

শেষ চৈত্ৰের স্রাণ

নূরজাহান আক্তার আলো

-‘আর করব না শুদ্ধ ভাই! ভুল হয়ে গেছে আমার,
এবারের মতো মাফ করে দেন, জীবনেও আর অবাধ্য
হবো না আপনার।’

উক্ত কথাটি বলতে বলতে প্রাণপণে ছুটছে শীতল।

তার পেছন পেছন

চালাকাঠ হাতে তেড়ে আসছে শুদ্ধ। ঘামে ভিজে
আছে পরনের টি-শার্ট।

মুখভঙ্গি অত্যন্ত গুরুগম্ভীর। দৃঢ় কপাল ও ঘাড় বেয়ে
ঝরে যাচ্ছে চিকন সুরু ঘাম। এই মুহূর্তে রাগে
দ্বিকশূন্য সে। জেদ চেপেছে শীতলকে উচিত শিক্ষা
দেওয়ার। সে ঢাকা থেকে বাড়ি এসেছে আজ প্রায়
তিনদিন হলো, তিনদিনই সে খেয়াল করেছে শীতল
কিছু একটা লুকাচ্ছে। কি লুকাচ্ছে সেটা গতকাল
রাতে ধরেও ফেলেছে। সেই সঙ্গে নজরে পড়েছে

শীতলের পদে পদে উড়নচণ্ডী ভাব। সবকিছুতে গা
ছাড়া মনোভাব। ও লাগামছাড়া
কথাবার্তা। আর এগুলো সে মোটেও পছন্দ করে না
তাই বরদাস্ত করার প্রশ্নই আসে না। কারণ এই
তিনটে বৈশিষ্ট্য বখে যাও প্রধান কারণ। আর তার
মতে, কারো ভুল শুধরে দেওয়ার পরেও সে যদি
বারবার একই ভুল করে তার পানিশমেন্ট
আপনাআপনিই ফরজ হয়ে যায়। শীতলেরও তাই
হয়েছে। সময়ও এসেছে শক্ত হাতে তার লাগাম টেনে
ধরার। এজন্য সেও আর দেরি করল না, সঠিক
মানুষকে, সঠিক পন্থায়, সঠিক পানিশমেন্ট বুঝিয়ে
দিতে চ্যাকাঠ হাতে সামনে এগিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ আগের ঘটনা,
তখন সকাল সাড়ে ছয়টা। ঘুম থেকে উঠে পরিপাটি
হয়ে বাগানে এসেছে শীতল। পরনে গোলাপি রঙা
নতুন থ্রি-পিচ। লম্বা কালো চুলগুলো স্বয়ত্বে
বেনুনি করে সামনে এনে রাখা। মনটা বেশ ফুরফুরে।
ঠোঁটে মিষ্টি হাসি।

স্নিগ্ধ মুখখানায় অপার মায়া। ডাগর ডাগর
নেত্রজোড়ায় আনন্দের রেশ। এত খুশির কারণ নেই

তবুও সে খুশি। কারণ গোমরামুখে থাকতে ভালো লাগে না তার। দু'দিনের ছোটো এই জীবনে দেড় দিনই যদি মন খারাপ করে থাকে তাহলে হেসে খেলে জীবন উপভোগ করবে কখন? এটাই তো সময় জীবন উপভোগ করার। মুক্ত পাখির ন্যায় স্বাধীন মনে উড়ে উড়ে, ঘুরে ঘুরে বেড়ানোর। মনে মনে একথা ভেবে ঠোঁটে হাসি এঁটে আশপাশে তাকাল। একটুদূরে দারোয়ান কাকা মেইন গেটের সঙ্গে লাগোয়া ছোটো ঘরে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। দলে দলে পাখিরা নিজস্ব স্বরে ডেকে জানিয়ে দিচ্ছে সকালের আগমনী বার্তা। সে কয়েক ধাপএগিয়ে দৃষ্টি ছুঁড়ল মেইন গেটের ওপাশে। সামনের রাস্তা দিয়ে দু'একজনকে হাঁটতে দেখা যাচ্ছে। তাদের পাশ কাটিয়ে রিকশা টুং টাং শব্দে আসছে-যাচ্ছে নিজস্ব গন্তব্যে। গেটের আশেপাশে কাউকে না দেখে সে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। কিছুক্ষণ আগে বেলকনিতে দাঁড়িয়ে দেখেছে শুদ্ধ ভাই জগিং করতে বের হয়েছে। যদিও

উনার ফিরতে দেরি হয় প্রায়ই দিন তারপরও একটু সতর্ক থাকা ভালো। আর যে ক'টাদিন থাকবে অবশ্যই চোখ, কান, খোলা রেখেই চলতে হবে।

কারণ এই লোকের শকুনের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি,
শেয়ালের মতো ধূর্ত বুদ্ধি, সহজে চোখ ফাঁকি দেওয়া
যায় না। কিভাবে যেন সব বুঝে যায়। একবার যদি
তার উদ্দেশ্যের ব্যাপারেও বুঝতে পারে তাহলে খবর
করে ছাড়বে। এসব ভাবনার ছেদ ঘটিয়ে আর না
দাঁড়িয়ে নিজের কাজে লেগে পড়ল। ফোনটা সঠিক
স্থানে রেখে আলতা পরা খালি পায়ে ঘাসের উপর
হেঁটে একটি ভিডিও ধারণ করল। চমৎকার হয়েছে
ভিডিওটা। গাছের ফাঁক ফোঁকড় দিয়ে সূর্যের নরম
আলো ঘাসে পড়ায় নজর কাড়ছে বেশি। তাও একটু
ইডিট করে একটা হিন্দি গান লাগিয়ে নিলেই হবে।
সকালের দিকে রান্নাঘরে তাড়া থাকায় বাড়ির
গৃহিনীরাও বাগানের দিকে আসে না। আর ছোটোরা
সাতটার পর ঘুম থেকে ওঠে। এই সুযোগে সে
বাগানের ফুলের সঙ্গে, গাছের সঙ্গে হেলান দিয়ে,
ঘাসের উপর বসে, একেক পোজে এক
রকমের ভিডিও নিলো। ভিডিওগুলো তার মনমতো
হওয়ার হাসি লেপ্টে রয়েছে অধরজুড়ে। ভিডিওগুলো
দেখতে দেখতে ভাবল লাস্ট আরেকটা ভিডিও নিয়ে
চলে যাবে। ঘড়ির কাঁটা তখন টিকটিক করে এগিয়ে

যাচ্ছে আটের ঘরে। যমরাজের ফেরারও সময় হয়ে গেছে। তাই সে দ্রুত চুলের বিনুনি খুলে খোলা চুলে পোজ নিয়ে দাঁড়িয়ে সামনে তাকাতেই বরফের ন্যায় জমে গেল। তার থেকে কয়েক হাত দূরে ভ্রুঁ কুঁচকে তাকিয়ে আছে শুদ্ধ ভাই। ওহ্ যা! ধরে পড়ে গেল? এখন কি বলবে? সে উপায় না পেয়ে গালভর্তি হেসে বলল,-‘হে, হে, ভালো আছেন শুদ্ধ ভাই? জগিং সেরে ফিরলেন?’

-‘তুই এখানে কি করছিস?’

-‘এমনি, এমনি হাঁটাহাঁটি করছিলাম আর কি।’

-‘হাঁটতে গেলে পায়ে আলতা পরতে হয়?’

-‘গা গরম লাগছিল। যা গরম! আলতা, আলতা তো রাতেই পড়েছিলাম।’

শুদ্ধ আর একটা কথাও ব্যয় করল না। শুধু এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছু একটা খুঁজতে লাগল। পেয়েও গেল কাক্ষিত জিনিসটি। সে একটু গিয়ে

অনুষ্ঠানের জন্য আনা চ্যাকাঠের স্তূপ থেকে তড়িৎ গতিতে চ্যাকাঠ হাতে তুলে নিলো। শীতল ভয়াত চোখে তাকাল। হাত দুটোও থরথর করে কেঁপে

উঠল। মস্তিষ্কও সংকেত পাঠাল,' এর মতিগতি
সুবিধার নয়, পালা শীতল, পালা!'

অবস্থা বেগতিক বুঝে সে ফোনটা ফেলে প্রাণপনে
দৌড়াতে শুরু করল। আর মুখে বলতে লাগল, 'আমি
কিছু করি নি শুদ্ধ ভাই। ছেড়ে দেন। ম'রে যাব ওটা
দিয়ে মারলে।'

সকাল সকাল মিথ্যা বলায় রাগে কোনো উত্তর করল
না শুদ্ধ। তবে ওর মুখ দেখে মনে হলো ধরতে
পারলে খবর আছে। এদিকে প্রত্যেক দিনের মতো
ঘড়ির কাঁটা আটের ঘরে পৌঁছানো মাত্র ব্রেকফাস্ট
করতে বসেছে

বাড়ির কর্তা ও তাদের সন্তানরা। সামনের চেয়ারেই
বসেছেন শারফাত, সাওয়ান ও শাহাদত চৌধুরী।
এরপরে সায়ন, শখ, সৃজন, সাম্য, ও স্বর্ণ। আরো
তিনটে চেয়ার ফাঁকা সেখানে বসবে শুদ্ধ, শীতল আর
শতরুপা। একটুপরেই শতরুপা চৌধুরীও এসে
বসলেন। পেশায় তিনি আইনজীবী। উপশহরে থাকেন
নিজস্ব ফ্ল্যাটে। একমাত্র ছেলে রুবাব কবির, পেশায়
মেরিনার। বছরের একবার ছুটিতে আসে। বর্তমানে
মাঝ সমুদ্রে থাকায় যোগাযোগ হয়নি কয়েক দিন

যাবত। এখানে উনি মাঝে মাঝেই আসেন ভাই-ভাবি
ভাইপো-ভাইঝিদের সঙ্গে সময় কাটাতে।

সবাই এসেছে। শুদ্ধ আর শীতল শুধু অনুপস্থিত।
ওদেরকে ডাকতে স্বর্ণ কেবল উঠে দাঁড়াতেই বাইরে
থেকে থড়বড় করে ছুটে আসতে দেখা গেল
শীতলকে। শীতলের পেছনে শুদ্ধকে দেখে সকলেই
হতবাক। বিশেষ করে তার হাতের মেহগনি গাছের
মোটা চ্যাকাঠ দেখে। বিস্ময়ে খেঁই হারিয়ে
ফেলেছেন সকলে। এইটুকু মেয়েকে চ্যাকাঠ দিয়ে
মারতে তেড়েছে? মারলে মেয়েটা বাঁচবে? কি এমন
বড় অপরাধ করেছে চ্যাকাঠ দিয়ে মারতে হবে?
তবে শুদ্ধ রেগে আছে দেখে সিতারা চৌধুরী আগে
ছুটলেন ছেলেকে বাঁধ সাধতে। চ্যাকাঠ দেখে
বুঝতে বাকি নেই শীতল আবার কোনো কান্ড
ঘটিয়েছে। নয়তো ছেলেটা হঠাৎ রাগল কেন? এখন
যদি রাগের বশেই দু'ঘা বসিয়ে দেয় তখন কি হবে?
ওই হাঁড়গিলে শরীরে শক্ত মার হজম করতে পারবে?
এদিকে ছুটতে ছুটতে হাঁপিয়ে গেছে শীতল।

মুখ খুবকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম। বড় মাকে আসতে
দেখে ভরসা পেল। পায়ের গতি একটু শিথিল

করামাত্রই পায়ের পেশি বরাবর বারি বসিয়ে দিয়ে
দিলো শুদ্ধ। বারিটা জোরে দিয়েছে বলার অপেক্ষা
রাখে না। তীব্র যন্ত্রণায় সে পা ধরে ‘ওমাগো’ বলে
চিৎকার করে সেখানেই বসে পড়েছে। শুদ্ধ আরেক
ঘা বসানোর আগেই সিতারা চৌধুরী দ্রুতবেগে
চালাকাঠ ধরে নিয়ে বললেন,-‘ছেড়ে দে বাপ, কি
করেছে মেয়েটা? এই টুকু বাচ্চা মেয়েকে চালাকাঠ
দিয়ে কেউ মারে? ম’রে যাবে তো মেয়েটা।’

-‘যাক, ম’রে যাক। এইরকম বেয়াদব থাকার চেয়ে
না থাকাই ভালো।’

-‘কিন্তু কি করেছে সে, বলবি তো নাকি? সকাল
সকাল ঘুম থেকে উঠে ডাকাতের মতো রুদ্ররূপ
ধরলি কেন, হ্যাঁ?’

একথা বলতে বলতে উনি ছেলেকে একটু দূরে
সরাতে চাইলেন। কিন্তু শক্তপোক্ত দেহের পুরুষালি
দেহটাকে একটা পাও নড়াতে পারলেন না। সে
এখনো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শীতলের দিকে।
এদিকে কাঁদতে কাঁদতে পেছন থেকে বড় মাকে
জাপটে ধরেছে শীতল। মাত্র একটা বারি খেয়ে
হাউমাউ করে কাঁদছে। চোখ, মুখ, লাল করে ভয়ে

সিঁটিয়ে আছে বড় মার পেছনে। ফাঁটা বেগুনের মতো
চুপসে গেছে একবুক সাহস। শুদ্ধ রাগে ফুঁসছে।
আরেকটা বারি দেওয়ার জন্য হাত নিশপিশ করছে।
কিন্তু সিতারা চৌধুরী হাত ধরে থাকায় পারছে না।
তাকে কাঁদতে দেখে শুদ্ধ আরেকটা দেওয়ার জন্য
মাকে সরাতে গেলে শীতল কাঁদতে কাঁদতে
বলল,-‘আর করব না ভাইয়া। এবারের মতো মাফ
করে দাও।’

-‘আর করবি কি না পরের হিসাব, এখন করলি
কেন? বারণ করেছিলাম না? বলেছিলাম, চৌধুরী
নিবাসের মেয়েরা এত সস্তা না। সস্তা মেন্টালিটি
দেখাতে চাইলে বাসার বাইরে বেরিয়ে যেতে। বল
বলেছিলাম?’

শুদ্ধর ধমকে কেঁপে উঠল শীতল। বড় মাকে ধরে
পরপর মাথা নাড়াল। অর্থাৎ শুদ্ধ বারণ করেছিল।
তাকে মাথা নাড়ানো দেখে শুদ্ধ মায়ের হাত
ছাড়িয়ে সাইড থেকে আরেক ঘা বসাল শীতলের
পিঠে। তখন শারাফাত চৌধুরী কয়েক ধাপ এগিয়ে
গুরুগম্ভীর সুরে বললেন,

-‘বাড়ির মেয়ের গায়ে হাত তোলা এ কেমন বিহেভিয়ার শুদ্ধ? এর আগে বারণ করেছিলাম না তোমাকে? মেয়েরা বড় হচ্ছে যখন তখন তাদের গায়ে হাত তুলবে না।’

-‘বাড়ির মেয়েটা যদি অবাধ্য হয় শুধু মার কেন প্রয়োজন গলায় ফাঁস দিয়ে সিলিংয়ে ঝুলিয়ে রাখব।’
বড় ভাইয়ের কথা। শুনে শখ আর স্বর্ণ গুটিয়ে গেল।
ভয়ে একে অপরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। কারণ তারাও সদ্য প্রেমে মজেছে। একথা যদি শুদ্ধ জানে ওদের মেরে গুটিকি করে রোদে শুকাতে দেবে। বেঁচে থাকলে অনেক প্রেম করা যাবে। ছেলের কথা শুনে শারাফাত চৌধুরী খুব বিরক্ত হলেন।

তাচ্ছিল্যের নজরে তাকিয়ে রইলেন। এই ছেলেকে কিছু বলা না বলা দুটোই সমান। মুখ তো নয় যেন ধারালো ব্লেড। যা বলবে কাট কাট উত্তর যেন প্রস্তুতই থাকে। তবুও তিনি দমে গেলেন না ছেলেকে শাসিয়ে বললেন,-‘সে যতই অন্যায় করুন সেসব দেখার জন্য আমরা আছি। তুমি কেন মারবে?’

-‘কারো অপকর্ম যদি আমার সন্মানে সামান্য ছিঁড়ে
ফোঁটাও দাগ লাগায় তাহলে আমি তাকে ছেড়ে দেবো
না। সে হোক বাবা-মা কিংবা কাজিন।’

একথা বলে সে শীতলের দিকে তাকাল। ভয় পেয়ে
শীতল সিঁটিয়ে গেল বড় মায়ের পেছনে। শুদ্ধ তখন
অপর হাতে থাকা শীতলের মোবাইলটা স্বজোরে
আছাড় মারল মেঝেতে। মোবাইলটা ভেঙে চূড়ে থান
থান হয়ে ছিটিয়ে গেল চারদিকে। শখের মোবাইলের
করণ দশা দেখে শীতলের কান্নার গতি বাড়ল। কত
কেঁদে কেটে ফোনটা কিনেছিল সে। অথচ এই বর্বর
লোকটা ফোনের জান কবজ করে নিলো। তখন
শারাফাত চৌধুরী

কিছু বলার আগে সাওয়ান চৌধুরী শুদ্ধকে জিজ্ঞাসা
করলো,

-‘কি করেছে শীতল? মারছিস কেন বলবি তো
নাকি?’

শুদ্ধ নিজের মুখে কিছু বলল না। বাধ্য হয়ে শীতলই
ফোঁপাতে ফোপাঁতে বলল,-‘ট টিক টিকটিক করেছি।’
তাকে অর্ধেক কথা লুকাতে দেখে শুদ্ধ ভ্রঁ বাঁকিয়ে
তাকাতেই পুনরায় বলল,

-‘চারদিন হলো একটা প্রেমও করছি।’

একথা শুনে উপস্থিত সকলের বিম্বিত নজর গিয়েপড়ল শীতলের দিকে। বলে কী এই মেয়ে? মাথা ঠিক আছে এর? তখন শুদ্ধ স্বর্ণ আর শখের দিকে তাকিয়ে কড়া কঠে শুধাল,

-‘তোরা জানতি না?’দু’বোন এবার ভয়ে গুটিয়ে গেল। ভয়াতের ছাপটা তাদের চেহায়ায় ফুটে উঠল। একথা তারা জানত। শীতলের পেট পাতলা যেটাই করুক তাদের বলে দেয়। তাদের মুখ দেখে শুদ্ধ যা বোঝার বুঝে গেল। এরা তিনজনেই এক ঘাটের মাঝি। এদের খবরও তার জানা আছে। একজন প্রেম করে টিউশন টিচারের সঙ্গে, আরেকজন ইউনিভার্সিটির একই ডিপার্টমেন্টের ছেলের সঙ্গে। এই দু’টোকেও একটা শিক্ষা না দিলে হবে না ভেবে ওদের দিকে তেড়ে গেলে সাওয়ান চৌধুরী থামালেন। তিনজনকে খুব বকলেন। মেজো বাবার বকা শুনে শখ, স্বর্ণ, শীতল মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

অতঃপর এদিকের পরিস্থিতি সামলে নাস্তার পর্ব শেষ করে যে যার যার কর্মক্ষেতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। শায়াফাত ও সাওয়ান চৌধুরী

উনাদের অফিসে চলে গেলেন। উনারা নিজস্ব আলাদা আলাদা ব্যবসা দেখাশোনা করেন। শাহাদত চৌধুরী আর্মি অফিসার। কিছুদিনের জন্য ছুটিতে এসেছেন। বর্তমানে আছেন চট্টগ্রামে।

শারীফাত চৌধুরী বাড়ির বড় কর্তা, উনার সহধর্মিণী সিতারা চৌধুরী এবং তার তিন সন্তান সায়েন, শুদ্ধ, শখ। সায়েন পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে রাজনীতি বেছে নিয়েছে। বলা যায় বড় মাপের রাজনীতিবিদ সে। শুদ্ধর পড়াশোনা চলমান এবং সে একজন গবেষক (researcher). সে ঢাকায় থাকে। সুযোগ বুঝে দু'চারদিনের জন্য বেড়াতে আসে। আর শখ অনার্স শেষ বর্ষের ছাত্রী। সাওয়ান চৌধুরী এই বাড়ির মেজো কর্তা। তার সহধর্মিণী সীরাত, তাদের জমজ ছেলে সৃজন ও সাম্য। তাদের বয়স বারো বছর। ওদের দু'জনের

চেহারা একই রকম। চট করে তাকিয়ে আলাদা করা মুশকিল। জন্মগত ভাবে তাদের দু'জনের চোখেই সমস্যা বিধায় চশমা পরতে হয় দু'জনকে।

রোগ শোকও হয় একসাথে। সকালে একজনের জ্বর এলে দু'এক ঘন্টার মধ্যে আরেকজনের গা গরম

হবেই মিস হওয়ার স্কোপ নেই।তাই একজন অসুস্থ হওয়া মাত্র সীরাত মানসিকভাবে প্রস্তুত নেয় আরেকজনের সেবা শুশ্রূষা করার। তবে তারা স্বভাবে হয়েছে উল্টো, একজন উত্তর মেরু তো আরেকজন দক্ষিণ মেরু।

শাহাদত চৌধুরী হচ্ছে এই বাড়ির ছোটো কর্তা। উনার সহধর্মিণী সিমিন, তাদের দুই মেয়ে, স্বর্ণ ও শীতল। স্বর্ণ অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী, শীতল সবে কলেজে পা দিয়েছে। শাহাদত চৌধুরী চাকরিস্থল চট্টগ্রাম, সেখানে থাকেন। স্ত্রীসহ মেয়েদুটোকে সবার সঙ্গে চৌধুরী নিবাসে থাকেন। তারা এই বাড়ি থেকে এক পা নড়তেও ইচ্ছুক নয়। ধরা বাঁধা নিয়মে নাকি খাপ খাওয়ানো তাদের পক্ষে নাকি সম্ভব নয়। একথা শুনে উনিও কিছু বলেন না। কারণ উনার অনুপস্থিতিতে স্বর্ণ বা শীতল কম আদর পায় না। বরং শারাদাত, সাফওয়ান চৌধুরীসহ বাড়ির প্রত্যেকটা সদস্য একটু বেশিই ভালোবাসে তাদের। সিতারা, সীরাত, সিমিন তিন জা যত্ন করে আগলে রাখে পুরো চৌধুরী পরিবারটাকে। সব মানিয়ে নেয় নিজেদের মত করে।তবে মজার ব্যপার এই চৌধুরী নিবাসের

প্রতিটা সদস্যের নামের শুরু, স অথবা শ দিয়ে।
যেটা সচরাচর কোথাও শোনা যায় না, দেখাও যায়
না।

সায়ন রুম থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে
খেয়াল করে শীতল

কান ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার শাস্তি এখনো শেষ হয়
নি। ড্রয়িংরুমে শুদ্ধ বসে তাই পালাতেও পারছে না।
সে শীতলের দিকে তাকিয়ে খ্যাকখ্যাক করে হেসে
বলল,

-‘আর ছেলে পেলি না? শেষে কি না ড্যান্ডিখোরের
প্রেমে পড়লি?’

শীতল মুখ তুলে তাকাল। পায়ের ব্যথায় জান যায়
যায় অবস্থা। সায়নকে হাসতে দেখে রাগ হলো খুব।
কোথায় তাকে বাঁচিয়ে বড় ভাইয়ের দায়িত্ব পালন
করবে তা না করে দাঁড়িয়ে দাঁত কেলিয়ে হাসছে।
মীর জাফরের দল এক একটা। সময় তারও আসবে।
সায়নের হাসি সহ্য হলো না তাই শীতলও খ্যাক করে
বলল,

-‘কে ড্যান্ডিখোর? সে মোটেও ড্যান্ডিখোর না।’ একথা
শুনে সায়ন হো হো করে হেসে ফেলল। তখন তাদের

কথার মাঝে সীরাত অর্থাৎ শীতলের মেজো মা এসে উপস্থিত হলেন। উনি সায়নের উদ্দেশ্যে বললেন,
-‘ড্যান্ডি কি রে বাপ?’

-‘ড্যান্ডি এক ধরনের আঠা। ড্যানড্রাইট অ্যাডহেসিভ নামের আঠাকে ছোট করে ড্যান্ডি বলে। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, ডিভাইস, চামড়া এবং প্লাস্টিকের পণ্য জোড়া লাগানোর কাজে ব্যবহৃত হয় ড্যান্ডি। এটা এখন নেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে অনেকে।’

সায়নের কথা চোখ সীরাতের চোখ কপালে উঠে গেল। উনি আঁতকে উঠে বললেন,

-‘হ্যাঁ রে শীতল শেষে কি না আঠাখোরকে পছন্দ হলো তোর? ব্রেকআপ করে ফেল মা। আঠাখোর জামাই চাই না আমাদের। আঠা দিয়ে জামাই অ্যাপায়ন করে কিভাবে তাও তো জানি না।’

মেজো মায়ের কথা শুনে সায়নের হাসি বেড়ে গেল। সে হাসতে হাসতে বলল,-‘ কেন মেজো মা, আঠার দিয়ে সব আইটেম বানাবে। আঠার পোলাও, আঠার কোর্মা, আঠার রোস্ট, আঠার কালা ভুনা। আমাদের শীতলের ইউনিক জামাই বলে কথা, তাকে ইউনিক অ্যাপায়ন না করলে চলে?’

একথা বলে সায়ন আবারও হাসতে লাগল। খাবারের আইটেমের নাম শুনে সীরাত মুখ কুঁচকে নিলেন। আর শীতল বিরক্ত হয়ে তাকিয়ে রইল। বড় ভাইগুলোর কাজই হলো ছোটো বোনদের বফের ভুল ধরা। কি যে মজা পায় কে জানে! তবে বাড়ির সবাই জেনে গেছে দেখে সেও ভেবে নিলো আজই ব্রেকআপ করে নেবে। নয়তো শুদ্ধ ভাই চ্যালাকাঠ ভাঙবে তার পিঠের উপরে। ড্রয়িংরুমে বসে মা, চাটীদের দিকে বিরক্তি চোখে তাকিয়ে আছে শীতল। বিরক্তির ভারে চোখ, মুখ কুঁচকে আছে তার। পায়ের পেশিতে কালশিটে পড়ে যাচ্ছে তাই অবস্থা। ব্যথায় পিঠ, পা, অবশ প্রায়। তারমধ্যে এতক্ষণ কান ধরে থেকে কেবলই ছাড়া পেয়েছে সে। ছাড়া পাওয়ামাত্রই সোফায় বসে পা ধরে কাঁদতে শুরু করেছে। তাকে কাঁদতে দেখে সিমিন চৌধুরী বকতে বকতে গেছেন রসুন তেল গরম করতে। কিন্তু সেইই গেছে এখনো ফেরার নাম নাই। থাকবে কিভাবে? রান্নাঘরে তিন জা মিলে রাজ্যের গল্প জুড়ে দিয়েছে। লাল শাক, পুঁইশাক দেখে পুরনো কিছু কথা মনে পড়েছে তিন জায়ের। উনাদের প্রেগনেসির সময় কে কোন জিনিস খেতে

পারত না। কার কোনটা খেতে ইচ্ছে করত। কোন
খাবার দেখা মাত্রই গা গুলাত এসব কথায় উঠেছে।
উনাদের সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছে কাজের বুয়া সাহেলা। ওই
মহিলা আরেক গল্পবাজ। যার তার সঙ্গে গল্প জুড়ে
দেয়। গল্প করতে করতে বাংলায় গালিও ছুঁড়ে
অনায়াসে। উনার এই বদ স্বভাবের কারণে সায়নের
কাছে ধমক খেয়েছে বেশ কয়েকবার। ধমক খাওয়ার
পর মুখ কাচুমাচু করে বলে, ‘জীবনেও আর
গালাইতাম না ভাইজান। যদি গালাই

তাইলে কুত্তার লগে দোস্তি করুম। কুত্তা আমার
দোস্ত।’এরপর দু’দিন ঠিক থাকে তারপর যা কার
তাইই। শুদ্ধকে দেখে ভয় পায় বিধায় সে বাড়িতে
এলে কম কথা বলে। দূরে দূরে থাকে। শুদ্ধ গেলে
যেন

হাফ ছেড়ে বাঁচে। একবার তো বড় মাকে বলেই
ফেলেছিল, ‘মা জননী আপনে ছুডু পুল্লা এরাম
খসখইসা মেজাজের ক্যান? হেই প্যাডে থাকতে কী
খুকসা পাতার রস খাইছিলেন?’

সেদিন তার কথা শুনে বড় মাও বিস্মিত নজরে
তাকিয়ে ছিলেন। আসলে কী জবাব দিবেন বুঝে

উঠতে পারছিলেন না বেচারি। এইদিকে রান্নাঘরে গল্প আরো জমে উঠেছে। অউহাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। শীতল ফোঁপাতে ফোপাঁতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নিজের রুমে গেল।

বিছানায় শুয়ে বালিশের পেটে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল। সকাল সকাল মুড খারাপ করে দিয়েছে এই পাঁজি শুদ্ধ। সব জায়গায় শুদ্ধ পুরুষগিরি না করলে চলে না তার। ইশ! চ্যাকাঠ দিয়ে কত জোরে মারল! এভাবে কেউ কাউকে মারে? পুলিশও চোরকে এভাবে পেটায় না বোধহয়। আর কেউ কিছু বলল না। বারণও করল না। শুধু পানিশমেন্ট দেওয়া দেখল। এখানেই প্রমাণ হয় বাড়ির কেউ ভালোবাসে না তাকে, কেউ না। যখন কেউ ভালোইবাসে না এই মুহূর্তই ম'রে গেলেই ভালো হতো। তখন সবাই বুঝত।

এত মারকাটের কী খুব দরকার ছিল? কি এমন মস্ত বড় পাপ করেছে? শুধু টিকটকই করেছে। অসংখ্য মানুষ টিকটক করে। প্রেম করে। তারা কি মানুষ না? মোদাকথা, প্রেম আর টিকটক এক জিনিস হলো নাকি?

মোটোও না! শয়তানে যখন নাড়ে মানুষ তখন প্রেমে
পড়ে। প্রেম করতে

ডগমগ করে উতলে প্রেমের খাদে। সেই খাদে একা
একাই হাবুডুবু খায়। তারপর যখন হুঁশ আসে তখন
বুঝে প্রেম কি জিনিস! আর মনের খুশির জন্য করে
টিকটক। নেচে, গেয়ে, বিনোদন দেয় নিজেকে এবং
নিজের মজিকে। তাই তার ভাষ্যমতে প্রেমের জায়গায়
প্রেম ;টিকটকের জায়গায় টিকটক। মূলত একথা
ভেবে প্রেম আর টিকটক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
যাতে প্রেমে ছাকা খাওয়া মাত্র টিকটক করে মনের
দুঃখ কমাতে পারে। তাছাড়া কষ্টের গানগুলো নাকি
ছাকা না খেলে ঠিকঠাক মতো অভিনয়
করা যায় না। করলেও খামতি থেকে যায়। এইতো
তাদের পাশের বাড়ির ডিভোর্সী মেয়ে রুগিয়া আপুও
টিকটক করে। তার লদলদে গতির নিয়ে ঝাকানাকা
গানে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে নাচে। কখনো বা প্রাক্তন
স্বামীর কথা ভেবে ভিডিও অন করে খুব কাঁদে।
এতো স্বামীকেও স্মরণ করা হয় টিকটকও করা হয়।
আবার তাদের ক্লাসের মেকাব সুন্দরী মিলি টিকটক
করে। পড়াশোনায় পুরাই ডাব্বা। কলেজ ব্যাগে বই

বাদে মেকাৰ সামগ্ৰী নিয়ে ঘূৰে। পথে, ঘাটে, সুযোগ
পেলেই টিকটক করতে শুরু করে। এসব করে সমান
তালে টাকা কামাচ্ছে। আইফোন কিনতে নাকি বিদেশ
যাবে। দেশে আসা আইফোন প্রায় নকল হয় তাই
সরাসরি বিদেশ গিয়ে চোখে দেখে, পরখ করে,
আইফোন কিনবে। কি সৌভাগ্য তার! নিজের টাকায়
শখের জিনিস কেনার মতো সুখ পৃথিবীতে আছে
নাকি? না নেই তো। এ সুখ অনিন্দ্য! নিষ্কলঙ্ক! বাস্তব
সত্য হলো, টাকা থাকলে সবাই উড়ে উড়ে
ভালোবাসতে আসে। আদর করে, কিছু হলে বলার
আগে কিলকিল করে যত্ন করে আসে। আর যার
টাকা নেই তার সম্মানের পরদ একদম শূন্যের
কোঠায়। গুরুতর কিছু হলেও গুরুত্ব মিলে না। যত্ন
মিলে না। এ বাড়িতে

জলজ্যান্ত উদাহরণ হিসেবে তার কথাখানায় ধরা যাক,
তার টাকা নেই, ছোটো খাটো ইনকামের সোর্স'ও
নেই, এজন্য কেউ দেখতেও পারে না। ভালোওবাসে
না। মাসে মাসে মোটা টাকা কামানো ঘাওড়া শুদ্ধই
সবার চোখের মনি। কয়লার খনি। ওর সামান্য জ্বর
এলেও সবাই তাকে আদরে আদরে গদগদ করে

মাথায় তুলে রাখে। অথচ তার বেলায় যেন লবডঙ্কা।
অন্যকে কি বা বলবে? নিজের আপন মায়েরই কোনো
পাত্তা নেই। গুরুত্ব নেই। থাক, লাগবে না, কারো
পাত্তা লাগে না, পায়ের ব্যথাতেই ম'রে ভূত হয়ে
এখানে এভাবে পড়ে থাকুক। আর সবাই শুদ্ধ
পুরুষকে নিয়ে ভালো থাকুক।

এমন মনগড়া অভিযোগ করতে করতে শীতল
একপর্যায়ে ঘুমিয়ে গেল।

তবে তার অজানায় রয়ে গেল, সে ঘুমানোর পর তার
মা, বড় মা এসে পায়ের ব্যথা কমানোর স্প্রে করেছে।
ঠিকঠাক শুইয়ে গায়ে চাদর টেনে দিয়েছে। পাগল
মেয়েটা কতশত অভিযোগ করল। অথচ এটাও
অজ্ঞাত

রইল, তার মা পায়ের কালশিটে দেখে ছলছল চোখে
তাকিয়ে আলতো করে হাত বুলিয়েছেন স্নেহমাখা
স্পর্শে। কপালে আদর ঐঁকে অশ্রুভেজা

চোখ মুছে দিয়েছেন মমতামাখা আঁচলে। আর বড় মা
ওর পায়ের অবস্থা দেখে শুদ্ধকে আরেকদফা
ঝেড়েছে। সময় তখন দুপুর একটা বেড়ে আটচল্লিশ
মিনিট,

এসময় চৌধুরী নিবাসের কর্তারা বাসাতে থাকে না
বললেই চলে। অফিস থেকে বাসায় ফিরে লাঞ্চ সারা
সম্ভব হয়ে উঠে না। ব্যস্ততা থাকে। কখনো মিটিং
থাকে। হিসাব নিকাশের ব্যাপার থাকে। মোদাকথা
সময়ের সঙ্গেও পেরে উঠা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু
শারাফাত ও সাফওয়ান চৌধুরীর ছোটো ভাই শাহাদত
চৌধুরী ছুটিতে এলে তিন ভাই একসঙ্গে খেতে বসে।
তখন যত ব্যস্ততায় থাকুক তিনবেলা একসঙ্গে
একটেবিলে খেতে ঠিকই সময় বের করে নেন। তখন
ভাইয়ের থেকে কাজকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় না।
কারণ শাহাদাত চৌধুরী বাড়ি বাইরে থাকেন। দিনের
পর দিন মাসের পর মাস একা একা খান।
পরিবারকে কাছে পান না, সময় দিতে পারেন না।
উনার নিশ্চয়ই পরিবারের সবার সঙ্গে সময় কাটাতে
খুব ইচ্ছে করে, গল্পের পসরা খুলে খাওয়ার পর্ব
সারতে ইচ্ছে করে। তাছাড়া একটেবিলে
খেতে বসলে কত কথা হয়, কত মজা হয়, রাগ-
অভিমান, দুষ্টুমি-খুনশুটি সবই হয়। আর এগুলো
বন্ধনকে আরো দৃঢ় করে। সম্পর্ক মজবুত করে।

ছোটো ভাইয়ের দিকটা মাথায় রেখে শারাদাত চৌধুরী
আদেশে যে'কটা দিন উনি বাড়িতে থাকেন সবাই
খাওয়ার সময় ঠিক সময়ে পৌঁছে যায়।

নিয়ম অনুযায়ী আজও সবাই ঁকে ঁকে খাওয়ার
টেবিলে ঁসে হাজির। অথচ সবার মধ্যে শীতল
অনুপস্থিত। তার কথা জিজ্ঞাসা করায় সকলে মুখ
চাওয়া চাওয়া করল। কেউ জানে না তার কথা।
সকালের পর তাকে নিচে দেখা যায় নি। রুম থেকেও
বের হয় নি। ঁমনকি সকালেও খায় নি। ঁকথা শুনে
শারাদাত চৌধুরী নিজেই গেলেন অভিমানী মেয়েটার
রাগ ভাঙাতে। উনি না গেলে তাকে কেউ আনতেও
পারবে না ঁকথা কারোও অজানা নয়। বাবাকে যেতে
দেখে শুদ্ধ বিরক্ত হয়ে তাকাল। ঁত আহ্লাদে ঁরো
ফাজিল হয়েছে সে। শাষণ, শাসণই! ঁকটা মেরেছে
কী না তাতে না খেয়ে, কেঁদে কেটে, ঢংয়ের পসরা
খুলে বসেছে। বাবা গেল, ঁরপরও

যদি না ঁসে তাহলে ঁরেদফা মার হবে তার।
সকালে চালাকাঠ দিয়ে দিয়েছে ঁবার হাতই যথেষ্ট।
থাপ্পড়ে মাড়ির দাঁত যদি না নড়িয়েছে তার নামও
শোয়াইব চৌধুরী শুদ্ধ নয়! ঁদিকে ক্ষুধার চোটে

শীতলের সাধের ঘুম ভেঙে গেছে অনেক আগে। কিন্তু মনে জেদ পুষে উঠছে না, খেতেও যাচ্ছে না। খালি এপাশ-ওপাশ করে সময় কাটাচ্ছে। ফোনটাও তো নেই

যে, স্বর্ণ আপুকে ফোন করে বলবে চুপিচুপি কোনো খাবার দিয়ে যেতে। তার রাগের আবার আরেক জ্বালা, মানুষের রাগ উঠলে নাকি ক্ষুধামন্দা হারিয়ে যায়। আর তার পেটে রান্নাসে ক্ষুধা এসে হাজির হয়। ইচ্ছে করে দুনিয়া সুদ্ধ খেয়ে ফেলবে। একথা কোনো কথা? এমন হলে রাগ দেখাবে কি করে? আর রাগ না দেখালে বুঝাবে কিভাবে সেও বড় হয়েছে। তাকে যখন তখন মারা যাবে না, বকাও যাবে না। কিন্তু কেউ খেতে ডাকছে না

কেন? কিছুক্ষণ আগে বাবা, মেজো চাচ্চু, বড় মা, শখ আপু ডেকেছিল, সে রাগ করে যায় নি। অভিমানের পারদ আকাশচুম্বী কি না! যাবেও না, খাবেও না, ভেবে দরজা আঁটকে ঘাপটি মেরে বসেছিল। ঘুম ভাঙার পর

তার রাগ পড়ে গিয়েছিল কিছুটা কিন্তু তাদের ডাকাডাকি শুনে শুদ্ধ রুম থেকে বেরিয়ে খ্যাকখ্যাক করে বলেছে,

-‘ এত ডাকাডাকির কি আছে? খাবে না ভালো কথা। এক বেলা না খেলে কেউ মরে না।’ ওই লাউয়ের বাচ্চা কদু একথা বলে তার রাগটাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। সে পারত না নিজে এসে সুন্দর করে ডাকতে? একবার বললে কি বা হতো,’ সরি, আর মারব না। খেতে আয়।’

কিন্তু সে উল্টে ত্যাড়া কথা বলে রাগ চড়িয়ে দিয়েছে। মেজাজের উপর কেরোসিন তেলে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। তখন থেকে তার মেজাজও

চাঙ্গে উঠে আছে। আপাতত বি’শ্রী মেজাজ ঠান্ডা করতে শাওয়ার নিয়ে এলো সে। শুদ্ধকে বকা চলমান রেখে ভেজা চুল মুছতে মুছতে কে যেন নক করল রুমের দরজার। খ্যাক করে উত্তর দেওয়ার আগে ভেসে এলো বড় বাবার গলা। সে জলদি দরজা খুলে দেওয়া মাত্রই শারফাত চৌধুরী স্নেহমাখা হাসি উপহার দিলেন। শীতল সব রাগ ভুলে গেল। অভিমানের পারদ গলেও চুরচুর। এই মানুষটার প্রতি

একটু বেশিই দুর্বল সে। উনার কোনো কথা ফেলতে পারে না। কারণ বাবাকে সে কতদিন কাছে পায়?পায় না বললেই চলে। যখন বাবাকে প্রয়োজন হয় এই মানুষটাই তাকে আগলে রাখে। ভরসা দেয়। সাহস জোগায়। এমনকি পৃথিবীতে আসার পরপর সে সবার প্রথমে কোলে চড়েছে এই মানুষটারই। ওর বাবা তখন কোনো একটা মিশনে গিয়েছিল। এমনিতেও সে জানে উনি সবার থেকে

তাকে একটু বেশিই ভালোবাসেন। কারণ শীতল নাকি মায়ের পেট থেকে আধমরা হয়েছিল। অনেকদিন হসপিটালে থেকে সুস্থ হয়েছিল। দেখতে এত আদুরে হয়েছিল খুব সহজে তার উপর সবার মায়া পড়ে গিয়েছিল।

একটু বড় হয়ে বাবার আঙুল না পেয়ে বড় বাবার আঙুলটাকে আঁকড়ে ধরেছিল সে। বাড়ির অন্যান্য ছেলে-মেয়েরা উনার রাগী রাগী মুখ দেখে ভয় পেতো। খুব একটা কাছ ঘেঁষতো না। এখনো তাই। অথচ সবকিছুতে শীতলের উনাকেই চায়। এখনো তাই। রুমের দরজায় বড় বাবাকে দেখে কিছু বলতে হলো না সে বিনাবাক্যে নিচে নেমে এলো।চেয়ার

টেনে খেতে বসল। আজ দুপুরে স্পেশাল টাইটেম
সর্ষে ইলিশ। অন্যান্য পদও আছে। এলার্জিজনিত
সমস্যার কারণে শুদ্ধ ইলিশ খায় না। তাই শুধু তার
জন্য সিঁতারার হাতের স্পেশাল ডিম ভুনা। শীতলও
জানে, ডিম ভুনা শুদ্ধের জন্য। তবুও সে ভাত নিয়ে
ডিমটাই পাতে তুলে নিলো। কেউ যেন ফেরত
দেওয়ার কথা বলতে না পারে তাই ডিমটাই আগে
মুখে পুরে দিলো। বলা বাহুল্য, সে এভাবে মনের রাগ
মিটাল। মেয়ের ছেলেমানুষি দেখে সিমিন

দাঁতের দাঁত চেপে বলল,

-‘একি তুই শুদ্ধর ডিম খেয়ে নিলি কেন?’

-‘ ডিমের গায়ে কারো নাম ধাম লেখা দেখলাম না
তো। আমি কী জানব এটা কার ডিম? মুরগির ভেবেই
তো খেলাম।’ একথা বলে সে সরাসরি শুদ্ধর দিকে
তাকাল। তারপর জিজ্ঞেস করল,

-‘ শুদ্ধ ভাই, এটা আপনার ডিম?’

শুদ্ধ একেবারে নিশ্চুপ। বড়রা শুনেও না শোনার ভাণ
করে খেতে ব্যস্ত।

তবে স্বর্ণ আর শখ একে অপরের মুখ চাওয়া চাওয়া
করল। মার খেয়েও দুষ্টামি কমে না এই পাজি
মেয়ের। এখন যদি শুদ্ধ ভাই উঠে চটাস্ করে
থান্ড দেয় তখন কি হবে? দুটো মার খেয়ে তো
সকাল থেকে বিছানাগত হয়ে পড়েছিল। আরেকচোট
খেলে দুই চোখে সর্ষে ফুল দেখবে। তাছাড়া
কেউ যদি বারবার যেচে নিজের পায়ে কুড়াল মারতে
চায়, তাহলে কি বা করার? অথচ শীতলের কথা শুনে
শারফাত চৌধুরী মুখ টিপে হাসলেন। তবে সেই
হাসিটা ঠোঁটে কোণেই অদৃশ্য রয়ে গেল। কথায় বলে,
হাতির গায়ে শক্তি বেশি হলেও পিঁপড়েও কম যায়
না। সেও মরার আগ পর্যন্ত দাঁত বসিয়ে কামড়ে ধরে
থাকে। বিপক্ষ দলকে বোঝায় হেরে যাওয়ার পাত্র সে
নয়। সহজে হার মানে ভীতুরা। শুদ্ধ নিজের মতো
খেতে ব্যস্ত। অল্প অল্প ভাত মুখে দিয়ে সুন্দর করে
খাচ্ছে সে। শীতলের কান্ড দেখেও নির্বাক। এমনকি
তার কথার জবাব দেওয়ারও প্রয়োজন মনে করল না
সে। কারণ পাগলরা তো কত কি বলে সব কথা কী
আর ধরতে আছে? বোধবুদ্ধি থাকলে বলত না
নিশ্চয়ই? অথচ শীতল মনের সুখে ডিমটার খেয়ে

সর্ষে ইলিশ দিয়ে তৃপ্তি সহকারে খাচ্ছে। মাঝে মাঝে
আড়চোখে শুদ্ধ দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। মুখে
ভাতের লোকমা তুলে মনে মনে চিৎকার করে বলছে,
'এ্যাই শুদ্ধ ভাইয়ে খাওন এত স্বাদ ক্যা?'

বড় জায়ের ইশারার সিমিন মেয়েকে আর কিছু বলল
না। বরং গজগজ করে তাড়াতাড়ি ডিম ভেজে শুদ্ধর
প্লেটে তুলে দিলো। এখন নিশুতি রাত। ধীরে ধীরে
ঘড়ির কাঁটা এগোচ্ছে তিনের ঘরে। গাঢ় আঁধারে ডুবে
আছে ধরাধাম। আকাশে উঠেছে মস্ত বড় পূর্ণিমার
চাঁদ। বইছে মৃদু বাতাস। আশেপাশে কোথাও একদল
কুকুর ডাকছে নিজস্ব স্বরে। দু'একটা জোনাকির দেখা
মিলেছে অদূরের ঝোপে। তারা নিজস্ব আলো জ্বালিয়ে
উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে স্বাধীন মনে। থেমে
থেমে ঝাঁঝি পোকাও তাল মেলাচ্ছে অদ্ভুত স্বরে। ঠিক
সেই মুহূর্তে বাসা থেকে বেরিয়ে এলো শখ আর স্বর্ণ।
হাঁটছে ধীর গতিতে। ভয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে
সতর্ক দৃষ্টিতে। তাদের থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে
অন্ধকারে

দাঁড়িয়ে আছে একটি পুরুষ অবয়। দারোয়ান কাকাকে
দেখা যাচ্ছে না। বেঘোরে ঘুমাচ্ছে বোধহয়। আর একটু

সামনে এগিয়ে কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির দেখা পেয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল তারা। আত্ননাদ করে জাপটে ধরল সেই অগন্তুককে। আঘাতপ্রাপ্ত শরীরে হালকা স্পর্শও জান বেরিয়ে যাওয়ার যোগাড়। তবুও অগন্তুক ব্যথাতুর শব্দ না করে নিজেকে সামলে নিলো।

জোরপূর্বক হাসার চেষ্টা করল। দু'জনকে জাপটে ধরে কিছু বলার চেষ্টা করল। কিন্তু অতিরিক্ত জ্বরে কাঠ হয়ে আসা কণ্ঠস্বরে কোনো শব্দই বের হলো না। কয়েকবার শুকনো ঢোক গিলেও চেষ্টায় ব্যর্থ হলো। তাকে এই অবস্থায় হাসতে দেখে শখ কান্নাভেজা স্বরে বলল,

-‘একি অবস্থা তোমার? কোথায় ছিলে তুমি? ফোন বন্ধ ছিল কেন?’

ছোটো বোনের কথা শুনে বুজে আসা চোখ দু'টো পুনরায় খুলল সায়েন।

আশেপাশে তাকাল। তারপর ধীরে ধীরে বলল,

-‘আমাকে ধর বোন। মাথা ঘুরছে। হাঁটতে পারছি না।

মনে হচ্ছে এন্ফুগি

পড়ে যাব।’ভাইয়ের কথা শোনামাত্রই স্বর্ণ আর শখ

দ্রুত তাকে ধরল। তাদের চোখে পানি দেখে সায়েন

কাঁদতে বারণ করল। ফিসফিস করে জানাল, সে ঠিক আছে। এবং বাড়ির কেউ জানার আগে তাকে এখুনি রুমে নিয়ে যেতে।

ভাইয়ের অবস্থা দেখে কেউ কথা বাড়াল না ধীরে ধীরে দো'তলায় নিয়ে

যেতে সামনে পা বাড়াল। চৌধুরী নিবাসের দো'তলার রুমগুলো বাড়ির ছোটো সদস্যদের দখলে। বড়রা থাকে নিচ তলায়। দো'তলার সায়নের পাশে শুদ্ধর রুম। শুদ্ধর পাশটায় শখের রুম। শখ, স্বর্ণ এক রুমে থাকে। ওরা দু'জন ঘুমায়ও একসাথে। কিন্তু শীতলকে নেয় না কারণ শীতলের ঘুমানোর ভঙ্গিমা ভালো না। সে ঘুমের ঘোরে পাশের জনের বুকের উপর পা তুলে দেয়। ঘুমের ঘোরে বকবক করে। হাসে। পাশের ঘুমন্ত মানুষটা যদি হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠে তাহলে কেমন লাগে? তাছাড়া শখ

আর স্বর্ণ দু'জনই রাত জেগে ফোনে কথা বলে। তারা এখন বড় হয়েছে। ব্যক্তিগত মানুষও রয়েছে এসব শীতল জানলে সবাইকে জানিয়ে দেবে। এই মেয়ের পেট পাতলা, তার পেটে কথা থাকে না। অগত্যা শীতল একা একটা রুমে থাকে। তার রুমের দরজা

সব সময় হাট করে খোলা থাকে। বলা বাহুল্য, ইচ্ছে করে দরজা খোলা রাখে যাতে ভয় পেলে দৌড়ে বের হতে পারে। শখ, স্বর্ণ বের হওয়ার আগেও দেখে এসেছে শীতল হাত পা ছড়িয়ে বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। কথা বলার সময় শীতলের গলার স্বর আস্তে হয় না। তার ফিসফিস করা কথাও পাশের জন্য শুনে ফেলে তাই তাকে ডাকার ভুল করে নি তারা। তাছাড়া সায়েন তাদের কল করে বলেছে যেন কেউ বুঝতে না পারে এমনভাবে বাসার বাইরে আসতে। কারণ তার এই অবস্থা দেখে তুলকালাম ঘটে যাবে। যা হবে সকালে দেখা যাবে এ মুহূর্তে তার বিশ্রামের দরকার। শরীর ছেড়ে দিচ্ছে। অসহ্য ব্যথায় দু'চোখ বুজে আসছে। তাছাড়া এবারই যে প্রথম তা নয়, এভাবে প্রায়দিনই মধ্যরাত্রে বাসায় ফিরে সে। আর তাকে চুপিচুপি বাসায় ঢুকতে সাহায্য করে তারই ছোটো বোনেরা। তারা চারজন বাইরে থেকে সিঁড়ির কাছে আসতেই হঠাৎ ড্রয়িংরুমের লাইন জ্বলে উঠল। অন্ধকার কেটে আলোর মাঝে দেখা গেল শাহাদত চৌধুরী দাঁড়িয়ে আছেন। দৃষ্টি তাদের দিকে নিবদ্ধ। ছোটো চাচ্চুকে দেখে চারজন ধরা পড়ে মাথা

নিচু করে নিলো। তবে মনে মনে খানিকটা স্বস্তি
পেলো শারায়াত চৌধুরী কাছে ধরা না পড়ায়। উনার
কাছে ধরা পড়লে খবর ছিল তাদের। শাহাদত চৌধুরী
আঘাতপ্রাপ্ত সায়নের আপাদমস্তক তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস
ছাড়লেন। ছেলেটার মাথায়, হাত-পায়ে ব্যান্ডেজ করা।
এই ছেলেকে কতবার বুঝিয়েছেন এসব রাজনীতি
টাজনীতে না জড়াতে কিন্তু এই ছেলে কথা শুনলে
তো? শুধু একবার নয় বার বার বাড়ির সব সদস্যরা
তাকে বুঝিয়েছে এসব না করতে, কিন্তু সে শোনে
নি। বরং জেদ দেখিয়ে দলনেতা হয়েছে। তার
চ্যাপেলারা তাকে ভাই ভাই করে ডেকে মুখে ফ্যানা
তুলে ফেলে। মিছিল, মিটিং করে। মারামারিতেও
দেখা যায়। যত দিন যাচ্ছে রাজনীতির সঙ্গে আরো
জড়িয়ে যাচ্ছে সে। এবং আজ
জানা গেছে আবু সিদ্দিক নামের একজন
রাজনীতিবিদের ডান হাত সে।
নির্বাচনের জন্য যত দৌড় ঝাপ করতে হয় করছে
আবু সিদ্দিকের হয়ে।

একথা শোনামাত্র শারফাত চৌধুরী ভীষণ ক্ষেপেছে তার উপর। কারণ চৌধুরী নিবাসের কেউ সরাসরি রাজনীতিতে জড়ায় নি কখনো। সাইন'ই এই দুঃসাহস দেখিয়েছে। এসবের চক্রে করে যে মার খেয়ে ম'রে রাস্তায় পড়ে থাকে কে জানে! ভালো স্টুডেন্ট সে। রেজাল্টও ফাস্টক্লাস। অথচ আবেগের বশে ভুল ডিসিশন নিয়ে ক্যারিয়ার নষ্ট করতে রাজনীতিতে নাম লিখিয়েছে। তাকে কোনোভাবেই বোঝানো যাচ্ছে না রাজনীতি এত সোজা নয়। রাজনীতিতে টিকতে গেলে নোংরা সাফ করার সঙ্গে নিজের গায়ে নোংরা লাগাতে হয়। লয়্যাল পারসোন হয়ে আর যায় হোক কখনো রাজনীতি করা যায় না। করলে জান, মানসহ, ক্ষমতা স্থায়ীত্ব থাকে না। এসব ভাবতে ভাবতে উনি এগিয়ে এলেন। ড্রয়িংরুমের দেওয়ালে সেটে রাখা বড় দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময়টা দেখে নিলেন। একবার তাকালেন বড় ভাইয়ের রুমের দিকে। ওই মানুষটা কিছুক্ষণ আগে রুমে গিয়েছে। ছেলের টেনশনে অস্থির হলেও কাউকে বুঝতে দিতে রাজি নন তিনি। সাইন পরশুদিন দুপুরে সবার সঙ্গে খেয়ে বের হয়েছিল।

এরপর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না তার। ফোনও বন্ধ ছিল। তার ফ্রেন্ডারাও খোঁজ দিতে পারছিল না। দলেন চ্যাপেলাদের জিজ্ঞাসা করেও লাভ হয় নি। মধ্যখানে একদিন পর এতরাতে বাড়ি ফিরেছে সে। ছেলেটা বাড়ি ফিরে নি দেখে বড়দের কারো খাওয়া নেই, চোখে ঘুম নেই। অথচ এই ছেলের মধ্যে একফোঁটা অনুশোচনা নেই। খারাপ লাগার রেশ নেই। মনে মনে এসব ভেবে উনি শখ ও স্বর্ণকে সরতে বলে নিজে সাইনকে ধরে উপরে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, -‘নিজের জানের মায়া না করো বাবা মায়ের কথা অন্তত মাথায় রাখতে পারো। তাদের বয়স হচ্ছে। আর কত?’

সায়ন বরাবরের মতোই নিরুত্তর! রোজ এক কথা শুনতে শুনতে কানের পোকা বের হয়ে গা সওয়া হয়ে গেছে। এখন কেউ কিছু বললে তার গায়ে লাগে না। খারাপও লাগে না। বরং বেহায়া মনে আনন্দ হয়। কারণ ভীষণ শখের পেশায় নিজের নামতৈরি করতে পেরেছে। ক্ষমতা অর্জন করেছে।

তার নাম, শাহরিয়ার চৌধুরী সায়ন। রাজনীতির মাঠে
তাকে শাহরিয়ার ভাই নামে পরিচিত সে। এটা তার
কাছে গর্বের, অহংকারের। শাহাদত চৌধুরী তাকে ধরে
রুমে পৌঁছে দিয়ে সাবধানে বিছানায় শুঁইয়ে দিলেন।
কিভাবে এই অবস্থা হলো সরাসরি জিজ্ঞাসাও
করলেন। সায়ন জানাল, বিপক্ষ দলের ছেলে-পুলেরা
একা পেয়ে দু'ঘা বসিয়েছে। একা থামাতে পারে নি
কাউকে ফলস্বরূপ আধমরা হতে হয়েছে। রাজনীতি
মানেই তো একদিন মারো তো আরেকদিন মার খাও।
এ আর নতুন কি!

মাঝখানে একদিন হাসপিটালে ছিল। বাসায় জানলে
দুঃচিন্তা করবে তাই কাউকে জানায় নি সে। ফোনটা
হারিয়ে গেছে বিধায় কাউকে জানাতেও পারেনি।
দুঃচিন্ততার কারণ নেই সে একদম ঠিক আছে।
একের পর এক

সায়নের দুর্বল যুক্তি শুনে শাহাদত চৌধুরী শুধু
শুনলেন। তারপর কিছু লাগবে কি না জানতে
চাইলেন। সায়ন বালিশে মাথা রেখে না বোধক মাথা
নাড়লেও মনে মনে ঠিকই বলল,

-‘ছোটোবেলার মতো প্যান্ট খুলে আমাকে হিসু করিয়ে
আনো চাচ্চু। বড্ড চাপে আছি।’এখন বড় হয়েছে এ
কথা কী আর মুখে বলা যায়? তবুও দুহাতে ব্যান্ডেজ
দেখে শাহাদত চৌধুরী নিজে থেকেই জানতে চাইলেন
ওয়াশরুমে যাবে কী না। মনের কথা বুঝে ফেলায়
সায়ন একটু লজ্জাও পেলো। তবে মুখে বলল যাবে
না। একথা শুনে উনি চলে গেলেন। উনি যাওয়ার
পরপর শখ আর স্বর্ণ খাবার হাতে রুমে ঢুকল। শখ
নিজে হাতে বড় ভাইকে খাইয়ে মেডিসিন খাইয়ে
দিলো। এদিকে খাওয়ার পর পর প্রেসাবের চাপ
আরো বেড়েছে। ছোটো বোনদেরও বলতে পারছে না
ওয়াশরুমে নিয়ে যাওয়ার কথা। যতই হোক বোন
তো! এদিকে ঘড়িতে কাটা এসেছে তিনের ঘরে।
সময় কাটছে যেন বাতাসের গতিতে। অনেক রাত
হয়েছে দেখে বোনদের ঘুমাতে যেতে বলে কাঠ হয়ে
পড়ে রইল সে। শখ ভাইয়ের গায়ে চাদর টেনে পা
বাড়াতেই সায়ন চোখ বন্ধ করা অবস্থায় বলল,-‘শুদ্ধ
কি বাসায় আছে নাকি চলে গেছে?’
-‘ ছোটো ভাইয়া বাসাতেই আছে।’

-‘ওকে ডেকে দিয়ে যা। আন্তে ডাকিস কেউ যেন না শোনে।’

-‘আচ্ছা ভাইয়া।’

একথা বলে শখ আর স্বর্ণ শুদ্ধর রুমের দরজায় নক করল। দু’বার নক করতেই শুদ্ধ বেরিয়ে এলো। সম্ভবত পড়ছিল। এতরাতে দু’জনকে দেখে কিছু বলার আগে স্বর্ণ জানাল সায়ন ডাকছে। এতরাতে সায়নের ডাকা মানে আহত হয়ে বাড়ি ফিরেছে। সে কথা না বাড়িয়ে তাদের যেতে বলে নিজেও পা বাড়াল বড় ভাইয়ের রুমে। শুদ্ধ সায়নের রুমে গিয়ে কেবল দাঁড়াতেই সায়ন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছোটো ভাইয়ের দিকে তাকাল। রাগে মুখ থমথম করছে তার। এতক্ষণ নিজেকে সামলালেও শুদ্ধকে দেখামাত্রই চড়চড় করে রাগ বাড়ছে। ইচ্ছে করছে নাক বরাবর ঘুষি বসিয়ে দিতে। শুদ্ধ বড় ভাইয়ের দৃষ্টির মানে বুঝেও নির্বাক। সে জানে তাকে ডাকার মূল কারণ। সে নিজেও ভাইয়ের দিক থেকে দৃষ্টি সরাল না। বরং চোখে চোখ রেখে সামনের সোফায় রাজকীয় ভঙ্গিমায় বসল। তাকে এভাবে বসতে দেখে সায়নের মেজাজ আরো বিগড়ে গেল। সে ব্যথা শরীরের চট করে উঠে বসল।

তারপর রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল,-‘যেটা করছিস ভালো হচ্ছে না এখানেই থেমে যা।’

-‘কোনটা ভালো হচ্ছে না?’

-‘কিসের কথা বলছি ভালো করেই জানিস। মিষ্টি কথার বাউয়াল বাদ দিয়ে ঝেড়ে কাশ।’

-‘তুমি কি আমার গফ যে মিষ্টি বাউয়াল ঝাড়ব? কেন, ডেকেছো বলো?’

-‘তুই আমার পিছু পিছু কৃষ্ণনগর কেন গিয়েছিল?’

শুদ্ধ সঠিক জবাবের ধারে কাছেও গেল না। বরং ত্যাড়া কণ্ঠে তাচ্ছিল্য করে বলল,

-‘ভুল পথ ছেড়ে সঠিক পথে এসো। এতে তুমি,আমি দু’জনেই ভালো থাকব।’

-‘আমি সঠিক পথেই আছি।’

-‘না নেই। তুমি ভুল মানুষের সঙ্গে পেয়ে ভুলকে সঠিক বলে চালিয়ে দিলে হবে না। তোমাকে আগেও বলেছি চোখ, কান, খোলা রেখে আগে মানুষ চিনে পা বাড়াও।’-‘এখন তোর থেকে আমাকে মানুষ চেনা শিখতে হবে? আমি বোকা, তুই চালাক এটাই বোঝাতে চাচ্ছিস?’

-‘বোঝাতে চাচ্ছি না সরাসরি বলছি, তুমি বোকা।
বোকা বলেই যে কেউ সহজে তোমার ব্র্ণ ওয়াশ
করতে পারে। তুমি না ভেবেই ভুল মানুষকে বাঁচাতে
বুলেটের সামনে বুলে পেতে দাঁড়িয়ে যাও। শেইম
অন ইউ ভাই!’

-‘শুদ্ধ!’

ভাইয়ের ধমক শুনেও শুদ্ধ দমল না। বরং সে আগের
তুলনায় তীক্ষ্ণসূরে পাল্টা জবাব দিলো,
-‘চেষ্টায়ে সত্যকে মিথ্যা প্রমাণের বৃথা চেষ্টা করে
এনার্জি লস কোরো না।

এখনো সময় আছে মানুষ চেনা শিখে নাও। নয়তো
চরম মূল্য দিতে হবে তোমাকে। আজ তোমার দলের
একজনকে মেরেছি একই কাজ করলে
আগামীতে আরো দশজনকে মারব। একজন রিসার্চার
হিসেবে শুধু নাম

কামিয়েছি তা কিন্তু নয়; ঘাড়ত্যাড়া হিসেবেও নামডাক
রয়েছে আমার। আর সেটা তোমার থেকেও কেউ
ভালো জানে না নিশ্চয়ই!’-‘ঢাকায় ফিরে যা। এসবের
মধ্যে নিজেকে জড়াস না। এক কথা বারবার বলতে
পারব না। এর আগে তোর গায়ে হাত তুলি নি আর

তুললেও চায় না। ফিরে যা। নিজের কাজে মন দে।
আমার পার্টি অফিসের আশেপাশে তোকে যেন না
দেখি। সবার কাছে তুই ভালো ছেলে, তাই হয়েই
থাক।’

-‘বড় ভাই যদি ভুল পথে পা বাড়ায় তাকে সঠিক
পথে আনার দায়িত্বটাও আপনাআপনিই ছোটো
ভাইয়ের ঘাড়ে চলে আসে। আমি সর্বদা আমার দায়িত্ব
পালনে অটল থাকি। আছি। তাই থাকব। আর
তোমাকে আগেও বলেছি সিদ্ধিক ভালো মানুষ নয়।
তার সঙ্গে কাজ করতে পারবে না তুমি।’

-‘কেন পারব না?’

-‘আমি বারণ করছি তাই।’

-‘তুই বারণ করার কে?’

-‘আমি কে সেটা নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করো উত্তর
পেয়ে যাবে। তবে আমি যখন বলেছি তুমি সিদ্ধিকের
হয়ে কাজ করতে পারবে না মানে পারবে না। আমি
তোমাকে করতে দেবো না।’-‘এবার বাড়াবাড়ি
করছিস তুই।’

-‘হয়তো। তবে আমি ততক্ষণ ভালো যতক্ষণ আমার আপনজন নিরাপদ থাকে। তোমার ছেলের মানা কোরো চৌধুরী নিবাসের দিকে ভুলেও যেন চোখ তুলে না তাকায়। নয়তো রিসার্চের কাজে ব্যবহার করা ইঁদুরের পরিবর্তে তাদের জলজ্যান্ত শরীর ব্যবহার করব। এতে একটুও খারাপ লাগবে না আমার। বরং কয়েকটা নিরহ ইঁদুর বেঁচে যাবে বলে ভালোই লাগবে।’

একথা বলে শুদ্ধ উঠে চলে গেল। সায়েন দাঁতে দাঁত চেপে তাকিয়ে রইল তার যাওয়ার দিকে। রাজনীতি করে সে আর তাকে কি না দাপট দেখায় এই ছেলে। এত বড় সাহস, ছোটো হয়ে বড় ভাইকে থ্রেট দেয়! শুনবে না। কারো কথাতেই রাজনীতি থেকে সরবে না সে। সেও এবার দেখবে শুদ্ধ ঠিক কি করে, কতদূর অবধি যেতে পারে। এদিকে রুম থেকে বের হয়েও আবার ফিরে এলো শুদ্ধ। সায়েনের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল,-‘চলো।’

-‘কোথায়?’

-‘ছোটো হয়েও বহুবার বড় ভাইকে ছোট কাজ সারতে সাহায্য করেছি। আজও দায়িত্ব পালন করি। হাত ধরো।’

একথা শুনে সায়ন দাঁত কটমট করে তাকিয়ে রইল। জেদ দেখিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলো ভাইয়ের থেকে। তাকে মুখ ফিরাতে দেখে শুদ্ধও এক ভ্রুঁ উঁচু করে ত্যাড়া স্বরে বলল,

-‘মুখ ফিরিয়েও লাভ হবে না। এখন আমার সঙ্গে তোমাকে ওয়াশরুমে যেতে হবে আর আমার কথাতেই তোমাকে সিদ্ধিকের সঙ্গে ছাড়তে হবে। একথার নড়চড় হবে না। চাইলে চেষ্টা করে দেখতে পারো তবে ফলাফল যা আসবে আমার কথামতোই। প্রয়োজন লিখে রাখো। আমি শুদ্ধ যে, এককথার মানুষ সেটা মনে করিয়ে দিতে হবে না নিশ্চয়ই!’

একথা বলেই শুদ্ধ ভাইয়ের হাত শক্ত করে চেপে ধরে উঠে দাঁড় করাল।

এদিকে তলপেটের চাপ অন্যদিকের ভাইয়ের জেদের কাছে হার মেনে সায়নকে উঠতেই হলো। শারাবাত চৌধুরীর তিন সন্তান সায়ন, শুদ্ধ, শখ। তারা বরাবরই মেধাবী স্টুডেন্ট। তাদের সঙ্গে পড়াশোনা নিয়ে

ঘ্যানঘ্যান করতে হয়নি কাউকেই। বরং তারা ফাস্ট ক্লাসে উত্তীর্ণ হয়েছে প্রতিটা পরীক্ষায়। ক্লাস টেন অবধি শুদ্ধ, সায়ন সময় বের করে ছোটো বোন শখকে পড়িয়েছে। তার জটিল সমস্যাগুলো যত্ন করে বুঝিয়েছে। বুঝাতে গিয়ে কখনো মেরেছে কখনো বকেছে। শখ মার বকা খেয়ে তাদের কাছেই পড়া শিখেছে। শখ সায়নের কাছে পড়ত ইংলিশ, শুদ্ধর কাছে ম্যাথমেটিক্স। তাদের পড়ানোর ধরণে আলাদা করে টিউশনির ব্যবস্থা করে দিতে হয় নি কখনো। বোনের জন্য

প্রয়োজনীয় সাজেশন, নোটস্, তারা নিজেরা কালেক্ট করে এনে দিতো।

কার থেকে আনত এই প্রশ্ন করার সাহস হয় নি শখের। সে শুধু মন দিয়ে পড়ত। তাকে পড়ানোর মূল শর্ত ছিল ভালো রেজাল্ট। কিভাবে করবে কী সে জানে। শুদ্ধ, সায়ন দু'জনই মাসে দু'টো করে পরীক্ষা নিতো। কোশ্চেন করত জটিল করে। এতটা জটিল যে মাঝে মাঝে কোশ্চেন দেখে শখের ঘাম ছুটে যেত। ভুলেও যেত এটা কোনো বোর্ড পরীক্ষা নাকি অন্যকিছু। তবে পরীক্ষায় ভালো করলে যখন দু'ভাই

তার আবদার পূরণ করত খুব খুশি হতো। মনে হতো কষ্ট সার্থক! এমন কষ্ট করতে ইচ্ছুক সে। পরীক্ষায় ভালো ফল করে সায়নের কাছে তার প্রথম আবদার ছিল, ‘ভাইয়া, আমি ফানুস উড়াতে চাই। এত ফানুস উড়াতে চাই যেন আকাশটা পুরো ফানুস ফানুস দেখায়।’

সপ্তাহ খানিক পর তার আবদার পূরণ করেছিল সায়ন। সে অনেকগুলো ফানুস এনে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে হইহই করে ফানুস উড়িয়েছিল। কি যে চমৎকার ছিল সেই মুহূর্তটুকু। রাতের বেলা ছাদে গিয়ে আকাশের দিকে তাকালেই সেদিনের কথা পড়ে যায় তার। সায়ন এই বাড়িতে বড় ছেলে হলেও বাড়িতে সবার সঙ্গে হাসি মুখে কথা বলে। মজা করে। বোনদের পেছনে লাগে। হাতভর্তি জিনিস এনে দেয়। ছোটো খোটো আবদার পূরণ করে। তবে তার থেকে শুদ্ধ একটু ব্যক্তিক্রম। সহজে হাসতে দেখা যায় না তাকে। হাসলেও মুচকি হাসি অবধি সীমাবদ্ধ। এই স্বভাব পেয়ে তার বাবার শারায়াত চৌধুরী থেকে। শারায়াত চৌধুরী যুবককালের কার্বন কপি যেন শুদ্ধ। কথায় কাজে একই রকম ত্যাগ স্বভাবের। যা পছন্দ

নয় কখনো করবে না। তাকে দিয়ে সেকাজ কেউ
করাতে পারবে না। আবার যা পছন্দ তার থেকে
কেড়ে নিতে পারবে না। যেটা তার শুধু তারই। যেটা
করবে বলে ঠিক করবে, সেই করবেই। তাকে
আঁটকানো মুশকিল প্রায়ই। স্বাভাবিক কথা বলার
সময়ও তার দৃষ্টি দেখে আচমকা বুকটা ধক করে
ওঠে। মনে হয় এই বুঝি মনের গোপন কথা পড়ে
ফেলল। সায়নের সঙ্গে সব ভাইবোনের সম্পর্ক
খুনশুঁটিপূর্ণ হলেও শুদ্ধর সঙ্গে বনিবনা পড়ে না
কারো। শারায়াত আর শুদ্ধ বাড়ির এই দুই পুরুষ
একটু আলাদায় বলা

চলে। নিজের আপন ভাই হলেও শখ তাকেও একটু
ভয় পায়। পরীক্ষায় ভালো ফল করে সে ভয়ে ভয়ে
শুদ্ধর কাছে আবদার করেছিল, ‘ ভাইয়া তোমার
কাছে আমি কিছু চাই। ‘

খাতাতে ম্যাথ করতে করতে শুদ্ধ চোখ তুলে বোনের
দিকে তাকালে শখ

থতমত খায়। কথা ভুলে যায়। কথার খেঁ হারিয়ে সে
ভুলে যায় কি বলতে

চেয়েছিল। বোন ভয় পাচ্ছে দেখে শুদ্ধ নরম সুরে
জিজ্ঞাসা করেছিল,

-‘কি চাস বল?’

-‘রিসার্চার শোয়াইব চৌধুরী শুদ্ধ’র বোন হিসেবে
সবার কাছে এক্সট্রা সম্মান পেতে চাই। তোমাকে
সফল রিসার্চার হিসেবে দেখতে চাই আমি।’ একথা
শুনে শুদ্ধ জবাব দেয় নি। হাসেও নি। শুধু বোনের
দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিল।
রিসার্চার হওয়ার তারও স্বপ্ন ছিল কিন্তু শারায়াত
চৌধুরী চাইতেন সে মেরিনার হোক। বড় বড় শিপে
শিপে ঘুরে বেড়াক দেশ হতে দেশান্তর। যখন
বোনকেও সাপোর্ট পেতে দেখল সেও

সিদ্ধান্তে অটল রইল। এরপরেই পড়াশোনার তাগিদে
চলে গেল ঢাকায়। সায়নের ব্যস্ততা বেড়ে গেল। দুই
ভাইয়ের কাউকেই না পেয়ে শখ টিউশন টিচারের
ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য বাবাকে জানাল। শারায়াত
চৌধুরী নিজে মেয়ের জন্য হোম টিউটর ঠিক করে
দিয়েছিলেন। শখ অনেকদিন

উনার কাছে পড়ত। এরিমধ্যেই আনাগোনায়ে শোনা
গেল সায়ন মিছিলে যায়। রাজনীতি করা ছেলেপুলের

সঙ্গে ঘুরে। ভাসিটিতে যার তার সঙ্গে হাতাহাতি করে। এভাবে প্রায় দিনই তার নামে অভিযোগ আসতে লাগল।

শারফাত চৌধুরী খোঁজ নিয়ে জানলেন সত্যিই ছেলে রাজনৈতির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। মেরে ধরেও তাকে রাজনীতি ছাড়ানো গেল না। বরং তার মধ্যে অদম্য জেদের সৃষ্টি হলো। ঝুঁকে পড়ল রাজনীতিতে। এভাবেই দিন

যেতে যেতে ক্ষমতার জোরে পেয়েছে দলনেতার পদ। কিন্তু তার হঠাৎই

পাওয়া ক্ষমতার ব্যাপারে একটা ঘাপলা রয়েছে। আর এ খাপলাটা ঠিক সর্বের মধ্যে ভূত থাকার মতোই রহস্যময়। আগামীকাল শারফাত চৌধুরীর মা শেফালি চৌধুরীর প্রয়াতবার্ষিকী।

সেই উপলক্ষে শারফাত চৌধুরীর নিমন্ত্রণে নিকট আত্মীয়দের উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে চৌধুরী নিবাসে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে যার যার মতো ঘুরে ফিরে সময় পার করছে আত্মীয়মহল। কেউ কাজে হাত লাগিয়েছেন কেউ'বা সমালোচনায় ব্যস্ত। শতরূপা চৌধুরী এখনো আসে নি। তবে জানিয়েছে কালকে সময় মতো চলে

আসবে। জটিল একটা কেসের দায়িত্ব উনার ঘাড়ে
তাই আজ সময় করে উঠতে পারেন নি। খাওয়া-
দাওয়ার অনুষ্ঠান যেহেতু কাল ;কালকে অবশ্যই
আসবেন। নিমন্ত্রিত মানুষদের আপ্যায়নে ত্রুটি না
রাখতে চৌধুরী তিনকর্তা একেকজন একেক দায়িত্ব
নিয়েছেন।

এবং কাজ ভাগ করে উনারা সেসব কাজে ব্যস্ত।
চৌধুরী নিবাসের বাগান এরিয়ায় প্যাভেল তৈরির
কাজ চলছে। সারি সারি চেয়ার পেতে সেখানে
বসানো হবে আমন্ত্রণিত মেহমানদের। রান্নার
আয়োজন প্যাভেল থেকে একটুদূরে। আত্মীয়-স্বজন,
পাড়া-প্রতিবেশী, চেনাজানা মানুষসহ দুটো এতিম
খানায় খাবার পাঠানো হবে। সব মিলিয়ে হাজার
তিনেক মানুষের খাবারের আয়োজন করা হয়েছে।
তবে এবারই প্রথম তা নয়। প্রতিবছর

এই দিনটিতে এভাবেই এত এত মানুষ খাওয়ান
শারায়ত চৌধুরী। এবং

দোয়া চেয়ে নেন মৃত বাবা ও মায়ের জন্য। ঘড়িতে
সময় সকাল সাড়ে দশটা। শুদ্ধ আর সাওয়ান চৌধুরী
বাজার সাদাইয়ের কাজ সেরে কেবল বাসায় ফিরেছে।

প্রচন্ড গরমে জান যায় যায় অবস্থা। পরণের টি-শার্ট
ভিজে জবজব করছে। আজ সকাল থেকে সূর্যটা যেন
মাত্রারিক্ত ক্ষেপে আছে। রাগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে
গরমের তীব্রতা দুর্ভোগ হিসেবে উগড়ে দিচ্ছে
জনজীবনে। এদিকে এত মেহমান।

এত গল্পকথা, হাসাহাসির শব্দে মেজাজটা যেন
আপনাআপনিই চিরচির করে বেড়ে যাচ্ছে। অসহ্য
লাগছে সবকিছু। গতরাতে ঠিকঠাক ঘুম পুরো না
হওয়ার কারণে মাথা ভার হয়ে আছে। চোখ লাল হয়ে
আপনাআপনি বুজে আসছে। তবুও নির্বিকার হয়ে
মেজো চাচ্চুর সঙ্গে বাজারের কাজ সারল শুদ্ধ।
ডেকোরটরের লোকদের কাজ বুঝিয়ে দিলো। লিস্ট
দেখে যেগুলো মিস গেছে সেগুলোর নতুন করে লিস্ট
করল। আবার বাজারে গিয়ে সেগুলো এনে বাবুর্চিকে
হাতে ধরে বুঝিয়েও দিতে হবে। ড্রয়িংরুমে অনেক
মানুষের উপস্থিতি দেখে সাওয়ান চৌধুরী নিজেও
ফ্রেশ হওয়ার জন্য সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে শুদ্ধকে
বললেন,-‘যা ফ্রেশ হয়ে রেস্ট নে। একটুপরে আবার
যেতে হবে।’

-‘হুম।’

একথা বলে সাফওয়ান চৌধুরী চলে গেলে অগত্যা
শুদ্ধও উঠে দাঁড়াল। উঁকিঝুঁকি মেরে মা কিংবা
বোনদের কাউকে দেখতে পেল না। এত गरমে
বাইরে থেকে এলো কেউ যে একগ্লাস পানি দেবে
তাও কারো হুঁশে নেই।

রান্নাঘরের সামনে আত্মীয়দের জটলা দেখে নিজেও
আর সেদিকে গেল না। ক্লান্ত শরীরে সিঁড়ি বেয়ে
উঠার সময় দেখা হলো স্বর্ণের সঙ্গে। স্বর্ণকে দেখে
বিরক্ত স্বরে বলল,

-‘সবগুলো একসাথে কোথায় হারাস তোরা? কাজের
সময় একটাকেও পাওয়া যায় না।’

-‘সায়ন ভাইয়াকে মেডিসিন দিতে গিয়েছিলাম।’

-‘মা কোথায়, দেখেছিস?’

-‘বড় মা রান্নাঘরে আছে বোধহয়।’

-‘মাকে গিয়ে বল আমার খাবারটা উপরে পাঠিয়ে
দিতে।’

-‘ঠিক আছে।’ একথা বলে শুদ্ধ পাশ কাটিয়ে রুমের
চলে গেল। তাকে যেতে দেখে স্বর্ণ

ওড়নার আড়ালে থাকা ফোনটা শক্ত করে ধরে শ্বাস
ছাড়ল। ভাগ্যিস ধরা পড়ে নি নয়তো শীতলের

ফোনটার মতো তার ফোনটাও অকালে অক্লা পেতো। সে আশেপাশে তাকিয়ে ফোন কানে ধরে পরে কথা বলবে বলে কল কেটে আগে ছুটল রান্নাঘরে। শুদ্ধ ভাইয়ের আদেশ মানে সঙ্গে সঙ্গে করা প্রয়োজন। নয়তো বাঁশ কখন কোনদিকে আসবে তা বলা মুশকিল।

বাড়ির গৃহিণীরা রান্নাঘরে বসে গল্পে গল্পে অনুষ্ঠানের জন্য আনা বাজার সাদাই গুছিয়ে রাখছেন। এখানে শীতল, শখও আছে। শখ মায়ের হাতে হাতে কাজ গুছিয়ে দিলেও শীতল বসে বসে কিসমিস চিবাচ্ছে। তার মন মেজাজ খুব খারাপ। এতটা খারাপ কেউ কিছু বললেই খেঁকিয়ে উঠছে।

তর্ক করছে। ঝগড়াও হয়েছে দু'জনের সঙ্গে। তারপর সকাল থেকে গাট হয়ে রান্নাঘরে বসে আছে। এখান থেকে সরে নি কারো সঙ্গে কথাও বলে

নি। কারণ কড়াভাবে আদেশ জারি করা হয়েছে তাকে যেন স্মার্ট ফোন কিনে দেওয়া না হয়। যে দিবে আগে তার বিচার হবে তারপর শীতলের। এই সিদ্ধান্তের পরপরই বিশেষ বিবেচনায় মত পরিবর্তন'ও করা হয়েছে।

মেয়ে কলেজে পড়ে, বাইরে যাবে, কখন কী প্রয়োজন হয় বলা যায় তাই

বিশেষ বিবেচনায় তাকে বাটন ফোন দেওয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শুধু বাইরে গেলে যোগাযোগের জন্য। এছাড়া জরুরি প্রয়োজন হলে বাসার কারো থেকে ফোন নিতে পারবে তবে সেটা কিছুক্ষণ জন্য, সময় নির্ধারণ করে।

আর এই আদেশ জারি করেছে তার বাবা শাহাদত চৌধুরী। বাবার কথা শোনার পর থেকে তার মন মেজাজ ভালো নেই। রিকুয়েস্ট করেও লাভ হয়। ইশ ! সবে টিকটক করা শুরু করেছিল। দিন দিন একটু একটু করে লাইক ও কমেন্টের সংখ্যা বাড়ছিল, বাড়ছিল তার ফ্যান ফলোয়ার। আর এখনই ফোন হারাতে হলো। ওহ থুরি, তার ফোন তো হারায় নি আছড়ে ভেঙে ফেলা হয়েছে। তাও আবার কে ভেঙেছে? এই বাড়ির শুদ্ধ পুরুষ। থুরি, এখানেও একটু ভুল হলো শুদ্ধ পুরুষ নয় তাকে বলা উচিত দূষিত পুরুষ। কারণ এই একমাত্র পুরুষ তার জীবনের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়।

মার্জির দাম দেয় না। উল্টে তার আদেশ জোরপূর্বক
চাপিয়ে দেয় কিছু বলাও যায় না। বললে চালাকাঠের
বারি। প্রচলিত এক কথায় আছে না, ছোটো মরিচের
ঝাল বেশি। তাদের এ বাড়িতে প্রবাদটি একেবারে
খাপে খাপ মিলে গেছে। নয়তো সায়েন তুখোড়
রাজনীতিবিদ। একজন নেতাও। বাইরে মারামারি
কাটাকাটি করলেও বাড়িতে যেন শান্ত জল। কই
কারো সঙ্গে রুড বিহেভ করে না। রাগ দেখায় না।
যখন তখন মারে না। ধমকায় না। অথচ মহামান্য
শুদ্ধ পুরুষ রিসার্চার হয়ে সবার মাথা কিনে নিয়েছে।
সে যা বলবে সেটাই সঠিক। সেটাই সমীচীন। বাকিরা
সব ভুল, জবরজং। মারামারি, ধমকাধামকি,
কোনোকিছুই সে বাদ রাখে না। গতবার বাসায় এসে
চটাস করে বলে বসল বাড়ির কোনো মেয়ে/বউ
হিজাব ছাড়া বের হতে পারবে না, পর্দা না করলেও
মার্জিত পোশাকে চলতে হবে। যদি সে ভুলেও দেখে
তার কথার হেরফের হয়েছে তাহলে খবর আছে।
ব্যস হয়ে গেল, এরপরদিন বড়মা সবার হাতে হিজাব
ধরিয়ে দিলো। এখন হিজাব ছাড়া বাইরে যায় না
কেউ। গরমে চুলের গোড়ায় ঘাম জমে চুলে ভিজে

যায় তাও হিজাব ছাড়া বের হওয়ার জো নেই।
এখানেই শেষ নয় আরো অনেক নিষেধাজ্ঞা আছে
তাদের সবার জন্য। আর এসবে সে বিরক্ত নয়,
মহাবিরক্ত। মাঝে মাঝে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে
করছে, ‘এসব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেন শুদ্ধ ভাই, খুব
প্রয়োজনে বিয়ে করে বউকে এসব প্যারা দেন।’ কিন্তু
মাইরের ভয়ে বলা হয়ে ওঠে না। বললে চাপার দাঁত
একটাও আস্ত থাকবে না তা বলার অপেক্ষা রাখে না।
হঠাৎ কাঁধে ঝাঁকুনি খেয়ে শীতল ভাবনার জগৎ থেকে
বেরিয়ে এলো। খেয়াল করল রান্নাঘরে শুধু বড় মা
ছাড়া কেউ নেই। আচমকা বাকিরা কোথায় গেল
জানতে চাইলে বড় মা জানাল, প্যাণ্ডেল করার জন্য
একটা ছেলে মই নিয়ে উপরে উঠতে গিয়ে বেখেয়ালে
মাটিতে পড়ে গেছে। তাকে দেখতে বাকিরা বাগানে
ছুটেছে।

একথা শুনে সেও যাওয়ার জন্য পা বাড়ালে সিঁতারা
চৌধুরী তাকে ধরে থামিয়ে দিলেন। তারপর তার
হাতে খাবারের ট্রে ধরিয়ে দিয়ে বললেন,-‘খাবারটা
শুদ্ধর রুমে দিয়ে আয় তো মা। আমি গিয়ে দেখি
ছেলেটার কি অবস্থা।’

একথা বলে উনি অ্যান্টিসেপটিক ক্রিমটা হাতে নিয়ে
নিজেও দ্রুতপায়ে রান্নাঘর ছাড়লেন। শীতল বিরক্ত
হয়ে রাগে গজগজ করতে করতে গেল খাবার পৌঁছে
দিতে। গতদিন যার মার খেলো। তাকে এখন খাবার
দিতে যেতে হচ্ছে। এটাই হচ্ছে তার নিয়তি। সে
শুদ্ধের রুমে নক করে সায়নের রুমে উঁকি মারতে
ভুলল না। সায়ন বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। কড়া মেডিসিনের
প্রভাবে দু’দিন ধরে পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে সায়ন।
ফোনটা কাছে নেই বিধায় ঘুমাতে পারছে না। নয়তো
মিনিটে মিনিট ফোন এসে কান ঝালাপালা করে দেয়।
সেদিন সায়নের ব্যান্ডেজ দেখে শাহাদত চৌধুরী
ভেবেছিলেন অল্প স্বল্প আঘাত। কিন্তু আদৌও তা নয়!
পরদিন ডাক্তার যখন ক্ষতস্থান ড্রেসিং করিয়ে তার
ব্যান্ডেজ চেঞ্জ করায় তখন সেটা দেখে আঁতকে ওঠে
অনেকেই। সিঁতার চৌধুরী ডুকরে কেঁদে ওঠে। এসব
ছাড়ার জন্য আবার বোঝায়। মায়ের কান্না দেখে
সায়ন নিশ্চুপ থাকে। তবে আনমনে খুঁজতে থাকে
তার রাগী বাবাকে। অথচ যাকে খুঁজে দুদিন পেরিয়ে
গেলেও উনি আসে না। জিজ্ঞাসা করে না তার
শরীরের হালহকিকত। আর না ছেলের কথা কারো

থেকে জানতে চেয়েছেন। কেউ বলতে গেলে হাতের
ইশারায় থামিয়ে দিয়েছেন। এমন না ছেলেটা মহৎ
কাজ করতে গিয়ে আহত হয়ে ফিরে এসেছে। সে
রাজনীতি করে, মস্ত বড় রাজনীবিদ। সে থাকুক তার
মতো। একথা বলে শারাবাত চৌধুরী একবারও
এদিকে পা মাড়ান নি। তবে শুদ্ধর থেকে সায়ন ভাই
যে শতগুনে ভালো একথা কেউ বোঝে না কেন?
বুঝলে সায়ন ভাইকে নয় বরং খাটাশ শুদ্ধকে
বকাঝকা শোনাত। হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ পেয়ে
শীতল ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখে শুদ্ধ ভ্রুঁজোড়া
কুঁচকে তাকিয়ে আছে। সদ্য শাওয়ার নিয়েছে। পরনে
আকাশি

টি-শার্ট ও কালো টাউজার। সে সায়নের রুমের
দরজা থেকে সরে এসে শুদ্ধর মুখোমুখি দাঁড়াল।
তারপর অন্যদিকে তাকিয়ে বলল,
-‘খাবার। বড় মা পাঠাল।’

থমথমে হয়ে আছে শীতলের মুখ। বিরক্তও বটে। এ
লোকটাকে তার সহ্য হয় না। চাচাতো ভাই হয়েছে
তাতে কি? তার অতিরিক্ত শাষণের জন্য সে তার

চক্ষুশূল। তার মুখভঙ্গি পড়ে শুদ্ধও খিটখিটে মেজাজে
বলল,

-‘কোনো অসহায় মানুষকেও তো কেউ এভাবে খাবার
দেয় না। মিনিমাম ম্যানাসটুকুও কি গিলে খেয়েছিস?’

একথা বলে শীতলের বাড়িয়ে দেওয়া ট্রেটা শুদ্ধ
হাতে ধরল না দরজা থেকে সরে দাঁড়াল। শীতল মনে
মনে তাকে গালি দিতে দিতে রুমে গিয়ে সেন্টার
টেবিলে আঁস্টে করে ট্রেটা রাখল। সেটা রাখতে গিয়ে
চোখ গেল তার ভাঙাচোরা ফোনের দিকে। ফোনটার
দিকে হাত বাড়াতে গেলে শুদ্ধ

বাহু ধরে বিছানার দিকে এক ধাক্কা মেরে বসিয়ে
দিলো। শীতল তিরিঙ্কি মেজাজে কিছু বলার আগে
শুদ্ধ চোয়াল শক্ত করে বলল,-‘শুনলাম আমাকে নাকি
গালাগাল দিয়েছিস তুই? অভিযোগ করেছিস আমি
তোকে শুধু শুধু মারি। চাচাতো বোন বলে তোর
ভালো সহ্য করতে পারি না আমি।’

-‘হ্যাঁ বলেছি। এখনও বলছি, তুমি আমাকে শুধু শুধু
মারো। ছোটো বোন প্রেম করলে অন্য ভাইরা বুঝিয়ে
বলে আর তুমি আমাকে বোঝানো দূর ডাকাতির
মতো চ্যালাকাঠ দিয়ে মেরেছো।’

-‘এত অভিযোগ?’

-‘কেন করব না অভিযোগ? এত জোরে কেউ মারে?’

-‘বেশ করেছে। আর করবি টিকটক?’

-‘করব তো। আবার করব।’

-‘মুখে তর্ক করছিস, মারের ব্যথা কমে গেছে তাই না? আরেক ঘা খাবি?’

শীতল রাগে গজগজ করে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।
অভিমানে তার মন মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠেছে।
আর কিছুক্ষণ থাকলে উল্টা-পাল্টা বলে বসতে পারে।
তাই সে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই শুদ্ধ তার পথ
আগলে দাঁড়াল। তারপর নিজেকে সামলে জোরে
জোরে শ্বাস ছেড়ে লেপটপটা এগিয়ে দিয়ে হিসহিসিয়ে
বলল,-‘কমেন্ট বক্স দেখ।’

শীতল লেপটপ কোলে নিয়ে দু’পা তুলে বিছানার
এককোণে বসল। শুদ্ধ

কথা না বাড়িয়ে খেতে বসল। কিছু খেয়ে মেডিসিন
খাওয়া জরুরি তার।

শীতল গালে হাত দিয়ে কমেন্ট বক্স চেক করতে
করতে হাসছে। ফ্যানরা তার টিকটক পছন্দ করেছে।
প্রশংসা করেছে। আরো বেশি করে টিকটক

করার জন্য উৎসাহ দিচ্ছে। এরা কত ভালো চায় তার। সে মহাআনন্দে

ঝুমঝুম করে মন দিয়ে কमेंটগুলো চেক করতে হঠাৎ আগুলের খোঁচা লাগল তার গালে। ব্যথায় কঁকিয়ে উঠল সে। ব্যথাতুর শব্দ শুনে শুদ্ধ ভ্রুঁ কুঁচকে তাকাতেই খেয়াল করল শীতলের বাম গাল দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে।

ক’দিন যাবৎ শীতলের কপালে, দু’গালে, খুতনীতে দু’চারটা ব্রণ উঠেছে। ফর্সা গালে লাল হয়ে আছে এক একটি ব্রণ। কিশোরী থেকে সদ্যযৌবনে পা দিলে এসব খুবই ন্যাচারাল। তাছাড়া ব্রণ নানান কারণে হতে পারে শুধু যে, সদ্য যৌবনা তা নয়। এমনও হতে পারে আজকাল সে পানি কম খাচ্ছে অথবা ঠিকমতো ঘুমাচ্ছে না। হতেও পারে পূর্বের চেয়ে তার স্কিণে ওয়েলি ভাবটা বেড়েছে। এসব নিয়ে কিছু বলার প্রয়োজনবোধ করল না শুদ্ধ। শীতল ওড়না দিয়ে সদ্য গলে যাওয়া ব্রণের রক্ত মুছে পুনরায় সে কमेंট চেক করতে গিয়ে তার চোখ আটকাল একজনের কमेंটে ‘সদ্য যৌবনে পা দেওয়া

আবেদনময়ী প্রেমিকা আমার। খুব ভালোবাসি জান।
তোমার এই যৌবনসুধা পান করার অপেক্ষায়।’

এ কमेंট করেছে তার ক’দিনের জন্য বানানো
প্রেমিক ফারাবি। এটাই

সেই প্রেমিক যাকে সায়েন ড্যান্ডিখোর বলেছিল।
ফারাবির কमेंট দেখে শীতল রাগে কিড়মিড় করে
তাকিয়ে রইল কमेंটটার দিকে। ফারাবি কী করে
পারল এসব নোংরা কথা বলতে? তার বুদ্ধিতেই তো
টিকটক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। পরিচিতি লাভ এবং
উপার্জনের উৎস হিসেবে বেছে নিয়েছিল টিকটক।
অথচ পাবলিক প্লেসে এভাবে ছোটো করতে পারল?
ফারাবির কमेंটের পর ঘন্টা খানিক আগে করা
আরেকজনের কमेंটে নজর আঁটকাল তার, ‘ব্রুণ
দেখে মনে হচ্ছে যৌবন জ্বালায় রাত বিরেতে ঘুমাতে
পারে না।’ গতরাতে করা তৃতীয় কमेंট,’ হেই সেক্সি
রসের আলাপ সারতে ইনবক্স প্লিজ।’

আরেকটি কमेंট দেখে শীতলের কথা হারিয়ে গেল।
হাসি মিলিয়ে গেল।

চোখ দিয়ে ঝরতে লাগল কয়েক ফোঁটা অশ্রুজল। সে ঝাপসা দু'চোখে এই কমেন্টটাও পড়ল, 'সায়ন, শুদ্ধ বোনদের পালতে পারছে না বোধহয়

এজন্য রাস্তায় নামিয়েছে। চৌধুরী বাবুরা দেখি বাড়ির মেয়েদেরকে দিয়ে ব্যবসা চালু করেছে। চালিয়ে যাও, ভালো হচ্ছে, পরের ভিডিওতে রেটটা জানিও।'

এই কমেন্টে আরেকজন রিপ্লাই করেছে, 'ভাই, রেট জানলে আমাকেও জানায়েন। আমরা না গেলে চৌধুরীদের ব্যবসা লাটে উঠবে তো।'

আরেকজনের কমেন্ট, 'আর দুই বোনকেও রাস্তা নামা সায়ন। একটাকে আর কতজন মিলে খাব? ভাগে কম পাব তো ইয়ার।' এমন বাজে বাজে কমেন্টে ভরা তার কমেন্টবক্স। এসব দেখে শীতলের কথা হারিয়ে গেল। মাথা নিচু করে বসে রইল সে। নোংরা কথায় গা রি রি করে উঠল। ছোটো থেকে কেউ তাকে নোংরা কথা বলে নি। বরং চৌধুরী নিবাসের মেয়ের বলে সব জায়গায় যথেষ্ট স্নেহ ও ভালোবাসা পেয়েছে।

শুদ্ধ খেতে বসেছে ঠিকই কিন্তু এক লোকমা খাবারও গলা দিয়ে নামে নি তার। সে খাবার থেকে হাত উঠিয়ে ধারালো দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ভীত হরিণীর

ন্যায় বসে থাকা শীতলের দিকে। শীতলের সাহস
নেই চোখ তুলে তাকানোর। তবুও বুঝতে পারছে
কেউ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে পরখ করছে।

তখন শুদ্ধ দাঁতে দাঁত চেপে বলল,-‘ এতদিন কেউ
চৌধুরী নিবাসের মেয়েদের দিকে চোখ তুলে
তাকানোর

সাহস করে নি, নোং’রা কথা বলা তো বহুদূর। তোর
বোকামিতে চৌধুরী নিবাসের প্রতিটা সদস্যের দিকে
আঙুল তোলা হচ্ছে। শিক্ষা নিয়ে কথা উঠছে। কमेंট
গুলো দারুণ না? শান্তি পেলি এবার? মনপ্রাণ
জুড়িয়েছে নিশ্চয়ই? আর কী বললি যেন আমি তোকে
সহ্য করতে পারি না। তোর ভালো দেখতে পারি না।
চাচাতো বোন তাই বাজে ব্যবহার করি। মারি।
ধমকায়। ওকে ফাইন, এতদিন যা করি নি আজকে
থেকে সেটাই করব। এই মুহূর্ত থেকে সত্যি সত্যিই
চাচাতো বোন হিসেবে ট্রিট করব। যা রুমে
যা।’শীতল বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে
নীরবে অশ্রু ঝরাচ্ছে। খারাপ লাগছে। কষ্ট হচ্ছে।
আগে যদি জানত এমন হবে তাহলে কি আর এসবে

জড়াত। ক্ষুণাক্ষরেও আন্দাজ করে নি তাদের পাড়ার
হেলেপেলে

তাকে ফলো করে। এমনকি সায়নের প্রতিপক্ষরাও এ
ব্যাপারটাকে তিল থেকে তাল করবে। জনে জনে
এসে তাকে টার্গেট করে চৌধুরী বাড়ির মেয়েদের
চরিত্র নিয়ে আঙুল তুলবে। শুধু তার জন্য শখ,
স্বর্ণকেও বাজে কথা শুনতে হলো। বাবা, চাচা ও
ভাইয়ের কষ্ট পেতে হলো। তাদের শিক্ষা নিয়ে প্রশ্ন
উঠল। বাবা তাহলে কমেণ্টগুলো দেখেই এত
ক্ষেপেছে। নতুবা উনি তো কখনো এত কঠিন ব্যবহার
করে না। সব দোষ তার,তার কারণে

এতকিছু। এসব ভেবে শীতল ফোঁপাতে ফোপাতে
কিছু বলার আগে শুদ্ধ কাঁচের গ্লাসটা মেজেতে ছুঁড়ে
মেরে চিৎকার করে বলল,' যেতে বলেছি। দূর হ
চোখের সামনে থেকে।'-'এই যে মিস, শাহরিয়ার ভাই
কি বাসায় আছে?'

হঠাৎ পেছন থেকে কারো কথা শুনে ঘুরে তাকাল
শখ। লম্বা-চওড়া, শ্যাম বর্ণের এক যুবক হাসি মুখে
তাকিয়ে আছে তার দিকে। শাহরিয়ার ভাই বলায়
বুঝল কথাটা তাকেই জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। কারণ

সায়নের নাম শাহরিয়ার। তবে এই ছেলেকে চেনে না সে। কখনো দেখেছে বলেও মনে হচ্ছে না। হবে হয়তো পার্টি লোক। কোনো প্রয়োজনে সায়নকে বাড়িতে খুঁজতে এসেছে। লোকটা জবাবের আশায় মুখের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে সে ছোট করে জবাব দিলো,-‘জি, ভাইয়া বাসাতেই আছে।’

-‘ডেকে দেওয়া যাবে? কথা ছিল, বলবেন মন্টি এসেছে।’

নামটা শুনে কেন জানি শখের হাসি পেল। মস্তিষ্কে ধাক্কা দিলো মাউন্টেন ডিও। মাউন্টেন থেকে মন্টি। এত সুদর্শন ছেলের সঙ্গে নামটা বড্ড বেশি বেমানান লাগল। কারো নাম নিয়ে কটু কথা বলা ঠিক না। এগুলো বাজে অভ্যাস। তাই সে মনকে ধমকে সম্মতি সূচক মাথা নাড়িয়ে ভেতরে চলে গেল। এদিকে ক্লাসের সময় হয়ে যাচ্ছে। প্রথম ক্লাসটা ধরতে পারবে কি না কে জানে। সে দ্রুত পায়ে দো’তলায় উঠে সায়নের রুমের দরজা নক করল,

-‘ভাইয়া! ভাইয়া শুনতে পাচ্ছে? এই ভাইয়া! তোমার সঙ্গে মন্টি নামের একজন দেখা করতে এসেছে।’ঘুমে কাতর সায়নের কোনো হুঁশ নেই। কড়া মেডিসিনের

প্রভাবে গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে। এদিকে শখ একনাগাড়ে নক করেই যাচ্ছে। এজন্যই সায়নকে ডাকতে আসতে চায় না। ডেকে ডেকে গলা শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যায় তবুও সায়নের কানে ডাক পৌঁছায় না। শুদ্ধর ঘুম খুব পাতলা। একবারের বেশি দু'বার ডাকলেই উঠে যায়। আর সায়ন মহিষ টাইপের, ঘুমালে দিন দুনিয়া ভুলে যায়। সকালবেলা হুট করে কারো রুমে প্রবেশ করাও উচিত না তাই আবার ডাকল। বেশ কয়েকবার ডাকার পর সায়ন ঘুম ঘুম চোখে ভেজানো দরজার দিকে একবারতাকিয়ে ভেতরে ঢোকান অনুমতি দিলো। শখ রুমে ঢুকতে ঢুকতে হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে বলল,-‘ভাইয়া, তুমি নিচে যাবে? নাকি উনাকে উপরে আসতে বলব?’

-‘কার কথা বলছিস?’

-‘মন্টি নামের একজন তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। বাগানে দাঁড়িয়ে আছে।’

-‘মন্টি কে? চিনলাম না তো।’

-‘আমিও চিনি না। কখনো দেখিও নি। হবে হয়তো তোমার পার্টির লোক। তুমি বললে উপরে পাঠাব।’

-‘আচ্ছা পাঠিয়ে দে। তা কোথাও বের হচ্ছিস নাকি তুই?’

-‘হুম। ক্লাস আছে আমার।’

-‘ফিরবি কখন?’

-‘ক্লাস শেষ করে ল্যাবে যাব। দেরি হতে পারে।’

-‘শীতল, স্বর্ণের ক্লাস নেই? যাবে না ওরা?’

-‘যাবে, রেডি হচ্ছে। আমি আসি ভাইয়া খুব লেট করে ফেলেছি আজ।’

-‘আচ্ছা যা।’

শখ ব্যস্ত পায়ে যাওয়ার জন্য ঘুরতেই সাইন তাকে পুনরায় ডেকে উঠল,

-‘এই শুন, টাকা নিয়ে যা। বাইরে কখন কী দরকার হয় বলা যায় না।’ একথা বলে সাইন এক হাজার টাকার নোট এগিয়ে দিলো। সে ভাইয়ের থেকে টাকা নিয়ে মিষ্টি করে হেসে বেরিয়ে গেল। বের হতে হতে শীতল, স্বর্ণও রেডি হয়ে রুম থেকে বের হলো। তিনবোন একসঙ্গে যাবে। ভিন্ন সময় ক্লাস থাকলেও আজ যাচ্ছে একসঙ্গে। শীতল শখের হাতে কলেজ ব্যাগ ধরিয়ে দিয়ে বুকের ভি-বেল্ট ঠিক করতে করতে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নামল। গলা ফাটিয়ে আম্মু! আম্মু!

করে ডাকতে ডাকতে রান্নাঘরে এসে পৌঁছাল। মায়ের কাছে ঘ্যানঘ্যান করে ফুচকা খাওয়ার টাকা হাতিয়ে বড় মাকে বলল,- ‘ওহ বড় মা, আর বিশ টাকা খুচরো থাকলে দাও না।’

কচকচে একশত টাকার নোট দেওয়া পরেও মায়ের কথা শুনে সীমিন চৌধুরী কিছু বলার আগেই সিতারা থামিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ আগে ডিম

এনে ভাংতি টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে তার হাতে ধরিয়ে তাড়া দিয়ে বললেন,

-‘ধর, ধর, শখ’রা চলে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি যা, এই তোরা সাবধানে যাস কিন্তু।’

-‘আচ্ছা!’

মায়ের বকুনি থেকে বাঁচতে শীতলও টাকা নিয়ে ছুটল শখের পিছু পিছু।

দৌড়ে এসে ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল তিনজন। স্বর্ণ বিরক্ত মুখে শীতলের দিকে একবার দেখে দ্রুত পা চালানোর তাগাদা দিলো।

তাড়াহুড়োর সময় রিকশাও পাওয়া যায় না আজ পাবে নাকি কে জানে।

একদিকে লেট করলে সবদিকেই এমন হয়। মন্টি নামের ছেলেটা তখনো দাঁড়িয়ে ছিল বাগানের দিকটায়। সম্ভবত ফোন কথা বলছিল। তাদেরকে দেখে কান থেকে ফোন সরিয়ে ঘুরে তাকাল। শখ একনজর তাকিয়ে দৃষ্টি সরিয়ে পা বাড়াতেই পেছন থেকে শুনতে পেল সিঁতারা চৌধুরী মন্টির উদ্দেশ্যে বললেন,

-‘এসো বাবা, ভেতরে এসো, সায়ন তোমাকে রুমে ডাকছে।’ উনার কথা শুনে মন্টি সিঁতারা চৌধুরী পেছন পেছন বাড়ির দিকে পা বাড়ালেও তার নজর ছিল চৌধুরী বাড়ির মেয়েদের দিকে। তিনটে পুতুল যেন চোখের সামনে। ছোটো টা কি একটু বেশিই সুন্দরী নাকি? নাম কি তার? কোন ক্লাসে পড়ে? স্কুলের গন্ডি পেরিয়েছে তো? চৌধুরী নিবাসের মেয়েরা দেখতে এত সুন্দরী জানত না সে। এজন্যই কি তার বাবা তাকে বলেছিল, ‘যাচ্ছে যাও। তবে চৌধুরীদের মেয়েদের দিকে নজর দিও না।

মেয়েগুলো ভালো হলেও ভাই দুটো ডেঞ্জারাস। একবার যদি দেখে তুমি বোনদের দিকে তাকিয়েছো চিলের মতো উড়ে এসে কখন দু’চোখ তুলে নিয়ে

যাবে আফসোস করারও সময় পাবে না।’-‘তাই নাকি? এত সাহস তাদের?’

-‘হুম, আর তাদের বিশেষত্ব হলো তারা ছাড় দেয় কিন্তু ছেড়ে দেয় না।’

-‘তুমি একটু বেশি বেশিই বলছো বাবা। কই তাদের নামে এমন কিছু শুনি নি কখনো।’

-‘বোকারা কথা রটাতে পছন্দ করে আর বুদ্ধিমানরা গোপনে কাজ সারে। তারা সমাজের সন্মানিত মানুষ। সামান্য আঁচড়ও গায়ে লাগাতে দেয় না। আর শাহরিয়ার রাজনীতির মানুষ। সে বাড়িতে ভদ্র কিন্তু বাইরের আস্ত হয়েনা। যতটুকু জানি সে কারো গায়ে হাত তুলে হাত নোংরা করে না। সরাসরি মাটিতে গেঁড়ে গলায় ছুরি চালায়।’

বাবার কথায় সে হেসেছিল। কারণ তার মনে হচ্ছিল বাবা তাকে মজা করে কথা বলেছিল। কারণ এগুলো বছর বিদেশে থাকলেও মেয়েলী কেসে জড়ায় নি কখনো। কেউ বলতে পারবে না কখনো মেয়েদেরকে কটুত্তি করেছে। এসবের ধারে কাছেও নেই সে, ভদ্র গোছের ভদ্র মানুষ কি না। তাছাড়া ইশতিয়াক ভাই তার বড় বোন আশালতার স্কুল ফ্রেন্ড। দেখা হয়েছে

বহুবার। সেই সূত্রে অল্প স্বল্প চেনাজানা আছে
ইশতিয়াকের সঙ্গে। সেও জানে ইশতিয়াক আর শুদ্ধ
কেমন। শুদ্ধ, ইশতিয়াকও জানে সে কেমন। মনে
মনে এসব ভাবতে ভাবতে সে সিঁতারার সঙ্গে
সায়নের রুমে এলো। সায়ন ততক্ষণে বিছানার
হেডবোর্ডে হেলান দিয়ে বসেছে।

সদ্য ঘুম থেকে উঠায় চোখ ফুলে আছে। পার্টির
ছেলেরা বাসায় আসবে না। কড়া আদেশ জারি আছে
যত ঝামেলায় হোক কেউ যেন বাড়িতে না আসে।
তাহলে এত সকালে কে এলো? কার এত জরুরি
দরকার পড়ল যে, সাধের ঘুমটার বারোটা বাজিয়ে
দিলো। তখন দরজা খুলে সিঁতারার

সঙ্গে থাকা ছেলেটাকে দেখামাত্রই কুঁচকানো ভ্রুঁ মসৃণ
হলো। গম্ভীরতার ছাপ সরে ঠোঁটে হাসি ফুটল। মন্টি
তাকে দেখে কিছু বলার আগেই সায়ন
বলল,-‘আহনাফ তুই! দেশে ফিরলি কবে?’

-‘এসেছি গত সপ্তাহে। তা আপনার এই অবস্থা কেন
ভাই?’

-‘আমাদের পেশাতে এসব টুকটাক লেগেই থাকে।
ছাড় সেসব কথা। তোর খবর বল।’

সায়নের কথা শুনে সে একটা কার্ড এগিয়ে দিয়ে
জানাল তার বোনের অর্থাৎ সায়নের ফ্রেন্ডের বিয়ে।
আশালতা অবশ্যই তাকে যেতে বলেছে।

বোনের কার্ড বিলানোর দায়িত্বটা তার ঘাড়ে পড়েছে
তাই আসতে হলো আর কি। সায়ন হেসে ব্যান্ডেজ
করা হাতে কার্ড খুলতে গিয়ে থেমে গেল।

সে খুলতে পারছে না দেখে আহনাফ কার্ড খুলে দিলে
বরের নাম, ধাম, দেখল। খোঁজখবর নিলো। তারপর
সে ভিডিও কলে আশালতাকে ফোন করে কিছুক্ষণ
ফাজলামি করল। সিতারা চৌধুরী চা, নাস্তা দিয়ে
গেলেন। তারা খেতে খেতে কিছুক্ষণ গল্প করে
আহনাফ বিদায় নিয়ে চলে গেল। শখ, শীতল, স্বর্ণ
কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও রিকশা পেল না। শখের
প্রথম

ক্লাস আজ মিস হয়েই গেল। আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে
একটা রিকশা পেয়ে তারা চট জলদি উঠে বসল।
শীতল ছোটো বিধায় বসল শখের কোলের উপর।
নতুবা বসে সিটের উপরে। ভাঙা রাস্তায় সিটের
উপরের অংশে বসলে কেমন যে লাগে যে বসে
সেইই জানে। একদিন ফাঁকা অংশ দিয়ে ধপাস করে

পড়ে গিয়েছিল শীতল। হাত ছিলে কি একটা অবস্থা।
তারপর থেকে শখ জোর করে হলেও তাকে কোলে
বসায়। আজ লেট হওয়াতে বিরক্তি প্রকাশ করতে
করতে কিছুদূর গিয়ে শখ ভাড়া দিয়ে নেমে পড়ল।
ওদেরকে সাবধানে যেতে বলে দ্রুতপায়ে ছুটল
চারতলার ক্লাসের দিকে। ক্লাস মিস করলেও নোট
মিস করা যাবে না। একটা নোট মিস গেলে চাপ বেড়ে
যায়। তাই সে রোজকার পড়া রোজ সারে। এদিকে
আর কিছুদূর গিয়ে স্বর্ণও নেমে গেল। সেও শীতলকে
সাবধানে যেতে বলে, সেও ছুটল জারুল তলায়। তার
ফ্রেন্ডরা সেখানে বসে আড্ডা দিচ্ছে। ক্লাস শুরু হতে
এখনো দেরি আছে। কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে তারপর
দলবেঁধে যাবে ক্লাস করতে। এটাই তো ভার্শিটি
লাইফের আসল মজা। বোনকে যেতে দেখে শীতল
আরাম করে বসল। ঘাড় ঘুরিয়ে ডানে-বায়ের মানুষ
দেখল। পাখি দেখল। রাস্তা দেখল। পথের ধাঁরে ফুটে
থাকা ফুলের রং দেখল। এভাবে দশ মিনিট পর সেও
তার কলেজের গেটে গিয়ে নামল। ভাড়া তখন শখ
দিয়েছে তার টাকা বেচে গেল দেখে খুশি হলো। সে
ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে পা বাড়াল গেটের দিকে। তার

বেস্ট ফ্রেন্ড কিয়ারা তার জন্যই অপেক্ষা করছিল।
তাকে দেখে কিয়ারা খ্যাক করে কিছু বলার আগে
কিছু পড়ার শব্দে দু'জনে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। একটা
ছেলে বাইক নিয়ে পড়ে গেছে। বাইকের অবস্থা খুব
খারাপ। পিচঢালা রাস্তায় এভাবে পড়ায় ছিন্লে ছুঁটে
গেছে হাত-পা। শীতল চুইংগাম চিবাতে চিবাতে
ছেলেটাকে ভালো করে দেখল। এই ছেলেকে তাদের
বাগানের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছিল।

পথচারীরা তাকে ধরে তুলছে দেখে সে আর গেল না।
চেনে না, জানে না।

আর অনেকেই সাহায্য করছে। সে ছোট মানুষ, গিয়ে
না পারবে এত বড় একজন মানুষকে টেনে তুলতে।
না পারবে তার নামি-দামি বাইকটা দাঁড় করাতে।
তাই কিয়ারার সঙ্গে ভেতরে চলে গেল। কলেজের
মাঠে চলছে আরেকটা সার্কাস। বিদেশি ক'জন ছেলে
সাদা স্যান্ডো গেঞ্জি, সাদা লুঙ্গি ও মাথায় লাল গামছা
বেঁধে হেঁটে বেড়াচ্ছে। তারা বিদেশী পর্যটক। মাত্র
কিছুদিন হলো বাংলাদেশ এসেছে। এখানে এসে
বাঙালিদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে বাংলাদেশ
ঘোরার ইচ্ছে পোষণ করেছে। শিক্ষকরা তাদের

এলাও করেছে। তারা অবশ্য হাঙামা করছে না
আগ্রহভরে শুধু দেখছে, মাঝে মধ্যে ছবি তুলছে,
কখনো নিজেরা নিজেরা বকবক করছে। তাদের দিকে
কৌতুহলবশত তাকিয়ে আছে কলেজের অনেক
স্টুডেন্ট। হাঁটতে হাঁটতে শীতলের হঠাৎ দৃষ্টি আঁটকে
গেল কামরানের দিকে। এই কামরান ছেলেটা শুদ্ধর
ঘনিষ্ঠ ফ্রেন্ড। সেও গবেষক। এবং শুদ্ধর সঙ্গে থাকে
এক ফ্ল্যাটে। তার তো এখানে থাকার কথা নয়
তাহলে সে এখানে কেন? আর এই বিদেশীদের
সঙ্গেই বা কেন? তখন কিয়ারা কামরানকে দেখে
বলল,-‘ওই ছেলেটাকে চেনা চেনা লাগছে কোথাও
দেখেছি মনে হচ্ছে। ‘

-‘ওটা শুদ্ধ ভাইয়ার বেস্ট ফ্রেন্ড কামরান ভাইয়া।’

-‘কামরান? এ আবার কেমন নাম?’

-‘এমনই নাম।’

-‘কিন্তু এত নাম থাকতে কামরান কেন?’

-‘উনার দাদার নাম ইমরান। উনার বাবার নাম
জুবরান। উনি ছোটো বেলায় যাকে তাকে কামড়ে
দিতো। তাই বাপ দাদার সঙ্গে মিল রেখে তার উনার
নাম হয়েছে কামরান।’ বাড়ির মেয়েরা তাড়াহুড়ো করে

বেরিয়ে গেলে সিরাত সায়নকে একবার দেখে
এলেন। মুখ ফুটে কিছু না বললেও সিঁতারার পাশ
ঘেঁষে দাঁড়ালেন।

ছোটো জায়ের এই অভ্যাসের কথা ভালো করে
জানেন সিঁতারা চৌধুরী।

সিরাত যখনই কিছু বলতে চায় তখন এভাবে ঘুরঘুর
করে। বোকা বোকা হাসে। যতক্ষণ না নিজে থেকে
কিছু জিজ্ঞাসা করবেন ততক্ষণ এভাবেই চড়কির
মতো ঘুরতে থাকবে। আজও তাকে পাশ ঘঁষতে
দেখে সিঁতারা চৌধুরী ব্যাপারটা বুঝে এঁটো প্লেটগুলো
ধুঁতে ধুঁতে বলল,-‘কিছু বলবি মেজো?’

-‘হুম।’

-‘বল, জরুরি কিছু?’

-‘বড় ভাবি বলছিলাম যে, সায়নের একটা বিয়ে দিলে
কেমন হয়? বয়স তো কম হলো না ছেলেটার।
এমনও হতে পারে লজ্জায় কিছু বলে না।’

সিঁতারা চৌধুরী জা’য়ের দিকে একবার তাকিয়ে প্লেট
ধুয়ে মুছে সাজিয়ে রাখলেন। তারপর ডিমগুলো ফ্রিজে
রেখে বললেন,

-‘হঠাৎ একথা? ভালো কোনো মেয়ের সন্ধান পেয়েছিস?’

-‘না, না, তেমন কিছু না।’-‘সায়ন, শুদ্ধ দু’জনই প্রাপ্ত বয়স্ক। আজকে বিয়ে দিলে কালই ঘর আলো করে নাতি-নাতনি আসবে। বাচ্চাদের কলকলানিতে ভরে উঠবে চৌধুরী নিবাস। কিন্তু যাদের জন্য মেয়ে দেখব ওরাই তো গুরুত্ব দেয় না। আমিই বা মা হয়ে আর কতভাবে বোঝাব, বল দেখি?’

-‘ওয়াশরুম থেকে বের হতে গিয়ে সায়ন আহত পায়ে ব্যথা পেয়েছে। রক্ত বের হচ্ছে। একটা বউ থাকলে সেবায়ত্ন করতে পারত। এত বড় ছেলের কখন কি লাগে আমরা কি বুঝব? বুঝলেও, ছেলেটাও তো লজ্জায় কিছু বলে না। ডাকে না আমাদের।’সিতারা চৌধুরী দীর্ঘশ্বাস চেপে দুপুরের রান্নার জন্য সবজিগুলো বুয়াকে কাটতে দিয়ে জবাব দিলেন,

-‘এবার শুদ্ধ ফিরুক। দেখি ওকে দিয়ে সায়নের সঙ্গে কথা বলাব। তোর বড় ভাই তো রাগে দেখতেও যায় নি ছেলেটাকে। কিছু বললে আমাকে উল্টো খিচমিচ করে ওঠে। এদের বাপ ছেলেদের দ্বন্দে আমি

মাঝখানে পড়েছি। না পারি স্বামীর কথায় সাপোর্ট দিতে না পারি ছেলের যুক্তির কাছে হার মানতে।’

-‘পছন্দ টছন্দ থাকলেও তো বলে না। আমরা কতদিন জিজ্ঞাসা করেছি, তোমরা দুই ছেলে মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকে। সায়ন ফাজলামো করে কথা এড়িয়ে গেলেও শুদ্ধ যেন কানেই শোনে না। বুঝি না বাপু এরা কি

চিরকুমার থাকার পণ করেছে নাকি।’-‘এর আগে একটা মেয়ে দেখতে গেলাম। আমাদের অফিসের স্টাফের শালি। কি যে সুন্দর মেয়েটা। সাজিয়ে গুছিয়ে রাখলে জ্যান্ত পুতুল যেন একটা। সায়নকে ছবি দেখালাম। সায়ন বিয়েতে রাজি না দেখে শুদ্ধকে কত করে বললাম। সে ফোঁস ফোঁস করে বলে, বিয়ের প্রয়োজন অনুভব করলে জানাব তখন আয়োজন শুরু করো। আপাতত এসব বলে মাথা খারাপ করো না।’

-‘তা প্রয়োজন অনুভব করবে কবে? অন্য বাড়ির ছেলেরা দেখি গোঁফ না গজাতেই বিয়ে, বিয়ে করে মুখে ফ্যানা তুলে ফেলে। কত ছেলে মরতেও যায় বিয়ের জন্য। যতসব হয়েছে আমাদের বাড়ির

ছেলেরা, বিয়ের কথা শুনতেই পারে নি।’এভাবে
সিতারা চৌধুরী সিরাতের সঙ্গে ছেলেদের নিয়ে কথা
বলছিলেন।

তখন সিমিনের (শীতলের মা) কথা শোনা গেল।
শীতলকে বকতে বকতে সিঁড়ি বেয়ে নামছে উনি।
একগাদা জামা বের করে বিছানার উপরে স্তূপ করে
রেখে গেছে মেয়েটা। পরে একটা বের করে পাঁচটা।
তারপর পালা দিয়ে দলা মলা পাঁকিয়ে রেখে চলে
যায়। এত বড় মেয়ে হুঁশ জ্ঞান এখন না হলে, আর
কবে হবে? এসব বকতে বকতে জামা কাপড়গুলো
একা হাতে গুছিয়ে ময়লা কাপড় ধুঁয়ে ছাদে মেলে
এসেছেন তিনি। হাঁপিয়েও গেছেন। মেয়ের নামে
অভিযোগের পসরা খুলে বসলেন। তখন সিরাত
সিমিনের উদ্দেশ্য বলল,

-‘ছোটো, শীতলকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার
কথা ছিল না, কবে যাবি? সিরিয়াল দিয়েছিস?’

সিমিন তো একথা ভুলেই বসেছেন। সিরাত বলার
পর উনার স্মরণ হলো

কথাটা। উনাকে মুখ দেখে সিঁতারা চৌধুরী বিরক্ত হয়ে বললেন,-‘মা হয়ে এতভুলো মনা হলে কিভাবে হবে সিমিন? দেখিস না, মেয়েটার

পিরিয়ডের প্রথমদিন কী অবস্থা হয়। স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিক বলেই তো কিছু থাকে নাকি? মেয়ে মানুষের কিছু কিছু ব্যাপার নিয়ে অবহেলা করতে নেই। তুই না গেলে বল আমিই নাহয় নিয়ে যায় মেয়েটাকে? ‘

জা’য়ের কথা বকা সিমিন মুখ কাচুমাচু করে জানাল উনিই নিয়ে যাবেন।

এরপর তিন জা মিলে গল্পে-গল্পে, হাতে-হাতে সাংসারিক কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ঘড়িতে তখন সাড়ে দশটা হবে। সিঁতারা চৌধুরীর ফোনটা হঠাৎ নিজস্ব স্বরে বেজে উঠল। উনি ড্রয়িংরুম থেকে ফোনটা হাতে তুলে নজর বুলিয়ে হাসলেন। নাম্বার দেখে মমতাময়ী মন দরদে উতলে পড়ল।

উনি কল রিসিভ করে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন,-‘আব্বা, কেমন আছে?’

শুদ্ধ সদ্য শাওয়ার নিয়ে ভেজা চুল মুছতে মুছতে জানাল,

-‘ভালো আছি। তুমি কেমন আছো, বাড়ির সবাই কেমন আছে, আম্মু?’

-‘আমরা সবাই ভালো আছি। সকালে নাস্তা করেছো বাবা?’

-‘না, সারারাত ল্যাবে ছিলাম কেবল ফিরলাম। একটা কথা জানাতে কল করলাম। কিছুক্ষণ পরে পাঁচজন গেস্ট যাবে বাসায়। লাঞ্চ সারবে। তুমি সামলে নিও প্লিজ।’

-‘এরা পরিচয় নাকি অপরিচিত কেউ?’

-‘বিদেশী সাইন্টিস্ট। কিছু কাজের জন্য এসেছে আর কি।’

-‘ওহ আচ্ছা, আচ্ছা। তুমি আসবে বাবা? তোমার বাসায় তোমরা গেস্টরা আসছে, তুমি না থাকলে কিভাবে হবে?’

-‘হুম আমিও আসছি। এইতো, এয়ার টিকিট কনফার্ম করেই তোমাকে জানালাম। আর আম্মু.. ওরা কিন্তু কয়েকটা দিন থাকবে।’

-‘সমস্যা নেই বাবা, তুমি শুধু সাবধানে চলে এলো তাহলেই হবে।’

-‘হুম।’মা ও ছেলে কথা শেষ করে কল কাটলেন।
সিতারা চৌধুরী দুই জা’কে গেস্টদের কথা বলতেই
উনারাও কাজে লেগে পড়লেন। ভাগ ভাগ করে কাজ
বেছে নিলেন। আপ্যায়নে যেন ত্রুটি না থাকে সেই
ব্যবস্থা করলেন। তবে কিছু জিনিস প্রয়োজন তাই
লিস্ট করে শাহাদত চৌধুরীকে বাজারে পাঠালেন।

শীতল ক্লাসে যায় নি। নরম ঘাসের উপর বসে
কিয়ারার আনা তেঁতুল খাচ্ছে। গল্প করছে। কিয়ারার
দৃষ্টি তখনো বিদেশীদের দিকে। বিদেশীরা রিকশায়
চড়ে ঘাসের উপর ঘুরছে। কখনো নিজেরাই রিকশা
চালাচ্ছে, রিকশা টেনে সামনে এগিয়ে নিতে না
পারলে নিজেরা হাসাহাসি করছে।

কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে কিয়ারা কামরানকে ইঙ্গিত
করে বলে বসল,

-‘উনারা দাদার নাম ইমরান। বাপের নাম জুবরান।
উনার নাম কামরান। তা এই রানের বংশধরদের
কোথায় কুঁড়িয়ে পেলি রে শীতল?’-‘বেল তলায়।’

-‘ওহ। তা কামরান মিঁয়া বিদেশীদের সঙ্গে করছে টা
কি?’

-‘কি আশ্চর্য, আমাকে বলেছে নাকি? তুই গিয়ে জিজ্ঞাসা করে আয়।’

-‘শুদ্ধ ভাইয়া কিছু বলে নি তোকে?’

-‘নিজে বাঁচতে চাইলে খবরদার বলছি উনার নাম মুখেও নিবি না। উনার মতো বিটকেল জাতের কাজিন কারো আছে কি না জানা নেই। কপালই খারাপ বা’ল।’

-‘এভাবে বলছিস কেন রে শীতল? শুদ্ধ ভাইয়ার মতো এত ভদ্র, ড্যাসিং, ছেলে হয় নাকি? তাও আবার সাইন্টিস। এই অবধি কি কি আবিষ্কার করেছে শুদ্ধ ভাই, জানিস কিছু?’

-‘ব্যঙের ছাতার নিচে বছরের পর বছর কিভাবে বসবাস করা যায় সেই গবেষণা চালাচ্ছে উনি।’

-‘রেগে যাচ্ছিস কেন? বল না একটু শুন।’

-‘কি বলব? সে শুধু দেখতেই ড্যাসিং না। তার হাতের চ্যালাকাঠের বারি আরো ড্যাসিং। সুইট। টেস্টি। খাবি একবার? টেস্ট কর ভালো লাগবে।’-‘ভাইয়া আবার তোকে মেরেছে?’

-‘শুধু মারে নি ফোনটারও জান কবজ করেছে। যাওয়ার সময় সবাইকে গিফট দিয়েছে আমাকে দেয়

নি। লাগবে না তার দেওয়া গিফট। সায়েন ভাইয়া বলেছে সুস্থ হলেই আমাকে শপিং করাতে নিয়ে যাবে।’

একথা বললেও মুখ ভার করে ঘাসের দিকে তাকিয়ে রইল। শুদ্ধর এমন

ব্যবহারে ভীষণ পেয়েছে সে। শখ, স্বর্ণকে দুটো ড্রেস দিয়েছে শুদ্ধ। সঙ্গে ম্যাচিং হিজাব। সাম্য, সৃজনকে রিমোট কন্ট্রোল হেলিকপ্টার আর তাকে দিয়েছে দু’ঘা চ্যাকাঠের বারি। এবার এসে কবেকার রাগ তুলেছে কে জানে! শীতলের বেজার মুখ দেখে কিয়ারাও কিছু বলার সাহস পেল না। এখন কিছু বললেই শীতলের সমস্ত রাগ তার উপরে পড়বে। হঠাৎ শীতল

কিয়ারার হাতের ফোনটা কেড়ে নিয়ে ফটাফট নাম্বার তুলে কাউকে কল দিলো। ওপর পাশের মানুষটা কল তুলছে না। সেও হাল না ছেড়ে একের পর এক কল দিতেই থাকল। চারবারের বেলায় কল তুলে গমগমে সুরে বলে উঠল,-‘ শোয়াইব স্পিকিং, হু আর ইউ?’

শীতল নিশুচুপ। কারো কথা না শুনে হ্যালো, হ্যালো, করে শেষমেষ কলই কেটে দিলো ওপর পাশের মানুষটা। তাতে শীতলের রাগের পারদ দ্বিগুন বাড়ল।

সে আবার কল করল সেই নাম্বারে। কিয়ারা বসে বসে শীতলের ক্লাউ দেখছে। এবারও কল বেজে বেজে শেষ মুহূর্তে কল রিসিভ হতেই সে গলার স্বর পরিবর্তন করে ন্যাকা সুরে বলল,

-‘বিশুদ্ধ বলছেন?’

-‘না। ‘

-‘বিশুদ্ধ সাহেব ভালো হয়ে যান ভালো হতে টাকা লাগে না।’

-‘ব্যথা কমে গেছে?’

-‘কিসের ব্যথা?’

-‘এই যে চ্যাকাঠ দিয়ে দু’ঘা দিয়ে এলাম তার ব্যথা।’

-‘(...)’

-‘নিষেধ করেছিলাম না আমার সঙ্গে চালাকি না করতে?’

-‘(..)’

শীতল মুখ লটকে তাকিয়ে আছে কিয়ারার দিকে। ইস, মুখে ওড়না গুঁজে কথা বলে কি লাভ হলো, বুঝেই তো ফেলল। মুখ থেকে ওড়না বের করে সে কিছু বলার আগে শুদ্ধ বলল,-‘কলের কারণ?’

-‘আপনাকে একটু দরকার ছিল।’

-‘কেন?’

-‘শোকেসে সাজিয়ে রাখার জন্য।’

একথা বলে শীতল কল কেটে ফোনের দিকে তাকিয়ে
মুখ ভেংচি দিয়ে বলল,

-‘ দিলাম খোঁচা। এবার মারেন দেখি, কেমন
পারেন।’একথা বলে শীতল সুন্দর করে হাসল।
এবার শান্তি লাগছে। সেও বুঝুক কাউকে খোঁচামার্কী
কথা বললে কেমন লাগে। সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে
শুদ্ধর ফোন নাম্বার ডিলিট করে কিয়ারাকে ফোন
ফিরিয়ে দিলো। আজ একটু বেশিই সাহস দেখিয়ে
ফেলেছে। কারণ সে জানে শুদ্ধ এবার দেরি করে
বাড়ি ফিরবে বড় মাকে তাই বলতে শুনেছে। দেরি
করে এলে ভুলে যাবে আজকের কথা। একথা ভেবে
একটু খোঁচাল আর কি। এখন শুদ্ধ খোঁচা খেয়ে দিন
পার করুন।বাড়ির মেয়েরা তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে
গেলে সিরাত সায়নকে একবার দেখে এলেন। মুখ
ফুটে কিছু না বললেও সিঁতারার পাশ ঘেঁষে
দাঁড়ালেন।

ছোটো জায়ের এই অভ্যাসের কথা ভালো করে
জানেন সিঁতারী চৌধুরী।

সিরাত যখনই কিছু বলতে চায় তখন এভাবে ঘুরঘুর
করে। বোকা বোকা হাসে। যতক্ষণ না নিজে থেকে
কিছু জিজ্ঞাসা করবেন ততক্ষণ এভাবেই চড়কির
মতো ঘুরতে থাকবে। আজও তাকে পাশ ঘঁষতে
দেখে সিঁতারী চৌধুরী ব্যাপারটা বুঝে এঁটো প্লেটগুলো
ধুঁতে ধুঁতে বলল,-‘কিছু বলবি মেজো?’

-‘ভূম।’

-‘বল, জরুরি কিছু?’

-‘বড় ভাবি বলছিলাম যে, সায়নের একটা বিয়ে দিলে
কেমন হয়? বয়স তো কম হলো না ছেলেটার।
এমনও হতে পারে লজ্জায় কিছু বলে না।’

সিঁতারী চৌধুরী জা’য়ের দিকে একবার তাকিয়ে প্লেট
ধুয়ে মুছে সাজিয়ে রাখলেন। তারপর ডিমগুলো ফ্রিজে
রেখে বললেন,

-‘হঠাৎ একথা? ভালো কোনো মেয়ের সন্ধান
পেয়েছিস?’

-‘না, না, তেমন কিছু না।’-‘সায়ন, শুদ্ধ দু’জনই প্রাপ্ত
বয়স্ক। আজকে বিয়ে দিলে কালই ঘর আলো করে

নাতি-নাতনি আসবে। বাচ্চাদের কলকলানিতে ভরে
উঠবে চৌধুরী নিবাস। কিন্তু যাদের জন্য মেয়ে দেখব
ওরাই তো গুরুত্ব দেয় না। আমিই বা মা হয়ে আর
কতভাবে বোঝাব, বল দেখি?’

-‘ওয়াশরুম থেকে বের হতে গিয়ে সায়ন আহত পায়ে
ব্যথা পেয়েছে। রক্ত বের হচ্ছে। একটা বউ থাকলে
সেবায়ত্ত্ব করতে পারত। এত বড় ছেলের কখন কি
লাগে আমরা কি বুঝব? বুঝলেও, ছেলেটাও তো
লজ্জায় কিছু বলে না। ডাকে না আমাদের।’সিতারা
চৌধুরী দীর্ঘশ্বাস চেপে দুপুরের রান্নার জন্য
সবজিগুলো বুয়াকে কাটতে দিয়ে জবাব দিলেন,

-‘এবার শুদ্ধ ফিরুক। দেখি ওকে দিয়ে সায়নের সঙ্গে
কথা বলাব। তোর বড় ভাই তো রাগে দেখতেও যায়
নি ছেলেটাকে। কিছু বললে আমাকে উল্টো খিচমিচ
করে ওঠে। এদের বাপ ছেলেদের দ্বন্দে আমি
মাঝখানে পড়েছি। না পারি স্বামীর কথায় সাপোর্ট
দিতে না পারি ছেলেদের যুক্তির কাছে হার মানতে।’

-‘পছন্দ টছন্দ থাকলেও তো বলে না। আমরা
কতদিন জিজ্ঞাসা করেছি, তোমরা দুই ছেলে মুখে
কুলুপ ঐটে বসে থাকে। সায়ন ফাজলামো করে কথা

এড়িয়ে গেলেও শুদ্ধ যেন কানেই শোনে না। বুঝি না
বাপু এরা কি

চিরকুমার থাকার পণ করেছে নাকি।’

-‘এর আগে একটা মেয়ে দেখতে গেলাম। আমাদের
অফিসের স্টাফের শালি। কি যে সুন্দর মেয়েটা।
সাজিয়ে গুছিয়ে রাখলে জ্যাক্স পুতুল যেন একটা।
সায়নকে ছবি দেখালাম। সায়ন বিয়েতে রাজি না
দেখে শুদ্ধকে কত করে বললাম। সে ফোঁস ফোঁস
করে বলে, বিয়ের প্রয়োজন অনুভব করলে জানাব
তখন আয়োজন শুরু করো। আপাতত এসব বলে
মাথা খারাপ করো না।’-‘তা প্রয়োজন অনুভব করবে
কবে? অন্য বাড়ির ছেলেরা দেখি গোঁফ না গজাতেই
বিয়ে, বিয়ে করে মুখে ফ্যানা তুলে ফেলে। কত ছেলে
মরতেও যায় বিয়ের জন্য। যতসব হয়েছে আমাদের
বাড়ির ছেলেরা, বিয়ের কথা শুনতেই পারে নি।’

এভাবে সিঁতারী চৌধুরী সিরাতের সঙ্গে ছেলেদের
নিয়ে কথা বলছিলেন।

তখন সিমিনের (শীতলের মা) কথা শোনা গেল।
শীতলকে বকতে বকতে সিঁড়ি বেয়ে নামছে উনি।
একগাদা জামা বের করে বিছানার উপরে স্তূপ করে

রেখে গেছে মেয়েটা। পরে একটা বের করে পাঁচটা। তারপর পালা দিয়ে দলা মলা পাঁকিয়ে রেখে চলে যায়। এত বড় মেয়ে হুঁশ জ্ঞান এখন না হলে, আর কবে হবে? এসব বকতে বকতে জামা কাপড়গুলো একা হাতে গুছিয়ে ময়লা কাপড় ধুঁয়ে ছাদে মেলে এসেছেন তিনি। হাঁপিয়েও গেছেন। মেয়ের নামে অভিযোগের পসরা খুলে বসলেন। তখন সিরাত সিমিনের উদ্দেশ্য বলল,

-‘ছোটো, শীতলকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা ছিল না, কবে যাবি? সিরিয়াল দিয়েছিস?’

সিমিন তো একথা ভুলেই বসেছেন। সিরাত বলার পর উনার স্মরণ হলো

কথাটা। উনাকে মুখ দেখে সিঁতারা চৌধুরী বিরক্ত হয়ে বললেন,-‘মা হয়ে এতভুলো মনা হলে কিভাবে হবে সিমিন? দেখিস না, মেয়েটার

পিরিয়ডের প্রথমদিন কী অবস্থা হয়। স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিক বলেই তো কিছু থাকে নাকি? মেয়ে মানুষের কিছু কিছু ব্যাপার নিয়ে অবহেলা করতে নেই। তুই না গেলে বল আমিই নাহয় নিয়ে যায় মেয়েটাকে? ‘

জা'য়ের কথা বকা সিমিন মুখ কাচুমাচু করে জানাল
উনিই নিয়ে যাবেন।

এরপর তিন জা মিলে গল্লে-গল্লে, হাতে-হাতে
সাংসারিক কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ঘড়িতে
তখন সাড়ে দশটা হবে। সিঁতারা চৌধুরীর ফোনটা
হঠাৎ নিজস্ব স্বরে বেজে উঠল। উনি ড্রয়িংরুম থেকে
ফোনটা হাতে তুলে নজর বুলিয়ে হাসলেন। নাম্বার
দেখে মমতাময়ী মন দরদে উতলে পড়ল।

উনি কল রিসিভ করে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন,
-‘আব্বা, কেমন আছে?’

শুদ্ধ সদ্য শাওয়ার নিয়ে ভেজা চুল মুছতে মুছতে
জানাল,-‘ভালো আছি। তুমি কেমন আছো, বাড়ির
সবাই কেমন আছে, আম্মু?’

-‘আমরা সবাই ভালো আছি। সকালে নাস্তা করেছো
বাবা?’

-‘না, সারারাত ল্যাভে ছিলাম কেবল ফিরলাম। একটা
কথা জানাতে কল করলাম। কিছুক্ষণ পরে পাঁচজন
গেস্ট যাবে বাসায়। লাঞ্চ সারবে। তুমি সামলে নিও
প্লিজ।’

-‘এরা পরিচয় নাকি অপরিচিত কেউ?’

-‘বিদেশী সাইন্টিস্ট। কিছু কাজের জন্য এসেছে আর কি।’

-‘ওহ আচ্ছা, আচ্ছা। তুমি আসবে বাবা? তোমার বাসায় তোমরা গেস্টরা আসছে, তুমি না থাকলে কিভাবে হবে?’

-‘হুম আমিও আসছি। এইতো, এয়ার টিকিট কনফার্ম করেই তোমাকে জানালাম। আর আম্মু.. ওরা কিন্তু কয়েকটা দিন থাকবে।’-‘সমস্যা নেই বাবা, তুমি শুধু সাবধানে চলে এলো তাহলেই হবে।’

-‘হুম।’

মা ও ছেলে কথা শেষ করে কল কাটলেন। সিঁতারা চৌধুরী দুই জা’কে গেস্টদের কথা বলতেই উনারাও কাজে লেগে পড়লেন। ভাগ ভাগ করে কাজ বেছে নিলেন। আপ্যায়নে যেন ত্রুটি না থাকে সেই ব্যবস্থা করলেন। তবে কিছু জিনিস প্রয়োজন তাই লিস্ট করে শাহাদত চৌধুরীকে বাজারে পাঠালেন।

শীতল ক্লাসে যায় নি। নরম ঘাসের উপর বসে কিয়ারার আনা তেঁতুল খাচ্ছে। গল্প করছে। কিয়ারার দৃষ্টি তখনো বিদেশীদের দিকে। বিদেশীরা রিকশায় চড়ে ঘাসের উপর ঘুরছে। কখনো নিজেরাই রিকশা

চালাচ্ছে, রিকশা টেনে সামনে এগিয়ে নিতে না পারলে নিজেরা হাসাহাসি করছে।

কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে কিয়ারা কামরানকে ইঙ্গিত করে বলে বসল,-‘উনারা দাদার নাম ইমরান। বাপের নাম জুবরান। উনার নাম কামরান। তা এই রানের বংশধরদের কোথায় কুঁড়িয়ে পেলি রে শীতল?’

-‘বেল তলায়।’

-‘ওহ। তা কামরান মিয়া বিদেশিদের সঙ্গে করছে টা কি?’

-‘কি আশ্চর্য, আমাকে বলেছে নাকি? তুই গিয়ে জিজ্ঞাসা করে আয়।’

-‘শুদ্ধ ভাইয়া কিছু বলে নি তোকে?’

-‘নিজে বাঁচতে চাইলে খবরদার বলছি উনার নাম মুখেও নিবি না। উনার মতো বিটকেল জাতের কাজিন কারো আছে কি না জানা নেই। কপালই খারাপ বা’ল।’

-‘এভাবে বলছিস কেন রে শীতল? শুদ্ধ ভাইয়ার মতো এত ভদ্র, ড্যাসিং, ছেলে হয় নাকি? তাও আবার সাইন্টিস। এই অবধি কি কি আবিষ্কার করেছে শুদ্ধ ভাই, জানিস কিছু?’-‘ব্যঙের ছাতার নিচে বছরের পর

বছর কিভাবে বসবাস করা যায় সেই গবেষণা চালাচ্ছে উনি।’

-‘রেগে যাচ্ছিস কেন? বল না একটু শুনি।’

-‘কি বলব? সে শুধু দেখতেই ড্যাসিং না। তার হাতের চ্যালাকাঠের বারি আরো ড্যাসিং। সুইট। টেস্টি। খাবি একবার? টেস্ট কর ভালো লাগবে।’

-‘ভাইয়া আবার তোকে মেরেছে?’

-‘শুধু মারে নি ফোনটারও জান কবজ করেছে। যাওয়ার সময় সবাইকে গিফট দিয়েছে আমাকে দেয় নি। লাগবে না তার দেওয়া গিফট। সায়েন ভাইয়া বলেছে সুস্থ হলেই আমাকে শপিং করাতে নিয়ে যাবে।’

একথা বললেও মুখ ভার করে ঘাসের দিকে তাকিয়ে রইল। শুদ্ধর এমন

ব্যবহারে ভীষণ পেয়েছে সে। শখ, স্বর্ণকে দুটো ড্রেস দিয়েছে শুদ্ধ। সঙ্গে ম্যাচিং হিজাব। সাম্য, সৃজনকে রিমোট কন্ট্রোল হেলিকপ্টার আর তাকে দিয়েছে দু’ঘা চ্যালাকাঠের বারি। এবার এসে কবেকার রাগ তুলেছে কে জানে! শীতলের বেজার মুখ দেখে কিয়ারাও কিছু

বলার সাহস পেল না। এখন কিছু বললেই শীতলের সমস্ত রাগ তার উপরে পড়বে। হঠাৎ শীতল কিয়ারার হাতের ফোনটা কেড়ে নিয়ে ফটাফট নাম্বার তুলে কাউকে কল দিলো। ওপর পাশের মানুষটা কল তুলছে না। সেও হাল না ছেড়ে একের পর এক কল দিতেই থাকল। চারবারের বেলায় কল তুলে গমগমে সুরে বলে উঠল,- ‘শোয়াইব স্পিকিং, হু আর ইউ?’ শীতল নিশ্চুপ। কারো কথা না শুনে হ্যালো, হ্যালো, করে শেষমেষ কলই কেটে দিলো ওপর পাশের মানুষটা। তাতে শীতলের রাগের পারদ দ্বিগুন বাড়ল। সে আবার কল করল সেই নাম্বারে। কিয়ারা বসে বসে শীতলের ক্লাভ দেখছে। এবারও কল বেজে বেজে শেষ মুহূর্তে কল রিসিভ হতেই সে গলার স্বর পরিবর্তন করে ন্যাকা সুরে বলল,

-‘বিশুদ্ধ বলছেন?’

-‘না। ‘

-‘বিশুদ্ধ সাহেব ভালো হয়ে যান ভালো হতে টাকা লাগে না।’

-‘ব্যথা কমে গেছে?’

-‘কিসের ব্যথা?’

-‘এই যে চ্যাকাঠ দিয়ে দু’ঘা দিয়ে এলাম তার ব্যথা।’

-‘(...)’

-‘নিষেধ করেছিলাম না আমার সঙ্গে চালাকি না করতে?’

-‘(..)’

শীতল মুখ লটকে তাকিয়ে আছে কিয়ারার দিকে। ইস, মুখে ওড়না গুঁজে কথা বলে কি লাভ হলো, বুঝেই তো ফেলল। মুখ থেকে ওড়না বের করে সে কিছু বলার আগে শুদ্ধ বলল,-‘কলের কারণ?’

-‘আপনাকে একটু দরকার ছিল।’

-‘কেন?’

-‘শোকেসে সাজিয়ে রাখার জন্য।’

একথা বলে শীতল কল কেটে ফোনের দিকে তাকিয়ে মুখ ভেংচি দিয়ে বলল,

-‘ দিলাম খোঁচা। এবার মারেন দেখি, কেমন পারেন।’একথা বলে শীতল সুন্দর করে হাসল। এবার শান্তি লাগছে। সেও বুঝুক কাউকে খোঁচামার্কি কথা বললে কেমন লাগে। সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে শুদ্ধর ফোন নাম্বার ডিলিট করে কিয়ারাকে ফোন

ফিরিয়ে দিলো। আজ একটু বেশিই সাহস দেখিয়ে
ফেলেছে। কারণ সে জানে শুদ্ধ এবার দেরি করে
বাড়ি ফিরবে বড় মাকে তাই বলতে শুনেছে। দেরি
করে এলে ভুলে যাবে আজকের কথা। একথা ভেবে
একটু খোঁচাল আর কি। এখন শুদ্ধ খোঁচা খেয়ে দিন
পার করুন। তখন দুপুর একটা পঁয়ত্রিশ। শীতল আর
কিয়ারা কলেজ থেকে বেরিয়ে ফুটপাথ ধরে হাঁটছে।
মুখ ভার দু'জনেরই। ক্লাস করবে না বলে জারুল
গাছের নিচে নিজেদের আড়াল করে বসেছিল। যাতে
কেউ দেখতে না পায়। না খোঁজে। কিন্তু হঠাৎ
জাঁদরেল এক স্যার সেখানে উপস্থিত হন।

একের পর প্রশ্ন করতেই থাকেন। অতঃপর প্রশ্নের
তোপে পড়ে অগত্যা তাদেরকে ক্লাসে যেতেই হয়েছে
এবং সবগুলো ক্লাসও করতে হয়েছে। মাথার উপরে
চড়া রোদ। ভ্যাপসা গরম। গাছপালা থম মেরে আছে
যেন

পাতা নড়লেও জ্বালা যাবে। এই রোদের মধ্যে না
হেঁটে শীতল কিয়ারাকে বিদায় জানিয়ে রিকশায় উঠে
বসল। অতঃপর চৌধুরী নিবাসের গেটের সামনে
নেমে ভাড়া মিটিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল। মূল

ফটকটা অতিক্রম করে যেতে যেতেই হঠাৎ বাগানের
দিকে নজর পড়ল। ফুলের বাগানের
একপাশে ফুলের গাছ লাগানো। তবে অন্য ফুলের
তুলনায় বেশির ভাগই টক জাতীয় ফুলের গাছ রয়েছে
সেখানে। যেমন, তেঁতুল, বরই, আমড়া, আমলকি,
পেয়ারা, জলপাই। বলা বাহুল্য, বাড়ির মেয়ে /বউরা
যেসব ফল খেতে পছন্দ করে সেসব ফুলের গাছ। এ
কাজ করেছেন শারফাত চৌধুরী নিজেই। যাতে
বাড়ির মেয়ে/বউরা ইচ্ছেমতো ফল খেতে পারে। তাই
উনি দেশি বারোমাসি ফুলের গাছ লাগিয়েছেন। বেশ
ক'দিন হলো, বাগানমুখো হওয়া হয় না শীতলের।
বিগত সপ্তাহে মেজো আম্মুর সঙ্গে লেবু আনতে
গিয়েছিল। তারপর এদিকে পা মাড়ানো হয় নি।
তাছাড়া শুদ্ধ বাড়ি থাকলে গাছে উঠতে পারে না।
উঠলে মারে। বকে। ধমকায়। মা'র খাওয়ার ভয়ে গাছ
উঠে না নয়তো গাছে উঠে ফল পাড়তে একাই একশ
সে।

হঠাৎ কি ভেবে যেন সে বাগানের দিকে গেল। রোদে,
গরমে, কলেজের ড্রেসের অবস্থা খারাপ। তবুও
সেদিকে পাত্তা নেই তার। দুটো বিড়ালের মারামারির

শব্দ শুনে সেদিকে পা বাড়িয়েছে। তার পায়ের শব্দ শুনে দুটো বিড়াল দু'দিকে দৌড়ে পালিয়ে গেল। ফেলে রেখে গেল সদ্য ফোটা পাখির দুটো ছানা। বেঁচে আছে ছানাদুটো। নড়ছে এখনো। সে ছানাদুটো দেখে হাতে তুলে আশেপাশে তাকিয়ে দেখল। কোন গাছে পাখি দুটোর মায়ের বাসা বুঝতে উঠতে পারল না। তবে মাথার উপর বরই গাছ দেখে বুঝল পাখির বাসা এখানেই হবে। সে কলাপাতা ছিঁড়ে পাখির ছানাদুটো রেখে পিছু সরে একটু আড়ালে লুকিয়ে রইল। মা পাখিটা কিচিরমিচির শব্দে হাজির হয়ে মুখে করে তার বাচ্চা দুটো নিয়ে চলে গেল। ভরদুপুরে ভালো একটা কাজ করে মনটাও ফুরফুরে হয়ে গেল। তারপর কি ভেবে গাছের দিকে তাকিয়ে ভাবল অনেকদিন পেয়ারা মাখা খাওয়া হয় না।যেই ভাবা, সেই কাজ, কাঁধের ব্যাগটা মাটিতে রেখে তরতর করে গাছের উঠে ডাসা ডাসা গোটা কয়েকটা পেয়ারা ছিঁড়ল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে গাছের ডালে বসে তৃপ্তি সহকারে খেলো। পেটে ক্ষুধা থাকায় মনে হচ্ছিল পেয়ারা না যেন অমৃত খাচ্ছে। নিজেদের বাগানে তাড়া খাওয়ারও ভয় নেই, ধমকানোর সুযোগ নেই,

যে ধমকানো সে তো বাড়িতেই নেই তাহলে কিসের
ভয়! এসব ভেবে সে ইচ্ছেমতো দেখে-দেখে, বেছে
বেছে পেয়ারা নামিয়ে নিচে নামল। তারপর সেগুলো
ব্যাগে পুরে চলল বাড়ির ভেতরে। গাছ উঠতে-নামতে
গিয়ে ড্রেসটা নষ্ট হয়ে গেছে। না ধুলেই নয়। তবে সে
ধুবে না। কারণ এই বাহানায় আগামীকাল কলেজ
মিস করবে। মনে মনে

এমন দুষ্ট পরিকল্পনা এঁটে চোঁচিয়ে আন্মু! আন্মু! করে
ডেকে ফুরফুরে মেজাজ ড্রয়িংরুমের পা রাখতেই
থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তার ডাক শুনে উপস্থিত
ক'য়েকজোড়া চোখের দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ। সে মুখ
কাঁচুমাচু করে দ্রুত পা ফেলে রান্নাঘরের দিকে ছুঁটল।
বিদেশীরা এখানে কেন? সে রান্নাঘরে গিয়ে মা-
চাচীদের ব্যস্ত হাতে খাবার রেডি করতে দেখে বুঝল
তারা গেস্ট হয়ে এসেছে। তাদের জন্যই রান্না হয়েছে
হরেক পদ বাঙালি আইটেম। রান্নাঘরের দরজায়
তাকে দেখে সিরাত আস্তে করে বলল,-‘একি! এ কি
অবস্থা তোর? কলেজ থেকে ফিরলি নাকি যুদ্ধ করে?’
-‘এরা কারা মেজো মা?’

-‘শুধুর গেস্ট। যা তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে আয়।’

‘শুদ্ধর গেস্ট’ কথাটা তার মস্তিষ্কে টোকা দিলো।টোক
গিলল কয়েকবার।

মস্ত বড় ডায়নিং টেবিলজুড়ে সিট দখল করে বসে
আছে চেনা-অচেনা মানুষজন। সে কথা বাড়ল না।
পরনের ড্রেসের হাল দেখে পেঁয়ারাগুলো
রান্নাঘরে রেখে গুঁটি গুঁটি পায়ে এগোল সিঁড়ির দিকে।
এমনকি সিঁড়িতে

উঠতে উঠতেও ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখতে
দেখতে রেলিং ধরে উঠছে। ভয় কাজ করছে। যার
গেস্ট সে কি বাসায় এসেছে নাকি? যদি আসে
তাহলে মার খাওয়া ফরজ হয়ে গেছে। আজকে মার
খাওয়া থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। আজ বুঝি
আধমরা হতেই হবে। এসব ভাবতে ভাবতে সে দাঁত
দিয়ে নখ খুঁটতে খুঁটতে সিঁড়ি পেরিয়ে শখের রুম
বরাবর আসতেই দরজা খোলার শব্দ শুনল। শুদ্ধর
রুমের দরজা খুলছে দেখে সে তড়িঘড়ি করে লুকাতে
গিয়েও শুদ্ধর মুখোমুখি পড়েই গেল। এভাবে তাকে
দৌড়াতে দেখে শুদ্ধ ভ্রুঁ কুঁচকে দাড়াল। আপাদমস্তক
দেখে বিশেষ করে ড্রেসের হাল দেখে শীতল চাহনি
নিষ্ক্ষেপ করে বলল,-‘গাছে উঠেছিলি?’

শীতল মুখ কাচুমাচু করে নত মস্তকে কেবল মৃদুভাবে
মাথা নাড়াল। শুদ্ধ কিছু বলল না শুধু ভ্রুঁজোড়া কুঁচকে
তাকিয়ে রইল। রোদে চোখ, মুখের কি অবস্থা
করেছে। মোদাকথা, ভর দুপুরে গাছে উঠে কেউ?
পড়ে হাত পা ভাঙলে কি হতো? তাকে নিশ্চুপ দেখে
শীতল আড়চোখে একবার দেখে মিনমিন করে বলল,
-‘মগডাল থেকে বাবুই পাখির দুটো ছানা পড়ে
গিয়েছিল। ছানাদুটো তুলে দিতে গাছে উঠেছিলাম।
আর উঠব না।’

-‘(....)’

-‘আপনি কখন এলেন শুদ্ধ ভাই? আপনার না
দেরিতে ফেরার কথা ছিল?’

-‘শোকেসে সাজানোর তলব করে ভুলে গেলে চলবে?
তোর এত আগ্রহ দেখে দেরি করি নি কাজকর্ম ফেলে
চলে এসেছি। চল, এবার শোকেসে সাজাবি আমায়।’

শীতলের মুখটা চুপসে গেল। সে চুপসানোর মুখটা
নিয়ে মায়া মায়া সুরে শেষ প্রচেষ্টায় নামল। এই
মুহূর্তে মিষ্টি মিষ্টি কথায় যদি একবার পালিয়ে বাঁচতে
পারে ভুলেও রুমের দরজায় খুলবে না। তবে তার
কাছে শুদ্ধকে ঘায়েল করার একটা অস্ত্র আছে। হঠাৎ

কোথা থেকে যেন তার অসীম সাহস উদয় হলো। সে মিষ্টি কথায় পটাতে না পারলে সেই অস্ত্রটা কাজে লাগাবে বলে ভেবে নিলো। অতঃপর সে বলল,-‘ মজা করে বলেছি তাই আমি ক্ষমাপ্রার্থী। এরপরও যদি মারেন আমি কিন্তু বড় বাবাকে বলে দেবো আপনি সিগারেট খান।’

একথা বলে শুদ্ধর চোখে চোখ রেখে তাকাল। তাকাতেই মনে হলো ভুল করে ফেলল নাকি আরেকটা। ভয়ে বুকটা ধুরুধুরু করে কাঁপতে লাগল। তবে তাকে অবাক করে দিয়ে শুদ্ধ পাল্টা জবাব দিলো না, পাশ কাটিয়ে চলে গেল। শীতলের খুশি এবার দেখে কে। সে গালভর্তি হেসে শত্রুকে পরাজিত করার খুশিতে নাচতে-নাচতে, গাইতে-গাইতে, তার রুমে চলে গেল। ভেবেও নিলো এবার থেকে শুদ্ধ মারতে এলে এই হুমকিটাই দেবে সে। বিদেশীরা সাধারণ ঝাল খেতে পারে না। তাদের কথা মাথায় রেখে সব রান্না করা হয়েছে। সায়নও এসেছে সবার সঙ্গে আলাপ জমাতে। শুদ্ধ নিচে নেমে আগে মা চাচীদের যাওয়ার ইশারা করে নিজে সবাইকে তুলে খাওয়ানোর দায়িত্ব নিলো। সিঁতারা চৌধুরী

হাতের বাঙালি রান্না তৃপ্তি করে খেতে তারা বাহবা
দিলো। ছেলেদের খাওয়া শেষ হলে তারা সবাই
ড্রয়িংরুমের সোফায় বসল। শুদ্ধও খায় নি দেখে মা
চাচীদের সঙ্গে খেতে বসল। বোনরাও বসেছে। শখ,
স্বর্ণ এতক্ষণ উপরেই ছিল। বাইরের কেউ এলে
বাড়ির মেয়েদের বারবার তাদের সামনে ঘুরাঘুরি করা
পছন্দ করে না শুদ্ধ, সায়ন। সায়ন ছাড় দিলেও শুদ্ধ
দেয় না। তাই তারা এসে নিচে নামে নি মায়ের ডাকে
খেতে এসেছে। সবাই বসেছে কিন্তু শীতল নেই।
একটুপরে সেও ফ্রেশ হয়ে খেতে এলো। শখ
শীতলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে একটা ইশারা
করল। শখের ইশারায় মাথাতে ওড়না তুলে ভেংচি
কেটে চেয়ার টেনে বসল। এইটুকু ইশারা না করলে
শীতলের সঙ্গে সঙ্গে বড় ভাইদের কাছে তাদেরও বকা
খেতে হতো। সবাই খেতে খেতে টুকটাক গল্প করছে
তবে নিচু স্বরে। সিঁতারা চৌধুরী ছেলের প্লেটে খাবার
তুলে দিচ্ছে। হঠাৎ ব্যাথাতুর শব্দ শুনে সবাই চোখ
তুলে তাকাল শীতলের দিকে। শীতল ঠোঁট চেপে
ধরেছে। সিরাত তখন বললেন,
-‘কি রে দাঁতে পাথর পড়েছে নাকি?’

শীতল ঠোঁট থেকে হাত সরাতেই দেখে ঠোঁটে কামড়
লেগে রক্ত বেরিয়ে গেছে। এত রক্ত দেখে স্বর্ণ
বোনের দিকে পানি এগিয়ে দিলেও সিমিন শীতলের
পিঠে দুম করে কিল বসিয়ে দিলেন। নিজে নিজে
খেতে গিয়ে কে ঠোঁট কেটে ফেলে, কে! এখনও কি
ছোটো আছে? নাকি তাকে হাতে তুলে খাইয়ে
দেওয়ার বয়স আছে? এত তাড়াহুড়োয় খেতেই হবে
কেন? সব সময় এত কিসের চঞ্চলতা? সিমিন
মেয়েকে চাপা সুরে বকতে শুরু করলেন। এদিকে
ঠোঁটের তীব্র জ্বলন, অন্যদিকে কিল, এই দু'টোর
চাপে শীতল ঠোঁট ভেঙে কেঁদে ফেলল। সে কাঁদতে
কাঁদতে উঠতে গেলে তার হাত ধরে সিঁতারা থামিয়ে
দিলেন। ছোটো জা'কে বকলেন। সিমিনের এই
স্বভাবটা খুব খারাপ যেটাই হোক মেয়ে দু'টোকে
মারেন। বকেন। জায়ের বকা খেয়ে সিমিন কথা
বাড়াল না। নিজের ঐটো হাতটা ধুয়ে শীতলকে আগে
পানি খাওয়ালেন। রক্ত মুছে দেখলেন কতটুকু
কেটেছে। তারপর রান্নাঘর থেকে মধু এনে ঠোঁট
লাগিয়ে দিলেন। মাংসের ঝোলের ঝালটা কমে এলে
চোখের পানি, নাকের পানি এক করে করুণ দৃষ্টিতে

তাকিয়ে রইল আধ খাওয়া রোস্টের দিকে। ভীষণ
মজা হয়েছে রান্না। মোজা মা রান্না করেছে চোখ বন্ধ
করেই বলে দিতে পারবে সে। ইচ্ছে ছিল তিনটে
সাবাড় করার। কিন্তু কিছু খেতে পারে নি কেবল দুই
লোকমা ভাত মুখে পুরেছিল। তার আগেই কামড়
লেগে ঠোঁট কেটে গেল। ভর তুপুরে পেট পুরে সবাই
খেলো কিন্তু মেয়েটা কিছু খেতে পারল না দেখে
সিমিনের গলা দিয়েও খাবার নামল না। উনি দই,
মিষ্টি এগিয়ে গমগমে সুরে খেতে ইশারা করলেন।
বেশ খানিকটা কেটে ফুলে গেছে শীতলের নিচের
ঠোঁট। মায়ের কিল খেয়ে শীতল কিছু বলো সাহস
করল না। অল্প অল্প করে দই নিয়ে মুখে দিলো।
স্বর্ণের ফোনেটা সেই তখন থেকে বেজেই চলেছে।
সাইলেন্ট থাকায় ঘুমে বিভোর স্বর্ণ কিছুই টের পাচ্ছে
না। এতবার কল করেও স্বর্ণকে না পেয়ে কিয়ারা
এবার শখকে ফোন দিলো। শখ কিয়ারার নাম্বার
দেখে শীতলের হাতে ফোন ধরিয়ে দিয়ে নিজে পড়ায়
মন দিলো। শীতল ফোন কানে ধরে

শখের রুম থেকে বেরিয়ে ধীর পায়ে বেলকণির দিকে
এলো। কিয়ারার নাক টেনে কান্নার শব্দ পেতেই সে
ভ্রুঁ কুঁচকে জিঙেস করল,

-‘কি রে কাঁদছিস কেন? তোর ফ্যাঁচর ফ্যাঁচর কান্নার
শব্দ শুনতে কল করেছিস?’

-‘শীতল আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। কাঁদতে
কাঁদতে আমি শেষ। তূর্য’র সঙ্গে কেন এমন হলো,
কেন?’

একথা শুনে শীতল মস্তিষ্কে জোর খাঁটিয়ে মনে করার
চেষ্টা করল, তূর্য কে। এই নামের কাউকে চিনে
বলেও মনে পড়ছে না তার। তবে কিয়ারা কাঁদছে
মানে আপনজন হবে হয়তো। তাই সে স্বাভূগা দিতে
বলল,

-‘থাক কাঁদিস না। আমরা কেউই সারাজীবন বেঁচে
থাকার জন্য আসি নি। আমাদের সবাইকে মরতে
হবে।’

এদিকে শীতলের স্বাভূগার বাণী শুনে কিয়ারার কান্না
বন্ধ হয়ে গেল। সে নাক টানতে টানতে পাল্টা প্রশ্ন
করল,

-‘ তূর্য মরে নি রে শীতল। সে তিথির চোখের সামনে
অন্য কাউকে বিয়ে করে বাসর সেরেছে। ভাবতে
পারছিস কতটা কষ্টের?’-‘বাল। কে তূর্য, কে তিথি?
কার কথা বলছিস তুই? এমনিতেই মুড অফ
খবরদার বলছি মাথা খাবি না আমার। ক্লিয়ার কাট
কথা বল নয়তো দূরে গিয়ে মর। নিজের জীবনে সুখ
নেই ও আসছে অন্যজনের দুঃখের কাহিনি শোনাতে।’
শীতলের বিরক্তমাথা কথা শুনে কিয়ারা চুপসে গেল।
কান্নাকাটি অফ করে জানাল, সে কলেজ থেকে
ফিরেই কাজিন রিলেটেড উপন্যাস পড়ে শেষ
করেছে। উপন্যাসের নায়ক ভুল বুঝে আরেকজনকে
বিয়ে করেছে। নায়িকার সামনে বউ নিয়ে বাসরঘরে
দুকেছে। তিথি, তূর্য ছিল কাজিন।

মূলত বাড়ির কেউ জানত না তারা একে অপরের
ভালোবাসে। চমৎকার

একটি উপন্যাস। তবে উপন্যাসটি স্যাড ইন্ডিং।
বিচ্ছেদের ইন্ডিং মানতে না পেরে কিয়ারা কেঁদে
কেঁটে একাকার অবস্থা। এদিকে মন দিয়ে পুরো
কাহিনি শুনে শীতলেরও মন খারাপ হলো। সে

বলল,-‘ওটা আমিও পড়ব কাল দিয়ে যাস তো বইটা।’

-‘ আগামীকাল কলেজে যাবি? ‘

-‘না, সকালের দিকে আম্মুর সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যাব।’

-‘আচ্ছা। তাহলে বিকেলে আমি তোর বাসায় যাব।’

-‘শোন, তোর কাছে যতগুলো কাজিন রিলেটেড উপন্যাস আছে তুই সবগুলো নিয়ে আসবি। এই জনরার উপন্যাস খুব ভালো লাগে আমার।’-‘আচ্ছা। ‘

তারপর সে কথা বলে কল কেটে সামনে তাকাল। হঠাৎ তার মনে হলো সে ছাড়াও এখানে কেউ আছে। কিন্তু কে? কে তার কথা শুনছে লুকিয়ে লুকিয়ে? কি মনে করে সে পেছনে ঘুরতেই দেখে একটু দূরে শুদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে। চোখে শীতল চাহনি। যাহ্, এখন কি হবে? কি করে বলবে সে যা ভাবছে আদৌও সেইরকম কিছু নয়।ক’দিন ধরেই চাপা রাগের তোপে শুদ্ধর মনটা বিষিয়ে ছিল। ভেবেছিল শীতলকে আর কখনো শাষণ করবে না। মুখে বারণ করলেও গায়ে হাত তুলবে না। যে তার শাষণকে সব সময় বাঁকা

ভাবে গ্রহন করে, চাচাতো ভাই বলে যা তা বলে, তাকে শাষণ করার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু এ মেয়ে ভীষণ ঘাড়ত্যাড়া। সে যেন মুখিয়েই থাকে তাকে রাগিয়ে দেওয়ার জন্য। করেও তাকে রাগানোর মতোই কাজকর্ম। যেমন আজকে সকালে ফোন দিয়ে যা ইচ্ছে তাই বলল। কেন বলল, কি কারণে বলল, সেও জানে না।

তার অহেতুক কল ভালো মেজাজটা বিগড়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। সকালের ঘটনার পর ভেবেছিল এসেই দু'খাপ্পড় বসিয়ে দেবে। কান টেনে লম্বা করে ভদ্রতা জ্ঞানের শিক্ষা দেবে। কিন্তু খেতে বসে হঠাৎ ঠোঁট কেটে রক্তারক্তি হলো দেখে ভাবল আপাতত থাক। নিজে না দিক একটা শাস্তি তো পেলোই। তখন তার করা অপরাধের শাস্তি মওকুফ করলেও এখন হাতখানা নিশাপিশ করছে। অনবরত থাপড়াতে ইচ্ছে করছে। বে'য়া'দবির একটা লিমিট থাকা দরকার। বাসায় বাইরের গেস্ট'রা উপস্থিত রয়েছে। তারা যদি ভুলক্রমেও এসব শুনে, কি ভাববে? ফ্রেন্ডদের কানে গেলেও মজা নিতে বিন্দু পরিমাণ কার্পণ্যবোধ করবে না। বরং ওরা নিজ দায়িত্বে রটিয়ে

দেবে যা হওয়ার নয় সেসব কথা। শীতল আচমকা
শুদ্ধকে দেখে জোরপূর্বক হাসল। মাথা ঢুলকে তার
লম্বা বিনুনির নাড়াচাড়া করে কিছু বলার জন্য শব্দ
খুঁজল। কিন্তু কি বলবে বুঝতে উঠতে না পেরে
এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল,

-‘কলা খাবেন শুদ্ধ ভাই? বাবা এনেছে। কি যে মিষ্টি
খেতে।’

-‘তোর কেন মনে হলো আমি কলা খাওয়ার জন্য
দাঁড়িয়ে আছি?’

-‘হে হে, না মানে, আমি খাব তাই ভাবলাম
আপনাকেও সাধি।’

-‘তোর বাপ এনেছে তুই বেশি করে খা।’

-‘আচ্ছা, গিয়ে খাই তাহলে।’

-‘ফোনে কি যেন বলছিলি?’

শীতল দু’টোক গিলল। আড়চোখে দেখেও নিলো শুদ্ধ
রাগান্বিত চাহনিতে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে ঠাস্
করে মেরে বসবে। সেও বুঝল ছাড় পাবে না। তাই
কৈফিয়ত দেওয়ার সুরে আমতা আমতা করে
বলল,-‘উ.. উপ.. উপন্যাসের কথা বলছিলাম।’

-‘আমি তোঁর কাজিন হই, রাইট? উপন্যাস পড়ে কি হবে? আমি সিঙ্গেল, চল প্রেম করি?’

-‘না।’

-‘না কেন? আমি কোন দিক থেকে কম? কাজিন লাভ যখন এতই ভালো লাগে তাহলে সমস্যা কি? কি ভেবেছিস, আমার সঙ্গে প্রেম করলে তোকে লিপস্টিক কিনে দিতে পারব না?’

শীতল মুখ কাচুমাচু করে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে। শুদ্ধর কথার জবাব খুঁজতে ব্যস্ত সে। তবে মুখ ফুটে না বললেও সে মনে মনে জবাব ঠিকই দিলো,-‘আপনার মতো হিটলার প্রেমিক চাই না আমার। আপনি এমন এক পুরুষ যাকে ‘ভালোবাসি’ বললেও থাপ্পড় দিয়ে বলবেন, বে’য়া’দব, বললি কেন ভালোবাসি? ভালোবাসা বলে বেড়ানোর জিনিস? এম্ফুণি কান ধর! ধর বলছি, নয়তো চ্যালাকাঠ দিয়ে মেরে তোঁর পা ভাঙব আজ।’

মনে মনে চিৎকার করে একথা বললেও মার খাওয়ার ভয়ে মুখে বলা হলো না। শীতলকে চুপ থাকতে দেখে শুদ্ধ এককোণে রাখা বুল ঝাড়া ঝাড়ুটা নিতে গেলে

শীতল বেলকনির সঙ্গে স্টেটে দাঁড়াল। চোখ, মুখে
তীব্র ভয়। সে এবার ভয়ে ভয়ে জবাব দিলো,
-‘কাজিন রিলেটেড বই দূর জীবনেও উপন্যাসের
নাম মুখে নেবো না।’

-‘কেন, তোর না ভালো লাগে?’

-‘কিছুক্ষণ আগেও ভালো লাগত। এখন আর ভালো
লাগছে না। ওসব পঁচা বই। পঁচা জিনিস থেকে দূর
থাকা উত্তম।’

একথা বলতেই সাইন তখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসে
শুদ্ধর পাশে দাঁড়াল। শীতলের রিমান্ডে চলছে দেখে
হাসতে হাসতে বলল,-‘এখন রুমে যা। শুদ্ধর ফ্রেন্ডরা
এদিকে আসছে।’

কয়েকজোড়া পায়ের পদধ্বনি কানে আসতেই
শীতলের কিছু বলারও সুযোগ হলো না, দ্রুত স্থান
ত্যাগ করল। সব সময় তার সঙ্গেই এমন হয়। বলতে
যায় এক মানুষ বুঝে বসে থাকে আরেক। করতে যায়
এক ঘটিয়ে বসে থাকে আরেক। জীবনটাই বেদনার।
তাকে যেতে দেখে সাইন বলল,

-‘ছোটো মানুষ, কি বলতে কী বলেছে, বাদ দে।’

-‘কথার ধার দেখে কিন্তু মনে হয় না ছোটো মানুষ।’

-‘ওইটুকু ধার না থাকলে কি মনে হবে চৌধুরী বাড়ির মেয়ে? এবার বল, ল্যাবের কাজ কতটুকু এগোলো? টাকা থেকে একেবারে ব্যাক করবি কবে?’-‘ কাজ এখনো একটু বাকি আছে। কাজের উপরে ডিপেন্ড করছে সব।’

এসব বলতে বলতে সায়ন পেতে রাখা চেয়ারে বসল।
এইটুকু পথ হেঁটে

আসতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে। ক্ষতস্থানে টান পড়েছে।
এ অবস্থায় বাইরে যেতেও পারে নি ক’দিন ধরে।
দলের ছেলেপুলেরা ওদিকে আরেক কান্ড ঘটিয়ে বসে
আছে। যত ব্যথায় থাকুক, আজ সন্ধ্যায় একটু বের
হাতেই হবে। শুদ্ধ নিজেও ভাইয়ের পাশে বসে
জানাল ল্যাবের কাজ সম্পর্কে। চৌধুরী নিবাসের উল্টো
পথ ধরে এগোলেই একটা নির্জন রাস্তার দেখা মিলে।
রাস্তার দু’ধারে গাছ আর জঙ্গল। সেখানে মাটির নিচে
তৈরা করা হচ্ছে শুদ্ধর পারসোনাল ল্যাব। সেখানে
থাকবে মানব কল্যাণে কার্যরত নিত্য নতুন আবিষ্কার।
বিদেশিরা মূলত এসেছেই ল্যাব পরিদর্শন করতে।
কাজ প্রায় শেষের দিকে। যদিও এ ব্যাপারে সায়ন
ছাড়া বাড়ির কেউই তেমনভাবে জানে না কারণ

ল্যাবটা সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রেখে তৈরি করা হয়েছে।
নির্জন স্থানে এমন ভাবে কাজ করা হচ্ছে কেউ
ক্ষুণ্ণক্ষরেও টের পাবে না ল্যাব রয়েছে। শুদ্ধ টাকা
থেকে খুব তাড়াতাড়ি ব্যাক'ও করবে। কারণ এক
নতুন আবিষ্কারের ভূত মাথায় চেপে বসেছে। যতক্ষণ
না সেই কাজ হাত দিবে তার স্বত্ত্বি মিলবে না,
কিছুতেই না।

দুই ভাইয়ের আলোচনার মাঝেই কামরান, অর্ক,
হাসান এসে ধপ করে বসল। কামরান ফস ফস করে
জানাল অর্ক থাকলে সে আর থাকবেনা। বন্ধুর কথা
শুনে শুদ্ধ ভ্রুঁ কুঁচকে পকেট হাতড়ে একশ টাকার
নোট বের করে দিয়ে বলল,-‘ধর।’

কামরান টাকা ধরে হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।
তাকে এভাবে তাকাতে দেখে শুদ্ধ বলল,
-‘বসে রইলি যে, যা।’

-‘আমি রাগ করে বললেই পারি তাই বলে সত্যি সত্যি
চলে যেতে বলবি? এই তোর বন্ধুত্ব?’

-‘ বন্ধু শখ করে একটা ইচ্ছে প্রকাশ করল। আমিও
তার ইচ্ছেকে সম্মান দেখালাম। এখানে ইমোশনাল
হওয়ার কি আছে?’-‘তাই তো, তাই তো, তোর বন্ধু

আমাকে কুত্তার দৌড়ানি খাওয়াল। আমি আর একটু হলে পটল তুললাম সেসব কিছুই না। সাধারণ একটা কথা বললাম তাতেই..... যাহ্ শালা, তোদের কারো সঙ্গেই বলব না কথা।’

শুদ্ধ এবার অর্কের দিকে তাকাল। কে বলবে এই ছেলেটা সবাইকে খোঁচা মেরে বেড়ায়? এই যেমন, কামরানকে কুত্তার দৌড়ানি খাইয়ে কি সুন্দর গোবেচারা মুখ করে তাকিয়ে আছে। চেহারাখানা দেখে যে কেউ বলবে ভাজা মাছটি উল্টো খাওয়া জানে না। তাকে তাকাতে দেখে অর্ক দাঁত কপাটি বের করে বলল,

-‘আমি কিছু করি নি ভাই। পুরো ঘটনাটা শুন, রাস্তার ধারে একটা লাল কুকুর শুয়ে ছিল। আমি শুধু পেছন থেকে তার ইয়েতে সুড়সুড়ি দিয়েছি। কিন্তু কুকুরটা আমাকে দৌড়ানি না দিয়ে কামড়ানোর পেছনে ছুঁটতে শুরু করল। এখানে আমার কি দোষ? আমি কি কুকুরকে বলেছি ওর পেছনে যা।’ অর্কের বলার ভঙ্গিতে সায়ন হো হো করে হেসে উঠল। হাসান মিটিমিটি হাসতে হাসতে বলল,

-‘ আর একটু হলেই কামরানের বিয়ের সাধ মিটে যেতো। ছোটো বেলায় তুই মানুষকে কামড়ে বেড়াতি কুকুরটা বোধহয় তারই শোধ নিলো।’

একথা বলতে না বলতেই কামরান এক ঘুষি বসিয়ে দিলো হাসানের বাহু বরাবর। নামের জন্য সবাই তাকে পঁচায়, সবাই। বন্ধুরা তো কথায় কথায় খোঁচায়। এখনো অর্ক, হাসান আর কামরানের তর্ক-বিতর্ক চলছে। আর

শুদ্ধ বিরক্ত মুখে তাকিয়ে রইল। তিনজনে সারাক্ষণ মেয়ে মানুষের মতো সামান্য ব্যাপারেও ঝগড়া করে। ঝগড়া থামাতে গেলে তার সঙ্গেও তুমুল ঝগড়া বেঁধে যায়। পরে নিজেরা সরি বলে দাঁত বের হাসে। লজ্জাও বলে কিছু নেই এদের। এরা শুধু কাজের সময়টুকু সিরিয়াস থাকে। সেই সময় তারা সাইন্টিস রুপে ফিরে আসে। দূরদর্শিতা, গম্ভীরতা, বুদ্ধিমত্তা তাদের চেহারায় স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। দুই বিদেশী স্যান্ডি, জুলিথও এদের সঙ্গে মিশে বাদর তৈরি হয়েছে। সাইন চুপ করে এতক্ষণ এদের কথা শুনছিল। শুদ্ধ এর আগে কখনো বাসায় বন্ধুদের আনে নি। এবারও প্রথম। আনার

যথাযথ কারণও রয়েছে বটে। প্রতিটা পেশায় একজন শিক্ষাগুরু থাকে,উনার থেকে হাতেখড়ি হয় সব কাজের। এরপর শিষ্যরা যখন শিখে যায় তখন তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয় নিজেরা কিছু করে দেখানোর আশায়।

বিগত পাঁচ বছরে তারা শিখেছে অনেক কিছু এবার তাদেরও কিছু করে দেখানোর পালা। নিজেদের আবিষ্কার দিয়ে নিজেদের নাম তৈরি করার পালা।

হঠাৎ সায়নের ফোন বেজে উঠল। সে কল রিসিভ করে হ্যালো বলতেই শোনা গেল আহনাফের গলা। আহনাফ দু'একটা কথা বলে তার বাবার হাতে ফোনটা ধরিয়ে দিলো কথা বলার জন্য। সায়ন উনাকে বিনয়ীসুরে

সালাম দিয়ে কুশল বিনিময় করল। ভদ্রলোক অহেতুক কথা না বাড়িয়ে সরাসরি আসল প্রসঙ্গে এলো,

-‘সায়ন বাবা বলছিলাম যে, বোনের বিয়ে দেবে না?’

-‘আমার তো তিনটে বোন। কার কথা বলছেন আক্কেল?’

-‘শখ মায়ের কথা বলছি।’

-‘বোন বড় হয়েছে বিয়ে তো দিতেই হবে। কিন্তু হঠাৎ একথা?’

-‘আহনাফকে তো তুমি ছোটো থেকেই চেনো। পাত্র হিসেবে কেমন এটাও জানো। ওর জন্যই শখের হাতটা চাইছি বাবা।’-‘আমার বোনের ইচ্ছে ডাক্তারী পড়ার। আমরাও চাই সে ডাক্তার হোক। তাই ওর বিয়ের কথা ভাবছি না আপাতত।’

-‘ওর পড়া নিয়ে আমাদের বাড়ি থেকে কোনো সমস্যা হবে না এইটুকু গ্যারান্টি দিতে পারি।’

-‘ঠিক আছে, আমি বাসায় সবাইকে জানিয়ে আপনাকে জানানাব।’

-‘ঠিক আছে, অপেক্ষায় রইলাম।’

-‘হুম।’

সায়ন কলটা কেটে শুদ্ধর দিকে তাকাল। শখের বিয়ের প্রস্তাব এসেছে বুঝতে বাকি নেই কারো। তারপরও সায়ন শুদ্ধকে আহনাফের ব্যাপারে যতটুকু বলা যায় বলল। শুদ্ধ আহনাফকে ভালো করে চেনে। ভদ্র ছেলে।

দেখা হলেই কথা হয়। অবিবাহিত বোনরা বাসায় থাকলে প্রস্তাব আসবে স্বাভাবিক। তবে ছেলে যতই

ভালো হোক বোনের অমতের বিরুদ্ধে তারা যাবে না।
কারণ বোনরা পানিতে পড়ে নেই যে, প্রস্তাব এলেই
বিয়ে বিয়ে করে লাফাতে হবে। তাছাড়া তাদের
তিনবোন তিন ধরনের। খুব ছোটো থেকে শখ খুবই
নরম মনের। কারো কান্না দেখতে পারে না সে।
কাউকে কাঁদতে দেখলে নিজেও কাঁদে। আর স্বর্ণ খুব
চাপা স্বভাবের। মনের কথা

কাউকে বুঝতে দেয় না। হোক সেটা কারো প্রতি তীব্র
রাগ বা অভিমান। বাকি রইল শীতলের কথা, সে যেন
খোলা আকাশের মুক্তমণা পাখি। মুক্তমনে উড়তে
পছন্দ করে সে। যেই তাকে উঠতে নিষেধ করে সে
তার জাত শত্রু। চোখের বিষ। তার জলজ্যন্ত
উদাহরণ, শুদ্ধ।

বিকেলের দিকে শুদ্ধ বন্ধুদের নিয়ে কোথায় যেন
গেল। সায়নও কাজের কথা বলে গাড়ি নিয়ে বের
হলো। শীতলের বাবা শাহাদত চৌধুরীর ছুটি শেষ।
দুপুরের পরপর উনি চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে
পড়েছেন। তিন মাস পর হয়তো আবার আসবে।
বাসায় ছেলেরা কেউ নেই তাই শীতল শখ আর
স্বর্ণকে বাগানে এলো। ঘাসের উপরে খালি পায়ে

হাঁটল। ফুলের বাগানে পানি দিয়ে দোলনায় বসতেই
সাম্য কোথায় থেকে যেন লাফাতে লাফাতে এসে
তিনটে গোলাপ ছিঁড়ে তিন বোনের কানে গুঁজে দিয়ে
ধপ করে বসল শখের কোলের উপর। তারপর
আহ্লাদী সুরে বলল,

-‘আপু চলো বউচুরি খেলি?’-‘ ভাইয়ারা বাইরে গেছে
যে কোনো সময় চলে আসতে পারে। অন্যদিন খেলব
ভাই।’

-‘প্লিজ!’

-‘বউচুরি না অন্যকিছুর নাম বল।’

-‘তাহলে চলো কানামাছি খেলি?’

-‘আচ্ছা চল।’ হঠাৎ শীতলের মনে পড়ল দুপুরে
পেয়ারা পেড়েছিল সেগুলো রান্নাঘরে পড়ে আছে।
শীতল দৌড়ে গিয়ে রান্নাঘর থেকে পেয়ারা এনে
সবাইকে দিলো। পেয়ারা খেতে খেতেই খেলার প্রস্তুতি
নিলো। শখের দুচোখ বেঁধে দেওয়া হলো। সাম্য,
সৃজন, শখ, স্বর্ণ, শীতল খেলায় ব্যস্ত। তারা শখকে
কাতুকুতু দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। শখ বন্ধ চোখে তাদের
খুঁজছে। খেলতে খেলতে খিলখিল করে হাসছেও
তারা। সিঁতারা, সিমিন, সিরাতও এসে দাঁড়িয়েছেন

বাগানে। তিন জা মিলে সবজি বাগান থেকে সবজি তুলতে তুলতে গল্প করছে। টাটকা সবজিগুলো রান্না হবে আজকে রাতে। তখন চৌধুরী নিবাসের গেট পেরিয়ে পুলিশের গাড়ি এসে থামল। ধপধপ করে কয়েকজন পুলিশ গাড়ি থেকে নেমে স্বর্ণকে ঘিরে ধরে বলল,

-‘ইউ আর আন্ডার এরেস্ট সুবর্ণ চৌধুরী স্বর্ণ।’ হঠাৎ চৌধুরী বাড়ির মূল ফটকে পুলিশের গাড়ি দেখে স্বর্ণ, শখ, সাম্য, সৃজন দাঁড়িয়ে গেছে। তাদের চোখে-মুখে বিস্ময়। শুধু শখের চোখ বাঁধা থাকায় সে হাত বাড়িয়ে খুঁজে যাচ্ছে দুট্টু ভাই-বোনদের। পুলিশ দেখামাত্র শীতল চট জলদি শখের চোখের বাঁধন খুলে বিস্ময়বরা কণ্ঠে বলল, ‘এই আপু ওই দেখ পুলিশ!’ শীতলের কথা শুনে শখ ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে দেখে সত্যি সত্যিই চৌধুরী নিবাসের মূল ফটক পেরিয়ে পুলিশের গাড়ি থেমেছে। কয়েকজন পুলিশ ধপাধপ পা ফেলে তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাদের পরখ করে নেইমপ্লেটে লেখা ইনসান নামের পুলিশটি অত্যন্ত রুক্ষকণ্ঠে বলল,-‘ইউ আর আন্ডার এরেস্ট সুবর্ণ চৌধুরী স্বর্ণ।’

উনার কথা শুনে ভাই-বোনের বিশ্বয়ের মাত্রা চূড়ান্ত
লেভেল পার করল।

তারা একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। কি
বলবে খেই হারিয়ে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে।
সায়ন রাজনীতি করলেও পুলিশ কখনো চৌধুরী
নিবাসে প্রবেশ করে নি। আর না পুলিশের জেরায়
পড়তে হয়েছে তাদের। অথচ স্বর্ণ কি এমন করেছে
যে পুলিশ এসেছে চৌধুরী বাড়িতে?

পুলিশের কথার শুনেও স্বর্ণের মধ্যে কোনো হেলদোল
দেখা দিলো না। সে আপনমনে পেয়ারা চিবাতে ব্যস্ত।
ভঙ্গিমা দেখে মনে হচ্ছে সে জানত এমন কিছুই
হবে। তাকে ভাবলেনসহীন দেখে ইনসান নামের
পুলিশটি ত্যাছড়া হেসে বলল,-‘চলুন, তাহলে যাওয়া
যাক?’

-‘কোথায় যাব?’

-‘আপনাকে শাশুড়বাড়ি নিয়ে যেতে আমরা আসব না
নিশ্চয়ই?’

-‘আশাও করি নি।’

-‘কথা বাড়াবেন না, চলুন।’

-‘আগে প্রমাণ করুন আমি অপরাধী তারপর যাব।’

একথা বলে স্বর্ণ ঘাসের উপর বসল। হাতের
আধখাওয়া পেয়ারার দিকে তাকিয়ে বিরক্তমুখে
শীতলকে বলল,

-‘কি পেরেছিস এটা? এত কস্টা কেন?’

শীতল জবাব দিলো না। হতবাক হয়ে একবার
তাকাচ্ছে পুলিশের দিকে একবার স্বর্ণের দিকে।
পুলিশ ওকে থানায় নিয়ে যাওয়ার কথা বলছে অথচ
এ মেয়ে পুলিশকে দাঁড় করিয়ে রেখে পেয়ারার
ভালো-মন্দ বিচার করছে। স্বর্ণের মতিগতি দেখে
ইনসানের বিরক্তির মাত্রা বাড়ল। একেতো
সারাদিন বিশ্রামের সুযোগ পায় নি। মেজাজও চটে
আছে। এখন আবার এই মেয়ে নখরা শুরু করেছে।
মন তো চাচ্ছে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে। কিন্তু
আদেশ আছে এই মেয়ে চৌধুরী বাড়ির মেয়ে। তাকে
যেন

বিন্দুমাত্র অসন্মান করা না হয়। তার উপরে সে নাকি
মেজরের মেয়ে।

ইনসান বিরক্তির মাত্রা চেপে পুনরায় বলল,-‘ দে
দে.খুন..

-‘ইচ্ছে করছে না।’

-‘কি? কি ইচ্ছে করছে না?’

-‘যা দেখাতে চাচ্ছেন সেটা দেখতে।’

স্বর্ণের কথা আর পুলিশের মুখে দেখে শখ মুখ টিপে হাসল। এই পুলিশটা যে রাগ চেপে ভদ্রতা দেখাচ্ছে সেটা তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে। এদিকে বাড়ির পেছন দিকে পুঁইশাকের লতা বেড়ে ওঠার তিন জা মাচা করে পুনরায় বাগানের দিকে এসে পুলিশের গাড়ি দেখে অবাক হলেন। তিনজনই দ্রুতপায়ে এগিয়েও গেলেন। স্বর্ণের মুখের সামনে হ্যানকাপ ঝুলিয়ে তাকে এরেস্ট করার কথা বলায় সিঁতারা চৌধুরীর বললেন,

-‘ওর অপরাধ? ‘হঠাৎ মহিলা কণ্ঠ শুনে তারা পেছনে তাকিয়ে তিনজন মহিলাকে দেখে বুঝল উনারা চৌধুরীদের সহধর্মিণী। পরনের পোশাকেও আভিজাত্যের ছাপ। ইনসান উনাদেরকে যথেষ্ট সন্মান দেখিয়ে জবাব দিলো,

-‘উনি গতকাল দুপুরে সন্মানিত এক ব্যক্তিকে থাপ্পড় মেরেছে। যা ইচ্ছে তাই বলে অপমান করেছে। সেই ভদ্রলোক আজ মানহানির কেস ফাইল করেছে। ‘

কাকে থাপ্পড় মেরেছে স্বর্ণ? কে সেই লোক? কেনই
বা মেরেছে? সিঁতারা

এসব জিজ্ঞাসা করার আগেই ফোনের টোন বেজে
উঠল। শুদ্ধর নাম্বার দেখে উনি কল রিসিভ করতেই
শুদ্ধ বলল,

-‘ পুলিশকে ফোনটা দাও কথা বলি।’

সিঁতারা চৌধুরী ছেলের কথা শুনে ফোন ইনসানের
দিকে বাড়িয়ে দিলে ইনসান ফোনটা নিয়ে কানে
ঠেকাল। শুদ্ধর বলা কোনো কথা শোনা না গেলেও
পুলিশের মুখভঙ্গি থমথমে হয়ে গেল। চোয়াল শক্ত
করে শুদ্ধর কথা শুনে গেল। তারপর ফোন ফিরিয়ে
দিয়ে সেভাবে এসেছিল তারা সেভাবেই চলে গেল।
না বাড়তি কথা বলল আর না কাউকে আর কিছু
বলার সুযোগ দিলো। পুলিশকে চলে যেতে দেখে
সবাই স্বর্ণকে ঘিরে ধরল ঠিকই কিন্তু কিছু বলার
আগেই দ্রুত গতিতে সাইনের গাড়ি ঢুকল। সাইন গাড়ি
থেকে নেমে পুলিশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কয়েক
মিনিটবলে বাগানে এসে দাঁড়াল। ভাই-বোন এবং মা-
চাচীদের দেখে গম্ভীরতাকে মুছে ফেলে ভ্রঁ কুঁচকে
বলল,

-‘এই তোরা পেয়ারা কোথায় পেলি? আমাকেও দে দেখি একটা চিবায়।’

শীতল সায়নের কাছে থেকে আগেই সরে বসল। তারপর তার আধখানা পেয়ারার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা ভেবে দাঁত বের করে হেসে বলল,

-‘আমার পেয়ারা খুব টক শখ আপুরটা নাও।

অতঃপর পেয়ারা কাড়াকাড়ি করতে লেগে গেল সায়ন। সিঁতারা চৌধুরী বার বার মূলত ঘটনা জানতে চাইলেও একথা ওকথা বলে এড়িয়ে গেল। ছেলের এমন গা ছাড়া ভাব দেখে উনারা ধরে নিলেন গুরুতর কিছু নয়। গুরুতর কিছু হলে সায়ন নিশ্চয়ই দাঁত বের করে হাসত না। স্বর্ণ সায়নের চালাকি বুঝেও কিছু বলল না। ভাই-বোনদের দুষ্ট মিষ্টি খুনশুটিতে মেইন টপিকটা আপাতত চাপা পড়ে গেল। রাত তখন কয়টা হবে, এই একটার কাছাকাছি বোধহয়। নির্জন রাস্তায় এক টগবগে যুবককে মাটির সঙ্গে চেপে ধরে রেখেছে কয়েকজন ছেলে।

শোয়ানো ছেলেটার হাত-পা দড়ি দিয়ে বাঁধা। চোখে ভয়। গোঁ গোঁ শব্দে বাঁচার আকুতি ছেলেটার চোখে-মুখে। কিছুক্ষণ আগেও দাপট দেখিয়ে মা-মাসি তুলে

বি'শ্রী বি'শ্রী গালি ছুঁড়েছে। একজনকে ঘুষি মেরে
রক্তাক্ত করেছে। এখন নিজেই বাঁচার ভয়ে প্রাণ ভিক্ষা
চাচ্ছে। এজন্যই বোধহয় প্রবাদে প্রচলিত, পিপিলিকার
পাখা গজায় মরিবার তরে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে বাইকে করে সায়ন উপস্থিত হলো।
পরনে থ্রি কোয়ার্টার কালো প্যান্ট ও সাদা টি-শার্ট।
সে শিষ বাজাতে বাজাতে বাইক স্ট্যান্ড করে চারি
ঘুরাতে ঘুরাতে তাদের কাছে এসে থামল। চারদিকে
অন্ধকার।

এদিকে রাতের বেলায় গাড়ি ঘোড়া আসে না বিধায়
জায়গাটা সুনশান।

সায়ন খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে ছেলেদের তাড়া দিয়ে
ধারালো ছুরি তুলে নিলো। ছুরিটা উল্টো পাল্টে দেখে
ধার পরখ করে নিলো। সব ঠিকঠাক দেখে সন্তুষ্টির
সুরে বলল,-'ভালোই ধার আছে। আমার এনার্জি কম
লস হবে।'

সায়নের ইশারা পেয়ে ছেলেগুলো ওই ছেলেটাকে
আরো শক্ত করে চেপে ধরতেই সায়ন ছেলেটার গাল
ধরে শান্ত কণ্ঠে বলল,

-‘আমার বাড়ির মেয়ের রেট জানতে চেয়েছিলি
শুনলাম। কাজটা ভালো করিস নি। এসব পাগলামি
কেউ করে রে পাগলা?’

-‘উম, উম।’

-‘এই ওর মুখটা খুলে দে মরার আগে কি বলে শুনি।’
নানু নামের একটা ছেলে ওই ছেলেটার মুখ খুলে
দিতেই ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে বলল,

-‘ভাই, ভাই আর করব না ভাই, মাফ করে দেন
ভাই।’

-‘ভাই না, বাপ ডাকলেও ছাড় পাবি না তুই। তোর
মরার টিকেট অলরেডি কনফার্ম হয়ে গেছে।’

-‘আমি আপনার বোনের পা ধরে মাফ চাইব ভাই।
আমার অপরাধ আমি স্বীকার করব। শু..শুধু এবারের
মতো জান ভিক্ষা দেন ভাই।’-‘মাফ করতাম যদি
তোর নোং’রা কথা শুনে আমার বোনটা না কাঁদত।

মাফ করতাম যদি আমার মাকে নিয়ে গালি না দিতি,
মাফ করতাম যদি আমার বোনকে তুলে আনার জন্য
ভুয়া পুলিশ না পাঠাতি। কি ভেবেছিস পুলিশের
পোশাকে গেলে আমরা আমাদের বোনকে তোদের
হাতে তুলে দিতাম? আর তোরা আমার আদরের

বোনকে খুবলে খুবলে খাবি। এত সোজা? নারে, শুয়োরের বাচ্চা, না। চৌধুরী নিবাসের মেয়েদের গায়ে কলঙ্ক লেপ্টানো এত সোজা না! গু খেয়ে রাজনীতির মাঠে নামি নি রে।’

একথা বলে সায়ন ছুরি দিয়ে ছেলেটার গলায় আকিঁবুকিঁ করতে করতে

ফিসফিস করে বলতে শুরু করল,-‘তোকে একটা সিক্রেট বলি শোন। আমরা দু’ভাই, আমি সায়ন, আমার ভাই শুদ্ধ। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের কোনো মিল নেই। না দেখতে আর না স্বভাবে। যা আছে সবই অমিল। আমরা দু’জন দুই মেরুর মানুষ। আমাদের রক্ত যেহেতু এক, এক বাবা-মায়ের সন্তান, যদি কিছু মিল না থাকে রক্তের বদনাম হয়ে যাবে। তাই কষ্টে সৃষ্টে একটা মিল খুঁজে বের করেছি আমরা। সেটা কি জানিস? আমরা দু’জনেই হাইড এ্যান্ড সিক খেলতে এবং খেলাতে ভালো পারি। দক্ষ প্লেয়ার বলতে পারিস।’

এইটুকু বলতে সায়ন থামল। একা একা ঠোঁট টিপে হাসল। তারপর নক্ষত্র ভরা আকাশের দিকে একবার

তাকিয়ে এদিক-ওদিকে করে ঘাড় ফুটাল। তারপর
পুনরায় বলল,

-‘আমি ভালোর মুখোশ পরে সবার কাছে ভালো হয়ে
চলার চেষ্টা করি। তবে রেগে গেলে অন্য অন্যকথা।
আর শুদ্ধর ভেতরেও যা বাইরেও তা।ও এমন এক
ছেলে নিজের বাপ/ ভাইয়ের পেছনে বাঁশ দিয়ে
জিজ্ঞাসা করে, ‘ব্যথা পেলে নাকি?’ তাহলে একবার
ভাব সে কতটা ক্রেজি। আমি তোকে ছেড়ে দিলেও
শুদ্ধর হাতে পড়তে হবে। ওর হাতে পড়লে সহজে
মারবে না। তবে তোর বলিষ্ঠ দেহখানা রিসার্চের
কাজে লাগাবে। আমার ভাই অপছন্দের কাউকে ধীরে
ধীরে মারতে পছন্দ করে। আর ধীরে ধীরে মরলে
কষ্ট হবে বেশি। এরচেয়ে আমার হাতে মরে যা, কথা
দিচ্ছি, আমি কম কষ্টে মারব তোকে।’

একথা বলে সায়ন ছেলেটাকে কিছু বলার আগেই
গলায় ছুড়ি চালিয়ে দিলো। পাক্কা হাত, একটুও কাঁপল
না। ধারালো ছুরিতে এবড়োখেবড়োও হলো না। ঠিক
যেভাবে কুরবানির পশুকে জবাই করা হয় ঠিক
সেভাবেই জবাব করল সায়ন। তার পরনের জামা

কাপড় লাল রক্তে রঞ্জিত। চোখ মুখে উচ্ছ্বাস। ঠোঁটে
তৃপ্তির হাসি। ছেলেটার গলা দেহের সঙ্গে খানিকটা
লাগিয়ে রেখে সায়ন বসা থেকে উঠে দাঁড়াল। ছেলেটা
পিচ ঢালা রাস্তায় ধরফড় করছে। গলা দিয়ে গোঁ গোঁ
শব্দ বের হচ্ছে। গলার ফাঁক গলিয়ে গলগল করে
রক্তের স্রোত বইছে। কয়েক মিনিট ছেলেটা কাঁটা
মুরগির মতো ছটফট করতে করতে একটা সময়
থেমে গেল। চোখ খোলা রাখা অবস্থায় তার প্রাণপাখি
দেহ ত্যাগ করল। সায়ন পরনের টি-শার্টের দিকে
তাকিয়ে বিরক্ত হলো। রক্ত মাখা হাতে টি-শার্টটা
ঝেড়ে ঝেড়ে মুখে বলল,-‘ধুর বাল, জা’নো’য়া’রে’র
র’ক্তে শীতলের দেওয়া সাধের টি-শার্টটাই নষ্ট করে
ফেললাম।’

একথা বলে মুখে বিরক্তিকর শব্দ করে নান্নুর হাতে
ছুরিটা দিয়ে বাইকে চেপে বসল। উপস্থিত
ছেলেপুলেরাই লা’শ গায়েব করতে ওস্তাদ। আলাদা
করে কিছু বলতে হবে না তাদের। তবে রাজনীতিবিদ
জাহিদ হোসেনের

একমাত্র ছেলে অংকনকে মনমতো শান্তি দিতে পেরে
মেজাজ ফুরফুরে। খুব শান্তি লাগছে। মনে হচ্ছে
পৃথিবীটা এত রঙিন কেন? সুন্দর কেন?

সে নির্জন রাস্তায় বাইকের গতি স্বাভাবিক রেখে শিষ
বাজাতে বাজাতে প্রফুল্ল সুরে গান ধরল,
কাছে আইসো, আইসো রে, বন্ধু, প্রেমের কারণে
ভালোবাইসো, বাইসো রে, বন্ধু, আমায় যতন!
‘পরেরদিন সকালে, বন্ধুদের বিদায় জানিয়ে কেবলই
এসে বসেছে শুদ্ধ।

ডায়নিং টেবিলের চেয়ারে বসে তিনবোন গুজরগুজর
করছে। আজকে সরকারী ছুটি বিধায় সবাই বাসাতেই
আছে। শুদ্ধ সোফায় বসে সামনের সেন্টার টেবিলে
থাকা এসির রিমোট নিয়ে এসি অন করল। গরমে
জান যায় যায়। সে এখনো তাকে খেয়াল করি নি
হয়তো। কাউকে ডেকে পানি চাইলেও শুনতে পাবে
না। কারণ সাম্য সাউন্ড বক্সে ফুল ভলিউমে গান
ছেড়েছে। যেন এটা বিয়ে বাড়ি। হঠাৎ মায়ের
বকুনিতে সে গান বন্ধ করে ফুটবল খেলতে চলে গেল
বাগানে। সৃজনও সেখানেই আছে। গান থামায়
সকলের কান মাথা যেন বাঁচল। এইদিকে শীতল,

শখ, স্বর্ণকে লাল শাক বাছতে দিয়ে গেছেন সিরাত।
তিনজন বাছতে বাছতে গল্প করছে। হঠাৎ কি ভেবে
শীতল রান্নাঘরে থাকা সিঁতারা চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে
বলে উঠল,-‘ওহ বড় মা শুদ্ধ ভাইয়ের বিয়ে দিবে
না?’

-‘দিবো। ভালো মেয়ের সন্ধান পেলে খোঁজ দিস।’

-‘খোঁজ আছে। কিন্তু তোমার ছেলের বউ টিকবে না
বিয়ে দিয়ে আর কি করবা? বরং ভাইয়ার বিয়ের
চিন্তা বাদ দিয়ে, অহেতুক টাকা-পয়সা খরচ না করে
ওই টাকাগুলো আমাকে দাও ট্যুর থেকে ঘুরে আসি।’
শীতলের কথা শুনে সিমিন এবার খ্যাক করে উঠে
ধমকে বললেন,

-‘এ আবার কেমন কথা? বড় ভাইকে নিয়ে এভাবে
কথা বলে? দিন দিন বে’য়া’দ’বের ধাড়ি হচ্ছে
একদম।’

-‘আম্মু, পুরো কথা না শুনে শুধু শুধু বকবে না। শুদ্ধ
ভাইয়ের বউ টিকবে না কারণ শুদ্ধ ভাইয়ের সমস্যা
আছে।’

এবার সিঁতারা, সিরাত, সিমিন একে অপরের মুখ
চাওয়া-চাওয়ি করল। এ মেয়ে সমস্যা বলতে কি

বোঝাতে চেয়েছে? উনারা যা ভাবছেন তাই?তারমানে সমস্যার কারণে শুদ্ধ, সায়ন বিয়ে করতে রাজি হয় না?সমস্যা থাকতেও পারে তাই বলে দু'জনেরই? এ আবার কেমন কথা? কই আগে কখনো শুনেছি নি তো। শীতল চঞ্চল, কিন্তু সে না জেনেশুনে আন্দাজে কথার বলারও মেয়ে না। তাও আবার শুদ্ধকে নিয়ে। কারণ শুদ্ধকে নিয়ে ভুল বকলেই তার কপালে মাইর নিশ্চিত। তাই তার কথায় গুরুত্বের সঙ্গে নিলেন উনারা। অতঃপর তিন জা নিজেরা গুজগুজ করে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে শীতলের কাছে এসে বললেন,-‘হ্যারে মা তুই জানলি কিভাবে শুদ্ধর সমস্যা আছে?’

-‘সকাল থেকে ডান হাত লুকাচ্ছে টাকা আসবে বোধহয়।’

-‘আচ্ছা টাকা দেবো, এখন বল।’

-‘ভাইয়ার বন্ধুরাই বলাবলি করছিল। ভাইয়াও ছিল। উনি নিজেও স্বীকার করেছেন। আমি সায়ন ভাইয়ার রুমে যাওয়ার সময় উনাদের বলা কথা শুনে পেয়েছিলাম।’

শীতলের কথা শুনে সিঁতারার চিন্তা দ্বিগুন বেড়ে গেল।
এই তাহলে বিয়ে না করার মূল কারণ? এর
সমাধানই পাবেন কিভাবে? না, না, জেনেশুনে
এসব নিয়ে বসে থাকা যাবে না আজকেই শারায়ত
চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলতে হবে। প্রয়োজনে ওই দুই
গাধাকে মারতে মারতে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে
হবে। এগুলো চেপে থাকার জিনিস? চেপে রাখলে কী
সমাধা হবে? বাবা মায়ের কাছে এত কিসের লজ্জা?
না, না, এতদিন জানতেন বিধায় ছেলেদের নানান
অজুহাত মেনে নিয়েছেন। আজ যেহেতু জেনেই নিলেন
আর বসে থাকবেন না। এদিকে সোফায় বসা শুদ্ধর
ফোন স্কল করা আঙুলটা থেমে গেছে। ঘাড় ঘুরিয়ে
তাকিয়ে আছে মায়ের চিন্তিত মুখের দিকে। ওদের
বলা কথাবার্তা ও চিন্তাধারা দেখে শুদ্ধ একবার
নিজের শরীরের দিকে তাকাল। তারপর বিরবির করে
বলল,

-‘কি আশ্চর্য! সমস্যা আমার আমিই কিছু জানি না
অথচ বাড়িসুদ্ধ সবাই জেনে বসে আছে।’
বিরবির করে একথা বলে সে পুনরায় ফোন স্কল
করতে করতে হাঁক ছাড়ল,

-‘শীতল! বাগান থেকে একটা চ্যালাকাঠ এনে দে তো। শরীর ম্যাজম্যাজ করছে কাউকে ইচ্ছে মতো পিটায়।’-‘শীতল! বাগান থেকে একটা চ্যালাকাঠ এনে দে তো। শরীর ম্যাজম্যাজ করছে কাউকে ইচ্ছে মতো পিটায়।’

আচমকা শুদ্ধের কথা শুনে চমকে উঠল উপস্থিত সকলে। ঘাড় বাঁকিয়ে

তাকাল আরাম করে বসা শুদ্ধের দিকে। এই ছেলে আবার কখন এলো?

এলো তো এলো কাউকে ডাকল না কেন? এদিকে শুদ্ধর কথা শোনমাএই

শীতল লাফ মেরে উঠে দাঁড়িয়েছে। চোখ-মুখে ভয়। ফাঁটা বেলুনের মতো চুপসে গেছে তার আদুরে মুখখানা। মস্তিষ্কে বারংবার ধাক্কা খেতে লাগল একটাই কথা, ‘যাহ্, শুনে ফেলল নাতো? শুনলে কি হবে?’ যখনই কিছু বলে তখনই এ লোক ভূতের মতো হাজির হয়। এ কোন জ্বালা? এ কোন বিপদ! কিন্তু এখন কি হবে, কি করে নিজেকে বাঁচাবে? পেট ব্যথা করছে না কেন? অন্যসময়ে তো খুব মাথা ঘুরায়, চোখে ঝাপসা দেখে, সবকিছু

অন্ধকার হয়ে আসে তাহলে এখন কিছু হচ্ছে না কেন? অসুখও ছ্যাচড়া লেভেলের নতুবা যখন দরকার তখন হয় না। আবার যখন প্রয়োজন হয় না তখন দলবেঁধে শরীরের উপর হামলা করে। ইশ! এই মুহূর্তে মাথা ঘুরে পড়ে গেলে বাঁচার একটা সম্ভাবনা ছিল। এসব ভাবতে ভাবতে সে হাতের মুঠোয় থাকা শাকগুলো রেখে মিনমিন করে বলল,- ‘এ এউ আপু, আ..আমি ওয়াশরুমে যাব, আসছি এন্ফুগি।’

একথা শোনামাত্রই শুদ্ধ উঠে এসে তার পথ আঁটকে দাঁড়াল। তারপর বাঁ হাতে থাকা ফোনটা পকেট রেখে বলল,

-‘আগে আমাকে তোর কথা ও কাজের হিসাবটা ঠিকঠাক বুঝিয়ে দিয়ে যা। এবার ঝটপট বল দেখি, তখন কার সমস্যার কথা বলছিলি?’

-‘আমি কিছু বলি নি ভা..ভাইয়া।’

-‘কিন্তু আমি যে অনেক কিছুই বলতে শুনলাম।’

-‘ভুল শুনেছেন হয়তো। বয়স হলে মানুষ ভুলভাল শুনে।’

-‘ওহ, এবার যা বাগানে থেকে চ্যালাকাঠ নিয়ে আয়।’

-‘আর ভুলভাল কিছু বলব না ভাইয়া।’

-‘স্বীকার করছিস তাহলে ভুলভাল বকেছিস?’

-‘স্বীকার না করে উপায় আছে? চালাকাঠের মার খুব লাগে।’

একথা বলে শীতল চুপসানো মুখে বড় মার দিকে তাকাল। চোখে -মুখে বাঁচার আকুতি। শীতলকে জেরা করতে দেখে সিঁতারা চৌধুরী ছেলের বাহু ধরে নিজের দিকে ঘুরালেন। সুযোগ বুঝে ছেলের মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে স্নেহের সুরে বললেন,-‘ রোগের কাছে লজ্জা করতে নেই বাবা। এখন সব রোগের চিকিৎসা আছে। সন্তানের কাছে মা হচ্ছে সবচেয়ে কাছের বন্ধু। শুভাকাক্ষী। ও বিশ্বস্ত ছায়া। মায়ের কাছে কিসের লজ্জা? ডাক্তারের কাছে যা বাবা। সায়ন কই, ওকেও ধরে বেঁধে নিয়ে যা।’

মায়ের কথাগুলো মন দিয়ে শুনল শুদ্ধ। তবে কিছু বলার আগে সায়নের বাইকের শব্দ শুনে কথাখানা আপাতত চেপে গেল। রাতে সায়ন বেরিয়ে কেবল বাসায় ফিরল সায়ন। পরনে ঝকঝকে নতুন প্যান্ট ও টি-শার্ট। কে বলবে এই ছেলে গতরাতে ভয়ানক কান্ড ঘটিয়েছে। সায়ন বাইরের চাবি আঙুলে নিয়ে ঘুরাতে ঘুরাতে বাড়িতে প্রবেশ করল। রান্নাঘরের সামনে

সবাইকে দাঁড়িয়ে থাকে দেখে ভ্রঁ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল,-‘কি হয়েছে? সবাই এভাবে তাকিয়ে আছো কেন?’

-‘আমাকে শান্তি দিবি না বলে ঠিক করেছিস তুই? আর কত টেনশনে রাখবি আমায়?’

মায়ের থমথমে মুখে তিক্ত কথা শুনে সায়নের ভ্রঁজোড়া কুঁচকে গেল।

সে একবার শুদ্ধর দিকে তাকাল। তারপর মায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল,

-‘কি করেছি আমি? সকাল সকাল বকছো কেন আমায়?’

-‘বকবো না তো কি করব? তোর সমস্যা আছে জানাইস কি কেন?’

-‘সমস্যা? আমার আবার কিসের সমস্যা?’

সিঁতারা জবাব দিতে পারলেন না হঠাৎ উনার কথা আঁটকে গেল। মাকে থামতে দেখে শুদ্ধ ফিচেল হাসল। তারপর জবাব দিলো,

-‘তোমার নাকি শারীরিক সমস্যা আছে এজন্য বিয়ে করতে ভয় পাও। মা এটাই বলতে চাচ্ছে আর কি।’

-‘হোয়াট! একথা কে বলেছে? কার থেকে এসব শুনেছো আম্মু?’

ভাইকে রাগতে দেখে কেন জানি শুদ্ধর বেশ মজা লাগল। সে আড়চোখে সিঁড়ির উপর তাকিয়ে এবারও জবাব দিলো,

-‘শীতল বলেছে।’

সায়নসহ সবাই আশেপাশে তাকিয়ে শীতলকে পেল না। বড়দের কথার মাঝে পালিয়েছে সে। শীতলের নাম শুনে সায়নের ভ্রুঁজোড়া সমান হয়ে গেল। এগিয়ে এসে গ্লাসে পানি ঢেলে ঢকঢক করে খেয়ে হাতের উল্টো পিঠে মুখ মুছল। তারপর বলল,-‘ওই পাগলের কথা শুনে তুমিও পাগল হলে আম্মু? ওসব কিছু না। সময় হোক আমিই তোমাদের বিয়ের কথা জানাব। যাই হোক, খাবার বাড়ো, আমি ফ্রেশ হয়ে আসছি।’

-‘সত্যি সমস্যা নেই তোদের? যদি না থাকে বিয়েতে এত ভয় কিসের?’

-‘সামনে ব্যস্ততা আরো বাড়বে। কখন বাড়ি ফিরি না ফিরি ঠিক ঠিকানা নাই। এখন বউ আনলে বউ টিকবে না। এরচেয়ে একটু সময় দাও, আর কিছুদিন পর জলজ্যান্ত বউমা এনে দিবো।’

একথা বলে সায়ন সিমিনের দিকে তাকিয়ে বলল,

-‘ছোটো আম্মু তোমার না ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা, গিয়েছিলে?’

-‘নারে বাপ, আর একটুপরে বের হবো।’

-‘ওকে। আমি সিরিয়াল দিয়ে দিয়েছি তুমি শুধু ডাক্তারের সহকারীকে আমার নাম বলবে তাহলেই হবে। শুদ্ধ বাইরে যাবি, কাজ আছে নাকি কোনো?’

-‘না, কেন?’

-‘তাহলে ছোটো আম্মুদের সঙ্গে যা।’

-‘হুম।’

একথা বলে সায়ন হাত দিয়ে তার চুলে ব্যাক ব্লাশ করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে গেল। সিঁতারা চৌধুরী বুঝলেন ছেলেদের সমস্যা নেই।

শীতলই বোধহয় বুঝতে ভুল করেছে। তবে একপক্ষে খুব ভালো হয়েছে

ব্যাপারটা সবারই জানা থাকল। এই নিয়ে কেউ কথা বাড়ালেন না তবে স্বস্তির শ্বাস ছাড়লেন। শুদ্ধও আর দাঁড়াল না সিমিনকে রেডি হতে বলে নিজের রুমের দিকে পা বাড়াল।-‘কিছু বলবি?’

সায়নের কথা শুনে ধীর পায়ে পর্দার আড়াল থেকে
বেরিয়ে এলো স্বর্ণ। একেবারে নিঃশব্দে এসেছে তাও
সায়ন তার উপস্থিতি বুঝে ফেলেছে। তাকে দেখে
সায়ন শার্টের বোতাম খুলে ঘামে ভেজা শার্ট ছুঁড়ল
কর্ণারে রাখা বিন ব্যাগের উপর। খালি গায়ে সিলিং
ফ্যান বরাবর বসে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল,
-‘কথা কানে যায় না? এক কথা কতবার জিজ্ঞাসা
করব?’

স্বর্ণ নিরন্তর থেকে নির্বিকার ভঙ্গিতে এসে দাঁড়াল
সায়নের মুখোমুখি। তবে মুখে কিছুই বলল না শুধু
তাকিয়েই রইল। সায়নও তাই। কিছুক্ষণ এভাবেই
চোখে চোখে কথা বলে স্বর্ণ রুম থেকে বেরিয়ে
যাওয়ার আগে পেছনে না ঘুরেই মুখ খুলল,

-‘ইনসান অংকনের কাজিন। অংকন রাজনীতিবিদ
ছেলে। অংকনকে না পেলে সন্দেহের তীর আপনার
উপরে আসতে পারে, কাজেই সাবধান।’

সায়ন শুনল। তার ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত হাসি।
হাসতে হাসতে সে শরীর এলিয়ে দিলো নরম
বিছানায়। তারপর ঘূর্ণায়মান ফ্যানের দিকে তাকিয়ে
শুধাল,-‘গতরাতে আমার পিছু নিয়েছিলি কেন?’

-‘দেখতে ।’

-‘ দেখে কেমন লাগল?’

-‘রাজনীতি করলে রাজনীতিবিদের মাঝেও হিংস্রতা রাখা উচিত। নতুবা অন্যরা পিষে মারতে দু’বার ভাববে না। কাজেই মন্দ লাগে নি।’

-‘ভয় লাগছে না আমাকে?’

-‘না।’

-‘কেন? ‘

-‘অল্পতে যারা ভয় পায় তাদের জীবনে সফলতার প্রাপ্তি ধরা দেয় না।’

-‘এসবের মধ্যে নিজেকে আর জড়াস না। তোর কিছু হলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না।’

-‘ এটা আগে ভাবার উচিত ছিল। নিজের হাতে খুন করতে শিখিয়ে এখন নীতিকথা অনর্থক নয় কি?’

-‘পরিস্থিতি..আ।’

-‘আমিও পরিস্থিতি বুঝে কাজ করতে প্রস্তুত!’

-‘বাড়ির সবাই জানলে কি হবে ভেবেছিস?’

-‘ পিছু ফেরার পথ বন্ধ আর কিছু করার নেই।’

একথা বলে স্বর্ণ যেভাবে এসেছিল সেভাবেই বেরিয়ে
গেল। তাকে যেতে দেখে সায়েন হাসল। অদ্ভুত সেই
হাসি। তারপর হাসতে হাসতেই বিরবির করল

-‘ এই নাহলে চৌধুরীদের রক্ত! প্রায় আধাঘন্টা পর,
সিমিন আর শীতল রেডি হয়ে পাকিং লটে এসে
দাঁড়িয়েছে। সিমিন তখনকার ঘটনার জন্য শীতলকে
এখনো বকছেন।

শীতল মুখ গোমড়া করে চুপ করে মায়ের বকুনি
শুনছে। এখানে সত্যিই তার দোষ নেই। সে যা
শুনেছে তাই বলেছে একটা কথাও আগ বাড়িয়ে বলে
নি। এসব নিয়ে শুদ্ধর ফ্রেডরা নিজেরা হাসাহাসি
করেছিল। শুদ্ধর কাঁধে হাত রেখে কীসব বোঝাচ্ছিল।
তাদের কথা শুনেই শুদ্ধর সমস্যার কথা জেনে
সবাইকে জানানোর কথা ভেবেছিল সে। তার কপাল
খারাপ নয়তো যখনই যা বলে শুদ্ধ ভাই শুনতে পায়
কেন? বাসায় নেই জেনেই কথাটা তুলেছিল। কিন্তু
কে জানত কখন এসে ঘাপটি মেরে বসেছে সেই
বিশুদ্ধ পুরুষ। আর কিছু বললেই মারতে হবে কেন?
সুন্দর করে বুঝিয়ে বলা যায় না? মনে মনে এসব

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কানে এলো,-‘গাড়িতে বসো ছোটো আম্মু। ‘

একথা বলে শুদ্ধ গাড়িতে উঠে ড্রাইভিং সিটে বসল।
সিমিনও বসলেন। শীতল বিষয় নিয়ে শুদ্ধের দিকে
তাকাল। এই লোক তাদের সঙ্গে যাবে নাকি? ওমা,
একি সর্বনাশের কথা! তারা কি বিয়ে বাড়ি যাচ্ছে যে
সঙ্গে যেতে হবে? তারা যাচ্ছে ডাক্তারের কাছে।
কারণ তার পিরিয়ড জনিত কিছু সমস্যা রয়েছে। শুদ্ধ
গেলে সে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে পারবে না।
তার সামনে বলবেই বা কীভাবে তার সমস্যার কথা?
ওদিকে তাকে গাড়িতে বসতে না দেখে শুদ্ধ হর্ণ
বাজাল। শীতল বলার মতো শব্দ না পেয়ে রাগে
গজগজ করতে করতে শুদ্ধর পাশে বসল। গাড়িতে
চলতে লাগল হাসপাতালের পথ ধরে। রাস্তায় কি
নিয়ে যেন ইয়া বড় মিছিল বের হয়েছে। দলে দলে
ছেলেপুলেদের একটাই জয়ধ্বনি, বিচার চাই! বিচার
চাই!’

সেই মিছিল পার হতে একটু সময় লাগল। জ্যামে
বাঁধা গাড়িগুলো ছুটতে লাগল আরো বিশ মিনিট।
একজায়গায় পানির পাইপ ফেটে পানি বের হয়ে

রাস্তার দুই পাশে পানি জমে গেছে। রাস্তা পার হতে গিয়ে দু'একজন থিষ্ঠি করে চলে যাচ্ছে। এসব নানান ঝামেলা শেষে অতঃপর হসপিটালে পৌঁছাল একটু দেরিতেই। কিন্তু রিসিপশনের কাছে যেতেই সিমিনের স্কুল ফ্রেন্ডকে কাঁদতে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। একবার মেয়ের দিকে তাকিয়ে আবার শুদ্ধর দিকে তাকালেন। উনাকে মুখে মুখে তাকাতেই দেখে শুদ্ধ বলল,-‘কি হলো চলো।’

উনি এবার আমতা আমতা করে বললেন,
-‘বাপ তুই শীতলকে নিয়ে ডাক্তারের চেম্বারে যা,আমি আসছি।’

-‘তুমি কোথায় যাচ্ছে?’

-‘ওই যে বোরকা পরা মেয়েটা হাউমাউ করে কাঁদছে ও আমার বান্ধবী। একসঙ্গে পড়েছি আমরা। ও কাঁদছে কেন দেখে আসি।’

-‘হসপিটালের ভেতরেই থাকবে এক পা বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হলেও আমাকে কল দিবে।’

একথা বলে শুদ্ধ শীতলকে নিয়ে ডাক্তারের চেম্বারের সামনে দাঁড়াতেই শীতলের নাম ধরে ডেতরে ডাকল। আসতে অনেক দেরি করাতে তারাই শেষ পেশেন্ট।

শীতল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁত দিয়ে নখ কাটছে। এবার কি হবে? এদিকে পুনরায় নাম ধরে ডাকলে শুদ্ধ ওকে যেতে বলে নিজেও যেতে নিলে শীতল হববড় করে বলল,

-‘না, না, আপনাকে যেতে হবে না। আপনি এখানেই দাঁড়ান।’

-‘কেন, আমি গেলে কি সমস্যা?’

-‘আছে, অনেক সমস্যা।’

একথা বলে শীতল একা একা ডাক্তারের রুমে ঢুকে বসল। ডাক্তার ওকে

যা জিজ্ঞাসা করল আমতা আমতা করে বলল। মহিলা ডাক্তার তবুও সে খতমত খাচ্ছে দেখে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করল,

-‘সঙ্গে কেউ এসেছে?’

-‘হুম, শুদ্ধ ভা..শীতল পুরো কথা শেষ করার আগেই সহকারী মেয়েটা হাঁক ছেড়ে বাইরে থাকা তার অভিভাবককে ডাকল। পাশের চেয়ারে কাউকে বসতে দেখে শীতল সিমিন ভেবে খুশি মনে তাকিয়ে হতবাক হয়ে গেল। আবারও শুদ্ধ ভাই! এই ছেলেটা অভিভাবক এবং এই মেয়ে এখনো অবিবাহিত দেখে

ডাক্তার ধরে নিলেন এই ছেলেই তার ফিয়ঙ্গি।
তাছাড়া এ মেয়ের হাতের অনামিকাতে জ্বলজ্বল
করছে খুব সুন্দর স্বর্ণের আংটি। তাছাড়া মেয়েরা
আপন ভাইকে নিয়ে এ সমস্যা নিয়ে সচারাচর আসে
না। তাই তিনি ধরে নিলেন পাশে বসা সুদর্শন
ছেলেটা মেয়েটার হবু স্বামী। কিংবা বয়ফেড।

তাই রশিক মানুষ হিসেবে তিনি প্রেসক্রিপশন লিখতে
লিখতে বললেন,-‘মেডিসিন দিয়ে আমি আমার দায়িত্ব
পালন করলাম। এবার আপনিও
তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে ফেলুন।’

ডাক্তারের কথা শুনে শুদ্ধর ভ্রুঁ কুঁচকে গেল। তার
বিয়ের সঙ্গে শীতলের রোগের কি সম্পর্ক? কিসব
বলে এই ডাক্তার? তাকে ভ্রুঁ কুঁচকে তাকাতে দেখে
ডাক্তার এবারও নিজেই মুখ খুললেন,

-‘অবিবাহিত মেয়েদের কিছু কিছু রোগের ট্রিটমেন্ট
বিয়ে। বিয়ের পর অনেক মেয়ের পিরিয়ডজনিত
রোগের সমস্যাগুলো ক্লিয়ার হয়ে যায়।

আমি কি বলতে চাচ্ছি আশা করি এইবার বুঝতে
পেরেছেন।’-‘অবিবাহিত মেয়েদের কিছু কিছু রোগের
ট্রিটমেন্ট বিয়ে। বিয়ের পর অনেক মেয়ের পিরিয়ড

জনিত সমস্যাগুলো ক্লিয়ার হয়ে যায়। আমি কি বলতে চাচ্ছি আশা করি এইবার বুঝতে পেরেছেন।’

-‘আমি ওর কাজিন।’

-‘কাজিন লাভ?’

ডাক্তারের কথা শুনে শুদ্ধ আড়চোখে একবার শীতলের দিকে তাকাল। শীতল চোখ বড় বড় করে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে আছে। কি আশ্চর্য!

এই ডাক্তার পাগল নাকি? না জেনেশুনে তখন থেকে ভুলভাল বকেই যাচ্ছে। পৃথিবীতে পুরুষ পেলো না বিশুদ্ধ পুরুষটাকেই তার হবু স্বামীর খেতাব দিয়ে দিলো? অন্যায়, ঘোর অন্যায়! এই অন্যায় মুখ বুঝে মেনে নেওয়া যায় না। সেও নেবে না, কখনো না, কিছুতেই না। তাই সে থমথমে মুখে জবাব দিলো,-‘উনি আমার আপন চাচাতো ভাই। না আমাদের প্রেম ছিল, না আছে, আর না ভবিষ্যতে কোনোদিন হবে। যদি পৃথিবীতে পুরুষ হিসেবে শুধু উনিই বেঁচে থাকে তবুও আমি উনাকে বিয়ে না।’

-‘হে, হে, আমার বোনের মেয়েও একথা বলতো। দেখতেই পারত না তার চাচাতো ভাইকে। গালমন্দ করতেও বাদ রাখত না। এখন সেই ছেলেরই বাচ্চার

মা সে। হেসে-খেলে সংসার করছে দু'জন। কেউ কাউকে ছাড়া একদন্ড থাকতে পারে না। তোমরাও তাই করবে মিলিয়ে নিও।’

এবার কি বলবে ভেবে পেল না শীতল। এসব কী কোনো কথা? একসঙ্গে এক বাড়িতে বড় হয়েছে তারা। দিন-রাত ঝগড়া করে। মা’রা’মা’রিও হয়। তাদের মিল অসম্ভব! মোদাকথা, এই লোক আর যাই হোক ভালো বর হতেই পারবে না। সারাদিন খ্যাক খ্যাক করে। ধমকায়। মারে। যে পাগল এই লোককে বিয়ে করবে ,করুক গিয়ে। সে এর মধ্যে ছিল না ভবিষ্যতে থাকার প্রশ্নই আসে না। শীতল এসব ভেবে মনে মনে ডাক্তারের গুণ্ঠি উদ্ধার ব্যস্ত। তখন শুদ্ধ এক ভ্রাঁ উঁচু করে বিরক্তি নিয়ে বলল,

-‘বাড়তি কথার প্রয়োজন দেখছি না। তাছাড়া বললেই কী আমি তোকে বিয়ে করার জন্য ম’রে যাচ্ছি?’

-‘তাই তো যাচ্ছে! নয়তো বলছো না কেন কিছু?’

-‘কি বলব? আমি কি তোর ডাক্তারকে এসব বলতে শিখিয়ে দিয়েছি? উনিই তো এসে অবধি ভুলভাল বকে যাচ্ছে।’

-‘শুরুতেই ভুল শুধরে দিলে না কেন?’

-‘সেই দায় আমার না। গলার সাউন্ড আশ্তে, নয়তো
থাপড়ে গাল লাল করে দেবো, বে’য়া’দব।’ তাদের
দু’জনের ঝগড়া দেখে ডাক্তার নিজেই খতমত খেয়ে
গেলেন। ধূর, বেশি বকার জন্য এমন হলো। পেশায়
ডাক্তার হলেও উনি একটু বাচাল প্রকৃতির। পৃথিবীতে
নানান রকমের মানুষের বসবাস। কেউ কেউ আছে
হাসতে ভালোবাসে। কেউ খেতে ভালোবাসে। কেউ বা
ঘুরতে। আর উনি কথা বলতে ভালোবাসে। এর
আগেও আগ বাড়িয়ে কথা বলায় বিপাকে পড়েছিলেন,
আজও তাই। তবে উনি সরি বললেন না কারণ উনার
অন্ধ মন এখনো চিৎকার করে বলছে এদের মাঝে
কিছু ঘটবে। কারণ প্রায়ই কাজিন লাভ স্টোরির
শুভারম্ভ হয় ঝগড়া/মারামারি দিয়ে। শুদ্ধর ধমক
খেয়ে শীতল আর একটা কথাও বলল না। মন
মেজাজ বিগড়ে গেছে। এ পাগল ডাক্তার তার
ফুরফুরে মেজাজকে নিজের হাতে খুন করেছে। তাই
সে রাগে ফোঁস ফোঁস করে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।
তখন ডাক্তার বেশ কিছু পরামর্শ দিয়ে প্রেসক্রিপশন
এগিয়ে দিলো। শুদ্ধ সেটাতে একবার নজর বুলিয়ে
উঠে চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেল। শীতলও পিছু পিছু

গেল। আশেপাশে সিমিনকে না দেখে সিঁড়ি বেয়ে
নিচে নামল দু'জন। মুখে রা নেই কারো। রিসিপশন
থেকে কয়েক হাত দূরে সিমিন একজন মহিলার
পাশে বসে আছে। ছলছল চোখে তাকিয়ে সান্তনাবাণী
ছড়াচ্ছেন। যেই মহিলা কাঁদছে উনার বাবা মারা
গেছে। লাশ নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে।
একটুপর লাশ নিয়ে চলেও গেলেন উনারা। শুদ্ধ
হাসপাতালের সামনে থেকে সব মেডিসিনগুলো নিয়ে
সিমিনের হাতে দিলো। তারপর

বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। ডাক্তার কি বলল না
বলল শুদ্ধ থাকায় আপাতত কিছু জিজ্ঞাসা করল না
সিমিন। তবে তাদের গাড়িটা কিছুদূর যেতেই শীতল
গমগমে সুরে বলে উঠল,-‘ক্ষুধা লেগেছে আমার।’
মেয়ের কথা শুনে পেছনের সিটে বসা সিমিন
বললেন,

-‘বাড়ি গিয়ে খাস। এইতো প্রায় চলেই এসেছি।’

-‘না, আমি এখনই কিছু খাব।’

-‘জেদ করে না মা, এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে
গেছে। তাছাড়া বাইরের খাবার বারণ না তোর? আর
একটু ধৈর্য ধর বাড়ি গিয়ে পেট পুরো খাস।’

-‘না, আমি কাচ্চি খাব, মানে খাবই। তুমি গাড়ি থামাতে বলো।’

শীতলের কথা শুনেও শুদ্ধ গাড়ি থামাল না। সে তার সুবিধা মতো হুইল ঘুরিয়ে যাচ্ছে। শীতল তাকে তো বলে নি তাহলে সে কেন গাড়ি থামাবে? গাড়ি থামাচ্ছে না দেখে শীতল কটমট করে শুদ্ধর দিকে তাকিয়ে বলল,-‘গাড়ি থামান শুদ্ধ ভাই, আমি নামব।’

-‘পারব না।’

-‘কেন?’

-‘জানি না।’

-‘সব সময় এমন ভালো লাগে না কিন্তু।’

-‘আমারো।’

-‘আম্মু কিছু বলছো না কেন? এবার রাগ হচ্ছে কিন্তু আমার।’

সিমিন কোনো জবাব দিলেন না। বরং তার কথা শুনে শুদ্ধ পুনরায় বাঁকাভাবে জবাব দিলো,

-‘রাগ হলে রাগ কর বারণ করেছে কে?’

-‘বললাম তো, কাচ্চি খাব।’

-‘বললাম তো, খেতে হবে না।’

-‘গাড়ি থামাবেন কি না?’

-‘না।’

-‘ বড় আব্বুকে বলে কিন্তু।’

শুদ্ধ পকেট থেকে ফোন বের শীতলের দিকে এগিয়ে দিলো। অর্থাৎ এই মুহূর্তে বলতে বলছে। শীতল ফোন ধরল না কারণ কথা বলতে বলতেই কাচ্চি ঘর পার হয়ে গেছে। শীতল মনের দুঃখে জানালার দিকে তাকিয়ে রইল। ভেবেও নিলো জীবনেও কাচ্চি খাওয়ার কথা কাউকে বলবে না। নিজের মাকেও না। সব সময় এমনই করে এরা। জ্যাম না থাকায় শুদ্ধ একেবারে চৌধুরী নিবাসের পার্কিং লটে গাড়ি থামাল। গাড়িটা থামতেই

শীতল গাড়ি থেকে নেমে হনহন করে বাসায় প্রবেশ করে দেখে শারফাত চৌধুরী ড্রয়িংরুমে বসে ফোনে কথা বলছেন। কথা শুনে মনে হলো উনি আজ বিকেলে অফিসের কাজে দেশের বাইরে যাবেন। শুদ্ধর নামে পেট ভর্তি অভিযোগ নিয়ে সেও পাশে বসল। অপেক্ষা করতে লাগল উনার কথা শেষ হওয়ার। মিনিট দু’য়ের পরেই উনি কল কেটে মুখে হাসি ঐটে বললেন,-‘কি কি লাগবে লিস্ট করেছো মা?’

শীতল উনার কথার জবাব না দিয়ে হড়বড় করে
বলল,

-‘বড় আবু শুদ্ধ ভাই সিগারেট খায়। আমি নিজের
চোখে দেখেছি।’

সিমিনের সঙ্গে কেবলই এসে দাঁড়িয়েছে শুদ্ধ। বাবার
কাছে শীতলের করা অভিযোগ শুনেও নির্বিকার সে।
পাশে বসে হাঁক ছেড়ে পানি দিতে বলল। সিরাত
পানি দিয়ে গেলে পান করে সোফাতে গা এলিয়ে
দিলো। এদিকে একটা অভিযোগ করে থামল না
শীতল বরং একের পর এক অভিযোগের ঝুঁলি খুলে
বসল। মনের যত রাগ ছিল সুযোগ বুঝে উগড়ে
দিলো। ছেলেরা বড় হয়েছে তার সব অভ্যাস নিয়ে
কথা বলা সাজে না। তবুও তিনি শীতলের কথা শুনে
গম্ভীর সুরে বারণ করলেন। শাসালেনও যেন বাড়ির
ছোটোদের সামনে সিগারেট না খায়। এগুলোর
শরীরের খুব ক্ষতিকর ভালো হয় এসব বর্জন করলে।
শুদ্ধ বাবার কথাগুলো মন দিয়ে শুনে শীতলের দিকে
তাকাল। শীতলের ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি। অর্থাৎ সে
খুব খুশি। শীতলকে হাসতে দেখে শুদ্ধর ঠোঁটেও
ফিচেল হাসি ফুটল। সে

কেন হাসল সেই জানে। তবে তাকে বকা খাওয়া
পেরে শীতল আর বসল না ফ্রেশ হতে চলে গেল।
আর তার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে শুদ্ধ ভাবল,
-‘সিগারেট নিয়ে যার এত বিরোধিতা তাকে সিগারেট
টানাতে কেমন হয়?’বিকেলের দিকে শখ আর স্বর্ণ
টুকটুক কেনাকাটা করে একসঙ্গে বাসায় ফিরছিল।
হঠাৎ মাঝপথে দেখা হলো আহনাফের সঙ্গে। পাশ
কেটে চলে যাওয়ার জন্য মনস্থির করলেও আহনাফ
হাসিমুখে তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। হাসি মুখে
কুশল বিনিময় করল। চৌধুরী নিবাসের সবার কথায়
শুধাল। ওরাও ভদ্রতার খাতিরে জবাব দিলো।
আহনাফ আশপাশ দেখে মাথা চুলকে অকস্মাৎ বলে
বসল,

-‘শখ, তোমাকে কিছু বলার ছিল।’

-‘জি, বলুন।’

-‘না মানে...! ‘

আহনাফ আমতা আমতা করে স্বর্ণের দিকে তাকাল।
স্বর্ণও আড়চোখে তাকাল শখের দিকে। আহনাফের
মতিগতি দেখে সে সব বুঝে ফেলেছে।

এই অবধি অনেক প্রস্তাব পেয়েছে তাই তারও ধারণা আছে। তবে শখের কথা বলা, তাকানো, পূর্বের মতোই শান্ত ও স্থির। সে স্বাভাবিক ভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। তার পরনে মিষ্টি কালার থ্রি-পিস ও কালো হিজাব। হেঁটে আশায় নাকের ডগায় জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। তবে বেশ লাগছে। যেন মন মাতানো কোনো ফুল। আহনাফের চোখে-মুখে মুগ্ধতা দেখে স্বর্ণ আবার বোনের দিকে তাকাল। ভাবল বোনের ইশারা পেলে সামনে হাঁটা শুরু করবে। কিন্তু শখ তাকে কোনো ইশারা না করে বলল,-‘বলুন, আমি শুনছি।’

এদিকে হাতে খুব একটা সময় নেই। তাছাড়া চৌধুরী নিবাসের মেয়েদের দাঁড় করিয়ে রাখলে অনেকেই বিরক্ত করছে ভেবে তেড়ে আসতে পারে। তাই সেও ভাবল মনের কথা বলে দেবে। কিন্তু সে মুখ খুলার আগেই স্বর্ণ বলল,

-‘আপু, একটু দাঁড়াও আমি আইসক্রিম নিয়ে আসি।’
একথা বলেই স্বর্ণ সামনের দোকানের দিকে এগিয়ে গেল। সুযোগ বুঝে

আহনাফ মনে মনে স্বর্ণকে ধন্যবাদ দিয়ে অকপটে বলে ফেলল,

-‘এই যে হবু ডাক্তার আমার মনের ডাক্তার হবেন?’

শখ সাথে সাথে কোনো জবাব দিলো না। তবে তার চোখে-মুখে অস্বস্তি ফুটে উঠেছে। তাছাড়া যতটুকু জানে এই মানুষটা তার বড় ভাই সায়নের চেনা কেউ। একদিন দেখা হয়েছে তাদের। খুব সামান্য কথা হয়েছে। তাই তার এমন প্রস্তাব সহসা গ্রহণের প্রশ্নই আসে না। তবে কিছু না বলে চলে যাওয়া অভদ্রতা হয়ে যায়। কিন্তু কি বলবে বুঝে উঠতে পারল না। তার মনের কথা বোধহয় বুঝল আহনাফ। তাই সে বলল,

-‘প্রেম করার ইচ্ছে নেই আমারও। বউ বানাব তোমায়। সায়ন ভাইয়াকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে বাবা। আশা করছি, পারিবারিকভাবে খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে আমাদের।’

শখ চুপ করে শুনল। তারপর অস্বস্তি থেকে বাঁচতে বলল,-‘আসি, তাহলে।’

একথা বলে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে হাঁটা ধরল। দোকানে খুব ভিড় থাকায় সেও এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল

স্বর্ণের পাশে। স্বর্ণের রাগাশ্রিত মুখশ্রী দেখে কিছু
বলার আগে নজর গেল পাশে পাশে দাঁড়ানো
সেদিনের সেই পুলিশের দিকে। নামটা বোধহয়
ইনসান। সিভিল ড্রেসে থাকলেও চিনতে অসুবিধা
হলো না। তবে স্বর্ণ রেগে থাকার কারণ বুঝল না
সে। দোকানে ভিড় দেখে আহনাফ পাশের দোকান
থেকে আইসক্রিম কিনে দোকানের সামনে এসে
স্বর্ণের নাম ধরে ডাকল। তারা তাকালে ইশারা করে
তাদের

বেরিয়ে আসতে বলল। দুবোন চোখাচোখি করে
বেরিয়ে এলো আহনাফ স্বর্ণের হাতে অনেকগুলো
আইসক্রিম ধরিয়ে দিয়ে বলল,-‘বড় ভাইয়া হিসেবে
দিলাম। না করলেও শুনছি না।’

স্বর্ণের মুখভঙ্গি এখন স্বাভাবিক। সে বোনের দিকে
একবার তাকিয়ে মুখ টিপে হেসে বলল,
-‘ঘুষ দিচ্ছেন দেন, না করছি না। তবে ঘুষের
বিনিময়ে বোন চাইলে দেবো না কিন্তু।’

একথা শুনে আহনাফ হেসে ফেলল। হাসার দরুন
গালে চমৎকারভাবে দুটো টোল পড়ল। শখ দেখল কি
না বোঝা গেল না। কারণ সে অন্যদিকে

তাকিয়ে আছে। স্বর্ণ মজা করছে দেখে আহনাফও হাসতে হাসতে বলল,

-‘তাহলে কি দিলে বোন দেবে শুনি?’-‘লেনা-দেনাতে কাজ হবে না। আমার বোনকে পেতে হলে পরীক্ষা দিতে হবে।’

-‘ পরীক্ষা দিতে দিতে জান জীবন কয়লা হয়ে গেল। এখন বউ পেতেও পরীক্ষা দিতে হবে?’

-‘তা তো হবেই। আমার বোনকে তো যার তার হাতে তুলে দিতে পারি না।’

-‘তা তো অবশ্যই। তা বলুন ম্যাম কি পরীক্ষা দিতে হবে?’

-‘সময় হলে জানিয়ে দেবো। আজ আসি।’

একথা বলে স্বর্ণ শখের হাতটা ধরে হাঁটা ধরল। আর দুই মিনিট হাঁটলেই চৌধুরী নিবাস তাই আর রিকশা নিলো না। তবে তাদের যাওয়ার দিকে

তাকিয়ে রইল দুই জোড়া চোখ। একেকজনের চোখে মুগ্ধতা অন্যজনের চোখে হিংস্রতা। দুপুরের দিকে হাসপাতাল থেকে ফিরে রুম থেকে বের হয় নি শুদ্ধ। এত ডেকেও সাড়া তো দূর দুপুরের খাবারটাও খায় নি অবধি। হয়তো কোনো কাজে ব্যস্ত। সে বাড়ি এলে

মাঝে মাঝেই এমন করে। বন্ধ রুমে কি করে একমাত্র সেই জানে। তার রুমের সঙ্গে লাগোয়া আরেকটা বড় সড় রুম রয়েছে। সেটা রুম না ঠিক ল্যাব বলা যায়। যেহেতু সে একজন সাইন্টিস্ট তার কাজ গবেষণা করা। মেধা ও শ্রম কাজে লাগিয়ে নিত্য নতুন জিনিস আবিষ্কার করা। ছেলের কথা চিন্তা করে শারায়ত চৌধুরী নিজে থেকেই এটা বানিয়ে দিয়েছেন। সাজিয়েছেন নান্দনিক উপায়ে। কৃত্রিম লাইটের ঝলকানিতে পুরো ল্যাব দিনের মতো আলোকিত থাকলেও বিশেষ এক উপায়ে বাইরের আলো বাতাস চলাচল ও বন্ধের ব্যবস্থাও রয়েছে। এবং ল্যাবেতে কাউন্টার স্পেস'ও রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমানের। ল্যাবের একেক টেবিল একেক ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ডেটা সংগ্রহ, ও গবেষণার স্থান হিসেবে যথাযথ। এমনকি গবেষণার কাজে ব্যবহৃত জিনিসপত্র হাতের নাগালে পাওয়ার জন্য ভেদে টেবিল কিংবা শেফে থরে থরে সাজানো। সেগুলো রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেমের। রিমোটের বোতাম চাপলে টেবিল তার সম্মুখে হাজির হবে। কাজ ফুরালে রিমোটের সাহায্যে পূর্বের স্থানে চলে যাবে। এক

কথায় সব সুযোগ সুবিধার কথা মাথায় রেখে
আধুনিক উপায়ে ল্যাবটা তৈরি করা। তবে তার রুমে
দুকলে বোঝার উপায় এখানে ল্যাব আছে বা থাকতে
পারে। ল্যাবে প্রবেশের গেটে রয়েছে প্যাটার্ন লক
এবং বৈদ্যুতিক শকের বিশেষ ব্যবস্থা। একেক অধিক
ভুল লক চাপলেই শুদ্ধর কাছে এ্যালার্ট নোটিফিকেশন
যাবে এবং সেটা কনফার্ম মেসেজ না পেলে বৈদ্যুতিক
শকে সেই ব্যক্তির পুরো শরীর ঝলসে দিতে পারে।
এই মুহূর্তে মনযোগ সহকারে চোখে চশমা, মুখে
মাস্ক, গায়ে এ্যাপ্রোণ ও হাতে একটি মোটা সিরিঞ্জ
নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শুদ্ধ। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে
আছে কাঁচের জারের দিকে। জারে ছটফট করছে
সাদা ধবধবে একটি পুরুষ ইঁদুর। মেডিসিন ট্রায়ালের
জন্য ইঁদুরকেই আগে বেছে নেয় সে। কারণ
জেনেটিক, জৈবিক ও আচরণগত দিক থেকে ইঁদুরের
৯০% জিন আশ্চর্যজনক ভাবে মানুষের সাথে মিলে
যায়। একারণে মানুষের বিভিন্ন প্রকার জিনের
মিথস্ক্রিয়ার প্রকৃতির পরীক্ষার ক্ষেত্রে মানুষের
প্রতিনিধিত্ব করে ইঁদুর। এবং রক্তে মাংসে গড়া
মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের সাথে ইঁদুরের অঙ্গের

বা তত্ত্বের মিল পাওয়া যায়। এজন্যমানুষের শরীরে
বিভিন্ন প্রকার ঔষধের প্রভাব সহজে নির্ণয় করা যায়।
আরেকটি কারণ হচ্ছে, এরা জিনগত ভাবে
পরিবর্তিত'ও হতে পারে। এদের নির্দিষ্ট জিনকে বন্ধ
কিংবা খুলে রাখা যায়।ফলে কি পরিবর্তন হয় তা
পর্যবেক্ষণ করা যায়।শুদ্ধ'ও এই মুহূর্তে সেটাই
করছে। সে জার থেকে ইঁদুরটা বের করে রাখল
টেবিলের উপরে। সুস্থ সবল সাদা ইঁদুর। মুখ তুলে
তাকেই যেন দেখছে। একহাতে চেপে ধরে না রাখলে
এতক্ষণে ছুট লাগাত। প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে লুকাতো
ল্যাবের কোনো এক কোনায়। শুদ্ধ ইঁদুরটাকে শত্রু
করে চেপে ধরে সিরিঞ্জের মেডিসিনটুকু ধীরে ধীরে
পুশ করল ইঁদুরের শরীরে। নরম গায়ে সূচ ফুটাতেই
ইঁদুরটা ছটফটিয়ে উঠল। কিন্তু ছাড়া না পেয়েও শান্ত
হতে পারল না। নিজের মতো করে ছটফট করতেই
থাকল। এইটুকু তার শরীর কতটুকুই বা শক্তি!
অতঃপর কাজ হয়ে গেলে স্বচ্ছ কাঁচের জারে পুনরায়
ইঁদুরটা রেখে জারের মুখটা বন্ধ করে দিলো। যাতে
কোনোভাবে পালাতে না পারে। এরপর বাজ পাখির
ন্যায় শিকারী দৃষ্টিতে লক্ষ করতে লাগল ইঁদুরের

গতিবিধি। ইঁদুরটা থম মেরে বসে আছে। মেডিসিন
হয়তো কাজ শুরু করেছে। সে ইঁদুরটার দিকে খেয়াল
রেখেই কয়েকটি কাঁচের তৈরি গোলাকার টেস্টিটিউব
নল নিলো। অদূরে রাখা কাঁচের জগের মতো
বিকারটিও রাখল হাতের কাছে। আয়তন হিসেবে ২৫
ও ৫০ মিঃ লিটার এর দুটো ব্যুরেট নিয়ে পানি দিয়ে
ধুয়ে আগে স্টপ কর্ক চেক করে নিলো। সব ঠিকঠাক
দেখে সেটাও রাখল হাতের নাগালে। তারপর ছোট
বড় থরে থরে সাজানো কাঁচের তৈরি ক্লিনিক্যাল ফ্লাস্কে
থাকা সবুজ রঙা তরল পিপেটের সাহায্যে
টেস্টিটিউবে রাখল। এসব করতে করতে হঠাৎ
খেয়াল করল ইঁদুরটা এখনো পূর্বের মতোই স্থির
আছে। গা এলিয়ে পড়ি নি অর্থাৎ এখনো সুস্থ আছে।
কতক্ষণ থাকে এখন সেটাই দেখার বিষয়। যদি
ইঁদুরটা সুস্থ থাকে এবং তার মধ্যে পরিবর্তন দেখা
দেয় তাহলে ধরা যায় কষ্ট স্বার্থক। সে আপাতত দৃষ্টি
সরিয়ে নোটে চোখ বুলাল। তারপর অসম্পূর্ণ কাজ
সম্পূর্ণ সারতে ক্লিনিক্যাল ফ্লাস্কের সবুজ তরলের
দিকে মনোনিবেশ করল। বিকেল পেরিয়ে এখন সন্ধ্যা
সাতটা। ধরনীর বুকে গাঢ় অন্ধকার। সিরাত

সন্ধ্যার নাস্তা হিসেবে গরম গরম শিঙাড়া ভাজছেন।
গরম শিঙাড়ার কথা শুনে ড্রয়িংরুম থেকে ছুটে
এসেছে শীতল। মুখভর্তি হাসি নিয়ে অপেক্ষা করছে
কখন গরম তেল থেকে শিঙাড়া তুলে প্লেটে রাখা
হবে। আর সে আগে ভাগে নিজের ভাগটা বুঝে
নিবে। তাকে দেখে সিরাত আগে সতর্ক করলেন,
-‘খুব গরম, খবরদার হাত দিবি না এখন। একটু
থামুক নয়তো হাত, মুখ দুটোই পুড়বি।’
-‘আরে কিছু হবে না। একটু তাড়াতাড়ি তোলো না
মেজো মা।’
-‘তুলছি, বাবা তুলছি। সবুর কর একটু।’
-‘সস কোথায়?’
-‘ পাশেই তো রাখা।’
শীতল সসের পুরো বোতল আর প্লেট নিয়ে সিরাতের
পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল। তার অবস্থা দেখে সিরাত
মুখ টিপে হেসে বলল,-‘হ্যারে শীতল এত খাস গায়ে
লাগে কেন তোর?’
-‘ তাতো জানি না।’
-‘ বিয়ের আগে আমিও তোর মতো’ই ছিলাম। একটু
মোটা হওয়ার জন্য কত আফসোস করতাম। কিন্তু

বিয়ের পরে না খেলেও শরীর স্বাস্থ্য যেন দিন দিন
বেড়েই চলেছে। ডাউট করব তারও উপায় নেই।’

-‘কেন উপায় নেই কেন?’

-‘তোমার মেজাজ চাচ্ছ ওসব ডাউট ফাইট একদমই
পছন্দ করে না। তার নাকি স্বাস্থ্যবতী গলুমলুম মোটা
বউই পছন্দ।’

একথা শুনে শীতল ফিক করে হেসে ফেলল। তাকে
হাসতে দেখে সিরাত

নিজেও হাসলেন। সিরাত একটু বেশিই ফ্রেন্ডলি
বিধায় বাড়ির মেয়েরাও তার কোলঘেঁষা একটু বেশি।
তাকে যেকোনো সমস্যার কথা আগে বলে। সমাধানও
পায় চটজলদি। যেমন শীতলই গল্পে গল্পে পিরিয়ডের
কথাটা আগে সিরাতকেই বলেছিল। সিরাত সিমিনকে
জানিয়েছে। সিঁতারী শুনে সিমিনি আগে ডাক্তার
দেখানোর তাড়া দিয়েছে। ছোটো মা হাসপাতালে যাবে
শুনে সায়েন সিরিয়াল দিয়ে দিয়েছে। তাদের একা
ছাড়বে না বলে শুদ্ধ নিজে নিয়ে গেছে। বাইরে থেকে
এসে জা এবং ছেলে-মেয়ে দুটো খাবে বলে
তাড়াহুড়ো করে রান্না সেজেছে সিঁতারী ও সিরাত।
মোটকথা,

এই পরিবারে সম্পর্কের মেলবন্ধনটা সত্যিই খুব সুন্দর। হিংসা-বিদ্বেষ ও আত্মঅহমিকাহীন প্রতিটা মানুষ। ডুবো তেলে শিঙাড়া ভাজা হয়ে গেলে শীতল প্লেট এগিয়ে দিতেই সিরাত তাকেই আগে তুলে দিলো। শীতল পা ঝুলিয়ে কিচেন কেবিনের উপর বসল। ফুঁ দিয়ে গরম শিঙাড়ায় কামড় বসিয়ে হাতের সাহায্যে মুখের ভেতরে বাতাস করতে লাগল। গরমে জিব পুড়ে যাওয়ার দশা। তবুও সে টুকটুক করে খেতে লাগল গরম গরম শিঙাড়া। সিমিন কেবলই শাহাদত চৌধুরীর সঙ্গে ফোনে কথা বলে রান্নাঘরে এসে দাঁড়িয়েছেন। সিরাতকে কিছু বলতে গিয়ে মেয়ের কান্ড দেখে কথা ভুলে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে রইলেন। মনে মনে নিজের উপর বিরক্ত হলেন।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েও কী বলতে এসেছিলেন মনে করতে না শীতলের উদ্দেশ্যে বললেন,

-‘সায়ন, শুদ্ধ, শখ, স্বর্গের আগে এটাকে বিয়ে দিয়ে বিদায় করব আমি।’

একথা বলে উনি পানির জগ নিয়ে চলে গেলেন। নিজের রাগ তো আর নিজের উপর দেখানো যায় না।

তাই শীতলের উপর রাগাটা দেখালেন। কিছু না
করেও দোষ পেতে পেতে শীতলেরও খুব একটা
গায়ে লাগে না।

তাই সিমিন চলে গেলে সে মুখভর্তি হেসে বিরবির
করে জবাব দিলো,

-‘তাহলে ভালোই হবে। কষ্ট করে গরম শিঙাড়া ফুঁ
দিয়ে খেতে হবে না। বর চিবিয়ে দিবে আমি শুধু
গিলবো।’

তার কথা শুনে সিরাত হাসতে হাসতে চোঁচিয়ে বলতে
গেলেন,-‘এই মেয়ে কি বলে শুনে...! ‘

সিরাত আর পুরো কথা শেষ করতে পারল না শীতল
মুখ চেপে ধরেছে।

সে ইশারা করে মেজো মাকে বলতে বারণ করে প্লেট
নিয়ে কেটে পড়ল।

সিরাতের শিঙাড়া ভাজা হয়ে গেলে ড্রয়িংরুমে
সবাইকে ডাকল। সিঁতারা

মন মরা হয়ে চায়ে কাপে চুমুক দিয়েছে। উনাদের
বিয়ের এতগুলো বছর

হয়ে গেল। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ভরা সংসার। তবুও
শারাফাত চৌধুরীর

অনুপস্থিতে মন ভার হয়ে থাকে। চিন্তা হয় মানুষটার
জন্য। বড় জায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সিরাত আর
সিমিন চোখাচোখি করে মুখ টিপে হাসল। এ নতুন
কিছু নয়। শারায়াত চৌধুরী বিকেলে চলে গেছেন।
কাজ শেষ করে হয়তো সপ্তাহ খানিক পরে ফিরবেন।
উনি না ফেরার অবধি
সিতারার মুখটা ততদিন চুপসে থাকবে। সায়েন বাসায়
নেই। সাওয়ান চৌধুরীর ফিরতে আরো রাত হবে।
বাসায় আছে বাড়ির তিন গৃহিণী আর ছেলে-মেয়েরা।
শুদ্ধ তো দুপুর থেকে নিজের কাজে ব্যস্ত। রুমটা
সাউন্ড প্রুফ বিধায় বাইরে কোনো শব্দ, হাঁক-ডাক
তার কান অবধি পৌঁছায় না। সাম্য, সৃজনের হোম
টিউটর পড়াতে এসেছে। তারা কিছুক্ষণ গাঁইগুঁই
করে পড়তে বসেছে। শখ আর শীতল ড্রয়িংরুমে
আছে। স্বর্ণ'র মাথাব্যথা তাই শুয়ে আছে। তিন জা
চারের কাপ হাতে সিরিয়াল দেখছে। এ সময় তাদের
পছন্দের সিরিয়াল হয়। এটা দেখে রাতের খাবারের
আয়োজন করতে। শখ আঙু ধীরে চা শেষ করে
উঠতেই শীতল বলল,
-‘আপু, চল ছাদে যাই?’

-‘এখন ছাদে? পড়তে বসবি না?’

-‘আমি ছোটো নাকি যে সন্ধ্যার পরপরই পড়তে বসে যাব?’

-‘তাই তো। তা ছোটো আব্বুকে বলি, তুই বড় হয়ে গেছিস তোর বিয়ে দিতে হবে?’

-‘বলো আপু, প্লিজ বলো। পড়াশোনা ভালো লাগে না। আমি বিয়ে করব।’ শীতলের কথা শুনে শখ হেসে ফেলল। কি যে সুন্দর সেই হাসি! এ হাসির জন্য শীতল মনে মনে শখকে একটা নামও দিয়েছে, সুহাসিনী। তবে মুখ ফুটে শখ জানায় নি কখনো। যদি বোনের নামটা পছন্দ না হয় এজন্যই জানায় নি। শীতল পুনরায় ছাদে যাওয়ার কথা বললে শখ জানাল পড়া বাকি আছে। কালকে একটা পরীক্ষা আছে। একথা শুনে শীতলও জোর করল না শখকে যেতে দিলো।★★(প্রথম পর্ব লিখেছিলাম শখ অনার্স ফাইনাল বর্ষের ছাত্রী। গল্পের থিমের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে ইডিট করতে বাধ্য হয়েছি। আপনারও একটু কষ্ট করে ধরে নিন শখ ডাক্তারি পড়ছে। হবু ডাক্তার সে। এই ভুল এবং গল্পের মাঝে বাড়তি কিছু লেখার জন্য আমি সরি)★★

মা -চাটীদের মধ্যে সিরিয়াল দেখতে ইচ্ছে করছে না
শীতলের। সে উঠে রুমে চলে গেল। ড্রেসিংটেবিলের
সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াল। চোখে কাজল দিলো।
কালো টিপ পড়ল। ঠোঁটে লিপবাম দিয়ে আয়নার
দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল। ঠিক সেই মুহূর্তে
স্বর্ণ এসে বলল,-‘বাম থাকলে দে তো।’

-‘কি বাম?’

-‘ঝান্ডুবাম।’

-‘ঝান্ডুবাম নাই লিপবাম আছে, নিবা?’

-‘লিপবাম কপালে দিবো?’

-‘তাই তো, তাই তো। সায়েন ভাইয়ার কাছে
দেখেছিলাম ঝান্ডুবাম।’

-‘আচ্ছা গিয়ে দেখি তাহলে। তা তুই কোথায়
যাচ্ছিস?’

-‘কই কোথাও না তো।’

, -‘তাহলে সেজেছিস যে?’

-‘পড়তে বসব তাই।’

-‘পড়তে বসলে সাজতে হয়?’-‘সাজুগুজু করলে মন
ভালো থাকে। ভালো মন নিয়ে পড়লে পড়া মাথায়
থাকে।’

বোনের যুক্তি শুনে স্বর্ণ বিরক্তমুখে চলে গেল। এ
পাগলের সঙ্গে বকলে মাথাব্যথা বাড়বে বৈ কমবে না।
তাই সে সায়নের বন্ধ রুমের দরজা খুলে রুমে
প্রবেশ করল। অন্ধকারে রুমটাতে লাইট জ্বালাল।
ড্রয়ার, ড্রেসিং,

হাতড়ে ঝান্ডুবাম খুঁজল কিন্তু কোথাও পেল না। এবার
বিরক্তের মাত্রা বাড়ল। হঠাৎ মাথাব্যথায় চোখ খুলে
রাখা দায়। মাথা ধরে সে ধপ করে বিছানায় শুয়ে
পড়ল। এত বড় বাড়ি, এত মানুষ, অথচ কারো কাছে
ঝান্ডুবাম নেই! সে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেও সায়ন
রুমে প্রবেশ করল। আর একটুর জন্য ধাক্কা লাগে নি
দু'জনের। তাকে রুমে দেখে সায়ন ভ্রু কুঁচকে
জিজ্ঞাসা করল,-‘আমার রুমে কি?’

-‘চুরি করতে এসেছি।’

-‘রুমের মালিককে নাকি?’

-‘নিজের জিনিস কেউ চুরি করে নাকি?’

সায়ন হেসে ফেলল। দরজা দিয়ে মাথা বের করে
আশেপাশে তাকিয়ে কেউ আছে কি না দেখে আশ্তে
করে রুমের দরজা আঁটকে দিলো। স্বর্ণ বাঁধা দিতে
গেলে তাকে পেছন থেকে জাপটে ধরে গ্রীবায় থুতনী

ঠেকাল। তার খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি খোঁচাল লাগল স্বর্ণের
মৃসন কাঁধে। স্বর্ণ নিজেকে ছাড়ানোর জন্য ছটফট
করতে করতে বলল,

-‘এভাবে ধরতে বারণ করেছি না? ছাড়ো!’

-‘ধরলে কি হবে?’

-‘বারণ করেছি ধরবে না, ব্যস!’

-‘কিসের ব্যস? কোনো ব্যস, ট্যসে কাজ হবে না।
যখনই ইচ্ছে হবে তখনই ধরব। পারলে আঁটকাস।’

-‘শুনলাম, ফেরার পথে ইনসানের সঙ্গে কথা
বলেছিস।’-‘হুম।’

-‘কি বলেছে তোকে?’

-‘অংকনের কিছু করলে তোমাকে দেখে নেবে।’

-‘শুধু দেখবে? তাতে খুশি সে? দেখবে, ধরবে, নাড়বে
নাহলে ফিল পাবে কিভাবে?’

সায়নের ডাবল মিনিংয়ের কথা শুনে স্বর্ণের ছটফটানি
বেড়ে গেল। নখ বসাল সায়নের হাতে। তবে সায়ন
শব্দহীনভাবে হাসছে। কারণ গালি কিংবা ডাবল
মিনিংয়ে বলা কথা স্বর্ণ পছন্দ করে ন। খুব চটে যায়।
সায়ন তাকে রাগাতে সেই কাজই বেশি করে।

সায়নের শক্তপোক্ত বাহুডোর থেকে নিজেকে ছাড়াতে
না পেরে স্বর্ণ বলল,

-‘ঝান্ডুবাম থাকলে দাও।’

-‘দিতে পারি তাহলে লিপকিস করতে দে।’

-‘দিতে পারি, যদি বৈধ সম্পর্কের দলিলনামা আনতে
পারো।’

-‘বিয়ের কথা বলছিস? চল এখনই বিয়ে করি?’

-‘চুরি করে?’

-‘আপাতত চুরি করে করি।’-‘না, বাসায় জানাও।

যতদিন না কেউ রাজি হবে ততদিন দূরে থাকো।’

-‘তুই খুব পাষণ, নিষ্ঠুর, সেটা কি জানিস?’

-‘জানি।’

-‘ অথচ পাথুরে মনের এই মেয়েটাকে আমি খুব
ভালোবাসি। বউ করার স্বপ্ন দেখি। একথা নিশ্চয়ই
জানিস তাই না?’

-‘না, তাও জানি না।’

-‘কেন জানিস না?’

-‘ কারণ ঘটা করে জানাও নি কখনো। ‘

-‘তাহলে ঘুরে ফিরে আমারই দোষ? ঠিক আছে মেনে
নিলাম। একদিন ঘটা করেই নাহয় জানাব।’

একথা বলে সায়ন স্বর্ণকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে
ধরল। তারপর তার

গালে, গলায় আদর ঐঁকে ছেড়ে দিলো। বালিশের
নিচে থেকে ঝান্ডুবাম বের করে স্বর্ণের হাতে দিতেই
স্বর্ণ দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল। তবে যাওয়ার আগে
বলে গেল, ‘সিদ্ধিকের অফিস থেকে ই-মেইল
এসেছে চেক করো।’সারাদিন ল্যাভে কাজ করে শুদ্ধ
রুমে এলো। সময় নিয়ে শাওয়ার নিলো। তারপর
ফুল কালো ড্রেসআপে রেডি হয়ে বাইকের হেলমেটটা
নিয়ে বের হতেই শীতলের মুখোমুখি পড়ল। শীতলও
ঐঁটো প্লেট নিয়ে বের হচ্ছিল।এতরাতে কি খেয়ে
বেড়াচ্ছে কে জানে! শুদ্ধকে এতরাতে এভাবে দেখে
শীতল মিষ্টি করে হাসল। শুদ্ধর পোশাক দেখে বুঝে
গেছে সে শুদ্ধ এখন বাইক নিয়ে লং ড্রাইভে যাবে।
দীর্ঘ সময় কাজ করে মাইন্ড ফ্রেশ করতে প্রায়ই
মাঝরাতে ড্রাইভে বের হয়। কারণ রাতে ঘুরার মজাই
আলাদা।

শীতলকে অহেতুক হাসতে দেখে শুদ্ধ এক ভ্রঁ উঁচু
করে তাকাল। শীতল তখন ঠোঁটে হাসি ঐঁটে
বলল,-‘লং ড্রাইভে যাচ্ছেন বুঝি?’

-‘কেন, গেলে তোর বড় আব্বুকে নালিশ জানাবি?’

-‘না তা না।’

-‘তাহলে?’

-‘বলছি যে, আমি এতক্ষণ ধরে পড়ছিলাম। আমারও মাইন্ড ফ্রেশ করা দরকার। আমিও আপনার সঙ্গে যাই?’

-‘যাবি বলছিস? নিয়ে গেলে খুশি হবি?’

-‘হুম।’

-‘যা রেডি হয়ে আয়।’ একথা শুনে শীতল খুশি মনে দৌড়ে রুমে চলে গেল। তাকে যেতে দেখে শুদ্ধ হেলমেটের উপর আঙ্গুলের সাহায্যে তবলার মতো করে বাজাতে বাজাতে বিরবির করে বলল,

-‘আমার নামে নালিশ, হুম? চল একবার, বিপদের চৌরাস্তা থেকে যদি ঘুরিয়ে না আনি তো আমার নামও শুদ্ধ নয়।’-‘আমার নামে নালিশ, হুম? চল একবার, বিপদের চৌরাস্তা থেকে যদি ঘুরিয়ে না আনি তো আমার নামও শুদ্ধ নয়।’

একথা বলে শুদ্ধ ঠোঁটে বাঁকা হাসি এঁটে ধীরে সুস্থে সিঁড়ি বেয়ে নামল।

সারা বাড়ি শুদ্ধ। হয়তো গভীর ঘুমে মগ্ন বাড়ির প্রতিটা সদস্য। ড্রয়িংরুম জ্বলজ্বল করছে কৃত্রিম আলোর ঝলকানিতে। গা ঝকঝকে আসবাবও চোখ কাড়ছে খুব সহজে। রাত বিরাতে ছেলে-মেয়েরা কখন পানি খেতে আসে বলা যায় না। অন্ধকারে যাতে ভয় না পায় তাই লাইটটা সারারাত জালানোই থাকে। তাছাড়া শখ একবার আঁধারে পড়ে গিয়েছিল তারপর থেকে শারাদাত চৌধুরীর আদেশে কেউ লাইট অফ করে না। এতরাতে কারো দেখা পাবে না জেনেই মূলত বাইরে যাওয়ার জন্য বের হয়েছিল শুদ্ধ। ইচ্ছে ছিল নতুন ল্যাব'টা ঘুরে আসা। সেখানকার কাজকর্ম কতদূর এগোলো দেখা দরকার। কিন্তু আজ আর যাওয়া হবে না বোধহয়। কারণ যাওয়ার আগে দেখা মিলল ব্যাঙাটির সঙ্গে। সে কি আর জানত ব্যাঙাটি দিনের মতো মধ্যরাতেও টইটই করে ঘুরছে। একা একা প্লেট হাতে করে কিসব খেয়ে বেড়াচ্ছে। তাকে নিয়ে তো আর ল্যাবে যাওয়া যায় না। যদি নিয়ে যায় প্রশ্ন করতে করতে আধ'ম'রা করে ফেলবে? আধ'ম'রা হলেও ছাড় দেবে বলে না মনে না। বরং পাশে বসে ঘ্যানঘ্যান করবে, 'এই শুদ্ধ ভাই আধমরা

কেন হলেন? এক্কেবারে শহীদ হলেও তো পারতেন। শীতল একটু ঘাড়ত্যাড়া একথা তারও অজানা নয়। তাদের দাদীজান'ও এমন ছিল। শীতল চেহারাও পেয়েছে দাদীর মতোই। তার চেহারাখানা নাকি মন শীতল করার মতোই তাই দাদাজান নাম রেখেছিলেন 'শীতল।'

তবে তার ভাষ্যমতে এটা মস্ত বড় ভুল করেছেন দাদাজান। কারণ স্বভাব ও চাল-চলন অনুযায়ী তার নাম রাখা উচিত ছিল; মাথা মোটা ব্যাঙাচি। চৌধুরী নিবাসে তারা মোট সাত ভাই-বোন। ছোটো ভাই-বোনরা সায়নের তুলনায় তাকে একটু বেশিই ভয় পায়। কিছু বললে মাথা তুলে তাকানোর সাহস করে না। বকলে কেঁদে কেটে একাকার তো করেই। এবং দূরে দূরে থাকারও চেষ্টা করে। অথচ ব্যাঙাচিকে কিছু বললে চোখ উল্টে তাকায়। একটু বকলে/মারলে সেই রেশ ধরে সুযোগ বুঝে শোধ তোলারও প্রচেষ্টা চালায়। যদিও শোধ নিতে পারেনি এখন অবধি। হয় ঘটনাটাই ভুলে যায় নতুবা চ্যালাকাঠের মারের ভয়ে নিজেকে দমিয়ে নেয়। তবে কথা দিয়ে দু'একটা খোঁচা মারতে ভুল করতে না। তবে আজ একটা শিক্ষা

দিলেও মন্দ হয় না। এমনিতে তার মর্জিমতো উড়ে-
উড়ে, ঘুরে-ঘুরে, বেড়ানোর পনিশমেন্ট পাওনা
রয়েছে। ধার রাখা কিংবা ফেলে রাখা কাজ একদমই
পছন্দ নয় তার। সুযোগ যখন এসেছে'ই সুযোগ
কাজে লাগানো যাক। সে এসব ভাবতে ভাবতে
দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল। রাত বাজে একটা।
ল্যাবে শুকনো খাবার থাকায় কাজের ফাঁকে ফাঁকে
সেসব'ই খেয়েছিল। কিন্তু গোসলের পর ক্ষুধা মাথা
চাড়া দিয়ে উঠেছে। এখনই কিছু খাওয়া দরকার।
এসব ভেবে হাতের হেলমেট চৌকো আকৃতির কাঁচের
সেন্টার টেবিলের উপর রাখল। ধীর পায়ে এগিয়ে
গেল কিচেনের দিকে। ফ্রিজ খুলে দেখল পছন্দসই
কিছু আছে কি না। গরুর মাংস আর ভাত দেখে
সেটাই বের করল। তারপর ওভেনে গরম করে
খাবার প্লেটে বেড়ে নিয়ে নিঃশব্দে চেয়ার টেনে খেতে
বসল। প্রথম লোকমা মুখে পুরে বুঝল এই রান্নাটা
তার মা সিঁতারা করেছেন। উনার হাতের রান্নার
ঘ্রাণই বলে দেয় খাবার স্বাদ। সে খেতে খেতে একবার
সিঁড়ির দিকে তাকাল। শীতলের আসার নামার নেই।
গাধীটা সাজতে বসল নাকি কে জানে! ধীরে সুস্থে

খেয়ে এঁটো প্লেট ধুঁতে ধুঁতে ভাবল পাঁচ মিনিটের মধ্যে শীতল না এলে চলে যাবে। অযথা সময় অপচয় করা তার স্বভাবে নেই। সে সত্যি সত্যিই ঘড়ি ধরে অপেক্ষা করল। পাঁচ মিনিট পুরো হতে যখন মাত্র দেড় মিনিট বাকি তখন শীতল এলো। পরনে শুদ্ধর মতোই ব্ল্যাক জিন্স, জ্যাকেট। চুলগুলো পনিটেইল করা। গোলাপি ঠোঁটে মিষ্টি হাসি আঁটা। ওর পোশাকের ধরনে মনে হচ্ছে শুদ্ধকে কপি করেছে। শুদ্ধ তার আপাদমস্তক দেখে ধমকে উঠার আগে শীতল বলল,-‘শুদ্ধর ড্রাইভিং পার্টনার শুদ্ধর মতো নাহলে চলে?’

কত বড় স্পৃহা! তার সামনে দাঁড়িয়ে তার নাম ধরে কথা বলছে। না, এর শিক্ষা পাওয়া ফরজ হয়ে গেছে। শুদ্ধ মুখে কিছু বলল না শুধু তাকিয়েই রইল। মুখভঙ্গি দেখে বোঝার উপায় নেই তার মনে কি চলছে। শীতলের খুশির অন্ত নেই। রাতের বেলা বাইকে করে ঘুরার আনন্দে ভুলে বসেছে বলির পাঠাকেও বলির আগে সেবা যত্ন করা হয়। তারপর এককো’পে..!

যদিও শুদ্ধ তাকে বলি দিতে পারবে না তবে আধমরা করাই যায়। শুদ্ধ ব’ক’ছে না দেখে সে আরেকটু

সাহস পেল। দাঁত বের করে হেসে হাতের হেলমেট
দেখিয়ে বলল,

-‘মাথায় হেলমেট থাকবে কেউ চিনবে না, চলো
যাই?’

-‘চেঞ্জ করে আয়!’

শান্ত কণ্ঠে কঠোর আদেশ! তবুও শীতল দমল না
বরং জেদ দেখিয়ে বলল,-‘না।’

-‘তাহলে রুমে যা।’

-‘সেইম সেইম হলে কি হয়?’

শুদ্ধ জবাব দিলো না। তবে ওয়ার্নিং ছাড়া দশ থেকে
উল্টো করে গুনতে শুরু করল। অর্থাৎ দশের মধ্যে
যেতে হবে নয়তো তার যাওয়া ক্যামেল। অগত্যা
শীতল বাধ্য হয়ে রুমে গেল। তবে যেতে যেতে
শুদ্ধকে কিছু গালি দিয়ে ধুঁতে ধুঁতে গেল। পরনের
লেডিস টি-শার্ট বদলে ব্ল্যাক জিন্সের সঙ্গে ব্ল্যাক কুর্তি
পড়ল। ম্যাচিং ওড়না গায়ে জড়িয়ে হেলমেটটাও
মাথায় পরে বেজার মুখে বেরিয়ে এলো। এই
হেলমেট খুলবেও না মুখও দেখাবে না। তাকে
হেলমেট পরে আসতে দেখে শুদ্ধ কিছু বলার আগেই
গটগট করে হেঁটে শুদ্ধর আগে পাকিং লটে গেল।

শুদ্ধ তার পেছন পেছন গিয়ে লাইট অন করে বাইক
বের করতে ভেতরে প্রবেশ করল। সেও গুঁটি গুঁটি
পায়ে

এগোলো। ভেতরে পাশাপাশি দুটো বাইক রাখা।
একটা সাইনের, একটা শুদ্ধর। সাইনেরটা সাদা,
কালো সংমিশ্রনে হলেও শুদ্ধরটা পুরো কালো। অপর
পাশে শারায়াত ও সাওয়ান চৌধুরীর চার চাকার
গাড়ি রাখা। তার

এককোনে শীতলের গোলাপি রঙ্গা সাইকেল।
সাইকেলটা সময় অসময়ে সাম্য, সৃজনও চালিয়ে
বেড়ায়। শুদ্ধ বাইক বের করছে দেখে শীতল চুপ
করে দাঁড়িয়ে আছে। ভেবেছে বেশি কথা বলবে না।
সে কথা বললে কেউ কেউ তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে
কি না! কিন্তু হঠাৎই একটা চিন্তা মাথায় টোঁকা
মারতেই সে ফট করে বলে বসল,

-‘ভাইয়া, বাইকের শব্দে বাড়ির সবার ঘুম ভেঙ্গে
গেলে কি হবে?’

-‘চোর ভেবে তেড়ে আসবে। দু’ঘা বসাতেও পারে।’

-‘শব্দ ছাড়া বাইক বের করা যায় না?’

-‘যায়। এদিকে আয় বাইকটা তোর মাথায় তুলে দেই? তুই মাথায় করে গেট অবধি নিয়ে যা। এতে শব্দও হবে না, কেউ জাগবেও না।’ একথা শুনে শীতল মুখ ভোঁতা করে তাকিয়ে রইল। সব সময় বাঁকা কথা না বললে যেন শান্তি পায় না এই লোক। কথার পিঠে খোঁচা মারতেই হবে তার। খোঁচা না মারলে যেন জাত যায়! শীতল মুখে কুলপ আঁটতেই শুদ্ধ বাইক নিয়ে হেঁটে হেঁটে গেট অবধি গেল। দারোয়ান গেটের সঙ্গে লাগোয়া ঘরটাতে ঘুমাচ্ছে। হঠাৎ গেট খোলার শব্দে উনি ধরফড়িয়ে উঠে শুদ্ধকে দেখে থেমে গেল। আর একটু হলেই ‘এই কোন শালা রে, বলে গালি দিয়ে বসতেন। উনার আবার কথার আগে মুখে গা’লি ছুঁটে। শুদ্ধ উনাকে গেট লাগাতে বলে নিজে বাইকে উঠে বসল। হেলমেট পরল। ফোনে কল এলে কথা শেষ করল। তারপর মূর্তির মতো দাঁড়ানো শীতলের দিকে তাকিয়ে বলল,-‘তুই তাহলে থাক আমি নিমন্ত্রণ পত্র ছাপিয়ে আনি?’

-‘নিমন্ত্রণ পত্র? কার জন্য?’

-‘তোৰ জন্য। দেখে তো মনে হছে বাইকে ওঠাৰ
জন্য তোকে নিমন্ত্ৰণ পত্ৰ পাঠাতে হবে।’

আবারও অপমান! তবে শীতল কথা বাড়াল না
বিনাবাক্যে বাইকে চড়ে বসল। নড়ে চড়ে জামা-
কাপড় ঠিকঠাক করে সুন্দর করে বসল। তখন শুদ্ধ
বলল,

-‘লং ড্ৰাইভে বের হলে আমার যদিকে দু’চোখ যায়,
আমি যাই। আজও যাব। এখনও সময় আছে স’ম’স্যা
থাকলে নেমে যা।’

-‘না, সমস্যা নেই।’

-‘সত্যি তো?’

-‘হুম, একদম সত্যি।’

-‘পরে বড় আকবুর কাছে নালিশ করবি না তো আমি
ভয় টয় দেখিয়েছি। অচেনা রাস্তায় নিয়ে গেছি, জোরে
বাইক চালিয়েছি, হ্যান ত্যান কত কি।’

-‘না, না, কোনো নালিশ করব না, প্রমিস।’

-‘ওকে।’ একথা বলে শুদ্ধ বাইক স্টার্ট করল। শীতল
খুশিতে ডগডগ হয়ে শুদ্ধর কাঁধের উপর হাত রাখল।
কারো মুখে কোনো কথা নেই। অনেকদিন পর
এভাবে বের হয়ে শীতল আশপাশ তাকিয়ে দেখছে।

পাগলাটে সমীরণে উড়ছে তার পরনের ওড়না।
হেলমেট থাকায় মুখভঙ্গি বোঝা যাচ্ছে না। তবে সে
খুশি, ভীষণ খুশি। এর আগেও সায়নের সঙ্গে বের
হয়েছিল। খুব মজা করেছিল দু'জন। কত কিছু
খেয়েছিল। ইচ্ছেমতো ঘুরেছিল। ভাবুক শীতল
ভাবনার জগতে ডুবে খেয়ালই করে নি বাইকের গতি
ধীরে ধীরে বাড়ছে। হাইওয়ে দিয়ে শাঁ শাঁ করে ছুটতে
তাদের বাইক। কোথায় যাচ্ছে জানা নেই। যদিকেই
যাক তাতেও সমস্যা নেই। আজ মন খুলে ঘুরবে।
ঘুরতে ঘুরতে আনন্দ কুড়াবে। তবে এতক্ষণ চুপ
থেকে তার পেটের মধ্যে কথারা যেন তাকে সমানে
খোঁচাচ্ছে। খুব অশান্তি লাগছে। শুদ্ধ ততক্ষণে
হাইওয়ে পেরেছি অচেনা পথের পথ ধরেছে। তার
বাইকের গতিও আরো একটু বেড়েছে। যেন বাতাসের
সঙ্গে উড়ে যেতে চাচ্ছে। বাইকের গতিটা এতক্ষণে
খেয়াল করল শীতল। তাতে তার বুকের ধুকপুকানি
শুরু হলো। ভয়ে দু'হাতে খামছে ধরেছে শুদ্ধর কাঁধের
জ্যাকেট। সে ভয়ে ভয়ে এবার
জিজ্ঞাসা করল,-‘আম..আমরা কোথায় যাচ্ছি ভাইয়া?’
-‘বিপদের চৌরাস্তায়।’

-‘এ আবার কেমন নাম? কোথায় এটা?’

-‘শশ্মান ঘাটের পাশে।’

-‘কিহ্! আপনি আমাকে শশ্মান ঘাটের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন?’

-‘হুম।’

-‘আমি যা..যাব না। বাইক থামান, নামব!’

-‘বাইক থামানো যাচ্ছে না।’

-‘ থামানো যাচ্ছে না মানে?’

-‘বাইকের ব্রেক ফেল!’

-‘ কিহ্! কি বলছেন এসব? এখন কি হবে?’-‘কি আর হবে, ম’রে যাব। ম’র’তে ভয় পেলে ম’রা’র আগে আমাকে আঁকড়ে ধরতে পারিস। মৃ’তপথযাত্রী মা’রা যাচ্ছে ভেবে বে’য়া’দ’বি মাফ করে দেবো।’

শীতল হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে। বাইকের ব্রেক ফেল মানে আজ তার ভবলীলা সাজ্জ! কোন কুক্ষণে এসেছিল সে? বাইকের ব্রেক ফেল অথচ এই লোক এখনো এত শান্ত আছে কিভাবে? এর কি ম’রা’র’ও ভয় নেই?

বাইক চলছে দ্রুত গতিতে। গতি কমার নেই ধাপে ধাপে বাড়তেই আছে।

শীতল এবার কাঁদতে শুরু করল,

-‘যেভাবেই হোক বাইক থামান ভাইয়া। আমি এখনই ম’র’তে চাই না।’

-‘ম’র:ণ কি বলে আসে? আমি সরি রে শীতল, সত্যিই বাইক থামছে না।’-‘একটা গাছের সঙ্গে দুম করে লাগিয়ে দেন। গুরুতর আহত হতে সমস্যা নেই কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ম’রা যাবে না..! ‘

-‘বাংলা সিনেমায় দেখিস নি, গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে স্মৃতি হারিয়ে টাল হয়ে পাবনায় যেতে হয়। তোরও যদি স্মৃতি হারিয়ে যায় তখন কি হবে? এমনিতে কথায় কথায় ভাই, ভাই, করে মুখে ফ্যানা তুলে হেদিয়ে মরিস।

স্মৃতি হারিয়ে আমাকে যে আব্বা ডাকবি না এর গ্যারান্টি কে দেবে, তুই নাকি তোর বাপ?’

-‘পাগল, স্মৃতিহারা হয়েও বাঁচতে যায় আমি। বাঁচান আমাকে। কে আছো বাঁচাও!’

শীতল ভয়ে কাঁদতে শুরু করেছে। আর শুদ্ধ হেলমেটের আড়ালে হেসেই যাচ্ছে। এই মুহূর্তে সে টের পাচ্ছে হাসি চাপিয়ে রাখাও খুব কষ্টের কাজ। এদিকে শীতল বাঁচাও! বাঁচাও! করে সমানে চেষ্টায়ে

যাচ্ছে। তবে নির্জন অন্ধকার রাস্তা বিধায় কেউ শুনছে না। তারা এমন এক রাস্তাতে এসেছে কোনো গাড়িও দেখা যাচ্ছে না। বাইকটা তখনো পূর্বের গতিতে চলমান। এত জোরে বাইকটা চলছে শীতল তার ভারসাম্য বজায় রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। মনে হচ্ছে, এম্ফুণি হাত ফাঁসকে পিচঢালা রাস্তায় আঁছড়ে পড়বে। সে ভয়ে শুদ্ধর পিঠে মাথা ঠেকিয়ে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে বিরবির করে সূরা পড়ছে। তার অবস্থা দেখেও শুদ্ধ বলল,

-‘শীতল বামে তাকা।’

শীতল সেভাবেই ঘাড় ঘুরিয়ে বামে তাকালে শুদ্ধ বলল,

-‘এটা হচ্ছে শশ্মান। অনেক পুরনো শশ্মান। এখানে কত মানুষের আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে কে জানে। কেউ গলায় ফাঁস দেওয়া, গলা কাটা, পা কাটা, হাত কাটা, কত ধরনের লাশ যে পোড়ানো হয়। এর আগেও শুনেছিলাম,

সিংহ রাশির এক পথিক এই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় তার গায়ে ফাঁসির আত্মা ভর করেছিল। পরে সেই আত্মা নাকি পথিককে জ্যান্ত অবস্থাতেই জ্বলন্ত চিতায়

দাঁড় করিয়ে পুড়িয়ে মে'রে'ছিল।'একে তো ঘুটঘুটে
অন্ধকার চারিপাশ। একদম লোকশূন্য এলাকা।
শশ্মান শুনে গা ভার হয়ে আসছে। শীতল আরেকটু
শক্ত করে শুদ্ধর জ্যাকেটটা খামচে ধরে চোখজোড়া
বন্ধ করে নিলো। ভয়ে ঘেমে উঠেছে তার হাতের
তালু। গলা শুকিয়ে কাঠ। পায়ের তালুটাও কেন জানি
শিরশির করছে। বাতাসের শো শো শব্দ অদ্ভুতুড়ে
শোনাচ্ছে। তাকে এতটা নিশ্চুপ দেখে
শুদ্ধ নিঃশব্দে হাসল। তারপর হঠাৎ কিছু মনে পড়ার
মতো করে বলল,

-‘শিট! আমি তো একটা কথা ভুলেই গেছি।’

-‘ক.. কি কথা?’

-‘তোমার কণ্ঠ এমন শোনাচ্ছে কেন? কাঁপছিস না
কাঁদছিস?’

-‘ভা..ভাইয়া বাড়ি যাব।’

-‘যেতে পারলে আমিও খুশি হতাম। কিন্তু সেটা
বোধহয় আর হবে না রে।

তাকে কতক্ষণ সেভ রাখতে পারব তাও বুঝছি না।’

-‘ক.. কক কেন?’-‘আমি তো ভুলেই বসেছি আমারও
সিংহ রাশি। এখন ওই আত্মারা যদি আমার গায়ে ভর

করে? তুই আমাকে জ্বালাস। রাগাস। তোর উপরে
খুব রাগ আছে আমার। আত্মার যদি সেই রাগ তুলতে
তোকে আছাড় মারে? অথবা গলা চেপে ধরে মে'রে
ফেলে? এরা নাকি রক্ত খায়। কচকচ করে মানুষের
নাড়ি ভুড়ি খায়। তোর সঙ্গে যদি এসব কিছু হয় মাফ
করে দিস। মনে করিস এখানে আমার হাত নেই,
আমি নিষ্পাপ! আত্মার হাতে যদি তোর অপমৃ'ত্ব
হয়ও তাহলে নিয়তি ভেবে ধরে নিস। কষ্ট রাখিস না
মনে।

তোকে তো বাঁচাতে পারব না তবে আমি কথা দিচ্ছি
তোর ফতরায় তোর পছন্দের জর্দা নিজের হাতে
বিলাব সবাইকে। শীতল ঠোঁট ভেঙ্গে কাঁদছে। বার
বার নাক টানছে। ভয়ে পরনের কুর্তিটা ভিজে
উঠেছে। ঘা গা চ্যাটচ্যাট করছে। এখন যদি সত্যি
শুদ্ধর গায়ে ভূত ভর করে তাহলে কি হবে? কার
কাছে সাহায্য চাইবে? একথা ভাবতে না ভাবতেই
তার ভয়ের মাত্রা বাড়াল। হাতের বাঁধন ঢিলে হয়ে
আসল। তবে জ্ঞান হারিয়ে পড়ার আগেই শুদ্ধ তার
হাতটা ধরে দ্রুত বাইকটা থামাল।

এতক্ষণ নজর রাখছিল শীতলের উপরে এজন্য ধরতে
পেরেছে সহজে।

সে বাইকে বসা অবস্থায় শীতলকে কাছে টেনে
হেলমেট খুলে দেখে তার মুখটা ঘামে ভিজে আছে।

সে হাত দিয়ে ঘাম মুখে শীতলের গাল চাপড়ে
ডেকেও সাড়া পেল না। পানি না থাকায় চোখে, মুখে
পানি দিতে পারল না। তবে অবচেতন শীতলের
মুখের দিকে তাকিয়ে বিরবির করে বলল,

-‘ কেবল বিপদের চৌরাস্তা পার হলি। এখনো
সর্বনাশের চিপাগলি পার হওয়া বাকি। এত তাড়াতাড়ি
জ্ঞান হারালে হবে, হুম?’ক’দিন ধরে’ই আবু সিদ্দিকের
সঙ্গে নীরব দ্বন্দ চলছে সায়নের। এজন্য অবশ্য
সায়নই দায়ি। আবু সিদ্দিক বার বার বারণ করেছিল
ভুলেও যেন অংকনকে জানে না মারে। এখন
অংকনকে মা’রলে দোষটা উনার ঘাড়ে চাপবে।
এমনিতেই সময় খারাপ যাচ্ছে এখন এসব করা
মানেই নিজের বিপদ বাড়ানো। কিন্তু সায়ন সেকথা
শুনে নি। বরং সে অংকনকে নির্মম ভাবে জ’বাই
করেছে। তারপর শুধু অংকনের মাথাটা পার্সেল করে
তার বাবার কাছে পাঠিয়েছে। কোনো রাজনীতিবিদ

ছেলের কাঁটা মাথা পেলে বসে বসে আঙ্গুল চুষবে না
নিশ্চয়ই! অংকনের বাবাও বসে নেই। পাগলা
কুকুরের মতো খুনিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। উপর মহলের
আদেশে পুলিশও বসে নেই। আবু সিদ্দিককে দলে
একমাত্র সায়নই এভাবে মানুষ মারতে পারে। মা'রে।
এ সন্দেহের বশে পুলিশ আজ সিদ্দিকের কাছে
এসেছিল।

শান্তভাবে হুমকি দিয়ে গেছে। সামনে'ই নির্বাচন।
এখন যদি এসব কেস ঘাড়ে পড়ে জনগন কি ভোট
দেবে? ভোটের আগেই তো জনগন আঙ্গুল তোলা শুরু
করবে। সায়নের এমন বাড়াবাড়িতে ভীষণ চটে আছে
আবু সিদ্দিক। উনি এসব নিয়ে কথা বলতেই
সায়নকে ইমেইল করেছে। স্বর্ণের কথায় ইমেইল
চেক করে সায়ন পার্টি অফিসে এসেছে। পায়ের উপর
পা তুলে বসেছে ঠিক আবু সিদ্দিকের মুখোমুখি। পাশে
দাঁড়িয়ে আছে কনক। সায়ন যদি আবু সিদ্দিকের ডান
হাত হয় তো কনক বাম হাত। তবে অজ্ঞাত কারণে
কনক সায়নকে সহ্য করতে পারে না। কারণ সায়নের
থেকে সে বেশিদিন আবু সিদ্দিকের সঙ্গে আছে। অথচ
সিদ্দিক তার কাজে মত নেওয়া দূর কিছু শেয়ারও

করে না। এই রাগে সায়নের ভুল ধরে বার বার সিদ্দিকের কান পড়া দেয় সে। কিছুক্ষণ আগেও দিয়েছে। সিদ্দিক চেয়ারে বসে জলন্ত সিগারেটের দিকে তাকিয়ে আছে। সায়ন বসে বসে কাঁচা ছোলা খাচ্ছে। খোসা রাখছে চকচকে টেবিলের উপর। তার এহেন কাজে সিদ্দিক ঠান্ডা স্বরে বলল,-‘কিছুদিনের জন্য গা ঢেকে দে সায়ন।’

-‘কার বা’ল ছিঁড়তে?’

-‘ কারোই না। আপাতত নিজের বা’ল বাঁচাতে গা ঢাকা দে। নয়তো তোর পুলিশ বাপ এসে তোর বাল উপড়ে নিয়ে যাবে।’

-‘আসুক। আমিও তাদের বাল ছিঁড়ে বোঝা বেঁধে হাতে ধরিয়ে দিবো।’

মুখে মুখে কথা বলায় সিদ্দিক বিরক্ত হলেও বুঝতে দিলে না। তবে মনে মনে সায়নকে গালি দিতেও ভুল করলেন না। সায়নের এমন দাপট দেখে কনকের গা পিত্তি জ্বলছে। এই ছেলে নিজেকে কি ভাবে কে জানে। তবে এই মুহূর্তে সে চুপ থাকতে পারল না। তাই দাঁতে দাঁত চেপে বলল,

-‘ মা’রা’র কি খুব দরকার ছিল? মা’র’লি মা’র’লি
পার্সেল পাঠাতে গেলি কেন?’

-‘ওকে মারার ক্যাড়া উঠছিল তাই মে’রেছি। তাতে
তোর বাপের কি?’

-‘সায়ন! বাপ তুলে কথা বলবি না।’

-‘বলব, যা পারিস করে নিস।’তাদের তর্কে এবার
ধমকে উঠলেন সিদ্দিক। টেবিলের উপর শক্ত থাবা
বসিয়ে হিসহিসিয়ে বললেন,

-‘ তুই মে’রে’ছিস এসব ঝামেলা তুই সামলামি। এর
একফোঁটা দায় যেন আমার ঘাড়ে আসে।’

একথা বলে উনি হনহন করে বেরিয়ে গেল। সায়ন
পায়ের উপর পা তুলে তখনো কাঁচা ছোলা চিবাতে
ব্যস্ত। পরনে টু কোয়াটার গ্যাবার্ডিন প্যান্ট ও টি-শার্ট।
শারীরিক গঠন দেখে মনে হচ্ছে ভদ্র সভ্য কোনো
চকলেট বয়।

যার মধ্যে হিংস্রতা নেই। রাগ ও ক্ষোভ শব্দের সঙ্গে
পরিচিত নয় নে। সে শান্তিপ্রিয় শান্ত মানুষ। আজ
আর বাসায় ফিরবে না। ইনসানের একটা ব্যবস্থা
করতে হবে। ছেলেটা বড্ড বেশিই লাফাচ্ছে। পা না
কা’টলে তার লাফাতে থামবে না বোধহয়। সমস্যা

নেই তার ব্যবস্থাও সে নিজে করবে। সিদ্ধিক বেরিয়ে
যাওয়ার পর কনকও বের হতে গেলে সায়ন বলল,
-‘আমার ফোনে উঁকি মারার সাহস আর দেখাস না।
প্রথমবার ভুল বলে মাফ করলাম। দ্বিতীয়বার উঁকি
মারা চোখটাই রাখব না। ভুলে যাস না, আমি ছেলে
ভালো তয় মানুষটা খুব খারাপ।’

কনক মনের রাগ চেপে কথাগুলো শুনে চলে গেল।
সায়ন পায়ের উপর পা তুলে এখনো ছোলা খেতে
ব্যস্ত। কাঁচা ছোলা রোজ খায়। ভালোই লাগে তার।
তখন তার ফোনে মেসেজ টোন বাজল। মেসেজ চেক
করে দেখে স্বর্ণ একটা ঠিকানা দিয়ে মেসেজ করেছে,
‘বেস্ট অফ লাক।’ সায়ন হাসল। বড়ই চমৎকার সেই
হাসি। তারপর ছোলা চিবাতে চিবাতে প্যান্টের কোমর
বরাবর হাত রেখে পিস্তলটা ঠিকঠাকভাবে গুঁজল।
ঘাড় ঘুরিয়ে ঘাড়িতে সময় দেখে স্বর্ণকে রিপ্লাই করল,
-‘ধন্যবাদ হ্যাকার সাহেব। আপনার কাজে আমি
বিমোহিত। অভিভূত।

অপেক্ষা করুক বাসায় ফিরেই কড়া চুমু ট্রিট
দিবো।’ __ ‘হ্যালো! কে বলছেন। হ্যা..লো!’

ফোনের ওপাশে নিশ্চুপ নীরবতা। তবে মৃদু শব্দে
বাজছে উইন্ড চাইমের টুং টাং শব্দ। শখ কথা ভুলে
মন দিয়ে শব্দটা শুনল। বাতাস বইছে। সেই বাতাসে
উইন্ড চাইম মিষ্টি সুর তুলেছে। সে কোথায় যেন
শুনেছিল উইন্ড চাইমের টুং টাং শব্দ নেতিবাচক শক্তি
দূর করে ইতিবাচক শক্তি প্রবাহিত করে। মন খারাপ
দূর করে। সেকথা ভেবে শব্দটা কানে আসামাত্রই
কথা ভুলে ফোন কানে ধরে বসে রইল। মন দিয়ে
শুনল। কলদাতাও বোধহয় এটাই চেয়েছিল। তবে
কথা না বলে চুপ করে থাকা একপ্রকার অভদ্রতা।
তাই আরো কয়েকবার হ্যালো! হ্যালো! করে সাড়া না
পেয়ে কলটা কেটে দিলো। মাঝরাতে চেনা/অচেনা
কেউ ফাজলামি করছে ভেবে পড়ায় মন দিলো।
পড়তে পড়তে হঠাৎ একটা ঘটনা মনে পড়ল।
শীতলের ঘুম না এলে পাশের রুমে গুয়ে ফোন করে
বকবক করে। তো একদিন মধ্যরাতে তাকে ফোন
করে বলেছিল,-‘এই আপু, তাড়াতাড়ি আমার রুমে
এসো তো।’

-‘কেন, কি হয়েছে?’

-‘সিলিং ফ্যানটা অফ করে যাও শীত লাগছে খুব।’

-‘এজন্য পাশের রুম থেকে আমাকে ডাকছিস?’

-‘আমি উঠতে পারব না, অলসতা আমাকে জাপটে ধরেছে। তুমি এসো। না এলে ঠান্ডায় নিউমোনিয়ার হলে সব দোষ তোমার।’

সেদিনও জেগে পড়ছিল বিধায় গিয়ে অফ করে এসেছিল। সেকথা মনে করে শখ হাসল। বিরবির করে পড়তে পড়তে পুনরায় তার ফোন বেজে উঠল। সেই নাম্বার থেকে কল এসেছে। ধরবে না ভেবে পড়তে পড়তেই দেখল পরপর কল আসতেই আছে। একবার..দুইবার..তিনবার...করে বারো বারের বেলায় কল রিসিভ করতেই ওপর পাশ থেকে কেউ বলল,-‘তুমি এত পাষণ কেন গো মেয়ে? বেখেয়ালে আমার মন চুরি করলে। ঘুম কেড়ে নিলে। এরপর তোমাকে পাওয়ার নে’শা’টুকু সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিলে। এখন না পাচ্ছি স্বস্তি, না একদন্ড শান্তি। পুরো তুমিটা বি’শ্রী’ভাবে আমার মনে গেঁথে গেছো। চোখ বন্ধ করলেও তোমাকে দেখি আর চোখ খুললেও তুমি। কেন এমন হচ্ছে? কি করেছি আমি? কি দোষ আমার? কেন এভাবে বিপাকে ফেললে আমায়? এমন করাই লাগত? না করলে কি অধর্ম হয়ে যেতো, হুম?’

পুরুষালি ভারী কণ্ঠস্বর শুনে শখ কান থেকে ফোন সরিয়ে নাম্বারটা চেক করল। অচেনা নাম্বার। তবে ভয়েজ শুনে চেনা চেনা লাগছে। মনে হচ্ছে, পূর্বেও মানুষটার সঙ্গে কথা হয়েছে। শুনেছে এই ভয়েজ। সে কে? আর এসব বলার মানে কি? তাই সে জবাব দিলো,-‘কে বলছেন?’

-‘তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া এক হতভাগা নাবিক।’

—‘হেয়ালি কথা আমার পছন্দ নয় তাই যা বলার সরাসরি বলুন। আর ভদ্র ঘরের ছেলেরা পরিচয় না দিয়ে কাউকে কল করে এসব কথা বলে না।’

-‘এতদিন ভদ্র, সভ্য’ই তো ছিলাম। থাকতে দিলে কই? যাই হোক, এখনো চিনতে পারো নি আমায়?’

-‘না।’

-‘আহনাফ বলছি। বিকেলে দেখা হলো, কথা হলো, এরিমধ্যে সব ভুলে গেলে?’এবার চিনতে অসুবিধা হলো শখের। এজন্য বোধহয় ভয়েজ চেনা চেনা লাগছিল। কিন্তু এই লোক নাম্বার কোথায় পেল? সাহস দেখাতে ফোনও করেছে। তবে লোকটা তার বড় ভাইয়ের চেনা হলেও তার কাছে মানুষটা সম্পূর্ণ

অচেনা। আর অচেনা কারো সঙ্গে রাত বিরেতে তার কথা থাকতে পারে না। তাছাড়া ইতিমধ্যে মানুষটার মনোভাব বুঝে ফেলেছে। এরপর আর তাকে পাত্তা দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। হ্যাঁ, পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষের বসবাস। এত এত মানুষের ভিড়ে হঠাৎ কাউকে ভালো লাগতেই পারে। মন হারিয়ে অপরিচিত জেনে আপন আপন লাগতেই পারে। তাই বলে মনের বিরুদ্ধি গিয়ে কাউকে সঙ্গে সঙ্গী করা অযৌক্তিক। তাছাড়া এসব বে'হা'য়া'গি'রি চৌধুরী নিবাসের মেয়েদের সঙ্গে যায় না। মনে মনে একথা ভেবে কল কেটে ফোন সাইলেন্ট করে ফেলল। ফোনের আলো

জ্বললে চোখ যাচ্ছে দেখে ফোনটা উল্টে করে রেখে দিলো। এই ব্যাপারে কিছু বলার নেই তাই কথা বাড়ানো বৃথা। কথার মাঝে কল কাটতে দেখে আহনাফ একের পর এক কল দিতেই থাকল। কিন্তু শখ রিসিভ'ই করল না। তাই অনেকগুলো মেসেজ করল। এরপর'ই কল দিতে গিয়ে বুঝল তার নাম্বার শখের নারীর ব্লাকলিস্টে ঠাঁই পেয়েছে। তবে কেন জানি তার রাগ হলো না। বেলকনি থেকে উঠে রুমে

গিয়ে হাত পা ছড়িয়ে বিছানায় শুলো। ঘাড় ঘুরিয়ে
পাশেন শূন্য জায়গাটা দেখল। তারপর ঠোঁট কামড়ে
হেসে ফোনের গ্যালারিতে থাকা অপরূপ সৌন্দর্যের
অধিকারী একটি মেয়ের ছবি বের করল। খুঁটিয়ে
খুঁটিয়ে মন দিয়ে দেখল। কি চমৎকার তার চোখ,
নাক, ঠোঁট, হাসি। ইশ! এই পুতুলটা কবে তার হবে?
জাপটে ধরে বুকের সঙ্গে মিশিয়ে রাখতে পারবে?
নিজের মনের ভাবনা দেখে সে এবার নিজেই হেসে
ফেলল। তারপর মিটিমিটি হাসতে হাসতে ছবির
মেয়েটাকে উদ্দেশ্যে করে বিরবির করল,

-‘এই যে মিষ্টির মুখের মিষ্টি মেয়ে, একটু
ভালোবাসতে এত বাঁধা কিসের শুনি? এই দুরত্ব যে
ভালো লাগে না। কাছে এসো। আমার হও। আমার
অবুজ মন পুড়িয়ে আর পাষান হই’ও না গো, হই’ও
না।’-‘ধন্যবাদ হ্যাকার সাহেব। আপনার কাজে আমি
বিমোহিত। অভিভূত।

অপেক্ষা করুন বাসায় ফিরেই কড়া করে চুমু ট্রিট
দিবো।’

সায়ন জানে এই মেসেজের রিপ্লাই আসবে না। তাই
ফোনটা পকেট পুরে উঠে দাঁড়াল। পার্টি অফিস প্রায়

সারারাত খোলা থাকে। পোলাপান মিটিং করে।
আলাপ আলোচনায় বসে। কখনো আমোদ ফুটিতে
মাতে।

সায়ন ছোলার খোসা ছড়িয়ে মুখে পুরে বাইক নিয়ে
বেরিয়ে গেল। পরপর ফোনে নোটিফিকেশন না
এলেও বুঝল কার মেসেজ হতে পারে। সে চৌধুরী
নিবাসের কাছাকাছি মোড়ে এসে দেখে কেউ একজন
দাঁড়িয়ে আছে। সে বাইকটা তার সামনে দাঁড় করালে
কালো পোশাকে সর্বাঙ্গ আবৃত মানুষটা বাইকের
পেছনে উঠে বসল। সায়নও বিকাবাক্যে বাইক ছুটাল
ক্ল্যাবের দিকে। পেছনে বসা মানুষটা চুপচাপ দেখে
সায়ন লুকিং গ্লাসে একবার তাকিয়ে চমৎকার করে
ডাকল, Show quoted text

পেয়েও সে কিছুই মনে করে না। ঝটপট উঠে
রিকশা ডেকে উঠে বসে। রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য
সে। রিকশায় বসে সে সায়নের ফোনে কল করে
জানতে চায়, সে এখন কোথায়। সায়ন সেদিন একটা
মিছিলে ছিল। তার ফিরতে দেরি হবে কারণ মিছিল
শেষে পার্টি অফিসে যাবে। একথা শুনে স্বর্ণ সায়নের
বারণ অমান্য করে পার্টি অফিসে যায়। সায়নের

বরাদ্দকৃত রুমে অপেক্ষা করে। সে সায়নের বোন
জেনে কেউ কিছু বলার সাহসও করে না। বরং
চা/কফির সাথে নাস্তা এনে রেখে যায়। তার পাটি
অফিসে আসার কথা কনক সায়নকে জানায়। একথা
শুনে সায়নও ছুটে আছে তাৎক্ষণিক। এসেই রাগে
থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞাসা করে,-‘একা
এখানে কেন তুই? পায়ের নলা কাটতে হবে?’

স্বর্ণ অগ্নি দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সায়নের চোখের
দিকে। চোখ-মুখ, লাল হয়ে আছে অস্বাভাবিকভাবে।
আজ তার চোখের মুখের অবস্থা দেখে সায়ন ভ্রুকুটি
করে তাকিয়ে রইল। সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে
আন্দাজ করে নিলো। নয়তো কড়া বারণ থাকা সত্ত্বেও
এখানে আসার ভুল স্বর্ণ করবে না। একথা ভেবে সে
নিজেকে শান্ত করল। স্বর্ণের মুখোমুখি চেয়ারে বসল।
ঝকঝকে গ্লাসে ঢেকে রাখা পানি এগিয়ে দিয়ে বলল,
-‘কেউ কিছু বলেছে?’

-‘আমি তোমার বেড গরম করি? তোমার সঙ্গে শুঁই?
বীর্য ছাড়া আর কি কি দাও আমাকে? এর জবাব
আগে দাও আমাকে!’ ক্ষীণ স্বরে বলা একথা শুনে
সায়নের কপাল কুঁচকে গেল। সে একবার দরজার

দিকে তাকিয়ে পুনরায় স্বর্গের দিকে দৃষ্টিপাত করল।
এ কেমন কথা? স্বর্গ, শীতল ছোটো চাচার মেয়ে
হলেও শখকে যতটুকু ভালোবাসে তাদেরকেও
কতটুকু ভালোবাসে। নিজের আপন বোন বলে সে
কখনো শখকে আলাদা কিছু দেয় নি। আলাদা করে
শাষণ'ও করে নি। যখন যা দিয়েছে তিনবোনকে
একসঙ্গে। যে যা চেয়েছে সময় করে এনে দিয়েছে।
অথচ আজ স্বর্গের মুখে এই কথা শুনে রাগের পারদ
বাড়ল। উঠে গিয়ে স্বর্গের গাল চেপে ধরে আগুন ঝরা
কণ্ঠে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল,

-‘কে কি বলেছে? বাড়তি চোপা দেখাবি না একদম।
মূল পয়েন্টে আয়। কে বলেছে এসব?’

-‘কে বলেছে তাদের চিনি না আমি। তবে কেন
বলেছে এর কৌফিয়ত তোমাকে দিতে হবে। নয়তো
বাবাকে অন্য বাসা নেওয়ার কথা বলতে বাধ্য
হবো।’-‘এবার বাড়াবাড়ি করছিস স্বর্গ। এখন বাড়ি যা,
আমি দেখছি।’

-‘অকারণে কেন আমাকে এসব বলা হলো? তোমার
কারণে কেন এসব শুনব আমি? তোমার কাজের দায়
নেবো না আমি। ঠিক চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তাদের

শিক্ষা দিবে নয়তো আমি বড় বাবাকে জানাতে বাধ্য
হবো। বাড়ির মেয়েদের রাস্তায় এভাবে অপদস্থ করার
কথা শুনে শারফাত চৌধুরীও বসে আগুল চুষবে না
নিশ্চয়ই।’

-‘আশ্চর্য তো! আমি এসব বলতে বলেছি নাকি স্বয়ং
নিজে এসব বলেছি তোকে? হুদাই চোটপাট
দেখাচ্ছিস কাকে, হুহু?’

-‘এমন কাজ করো কেন যে কাজের রেশ ধরে বাড়ির
মেয়েরা পথেঘাটে অপদস্থ হতে হয়?’

-‘সেই কৌফিয়ত তোকে দিতে হবে?’

-‘প্রয়োজনে তাই দিতে হবে।’সায়ন একথার জবাব
না দিয়ে চোয়াল শক্ত করে শুধু তাকিয়ে ছিল। স্বর্ণ
তার রাগটুকু উগড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে রুমের দরজা
বন্ধ করে বসেছিল।

পরে সায়ন খোঁজখবর নিয়ে সেই ছেলেগুলো কি
করেছে একমাত্র সেই জানে। তারপর থেকে সায়নের
সঙ্গে কথা বলত না। পাশে বসত না। কিছু দিলে
নিতো না। এমনকি ইদের সেলামি দিলে ছুঁয়েও
দেখত না। অনেকে খেয়াল করেছিল। ওদের
দু’জনকে জিজ্ঞাসা করলে জবাব পাওয়া যায় নি

কারো থেকে। সামান্য একটা ঘটনায় সম্পর্কের
অবনতি হচ্ছে দেখে একদিন সাইন'ই তাকে ডেকে
পাঠায়। সরি বলে। জবাবে স্বর্ণ অকপটে বলে বসে
-‘আমাকে তোমার সঙ্গে নাও।’

তার কথা শুনে সাইক হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে
তার ভেজা চুলে ব্যাক ব্রাশ করতে করতে হেয়ালি
সুরে বলল,

-‘সঙ্গে নেবো মানে? রাজনীতিতে নাম লেখানোর কথা
বলছি নাকি?’-‘হুম।’

-‘না নিলে?’

-‘পরিবার আলাদা হওয়ার চমৎকার দৃশ্য দেখতে
নিজেকে প্রস্তুত করো।’

-‘থ্রেট দিচ্ছিস?’

-‘ধরে নাও তাই।’

-‘যে নোং'রা ঘৃ'ণা করিস। সেই নোং'রা গায়ে মাখতে
উঠে পড়ে লাগলি কেন হঠাৎ? কি উদ্দেশ্যে তোর? কি
ঘোট পাকাচ্ছিস তুই?’

-‘রাজি তুমি?’

-‘চোধুরী নিবাসের মেয়ে রাজনীতি করবে স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি আমি। বাবা জানলে কি হবে বুঝতে পারছিঁস?’

স্বর্ণ জবাব দেয় নি। আবার নিজের জেদ থেকে তাকে টলানো যায় নি। একপ্রকার বাধ্য হয়েছিল সায়ন স্বর্ণের জেদের কাছে হার মানতে। এবং সেও শর্ত জুড়ে দিয়ে বলেছিল,-‘কাজের স্বার্থে যা করার করবি তবে আড়ালে থেকে। যত যাই হোক, সর্ব সম্মুখে কখনো তোর নিজের পরিচয় সামনে আনতে পারবি না।’

স্বর্ণ রাজি হয়েছিল। এরপর থেকে সুযোগ বুঝে স্বর্ণের সঙ্গে রাজনীতির আলাপ করত। লেপটপে ছবি দেখিয়ে চিনাতো কে কার বিপক্ষ দল। কে কেমন, কে কোন কাজের সঙ্গে জড়িত। মাঝে মাঝে হোমওয়ার্কের মতো টাস্ক পূরণ করতে হতো। আর বেশিরভাগ টাস্ক হতো কারো সম্পর্ক তথ্য কালেক্ট করা। মোটকথা, সায়নও বুঝত না তাকে দিয়ে কি কাজ করাবে। কি কাজ করলে সবার চোখের আড়ালে থাকবে স্বর্ণ। পরে অনেক ভেবে প্রফেশনালভাবে হ্যাকিং শেখায়। মাসের পর মাস মন দিয়ে হ্যাকিং

শেখে সে। বর্তমানে সে তুখর হ্যাকার। তার কাজ
সায়নের চিহ্নিত করা আইডি কিংবা ফোন হ্যাক করে
সেই ব্যক্তির দুর্বলতা খুঁজে বের করা। তারপর একটি
ফাইল তৈরি করে সেসব সায়নের হাতে তুলে
দেওয়া। আর সায়ন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি খাঁটিয়ে সেগুলোকে
কাজে লাগিয়ে রাজনীতির ফিল্ডে একাই নিজের
জায়গা তৈরি করেছে। কারণ রাজনীতি করতে গেলে
সর্বপ্রথম নিজের পায়ের তলার মাটি শক্ত করা
জরুরি। নয়তো ফিল্ডে টিকে থাকা মুশকিল। আর
এভাবেই দিন যাচ্ছে। সময় কাটছে। ধীরে ধীরে
ক্ষমতাও হাতে এসেছে। তবে এসব করতে করতে
তারা কেউ টের পায় নি, তাদের সম্পর্কের বদল
ঘটেছে। অজান্তে মন দেওয়া-নেওয়া হয়েছে।
ভালোবাসা নামক জালে ফেঁসে গেছে। মোহ কেটে
মায়াতে জড়িয়েছে। এসব যখন টের পেয়েছে কেউ
আর লুকানোর চেষ্টা করে নি। বরং অকপটে স্বীকার
করেছে। গ্রহন করেছে একে অপরের ভালোবাসাকে।
বাড়ির সকলের সামনে থেকে চালাচ্ছে লুকোচুরি
প্রেম। প্রেমের সঙ্গে রাজনীতির মাঠে দাপিয়ে
বেড়াচ্ছে। একজন স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে আরেকজন

আড়াল থেকে শক্তি হয়ে। বাইকে বসা অবস্থায় শুদ্ধ
এখনো শীতলকে ধরে আছে। তার চোখে মুখে
একরাশ বিরক্তি ঝরে পড়ছে। শীতলের চোখ বন্ধ।
ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস পড়ছে। এতক্ষণ ধরে থাকতে
থাকতে হাতও ব্যথা হয়ে গেছে। এইদিকে শীতলকে
ধরে গেলে বাইক পড়ে যাবে বাইক সামলাতে গেলে
তার হাত ফসকে শীতল পড়ে যাবে। এ কোন বিপদ?
কিন্তু এভাবে কতক্ষণ থাকা যায়? সে আরেকবার
শীতলের গাল চাপড়ে ডাকল। সাড়া নেই। নড়চড়
নেই। তাই সে আশেপাশে তাকাতে তাকাতে বলল,-
‘বাড়ির কেউ একসঙ্গে বের হতে দেখে নি।
দারোয়ানকে নাহয় টাকা দিয়ে ক্যাচাপ করা যাবে।
এক কাজ করি আপদটাকে এখানেই ফেলে যায়।
শেয়ালে এসে মাংস খেয়ে ফেললে হাড় গোড় লুকানো
ব্যাপার না।’

একথা বলে তাকে ছাড়তে গেলে শীতল খপ করে
শুদ্ধর দুহাত আঁকড়ে ধরল। ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে
মাথা নাড়িয়ে তাকে ছাড়তে বারণ করল।
তারপর হেঁচকি তুলে কাঁদতে কাঁদতে বলল,

-‘ কি করেছি আমি? সবসময় আমার সঙ্গে এমন করেন কেন?’

-‘তুই না অজ্ঞান ছিলি?’

-‘না। আপনি শুধু শুধু ভয় দেখাচ্ছিলেন তাই অজ্ঞান হওয়ার ভান ধরে ছিলাম।’

একথা শুনে শুদ্ধ দাঁত দিয়ে তার নিচের ঠোঁট কামড়ে এক ভ্রুঁ উচু করে তাকিয়ে রইল। সে আগেই বুঝেছিল শীতল অভিনয় করছে। কারণ আর যাই হোক, অবচেতন মানুষের চোখের দুই পাতা তিরতির করে কাঁপে না। সত্যি সত্যি ফেলে দিচ্ছে কি না দেখার জন্য মিটমিট করে চোখ খুলে না।

সে এই নিয়ে কথা না বাড়িয়ে শীতলকে ইশারা করে বাইক থেকে নামতে বলল। শীতল আশপাশ তাকিয়ে নামল। শুদ্ধ বাইক স্ট্যান্ড করে পকেটে হাত গুঁজে সামনের দিকে হাঁটা ধরল। তাকে হাঁটতে দেখে শীতলও তার সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে মিনমিন করে বলল,-‘বাড়ি যাব না?’

-‘যা, আমি কি ধরে রেখেছি?’

-‘একা একা কিভাবে যাব?’

-‘বাতাসে উড়ে উড়ে যা নয়তো আ’ত্মা’র পিঠে ভর করে যা।’

-‘কথায় কথায় এমন খ্যাচ খ্যাচ করলে সঙ্গে নিলেন কেন?’

-‘আমি নেয় নি তুই স্বেচ্ছায় সঙ্গে এসেছিস।’

-‘এসেছি, এসেছি তাই বলে এভাবে কথা বলতে হবে?’

-‘হবে।’

-‘কেন হবে?’

-‘নয়তো বিশুদ্ধ পুরুষের জাত যাবে।’

শীতল মুখ লটকে শুদ্ধর দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিলো। চাঁদের আলোয় রাস্তা দেখা যাচ্ছে। রাত ক’টা বাজে কে জানে। শুদ্ধ হাঁটছে তো হাঁটছেই। বের হয়েছিল বাইকে করে ঘুরবে বলে অথচ এই বর্বর লোক তখন থেকে হাঁটাচ্ছে তো হাঁটাচ্ছেই। সে এবার আর না পেরে পাশাপাশি চলতে চলতে পুনরায় মুখ খুলল,-‘ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন? সব অন্ধকার।’

-‘এত সুন্দর অভিনয় করলি গিফ্ট না দিলে চলে? তোর গিফ্ট’টা তোকে বুঝিয়ে দিতে ওদিকে যাচ্ছি।’

-‘গিফ্ট! সত্যি আমি সুন্দর অভিনয় করেছি?’

-‘হুম।’

-‘কি গিফ্ট দিবেন শুদ্ধ ভাই, বলুন না প্লিজ, বলুন বলুন।’

-‘সামনে একটা পুকুর আছে। ভাবছি, সেখানে তোকে নিয়ে গিয়ে চুবাবো। ছোটো গিফ্ট বলে মন খারাপ করিস না, এখন পুকুরে চুবাই কাল নাহয় নদীতে চুবিয়ে আনব।’ শীতল থেমে গেল। ওর নিজের পায়ের জুতো খুলে নিজের গালে মারতে ইচ্ছে করছে। সে কেন ভুলে যায় এই লোক আস্ত একটা ব’দ’মা’শ। বোম মারলেও তার মুখ দিয়ে সুন্দর কথা বের হয় না, হবেও না। কোনোমতে প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারলে কোনোদিন এই লোকের সঙ্গে বের হবে না। এই বিশুদ্ধ পুরুষ তাকে নিয়ে বেড়ানোর জন্য কেঁদে ম’রে গেলেও যাবে-না, না, না! আসার সময় ভেবেছিল যা কিছু ঘটুক বড় আব্বুকে কিছু বলবে না। কিন্তু না, সে বাড়ি গিয়ে বড় আব্বুকে ফোন করবে। পাই টু পাই সব বলবে, সব। ছেলের এই কাণ্ডে যদি বড় আব্বু বিচার না করে তবে সেই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। তাকে চুপচাপ দেখে শুদ্ধ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। তারপর ফিচেল হেসে বলল,-‘বড় আব্বুকে কথা

লাগানোর পা'য়'তা'রা জুড়েছিস তাই না? তা তোর
বড় আব্বুকে ভয় পাই নাকি আমি?'

শীতল বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে দেখল সামনে দাঁড়ানো
মানুষটাকে। এ লোক তার মনে কথা বুঝল কিভাবে?
তারমানে আশা ভরসা নেই সত্যি সত্যিই এখন
পুকুরে চুবাবে। তাই সে ধপ করে বসে পড়ল। তাকে
বসতে দেখে শুদ্ধ হাঁটা থামিয়ে কপাল কুঁচকে বলল,
-‘বসলি কেন? দেরি হয়ে যাবে তো চল, উঠ,।’

-‘লাগবে না গিফ্ট। বাড়ি যাব।’

-‘তা বললে হয় নাকি? হয় গিফ্ট নিবি নতুবা শর্ত
মানবি। বল কোনটা করবি?’

-‘কি শর্ত শুনি?’

শুদ্ধ তার পাশে বসল। পকেট থেকে দিয়াশলাই আর
সিগারেট বের করে জ্বালিয়ে দুটো টান দিলো।
তারপর শীতলের দিকে সিগারেটটা বাড়িয়ে দিয়ে
বলল,-‘নে সুখ টান দে। ‘

আজ যেন শীতলের অবাক হওয়ার রাত। এই বিশুদ্ধ
পুরুষ তাকে আজ অবাক করতে করতে মা'র'বে
বোধহয়। সে খাবে সিগারেট! এই লোকটা কি পাগল
হয়ে গেছে? তাকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে

দেখে মনে করিয়ে দিলো হয় সিগারেট খেতে হবে
নয়তো পুকুরে চুবাবে....! শীতল কিছু একটা ভেবে
সিগারেট হাতে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলার আগে শুদ্ধ হাতটা
চেপে ধরল। তারপর তাকে চেপে ধরে সিগারেট
খাওয়াতে গেল শীতল ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কেঁদে দিলো।
তাকে কাঁদতে দেখে শুদ্ধ ওকে ছেড়ে দিয়ে বলল,
-‘খেতে হবে না সিগারেটে শুধু ঠোঁট ছোয়াবি, নে
ছোঁয়া।’

-‘ন..না।’

-‘কি, কি বললি আবার বল?’ শুদ্ধর মারকাঠ মুখভঙ্গি
দেখে শীতল ফোঁপাতে ফোঁপাতে হাতে সিগারেট
ধরল। তারপর জ্বলন্ত সিগারেটে ঠোঁটের কাছে
আনতেই ফোনের ফ্ল্যাশ জ্বলে উঠল। সেই সঙ্গে শুদ্ধর
বলা একটি কথা,

-‘হেই লেডি স্মাইল প্লিজ!’

হঠাৎ ফোনের ফ্ল্যাশ জ্বলে ওঠায় শীতল দৃষ্টি তুলতেই
শুদ্ধ সেই অবস্থায় ফটাফট কয়েকটা ছবি তুলে
নিলো। তারপর ছবিগুলো তাকে দেখিয়ে বলল,-
‘এবার তোর কাজ হলো, বাবা-মাকে আমার জন্য
পাত্রী দেখতে বলবি। জোর করে আমাকে যাতে বিয়ে

দেয় এটা বোঝাবি। উনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করলে
আমি সবার সামনে না, না, করব। রাগ দেখাব।
টিংকার টিংকার করে পরিস্থিতি ঘোলাটে করে দেবে।
তবুও তুই কাজ থামাবি না যেভাবে হোক সবাইকে
রাজি করাবি, মনে থাকবে? যা বললাম পাই টু পাই
করবি। যদি না করিস ছবিগুলোর তিন চৌধুরী কর্তার
ফোনে চলে যাবে।’

শুধুর করা কাজ ও কথা শুনে শীতল আহাম্মক হয়ে
তাকিয়ে আছে। সে আপাতত হতবাক, হতভম্ব।
খুনশুঁটি, ঝগড়া, করতে করতে সায়ন, স্বর্ণ এসে
পৌঁছেছে একটি পুরনো মন্দিরের সামনে। এই
মন্দিরে আগে কালীমূর্তির পূজা হতো। মন্দিরের
পুরোহিত রামকৃষ্ণ চরণের কা’টা ম’ডু পাওয়ার পর
থেকে পূজো অর্চনা বন্ধ থাকে। এরপর নানান
কুসংস্কার ছড়াতে ছড়াতে ধীরে ধীরে মন্দিরটি
একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। কালীমূর্তি সরিয়ে অন্যত্র
স্থানান্তর করা হয়। দিনে দিনে মন্দিরের পলেশ্তারা
খসে, অযত্ন-অবহেলায় মন্দিরটি সৌন্দর্য হারায়।
কদর হারায়। বর্তমানে দিনেও নাকি এখানে আসার

সাহস করে না কেউ। এলে নাকি গা মাথা ভার হয়ে আসে। ভয়ে শরীর শিউরে ওঠে।

তবে নিস্তর্র এরিয়া দেখে মাঝেমাঝেই জুয়াখোরদের আনাগোনা দেখা যায়। দিনের বেলায় মন্দির থেকে দূরত্বে দলবেঁধে জুয়ার আসর বসায়।

তারপর সন্ধ্যার আগে আগে ফিরে যায়। এমনই এক জায়গায় স্বর্ণ আর সায়ন এসে দাঁড়িয়ে আছে। মশার কামড়ে হাত-পা জ্বলতে শুরু করেছে। সায়ন এতক্ষণ শান্ত শিষ্ট থাকলেও এবার তার মুখ দিয়ে গালির ফোরায়া ছুঁটতে শুরু করল। একপর্যায়ে রাগে গজগজ করে পকেট থেকে ফোনটা বের করে কাউকে কল করে বলল,

-‘ওই আমার শা’উ’য়া’র বা’ল মশকরা মারাও আমার লগে? আমি কি তোমার শালা লাগি? পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসবি নয়তো আজ তোকে এমন ঠা’প দেবো বাপ ডাকাও সময় পাবি না শা’লা ভ্যা’ড়া’চু’দা।’

ফোনের ওপাশে থাকা মানুষটা কি বলল শোনা গেল না। শোনার ধৈর্য্যও নেই সায়নের। সে নিজের কথাটা শেষ করে কল কেটে হাত-পা ঝাড়ছে।

একদফা মশাকেও গালি ছুঁড়ল সে। তাকে গালি দিতে দেখে স্বর্ণ বিরক্ত মুখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। এই মানুষটা বাড়ি থাকাকালীন একরকম, বাড়ির বাইরে অন্যরকম। কতদিন বলেছে গালি না দিতে, কিন্তু শুনলে তো! তাকে এভাবে তাকাতে দেখে সায়েন আরেকটু কাছঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল,-‘ভয় লাগছে জান?’

-‘তোমার মতো ভূত সঙ্গে থাকতে ভয় কিসের?’

-‘তা ঠিক, তা ঠিক। কিছু খাবি, খিদে পেয়েছে?’

-‘যদি বলি হ্যাঁ। এই জঙ্গলের মধ্যে কিছু এনে দিতে পারবে?’

-‘পকেটে কাঁচা ছোলা আছে খাবি?’

-‘না।’

-‘তাহলে আমাকে খা।’

স্বর্ণ মুখে বিরক্তিকর শব্দ করে প্রসঙ্গ পাল্টাতে বলল,

-‘সত্য গালি দিতে খুব কষ্ট হয় তোমার?’

-‘গালি ভদ্র সত্য হয় নাকি? মাথার চাঁদি গরম না হলে সেটা গালি বলে গণ্য করা হয় না জান। চিন্তা করিস না তোকেও শিখিয়ে দেবো। একদিন দেখবি, তুই আমার থেকেও বড় মাপের গালির মাস্টার হয়ে যাবি।’

-‘তোমার গা’লি রেকর্ড করে বড় মাকে শোনার
ভাবছি। ‘

-‘এভাবে কট খাওয়াস না জানপাখি। আমার মা সহ্য
করতে পারবে না।’ একথা শুনে স্বর্ণ ঠোঁট কামড়ে ধরে
নিঃশব্দে হাসল। তাকে হাসতে দেখে সায়ন শক্ত
থাবায় দুই গাল চেপে ধরে ঠোঁটে শব্দ করে চুমু
খেল। এরপর দু’গালে। স্বর্ণ তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে
গাল, ঠোঁট মুছে কিছু বলার আগে সেখানে গাড়ি
আসার শব্দ পেল। সায়ন স্বর্ণের হাত টেনে আড়ালে
সরে উঁকি মেরে ঠোঁটের কোণে তাচ্ছিল্যের হাসি
আঁটল। তার ধারণায় ঠিক, সিদ্দিকের চ্যালা কনক
এসেছে। ইনসানের সঙ্গে কি ঘটবে সেটার প্রমাণ
হাতাতে স্ব-শরীরে উপস্থিত হয়েছে। প্রমাণ টমাণ কিছু
পেলে সিদ্দিককে দেখিয়ে তাকে দল থেকে বাদ
দেওয়ার চমৎকার ফন্দি। কিন্তু এত কাঁচা কাজ করার
মানুষ সে নয়। কনককে একটু খেলানো যাক। একথা
ভেবে সে স্বর্ণের দিকে তাকিয়ে বলল,

-‘জান, শালাকে কিছু দিয়ে আয় তো।’

-‘কি দেবো, চুমু টুমু কিছু?’

-‘একদম জানে মেরে দেবো আমার ভাগের জিনিস অন্যকে দিলে। এক কাজ করি, ওর ভবিষ্যতের উপর ঠা’ড়া ফেলে আসি। যাতে সমন্ধির পোষিয়ে পিরিতে বসেও নিজের পুরুষত্ব নিয়ে ভয়ে থাকে।’

-‘যাবে যাও, বলার কি আছে? তবে তাড়াতাড়ি এটাকে বিদায় কোরো আরেক পাখি যে কোনো সময় চলে আসতে পারে।’-‘হুম। তুই এখানেই থাক আমি যাব আর আসব।’

-‘সাবধানে। ভুলেও বুঝতে যেন না পারে এটা তুমি। স্মরণে রেখো আসল কাজ এখনো বাকি।’

স্বর্ণের কথা শুনে সায়েন সম্মতি সূচক মাথা নাড়িয়ে একদৌড়ে কনকের গাড়ির কাছে গেল। কনক আশপাশ উঁকি মেরে কারো উপস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছে। বোকা কনক সায়েনের সুবিধা করতে গাড়ির লাইটটা অফ করেই গাড়ি থেকে নেমেছে। এই সুযোগেই সায়েন কনকের মাথায় ওড়না পেঁচিয়ে একের পর এক লাখি বসাল প্যান্টের চেইন বরাবর। আচমকা আক্রমণে কনক কিছু বুঝতে উঠতে পারল না। আর না নিজেকে সেইভ করার সুযোগ পেল।

একের পর এক লাথিতে প্রচণ্ড ব্যথায় গোঙ্গাতেই আরেকটা গাড়ি শব্দে সায়ন ছুটে পালালো। ওটা সায়নের গাড়ি ভেবে কনকও দেরি করল না। কোনোমতে মুখ থেকে ওড়না সরিয়ে গাড়িতে বসে গাড়ি স্টার্ট দিলো। জান নিয়ে বেঁচে ফিরলে পরেও ব্যথাস্থানে হাত বুলানো শোক প্রকাশ করা যাবে।

এদিকে সায়ন কনককে ইচ্ছেমতো পিটিয়ে স্বর্ণের কাছে গিয়ে হাতের ইশারায় বোঝাল, আসল পাখি'ও এসে গেছে। ততক্ষণ ওই গাড়িটা এসে থেমেছে তাদের থেকে একটুদূরে। জুলিয়া নামের মেয়েটি ড্রাইভিং সিটে বসে ইনসানকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে গেল। মাল খেয়ে টাল হওয়া ইনসান জানতেও পারল না তার বর্তমান অবস্থান কোথায়। প্ল্যান করে জুলিয়া তাকে কোথায় নামিয়েছে। কেনই বা এখানে নামিয়েছে।-‘এবার তোর কাজ হলো, বাবা-মাকে আমার জন্য পাত্রী দেখতে বলবি। জোর করে আমাকে যাতে বিয়ে দেয় এটাই বোঝাবি। উনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমি সবার সামনে না, না, করব। রাগ দেখাব। চিৎকার টিৎকার করে পরিস্থিতি ঘোলাটে করে দেবে। তবুও তুই কাজ থামাবি না,

যেভাবেই হোক সবাইকে রাজি করাবি, মনে থাকবে?
যা বললাম পাই টু পাই করবি। যদি না করিস
ছবিগুলো তিন চৌধুরী কর্তার ফোনে চলে যাবে।’

শুদ্ধর কথা ও কাজে শীতল আহাম্মক হয়ে তাকিয়ে
আছে। সে আপাতত হতবাক, হতভম্ব। জবাবে কিছু
বলার মতো শব্দ তার শব্দ ভান্ডারে নেই।

সে বিয়ের জন্য পাগল অথচ এতদিন এমন ভাব
করত যে বিয়ে বিদ্বেষী।

না, যে করেই হোক আগে বাড়ি পৌঁছাতে হবে। এখন
কিছু বললে সত্যিই যদি জোর করে সিগারেট খাইয়ে
দেয়? নতুবা পুকুরে চুপায়? কোনোমতে

ঘাড়ত্যাড়াটার সঙ্গে তাল মেলানো যাক, পরেরটা পরে
ভাবা যাবে। মনে একথা ভেবে শীতল শুদ্ধকে রাগাল
না বরংতালে তাল মিলিয়ে দাঁত বের হাসল। বোকা
বোকা হাসি আর কি! এছাড়া বাঁচার জন্য কোনো
উপায়ও নেই। তারপর শুদ্ধর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে
আকাশের চাঁদের দিকে কিছুক্ষন তাকিয় ভাবল, শুদ্ধ
ভাই হয়তো কাউকে পছন্দ করে। বিয়ে করতে চায়।
লজ্জায় বিয়ের কথা কাউকে বলতে পারছে না তাই
হয়তো বোঝানোর দায়িত্ব তাকে দিচ্ছে। কিন্তু বিশুদ্ধ

পুরুষের লজ্জা আছে একথা ভাবতেও তার লজ্জা
লাগছে। যে কারণে অকারণে অন্যের লজ্জার পিন্ডি
চটকায় তার আবার লজ্জা! তাছাড়া সায়ন ভাই শুদ্ধ
ভাইয়েরও বড়। বাড়ির বড় সন্তান হিসেবে সায়ন
ভাইয়ের বিয়ে নাহলে শুদ্ধ ভাইয়ের পথ ক্লিয়ার না।
আবার সায়ন ভাই কোনো কারণে বিয়ে করতে রাজি
না অর্থাৎ অপেক্ষা

আর অপেক্ষা। হলেও হতে পারে ভাবি হয়তো শুদ্ধ
ভাইকে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছে। বিয়ে না করলে হাত
কেটে ফালা ফালা করার ভুমকি দিচ্ছে। এজন্য হয়তো
বিশুদ্ধ পুরুষ হঠাৎ বিয়ের জন্য এত উতলা হয়ে
উঠেছে। তবে ভালোই হবে বাড়িতে একটা বিয়ের
আয়োজন হলে। অনেকদিন 'ই হলো বিয়ে বাড়ির
রোস্ট, রেজালা, বোরহানি, খাওয়া হয় নি। তবে শুদ্ধ
কিংবা সায়ন যারই বিয়ে হোক ওরা তিনবোন সেইম
ডিজাইনের লেহেঙ্গা কিনবে। সাজগোজ করবে চোখ
ধাঁধানোর মতো করে। মনে মনে এমন কথা ভাবতে
ভাবতে তার মন খারাপ দূর হয়ে গেল। ভাবল শুদ্ধকে
বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে বাড়ির সবাইকে খুব করে
বোঝানোর চেষ্টা করবে। সে

যতই হোক চাচাতো ভাই, ভাইই তো! ছোটো বোন
হিসেবে ভাইয়ের সব কষ্ট দূর করার দায়িত্ব আছে
না? সেই দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবে সে। শুদ্ধ
ভাইয়ের কষ্ট বুঝে সরলমণা শীতল কিছুক্ষণ আগে
ঘটনা মাফ করে দিলো। তারপর নরম দুর্বাঘাস টেনে
তুলতে তুলতে বলল,

-‘ভাবির ছবি দেখি।’

-‘কোন ভাবি?’

-‘আপনার বউ আমার ভাবি হচ্ছে না? সেই ভাবির
ছবি দেখান।’

-‘তোর ভাবির ছবি আমার কাছে থাকবে কেন?’

-‘ওমা, নিজের বউয়ের ছবি নিজের কাছে রাখবেন
না?’

-‘না, রাখব না।’

-‘কেন রাখবেন না?’

-‘আমার ইচ্ছে।’-‘ছবি রাখবেন না। তাকে দেখাবেনও
না। তাহলে তাকে বিয়ের জন্য মরে যাচ্ছেন কেন?’

-‘বিয়ে জন্য মরে যাচ্ছি তোকে কখন বললাম?’

-‘বলতে হবে কেন? আপনার অবস্থা দেখে যা বোঝার
বুঝে গেছি।’

-‘আমার শাৰীৰিক সমস্যা আছে অথচ আমি জানি না, তুই জানিস। আমি বিয়ের জন্য মৰে যাচ্ছি অথচ আমি মৰাৰ ফিল পাচ্ছি না, এটাও তুই নাকি পাচ্ছিস। কাহিনী কি, ঝেড়ে কাশ দেখি? তা কাজিন উপন্যাস পড়ে তুইও সেই কাহিনী রচনা করতে চাচ্ছিস নাকি?’

শুদ্ধৰ কথা শুনে ৰাগে দুঃখে শীতলৈৰ ইচ্ছে কৰল হেলমেটটা দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিতে। মাথা ফাটানোৰ পৰ কলার ঝাঁকিয়ে হিসহিসিয়ে বলতে, ‘আপনার মতো ঘা’ড়’ত্যা:ড়া, অ’ভ’দ্র, অ’স’ভ্য পুৰুষকে নিয়ে কখনো কোনো কাহিনী রচিত কৰব না আমি। যদি কৰিও, তাহলে আমি ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের বউ।’

একথা মনে মনে বললেও শুদ্ধ আন্দাজে টিল ছুঁড়ে গমগমে সূৰে জবাব দিলো,

-‘কান খুলে শুনে ৰাখ, বিয়ের অভাবে যদি ক’ল্লা’লসার হয়ে যাই তবুও তোকে বউ বানাব না। যে মেয়ে আমার কোলে হিসু কৰে দেয় আর যাই হোক সেই মেয়েকে আমার বউ বানানোৰ কথা ভাবতেও পাৰি না আমি।’-‘এক খোঁটা আর কতদিন দিবেন?’

-‘ম’রা’র আগ পর্যন্ত।’

-‘তা ম’রবে’ন কবে? প্লিজ তাড়াতাড়ি ম’রে যান আমি আপনার অত্যাচার থেকে নিস্তার পাই।’

-‘ একা মরতে ভালো লাগছে না চল দু’জন একসাথে ম’রি?’

শীতল অগ্নি দৃষ্টিতে শুদ্ধর দিকে তাকিয়ে আছে। শুধু পারছে না শুদ্ধকে দাঁতে তলায় পিষতে। তাকে এভাবে তাকাতে দেখে শুদ্ধ মাথার নিচে হাত দিয়ে ঘাসের উপর শুয়ে উপর। তারপর যৌবনবতী পূর্ণিমা চাঁদের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের কোণে ফিচেল হাসি এঁটে বলল,-‘ প্রায়দিনই স্কুল থেকে ফিরে দেখতাম ছোটো মা তাকে কোলে নিয়ে ভাত খাচ্ছে নয়তো অন্য কোনো কাজ করছে। না কারো কোলেও যেতি আর না দুদন্ড কাউকে শান্তি দিতি। রাত-দিন শুধু কান্না করতি। ছোটো মায়ের কষ্ট দেখে আমি জোর করে যদি বা একটু কোলে নিতাম অমনি হিসু করে দিতি।’

শীতলের আর সহ্য হলো না সে উঠে হাঁটা ধরল। ঘুরে ফিরে একই গল্প! ছোটো থাকতে সবাই এমন করে। তখন যদি জানত ওই কাজের জন্য বছরে

ছত্রিশবার করে খোঁটা শুনতে হবে তাহলে জীবনেও তার কোলে যেতো না। জয়েন্ট ফ্যামিলিতে থেকে তারা বড় হয়েছে। বাসায় ছোটো বাচ্চা থাকলে সবাই কোলে নেবে, আদর করবে, সেই বাচ্চা কোলে উঠে হিসু করবে এটাই স্বাভাবিক। তার বেলায়ও এটাই কাহিনী। অথচ এই লোক সুযোগ পেলেই সেই গল্প জুড়ে দিয়ে মেজাজ খারাপ করে দেয়।

সে এখন বড় হয়েছে, বুঝতে শিখেছে। এসব শুনে তার কি লজ্জা লাগে না? তাও ওই একই কথা, একই গল্প। শীতল চলে যাচ্ছে দেখে শুদ্ধ ধীরে সুস্থে উঠল। ঠোঁটে বাঁকা হাসি এঁটে জামা কাপড় ঝেড়ে সেও পিছু পিছু গেল। হাঁটতে হাঁটতে যেখানে শুদ্ধর বাইকটা স্ট্যান্ড করা সেখানেই এসে শীতল থামল। একটুপরে শুদ্ধ এসে বাইকে বসে আরেকটা খোঁটা মারল,-‘কিছু কিছু মানুষ আছে অন্যের কোলে হিসু করে বড় হয়। তারপর তার কর্মের কথা মনে করলে চোটপাট দেখায়। উপকার পেয়ে উপকারীকে যাচ্ছে তাই বলে এরা। আফসোস দিন দিন মানুষের বিবেক পঁচে যাচ্ছে।’

আবারও খোঁচা শুনে শীতল জ্বলে উঠল আপন
শক্তিতে। সেও ঝগড়ুটে গলায় বলে উঠল,
-‘গ্যাদাকালে আমি মানুষের কোলে চড়ে হিসু করেছি,
আপনি করেন নি?’
-‘না করি নি। আমি কারো মতো এত বে’হা’য়া না
যে, যার তার কোলে চড়ে হিসু করে ফোঁকলা দাঁত
বের করে হাসব।’
-‘কি করলে হিসুর কলঙ্ক থেকে মুক্তি পাবো বলবেন
প্লিজ! আপনার এই খোঁচামার্কী কথা শুনতে শুনতে
আমার কানের পোকা বের হয়ে গেছে।’
-‘পোকা বের হয়ে গেছে মানে? তুই কানে পোকা
পালতি নাকি? বাড়ির পেছনেই তো অনেক জায়গা
পড়ে আছে।’
-‘দেখেন শুদ্ধ ভাই শুধু শুধু কথা প্যাঁচাবেন না।
আপনার পায়ে পড়ি ছোটো বেলার কাহিনী থেকে
আমায় মুক্তি দেন।’
একথা শুনে শুদ্ধ বাইকে বসা অবস্থায় এক পা
এগিয়ে দিয়ে বলল,
-‘আগে পা ধর। পা না ধরে ‘পায়ে পড়ি’ বলে দাঁড়িয়ে
থাকা একপ্রকার বে’য়া’দ’বি। একটা মানুষের কথার

সাথে কাজেরও মিল থাকা জরুরি।’-‘কি আশ্চর্য! আমি তো কথার কথা বললাম।’

-‘বললি যখন ধরতে কি সমস্যা? আর কলঙ্ক থেকে মুক্তির একটাই পথ আমার বিয়ের ব্যবস্থা করা। বিয়ের একমাস না পেরোতেই বাপ হবো। প্রতি বছর একটা করে ছানাপোনা ফুটাব। তারপর ছানাদের হিসু করাব তোর কোলে। আমার কোলে তুই হিসু করেছিস আমার ছানারা তোর কোলে হিসু করবে, হিসাব বরাবর।’

-‘ঠিক আছে তাই হবে। আমার জীবনে এখন একটাই টার্গেট আপনাকে বিয়ে করানো।’

একথা বলে শীতল গজগজ করতে করতে বাইকের পেছনে চেপে বসল।

তাকে বসতে দেখে শুদ্ধ বাইক ছুটল অজানা পথ ধরে। রাত বাড়ছে ধরা বাঁধা নিয়মে। অজানা পথ। অচেনা গন্তব্যে ছুটছে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে। কি মনে করে শীতল মাথা থেকে হেলমেট খুলতেই তার চুলগুলো অবাধ্য হয়ে উঠতে লাগল। শুদ্ধ ধমকে উঠলেও পাত্তা দিলো না। বরং প্রাণ ভরে শ্বাস নিলো। মুক্ত বাতাসে চোখ বন্ধ করে দুই হাত দু’দিকে

প্রসারিত করে মিষ্টি করে হাসল। কোনদিকে বাইক
যাচ্ছে সে জানে না। যেদিকে যাচ্ছে যাক, তার
ভালোই লাগছে। এই রাস্তায় লাইট থাকায় তেমন ভয়
লাগছে না। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর শুদ্ধ বলল,
-‘প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরতে চাইলে আগে চুল বেঁধে
হেলমেট পর। নয়তো এক্সিডেন্ট করে দু’জনের
ভবলীলা সাজ হতে দেরি লাগবে না।’ শীতল শুনল না
বরং টেনেটুনে শুদ্ধর হেলমেটটাও খুলে নিলো।
বাতাসে উড়তে লাগল শুদ্ধর চুল। শুদ্ধ বেয়াদব,
টেয়াদব, বলে ধমকালেও কিছু মনে করল না। কারণ
এ তো আর নতুন কিছু না। এসব সে রোজ শুনে।
তাই আরেকটু সাহস দেখিয়ে পেছনে থেকে শুদ্ধর চুল
টেনে দিতে দিতে বলল,

-‘একটা কথা বলি?’

-‘না।’

-‘বলি না প্লিজ! না বললে পেট ব্যথা করবে আমার।’

-‘(...)’

-‘কিছুদিন আগে সাইন ভাইয়ার কাছে খুব সুন্দর
দেখতে একটা ছেলে এসেছিল। আহনাফ নাম। ওই
ভাইয়াটার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।’

ভাইয়াটা শখ আপুকে পছন্দ করে। বিয়ে করতে চায়। আমার দুলাভাই হিসেবে খাপে খাপ তাই আমি আপুর নাম্বার উনাকে দিয়েছি। বলেছি, প্রেম করে আপুকে পটিয়ে নিতে।’

একথা শোনামাত্রই আচমকা বাইক থামাতেই তার পিঠের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল শীতল। নাকে ব্যথা পেয়ে নাক ডলার আগে বাঁজখাঁই গলায় শুদ্ধ বলল,
-‘অচেনা একজন শখের নাম্বার চাইল আর তুই দিয়ে দিলি? এই মহৎ কাজ করতে কে বলেছে তোকে?’

-‘কেন, কি হয়েছে?’-‘আবার জিজ্ঞাসা করছিস, কি হয়েছে? বে’য়া’দ’ব কোথাকার। থা’প্ল’ড়ে দাঁত ফেলে দেবো তোমার।’

-‘শুধু শুধু বকছেন কেন? নিজে বিয়ে পাগলা তার বেলা? এদিকে সায়ন ভাইয়াও প্রেম করে বলেছি নাকি কাউকে?’

-‘কে কাকে পছন্দ করে। কে কাকে ভালোবাসে। এসব দেখা ছাড়া কাজ নেই তোর? এসব করতে পেলেপুষে বড় করা হচ্ছে তোকে?’

-‘ঘুরে ফিরে আমার চোখেই পড়ে এটাও কি আমার দোষ নাকি? প্রায় সবাই কথায় জানি শুধু আপনার টা

বাদে। আপনার কাহিনী জানলেই যোলো আনা পূর্ণ হবে।’

শীতলের দিকে বিরক্তচোখে তাকিয়ে শুদ্ধ বাইকটা টান দিয়ে টং চায়ের দোকানের সামনে থামাল। দোকানিকে চা দিতে বলে দোকানের সামনে থাকা ড্রাম থেকে একমগ পানি তুলে শীতলকে বলল চোখে-মুখে পানি দিতে। ঘুম ছুটাতে শীতল তাইই করল। দোকানি চা বানাচ্ছে দেখে শুদ্ধ আশেপাশে তাকিয়ে শীতলকে দাঁড়াতে বলে এগোলো জঙ্গলের দিকে। কয়েক টা ধাপ এগিয়ে হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাতেই ওমনি তার প্রশস্ত বুকের সাথে শীতল বারি খেলো। ব্যথা পেয়ে নাক ডলতে ডলতে খ্যাক করে বলল,

-‘আশ্চর্য তো, খাম্বার মতো দাঁড়িয়ে গেলেন কেন?’

-‘তুই কোথায় যাচ্ছিস?’

-‘আপনার সঙ্গে।’

-‘আমি কোথায় যাচ্ছি?’

-‘আমি কি করে বলব?’

-‘জানিস না তো পিছু নিয়েছিস কেন?’

-‘ শুধু শুধু কথা প্যাঁচাবেন না। কোথায় যাচ্ছেন বলে গেলেই হয়।’

-‘মূত্র বিসর্জন দিতে, যাবি? গেলে আয়। গল্পে গল্পে কাজ সারি।’

-‘ ছিঃ! কিসব কথাবার্তা।’

-‘ছিঃ! এর কি হলো? মূত্র বিসর্জন দিতে চেয়েছি অন্যকিছু তো করতে চাই নি।’

-‘কোন মসজিদে জিলাপি বিলালে আপনার লাগাম ঠিক হবে বলবেন প্লিজ!’একথা বলে শুদ্ধকে আর কিছু বলার সুযোগ দিলো না সে। দোকানের সামনের বেঞ্চে বসল। দোকানিকে জায়গার নাম জিজ্ঞাসা করলে উনি জবাব দিলো। একটুপরে শুদ্ধ ফিরে এসে দাঁড়াতেই দোকানি জানতে চাইলেন,

-‘আব্বা, এডি আমাগো আম্মাজান লাগে?’

-‘ তাকে আমিও চিনি না কাকা। রাস্তায় পড়ে ছিল ধূলো ঝেড়ে সঙ্গে নিলাম। থাকতে চাইলে রেখে দেবো না যেতে চাইলে অজানা গন্তব্যে ছেড়ে দেবো।’

এ কথা শুনে শীতল ভ্রুঁ কুটি করে তাকালে দোকানি হো হো করে হেসে ফেলল। হাসল শুদ্ধও। তারা কেন হাসল বোধগম্য হলো না শীতলের।অতঃপর তারা চা

পান করে পুনরায় ভবঘুরে হয়ে বাড়ি ফিরল ভোরের
দিকে। শীতল কোনোমতে হেলমেট রেখে সেভাবেই
ঘুম। একঘুমেই দুপুর পার। একতলা বিশিষ্ট একটি
বিল্ডিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মাঝবয়সী এক
লোক। নাকের ডগার উপরে মোটা কাঁচের চশমা।
পরনে কুঁচকে যাওয়া পাজামা-ফতুয়া। হাতে একটি
ব্যাগ। ব্যাগে সম্ভবত কাগজপত্র রয়েছে।

তিনি চশমা ঠেলে ভ্রুঁ কুঁচকে একটু এগিয়ে এলেন।
তারপর নেইম প্লেটে

বড় বড় অক্ষরে লেখা নামের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে
নামটা বিরবির করে

উচ্চারণ করলেন, ‘এডভোকেট শতরূপা চৌধুরী।’
অবশেষে তিনি সঠিক গন্তব্যে এসেছে। এতদূরে জানি
করে আসা স্বার্থক হলো তবে। উনি কাঁপা হাতে
কলিংবেল চাপতেই একজন যুবক দরজা খুলে হড়হড়
করে বলল,-‘চটি খুলে, পদধূলি ঝেড়ে, হাগা-মুতা
সেরে পাশের রুমে বসুন। একটু পরে মেডাম এলে,
গলা ঝেড়ে, খানিকটা কেশে, নিজের সমস্যার কথাটা
জানাবেন। আলোচনা চলাকালীন কৌষ্ঠকাঠিন্য রোগীর
মতো কুঁতকুঁত

করবেন না। চুলকাচুলকি, মুচড়ামুচড়ি মেডাম
একদমই পছন্দ করে না,
তাই এসব থেকে নিজেকে সংযত করবেন,
ধন্যবাদ।'-'চটি খুলে, পদধূলি ঝেড়ে, হাগা-মুতা সেরে
পাশের রুমে বসুন। একটু পরে মেডাম এলে, গলা
ঝেড়ে, খানিকটা কেশে, নিজের সমস্যার কথাটা
জানাবেন। আলোচনা চলাকালীন কৌষ্ঠকাঠিন্য রোগীর
মতো কুঁতকুঁত

করবেন না। চুলকাচুলকি, মুচড়ামুচড়ি মেডাম
একদমই পছন্দ করে না,
তাই এসব থেকে নিজেকে সংযত করবেন,
ধন্যবাদ।'অপরিচিত কারো কথা শুনে দরজামুখো
দাঁড়ানো লোকটি হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। প্রথম
পরিচয়ে কেউ কাউকে এভাবে বলতে পারে? তাও
আবার এমন ধরনের কথা? উনার বিষয়মাখা মুখ
দেখে নাদিমের মধ্যে দেলদোল দেখা দিলো না। সে
সরাসরি কথা বলতে পছন্দ করে। অপ্রিয় কথা মুখের
উপর চটাস করে বলার কারণে তার বাবা মা'ও
তাকে গা'লি দেয়। কিন্তু অভ্যাস ছাড়তে পারে না। সে
শতরূপা চৌধুরীর এসিস্ট্যান্ট

হিসেবে নিয়োজিত পাঁচ বছর। পাঁচ বছরে কেসের সুবিধার্থে সে অনেক মানুষের সঙ্গে মিশেছে। ভালো মানুষের যেমন দেখা পেয়েছে তেমনি গুঁটি কয়েক ছ্যাঁচড়াও কপালে জুটে/জুটেছে। প্রায়ই অনেক সময় দেখা যায়, অনেকে চেম্বারে এসে অন্যের সাথে গল্প জুড়ে দেয়। যেন মাহের বাজার।

কার বাপের কত বিঘা সম্পত্তি ছিল, বর্তমানে কত আছে, কার ভাতিজা ডাক্তার, কোন মহিলা ননদের স্বামীর সঙ্গে ভেগে গেছে এসব গল্প জুড়ে বসে। এরপর মেডাম একে একে ডেকে কেসের ব্যাপারে কথা বলা শুরু করে তখন কথার মাঝখানে বলে বসে,-‘মেডাম, বলছিলাম যে ওয়াশরুমটা কোনদিকে?’ সিরিয়াস কথার মধ্যে এই কথা শুনে বিরক্তির মাত্রা তরতর করে বেড়ে যায়। এমনিতেই শতরূপা চৌধুরী সময় সচেতন মানুষ। বাড়তি কথা বলা পছন্দ করেন না উনি। উনার মতে, বাড়তি কথা কাজকর্মে টিলেমি করে বেশি। ওয়াশরুমের চক্রে দশ মিনিটের কথাতে যদি পঁচিশ মিনিট খরচ হয়ে তাহলে কিভাবে হবে? এজন্যই কেউ এলে মুখের উপরে এসব বলে

সচেতন করে দেয়। যাতে হাঁট না বসিয়ে পারসোনাল কাজটা সেরে নেয়।

এতে সময়ও বাঁচে আলাপও দ্রুত হয়। অকপটে বলা কথা শুনে লোকটা আমতা আমতা করছে। নাহিদ দরজা থেকে সরে শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে ওয়াশরুম দেখিয়ে বলল,

-‘ওই যে ওইদিকে ওয়াশরুম।’

মধ্যবয়সী লোকটা সেদিকে তাকিয়ে দৃষ্টি সরিয়ে মিনমিন করে বললেন,-‘শতরূপা মেডাম কখন আসবে?’

-‘সময় মতো চলে আসবে। আপনি কাজ সেরে বসুন।’

-‘ঠিক আছে।’

অতঃপর তিনি ভেতরে প্রবেশ করে চেয়ার টেনে বসলেন। নাদিমও তার টেবিলে কাজ করতে বসল। সামনে অনেক ফাইল রাখা এই কেসগুলোর সারমর্ম শতরূপাকে চৌধুরী জানাতে হবে। তথ্য কালেক্ট করতে হবে। এর

আবার আলাদা ফাইল তৈরি করতে হবে। গতকাল রাত থেকে যে ফাইল ধরেছে সব ক’টাই পরকিয়া

কেস। পরকিয়ার প্যাঁচে পড়ে ডিভোর্সও যেন
দুধভাত।

নাহিদ টাইপ করতে করতে মধ্যবয়সী লোকটার দিকে
একবার তাকাল।

দেখে মনে হচ্ছে ভদ্র গোছের ভদ্র মানুষ। বাকিদের
মতো ফিসফাঁস না করে চুপটি করে মেঝের দিকে
তাকিয়ে আছে। গভীর ভাবনায় বিভোর।

নাহিদ কি মনে করে হাতের কাজ থামিয়ে উনাকে
ডাকল। ডাকটা শুনে উনি ভদ্রতা বজায় রেখে
নাহিদের সামনের চেয়ারে বসল। নাহিদ হাঁক ছেড়ে
কদর নামে একটা ছেলেকে ডেকে দু'কাপ চা দিতে
বলে উনাকে বলল,-‘কোথা থেকে এসেছেন?’

-‘মাদানীপুর থেকে।’

-‘অনেক দূর।’

-‘হুম। গতকাল রাতে বাড়ি থেকে বের হয়ে এখন
পৌঁছালাম। আসলে বাবা, ধৈর্য্য আর কুলায় না
বলেই আসতে বাধ্য হয়েছি।’

-‘কেন, কি সমস্যা?’

-‘মেয়ে জামাই খুব অত্যাচার করে। কথায় কথায়
আমার গায়ে গা তুলে।’

আমার জায়গা জমি তার নামে লিখে দিতে বলে।
মেয়ে প্রতিবাদ করায় পরশুদিন সে আমার গিন্নির
হাতে পুঁড়িয়ে দিয়েছে।’

-‘আপনার ছেলে-মেয়ে কয়জন কাকা? ওই গোলামের
পুত্রের নামে কেস করছিলেন?’

-‘একটাই মেয়ে আমার। সঙ্গ দোষে পালিয়ে বিয়ে
করছিল। গিয়ে দেখে

ছেলের ঘরবাড়ি কিছু নাই, ছেলে বস্তির টোকাই।
বস্তিতে এক আত্মীয়ের বাসায় থাকে। পরে সবকিছু
জানাজানির পর আমার বাড়িতে উঠেছিল। আমারও
একটাই আদরের মাইয়া। কষ্ট দেখতে না পেয়ে
আমিও সুযোগ দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ছেলের মতো
তাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াব। কাজ যোগাড় করে দেবো।
সরল মনে এসব ভেবে ঘরে তুলছিলাম এখন মেয়ে
জামাই আমাকেই বাড়ি ছাড়তে বলে। দুঃব্যবহার
করে।

-‘আপনি কি করেন কাকা? নাম কি আপনার?’

-‘আমার নাম খালেক বেপারি। আমি বেসরকারি
একটা স্কুলে শিক্ষকতা করতাম। গতবছর অবসর
নিয়েছি।’

-‘ওহ, তা এখন কি করতে চাচ্ছেন?’

-‘আমাকে সায়ন বাবা পাঠিয়েছে। মেডামের সঙ্গে নাকি কথাও হয়েছে। এখন মেডাম আমাকে যা বলবে, যেভাবে বলবে, আমি সেভাবেই ব্যবস্থা নিবো।’-‘কোন সায়ন? মেডামে বড় ভাইয়ের ছেলে শাহরিয়রায় চৌধুরী সায়ন?’

-‘জি।’

উনাদের এই কথোপকথের মাঝেই গাড়ির হর্ণ শোনা গেল। শতরূপা চলে এসেছে দেখে নাহিদ বের হলো। সে বিনয়ীভাবে সালাম দেওয়ার আগেই বাইরে অনেক মানুষের কথা শুনতে পেল। দু’একটা বাংলা গালিও কানে

এসে বিঁধলো। শতরূপা নিজের চেম্বারে চলে গেলে নাহিদ কৌতুহলবশত মূল ফটকের দিকে তাকাল। ইশারায় দারোয়ানের থেকে জানতে চাইল, ঘটনা কি। দারোয়ান জানাল, এক প্রতিবেশী আরেক প্রতিবেশীর বাড়ির সামনে মাছের নাড়িভুঁড়ি, গোবর, পঁচা ডিম ছুঁড়ে মারে। এসবের কারণ ওই বাড়ির দুই বুড়ি দু’জন দু’জনের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। এরপর হয়েছে জা।

কোনো কিছু নিয়ে ঠুকাঠুকি হলেই তারা একে
অপরের বাড়িতে ন্যাস্টি জিনিসপত্র ছুঁড়াছুঁড়ি করে।
আবার কেউ কাউকে ছাড়া থাকতেও পারে না।
তাদের ঝগড়া দেখে ঝগড়া থামাতে গেলেও রেগে
যায় তারা। একথা শুনে নাস্টি কোনো প্রতিক্রিয়া
দেখাল না। মনে মনে দোয়া করল এমন ঠ্যাঙ্গামারা
বন্ধুত্বগুলো আজীবন বেঁচে থাক। দুপুরের পর শীতল
ঘুম থেকে উঠেছে। ক্ষুধার চোটে এখন চোখে ঝাপসা
দেখছে। কোনোমতে গোসল সেরে দৌড়ে নিচে
নেমেছে সে। কোনো কথা

না বলে রান্নাঘর থেকে খাবার নিয়ে ঝটপট খেতে
বসল। প্রথম লোকমা
মুখে পুরে চিবাতেই বাইরে থেকে শুদ্ধ এলো।
লাটসাহেব বসলও সিঙ্গেল

সোফায়। বড় মা পানির গ্লাস এগিয়ে দিলে ঢকঢক
করে গিলে সোফায় গা এলিয়ে দিলো। যেন যুদ্ধ জয়
করে কেবল ফিরেছে। সেন্টার টেবিলের উপর রাখা
ব্যাগ খুলতে খুলতে সিঁতারা চৌধুরী শুধালেন,- ‘সব
এনেছিস বাপ, বাদ পড়ে নি তো কিছু?’

-‘দেখো আগে। কিছু বাদ পড়লে জানাও এনে দেওয়া যাবে।’

-‘ওরা কখন আসবে জানিয়ে কিছু?’

-‘সন্ধ্যার পরপরই চলে আসবে।’

-‘আচ্ছা।’

এভাবে তিন গিনি আর শুদ্ধর মধ্যে টুকটাক কথাবর্তা চলছিল। শারায়াত ও সাফওয়ান চৌধুরী অফিসে।

সাম্য, সৃজনকে দুপুরে খাইয়ে জোর করে ঘুম পাড়িয়েছে সিরাত। তখন সিমিন আর শখকে নামতে

দেখা গেল। কি নিয়ে কথা বলতে বলতে নামছে

তারা। সিমিন শখকে নিয়ে ড্রয়িংরুমে পা

রাখতেই শুদ্ধ শখকে বসতে ইশারা করল। শখ মা-

চাটীদের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে ধীরে সুস্থে

বসল। তবে মুখ চুপসে আছে তার। বুঝতে

বাকি রইল শুদ্ধ সিরিয়াস কিছু বলবে তাকে। জরুরি

কিছু বলার থাকলে সে এভাবে ডেকে পাঠাল।

আবারও বিয়ের ঝামেলায় পড়তে হবে কি না ভেবে

বুকের ধুকপুকানি বেড়ে গেছে তার। তখন শুদ্ধ

বলল,-‘পড়াশোনা কেমন চলছে?’

-‘ভালো।’

-‘আমি বারবার এক কথা জিজ্ঞাসা করব না। তবে এখন যা জানতে চাই আশা করি সরাসরি জবাব দিবি।’

-‘হুম।’

-‘কাউকে পছন্দ করিস?’

-‘ আমি পড়াশোনা করতে চাই ভাইয়া। বিয়ে করব ন...!’

-‘ এটা কি আমার প্রশ্নের আনসার হলো?’

-‘না।’

-‘কি না?’

-‘পছন্দ নেই।’

-‘ভেবে বললি? পরে অন্য গান গাইতে যেন না শুনি। এখনো সময় আছে ভেবে জানা।’

-‘ তেমন কেউ নেই।’

-‘সন্ধ্যার পর গেস্ট আসবে রেডি থাকিস। এনজেলগমেন্ট করা থাক। দেড় বছর পর আহনাফ ফিরলে বিয়ে সম্পূর্ণ করা হবে।’

আহনাফের কথা শুনে শখ দৃষ্টি তুলে এক পলক ভাইয়ের দিকে তাকাল।

কিন্তু এখন বিয়ে করতে চায় না সে। বিয়ের পর বেশির ভাগ মেয়ের স্বপ্ন জলাঞ্জলী দিতে হয়। ছোটো থেকে তার স্বপ্ন ডাক্তার হওয়া, এতদিন সে সেভাবেই নিজেকে গড়ে তুলেছে। এমনকি এক ছেলে পেছনে থাকায় সে মিথ্যা কথা বলেছিল যে, তার বফ আছে। শীতলের সামনে কথাটা বলায় বাড়ির সবার কাছে সেকথা পৌঁছে গেছে। সবাই ভাবে তার পছন্দ আছে। কিন্তু তেমন কিছু না। এ অবধি অনেক ছেলে তাকে প্রস্তাব দিয়েছে কিন্তু কেন জানি কারো প্রতি অনুভূতি জাগে নি। মনে হয় নি মানুষটা একান্তই নিজের মানুষ। আরাধনার মানুষ। শখ আর একটা কথাও বলল না চুপ করে বসে রইল। তখন সিরাত তার কাঁধে হাত রেখে বললেন,-‘ছেলেটা খুব ভালো। আমাদের সবার বেশ পছন্দ। তোরা খুব ভালো থাকবি। মোটকথা, তোরা পড়াশোনা নিয়েও আহনাফ কিংবা তার পরিবারের কারো কোনো সমস্যা নেই। বরং তুই চাইলে তোকে বাইরের দেশ থেকে ডাক্তারী পড়া কমপ্লিট করাবে।’

-‘বড় ভাইয়া বাসায় আসে নি?’

-‘না, তবে আহনাফ নাকি সায়নের কাছে আগে প্রস্তাব দিয়েছিল। সায়ন

তোর বাবাকে জানিয়েছে। তোর বাবা ছেলে ও তার পরিবারের খোঁজ খবর নিয়েছে। শুদ্ধও চিনে। সেও বলেছে ছেলেটা অমায়িক। তারপর আহানাফের বাবা একদিন তোর বাবার অফিসে গিয়ে আবার’ও প্রস্তাব রাখে। আহনাফ নাকি আবার চলে যাবে। যাওয়ার আগে কিছু করে যেতে চায়। তারপর ভেবেচিন্তে দুই পরিবার এনগেগেজমেন্ট করিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।’ এভাবে টুকটাক কথা হচ্ছিল শখকে নিয়ে। রোজই হয় তাই সেদিকে না তাকিয়ে শীতল খাওয়াতে মন দিয়েছে। পছন্দের ডিশ পেয়ে অন্যদিকে তাকানোর সময় নেই। কিন্তু আহনাফ নামটা কৰ্নকুহুরে পৌঁছাতেই মাথা তুলে তাকাল। এনগেজমেন্টের কথা শুনে খাবারের প্লেট নিয়ে গেল সবার কাছে। শুদ্ধর পাশের সোফায় ধপ করে বসে গদগদ হয়ে বলল,-‘আপু, তোমাদের দু’জনকে যা লাগবে না। পুরাই রাজযোটক।’

শখ লজ্জায় মুখ কাচুমাচু করে বাহানা দেখিয়ে উঠে
গেল। ব্যাগ হাতে সিঁতারা, সিরাত গেলেন রান্নাঘরের
দিকে। শুদ্ধ ফোন ঝল করছে দেখে শীতল বলল,

-‘ভাইয়া? বাজারে গিয়েছিলেন?’

-‘হুম।’

-‘আমার জন্য রসমালাই এনেছেন?’

-‘না।’

-‘কেন? জানেন না আমি রসমালাই কত পছন্দ করি।’

-‘তা জেনে আমি কি করব? তোকে দেখতে আসছে
যে ঘটা করে তোর জন্য হাজিবাঁজি আনতে হবে?’

-‘এক বোনের জন্য আরেক বোনকে অবহেলা
করতে পারেন না। এটা অন্যায়। আমাকে রসমালাই
এনে দিন।’

-‘আমি তোর বাপের চাকর? তোকে রোজ রসমালাই
গেলানোর জন্য আমাকে টাকা দেয় তোর বড় আব্বু?
নাকি তুই আমার মালকিন যে যা বলবি আমাকে তাই
শুনতে হবে?’-‘কোনোটাই না।’

-‘তাহলে ভাগ এখন থেকে।’

একথা শুনে শীতল মুখ ভোঁতা করে সেখান থেকে
উঠে রান্নাঘরে গেল। গেস্টদের জন্য কয়েক ধরনের

মিষ্টি আনা হয়েছে। সিঁতারা সেসব তুলে রাখছে।
ক'দিন যাবৎ কাজিন রিলেটেড একটা বই চুপিচুপি
পড়ছে সে।

সেখানে নায়ক নায়িকাকে বকে, মারে, আবার যখন
যা চায় এনে দেয়।

অথচ বিশুদ্ধ পুরুষ মারে, বকে কিন্তু যখন যাচায়
এনে দেয় না। আনার জন্য জেদ দেখালে দু'থাপ্লড়
মেরে দেয়। ইশ! বাস্তব জীবনের গল্প কেন যে
উপন্যাসের মতো সাজানো হয় না। বিকেল পেরিয়ে
এখন সন্ধ্যা। অনিন্দ্য ধরণীর বুকে নেমেছে নিকষ
কালো রাতের আঁধার। ব্যস্ত নগরীর মানুষগুলো ছুটছে
আপন গৃহালয়ে ফেরার তাড়ায়। ফলস্বরূপ পথে_ঘাটে
বেঁধেছে অসহ্যকর জ্যাম। জ্যামের চক্রে পড়ে
আধাঘন্টার পথ আড়াই ঘন্টায় পার করে কিছুক্ষণ
আগে'ই বাসায় ফিরেছেন শারাকাত চৌধুরী। ক্লান্ত
পরিশ্রান্ত দেহে ফিরে ফ্রেশ না হয়ে'ই আগে শখকে
রুমে ডেকেছেন। শুনেছেন, বিয়ের কথা শুনে থেকে
মেয়ে মনমরা হয়ে বসে আছে। হ্যাঁ/ না কিছুই বলে
নি মেয়েটা। মেয়ে যে এখন বিয়ে করতে চায় না
একথা উনিও জানেন। কিন্তু আর কতদিন? কতদিন

মেয়েকে ধরে বেঁধে রাখবেন। মেয়ে হয়ে যখন
জন্মেছে তাকে পরের ঘরে যেতেই হবে। মোটকথা,
শখ উনার বড্ড আদরের মেয়ে। দুই ছেলের পর খুব
ইচ্ছে ছিল এবার একটা মেয়ে হোক। বাবা! বাবা!
করে ডেকে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ুক। আদুরে আবদারে
অতিষ্ঠ করে তুলুক। মিষ্টি সুরে শাষণ করুক। বকা
দিক। পছন্দের কিছু না পেলে দু'গাল ফুলিয়ে বসে
থাকুক। কিন্তু উনার মনের কথাটা সিঁতারাকে
কখনোই বলা হয়ে ওঠে নি। কারণ সায়ন, শুদ্ধ
হওয়ার সময় সিঁতারার অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে
গিয়েছিল। ডাক্তাররাও হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন।
সহধর্মিনীর কথা চিন্তা করে মনের কথা চেপে'ই
রেখেছিলেন। কিন্তু শুদ্ধ হওয়ার কয়েক বছর পরে,
একদম অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে শখের আগমন ঘটে। বুকে
পাথর চেপে সিঁতারাকেও বলেছিলেন জীবনের ঝুঁকি
না নিতে। কিন্তু সিঁতারারও মেয়ের শখ ছিল। এত
বলে কয়েও উনাকে বাচ্চা নষ্ট করাতে রাজি করানো
যায় নি। ফলে

দিন দিন প্রেগনেন্সির জার্নি আরো কষ্টকর হয়ে ওঠে।
ডেলিভারির ডেট যতই ঘনিয়ে আসছিল উনিও

নেতিয়ে পড়েছিলেন। শরীরের হাল বুঝে কাঁদতে কাঁদতে উনাকে দ্বিতীয় বিয়ের পারমিশন দিয়েছিলেন। তারপর সিঁতারাকে আবার ঝুঁকি নিতে হয়। মা ও মেয়ে দু'জনই জীবন যুদ্ধ জিতে একটা সময় স্বাভাবিক হয়। মেয়ের পুতুল মুখটা দেখে সব কষ্ট সহ্য করে নেন দু'জনই। এবং শখের মেয়ের নামটাও উনিই রাখেন, শানায়া চৌধুরী শখ। দিন যায় দিন আসে। দেখতে দেখতে সময় কাটতে থাকে। ছোটো শখও বড় হতে থাকে। উনার ছোটো ভাইদের ঘর আলো করে সন্তানরা আসে। একটা সময় চৌধুরী নিবাসও ভরে ওঠে প্রান্তবস্ত্র প্রাণদের চঞ্চল কলকলানিতে। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে তারাও বড় হতে পারে। একটা কথা না বললেই নয়, উনি বাবা হওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে এটা বুঝেছেন, ছেলেরা যদি হয় বাবার শক্তি, মেয়েরা হয়; মায়া। কলিজার একাংশেই থাকে মেয়েরা। মেয়েদের মুখজুড়ে থাকে জান্নাতি সুখ তাই বাবারাও চুপ করে সয়ে যায়, এক পৃথিবী সমান দুখ। এই মুহূর্তে বাবার সামনে মুখে হাসি এঁটে চুপটি করে বসে আছে শখ। সে

বরাবরই শান্ত স্বভাবের। কথাবার্তা বলে ছোটো ছোটো করে ধীরে_সুস্থে।

তার মুখে হাসি থাকলেও এই মুহূর্তে ডাগর ডাগর আঁখিজোড়া অশ্রুজলে টইটুস্বর। মনটাও অভিমানে পূর্ণ। মেয়ের মুখটা দেখে শারফাত চৌধুরীর বুক মোচড় দিলেও স্বাভাবিক রইলেন। কিছুক্ষণ মেয়ের মুখপানে চেয়ে আদুরে স্বরে ডাকলেন,
-‘মা!

বাবার স্নেহমাখা ডাক শুনে শখের চোখ থেকে জল গড়িয়ে গেল। বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে খুব করে কাঁদতে ইচ্ছে করল। কিন্তু এ কাজ কি আর সাজে? বড় হয়েছে এখন। হবু ডাক্তারও। এত আবেগী হলে তো চলে না।

তবে এত চেষ্টা করেও কোনোমতে চোখের জল আঁটকাতে পারল না সে।

গড়গড়িয়ে গাল বেয়ে জল গড়াতেই থাকল। কিছু বলবে গলা যেন চেপে ধরেছে কেউ। রুমজুড়ে পিনপতন নিরাবতা। বাবা ও মেয়ে দুজনেই চুপ।

কেউ যেন কথা খুঁজে পাচ্ছে না। বুকচাপা কষ্টে শব্দের জোড়াতালি দিতে

ব্যর্থ বাবা ও মেয়ে। বুকে জমা অভিমান থেকে শখের
হঠাৎ বলতে ইচ্ছে করল,

-‘আমি কি বেশি খাচ্ছি বাবা? খুব বেশি বোঝা হয়ে
গেছি তোমার? কেন পর করে দিচ্ছে? কেন চিরচেনা
বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছে? তবে কি আমাকে
আর ভালোবাসো না, বাবা? আমাকে তোমাদের কাছে
রেখে দাও না, বাবা? এতদিন যেভাবে স্নেহতলে
আগলে রেখেছিলে সেভাবেই রেখে দাও আমায়।’

কিন্তু চাইলেও বুকের কথা মুখে বলা হলো না।
শারফাত চৌধুরী মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে
আছেন। তারপর মুখে হাসি এঁটে জবাবে
বললেন,-‘তুমি সারাজীবন শুয়ে বসে খেলেও আমার
অর্থ ফুরাবে না, মা। মেয়েরা প্রাপ্ত বয়স্ক হলে পাত্রস্ত
করা প্রতিটা বাবার গুরুদায়িত্ব।’

-‘(.....)’

-‘সায়ন, শুদ্ধ, শখ, স্বর্ণ, শীতল, সাম্য, সৃজন এরা
আমার বাগানের এক একটা জীবন্ত ফুল। এরা
সামান্য ব্যথা পেলে তার দ্বিগুন আঘাত আমার বুকে
এসে লাগে, মা। সেই আমি কিভাবে পর করব
তোমাকে? পর করে আমি নিজে ভালো থাকব?’

তোমরা আছো বলেই তো আমার পৃথিবীটা এত সুন্দর।’

_(....)’

-‘আহনাফ ছেলেটা ভালো। সে নিজে এসে আমার কাছে তোমার হাতটা চেয়েছে। তোমার ভাইরা, চাচ্চুরা, ছেলেটার খোঁজ নিয়ে খারাপ রিপোর্ট আনতে পারে নি। আমরা সবাই চায়, তুমি ভালো থাকো। আমার বিশ্বাস

ছেলেটা তোমায় সুখে রাখবে। খুব ভালো রাখবে। রাজি হয়ে যাও মা।’ শখ ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। মেয়েকে কাঁদতে দেখে উনি মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক কথায় বুঝিয়েছেন। শখ এবারও বাবার কথা নিশ্চুপ হয়ে শুনেছে। বাবার মুখ দেখে বুঝেছে এই বিয়েটা হলে বাবা খুশি হবে।

মা-চাচীরাসহ, বড় ভাইরাও খুব খুশি। সবার কথা ভেবে তার মতের কথা জানতে চাইলে সে সম্মতি সূচক মাথা নাড়িয়েছে। অর্থাৎ বিয়েতে রাজি। অথচ মুখে মুখে সম্মতি দিলেও তার মনটা অশান্ত হয়ে আছে। হাউমাউ করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। বিয়ের রীতিনীতি একদমই পছন্দ নয় তার। কারণ বিয়ের

ছলে সম্পর্কের রূপ বদলায়। ধরণ বদলায়। বিয়ের
আগে বাপ-ভাইরা যতই বলুক সম্পর্কগুলো আগের
মতোই ঠিকঠাক থাকবে।

আদৌ তা হয় না। বরং বিয়ের পর মেয়েদের
বোঝানো হয় বাপের বাড়ির থেকে শশুরবাড়ি আপন।
তারাই আপন। তারাই তোমার প্রিয়জন। তারা মিটাবে
তোমার সকল প্রয়োজন। সেখানেই যাও, সেথায়
তোমার আপন ঠিকানা। রক্তের বন্ধনকে বুড়ো আগুল
দেখিয়ে আপন করে নাও অচেনা মানুষগুলোকে। কষ্ট
হলেও কিছু করার নেই। বাঁধা দেওয়ার মতো জোর
নেই। এটাই মেয়েদের ভবিষ্যৎ। মানতেই হবে।
যেতেই হবে শশুরবাড়ি। এখন বাপের বাড়ির মেহমান
তুমি। পেলপুষে বিয়ে দেওয়ার পর বাপের বাড়ি
থাকার সময় ফুরিয়েছে তোমার। অন্যের ঘরের ঘরণী
তুমি। প্রদীপ হয়ে আলোকিত করো অন্যের জীবন।
অন্যের সংসার। পুরনো সব মায়া ছেড়ে আঁকড়ে ধরে
নতুন মায়াকে। সেই মায়াতেই বেঁধে রাখো সংসারের
প্রতিটা সদস্যকে। তবেই না হবে তোমার নারী জীবন
স্বার্থক।

স্বর্ণ লেপটপে কাজ করছে। বিছানার হেডবোর্ডে
হেলান দিয়ে মনোযোগ সহকারে কি যেন করছে।
তাকে মনোযোগী দেখে শীতল টাকা নেওয়ার
ধান্দায় দু'একবার খোঁচালেও কাজের কাজ কিছুই
হলো না। তাই বকতে বকতে নিচে চলে গেছে। শখ
পড়ার টেবিলে চুপ করে বসে আছে। দৃষ্টি
বইতে নিবদ্ধ থাকলেও পড়াতে মন নেই তার।
মস্তিষ্কে নানান ভাবনা। মুখ শুকিয়ে চুপসে গেছে।
কিছুক্ষণ আগে আহনাফ ফোন করেছিল তাকে।
বিয়েতে সম্মতি দিয়েছে শুনে ছেলেটা খুব খুশি।
মাত্রারিক্ত খুশিতে কথা বেরোচ্ছিল না মুখ দিয়ে।
বারবার কথা আঁটকে আসছিল তার। কতবার শখকে
ধন্যবাদ দিয়েছে সেও হয়তে জানে না। পছন্দের
কাউকে পেলে এমনই হয় বুঝি? কি জানি, তার
জীবনেএমন অনুভূতির কেউ আসে নি।
ঘটা করে কাউকে ভালোবাসি বলা হয় নি। মন
দেওয়া-নেওয়া'ও হয় নি।

সে বারবার রুম থেকে এসে পড়ার টেবিলে বসেছে।
নীরবে জানিয়েছে সে বিয়েতে রাজি। কিন্তু মনের
তোলপাড় বন্ধ হচ্ছে না। হাত-পা অনবরত কাঁপছে।

আর কিছুক্ষণ, কিছুক্ষণ পরে আহনাফরা চলে আসবে। হাতে রিং পড়িয়ে তাকে বউ হিসেবে চিহ্নিত করবে। দুই পরিবারে নতুন করে সম্পর্ক জুড়বে। সম্বোধনেও পরিবর্তন আসবে। এসব নানান কথা ভেবে

শখ বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে স্বর্গের উদ্দেশ্যে বলল,-‘আমার কি বিয়েটা করা উচিত, স্বর্গ?’

স্বর্গ তাকাল না। শক্ত করে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে দ্রুত গতিতে টাইপ করছে সে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লেপটপের দিকে। শখের কথাটা শুনেও সাথে সাথে জবাব দিলো না। বরং একটু সময় নিয়ে হাতের গতি কিছুটা কমিয়ে এনে ধীরে সুস্থে উত্তর করল,
-‘উচিত।’

-‘কেন উচিত?’-‘ তোমার হবু বর মানুষ হিসেবে পার্ফেক্ট। একজন পার্ফেক্ট মানুষই পারে পার্ফেক্ট পার্টনার হতে। নরম সরম মেয়েরা একা বাঁচতে পারে না। বাঁচতে চাইলে পৃথিবীর নিষ্ঠুর মানুষরা তাদের বাঁচতে দেয় না। হয় নারীখেকোরা কলঙ্কের কালি লেপ্টে দেয়ে নয়তো খুবলে খেয়ে পৃথিবী থেকে বিতাড়িত করে। এজন্য মেয়েদের নিরাপদ আশ্রয়

দরকার। ছায়া দরকার। মন ভরে কাঁদার জন্য হলেও
বিশ্বস্ত বুক দরকার। আহনাফ ভাই নিঃসন্দেহে ভালো
মানুষ। তাকে নিয়ে সংশয় রেখো না বরং মেনে নাও।
ভুলে যেও না, শুদ্ধ, সায়ন ভাইয়ের কলিজা আমরা
তিনবোন। আমাদের জন্য তারা কি কি করতে পারে
ধারণাও করতে পারবে না তুমি। সেই ভাইরা যার
তার হাতে তোমাকে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিবে না।
তাই নিশ্চিত থাকো, নিশ্চয়ই আহনাফ ভাইয়ের মাঝে
বিশেষ বিশেষত্ব আছে বলেই তারা তার সাথে
তোমার বিয়ের কথা ভেবেছে।’

স্বর্ণের স্পষ্টভাষায় স্পষ্ট কথাগুলো শুনে শখ সত্যি
সত্যিই অহেতুক চিন্তা বাদ দিলো। তাই তো, মাথার
উপর বড় ভাইরা থাকতে এত ভয় কিসের? তার
ভাইরা তো আর পাঁচটা ভাইয়ের মতো না। এসব
ভেবে সে মন মরা হয়ে বসে থাকল না বরং উঠে
নিচে গেল। তাকে যেতে দেখে স্বর্ণ কেবল তাকিয়েই
রইল। বাড়ির মূল ফটক দিয়ে আইসক্রিম খেতে
খেতে হাঁটতে হাঁটতে আসছে সাম্য, সৃজন আর
শীতল। সাওয়ান চৌধুরীকে বের হতে দেখে তিনজন
ধরেছিল আইসক্রিম কিনে দেওয়ার জন্য। উনি

ওদেরকে আইসক্রিম কিনে দিয়ে বাড়ির গেটে নামিয়ে
গাড়ি নিয়ে চলে গেছে। ওরা

আইসক্রিম খেতে খেতে বাড়িতে প্রবেশ করল।
ইতিমধ্যে ওরাও জেনেছে শখকে আজ দেখতে
আসবে। কিছুদিন পর তার বিয়ে হবে। তারপর শখ
তাদের ছেড়ে শশুরবাড়ি চলে যাবে। আপু চলে যাবে
ভেবে কষ্ট লাগলেও সুদর্শন দুলাভাই পারে বলে
ভীষণ খুশি তারা। আহনাফকে পছন্দ হয়েছে কি না!
ড্রয়িংরুমে শারাকাত চৌধুরী, সায়ন সহ বাড়ির তিন
গিনি এসে বসেছে।

বড়দের হাতে চায়ের কাপ। আহনাফরা নাকি লম্বা
জ্যাম আঁটকে গেছে। একটু আগে ফোন করে তাই
জানিয়েছে। শারাকাত চৌধুরী ফিরে আগে এককাপ
চা পান করেন নয়তো উনার মাথা ভার হয়ে থাকে।
শারাকাত

চৌধুরীর জন্য শুধু চা না বানিয়ে সিঁতারা সবার জন্য
বানিয়েছেন। প্রতি

সন্ধ্যায় তিন জায়ের চা না খেলে চলেই না।
আহনাফদেরও আসতে দেরি হবে। এই ফাঁকে বাড়ির
সকলে একদফা চা আড্ডা'ও হয়ে যাবে। শখকে

ডেকে তার হাতে কাপ ধরিয়ে দিয়েছে সিমিন।
কথাবার্তা বলে মেয়েটাকে সহজ করার চেষ্টা করছেন
তারা। এদিন তাদের জীবনেও তো এসেছিলে বিধায়
তারাও জানে এ মুহূর্তের কথা। তখনই বাড়ির তিনটে
বিচ্ছু হইহই করতে করতে ড্রয়িংরুমে এলো।
নিজেদের আইসক্রিম ভাগাভাগি করে নিলো। সবার
জন্য আনা হয়েছে আইসক্রিম। যার যারটা তাকে
বুঝিয়ে দেওয়া হলো। বাটি আইসক্রিমের বাটি থেকে
একবাটি আইসক্রিম নিয়ে

সৃজনকে দিয়ে শুদ্ধের কাছে পাঠিয়ে দিলো সিরাত।
সায়ন চায়ের কাপ রেখে ভাই-বোনদের থেকে এক
কামড় করে খাবেই। নিজে না দিলে সে জোর করে
খাবে অগত্যা বাধ্য হয়ে দিতেই হলো। সাম্য হঠাৎ
আইসক্রিম

খাওয়া থামিয়ে কিছু ভাবতে বসেছে। ভাবার পর্বে
সমাপ্তি টেনে সে উঠে শারফাত চৌধুরীর পাশে
বসল। তারপর চিন্তিত সুরে বলল,-‘বড় আব্বু? শখ
আপুকে অচেনা কারো সাথে বিয়ে দিও না।’

এই কথা শুনে সবার দৃষ্টি পড়ল সাম্যের দিকে।
সবাইকে তাকাতে দেখে সাম্য ভয় পেল না।

ভড়কালোও না। সে ছোটো থেকেই এমন। যখন যা বলতে চাইবে পুরো কথাটুকু শেষ করেই থামবে। আর অপর মানুষটাকে বাধ্য করে তার কথা শুনতে। হঠাৎ এমন কথা বলায় শারায়াত চৌধুরী শুধালেন,
-‘কেন বাবা? দিলে কি হবে?’

-‘আমরা তো আপুর শঙড়বাড়িতে থাকব না। ওরা যদি আপুকে মা’রে, ব’কে?’

ছোটো ভাইয়ের চিন্তা বড় বোনের সেফটি নিয়ে।
আহা, কি মধুর সম্পর্ক!

কিন্তু শখ হাসিটা মিলিয়ে গেল। পুনরায় তার চোখের কোণে অশ্রু জমে গেল। বুঝে ওঠার আগেই গাল বেয়ে অশ্রুফোটা গড়িয়েও গেল। সায়ন সেটা খেয়াল করে এবারের জবাবটা সেই দিলো,

-‘আমরা চার ভাই আছি কি করতে? আমাদের বোনকে মারবে, এতোই সোজা? শুধু মে’রে’ই দেখুক না, ওদের ছাপার নঁকশা চেঞ্জ করে দেবো।’-‘তা নাহয় দেবো। কিন্তু...!’

-‘আবার কিন্তু কেন?’

-‘তিন আপুকে বাইরে বিয়ে না দিয়ে অন্য একটা কাজ করি। আমি শখ আপুকে বিয়ে করি। তুমি স্বর্ণ

আপুকে বিয়ে করো। শুদ্ধ ভাইয়া শীতল আপুকে বিয়ে করুক। তাহলে আপুরা এই বাড়িতে থাকবে। কেউ বকতে পারবে না, মারতেও পারবে না।’

সাম্যের হিসেব দেখে সকলের চক্ষু চড়কগাছ। সিরাত তো ভীষম খেয়েই ফেললেন। সিমিন গরম চায়ে ছাকা খেয়ে ঠোঁট চেপে ধরে বসে আছেন।

সিতারা বেগম মুখ টিপে হেসে কিছু বলার আগেই শীতল নিজ শক্তিতে

জ্বলে উঠল। সে চট করে উঠে সাম্যের গালে চটাস করে একটা থাপ্পড় বসিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল,

-‘বে’য়া’দ’ব। নিজেরা ভালো ভালো বেছে নিয়ে আমাকে আপদ-বিপদ দিবি? আর আমি মুখ বুঁজে তা মেনে নেবো? কখনো না! দরকার হলে হাত কাঁটা ছেলেকে বিয়ে করব তাও আপদ বিপদকে ঘাড়ে ঝুলাব না।’

তার এহেন কাণ্ডে উপস্থিত সকলেই হতবাক। আপদ-বিপদ কে, শুদ্ধ?এছাড়া কাকেই বা বলবে? শীতলের কথা শুনে শারফাত চৌধুরীর কেন জানি ভীষণ হাসি পেল। মনে মনে ভেবেও নিলেন শুদ্ধ উপস্থিত থাকলে বেশ হতো। ছেলের মুখের অবস্থা

কেমন হতো তখন? এসব ভেবে হাসি চওড়া হতে
গিয়েও কোনোমতে নিজেকে সামলে নিলেন। সবার
সামনে

হাসা ঠিক হবে না ভেবে গলা খাঁকারি দিয়ে হাসি
গিলে উনি চায়ের কাপে চিমুক দিলেন। কিন্তু উনার
অজানা রয়ে গেল সিঁড়ির মুখে শুদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে।
পুরো ঘটনা দেখেছে, শুনেছে। স্বর্ণ হাতের কাজ সেরে
রুম থেকে বেরোতেই শুদ্ধর মুখোমুখি হলো।
চোখাচোখি হলো। শুদ্ধ তাকে দেখে পাশ কাটিয়ে
যেতে যেতে বলল,

-‘অন্ধকে সাহায্য করা পূন্যের কাজ হলেও অন্ধের
সঙ্গে চলতে গিয়ে অন্ধ সাজা বো’কা’মি। যা করছিস,
শাহাদত চৌধুরী জানলে মঙ্গলজনক কিছু হবে না।
তাই ফাস্ট এ্যান্ড লাস্ট ওয়ার্নিং দিলাম, বাকিটা
তোদের ইচ্ছে।’

স্বর্ণ শুনল। তবে পেছনে ফিরে তাকাল না আর না
কোনো জবাব দিলো।

শুদ্ধও যেতে যেতে যা বলার বলে রুমে ঢুকে গেল।
সব দেখে। সব বুঝে।

তবে কাউকে কিছু বলে না। এখন চুপ আছে মানে সামনেও চুপ থাকবে এর গ্যারান্টি নিজেকেও দিবে না। সন্ধ্যার পরে আহনাফদের আসার কথা থাকলেও জ্যামে আঁটকে তারা এলো রাত সাড়ে নয়টার দিকে। ড্রয়িংরুমে বসে বিয়ে নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত বড়রা। শখকে সাজানো হচ্ছে। স্বর্ণ নিজেই সাজাচ্ছে বড় বোনকে।

আহনাফ, বাবা-মা আর বোনের পাশে বসে উশখুশ উশখুশ করছে তখন থেকে। বারবার তাকাচ্ছে সিঁড়ির দিকে। নয়তো সময় দেখছে। অপেক্ষার প্রহর এত দীর্ঘ কেন? আসছে না কেন মেয়েটা? এত সাজা লাগে? আজ কি বিয়ে? তার মিষ্টি মুখটা দেখার জন্য বুকের ভেতর যে ছটফট করেছে মেয়েটাকে কি জানে না? বুঝে না? নাকি তাকে বউ করার শাস্তি দিচ্ছে এভাবে? আহনাফের উশখুশ ভাবটা শীতল এসে অবধি খেয়াল করছে।

দেখে হাসছে মিটিমিটি। আহা! কি ভালোবাসা। কি ভেবে শীতল দৌড়ে গিয়ে সিমিনের ফোন এনে চুপিচুপি বেশ ক'টা আহনাফের ছবি তুলল। সবাইকে দেখাতে হবে তার দুলাভাই কত সুদর্শন। তাছাড়া এই

ছবিগুলো দেখিয়ে শখের থেকে টাকা হাতাবে সে।
মনে মনে শয়তানি বুদ্ধি এঁটে সে
ড্রয়িংরুমের এককোণে দাঁড়াল। বড়রা কথা বলছে
দেখে শুদ্ধ'ও আস্তে করে উঠে অদূরে দাঁড়ানো
শীতলের পাশে দাঁড়াল। তারপর নিচু কণ্ঠে বলল,
_ 'রুমে যা, শীতল।'
_ 'কেন?'
- 'আমি বলেছি তাই।'
- 'আপনি বললেই শুনতে হবে? আপনি কি আমার
বাপজান?'
- 'আমি তোঁর কি জান পরে বুঝাচ্ছি। আপাতত হাঁটা
ধর।'
- 'না, থাকব এখানে। আপুর সঙ্গে আমারও একটা
হিল্লো হয়ে যাক। আপনার অ'ত্যা'চা'র সহ্য হয় না
আর।'
- 'চ্যলাকাঠটা বোধহয় সোফার নিচে রেখেছিলাম, তাই
না রে?' আবারও চ্যলাকাঠ! ইশ! প্রচুর লাগে। মা'রের
কথা উঠেছে মানে বিশুদ্ধ পুরুষ কোনো কারণে রেগে
আছে। তর্ক করলে সত্যি সত্যিই মে'রে দিতে পারে।
তাই সে বোকা বোকা হেসে বলল,

-‘ইয়ে মানে মেলা পড়া বাকি আছে, যাই গা।’

একথা বলে শীতল সামনের সেন্টার টেবিলের উপরে
থাকা শুদ্ধর ফোন

ওড়নার তলায় লুকিয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ান।

ফোনের লক জানে সে। কিছুক্ষণ আগেই আড়চোখে

দেখেছে। মূল উদ্দেশ্য, সেদিনের সিগারেট খাওয়া

ছবিটা ডিলিট করে শুদ্ধর দুর্বলতা খুঁজে বের করা।

যেটা দেখিয়ে শুদ্ধকে হুমকি দেওয়া যাবে। কিন্তু সেটা

হবে না বোধহয় কারণ যাওয়ার আগেই শুদ্ধ হঠাৎ

বলে উঠল,

-‘ফোনটা রেখে যা।’

-‘আমি কি আপনার চাকর? নাকি আপনি আমার

মালকিন যে, যখন যা বলবেন আমাকে তাই করতে

হবে?’

-‘অহেতুক কথা বাড়াবি না নয়তো থাপড়ে গাল লাল

করে দেবো, বে’য়া’দ’ব।’

-‘মে’রেই দেখুন বড় আব্বুকে বলে আপনকেও উচিত

শিক্ষা দেওয়ার আজ। চুপ থাকি বলে সাপের পাঁচ পা

দেখেছেন, তাই না?’ড্রয়িংরুমে গেস্ট থাকায় শীতলের

সাহস আজ আকাশচুম্বী। তার উপর বড় আব্বুও

উপস্থিত আছে। সে জানে, বড় আবু উপস্থিত থাকাকালীন শুদ্ধনকিছু করবে না। এই সুযোগেই কোনোমতে ফোন হাতিয়ে ভাগতে হবে এখান থেকে। কিন্তু তার তর্ক করা দেখে শুদ্ধ তেড়ে যেতেই শীতল এক দৌড়ে মাঝ সিঁড়িতে উঠে দাঁড়াল। বড়রা তখনো নিজেদের কথায় ব্যস্ত। আশেপাশেও কেউ নেই। শুদ্ধ কাউকে ফোন ধরতে দেয় না। অর্থাৎ সে ফোনটা তাকেও নিতে দিবে না, এখন না নিলে চেক করাও হবে না।

একবার যখন হাতে পেয়েছে এই সুযোগ হাতছাড়া করাও উচিত হবে না। কথাখানা তার মস্তিষ্কে টোঁকা মারতেই সে কোনোকিছু না ভেবেই জামার ভেতরে ফোনটা ঢুকিয়ে নিলো। আপাতত এটাই যেন নিরাপদ জায়গা।

বিশুদ্ধ পুরুষ আর যাই হোক এবার আর কেড়ে নেওয়ার সাহস দেখাবে না। আর না নোংমির করতে এগিয়ে আসবে। এইটুকু বিশ্বাস তার আছে। এদিকে তার কাণ্ডে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়েছে শুদ্ধ। এই মুহূর্তে বাকহারা সে। বিষয় চোখে-মুখে। কিছু বলার আগে শীতল একদৌড়ে উপরে চলে চলে। এখান

থেকে শোনা গেল দরজা আঁটকানোর শব্দ। আপাতত
আজ আর বের হবে না সে। শুদ্ধ আর এগোল না,
ঘুরে দাঁড়াল। মাথার ভেতর ভনভন করছে তার।
মেয়েটা দিন দিন এত পাজি হয়েছে বলার বাইরে।
না, একে সভ্য করা যাবে না বোধহয়। কয়েক ধাপ
এগোতেই হঠাৎ তার

চোখ পড়ল সায়নের দিকে। দুই ভাইয়ের চোখাচোখি
হলো। শুদ্ধ খেয়াল

করল সায়ন হাসছে। ঠোঁটজুড়ে যেন উপহাসের
হাসি।-‘পরীক্ষার দুটো খালায় তোমার খুব পছন্দের
দুটো আইটেম রাখা। প্রায়

এক সপ্তাহের অনাহারী তুমি। পেটে ম’র’ণ ক্ষুধা।
খাবারের ঘ্রাণে জিবটা লকলক করছে তোমার। খাবার
দেখে ক্ষুধার মাত্রাও দ্বিগুন ছাড়িয়েছে।

সেই মুহূর্তে কি করবে তুমি? নোংরা হাত ধুঁয়ে মুছে
সময় নষ্ট করবে নাকি আগেই সর্বগ্রাসী এক থাবা
ব..সাবে?’

ফোনের ওপর পাশের লোকটি পুরো কথা শুনে খ্যাক
খ্যাক করে হেসে উঠল। কি বি’শ্রী হাসির শব্দ! ভয়ে
গায়ের পশম দাঁড়িয়ে যাওয়ার মতো

ভয়ংকর। তাকে এভাবে হাসতে দেখে এই পাশের লোকটি বিরক্ত হলো। মুখে বিরক্তিকর ‘চ’ জাতীয় শব্দ করে মনে মনে বিশ্রী গালি’ও ছুঁড়লো।

কোনোমতে হাসি থামিয়ে ইয়াসির নামের লোকটি এবার বলল,-‘সাইন্টিস্ট ফর্মুলা দেয় নি বিধায় রেগে আছেন নাকি স্যার?’

-‘(...)।’

-‘হা, হা। তা ভদ্র মহাশয়ের নামটা যেন কি?’

-‘শোয়াইব চৌধুরী শুদ্ধ।’

-‘বুঝলাম। তা আপনাদের ভদ্র লোকদের মাঝে আমার কাজ কি?’

-‘সাইন্টিস্টকে তড়পাতে দেখার সাধ জেগেছে মনে, খেয়ে দাও।’

-‘ছ্যাহ্! কি বা’ল’ছা’ল কন এগ্লা? পোলা হইয়া পোলারে খামু? আমার রুচি এখনো এত নিচে নামে নাই স্যার। এই কাজ পারব না, অন্যরে দিয়া খাওয়ান।’

-‘তিনটেই কুমারি ফুল। দুই ভাইয়ের জন্য কড়া নজরের কারণে ভ্রমর’ও তাদের কাছ ঘেঁষতে পারে নি। এবার তুমি দুটোকে খেয়ে যত্ন করে কলঙ্ক

লাগাও দেখি।’-‘উফফ, ইন্টেক মাল। তা এরা শোয়াইবের কে?’

-‘বোন।’

-‘ওহ। কিন্তু মাল সুন্দরী না হইলে মুড আসে না আমার। মুড না এলে কি খাওয়া যায়? আমি আবার আধপেটা খাওয়ার ছেলে না। পছন্দ হলে পুরোটাই খাই নয়তো ছুঁয়েও দেখি না।’

-‘তিনটেই চোখ ধাঁধানো সুন্দরী তবে ছোটোটা সবার থেকে এগিয়ে আছে।’

-‘নাম?’

-‘শীতল।’ নাম শুনে ছেলেটা কল কেটে ফিচেল হাসল। তারপর ফোনটা অদ্ভুত কায়দায় পাঁচ আঙ্গুলের মাঝে ঘুরাতে ঘুরাতে মুখে উচ্চারণ করল, ‘শীতল রাণী, এবার আমি তোমায় খা..ব।’ ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে টুকটাক কেনাকাটার জন্য বাজারে এসেছে স্বর্ণ। হাতে দু’টো শপিংব্যাগ। কড়া রোদে ঘেমে নেয়ে একাকার অবস্থা। মাঝারি সাইজের মোটা বেনুনিটা কাঁধের একপাশে অযত্নে ফেলে রাখা। বিরক্তিতে চোখ, মুখ কুঁচকে আছে। সরু নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম।

কড়া রোদের তাপে ফর্সা দু'গাল রক্তিমবর্ণ ধারণ
করেছে। শখের পরীক্ষা থাকায় আজ একাই আসতে
হয়েছে তাকে। নয়তো ঝামেলার কাজে খুব একটা
জড়ায় না নিজেকে। এখন কতক্ষণে ঘুরে ঘুরে
শীতলের জামার সঙ্গে ম্যাচিং করা ওড়না খুঁজে পাবে
কে জানে। শুধু শীতলের নয় সিরাত তার ব্লাউজের
ফলস আর সিঁতারা দিয়েছেন দুটো শাড়ি কিনতে,
হালকা কালারের মধ্যে। শাড়ি দুটো অভাবী দুঃস্থ এক
মাম্বাবয়সী মহিলার জন্য। তাদের বড় মা প্রায় এভাবে
দান করেন এ নতুন কিছু নয়। এইদিকে দিয়ে
মহিলার মন মানসিকতা অনেক ভালো। সে বাজারে
যাবে শুনে সিমিনও

সুরে সুরে জানিয়েছে নরম দেখে রুমে পরা
একজোড়া স্যাভেল আনতে।

ক'দিন ধরে উনার এক পার্ট স্যাভেল পাওয়া যাচ্ছে
না। তবে ধারণা করা যাচ্ছে, এই আকাম বাড়ির
একমাত্র উড়নচন্ডী কন্যা শীতল'ই ঘটিয়েছে।

কারণ সে ইঁদুর, তেলাপোকা দেখলেই স্যাভেল দিয়ে
মারতে যায়। মেরে ক্ষান্ত হলে ঠিক ছিল। কিন্তু না,
সে ইঁদুর, তেলাপোকা মেরে সেটা আবার রেখে আসে

যার উপর রাগ থাকে তার রুমের চিপায়। এটাই তার
রাগের গোপন বহিঃপ্রকাশ’ও বলা চলে।

স্বর্ণের ঘুরে ঘুরে সবার কিছু কিনতে কিনতে দুপুর
পেরিয়ে গেছে। ক্ষুধাও লেগেছে। খুব বেশি প্রয়োজন
ছাড়া বাইরের খাবার খায় না সে। এখনো খাবে না।
একেবারে বাড়ি গিয়ে ফ্রেশ হয়ে ভাত খেতে বসব।
এসব ভেবে

চিপাগলি ধরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ ব্যাগের ভেতরটা
কেঁপে উঠল। ফোন ভাইব্রেট হচ্ছে দেখে সে ব্যাগ
থেকে ফোন বের করে কানে ধরতেই সাইন বলল,-
‘জান, কোথায় রে তুই?’

-‘বাজারে এসেছি।’

-‘বাজারে কেন?’

-‘কাপড় চোপড় কেনার ছিল।’

-‘কেনা শেষ নাকি বাকি আছে?’

-‘প্রায়ই শেষ।’

-‘আসব আমি?’

-‘প্রয়োজন ছাড়া আসার দরকার নাই।’

-‘ ইয়ে জান শোন না? আমার জন্য দু’তিনটে শর্ট প্যান্ট কিনিস। বউয়ের পছন্দ করা শর্ট পরার ফিলিংস জেনে রাখা দরকার।’

-‘ লাল, নীল, হলুদ নয়তো গোলাপি কালার আনলে চলবে?’

-‘তুই আনতে পারলে আমিও পরতে পারব। পরে একেবারে তোর সামনে গিয়ে দাঁড়াব। এখন যা ভালো মনে করিস, আন। আমাকে সামলানোর দায়িত্ব তো তোরই, তাই না?’-‘অ’স’ভ্য।’

-‘ধন্যবাদ। আচ্ছা শোন না জান, বাসায় ফিরে আগে ইনবক্স চেক দিস। কাজিত সারপ্রাইজ আছে।’

-‘ তুমি কি বাসায়?’

-‘বাসায় থাকলে কি হবে, দৌড়ে এসে চুমু দিবি?’

-‘ধরে নাও দিতাম।’

-‘বাসায় ছিলাম না তবে এখনই যাচ্ছি। তুইও তাড়াতাড়ি চলে আয় জান। তোর চুমুর অপেক্ষায় আমি।’ স্বর্ণ জবাব দিলো না খট করে কল কেটে দিলো। নয়তো এই পাজি ছেলে কথা বাড়াতেই থাকত। সে হাতের ব্যাগগুলো ধরে সামনে এগোতেই দৃষ্টি পড়ল একটি শাড়ির দিকে। ভীষণ সুন্দর

শাড়িটি। কালো রঙা শাড়িটিতে গোল্ডেন পাড়। মেয়ে
হলেও তার কেন জানি কেনাকাটা, সাজগোজ, খুব
একটা পছন্দ নয়। যতটুকু না করলেই নয় ততটুকুই
করে। কারণ তার মতে, কেনাকাটা, সাজগোজ, শো
অফ নিয়ে পড়ে থাকা ছাড়াও অনেক কাজ রয়েছে
মেয়েদের জীবনে। সাজগোজ নিয়েই পড়ে থাকলে
সফল হয়ে স্বপ্নছোঁয়ার আশায় এগোতে হবে না।
যেখানে কষ্ট আছে, পরিশ্রম আছে, সেখানে সাফল্যও
আছে শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। সে শাড়িটার দিক
থেকে নজর সামনে এগিয়েও ফিরে এলো। শখকে
শাড়িটাতে বেশ মানাবে। মূলত শখের কথা মাথায়
রেখে শাড়িটা কিনে নিলো সে। সঙ্গে নিলো ম্যাচিং
ব্লাউজ। শখের চমৎকার গড়নের শরীরে শাড়িটি
চমৎকার লাগবে। তাছাড়া এনগেজমেন্টের গিফ্ট
হিসেবে কিছুই দেওয়া হয় নি বড় বোনকে। অথচ
আহনাফ আর শখের এনগেজমেন্ট হয়েছে আজ প্রায়
এক সপ্তাহ হতে চলল। সেদিন তাদের এনগেজমেন্ট
করিয়ে দেড় বছর পর বিয়ের অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়
বড়রা। ততদিনে শখের পার্সপোট, ভিসাও রেডি হয়ে
যাবে। অনুষ্ঠানের পরপরই আহনাফ শখকে নিয়ে চলে

যাবে বাইরের দেশে। সেখানে গিয়েই শখ ডাক্তারী
পাশ করবে। আহনাফ একথা জানালে সবাই পছন্দ
হয় প্রস্তাবখানা। শখ অভিমান করে সম্মতি জানায়।
মেয়ে রাজি দেখে বড়রা আর কিছু বলে না কারণ
হাতে এখনো অনেক সময় আছে। এরমধ্যে যদি
কারো মন পরিবর্তন হয় তাহলে অন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া
যাবে। মোটকথা, ছেলে-মেয়ে দুটো যেভাবে ভালো
থাকে দু'পরিবার সেভাবেই সিদ্ধান্ত নিবেন। এদিকে
আহনাফেরও ছুটি শেষ। দুদিন পর তার ফ্লাইট।
প্রতিবার দেশে এসে যাওয়ার সময় খারাপ লাগা কাজ
করলেও এবার যেন দ্বিগুন খারাপ লাগছে তার।
কষ্টও হচ্ছে। মনে হচ্ছে কলিজা ছিঁড়ে রেখে যাচ্ছে।
কেন এমন হচ্ছে? শখের জন্য? মাত্রই ক'দিনের
সম্পর্ক অথচ অনুভূত হচ্ছে তাকে ছাড়া এই জীবনই
বৃথা। এই সপ্তাহের মধ্যে আরেকটা কাজ করা
হয়েছে। আগে শখ আর স্বর্ণ একই রুমে থাকলেও
এবার তাদের রুম আলাদা করা হয়েছে। আহনাফ
রাত বিরেতে ফোন দেয়। কত কথা থাকে দু'জনের।
বোনের সামনে কিছু কিছু কথা বলতে অস্বস্তি হয়।
লজ্জা কাজ করে। অস্বস্তি থেকে বাঁচতে ফোন হাতে

নিয়ে কখনো বাগানে যায় তো কখনো ছাদে।
ব্যাপারটা সিঁতারাসহ
অনেকের নজরে পড়ে। পরে শুদ্ধ সরাসরি জানায়
দু'বোনের একজনকে নিচ তলায় চলে আসতে। পরে
শখ তল্লিতল্লাসহ চলে আসে নিচ তলায়। এখন স্বর্ণ
তার রুমে একাই থাকে আর এ কাজের ফায়দা উঠায়
সায়ন।

সে রাত বিরেতে যখন তখন স্বর্ণের রুমে চলে আসে।
তারপর লাটসাহেব হয়ে আদেশের ফোড়ারা ছুঁড়ে,
এই জান পা জোড়া টিপে দে, মাথা টিপে দে, খেতে
দে, আরো কত কি! কতবার বলেছে এভাবে যখন
তখন রুমে না আসতে। কিন্তু তার কথা শুনলে তো?
বারণ করলে উল্টে জেদ করে আসে।

নিত্যদিনের নানান ঘটনা ভাবতে ভাবতে শীতলের
নাম্বার থেকেও ফোন এলো। কল রিসিভ করে কানে
ধরতেই শোনা গেল তার চঞ্চল কণ্ঠস্বর,-‘এ্যাঁই আপু,
আমার ওড়না পেয়েছো?’

-‘না, খুঁজছি।’

-‘আচ্ছা খুঁজো। আপু আমার জন্য একটা শাড়ি’ও
এনো প্লিজ।’

-‘শাডি কি করবি?’

-‘পরব! আমি বাবাকে বলেছি বাবা এম্মুনি তোমাকে বিকাশ করে দেবে।’

-‘আমি একটা শাড়ির ছবি পাঠাচ্ছি দেখ এমন ধরনের নিবি কি না?’

-‘দাও।’ শখের জন্য নেওয়া শাড়িটা শীতলকে দেখাতেই শীতল লাফিয়ে উঠল। ভীষণ পছন্দ হয়েছে তার। আবদার জুড়ে বসল তিনবোনের জন্য একই রকম শাড়ি কিনতে। তিনবোন একই শাড়ি পরে একসাথে ছবি তুলবে।

কিন্তু দুঃভাগ্যবশত কালো শাড়িটা স্টক আউট। অগত্যা শীতলের জন্য অনিয়ন কালার শাড়ি পছন্দ করল স্বর্ণ। তার ধারণা মতে, এই শাড়িতে শীতলকে ভীষণ আদুরে লাগবে। বোনের কথা শুনে শীতল লজ্জা পেল।

আবার বায়নাও ধরল, শাড়ির সাথে পরার জন্য চুড়ি, টিপ ম্যাচিং করে কিনে আনতে। স্বর্ণ বিরক্ত হলেও মেনে নিলো ছোটো বোনের আবদার। তারা কথা বলতে বলতে শাহাদত চৌধুরীর একাউন্ট থেকে টাকাও চলে এলো। স্বর্ণ শাড়ি পরে না। এ অবধি

দু'একবার পরলেও কয়েক মিনিট পরে খুলে
ফেলেছে। শাড়ি টাড়ি পছন্দ না তার। কিন্তু শীতলের
জেদের কাছে হার মেনে তাকেও একটা শাড়ি নিতে
হলো। সে নিলো ছাই রঙের

সুতি শাড়ি। তারপর টুকটাক আরো কিছু কেনাকাটা
করে কয়েক ধাপ এগোতেই কনকের মুখোমুখি
পড়ল। কনক তাকে দেখেই হাসি হাসি মুখে
বলল,-‘ভালো আছেন আপু?’

-‘ভূম, আপনি?’

-‘আছি এক রকম।’

-‘কোথায় গিয়েছিলেন?’

-‘কাজ ছিল।’

-‘ওহ। কিছু কথা বলার ছিল আপু।’

-‘বলুন।’

-‘অংকন কোথায়?’

-‘অংকন কে?’

-‘হা,হা, সো ফানি। কড়া রোদে দাঁড়িয়ে ফান করতে
ইচ্ছে করছে না যে আপু। অন্যদিন ফানের ফোঁরায়
নিয়ে বসব নাহয়। আজ কাজের কথা বলি?’

-‘কাজ কিংবা অকাজ জানি না। সেই হিসাব করার সময়ও হাতে নেই।

তবে যার কথা জিজ্ঞাসা করছেন আমি তাকে চিনি না। তাই জানিও না উনি এখন কোথায়।’-‘সায়ন ভাই তো জানে।’

-‘তাহলে সায়ন ভাইয়ের থেকে জেনে নিন, আসি। ‘ একথা বলে স্বর্ণ আর দাঁড়াল না। চোখ, মুখ শক্ত করে হাঁটা ধরল। তাকে যেতে দেখে কনক ঘাড় চুলকে শয়তানি হেসে বলল, শালি একটা চিজ বটে!’ একথা বলে হাসতে হাসতে প্রস্থান করল সে। স্বর্ণও সিএনজি ডেকে উঠে বসল তাতে। তারপর বাসায় ফিরে’ই ফ্রেশ হতে গেল। ওয়াশরুম থেকে বেরোতেই আঁটকা পড়লো কারো বাহুডোরে। পুরুষালি চেনা স্পর্শ পেয়ে নড়াচড়া করল না সে। বরং চুপটি করে সেভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। অনুভব করল একান্ত ব্যক্তিগত পুরুষের ছোঁয়া। উন্মাদ পুরুষটিও সুযোগ বুঝে স্থির থাকতে পারল না। বরং নেশাগ্রস্তের মতো টেনে নিতে থাকল স্বর্ণের চুলের শ্যাম্পুর ঘ্রাণ, লতানো দেহের বিদেশী সাবানে ঘ্রাণ। হাতটা অবাধ্য হয়ে ঘুরতে লাগল কোমরে আশেপাশে। সিতারা,

সিরাত, সিমিন চৌধুরী কিছুক্ষণ আগেই হতুদন্ত হয়ে
বেরিয়েছে সিরাতার অসুস্থ মাকে দেখতে। হঠাৎ
মায়ের অসুস্থতার কথা শুনে সিরাত কাঁদতে শুরু
করে। সাফওয়ান

চৌধুরী মিটিংয়ে তার ফোনটা উনার কেবিনে।
সাইলেন্ট অবস্থায় বেজে চলেছে। পরে মেজো জাকে
সামলাতে উনারাও উনার সঙ্গে যান। উনারা রাস্তার
মোড়ে যেতেই সায়নের সঙ্গে দেখা হয়। শখও চলে
আসবে একটু পর। শীতল কলেজ থেকে ফিরে খেয়ে
ঘুমিয়েছে বিধায় তাকে ডাকে নি।

বাড়ির গাড়িতে যাচ্ছে দেখে সায়ন সাবধানে যেতে
বলে বাড়িতে ঢুকল। ড্রয়িংরুমে কেউ নেই দেখে
উপরে চলে এলো। শীতলের রুমের দরজাটা
বন্ধ। পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে বোধহয় ঘুম কাতুরে
পাগলিটা। আরেক কন্যা

কি ফিরেছে? নাকি বাজারেই রয়ে গেছে এখনো? স্বর্ণ
ফিরেছে কি না দেখতে রুমে ঢুকে পানির শব্দ পেয়ে
বুঝল সে ওয়াশরুমে। তাই অপেক্ষা করতে থাকল
তার বের হওয়ার। দশ মিনিটের মাথায় বের হতেই
স্বর্ণে আঁটকা পড়ল বাহুডোরে। গালে পেলে পুরুষালি

ঠোঁটের স্পর্শ। গ্রাবীয় পেল খোঁচা খোঁচার দাড়ির
খোঁচা। ধীরে ধীরে এই স্পর্শ গাঢ় হচ্ছে দেখে স্বর্ণ
নিজেকে ছাড়াতে চাইল। কিন্তু সায়ন ছাড়াতে
অনিচ্ছুক। সে নিজের মতো করে স্বর্ণের শরীরে স্পর্শ
লেপ্টাতে ব্যস্ত। স্বর্ণ জোরপূর্বক সায়নকে
নিজের থেকে ছাড়ানোর চেষ্টা চলমান রেখে
বলল,-‘সিগারেট খেয়ে আমার কাছে আসতে বারণ
করেছিলাম না?’

-‘বারণ করলেই শুনতে হবে নাকি?’

-‘হুম, হবে।’

-‘উহুম, হবে না। বীর পুরুষরা সব সময় বউয়ের
কথা শোনে না। শুনলে
অনেক ভুগতে হয়।’

-‘ক্ষুধা লেগেছে, ছাড়া।’

-‘আমার’ও।’

-‘ফ্রেশ হয়ে এসো খাবার বাড়ছি আমি।’

-‘খাবার তো আমার হাতের মুঠোয়। কিন্তু খেতে আর
পারছি কই? স্বর্ণ, জান আমার, চল না বিয়ে করে
ফেলি?’

সায়নের হাঙ্কি গলায় বলা কথাগুলো স্বর্ণ নিজে
ছাড়াতে জোরাজুরি শুরু করল। পাজি লোকটা আবার
ফাজলামি শুরু করেছে। তাকে জোর প্রয়োগ করতে
দেখে সায়ন ঠোঁট কামড়ে হাসল। স্বর্ণের পেট খামচে
ধরে দুই গালে শব্দ করে চুমু খেল। তারপর কাঁধে
মুখ ডুবাতেই রুমের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে থমকে
দাঁড়িয়ে গেল শখ। ওর ফোনের চার্জারটা নিতে
এসেছিল আর এসেই যে এমন ঘটনার সাক্ষী হবে
কল্পনাও করে নি সে। রুমে তৃতীয় কারো উপস্থিতি
টের পেয়ে স্বর্ণ, সায়ন, চোখ তুলে তাকিয়ে
দ্রুতগতিতে ছিঁটকে দূরে সরে গেল। শখ নিজেও
লজ্জা পেয়ে দৃষ্টিজোড়া রেখেছে মেঝের দিকে।
একরাশ অস্বস্তিতে ডুবে কিছু বলার ভাষা পেল না
শখ। দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি চলে যাবে বোধগম্য হলো
না তার। আপন ভাইয়ের সঙ্গে চাচাতো বোনকে
এমতাবস্থায় দেখে নিজেও বাক হারিয়ে ফেলেছে।
এখন রুমে চলছে পিতনপতন নীরাবতাকি কি
বলবে বুঝতে উঠতে পারল না, তিনজনের কেউই।
সায়ন বোনের কাছে ধরা খেয়ে চুপ

করে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকাচ্ছে। আবার স্বর্ণের মুখ
দেখে তার খুব হাসিও পাচ্ছে। সে আমতা আমতা
করে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। এরপর মাথা
চুলকে পাশ কাটিয়ে তার রুমে চলে গেল। ভাইকে
যেতে দেখে শখ টেবিলের উপর থেকে চার্জারটা
হাতে নিলো। একপলক তাকাল স্বর্ণের দিকে তারপর
স্বাভাবিকভাবে বলল,-‘আমি যা ভাবছি তাই?’

-‘হুম।’

অকপটে স্বীকার করে নিলো স্বর্ণ। না তার গলা
কাঁপল আর না খতমত খেয়ে প্রসঙ্গ পাল্টানোর বৃথা
চেষ্টা চালাল। শখও কথা বাড়াল না, হতেই পারে।
যুগ আপডেট। কাজিন লাভ এখন কমন ব্যাপার হয়ে
দাঁড়িয়েছে।

তারা যদি একে অপরের সঙ্গে ভালো থাকে থাকুক
না, সমস্যা কি? তবে

বাড়ির লোক ব্যাপারটা কেমনভাবে নিবে এটা ভাববার
বিষয়। তাছাড়া

শাহাদত চৌধুরী সায়নকে অপছন্দ করার কারণ খুঁজে
পাবে বলে মনে হয় না। রাজনীতি করা নিয়ে একটু
আপত্তি করলেও মনে হয় না রিজেক্ট করবে। মনে

মনে একথা ভেবে ধরা খাওয়ার পর সায়নের মুখের
বেহাল দশা স্মরণ করে ঠোঁপ টিপে হাসল শখ।
বাড়তি প্রশ্ন করে আর কাউকে অস্বস্তিতে ফেলতে
চাইল না দেখে কথা বাড়ল না। চলে যাওয়ার জন্য
পা বাড়াতেই স্বর্ণ ডাকল। ডাক শুনে সে ঘুরে
তাকাতেই স্বর্ণ বলল,-‘আপু, আপাতত কাউকে বোলো
না।’

-‘কেন?’

-‘সময় হোক তখন নাহয় সবাইকে জানিও।’

-‘ভূম।’ শুদ্ধ ঢাকা গেছে আজকে প্রায় চারদিন হচ্ছে।
ঢাকা থেকে গত কালকের ফ্লাইটে গেছে
সুইজারল্যান্ড। হঠাৎ সেখানে কেন, কি কাজ, কবে
ফিরবে, এসবের কিছুই বলি নি সে। কথায় কথায়
শুধু জানিয়েছে সেখান থেকে ফিরে একেবারে বাড়ি
চলে আসবে। কিছুদিন পর রমজান মাস। পূর্বের
দিনগুলো ঢাকায় থাকলেও এবারের পুরো রমজান
পরিবারের সাথেই কাটাবে। পেশাগত দিক থেকে যা
কাজ বাড়িতে থেকে সারবে। আপাতত আর কোথাও
যাবে না।

একথা শুনে একজন বাদে খুশি বাড়ির সকল সদস্য।
সেই একজন আর কেউ নয় শীতল। কথাটা শুনে মুখ
বাঁকিয়েছে। গালি দিয়েছে। আজকাল শুদ্ধ বাড়িতে
ঘনঘন থাকছে যেটা ওর পছন্দ হচ্ছে না। পুরুষ
মানুষ এত বাড়িতে থাকবে কেন? তারা বাইরে টইটই
করবে নয়তো কাজে মশগুল থাকবে। তিনবেলা
খেতে এলে এলো নয়তো কাজ সেরে একেবারে
রাতে ফিরবে। যুগের পর যুগ পুরুষরা তো তাই করে
আসছে। নারী থাকবে ঘর বন্দী আর পুরুষ থাকবে
বাইরে। কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষরাই
সংসারের রাজা।

শখের বিয়ে ঠিকঠাক হওয়ার পর থেকে বাড়িতে
আমেজ আমেজ ভাব। খুশি খুশি রব চারদিকে। সুখ
সমৃদ্ধি যেন ছড়ানো চৌধুরী নিবাসে প্রতিটি আনাচে-
কানাচে। শখ প্রথম প্রথম অভিমান করলেও এখন
সব মেনেও নিয়েছে। আহনাফের সঙ্গে কথা হয়
রোজ। আহনাফ হুটহুট করে দেখা করে চমকে দেয়।
দু'জন ঘুরে। খায়। ছবি তোলে। সময় কাটায়।
টুকটুক

কেনাকাটাও করে। তন্মধ্যে শীতল ইচ্ছেমতো শখকে পঁচায়। ছোটো হয়ে বড় বোনকে লজ্জা ফেলে দেয়। লজ্জার মাত্রা দ্বিগুন করতে কখন বলে আহনাফের বউ! একথা শোনামাত্রই শখ লাল হয়ে যায়। হাসি-আনন্দে এভাবেই তাদের দিনগুলো কাটছে। শুদ্ধ বাড়ি নেই, শীতল যেন মুক্তমণা পাখি। যার কাজ হচ্ছে স্বাধীন চিন্তে নেচে নেচে, ঘুরে ঘুরে বেড়ানো। এই ঘুরে বেড়ানোর খুশির সাধ ডাবল হয়েছে কারণ শুদ্ধ তার ফোনটা তাকে দিয়ে গেছে। সেদিন শুদ্ধর ফোন ঘোঁটে তেমন কিছুই পায় নি। কয়েকটা ফাইল ছিল তাও লক করা। ছিল গ্যালারিতে শুদ্ধর ছবি, একঝাঁক সাদা হুঁদুরের ছবি, ল্যাবের জিনিসপত্রের ছবি, কিসব থিওরি টিওরি ছাড়া কিছুই পায় নি। পায় নি তার সিগারেট খাওয়া সেই ছবি টাও। অগত্যা আধাঘন্টা পর শুদ্ধর ফোনটা শুদ্ধর বিছানার উপর রেখে এসেছিল। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে শুদ্ধ যাওয়ার আগে তার রুমে এসেছিল। হাতে ফোন ধরিয়ে দিয়ে বলেছিল,-‘ধর।’

-‘কাকে দিবো?’

-‘রেখে তে।’

-‘কিহ্! আমাকে দিচ্ছেন? তাও আবার নিউ আইফোন? মাথা ঠিক আছে নাকি ভুলভাল কিছু খেয়েছেন, শুদ্ধ ভাই?’

একথা বলতে দেরি কিন্তু তার মাথায় গাটা পরতে দেরি হয় নি। শীতল ব্যাথায় মুখ কুঁচকে কিছু বলতে গেলে তাকে পুনরায় বলেছিল,

-‘কাজ কতদূর এগোলো আপডেট দিবি। ভুলেও যদি টিকটক করিস কিংবা টোকাই মার্কা বফ জুটিয়েছিস তোর খবর আছে।’

-‘সবই বুঝলাম। কিন্তু কিসের আপডেট দিবো?’

-‘আমার বিয়ের। ওই যে বিপদের চৌরাস্তার কথা ভুলে গেলি? পুনরায় মনে করাতে হবে?’

-‘না, না, মনে পড়ে গেছে। তা আপনি কি চলে যাচ্ছেন?’

-‘হুম।’

-‘কবে ফিরবেন?’

-‘বলতে পারছি না।’ শুদ্ধ চলে যাচ্ছে শুনে শীতলের চোখে মুখে খুশি ঝরে পড়ল। তার অবুজ মন খুশিতে ঝুমঝুম করে নেচে উঠল। একাধিচিত্তে গেয়েও উঠল, ‘আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে।’ সে চাইলেও

খুশির মাত্রা গোপন রাখতে পারল না গালভর্তি হেসে
গদগদ হয়ে বলেই ফেলল,

-‘আলহামদুলিল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ! যান, যান,
সাবধানে যাবেন। এত তাড়াতাড়ি ফেরার দরকার
নাই, কেমন? বয়স’ও তো হচ্ছে। এত ধকল নেওয়ার
কি দরকার শুধু শুধু?’

শুদ্ধ ভ্রুঁ কুটি করে তাকাল। তার যাওয়ার কথা শুনে
শীতলের খুশি যেন আর ধরে না। কত্ত বড় বে’য়া’দ’ব
ভাবা যায়! কিন্তু তার এত খুশি শুদ্ধর সহ্য হলো না।
মন চাইল থা’পড়ে গাল দু’খানা লাল করে দিতে।
যাওয়ার

আগে মারল না তবে এত খুশিও দেখতে ইচ্ছে করল
না। তাই সে হঠাৎ উৎফুল্ল বদনে দাঁড়িয়ে থাকা
শীতলের হাত থেকে ফোনটা কেড়ে নিলো। ফোন
কাড়তে দেখে শীতল আঁতকে উঠে চোঁচিয়ে বলল,

-‘আরে আরে নিয়ে নিলেন যে, এন্সুণি না ফোনটা
আমাকে দিলেন?’

-‘যার মধ্যে কৃতজ্ঞতা বোধ নেই তাকে কিছু না
দেওয়াই উত্তম।’

একথা শুনে শীতল ভাবল শুদ্ধ বোধহয় হাসিমুখে
বিদায় নিতে চাচ্ছে না। ফোনটা নিতে গেলে আগে
বিশুদ্ধ পুরুষের মন গলাতে হয়। দরকার হলে
কাঁদতে হবে, প্রচুর কাঁদতে হবে। কেঁদে কেঁদে
ফোনটা হাতাতে হবে।

এদিকে নিচ থেকে সিঁতারার ডাক শুনে শুদ্ধ হনহন
করে শীতলের রুম থেকে বেরিয়ে গেল। ফোন
হাতছাড়া হতে দেখে শীতলও পিছু পিছু গেল। তবে
যাওয়ার আগে দুই চোখে গ্লিসারিন দিলো যাতে চোখে
পানি আসে। চোখের পানি সস্তা নাকি চাইলেই যখন
তখন কাঁদা যায়! তারপর চোখ মুছতে মুছতে সে
গিয়ে দাঁড়াল শুদ্ধর থেকে একটুদূরে। শব্দ করে নাক
টেনে কাঁদতে থাকল নিঃশব্দে। বাড়ির সবাই উপস্থিত
হয়ে টুকটাক কথা বলছে। সিঁতারা পূর্বের মতো
খাবার বেঁধে দিতে বক্স রেডি করছেন। এত বলে
কয়েও উনাকে শুধরাতে পারে না শুদ্ধ। যতবার যাবে
ততবার উনি বাঁধাবাঁধির ঝামেলা করবেই, করবে।
কথা বলতে বলতে হঠাৎ সিরাতের চোখ গেল
শীতলের দিকে। শীতল এক কোণে দাঁড়িয়ে ওড়না
দিয়ে চোখ মুছেছে। চোখ, নাক লাল করে ফেলেছে

কেঁদে কেঁদে। হেঁচকি উঠছে থেমে থেমে। মেয়েটাকে
এভাবে কাঁদতে দেখে সিরাত বিস্মিত সুরে বললেন,
-‘একি! কাঁদছিস কেন শীতল? কি হয়েছে তোর?’

-‘(....)’

-‘পেট/মাথা ব্যথা করছে?’

-‘ন নাআ।’

-‘তাহলে এভাবে কাঁদছিস কেন মা? কিছু খাবি?’

-‘না।’

সকলের দৃষ্টি তখন শীতলের দিকে। একে একে
কারণ জানতে এগিয়ে এসেছে তারা। পিঠে, মাথায়
হাত বুলিয়ে কান্নার কারণ জানতে চাইলে শীতল
ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল,-‘শু শুদ্ধ ভাই চলে যাচ্ছে
তাই আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। বুকের ভেতরটায় ধড়াস
ধড়াস করছে।’

শীতলের মুখে একথা শুনে সকলে হতবাক। হতভম্ব
স্বয়ং শুদ্ধ’ও। একি আদৌও বিশ্বাসযোগ্য? যে মেয়ে
কি না শুদ্ধর উপস্থিতি সহ্য করতে পারে না। বাড়ি
এলে মনে মনে গালির ফোঁয়ারা ছুটায় সে কি না
কাঁদছে শুদ্ধর জন্য! চোখের পানি দেখে বোঝার
উপায় নেই মিথ্যা বলছে। কেন জানি সবাই সন্দেহের

নজরে তাকাল শুদ্ধর দিকে। শুদ্ধ দুই ভ্রুঁ কুঁচকে
তাকিয়ে

দীর্ঘশ্বাস চাপল। কেউ বুঝুক না বুঝুক আসল কাহিনী
বুঝেছে সে। তবুও কিছু বলার প্রয়োজনবোধ করল
না। ড্রামা কুইন ড্রামা করবে এই আর নতুন কি!
কিন্তু শীতলের কান্না দেখে সিরাত পুনরায় বললেন,
-‘স্বামী বিদেশ গেলেও তো কেউ এভাবে কাঁদে না।
অথচ তুই কি না শুদ্ধর জন্য এভাবে কাঁদছিস?
ব্যাপারটা ঠিক হজম হচ্ছে না মা।’ শীতল নাক টানল।
চোখ মুছল। তারপর শুদ্ধর দিকে তাকিয়ে ফোঁপাতে
ফোঁপাতে বলল,

-‘নিজের খেয়াল রাখবে। তাড়াতাড়ি ফিরবেন।
ফোনটা দিয়ে যান খোঁজ খবর তো নিতে হবে নাকি?’
এবার সবাই মুখ চাওয়া চাওয়া করল। এবার কারোই
বুঝতে বাকি রইল না আসল কাহিনী। সায়ন তো হো
হো করে হেসেই ফেলল। অগত্যা শুদ্ধ সবার সামনে
ফোনটা দিয়ে সাবধান করে দিলো,

-‘ফোন নিয়ে বাইরে যাবি না। টিকটক করার কথা
মাথাতেও আনবি না।’

শীতল খপ করে ফোনটা নিয়ে ঘাড় কাত করে
মুখভর্তি হাসল। অর্থাৎ সে

এসব কিছুই করবে না। তারপর শুদ্ধ সবার থেকে
নিয়ে চলে গেল। ঢাকা গিয়ে শীতলের সাথে
দু'একবার কথাও হয়েছে। শুদ্ধর জন্য মেয়ে দেখার
ব্যাপারে সিঁতারাসহ সবাইকে ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক
কিছু বলেছে। কিন্তু

বাড়ির ছোটো সদস্য বলে তার কথা কেউ আমলে
নেয় না। হেসে উড়িয়ে দেয়। ওদিক থেকে শুদ্ধ রোজ
চাপ দিতে থাকে। ফোন দিয়ে কিছু বলার আগেই
বলে, ‘বলেছিলি? মেয়ে দেখা শুরু করেছে?’ শীতল
খুব বিরক্ত হয়। বিয়ে পাগল ছেলে নিজের বিয়ের
কথা নিজে বলে না। অথচ তাকে

বাঘের মুখে ঠেলে দেয়। কিন্তু কি আর করার হাল
ছেড়ে দিলে তো চলবে না গ্যাঁড়াকলে ফেঁসে গেছে
সহ্য করতেই হবে। দেড় ঘন্টার মতো ঘুমিয়ে বিছানা
ছাড়ল শীতল। তারপর কিয়ারাকে বের হতে বলে
নিজেও কোচিংয়ের উদ্দেশ্যে বের হলো। মুখে
মিটিমিটি হাসি।

নতুন ফোন, নতুন সিম, নতুন ফেসবুক আইডি পেয়ে
খুশি যেন ধরে না।

কোচিংয়ে গিয়ে সে সবার আগে কিয়ারের আইফোন
দেখাল। ভাব নিয়ে ছবিও তুলল দুই বান্ধবী। তারপর
কোচিং শেষে বের হয়ে দেখে কিয়ারার বাবা দাঁড়িয়ে
আছেন। কিয়ারার মামাতো বোনের জন্মদিন তাই
এখান থেকে সোজা মামাবাড়ি চলে যাবে তারা।
শীতলকে সাবধানে যেতে বলে কিয়ারা চলে গেল
তার বাবার সাথে। শীতলও সাবধানে রাস্তা পার
হলো।

সামনের মোড়ে রিকশা পাওয়া যাবে। সন্ধ্যা'ও ঘনিয়ে
এসেছে প্রায়। সে মোড়ের দিকে যাওয়ার জন্য পা
বাড়াতেই কিছু লোক তার পথ আঁটকে দাঁড়াল।
অচেনা ছেলেপুলে দেখেও মিষ্টি করে হেসে
শুধাল,-‘কিছু বলবেন ভাইয়া?’

-‘শুধু ভাই আমাদেরকে পাঠিয়েছে আপনাকে নিয়ে
যাওয়ার জন্য।’

-‘কোথায় শুধু ভাই?’

-‘সামনের একটা রিসোর্টে উনার ফ্রেন্ডের বার্থডে পার্টি হচ্ছে তাই ভাই আপনাকে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছে।’

-‘ঢপ মারছেন না তো?’

-‘কি যে বলেন না ছোটো আপু। সেই সাহস কি আর আমাদের আছে?’

-‘আপনারাও শুদ্ধ ভাইকে ভয় পান বুঝি?’

-‘তা তো একটু পাই।’

একথা শুনে শীতল খিলখিল করে হেসে উঠল। শুদ্ধকে ভয় পায় এমন লোক’ও আছে দেখে ভালোই লাগল। ছেলেগুলো তার সঙ্গে গল্প করতে করতে গাড়ির কাছে গেল। সামনে রাখা কালো গাড়িটায় উঠতে ইশারা করে বলল,

-‘আপু আপনি বসেন আমরা এন্ফুগি আসছি।’

-‘আচ্ছা ভাইয়া।’ ছেলেগুলো একটুদূরে দাঁড়িয়ে কাকে যেন ফোন করল। কল রিসিভ না করায় কল দিতেই থাকল। নিজেরা গুজুরগুজুর করে সামনের দোকান থেকে সিগারেট কিনলো। তাদের মতিগতি খেয়াল করে শীতলের কেমন যেন লাগল। কোথায় নিয়ে গেলে সায়ন, শুদ্ধ নিজে নিয়ে যায়। কখনো তো

কাউকে পাঠায় না তাহলে আজ কেন? তাছাড়া তার
জানামতে শুদ্ধ দেশের বাইরে আছে। দেশের বাইরে
থেকে কিভাবে বার্থে পাটি এটেড করবে? এসব
ভেবে তার মাথা ঘুরতে লাগল। অজানা এক ভয়ে
হাত পা

কাঁপতে থাকল। বিপদের আভাষ পেয়ে ছেলেগুলোর
দিকে নজর রেখে ডাটা অন করে কল দিলো শুদ্ধর
নাম্বারে। তিনবারের বেলায় শুদ্ধ কল রিসিভ করতেই
শীতল হড়হড় করে বলল,-‘শুদ্ধ ভাই, আপনি কি
আমাকে নিয়ে যেতে লোক পাঠিয়েছেন?’

-‘কই না তো। আমি কেন লোক পাঠাব?’

-‘ তাহলে একদল ছেলে এসে যে আপনার নাম
বলল। আপনি নাকি আমাকে নিয়ে যেতে তাদের
পাঠিয়েছেন।’

-‘এখন কোথায় আছিস তুই?’

-‘একটা কালো গাড়িতে বসে আছি।’

-‘ চেনা নেই, জানা নেই, কার গাড়িতে উঠে
বসেছিস? কেউ কিডন্যাপ করতে যায় নি তো
আবার?’

-‘ কিড..ন্যাপ! কিডন্যাপ করবে মানে? কি বলছেন এসব? এখন উপায়? আমি কি তাহলে অজ্ঞান হয়ে যাব?’

-‘ অজ্ঞান হয়ে যাবি মানে?’

-‘ গুন্ডারা ধরতে এলে সিনেমায় নায়িকারা যেভাবে অজ্ঞান হয়ে যায় ওভাবে।’

-‘এটা বাংলা সিনেমা পাস নি। পালা বে’য়া’দব। এম্ফুণি গাড়ির দরজা খুলে দৌড় দে।’

-‘ওরা তো গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে।’-‘যেভাবেই হোক তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যা শীতল।’
এতক্ষন ব্যাপারটা সহজভাবে নিলেও এবার শীতলের ঘাম ছুটে গেল।

শুদ্ধর কথা বলার ধরণই বলে দিচ্ছে সে মজা করছে না, লোকগুলোকে সে পাঠায়ওনি। অর্থাৎ পুনরায় নিজের বোকামি নিজেই ফেঁসে গেছে সে। কিন্তু এরা কারা? তাকে কোথায় নিয়ে যেতে চায়? সে ভয়ে ভয়েই বলল,

-‘ভ..ভয় লাগছে শুদ্ধ ভাই।’

-‘ভয় নেই। গাড়ির জানালা দিয়ে দেখ আশেপাশে লোকজন আছে কি না। যদি থাকে সেদিকে দৌড়ে

যা। আমি এম্মুণি ভাইয়াকে যেতে বলছি। শুদ্ধর চিন্তিত
কণ্ঠস্বর। শীতলের ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শুনে তার বুকের
ভেতর কেমন করে যেন মোচড় দিয়ে উঠছে। কপাল
বেয়ে সরু ঘাম ঝরতে শুরু করল। তবুও শীতলকে
স্বাভাবিক রাখতে বলেই গেল,

-‘শীতল, হ্যালো, হ্যালো আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস?
ফোন বন্ধ করিস না। যেভাবেই হোক ফোনটা যেন
অন থাকে। প্রয়োজনে ফোন সাইলেন্ট করে সেদিনের
মত সেইভ জনে লুকিয়ে রাখ।’ একথা বলতে না
বলতে কয়েকজনের কথা শোনা গেল। বুঝল
শীতলের সঙ্গে হাতাহাতি হচ্ছে ওদের। শীতল সমানে
চেষ্টাচ্ছে, ‘বাঁচান, শুদ্ধ ভাই! এরা সত্যি সত্যিই
আমাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছে। শুদ্ধ ভাই এরা
আমাকে..!’

শীতলের পুরো কথাটা শোনা গেল না এরপরই
ফোনটা অফ হয়ে গেল।

কোনোভাবেই না ফোনে কল ঢুকল আর না লোকেশন
ট্র্যাক করা গেল। সন্ধ্যা সাড়ে ছয় টা।

চলন্ত গাড়ির পেছনের সিটে মুখ ফুলিয়ে বসে আছে
শীতল। মন খারাপ করে তাকিয়ে আছে বাইরের

দিকে। গাড়িটা কোন দিকে যাচ্ছে বুঝতে পারছে না।
আর না এই রাস্তা তার পরিচিত। সারাদিন পর
অফিস ছুটির কারণ পথেঘাটে জ্যাম বেঁধেছে। একটু
পথ গিয়ে জ্যামের কারনে বসতে হচ্ছে মিনিটের পর
মিনিট। জ্যাম দেখে চিৎকার করার পায়তারা জুড়তে
পারে ভেবে ছেলেগুলো শীতলের চোখ, হাত-মুখ বেঁধে
দিয়েছে। কৰ্কশ স্বরে শাসিয়েছেও যেন শব্দ না করে।
গাড়িতে গান চলছে যাতে শীতলের গোংড়ানোর শব্দ
ভুলেও বাইরে না যায়। পেছনের সিটও অন্ধকার করে
রাখা। গাড়ি গ্লাস তুলে দেওয়ায় বোঝারো উপায় নেই
জলজ্যান্ত একটা মেয়েকে তারা কিডন্যাপ করে নিয়ে
যাচ্ছে। কি'ড'ন্যা'প হচ্ছে জেনে শীতল প্রথম প্রথম
ভয় পেলেও এখন আর ভয় পাচ্ছে না। বরং রাগ
হচ্ছে। মন চাচ্ছে নিজেকে থাপড়াতে। মোটকথা সে
এমন বোকামি করলো কিভাবে? নিজের পায়ে হেঁটে
এসে গাড়িতে বসে যেসব চিন্তা করল সেসব আগে
কেন করল না? কেন ভাবল না বাইরের পৃথিবীটা
জনজালে ভরা। বেশিরভাগই নারীখেকো হয়েনা।
এদিকে তার

ফোনটাও কেড়ে নিয়েছে ছেলেগুলো। কিন্তু কারা
এরা? কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাকে? এসবের পেছনে
কে আছে? কে তাদের গোপন শত্রু? কি উদ্দেশ্য
তার? তাকে মেরে ফেলবে নাকি তার গায়ে কলঙ্কের
বিশ্রী কালি লেপ্টানো তার উদ্দেশ্য? তাছাড়া আজকাল
নাকি দলে দলে কিডনী চোর বের হয়েছে। অল্পবয়সী
ছেলেমেয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে কিডনী কেড়ে নিচ্ছে।
তারও কি তাই করবে নাকি? যদি করে টাকার ভাগ
তাকে দিবে নাকি পুরোটা নিয়ে নেবে? যদি দেয় তো
ভালো নয়তো সেও ব'দ'মা'শগুলোর নামে মা'ম'লা
ঠুকে দেবে।

আর্মির মেয়ের কিডনী কাড়ার সাধ জন্মের মতো
ঘু'চি'য়ে দেবে। আর্মি শব্দটা স্মরণ হতেই বাবার কথা
মনে গেল তার। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে।
কাঁদতে কাঁদতে কান্নার গতি বেড়ে গেল। হঠাৎ তাকে
কাঁদতে দেখে ছেলেগুলো একে অপরের মুখ
চাওয়াচাওয়ি করল। তাদের কাছে খবর আছে এই
মেয়ে দেখতে ভোলাভালা হলেও বহুত চালাক।
শয়তানি

বুদ্ধি তার রন্ধে রন্ধে তাই ভুলেও এর অভিনয়ে গলা
যাবে না। না আবেগ দেখে মায়া করা যাবে। কেঁদে
মরে গেলেও সাত্ত্বণা দেওয়া যাবে না কারণ কথার
চক্রে ফেলে গোপন তথ্য নিয়ে নিতেও পারে। একথা
ভেবে তারা কেউ কথা বাড়াল না বরং নিজেরা
নিজেরা গল্প করতে লাগল। তারপর জ্যাম ছুটলে
গাড়ি ছুটাল নির্জন রাস্তার পথ ধরে। এই রাস্তায় কেউ
নেই দেখে শীতলের মুখ, চোখ খুলে দেওয়া হলো।
ছাড়া পেয়ে সে উঠে বসল।

আশেপাশে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল গাড়ি
কোনদিকে যাচ্ছে। কিন্তু অন্ধকার জনমানবশূন্য রাস্তা
দেখে ভয়ে চুপসে গেল। তাকে ভয় পেতে দেখে
একটা ছেলে খ্যাক খ্যাক করে হেসে বলল,- ‘কিছু
খাবেন আপু?’

-‘আপনাদের বসের নাম কি?’

-‘জানি না।’

-‘যার হয়ে কাজ করছেন তার নাম জানেন না?’

-‘না, টাকার বিনিময়ে কাজ করি। টাকা পেলে আর
কোনোকিছু জানার আগ্রহ আসে না।’

-‘আপনারদের স্যারকে ফোন দিয়ে বলুন, আমি কথা বলব।’

-‘জায়গা মতো পৌঁছায় শুধু কথা না অনেককিছু করতেও পারবেন?’

একথা বলে ছেলেটা শব্দ করে হাসতে লাগল। তার দেখে হাসতে লাগল সঙ্গের ছেলেগুলোও। শীতল চোয়াল শক্ত করে তাকিয়ে রইল। মনে মনে কয়েকদফা গালি বর্ষণ করে চুপ করে বসে রইল। কাঁদতে লাগল নীরবে, নিঃশব্দে। কাঁদতে কাঁদতে কেন জানি তার বরইয়ের আচারের কথা মনে পড়ল। ভাবল,এদের হাতে মা’রা গেলে আর আচার খাওয়া হবে না তার। বড় আম্মুর বানানো আচার সায়ন ভাইই খেয়ে নেবে। সায়ন ভাই আবার আচার পাগল। মেয়ে মানুষের মতো বাটি বাটি আচার খায় সে। আচ্ছা, সায়ন ভাইয়ের যখন বিয়ে হবে তার বউয়ের বাচ্চা হবে তখন সায়ন ভাই কি তার বউয়ের আচারে ভাগ বসাবে? কেঁড়ে কুঁড়ে নিজেই খেয়ে নিবে? নাকি মুখভর্তি আচার নিয়ে বলবে, ‘বুঝলি শীতল, বাপ হচ্ছি, মুখে রুচি টুচি নেই তাই আচার খাচ্ছি।’

একথা ভেবে খিলখিল করে হেসে উঠল শীতল।
ছেলেগুলো কথা থামিয়ে
ঘুরে তাকাল তার দিকে। অদ্ভুত তো, মেয়েটার গায়ে
জ্বিন আছে নাকি? এই হাসে, এই কাঁদে। শীতল
সিটে হেলান দিয়ে বসে কিছু একটা ভাবল।
জিব দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে ভ্রুঁ কুঁচকে একে একে সব
ছেলেগুলোকে গুনে দেখল। মোট পাঁচজন আছে
গাড়িতে। একজন একটুপর পর কার সাথে যেন
ফোনে কথা বলছে। একবার তার ছবি তুলে কাকে
যেন পাঠাল সে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে পুনরায় কল এলে ছেলেটি
রিসিভ করল। বিনয়ী ভাব কণ্ঠে ঢেলে বলল,
-‘ফেনীর দিকে যাচ্ছি স্যার। তাহলে গাড়ি ঘুরাব?
গোডাউন কুমিল্লায়? জি, জি! তাহলে কুমিল্লার দিকে
এগোচ্ছি আমরা।’ শীতল তাদের কথা শুনল। মস্তিষ্কে
ধাক্কা দিলো নানান চিন্তা। এদেরকে বিশ্বাস করে ভুল
করে ফেলেছে। যেভাবেই হোক গাড়ি থামানোর
ব্যবস্থা করতে হবে। বুদ্ধি খাঁটিয়ে শুদ্ধ, সায়ন, নয়তো
বাবাকে একটা ক্লু পাঠাতে হবে। তার আগে কথা
বলে এদের মাথা খেতে হবে। ভয় পেলে চলবে না।

বরং ভয় পেলে এরা লাই পাব, মজা লুটবে। একথা
ভেবে সে মন খারাপ দূর করে ঠোঁটে হাসি ফুটাল।
এরপর কণ্ঠে মধু ঢেলে মিষ্টি করে ডাকল,

-‘ভাইজান?’পাশে বসা ছেলেটা তাকাল। সে আবার
কানে কম শোনে। মেয়ে মানুষের মিনমিনে সুরের
কথা বোঝেও কম। না বুঝলে পুনরায় জিগাতে
ইগোতে বাঁধে। যতই হোক পুরুষ মানুষ বলে কথা
আত্মসন্মানবোধ থাকা জরুরি।

শীতল তাকে কিছু বলছে বুঝতে পেরে সে পাশের
জনকে গুঁতো মারল। ইশারা করল পাশে তাকাতে।
পাশেরজন তখন সবে মুখে পানি নিয়েছিল পান
করার জন্য। হঠাৎই পেটে গুঁতো লাগায় মুখের পানি
বেরিয়ে গেল। সে বিরক্ত হয়ে তাকাল কম শোনা
ছেলেটার দিকে। তাকে তাকাতে দেখে ছেলেটা দাঁত
বের করে হেসে শীতলকে দেখাল। ছেলেটার দৃষ্টি
যেন বলে দিলো, শীতলের উপর খুবই বিরক্ত
দু’থাপ্পড় দিতে পারলে শান্তি পেতো।

মেয়েটার চোখ, মুখ খুলে দেওয়া হয়েছে অনেক আগে
অথচ মেয়েটা না কাঁদছে আর না চিৎকার করছে।
চিৎকার করার অজুহাতে মারধর করত নাহয়। কিন্তু

সে তা করছে না বরং দেখে মনে হচ্ছে পিকনিকে
যাচ্ছে সে।

ভীষণ খুশি। তাকে রাগী দৃষ্টিতে তাকাতে দেখে
শীতল পুনরায় ডাকল। এবার ছেলেটি কৰ্কশকণ্ঠে
জবাব দিলো,-‘কিতা হইছে?’

শীতল ভ্রু কুচকালো। ইচ্ছে করল মুখ বরাবর একটা
ঘুষি মেরে বলতে,

-‘আমাকে কি’ড’ন্যা’প করে আমাকেই বলছিস, কিতা
হইছে! হা’রা’মির দল একবার ছাড়া পাই তোদের
পেছনে লাল কাপড় বেঁধে শুদ্ধ ষাঁড়ের গুঁতো না
খাওয়ালে আমার নামও শীতল না। তখন ভালো করে
বুঝবি আমার আসলে কিতা হইছে!’

মনের কথা মুখ ফুটে বলা হলো না শীতলের।
কোনোমতে কথা গিলে মুখ এইটুকু করে বসে রইল।
তখন ড্রাইভারের পাশে বসা ছেলেটা হাসিমুখে
শুধালো,

-‘কোনো সমস্যা আপু?’

শীতল সাহস পেল। বেঁধে রাখা হাতটা মুচড়ামুচড়ি
করে বলল,

-‘এই ভাই বরইয়ের আচার আছে আপনার কাছে?’

-‘না নেই।’-‘নেই মানে? কেন নেই? এখন দেবো একটা গাটা? কি’ড’ন্যা’প করার সময় মনে ছিল না গাড়িতে উঠলে আমার বমি পায়। মাথায় ঘুরায়। এখন দেই আপনার গায়ে হকহক করে বমি করে?’

-‘ম’স্ত বড় ভুল হয়ে গেছে মেডাম। পরেরবার কিডন্যাপ করতে এলে আপনার জন্য বরইয়ের আচার নিয়ে আসব।’

-‘ঠিক আছে। ঠিক আছে। কিন্তু আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন টা কোথায়?এক কাজ করুন কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, নয়তো সাজেকের দিকে চলুন। জীবনে কখনো মন খুলে বেড়াতে পারলাম না এই সুযোগে ঘুরে আসাও হবে।’

-‘মেডাম আমরা আপনাকে কিডন্যাপ করেছি হানিমুনে নিয়ে যাচ্ছি না।’

-‘আপনাদের মতো পেট মোটা, বয়রা, টাকলা পোলাপানের সাথে আমি হানিমুনে যেতামও না। যা বলছি শুনুন নয়তো আপনাদের মালিককের কাছে বিচার দেবো কিন্তু?’-‘স্যার বলেছে, আপনাকে কুমিল্লায় নিয়ে যেতে।’

-‘কেন, রসমালাই খাওয়াতে?’

-‘না, আপনাকে খেতে।’

-‘আমাকে কেন খাবে? তার বাড়িতে মা, বোন নেই? গিয়ে তাদের খাক। অন্যের বোনের দিকে নজর কেন?’

একথা শুনে ছেলেটা চুপ হয়ে গেল। গাড়ি উঠে অবধি বকবক করতেই আছে মেয়েটা। প্রশ্নের বহর থামছে না। কান, মাথা, সব ঝালাপালা করে দিলো। শুধু বসের জন্য কিছু বলতে পারছে না নয়তো এতক্ষণে জানের দফারফা করে ফেলত। ছেলেটা চুপ হয়ে গেল দেখে শীতল কথা বাড়াল না। কিছুক্ষণ পর নড়েচড়ে বসল। কিন্তু কতক্ষণ আর এভাবে বসে থাকা যায়? একদিক দিয়ে নিশ্চিত শুদ্ধ জেনেছে কিডন্যাপ হয়েছে। নিশ্চয়ই কোনো না কোন পথ খুঁজে বের করবেই সে। তবে ফোন অন থাকার কথা বলেছিল শুদ্ধ। কিন্তু ছেলেগুলো তার ফোনটা কেড়ে বন্ধ করে দিয়েছে।

রাত বাড়ছে। ঘড়িতে ক’টা বাজে কে জানে? আম্মুরা বাসায় ফিরেছে?উনারা বাসায় ফিরে তাকে না পেয়ে চিন্তা করছে নিশ্চয়ই! কান্নাকাটিও শুরু করে দিয়েছে বোধহয়! এখন কি করবে সে? কিভাবে ছাড়া পাবে?

রোজ পত্রিকা খুললে দেখা যায় ধর্ষনের সংবাদ। তার সাথেও কি এমন কিছু ঘটবে? চৌধুরী বাড়ির সদস্যের মাথা হেট হবে শুধু তার বোকামির কারণে? বড় আবু, মেজো আবু, আবু, সায়েন ভাই, শুদ্ধ ভাই তারা কি লজ্জায় পড়ে যাবে? তাদের সুখপূর্ণ জীবনে অসন্মানের তকমা লাগবে তার কারণে? বড় আম্মু, মেজো আম্মু, আম্মুরা কি তার জন্য কাঁদবে?

শখ আপু, স্বর্ণ আপু এরা কি মন খারাপ করবে নাকি খুশি হবে জ্বালাতন করা মানুষটা হারিয়ে গেলে? এসব ভেবে তার গলা শুকিয়ে এলো। কণ্ঠ রোধ হয়ে এলো বুকচাপা কান্নায়। ভয়ে কাঁপতে লাগল সে। নির্জন রাস্তা তার উপরে এতগুলো ছেলে। সিটে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে রইল শীতল। না, একটু খাওয়া দরকার। সে ছেলেগুলোকে বলল পানি খাবে তাকে পানি খাওয়ানো হলো। কিছুক্ষণ পর বলল ক্ষুধা পেয়েছে তাকে খাবারও দেওয়া হলো।

অথচ খাবার গলা দিয়ে নামছে না। মানুষ ভয় পেলে কিংবা টেনশনে করলে বুঝি এমনই হয়। ফোনটা এখনো বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। শীতলের জানামতে ফোন বন্ধ থাকলে লোকেশন ট্র্যাক করা যায় না।

লোকেশন ট্র্যাক না করলে তার খোঁজ করতে পারবে না শুদ্ধ। তাই মনে মনে কিছু একটা ভেবে বলল এভাবে সময় কাটছে না ফোনটা দিলে রিলস দেখলে সময় কাটত। একথা শুনে অতিষ্ঠ হয়ে একজন স্বজোরে থাপ্পড় বসিয়ে দিলো তার দুই গালে। দাঁতের সাথে ঠোঁট লেগে রক্ত বের হলো। পুরুষালি শক্ত হাতের থাপ্পড়ে গালে পাঁচ আঙ্গুলের দাগ বসে গেল। শীতল হতবাক হয়ে তাকাল রইল ছেলেটার দিকে। অকারণে মারার জন্য খুব রাগ হলো তার। সেও এক পা তুলে আচমকা লাথি বসাল ছেলেটার প্যান্ট বরাবর। তার এহেন কাণ্ডে পাশের ছেলেটা এবার রেগে আরেকটা থাপ্পড় বসিয়ে হিজাব টেনে খুলে ফেলল। একহাতে নাক চেপে ধরে আরেক হাতে শক্ত করে চেপে ধরল শীতলের গলা। নিঃশ্বাস নিতে না পেরে শীতল কাঁটা মুরগির মতো ছটফট করতে লাগল। হাত-পা ছুঁড়েও ছেলেটাকে ছাড়তে পারল না। এবার প্রাণটা বুঝি যায় যায়। এতক্ষণ ভয় দূর করতে বকবক করছিল শীতল। বোঝাতে চেয়েছিল সে ভয় পাচ্ছে না স্বাভাবিক আছে। আসলেই তাই? এতগুলো ছেলের মাঝে স্বাভাবিক থাকা যায়? থাকা কি সম্ভব?

এদিকে তার বকবকানিতে অতিষ্ঠ হয়ে অন্য
ছেলেগুলো থামানো দূর, এগিয়েও এলো না। বরং
দেখল। হাসল। পরে শীতলের চোখজোড়া উল্টে
আসলে তারা ছেলেটাকে কোনোমতে সরাল। তবে
ছেলেটা সরার আগে শীতলের বুকে স্বজোরে একটা
লাথি বসাল। লাথিটা লেগেছে হার্ট বরাবর। এই বুঝি
প্রাণটা বেরিয়ে এলো। জন্মের পর গায়ে ফুলের টোঁকা
না পড়া মেয়েটা অসহ্য যন্ত্রনায় গুমড়ে উঠল। তার
হাত-পাও ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে এলো। চোখে
নামল গাঢ় অন্ধকার। কানে বাজল প্রাণপ্রিয় বাবার
আদুরে ডাক, ‘মা, শীতল। কই তুমি মা?’ শীতল
ছোটো থেকে অতিরিক্ত চঞ্চল। বাঁচাল। দুষ্ট বুদ্ধির
অধিকারিণী।

তবে সে যতই চঞ্চল হোক, দুষ্টমি করুক, কেউ
তাকে এভাবে মা’রে নি। শারায়াত চৌধুরীর কারণে
মা’রা’র সাহস করে নি। শুধু মাঝে মাঝে মার খেতো
শুদ্ধর হাতে তাও তার অপকর্মের কারণে। এজন্য
শুদ্ধকে পাষণ উপাধিও দিয়েছে। তবে আজ বুঝল
শুদ্ধ ভাই মারলেও রয়ে সয়ে সহ্য ক্ষমতা বুঝেই
মারত। আর এরা! তবে বলতেই হয় শুদ্ধ ভাই আর

এদের মারের মধ্যে অনেক তফাৎ। আকাশ-পাতাল তফাৎ! শীতল জ্ঞান হারাল। অচেতন শীতলের মাথাটা ধাক্কা খেলো গাড়ির কাঁচে সাথে। হঠাৎ গাড়ি ব্রেক করায় আবার গিয়ে ধাক্কা খেলো সামনের সিটে। তবুও ছেলেগুলো দেখেও দেখল না। বিরক্ত মুখে ফোনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

অন্যের বাড়ির মেয়ে, ম'রু'ক, বাঁচুক, যা ইচ্ছে করুক, তাতে তাদের কি?

অগত্যা তিন চৌধুরীর এক কলিজা অনাদরে পড়ে রইল সিটের উপরে।

তিন মায়ের আদুরে রাজকন্যাটা আঘাত পেয়ে কপাল ফুলে কারশিটে পড়ে গেছে। চার ভাইয়ের সবচেয়ে চঞ্চল, বাঁচাল বোনটিকে কথা বলার দায়ে শক্ত হাতে আঘাত করা হয়েছে। তার ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে। গলা চেপে ধরার গলায় দাগ বসে গেছে। কেউ জানলও না, কেউ দেখলও না, চৌধুরী বাড়ির আদুরে কন্যার বর্তমান হাল। কিছুদিনের জন্য দেশে ছেড়েছে শুদ্ধ। পাঁচ বন্ধু এসেছে তাদের স্যারের জরুরি ডাকে। দিন-রাত এক করে তারা কাজ করছে ল্যাভে। খাওয়ার সময়টুকু ছাড়া সময় কাটছে সেখানেই।

আজও একমনে কাজ করছিল সে। হঠাৎ ফোন
ভাইব্রেট করায় কাজে বিঘ্ন ঘটে সবার। স্যার খুব
বিরক্ত হলেও কিছু বললেন না কারণ শুদ্ধ শুনতো
না। দলের মধ্যে এই ছেলেটা যেমন মেধাবী, তেমনি
ত্যাড়া। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছাড় না দিলে সে কাজে
হাত দেয় না। তাছাড়া ছেলেটা পরিবার নিয়ে খুব
বেশিই পজেসিভ। তাই কথা না বাড়িয়ে সবাইকে
মনযোগী হতে ইশারা করলেন উনি। আর শুদ্ধ
ফোনটা নিয়ে চলে গেল ল্যাবের এককোণে।
ডিসপ্লেতে ভাসছে ‘ব্যাঙাচি’ নাম। কল রিসিভ করে
শীতলের কথা শুনে চিন্তা বেড়ে গেছে তার। সে
স্যারকে বলে বেরিয়ে এসেছে ল্যাব থেকে। কথা
বলতে বলতে কল কেটে গেলে দৌড়ে এসেছে তার
জন্য বরাদ্দকৃত রুমে। ল্যাবের অ্যাপ্রন পরা অবস্থায়
বসে পড়েছে লেপটপ নিয়ে। লেপটপে শো করছে
তার ফোনের সকল তথ্য। চেষ্টা করছে ফোনের
লোকেশন ট্র্যাক করার। যদিও ফোন বন্ধ। তারপরেও
বেশিরভাগ ওয়ারলেস চিপগুলি ডিভাইস বন্ধ থাকা
সত্ত্বেও কাজ করতে থাকে। কিছু কিছু কম্পোনেন্ট
লো পাওয়ার মোডে চলতে থাকে আইফোন বন্ধ

হওয়ার ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত। তথ্য অনুযায়ী এই উপাদানগুলোর শক্তি থাকে এবং ট্র্যাকিংয়েও সক্রিয় থাকে। মোটকথা, সিস্টেম-ওয়াইড অ্যাক্সেসসহ সেটিং ব্যবহার করে ফোনের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে বন্ধ থাকা অবস্থাতেও। তাছাড়া সেও যেন জানত, ফোনটা হারাবে

নয়তো কোনো অঘটন ঘটাবে এই মেয়ে। বরং অঘটন না ঘটালে অবাক হতো। সেই চিন্তা মাথায় রেখে আগে থেকে শকতপোক্ত ব্যবস্থাও করে রেখেছে। কিছুক্ষণ চেষ্টা চালানোর পর সে সফল হলো। ফোনের লাস্ট লোকেশন শো করছে ঢাকাতে এবং সেটা যাচ্ছে ফেনীর দিকে। শুদ্ধ লেপটপে দৃষ্টি রেখে কল করল শাহাদত চৌধুরীকে। জানাল ঘটে যাওয়া পুরো ঘটনা। শাহাদাত চৌধুরী ঠান্ডা মাথা পুরো ঘটনা শুনলেন। ভাবলেন। তারপর

জানালেন সেনাবাহিনী ক্যাম্পের উর্ধ্বস্ত কর্মকর্তাকে। আধাঘন্টার মধ্যে ফেনির রাস্তা ব্লক করার ব্যবস্থা করা হলো। পুলিশ'ও নেমে গেল রাস্তায়।

সেই রাস্তার প্রতিটা পয়েন্টে থাকা ট্রাফিক পুলিশদের সিগন্যাল পাঠানো হলো। এইটুকু সময়ের মধ্যে

যতটুকু করার সম্ভব করল। কিন্তু তাতে কিছু হবে
তো! বাঁচতে পারবে তো তাদের বাড়ির প্রানবন্ত
ফুলটাকে? এদিকে সায়নের কাছে এ খবর পৌঁছে
গেছে অনেক আগে। তারই লোক দেখেছে শীতলকে
একটা কালো গাড়িতে উঠতে। তাৎক্ষণিক জানিয়েছে
একথা। সায়ন খেয়ে ঘুমিয়েছিল। হঠাৎ ফোনের গোঁ
গোঁ শব্দে খুব বিরক্ত

হয়। দু'পায়ে মাঝে জড়িয়ে ধরে থাকা
কোলবালিশটাকে জড়িয়ে ধরে গালি দেয়
কলদাতাকে। দু'একবার রিং হয়ে থামছে না যখন
তখন উঠে কল রিসিভ করল সে। রাগে ফোঁস ফোঁস
করতে করতে বলল,

-‘ওই মা’দার’চো’দ কল করার সময় পাস নি? আমি
ঘুমালেই তোর ফোন দিবার মন চায়? আমার ঠা’প না
খাইলে শান্তি পাও না তুমি, না? আসো শালা আগে
তোমার মনের মখ মিটায়?’

-‘ভুল হইছে ভাই। একখান কথা জানার লিগা ফোন
দিসি ভাই।’

-‘পরে জানা যাইতো না তোর ফা’কিং কথা?’-‘ঢাকা মেট্রো-গ, ৫২_৫২১* এটা আপনাদের গাড়ির নাম্বার। গাড়ির রং কালো।’

একথা শুনে সায়নের ঘুম ছুটে গেল। তার মা চাটীরা বাইরে গেছে তাদের কিছু হলো না তো? আজম হঠাৎ করে গাড়ির কথা জানতে চাচ্ছে কেন? একথা মস্তিষ্কে টোকা মারতেই তার ভ্রুঁ কুচকে গেল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মনে করল তাদের বাড়ির সব গাড়িগুলোও নাম্বার। এই নাম্বারের গাড়ি তাদের নেই। তাই সে বলল,

-‘কাহিনী কি আজম? গাড়ির নাম্বার জিগালি ক্যান?’

-‘শীতল আপু কিছুক্ষণ আগে কালো একটা গাড়িতে উঠেছে। সঙ্গে ছিল

পাঁচটা ছেলে। তবে তাদের দেখে মনে হলো, আমাদের এরিয়ার ছেলে না তারা।’

-‘গাড়ি ফলো করতে থাক, আসছি আমি। ভুলেও গাড়িটা যেন চোখের আড়াল না হয়।’

-‘ঠিক আছে ভাই।’তারপর থেকে আজম নামের ছেলেসহ ক’জন গাড়িটাতে ফলো করছে।

শীতলের গাড়ির পেছনে রয়েছে তাদের গাড়িটা। কিন্তু দুঃভাগ্যবশত সেই মুহূর্তে আজমদের গাড়ির টায়ার পাংচার হয়ে যায়। চোখের পলকে তারা হারিয়ে ফেলে শীতলদের গাড়ি। নিঁখোজ হয় শীতল। তাকে খুঁজতে উঠে পড়ে রেগেছে তার বাপ ও বড় ভাইরা। একথা শুনে ইয়াসির হো হো করে হাসল। তারপর অর্ধনগ্ন শরীরে বিছানার হেডবোর্ডে হেলান দিয়ে বসল। হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া উড়াতে উড়াতে কল করল কিডন্যাপারদের একজনকে। বলল,-‘মেয়েটা কই?’

-‘গাড়িতেই আছে।’

-‘কিছু করিস নি তো তাকে?’

-‘না স্যার।’

-‘আমার খাবার সে। ভুলেও টাচ করবি না ওকে।’

-‘জি স্যার।’

-‘ওর ফোন আর ওকে গাড়িতে রেখে পালা দেখি এবার।’

-‘কেন স্যার? কুমিল্লা যাব না?’-‘ওর বাপ ভাইরা আসছে তাদের পেছনে বাটাম দিতে। বাটাম নিতে

পারলে গাড়িতেই বসে থাক। বাই দ্যা ওয়ে, আমি কিন্তু চিনি না তোদের, বাই।’_’মেয়েটা কই?’

_’গাড়িতেই আছে।’

_’কিছু করিস নি তো তাকে?’

_’না স্যার।’

_’আমার খাবার সে। ভুলেও টাচ্ করবি না ওকে।’

_’জি স্যার।’

_’ওর ফোন আর ওকে গাড়িতে রেখে পালা দেখি এবার।’

_’কেন স্যার? কুমিল্লা যাব না?’

_’ওর বাপ ভাইরা আসছে তোদের পেছনে বা’টা’ম দিতে। বা’টা’ম নিতে পারলে গাড়িতেই বসে থাক। বাই দ্যা ওয়ে, আমি কিন্তু চিনি না তোদের, বাই।’একথা বলে কল কাটতে গিয়েও থেমে গেল ইয়াসির। কিছু একটা ভেবে

ঠোঁট কামড়ে হাসল। ছবিতে দেখা মেয়েটাকে মন ধরেছে। হাত নিশাপিশ করছে ছুঁয়ে দেখতে। শরীরের গঠন অস্ফির! দেখেই মনে হচ্ছে পুরুষালি হাত পড়ে নি লতানো দেহে। বাবা ভাই যে খুব আদরে বড় করেছে সেটা দেখেই বোঝা যায়। তবে নারী যখন

হয়েছে পুরুষ তো ছুঁবেই। আদরের ছাপ পড়বেই তার
সর্বাঙ্গে। পুতুলটাকে যখন খুবলে খাবে তখন কি আর
এমন স্নিগ্ধ রূপ থাকবে? থাকবে না রে, থাকবে না!
এতদিন যত মেয়ের গায়ে তার হাত পড়েছে সেই
মেয়েই মারা গেছে। কেউ বা মরেছে স'ঙ্গ'ম
চলাকালীন কেউবা মাত্রারিক্ত র'ক্ত ক্ষরণে। এখানে
তার তো দোষ নেই। সব দোষ মেয়েগুলোর। তারা
কেন তার রুডলি আদর নিতে পারে না? মেয়ে হয়ে
যখন জন্মেছে পুরুষের আদর কেন নিতে পারবে না,
কেন?

যারা পারে না তাদের ম'রে যাওয়াই ভালো। এত
নরম সরম মানবীদের জন্য এই পৃথিবী নয়! তাকে
চুপ থাকতে দেখে ছেলেটি ভয়ে ভয়ে বলল, _'ওরা
খোঁজ পেল কিভাবে, বস?'

_ 'কাদের বাড়ির মেয়ে তুলেছিস খোঁজ নিস নি? না
নিলে নিস নে। তবে

এটা কেবল ট্রেইলর ছিল সিনেমা এখনো বাকি। গা
ঢাকা দে। যতদিন না আমি বলব ততদিন বাইরে
বেরোস না। নয়তো সায়ন, শুদ্ধ তোদের একেকটাকে
ধরে এমন ঠা'প দিবে বাপ বলাও সময় পাবি না।'

-‘সায়নকে নিয়ে ভয় আছে তবে শুদ্ধকে তো ওইরকম মনে হয় নি।’

-‘সায়নের থেকেও শুদ্ধ ডেঞ্জারাস। সায়ন প্রকাশ্যে খেলে আর শুদ্ধ চাল বুঝে দান ফেলে। মা’দা’র’চো’দ আরেকটা চিজ বটে।’

—‘কথার কথা এক কথা আমরা ফেঁসে যাব না তো বস?’

—‘আমি কি করে বলব? ফাঁসবি নাকি কি করবি তোরা জানিস। তবে হ্যাঁ আমার সাথে চা’লা’কি করতে যাস না। চা’লা’কি তোমাদের পেছন দিয়ে ভরে দেবো। ‘আউচ’ করারও সময় দেবো না। মনে রাখিস, আমি এসবে দারুণ এক্সপার্ট।’ একথা বলে ইয়াসির কল কেটে দিলো। ছেলেগুলো একে অপরের দিকে তাকিয়ে চিন্তিত হয়। তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে ফাঁকতালে নিজেই কেটে পড়ছে। আবার শীতল কণ্ঠে থ্রেট’ও দিচ্ছে নাম না বলার জন্য। এ লোক ঠান্ডা মাথার খুনি প্রথমে বুঝতে পারে নি। বোঝার উপায় নেই কারণ এই লোক ডিলার নয়। তাদের সাথে ডিল করেছে অন্যকেউ। ‘অন্যকেউ’ সেই মানুষটাকেও চেনে না। মোটকথা, টাকার পোকা তারা। যার থেকে

টাকা পায় তার হয়েই কাজ করে। তাছাড়া কিডন্যাপ
কেস এই প্রথমবার তাও নয়। পূর্বেও বহু জনকে
করেছে। হাত-পা লুলা করে বাড়ির সামনে ফেলে
এসেছে। কাউকে মে'রে গুম করে দিয়েছে। কাউকে
বা টাকার বিনিময়ে প্রাণ ভিক্ষা দিয়েছে। এসব কাজ
বহুবার করেছে বলেই চৌধুরী বাড়ির মেয়ে তুলতে
এতকিছু ভাবে নি। এখন মনে হচ্ছে এবার চালে ভুল
করে ফেলেছে। তাদের খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল।
সায়ন পশু কুরবানি করার মতো মানুষ জবাই করে।
শুদ্ধও নাকি কম না। এমন ভয়ংকর ভাইয়দের
আদুরে বোনকে তুলেআনা উচিত হয় নি। এখন
নিজেরাই না মারা পড়ে।

নিজাদের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছে বড়লোকগুলো
গিরগিটি হয়। সময়ে সময়ে রং বদলায়। ইয়াসিরের
মতো নি'মো'কহা'রা'ম টাইপের হয়। কাজ করিয়ে
পরে তাদেরকেই চিনতে পারে না। অগ্রিম টাকা
নিয়েছিল বিধায় নয়তো টাকা ছুঁড়তো শা'লা
ইয়াসিরের মুখে। এখন কিছুটি করারও নেই। বাঁচতে
চাইলে, চোখ বুজে জান নিয়ে পালাতে হবে।

বিরবির করে এসব বলতে বলতে তারা গাড়ি থেকে
বের হলো। ফেনীতে ঢুকতে পারে নি এখনো। এটা
কোন জায়গা ধারণা করতেও পারল না। আশেপাশে
রাস্তা আছে বোধহয় গাড়ি চলাচলের শব্দ আসছে।
পাঁচজন গাড়ি থেকে নেমে তাকাল অবচেতন শীতলের
দিকে। থাপ্পড়ের আঘাতে

মেয়েটার ঠোঁট ফেটে রক্ত বেরোচ্ছে। কপালে
কালশিটে। ফর্সা দুই গালে থাপ্পড়ের দাগ। দলের
ছেলেগুলোর একজন শীতলকে পরখ করে দাঁত বের
করে হেসে বলল,

—‘মাম্মা, মাইয়া কিন্তু বহুত সুন্দরী। এমন জিনিস
ফেলাইয়া যাইতে মন চাইতেছে না। খাইতে না পারি
একটু চটকাতে তো পারি, তাই না ক?’—‘বা’ই’ন’চো’দ
তুই চটকা। আমরা যাই গা। হের বাপ-ভাইয়ে
আইতাছে। হের ভাইরে তো চিনো না শালা, সেই
জল্লাদ। চোখের পলকে কল্লা কাটে। তর ক’ল্লা’ও
কা’ই’টা তোর মায়েরে তবারক হিসাবে পাঠাইয়া
দেবে নে।’

-‘সব জাইন্না হের বুইনরে উঠাইছিলি ক্যান তাইলে?
তর কথায় আইসা এহন দেখি সত্যি সত্যিই ম’র’তে
হইব বা’ল।’

-‘আমিও জানতাম না পরে জানছি। তয় হের বড়
ভাইয়ের রেকর্ড ভালো না। বহুত ডেঞ্জারাস আছে।
হাতে পরলে জান শ্যাম। মাম্মা হাঁটোন ধর। বাঁইচ্ছা
থাকলে মেলা মাইয়া পাবি।’

একথা বলে থামতেই খেয়াল করল আরেকজন
শীতলের আইফোন ধরে নেড়েচেড়ে দেখছে। চোখে
লোভাতুর দৃষ্টি। একদম নিউ ফোন। মাইয়ার বাপে
বোধহয় মেলা বড়লোক নাহলে এইটুকুন মাইয়ারে
কেউ আইফোন দেয়? তারও মেলাদিনের শখ একটা
আইফোন কিনার। আইফোন যা ছবি আসে না, পুরাই
অস্থির!ওর মনের অবস্থা বুঝে পাশেরজন ফোনটা ছোঁ
মেরে কেড়ে নিলো। তারপর গাড়ি থেকে
স্যানিটাইজার নিয়ে রুমালে মাখালো। এরপর রুমাল
দিয়ে ফোনটা ভালো করে মুছে অন করে ছুঁড়ে মারল
শীতলের দিকে। তখনই ফোনটার আলো জ্বলে উঠল।
একের পর এক ফোনকল আসতে থাকল। কখনো
বাবা, মা, সায়েন ভাই, বড় আবু, সবথেকে বেশি কল

এলো বিশুদ্ধ পুরুষ নামে সেভ করা নাম্বারটি থেকে।
কলের বহর দেখে তারাও বুঝে নিলো এই নাম্বার
ট্রাক হচ্ছে/হতে পারে।

এই কথা স্মরণে আসতেই তারা একে অন্যের দিকে
তাকিয়ে প্রাণপণে

ছুটতে শুরু করল। পাঁচজন ছেলে ছুটতে ছুটতে
আঁধারে মিলিয়ে গেল।

আর অবচেতন শীতল সেভাবেই পড়ে রইল। একটা
কালো বিড়াল এসে ঘুরঘুর করে গেল। দেখে গেল
কারো বুকের ধন জ্ঞান হারিয়ে অন্ধকারে পড়ে আছে।
ওদিকে মেয়ের চিন্তায় সিমিন চৌধুরীর প্রেসার বেড়ে
গেছে। কোনোভাবে প্রেসার কমছে না। অসহায় সুরে
কেঁদেই যাচ্ছে আর দোষারোপ করছেন নিজেকে।
কেন মেয়েটাকে সঙ্গে নিলেন না? কেন কোচিং যেতে
বারণ করলেন না? কোথায় গেল মেয়েটা? কে নিয়ে
গেল উনার জানপাখিকে? তারা কি কিছু খেতে
দিয়েছে কিছু নাকি কষ্ট দিচ্ছে? এভাবে একের পর
এক বিলাপ করেই যাচ্ছেন। উনাকে কোনোমতে
থামাতে না পেরে শখ পরপর দুটো ইনজেকশন পুশ
করে দিলো। সিমিন চৌধুরীও ধীরে ধীরে থেমে

গেলেন। কিছুক্ষণ পর প্রেসার কনট্রোলে এলে উনার
চোখেও ঘুম নেমে এলো। বাড়ির সকলে তখনো
চিন্তায় অস্থির। বাঁচাল মেয়েটা ঘন্টা খানিক হলো
বাসায় নেই তাতেই বাড়িটা যেন থমকে গেছে। প্রায়
আড়াই ঘন্টা পর একটি গাড়ি এসে থামল শীতলের
গাড়ির পেছনে।

লোকেশন এখানেই শো করছে অর্থাৎ শীতলের
ফোনটা এখানেই আছে।

সায়ন কোমরে পিস্তল গুঁজে গাড়ি থেমে নামল।
একটাকেও যদি ধরতে পারে জান খুবলে খাবে। কত
বড় কলিজা ওজন করে দেখবে। গজগজ

করতে করতে সে খেয়াল করল পুরো জায়গাটা
ঘুটঘুটে অন্ধকার। লোক শূন্য এরিয়া। শীতল ছোটো
থেকে অন্ধকারে থাকতে পারে না। অন্ধকারে ফোবিয়া
আছে তার। সে ফোনের ফ্ল্যাশ অন করে গেল
গাড়িটির কাছে। আশেপাশে কেউ নেই। ঝোঁপের
ঝাড়ে ঝাঁ ঝাঁ ডাকছে। গাড়ির দরজাও খোলা। হাতে
পিস্তল নিয়ে খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে তাকিয়েই
বুকটা ছলাৎ করে উঠল তার। আদরের বোনের এই
অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে গেল সে। ছুটে গিয়ে বুকে

আগলে নিলো শীতলকে। গাল চাপড়ে আদুরে সুরে
ডাকতে লাগল, ‘শীতল! বোন আমার। এই জানবাচ্চা
তাকা। তাকা আমার দিকে?’

(...)

‘বোন? শুনতে পাচ্ছিস? চোখ খোল না। ভাইয়া এসে
গেছি। ভয় নেই।’

(...)

শীতলের কোনো সাড়া নেই। সায়ন এবার চেষ্টা করে
আজমকে বলল গাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি পানি আনতে।
আজম পানি নিয়ে এসে পানির ঝাপটা দিলে।
এবারও ব্যর্থ। ফোনের আলোতে আঘাতের চিহ্ন নজর
এড়াল না তার। তখন আজম আমতা আমতা করে
বলল,

-‘ভাই, আপুরে হাসপাতাল নিয়া যাওন লাগব।
খা’ন’কি’র পোলাগোর বিশ্বাস নাই হেরা আপুরে কিছু
খাওয়াতেও পারো। দেরি করন যাইব না চলেন,
উঠেন, যাই গা।’

-‘হুম, হুম, তাই চল।’

একথা বলে উঠতে গেলে শীতলের পাশে থেকে
ফোনের আলো জ্বলে উঠল। ফোনের ডিসপ্লেতে
ভাসছে একটি নাম, ‘বিশুদ্ধ পুরুষ।’ সায়ন
ভালোই করে জানে কে সে। কলের বহর দেখে
বুঝতে বাকি রইল না অপর পাশের মানুষটিও
অস্থির। বিচলিত। চিন্তিত। তাকেও শান্ত করা
জরুরি। তাই সে শীতলকে আগলে রেখে ফোনটা
রিসিভ করল। তখন শুদ্ধর বিচলিত কণ্ঠস্বর শোনা
গেল, ‘হ্যালো! শী..শীতল, আমার কথা শুনতে
পাচ্ছিস? হ্যালো!’

— ‘শুদ্ধ, আমি ভাইয়া বলছি। ওকে পেয়ে গেছি। বাসার
দিকে যাচ্ছি গিয়ে কথা বলছি।’

— ‘ও..ও ঠিক আছে ভাইয়া?’

— ‘হুম।’

— ‘সত্যিই ঠিক আছে? ওকে ফোনটা দাও।’

— ‘সেন্সলেস।’

একথা শুনে শুদ্ধ চুপ হয়ে গেল। এরপর থমথমে
গলায় বলল,

— ‘সেন্স এলে পোর্ট্রেট আর্টিস্ট (যারা মানুষের মুখাবয়ব
আঁকে) ডেকে স্কেচ করাবে। পাঁচ, দশ, যতজনই

হোক তোমার বোনকে বলবে তাদের মুখাবয় মনে করে আর্টিস্টকে জানাতে। আমার স্কেচ চাই মানে চাই-ই।’

—‘হুম।’

—‘ওর শরীরে আঘাতের চিহ্ন থাকলে বাড়ির দিকে যাওয়ার দরকার নেই। আপাতত ফুপির বাসায় যাও। ফুপিকে আমি জানিয়ে রাখছি।’

—‘রিলেক্স ভাই! দেখে মনে হচ্ছে, ওইরকম কিছু ঘটে নি। ভয়ে সেন্সলেস বোধহয়। আপাতত হাসপাতালের দিকে যাচ্ছি, রাখছি।’ একথা বলে সায়ন কল কেটে ফোনটা পকেটে রাখল। শীতলকে কোলে নিয়ে বের হলো গাড়ি থেকে। তার গাড়িতে বসে আজমকে বলল গাড়ি জোরে টান দিতে। আজম সায়নের কথামতো তাই করল। সায়ন তখনো শীতলের জ্ঞান ফেরাতে মুখ পানি দিচ্ছে। কখনো ডাকছে। না, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। তখন মনে হলো বাড়িতেও খবরটা জানানো দরকার। খুব টেনশনে আছে সবাই। তাই সে স্বর্ণকে অল্প কথায় মেসেজ করে জানিয়ে দিলো। তারপর ছুটল আশেপাশের কোনো হাসপাতালে। শীতলের আগে জ্ঞান ফেরানো দরকার। এদিকে সায়নের কথায়

শুদ্ধের বুক থেকে যেন পাথর নেমে গেল। ধপ করে
বসল বিছানায়। গা ঘেমে একাকার অবস্থা। পরনের
অ্যপ্রোণ খুলে বিছানায় শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ
সেভাবেই শুয়ে থেকে বুকের বাঁ পাশে হাত বুলিয়ে
বুক ভরে শ্বাস নিলো। এতক্ষণ দমটা বুঝি গলায়
আঁটকে ছিল। তবে ঘটনাখানা স্বাভাবিকভাবে নিতে
পারল না। কেন জানি তার মনে হচ্ছে কেউ ইচ্ছে
করে কাজটা করল। সংকেত নতুবা সতর্কবার্তা
দিতে। কিডন্যাপ করে নির্জনরাস্তায় নিয়ে গিয়ে ফোন
অন করে রাখার ব্যাপারটা আরো বেশি অস্বাভাবিক
লাগছে। এটাও তো দেখতে হবে, কার কলিজায় বার
চড়েছে যে চৌধুরী বাড়ির মেয়ের দিকে হাত বাড়ায়,
কে? ব্যাপারটা ছোট করে দেখলে হবে তো না।
নিশ্চয়ই এর পেছনে কেউ আছে। তবে সে কে? কি
বা তার উদ্দেশ্যে?

মেয়েকে পাওয়া গেছে শুনে শাহাদত চৌধুরী এই
খবর জানিয়ে দিলেন। যেসব পুলিশ উপর মহলের
আদেশে রাস্তায় নেমেছিল তারা ফিরে গেল। ট্রাফিক
পুলিশদের কাছে বার্তা পৌঁছে গেল। ঘটনাখানিকের

মধ্যে যেমন তৎপর হয়ে পড়েছিল তেমনি সবাই
থেমে গেল। সবকিছু পাওয়ার। হাতে
পাওয়ার থাকলে সব সম্ভব, সব। যেখানে থানায়
গেলে ২৪ ঘন্টার আগে মিসিং কেস নেয় না। সেখানে
এক ঘন্টার মধ্যে ঢাকা থেকে ফেনীর রাস্তা ব্লক করে
ফেলেছে পুলিশ/ট্রাফিক।

সায়নের অবস্থান জেনে উনিও ছুটলেন আদরের
মেয়ের কাছে। সায়ন
ততক্ষণে শীতলকে একটা হাসপাতালে নিয়ে এসেছে।
তাকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। রেপ কেস ভেবে
ডাক্তারটা প্রথম হাত দিতে চাচ্ছিলেন না। পরে
ডাক্তারকে বোঝানো হয়েছে পারিবারিক ক্ষোভ
মিটাতে কিড'ন্যা'প করা হয়েছে। রেপ কেস না,
রাগের মাথায় আঘাত করা হয়েছে। ডাক্তার আরো
কিছু বলতেন কিন্তু শাহাদত চৌধুরীর পরিচয় পেয়ে
দমে গেলেন।

দ্রুত সেবা প্রদানের আধাঘন্টা পর শীতলের জ্ঞান
ফিরল। নিজেকে পেল হাসপাতালের বিছানায়। উঠতে
গেলে টান খেল হাতে। বা হাতে স্যালাইন চলছে। সে
চোখ ঘুরিয়ে দেখল পুরো কেবিন। কে আনল এখানে?

আর ছেলেগুলো কই? ফো..ফোনটা কই? ফোন হারালে শুদ্ধ আধমরা করে দেবে? অনেক কেঁদে কেঁটে ফোনটা হাতিয়েছিল সে। আশপাশ তাকিয়ে ফোন না পেয়ে নাক টেনে কাঁদতে লাগল। শরীরের আঘাতের চেয়ে তার ফোন হারানোর যন্ত্রণা সবচেয়ে বেশি। আঘাতের ব্যথা মেডিসিন নিলেই সেরে যাবে কিন্তু ফোন হারালে শুদ্ধর খোঁচামার্কী আজীবন শুনতে হবে। ছোটো বেলায় অবুঝ শিশু ছিল। তখন কোলে হিসু করে দিতো এই নিয়ে এখনো কথা শুনতে হয়। এখন বড়বেলা। এবার আর রক্ষে থাকবে না।

সায়ন কি ভেবে কেবিনে উঁকি মেরে দেখে শীতল কাঁদছে। বোন কাঁদছে দেখে হত্তদন্ত হয়ে কেবিনে ঢুকল সে। ব্যথা বেড়েছে? নাকি কাউকে না দেখে ভয়ে কাঁদছে? আগে মেয়েটাকে স্বাভাবিক করতে হবে! কথা বলে ভয় কাটাতে হবে। তাই সে গালভরে হেসে বলল,-‘কি রে ছুটকি কাঁদছিস কেন? ক্ষুধা পেয়েছে?’

-‘আমার ফোন কোথায় সায়ন ভাই?’

-‘আমার কাছে।’

-‘কই দেখি? উফ, বাঁচলাম! নাহলে শুদ্ধ ভাই আমাকে
মেরে আধমরা করে দিতো।’

-‘কি আশ্চর্য! তুই এতক্ষণ ফোনের জন্য কাঁদছিলি?’

-‘ভুম।’

একথা শুনে সায়নের হাসি পেলেও নিজেকে সামলে
নিলো। তার পকেট থেকে ফোন বের করে শীতলের
হাতে দিলো। ফোন পেয়ে শীতল কল দিলো শুদ্ধকে।
শুদ্ধ যেন এই কলের আশাতেই এতক্ষণ। চট করে
কল রিসিভ করে দেখতে পেল শীতলের মুখ। তীক্ষ্ণ
নজরে দেখে গেল ঠোঁটের পাশ, কপালের কালশিটে।
তখনই কানে এলো শীতলের চঞ্চল কণ্ঠস্বর,-‘শুদ্ধ
ভাই! ফোন হারায় নি।’

তার কণ্ঠে অবাধ খুশি। ফোন না হারানোয় যেন
বিশ্বজয় করে ফেলেছে। শুদ্ধ চুপ করে দেখল সেই
খুশি। আগে ছিল আধাপাগল আঘাত পেয়ে ফুল
পাগল হলো নাকি কে জানে। নয়তো এই অবস্থায়
ফোনের চিন্তা কে করে? তখন শীতলই বেশ গর্ব
করে বলল,

-‘শীতলের থেকে ফোন কাড়া এত সোজা না,
বুঝলেন?’

-‘বুঝলাম। তবে হারালে তোকে কি যে করতাম।’

-‘কি করতেন?’

-‘তোকে কুচিকুচি করে কেটে, ধুয়ে, মশলা মাখিয়ে বিরিয়ানি রান্না করতাম। নাম দিতাম ব্যাঙাচি বিরিয়ানি। তারপর বিলিয়ে দিতাম। ছোটো বাচ্চারা খেয়ে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে আমার জন্য দোয়া করতো।’

-‘অ’ন্যা’য়! ঘোর অ’ন্যা’য়! আমার একটা নাম আছে শুদ্ধ ভাই। আপনি সেই নামকে এভাবে অপমান করতে পারেন না। দু’দুটো খাসি কেটে দাদু আকিকা দিয়ে নাম রেখেছে আমার। আর আপনি কি না সেই নাম গুম করে আমাকে ব্যাঙাচি নামে নামকরণ করলেন?’-‘তোর নামটা যেন কি?’

-‘এ কি কান্ড! কপালে আঘাত পেলাম আমি আর স্মৃতি হারালেন আপনি?’

-‘থান্ড না খেলে যা জিজ্ঞাসা করছি বল।’

-‘সুবহানা চৌধুরী শীতল।’

-‘শীতল মানে ঠান্ডা, উষ্ণতাহীন। তোর মাঝে কি ঠান্ডা, স্থির, বলে কিছু আছে? নেই। তোর দাদা পাগল বলেই ভুল মানুষকে ভুল নাম দিয়েছে।’

যদিও তোর দাদা আমারও দাদা। নাতি হিসেবে
দাদার ভুল শুধরানোর দায়িত্ব তো আমারই। তাই
আজ সঠিক মানুষকে সঠিক নামে নামকরণ
করলাম।’

-‘তাই বলে ব্যাঙাচি?’

-‘হুম, একদম খাপে খাপ।’

শীতল মুখ ফুলিয়ে তাকিয়ে রইল শুদ্ধর দিকে।
ভিডিও কলে কথা বলছে তারা। ডিসপ্লেতে ভাসছে
দু’জনের মুখ। নিজের ছবির দিকে নজর গেলে
শীতলের কান্না পেল। ইশ! মুখের কি অবস্থা তার।
সে নিজের মুখে হাত

বুলিয়ে কান্নারত স্বরে বলল,-‘ আগে ভাবতাম আপনি
পাষণ তাই পাষণের মতো আমাকে মা’রে’ন। আজ
বুঝলাম আপনার থেকেও বাইরের ওই ছেলেগুলো
আরো পাষণ, নিষ্ঠুর। নয়তো এতজোরে কেউ থাপ্পড়
মারে?’

-‘কে মেরেছে?’

-‘ভ্রুঁ কাঁটা ওই ছেলেটা।’

-‘কপালে ব্যথা পেলি কিভাবে?’

-‘কি জানি, মনে নেই। তবে ওই ছেলেগুলোই কিছু করেছে।’

-‘মা’র’ল কেন তারা?’

-‘কথা বলেছি তাই।’

-‘হিজাব কি ওরাই খুলেছে?’

-‘হুম।’এবার সে গড়গড় করে বলতে লাগল ঘটে যাওয়া ঘটনা। শুদ্ধ চুপ করে শুনল। ঠিক এই কথা শোনার জন্যই এতক্ষণ আবল-তাবোল বকছিল। কারণ সে জানে শীতলের পেট পাতলা। একবার কথা শুরু করলে পেটে যা আছে সব উগলাবে। অদূরে বসা সায়ন ঠোঁট কামড়ে হাসছে ভাইয়ের বুদ্ধিমত্তা দেখে। এই কাজ যদি সে করতো তাহলে শীতল রয়ে সয়ে মনে করে মনে করে বলতো। অথচ শুদ্ধকে এমনভাবে বলছে যেন মজার গল্প শোনাচ্ছে। শুদ্ধ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে ক্যাচ করে নিলো ওই ছেলেগুলো পাঁচজন ছিল। তাদের ফেস কেমন ছিল, কে কানে কম শোনে, কার গায়ের ড্রেস কেমন ছিল, কে তাকে মেরেছে, কে গালি দিয়েছে, কে হিজাব খোলার দুঃসাহস দেখিয়েছে, সব বলল। আরো বলল, গাড়িতে মধ্যে একজনের সাথে বারবার কলে কথা বলেছিল।

কথা বলার সময় কলদাতাকে ভাই!ভাই! করে
সম্বোধন করছিল। অর্থাৎ মেইন কালপিট একটা
ছেলে। সব শুনে পাঁচজন ছেলের হুবুহু মুখাবয়ের
বর্ণনা শুনে শুদ্ধ অন্য হাতে থাকা ফোনে রেকর্ডার
অফ করল। কথা বলা অবস্থায় পাঠিয়ে দিলো অর্কের
নাম্বারে। সঙ্গে ছোট্ট একটা বার্তা, 'আর্জেন্ট।' অর্ক
মেসেজ দেখে সেভ করল তার বড় ভাইয়ের কাছে।
উনি আবার এসবের কাজ করে। সেও ভাইকে
জানিয়ে দিলো আর্জেন্ট কেস। কারো উপরে ভরসা না
করে শুদ্ধ এক জায়গায় বসেই কাজ চালিয়ে গেল।
শীতলকে বার বার এই ঘটনার কথা মনে করতে
যেন না হয় তাই এ কাজ করেছে সে। এরপর
কিছুক্ষণ কথা বলে কল কাটল শুদ্ধ। শীতল এবার
বকবক করতে লাগল সাইনের সাথে। পুরনো গল্প
মনে করে খুব হাসল। শাহাদত চৌধুরীও তাল মেলাল
তাদের সাথে। তারপর শীতলের স্যালাইন শেষ হলে
সায়ন আর শাহাদত চৌধুরী তাকে নিয়ে রওনা হলো
বাসার দিকে। চৌধুরী নিবাসে পৌঁছাতে পৌঁছাতে
বেজে গেল ভোর চারটা। ড্রয়িংরুমে সবাই তাদের
অপেক্ষায়। টেনশনে ঘুম নেই কারো। সায়ন ঘুমন্ত

শীতলকে কোলে নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করল।
ইশারায় বলল শব্দ না করতে। সবাই তাই করল।
ফুলের মতো স্নিগ্ধ মুখে আঘাতের দাগ দেখে সবার
বুক ভার হলো। কাঁদলেনও নিঃশব্দে। সায়ন বোনকে
রুমে শুইয়ে নিচে আসতেই শারাবাত চৌধুরীর
রোষানলে পড়ল। উনি সায়নকে সরাসরি বললেন,
-‘এই ঘটনা এবারই প্রথম। আমার মনে হয় না, এত
বছরে এমন শত্রু তৈরি করেছি যারা আমার বাড়ির
মেয়েদের দিকে হাত বাড়াবে। কত বড় স্পৃহা! আমি
আবারও বলছি নিজেকে শুধরে নাও। তোমার নাহয়
মরার ভয় নেই। কিন্তু তোমার কাজের ফল আমার
অন্য সন্তানের প্রাণ নাশের কারণ না হয়। তোমার
কর্মে যেন তোমার বোন রা কখনো অসন্মানিত না
হয়। আজ মেয়েটা বেঁচে গেছে বার বার বাঁচবে
এমনটা নয়। আজ নাহয় শীতলের উপর হামলা
করেছে কাল শখ, স্বর্নকে টার্গেট করবে না এটার
গ্যারান্টি কে দেবে?’সায়ন মেঝেতে দৃষ্টি রেখে বাবার
কথা শুনে শুনল। বাবার কথার ধরনে স্পষ্ট, উনি ধরে
নিয়েছে সায়নের জন্য এই ঘটনা ঘটল। বোন
কি’ডন্যা’প হওয়ার পেছনে সেই দায়ী। যদিও জোর

দিয়ে কিছু বলতেও পারবে না। কারণ রাজনীতিতে এসব কমন। হতেও পারে। রাজনীতিতে জড়ানোর পর বাবা ভালো কথা বলে না। এখন যেমন রুডভাবে কথাগুলো বললেন সেভাবেই বলে। এতদিন শুনতে শুনতে গা সওয়া হয়ে গেছে। তাই জবাব না দিয়ে সিতারাকে বলল খেতে দিতে। রান্নাবান্না করাই আছে কেউ কিছু মুখে তুলে নি। তাই উনি সবাইকে খেতে ডাকলেন। শাহাদত চৌধুরী ফ্রেশ হতে গেছে কাল দুপুরের পরপরই চলে যাবেন। সিমিন তো এখনো ঘুমে।

শাফাত চৌধুরী, শখ এখন আর খাবে না চলে গেলেন যার যার রুমে। সায়ন কোনোমতে হাত ধুয়ে খেয়ে চলল নিজের রুমে। যাওয়ার আগে একবার তাকাল স্বর্ণের দিকে। এই তাকানোর মানে স্বর্ণ বুঝে। এর অর্থ ‘জলদি রুমে আয়।’ স্বর্ণ বিরক্তিতে মুখ কুঁচকালো। তার মুখ দেখে সায়ন বুঝল স্বর্ণ আসবে না। তাই মাঝ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে গম্ভীর স্বরে বলল,

-‘ পেইন কিলার থাকলে রুমে দিয়ে যা। মাথা ব্যথায় ম’রে যাচ্ছি। দেরি করলে থাপ্পড়ে গাল লাল করে দেবো।’

ছেলের কথা শুনে সিঁতারা চৌধুরী খ্যাক করে উঠলেন। বললেন,

-‘ এটা কেমন ব্যবহার সায়ন? ছোটো বোনের সাথে কেউ এভাবে কথা বলে?’

-‘তো কিভাবে বলে?’

-‘সুন্দর করে বল। না বললে পারি না পেইন কিলার।’সায়ন দীর্ঘশ্বাস চাপল। দুই আঙ্গুল কপালে ডলে স্বর্নের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে বলল,

-‘মার্জনা করুন চৌধুরী কন্যা। অনুগ্রহনপূর্বক একটা প্রতিষেধক দিয়ে আমাকে ধন্য করুন, প্লিজ।’

ছেলের কাণ্ডে সিঁতারা এবার হেসে ফেললেন। মাকে হাসতে দেখে সায়ন স্বর্ণকে শীতল চাহনি ছুঁড়ে হনহন করে চলে গেল। তাকে যেতে দেখে স্বর্ণ বিরবির করে বলল,

-‘মনভরে বাপের দো’চ’ন খেলো। বাপকে কিছু বলতেও পারল না। অথচ এখন সব রাগ উগড়াবে

আমার ঠোঁটের উপর। বে'য়াদব, ন'ষ্ট পুরুষটাকে
নিরে আমার হয়েছে যত জ্বালা।'-'স্বর্ণ!'

-‘(.....)’

-‘এ্যাই স্বর্ণ!’

-‘(.....)’

-‘ এ্যাই বেয়াদব আর কত গিলবি?’

-‘শহীদ না হওয়া অবধি।’

-‘আমাকে নামতে হলে আজ সত্যি সত্যিই আমার
হাতে খুন হবি।’

দোতলায় নিজের রুমে শুয়ে পা নাচাতে নাচাতে
কথাটি বলল সায়ন।

এমন ভাব যেন অসহ্য যন্ত্রনায় ছটফট করছে সে।
স্বর্ণ কেবল মুখে এক লোকমা ভাত দিয়েছে। বেচারি
গিলা দূর মুখ নাড়িয়ে চিবাতেও পারে নি। তার আগেই
অধৈর্য হয়ে ডাকতে শুরু করেছে সায়ন। সমানে
চেষ্টাচ্ছে। স্বর্ণ চুপচাপ শুনল। তবে উঠে যাওয়ার
প্রয়োজনবোধ করল না। কেউ না

জানুক সে তো জানে কেন চেষ্টাচ্ছে। মাথাব্যথা নাকি
ছাই! পাজি ছেলের ধান্দা অন্যকিছু খুব ভালো করে
জানে সে। যাবে না সে। সত্যিই যাবে না। শখ আপুর

কাছে ধরা খেয়েও শখ মিটেনি ফাজিল ছেলের।
থাকবে কি করে? লজ্জা বলে কিছু থাকলে তো?
নিজের রুমে শুয়ে শখ'ও শুনছে সায়নের গলাস্বর।
হাসছে মিটিমিটি। ভাইয়ের মাথাটা বুঝি সত্যিই
গেছে।

প্রেমে পড়লে বুঝি এমনই হয়। এদিকে ছেলের কাছে
সিঁতারা নিজের কাছে থাকা পেইন কিলার নিয়ে
ছুটলেন দো'তলায়। ছেলের বুঝি সত্যি মাথা ব্যথা
করছে। নয়তো এভাবে ডাকাডাকি করতো না
নিশ্চয়ই। বড় মাকে যেতে দেখে স্বর্ণ ঠোঁট টিপে
হাসল। তার জায়গায় বড় মাকে দেখে সায়নের মুখটা
কেমন হবে ভেবে হাসি চওড়া হলো। সিরাতের
সামনে হাসি আঁটকাতে গ্লাস উঁচিয়ে একটু পানি
খেল। নয়তো এভাবে হাসতে দেখলে প্রশ্নের তোপে
পড়তে পারে। ওদিকে সায়ন শুয়ে অস্থির অস্থির
করছে। ওপাশ-অপাশ করে চোখ মুখ বুজে আবার
ডাকার আগে মাকে দেখে বোকা বোকা হাসল। ঠোঁটে
হাসি এঁটে উঠে বসল। সিঁতারা সঙ্গে আনা মেডিসিন
ছেলের ডান হাতে ধরিয়ে গ্লাস এগিয়ে দিলেন। সায়ন
মুখ কাঁচুমাচু করে হাতে মেডিসিন নিয়ে চুপ করে

বসে রইল। তার তো কোথাও ব্যথা ট্যাথা কিছু নেই। আসলে স্বর্ণকে একটু কাছে পেতে এতক্ষণ তাড়া দিচ্ছিল। নয়তো পাজি মেয়ে আসতো না। কিন্তু এখন কি হবে? কি বলে বাঁচবে? মনে মনে একথা ভেবে সায়ন কথা খুঁজতে লাগল। কিন্তু এ মুহূর্তে কথা খুঁজে পেল না। পৃথিবীতে কথার আকাল পড়ে গেল নাকি কে জানে! ছেলেকে বসে থাকতে দেখে সিঁতারা তার মাথায় স্নেহের হাত বুলাতে বুলাতে বললেন,-‘কি হলো বাবা, খা।’

-‘হ্যাঁ? হুম, হুম, এইতো খাচ্ছি।’

-‘খুব বেশি মাথাব্যথা? কড়া করে এক কাপ চা করে দেই?’

-‘না, না, চা খেলে এখন আর ঘুম আসবে না। আমি বরং ঘুমানোর ট্রাই করি।’

-‘ওষুধটা খেয়ে নে বাপ তারপর ঘুমা। আমি চুল টেনে দিচ্ছি এমনিতেই ঘুম চলে আসবে।’

একথা বলে সিঁতারা সায়নকে তাড়া দিয়ে ওষুধ খাওয়াল। সায়নও খেতে বাধ্য হলো। তারপর উনি ছেলের শিয়রে বসে কখনো ছেলের মাথার চুল টেনে দিতে লাগলেন। কখনো কপাল টিপতে থাকলেন।

মনে মনে সায়ন স্বর্ণের গুষ্ঠি উদ্ধার চোখ বুঝে নিলো।
একটুপর ছেলেকে গভীর নিঃশ্বাস ফেলতে দেখে
সিঁতারা লাইট অফ চলে গেলেন। উনি যেতেই সায়ন
উপুর হয়ে শুয়ে বিরবির করে বলল,
-‘খেতে চাইলাম সুন্দরী বউ অথচ খেতে হলো পেইন
কিলার। কপাল!’ একথা বলে স্বর্ণকে গালি দিতে দিতে
সে সত্যি সত্যিই ঘুমের দেশে পাড়ি জমাল। ঘড়ির
কাঁটা চলছে টিকটিক করে। রাতের শেষ প্রহর।
নিবাসের সকল সদস্য গভীর ঘুমে মগ্ন। তখন কেউ
দো’তলার রুমের দরজা খুলল। পা টিপে টিপে বের
হলো সন্তপর্णे। গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে দরজায় হাত
ছোঁয়াল। পাসওয়ার্ড টিপে প্রবেশ করল রুমে।
এদিক-ওদিক উঁকিঝুঁকি মেরে নিঃশব্দে দরজা আঁটকে
দিলো। লাইট জ্বালালো। বিছানায় বসল। এরপর
চোখ বুলাল চারপাশে। সামনে থাকা বিশাল বড়
ড্রেসিংটেবিলের আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে
মলিন হাসল। হাত রাখল আঘাতপ্রাপ্ত ঠোঁটের কোণে।
তখন হাতের ফোনটা ভাইব্রেট হতে দেখে হাসল।
জানত কলটা এখনই আসবে। সে কল রিসিভ গা

এলিয়ে দিলো নরম বিছানায়। নাকে এসে ঠেকল খুব
পরিচিত ঘ্রাণ। তখন ফোনের ওপাশেও নীরাবতা।

কিছুক্ষণ পর কানে এসে বিঁধল গমগমে সেই
কণ্ঠস্বর,-‘এত রাতে আমার রুমে কি, হুম? ঘুমাস নি
কেন?’

-‘ঘুম ভেঙ্গে গেল আর আসছে না।’

-‘এজন্য আমার রুমে আসতে হবে?’

-‘এলে কি ক্ষয়ে যাবে?’

-‘তা যাবে না তবে আসার কারণ থাকতে হবে।’

-‘কেন? রুমে কি হিরে জহরত লুকিয়ে রেখেছেন যে
ভয় পাচ্ছেন?’

-‘এরচেয়েও দামী কিছু।’

-‘চুরি করি তাহলে?’

-‘চুরি করতে গেলে কৌশল জানা আবশ্যিক।’

-‘শুনি কি সেই কৌশল?’

-‘রুমের মালিকের থেকে চুরির কৌশল জানতে
চাচ্ছিস? ঘটে বুদ্ধির ছিঁটেফোঁটা না থাকলে যা হয়
আর কি!’

-‘আমি অসুস্থ। বকবেন না খবরদার।’-‘এখনো ব্যথা
আছে?’

- ‘আছে।’

-‘(.....)’

-‘শুদ্ধ ভাই?’

-‘হুম।’

-‘ আমাকে এই ফোনটা দেওয়ার কারণ কি?’

-‘বলেছিই তো, বিয়ের কাজ কতদূর এগোলো জানার জন্য।’

-‘কাজ শুরু করি নি এখনো।’

-‘কাল থেকে শুরু কর। বিয়ে করব। বিয়ে করা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।’

-‘হঠাৎ বিয়ে পাগল হয়ে গেলেন কেন? কাহিনী কি?’

-‘ বয়স তো কম হলো না।’

-‘ তাই বলে হঠাৎ করে কেন?’

-‘ওসব তুই বুঝবি না। আরো বড় হ।’

-‘বুঝব না অথচ আমার ঘাড়ে গুরু দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন।’

-‘ দেওয়ার কারণ সময় মতো বুঝে যাবি।’একথা বলে শুদ্ধ চেয়ারে হেলান দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে হাসল। শীতল চোখের সামনে যেভাবে বুকের মধ্যে ফোন লুকিয়েছিল ভাবলেও হাসি পায়। অস্বস্তি

লাগে। মূলত এই কারনে ফোন নিজের কাছে রাখার
সাহস করে নি। ফোনটা দেখলেই সেদিনের ঘটনা
মনে পড়ে যেতে। যেটা তার জন্য শুভকর কিছু
হতো। কেন হতো না? এই ‘কেন ‘এর জবাব নেই।

জবাব খোঁজারও প্রয়োজন মনে করে নি কখনো। সে
চোখ খুলে তাকাল

লেপটপের দিকে। তার বিছানায় শুয়ে আছে শীতল।
কানে ফোন। বুকের উপর একটা বালিশ। চুলগুলো
এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিছানা জুড়ে। পরনে
কালো কালার লেডিস টপস সঙ্গে টিলেটাল প্লাজু।
পুরো লুক নাদান বাচ্চা টাইপের। অথচ দুষ্টুমিতে
পিএইচডি করা। কথা, কাজে

দূরন্তপণা। শীতল কিছুক্ষণ আগে রুমের পাসওয়ার্ড
চাপতেই তার কাছে নোটিফিকেট চলে এসেছে।
এতরাতে রুমে কে ঢুকতে চাচ্ছে? কি কাজ?নাকি
অন্যকেউ বাসায় ঢুকেছে? মূলত এসব ভেবে
লেপটপে চেক করে দেখে দরজার সামনে জুবুথুবু
শীতল দাঁড়িয়ে আছে। হেলেদুলে বারবার পাসওয়ার্ড
ইন করছে। তাকে দেখে কনফার্ম বাটন পেস
করতেই দরজা খুলে গেছে। ডিসক্লাইন করলে

একাধিকবার পার্সওয়ার চাপায় বৈদ্যুতিক শখ খেতো।
বৈদ্যুতিক শকে ঝাঁকি খেয়ে সে ওখানেই ম'রে পড়ে
থাকত।

অথচ বোকা শীতল টের পায় নি রুমের মালিক না
চাইলে রুমে ঢুকতেও পারত না। বর্তমানে দুজনেই
চুপ। চলছে নীরাবতা। অদ্ভুত কারণে নিশুচুপ থাকতে
ভালো লাগছে। ফোন কানে ধরে একে অপরের
নিঃশ্বাসের শব্দ শুনছে। কাকতালীয়ভাবে দু'জনেই মন
খারাপ। মনে অনেক কথা জমা

অথচ বলতে ইচ্ছে করছে না। শীতল আবার
বেশিক্ষণ চুপ থাকতে পারে না। চুপ থাকলে পেটের
মধ্যে গজগজ করে। এই স্বভাবের কারনে সেই আগে
নীরাবতা ভাঙ্গল। ধীর কণ্ঠে বলল,-‘ শুদ্ধ ভাই?’

-‘ হুম।’

-‘একটা কথা বলি?’

-‘না।’

-‘কেন? বলি না প্লিজ?’

-‘বারং যখন শুনবিই না তখন পাগল ছাগলের মতো
জিঞ্জাসা করিস কেন?’

-‘আপনার কি মন খারাপ?’

-‘একথা কেন মনে হলো কেন?’

-‘আপনার বুকচাপা নিঃশ্বাস আমার কানে কানে
গুনগুন করে বলে গেল।’

একথা বলে খিলখিল করে হাসল শীতল। হাসতে
গিয়ে কাঁটা ঠোঁটে টান খেলো। ব্যথাতুর শব্দ করে
ঠোঁট চেপে ধরল। শুদ্ধও হাসি শুনল। শুনল তার করা
ব্যথাতুর শব্দও। কেন জানি বুক ভার হলো। তারপর
লেপটপে চোখ রেখে বলল,-‘রুমে যা।’

-‘কেন?’

-‘যেতে বলেছি।’

-‘যাব না।’

-‘তুই চুনি। তোকে বিশ্বাস নেই। তোকে রুমে রাখা
রিস্ক, যা বলছি।’

-‘আমি চুনি? কি চুরি করেছি আমি? খবরদার বরছি
উল্টা পাল্টা অপবাদ দিবেন না।’

-‘আমার নতুন টি-শার্টটা গায়েব করেছিস।
পারফিউম। সি ব্লু রিচওয়াচ টাও দু’দিন আগে
ঝেড়েছিস। আর বলব?’

শীতল জিভে কামড় দিলো। সত্যি সত্যিই গায়েব
করেছে। কিন্তু বিশুদ্ধ পুরুষ জানল কিভাবে? কথায়

কথা বাড়ে। কিছু বলতে গেলে সত্য ফাঁস হয়ে যাবে।
এরচেয়ে ভালোই ভালোই কলটা কাটা উত্তম। তাই
সে বলল,

-‘যেই না রুমের চেহারা তার নাম আবার পেয়ারা।
থাকবই না আপনার রুমে।’একথা বলে সে কল
কেটে দিলো। তারপর পুরো রুম টাইটই করে ঘুরে,
এটা-ওটা নেড়েচেড়ে দেখল। রুমের এককোণে থাকা
ছোট ফ্রিজ খুলে সফট ড্রিংকস্ বের করল। খেলো
ধীরে সুস্থে। অত্যাধুনিক ডিজাইনের
ড্রেসিংটেবিলের কাঁচ সরিয়ে থরে থরে সাজানো
পারফিউম ঘেটে ঘুটে দেখল। তারপর পছন্দসই
একটা নিয়ে নিজের শরীরেও মাখল। খোলা চুল গুলো
খোঁপা করে স্টাডি টেবিল থেকে একটা কলম নিয়ে
খোঁপাতে গুঁজে দিলো। চুলের কাঠি কাজ সারল কলম
দিয়ে আর কি! এরপর থম মেরে কিছুক্ষণ বসে থেকে
যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েও থেমে গেল। পিছু ফিরে
তাকাল বিছানার দিকে। বিছানাটা যেন টানছে তাকে।
ভাবল সে যদি এখানে থেকেও যায় শুদ্ধ জানতেও
পারবে না। কল কেটে দিয়েছে জানার কথাও না।
চোখে আবার ঘুম ধরা দিয়েছে। রুমে যেতে আলস্য

লাগছে। এসব ভেবে সে ড্রিম লাইট অন করল। রুমে
ছেঁয়ে গেল নীলচে নরম আলোয়। তার রুমটার
থেকেও এই রুমটা বড়সড় খুব বেশি সুন্দর।
গোছগাছ থাকে অলটাইম। এজন্য খুব লোভ হয়। মন
বলে শুদ্ধকে বের করে রুমটা দখল করে নিতে। মনে
মনে এসব ভাবতে ভাবতে সে এগোল বিছানার
দিকে। শুয়ে পড়ল নিশ্চিত মনে। এরপর বিরবির
করে বলল,-‘একটু ঘুমাই। একটু ঘুমালে পাপ হবে
না। জানতেও পারবেনা রুমের খ’চ্চ’র মালিক।’

একথা বলে চোখজোড়া বন্ধ করে নিলো। পরিচিত
ঘ্রাণ নাকে এলে প্রাণ ভরে টেনে নিলো। এরপর
অবাস্তুর ভাবনা ভাবতে ভাবতেই ঘুমের দেশে পাড়ি
জমাল। শুদ্ধ চেয়ারে হেলান দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে
দেখল তার অনুপস্থিতিতে, তার রুমে, তার বেডে,
অন্যকারো রাজত্ব। অথচ না কিছু বলতে পারল আর
ধমকে বের করে দেওয়ার ইচ্ছে করল। এখন
মধ্যরাত। ঘুমিয়ে আছে সুখী মানুষগুলো। ইয়াসির
রাতের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে সিগারেট ফুঁকছে। নাক
মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে। তার মনে একটি আফসোস
জমা হয়েছে। সেই আফসোসের নাম শীতল। আজকে

পাখিটাকে না চাইলেও ছাড়তে হয়েছে। পাখিটার সেই
পুতুল মুখ, শরীর শিরশির করা গোলাপি ঠোঁট, অধর
কামড়ে হাসি, রাগী ফেস, চঞ্চলতা,
সব চোখের তারায় ভাসছে। কুটকুটে যৌবনের
তাড়নায় জীবনে অনেক মেয়েকেই খেয়েছে। কিন্তু না
মন তৃপ্ত হয়েছে আর না দেহ। এবার মনের মতো
কাউকে পেলে নিজের কাছে রেখে দিলে কেমন হয়?
ঠিক বন্দিনী করে। সম্পত্তির মতো নিজের নামে
দলিল করে। যাতে কেউ না কাড়তে পারে। হুম,
কাজটা করলে কিন্তু মন্দ হয় না। তার জীবনে হেতু
দরকার। সংসার করার ইচ্ছে কোনোকালেই ছিল না
কিন্তু জীবনটা আজকাল খুব বেশি পানসে লাগে।
একাকী সময়গুলোতে কাউকে পাশে পাওয়ার শখ
জাগে। অনেক তো হলো বাউডুলেপণা। এবার তাহলে
শীতল রাণীকেই বন্দিনী করা যাক। রেখে দেওয়ার
যাক নিজের খুব কাছে, নিজের করে।

তার স্তব্ধ বাড়িতে চঞ্চলপাখিটি উড়ে উড়ে, ঘুরে ঘুরে,
বেড়াবে। তার মন কেমন করা খিলখিল হাসিতে সুখ
এসে ঝুমঝুম করবে। গাইবে। নাচবে। আর সে

দু'চোখ ভরে দেখবে। হাসবে। আগলে রাখবে।

এছাড়াও চঞ্চল

পাখিটাকে সে রোজ রাতে বউ সাজাবে। লাল
টুকটুক লাজেরাঙা বউ।

মোটকথা, বউয়ের সাজে কখনো কারো সঙ্গে
রাত্রিযাপন করা হয় নি।

না কারো বউয়ের সাজ নষ্ট করার কারণ হতে
পেরেছে। এবার হবে। খুব তাড়াতাড়ি হবে।
সামর্থ্যবান পুরুষ হয়ে যদি বউসাজে বউয়ের সাজ
নষ্ট করতে না পারে তবে কেমন পুরুষ সে, ছাহ্!
পুরুষ সমাজ কি মানবে?

মানা উচিতও না। সে জানে না এসব কেন ভাবছে।
তবে ভাবতে ভালোই লাগছে। তার এমন বেপরোয়া
ভাবনা ছেদ ঘটল ফোনের রিংটোনে। কল রিসিভ
করে কানে ধরতেই কেউ বলল,-‘ওই ছেলেগুলো
কই? কোথায় পাঠিয়েছো তাদের?’

-‘পালাতে বলেছি পালিয়েছে। কোথায় গেছে আমি কি
করে বলব?’

-‘সত্যি কথা বলো ইয়াসির।’

-‘কি আশ্চর্য! আপনাকে মিথ্যাকথা বলব কেন?
আপনি কি আমার বেড পার্টনার যে মিষ্টি মিষ্টি কথা
বলে আরেক রাউন্ড খেলার ফায়দা খুজব?’

-‘তুমি কি নরমাল কথা বলতে পারো না?’

-‘না পারি না। কারণ আমার সেক্স পাওয়ার আপনার
মতো লো বাজেটের না। আমার পাওয়ার অলটাইম
তুঙ্গে তাই আমিও থাকি চাঙ্গে।’-‘এতই যখন পাওয়ার
মেয়েটাকে রেপ করলে না কেন?’

-‘শুদ্ধ মশাইকে একটু খেলিয়ে নিতে মন চাইল।
তাছাড়া ওই নটি বয় আগে দেশে আসুক। বিদেশী
বসে বোনের কলঙ্কিত দেহ দেখে কতটুকুই বা
শোকপালন করবে?’

-‘ও ফিরলে আরো পারবে না। শকুনি দৃষ্টি তার।
এমনি এমনি শীর্ষস্থানে নাম পৌঁছায় নি।’

-‘বলেন কি, দেখে তো মনে হয় না।’

-‘গভীর জলের মাছ। যা করে তা দেখায় না আর যা
দেখায় আসলে সে সেটা না। তাই ওকে হেলাফেরা
করা ঠিক হবে না।’

-‘ও আই সি। সমন্ধি দেখি গোটাটাই চিজ বার্গার।’

-‘ও তোমার বউয়ের ভাই না যে সমন্ধি ডাকবে।’

-‘ডাকলে কি পাপ হবে?’-‘তা জানি না তবে সিরিয়াস হও। চোখ কান খোলা রাখো। গাধার মতো একাজ বার বার করে সময় নষ্ট করছো তুমি। মেয়েটাকে ছেড়ে শুদ্ধকে খোঁচালে এর ফল ভালো হবে না।’

-‘ভ্যাজর ভ্যাজর না করে টাকা পাঠান দেখি। পকেটে টাকা না থাকলে শরীরে এনার্জি পাই না।’

ইয়াসিরের কথা শুনে লোকটা কল কেটে দিলো। কয়েক মিনিট পর তার ফোনে মেসেজ এলো। মাত্রই একাউন্টে তিন লাখ টাকা ঢুকেছে। এবার শান্তি লাগছে। মনে শান্তি নিয়ে ভাবতে লাগল পরের থাবাটা ঠিক কোন

জায়গায় দিলে শুদ্ধ সোনা আঁতকে উঠবে? কাঁটা মুরগির মতো ছটফট করবে? চৌধুরী নিবাসে নাকি দু’টো কুঁচো চিংড়ি আছে। নামটা বোধহয় সাম্য, সৃজন। তাদের থাবার গুটি বানাতে কেমন হয়? উম, ভালোই হয় বোধহয়। তাহলে আর কি ভালো দিয়ে ভালো কাজই সম্পূর্ণ করা হোক। গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে সায়ন। রুম জুড়ে অন্ধকার। সময় তখন ভোর পাঁচটার কাছাকাছি। সেই মুহূর্তে নিঃশব্দে তার রুমে

প্রবেশ করল কেউ। আঙুঠে করে জ্বালালো ড্রিম
লাইট। আবছা আলোয় দেখল দাপুটে, রাগী,
ছেলের শান্ত চেহারা। সে সাবধানে হাতে রাখা
কেকটা সেন্টার টেবিলের উপর রাখল। এরপর
কোলবালিশটা সরিয়ে সায়নের পাশে শুয়ে পড়ল।
মায়া লাগল ডাকতে। বুকের কাছ থেকে কোলবালিশ
সরায় বিরক্ত হলো সায়ন। বউটাও কাছে আসে না।
কোলবালিশও আজকাল কাছে থাকতে চাই না। কি
যে জ্বালা!

সে ঘুমের ঘোরে কোলবালিশ হাতড়ে নিতে গিয়ে হাত
পড়ল নরম কিছুর উপর। বালিশ তো এত নরম না।
বিড়াল টিড়াল নাকি? রুমের দরজাটা খোলা দেখে
দুকেছে পড়েছে বোধহয়। একথা মাথায় আসতেই সে
চোখ খুলতে গিয়েও খুলতে পারল না। কেউ চোখের
উপর হাত রেখেছে। তার খুব কাছে ঝুঁকে এসেছে।
কানে কানেও বলছে, ‘ শুভ জন্মদিন শাহরিয়ার
চৌধুরী। শুভ হোক আপনার জীবনের আগামী
পথচলা। সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য

এসে আলোকিত করুক আপনার জীবন।’ সায়ন
হাসল। তার চোখ থেকে হাত সরালে ঘুম ঘুম চোখে

দৃষ্টি মেলতেই চোখের তারায় বিস্ময় খেলে গেল।
তড়িৎ উঠে বসতে গিয়েও নিজেকে দমিয়ে নিলো।
চোখ ডলে আবার তাকাল। স্বর্ণও তাকিয়ে আছে।
সায়ন অবাক হয়ে দেখছে শাড়ি পরা স্বর্ণকে। স্বর্ণ
শাড়ি পরে না। কালেভাদ্রেও না। আর পড়লেও
কখনো বাইরে যায় না। অথচ আজ এ রূপে, এ
বেশে তাকে দেখে সায়ন কথার খেঁই হারিয়ে ফেলল।
শুধু মুগ্ধ নয়নে দেখে গেল তার মনোহরণীকে।
তারপর আজলা ভরে স্বর্ণের দুই গালে হাত রেখে
বলল,

-‘কাজি অফিস খোলা থাকবে এখন?’

-‘না।’

-‘কাজির বাড়িতে লোক পাঠায় তুলে আনুক
ব্যাটাকে?’

-‘উহুম।’

-‘তাহলে তুই কিছু একটা কর?’

-‘কি করব?’

-‘হয় বিয়ে নয়তো বেসামাল আমিটাকে সামলে নে।’

-‘উঠে বসো।’ একথা বলে স্বর্ণ সরে গেল। কেবটা
এনে দাঁড়াল ঠিক সায়নের সামনে। সায়নের চোখে

মুখে মুগ্ধতা। বিহ্বলতা। অপ্রত্যাশিত ভালোলাগায়
বুক ভরে গেছে। স্বর্ণ সেজেছে। তার স্বর্ণ তার জন্য
সেজেছে। যত্ন করে চোখে কাজল পড়েছে। ঠোঁটে
লিপস্টিকের হালকা ছোঁয়া। অঙ্গে জড়ানো তারই
দেওয়া জামদানি শাড়ি। আচ্ছা শাড়িটি বেশি সুন্দর
নাকি তার স্বর্ণ অঙ্গে জড়িয়েছে তাই এত সুন্দর
লাগছে? সায়নকে ডাবডাব করে তাকিয়ে থাকতে
দেখেও স্বর্ণ কিছু বলছে না। হাসছে না। আর না
লজ্জায় নুইয়ে পড়ছে। সে সায়নকে উঠে বসিয়ে
ইশারায় কেক কাটতে ইশারা করল।

সায়ন কেকটা সামনে রেখে স্বর্ণকে হেঁচকা টানে
বসাল তার সামনে। খুব শক্ত করে জড়িয়ে ধরল
পেছন থেকে। গ্রাবীয় খুতনী ঠেকিয়ে চুমু খেল। খোঁচা
দাঁড়ি ঘষে দিলো মসৃণ ত্বকে। ক'দিনের না কামানো
দাঁড়ির খোঁচা খেয়ে স্বর্ণ বিরক্তি নিয়ে তাকাল। সরে
বসার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না আঁটকা পড়ল
পুরুষালি শক্ত বাঁধনে। সায়ন তার হাতের উপর হাত
রেখে কেক কাটল। দু'জন দু'জনকে খাওয়াল। স্বর্ণ
রিচওয়াচ গিফ্ট করল। এবং নিজে হাতে তা পরিয়ে
দিলো। সায়ন তাকাল জানালার দিকে। দেওয়াল

ঘড়িতে বাজে পাঁচটা আঁটচল্লিশ। বাইরের আলো ফুটে
নি। মনেও ছিল না আজ তার জন্মদিন। জন্মদিনের
সকালটা এত সুন্দর হবে ভাবতেও পারে নি। সে
পুনরায় স্বর্ণকে কাছে টেনে নিলো। যত্নে করে চুমু
আঁকল চোখে, গালে, গলায়। তারপর ফিসফিস করে
ডাকল,-‘জ..জান!’

-‘হুম।’

-‘চলনা বিয়ে করে ফেলি? আজই বাসায় জানিয়ে
দেই? শুধু শুধু টাইম ওয়েস্ট করে কি লাভ বল?’

-‘আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি?’

-‘ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছিস।’

-‘যেই ফিল্ডে পা রেখেছো দু’দিন পর দম ফেলানোর
সময় পাবে না। এরই মধ্যে বিয়ে?’

-‘তাও ঠিক কিন্তু মন তো মানছে না। এককাজ করি
চুপিচুপি বিয়ে করি? পরে জানাব সবাইকে? আমার
বিশ্বাস আমার বাপ ছাড়া বাড়ির কেউ’ই অমত করবে
না।’

-‘শখ আপুর বিয়েটা হয়ে যাক এরপর তোমার
পালা।’

-‘কিন্তু.....!’

-‘কি?’

সায়ন ওকে জড়িয়ে ধরে’ই শুয়ে পড়ল। মুখ রাখল
স্বর্ণের গলার ভাঁজে। এরপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে
বিরবির করে আওড়ালো,এলোমেলো হয়ে যায় মন,
কেন আজ বুঝি না

দাবানল যেন ছড়ালো পার করে সীমানা
শ্বাপদের মতো হানা দেয় এ মনের কামনা
নিজেকেই দেখে লাগে আজ
অ..অচেনা, অচেনা, অচেনা।

সায়ন থামল। স্বর্ণ মনে মনে হাসল। তারপর সায়নের
চুল খামছে ধরে গলার ভাঁজ থেকে মুখ তুলে চোখে
চোখ রাখল। সায়নের নিদারুণ ফেসে নজর বুলালো।
কপাল, গাল, নাক, ঠোঁট, রেখে চুমু আঁকল খোঁচা
খোঁচা দাড়ির খুতনীতে। তারপর বলল,

-‘স্কলারশিপ নিয়ে দুই বছরের জন্য বাইরে চলে
যাই?’

-‘কেন?’-‘যত দিন যাচ্ছে তোমার চিপকাচিপকি
বাড়ছে। দিনকে দিন অধৈর্য হয়ে যাচ্ছে তুমি।
এরচেয়ে দূরে চলে যাই। তুমি এদিকে কাজ সারো।
দু’বছর পর নাহয় দেশে ফিরে সংসার সাজাব

আমরা। এতে আমার পড়াশোনা ঠিক থাকবে আর তুমিও লক্ষ্যে স্থির থাকতে পারবে।’

-‘প্রতিনিয়ত আমার যৌবনের খ্যাতায় আগুন জ্বালিয়েও মন ভরছে না, না তোর? এখন তোকে রোজ না দেখে, না ছুঁয়ে, মেরে ফেলার পায়তারা জুড়েছিস? এতই সোজা? এতই সস্তা আমার প্রেমানুভূতি?’

-‘ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখো এতে দু’জনেরই ভালো হবে।’

-‘সর যা। ভুলেও আর আমার রুমে আসবি না তুই। তোর ভালোবাসার গুষ্ঠিকে চু...চন্দ্রাবতী।’

একথা বলে সায়ন রেগে উঠতে গেলে স্বর্ণ থামিয়ে দিলো। সায়নের দুই গাল আজলা ভরে ধরে একগালে মৃদুভাবে থাপ্পড় মেরে বলল,-‘মুখ খারাপ করতে বারণ করেছি না?’

-‘তুমি আমার বালের আবদার করবা? আর আমি শক্তিহীন পুরুষের মতো মেনে নেবো? আবার গালিও দেওয়া যাবে না। গালি দিবো না তো কি এভাবে চুমু দেবো?’

কথাশেষ করে স্বর্ণের ঠোঁটে চট করে চুমু খেয়ে
নিলো। কাজটা এত দ্রুত করল যে তাকে বারণ
করারও সময় পেল না। স্বর্ণ কিছু বলার আগেই
নিজে সিরিয়াস হয়ে বলল,

-‘আমি ইচ্ছে করে তোকে ভালোবাসি নি। যা হয়েছে
তা মনের অজান্তে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের রিলেশন
নিয়ে আমি খুব সিরিয়াস। ভালোবাসি তোকে তাই
বউ বানাবো তোকেই। নয়তো মন কঠুরী আজীবনের
জন্য সিলগালা করে দেবো। আর মজা করে যদি দূরে
যাওয়ার কথাটা বলিস তাহলে বলব দারুণ জোক্সস্।
ফিলিংস হচ্ছে নাইচ, ওয়াও, অসাধারণ, নেক্সট,
পরের পার্ট প্লিজ। আর যদি সিরিয়াসলি বলিস
তাহলে আগে ওয়ার্নিং ছাড়াই বাসর সারব, প্রেগনেন্ট
করব, তারপর বিয়ে করে বাসায় জানাব। এটা অন্তত
মাথায় গেঁথে রাখিস?’

স্বর্ণ চুপ করে শুনল। তারপর সাইনকে সরিয়ে
সায়নের বুকে মাথা রেখে চুপ করে শুয়ে থাকল।
সায়ন তাকে বুকে আগলে চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে
যত্ন সহকারে। শান্তিতে দু’চোখে ঘুম নেমে আসছে।

সায়নের মাথায় হঠাৎ দুটু বুদ্ধি খেলে গেল। সে স্বর্ণের কানে কানে বলল,-‘শাড়ি কি আমার জন্য পরেছিস?’

-‘হুম।’

-‘তাহলে খোলার দায়িত্ব’ও তো আমারই, তাই না?’

-‘রুমে যাব, সরো।’

-‘মামার বাড়ির আবদার বললেই মনে হচ্ছে যেতে দেবো।’

-‘তাহলে মুখ বন্ধ রাখো।’

-‘ তাহলে একটু আদর করতে দে।’

-‘আগামী তিনদিন তোমার কাছে আসা তো দূর কথাও বলব না। এখন যেতো না সময় বেড়ে যাবে। তুমিই ভাবো তুমি কি করবা!’

একথা বলে স্বর্ণ ওকে ধাক্কা দিয়ে উঠে চলে গেল। দরজা খুলে যাওয়ার আগে সায়ন মুখ কাঁচুমাচু করে বলল,

-‘যাচ্ছিস যা। আমাকে রেপ করে যা প্লিজ। নয়তো তোর ছোঁয়ায় একটু কলঙ্ক লেপ্টে দিয়ে যা, জান।’

-‘আবার শুরু করলে?’

-‘না মানে সকালে আয়নায় নিজেকে দেখে যাতে সাত্বনা দিতে পারি তাই আর কি!’

তার কথায় স্বর্ণ খুব বিরক্তি হয়ে তাকিয়ে চলে গেল।
স্বর্ণকে রেগে যেতে দেখে সায়ন শব্দ করে হেসে
ফেলল। তার লাগামছাড়া কথা ও কাজ শুধু
পাগলিটাকে রাগানোর জন্যই আর কি! পরিশেষে
সফল। এক সপ্তাহ পরের ঘটনা,

শীতল এখন সুস্থ বলা চলে। তার চঞ্চলতা দেখে
বোঝার উপায় নেই কত বড় বিপদের হাত থেকে
বেঁচে ফিরেছে। তার মতে, তার জন্য চিন্তা করার
অনেক মানুষ আছে। সে শধু শুধু চিন্তা করে রক্ত
শুকাবে কেন? এরমধ্যে সে শুদ্ধর বিয়ের ব্যাপারে
ইনিয়ে বিনিয়ে সবার কাছে বলেছে। আশ্চর্যের ব্যাপার
কেউ বিশ্বাস করতেই চায় না। শীতলের কথা শুনে
সিঁতারা নিজে শুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেছিল,

-‘শীতল খেতে বসে বলছিল তুই নাকি পাত্রী দেখার
কথা বলেছিস। সত্যি নাকি বাপ?’

-‘পাগল ছাগল মানুষ কত কথায় তো বলে সব কথা
ধরতে আছে? আমি কাজে এসেছি এসব বিয়ে টি়ের
কথা বলে মনোযোগ নষ্ট করতে চাচ্ছি না আপাতত।
ওর কথায় কান দিও না।’

ছেলের কথা শুনে সিঁতারা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন।
ভেবেছিলেন ঘটনা সত্যি বোধহয়। খুশিও হয়েছিলেন।
কিন্তু ছেলে তো মুখে উপর না করে দিলো। দু'দিন পর
শীতল পুনরায় কলেজ যাওয়া শুরু করল। কেউ বাঁধা
দিলো না তবে সায়ন তিনবোনের জন্য কড়া
সিকিউরিটির ব্যবস্থা করল। যেটা তিনবোনের কেউ
টেরও পেল না। শুদ্ধ স্কেচগুলো পেয়ে গেছে।
সায়নকে পাঠিয়েছে কাজ শুরু করতে। সায়ন ইনিয়ে
বিনিয়ে শীতলকে সেগুলো

দেখিয়েছে। শীতল বিষয় নিয়ে কনফার্ম করেছে
এরাই ছিল। বোনের কথা শুনে সায়ন মাথায় হাত
বুলিয়ে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেছিল,

–‘বোন, মনে কর এই ছেলেগুলোকে হাতের কাছে
পেলে, তখন কি করবি? মাফ করে দিবি?’

–‘মোটেও না। ওরা আমাকে মেরেছে। মেরে ঠোঁটের
রক্ত বের করেছে। যখন আমার বুকে লাথি মারল
আমার মনে হয়েছিল আমি মরেই যাব। শ্বাস নিতে
পারছিলাম না। হৃদপিণ্ড যেন ছিটকে বেরিয়ে আসবে
এমন ভাবে লাফাচ্ছিল। বিশ্বাস করো ভাইয়া, খুব কষ্ট
হয়েছিল আমার, খুব। ওদের পেলে করাত দিয়ে ওদের

হাত কাটব। কাঁচা চামচ দিয়ে ওদের হাট খুঁচিয়ে দেবো। বেয়াদবগুলো তখন বুঝবে কারো বুকে ব্যথা দিলি কেমন লাগে।’-‘ধর এমনভাবে কেউ তাদের মেরে তোর কাছে পার্সেল করল। ভয় পাবি না তো?’

-‘মোটেও না।’

-‘তাহলে আবেদন মঞ্জুর করা হলো।’

-‘মানে? কিসের আবেদন? কিসের মঞ্জুর?’

-‘ও কিছু না। তুই পেয়ারা খা, আমি যাই গা।’

সায়নের কথার আগামাথা কিছুই বুঝল না সে পেয়ারা খাওয়াতে মন দিলো। সিঁতারী এসে তখন জানালেন শুদ্ধকে নাকি কলে পাচ্ছেন না। ছেলেটার সাথে কথা হয় নি গতকাল থেকে। একথা শুনে শীতল নিজেই ফোন করল শুদ্ধকে। কলের পর কল দিতেই থাকল। তবুও কেউ রিসিভ করল না। আঁটবারের বেলায় কেউ রিসিভ করে বলল,-‘হেই শীতল, শুদ্ধকে আঁটকাও বোন!’

-‘আঁটকাব? কিন্তু কেন, কি হয়েছে?’

-‘লাইফ রিস্ক নিয়ে sky diving করার পায়তারা জুড়েছে? কার উপর রেগে আছে কে জানে।’

-‘এটা আবার কি?’

-‘ একটা কাজে প্রাইভেট জেট নিয়েছিলাম। এখন ও বলছে প্যারাসুট নিয়ে জেট থেকে লাফ দেবে। এই পাগলকে কি করে সামলাব আমি?’

-‘ লাফ দেবে মানে? চলন্ত জেট থেকে লাফ দেবে?’

-‘হুম। তাও একা নয় ঐশ্বর্যকে নিয়ে।’

-‘ঐশ্বর্য কে?’

-‘ আমাদের দলের হার্ট-হ্যাকার। দেখবে ওদের?’

একথা বলে কামরান ফোনের ব্যাক ক্যামেরা অন করতেই দেখতে পেল শুদ্ধকে। সাদা টি-শার্ট, কালো প্যান্ট পরা সুদর্শন যুবকটির কাঁধে ব্যাগ।সে কথা বলতে বলতে জেটের দরজা খুলে দিলো শুদ্ধ। কামরান তাকে বলতেও পারল না শীতল কলে আছে তাকে দেখছে। তার আগেই শুদ্ধ লাফ মেরেছে জেট থেকে। এরপরপরই লাফ দিলো আরেকজন। তার শারীরিক গঠন বলে দিচ্ছে সে মেয়ে। চোখে মুখে আত্মবিশ্বাসের ছাপ।

অপরূপ সৌন্দর্য্যে অধিকারী বলার অপেক্ষা রাখে না। কামরান ক্যামেরা নিচের দিকে তাক করতেই দেখতে পেল শুদ্ধ পড়ে যাচ্ছে নিচের দিকে। নিচে বড় বড়

পাহাড়। উপর থেকে পড়লে বাঁচানো যাবে না।
শেষ..শেষ।

এইটুকু দেখে ভয়ে শীতলের দেহ কাঁপতে লাগল।
ঘামতে লাগতে দরদর করে। আর দেখার সাহসও
করল না সে চিৎকার করে উঠল শু.....শুদ্ধ ভাই!
কামরান নিচের দিকে ক্যামেরা তাক করতেই দেখতে
পেল শুদ্ধ পড়ে যাচ্ছে। মাথার উপরে স্বচ্ছ সুনীল
আকাশ। নিচে বড় বড় পাহাড়। তীব্র বাতাসের গতি
তাকে নিচের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এত উপর
থেকে পড়লে বাঁচার সম্ভাবনা শূন্যের কোঠায়।
শেষ..সব শেষ। এটুকু দেখামাত্র তার শরীর কাঁপতে
লাগল। ঘামতে লাগল দরদর করে। গলায় যেন মরণ
তৃষ্ণা। হতবাক দৃষ্টি। তার ইচ্ছে করল দু'হাত বাড়িয়ে
শুদ্ধকে ধরে নিতে। জাপটে ধরে চিৎকার করে
বলতে, 'এ কেমন পাগলামি শুদ্ধ ভাই! কেন এমন
করছেন? জানে কি ভয় ডর নেই আপনার।' সে মনে
মনে চিৎকার করে কথাগুলো বললেও কণ্ঠস্বর যেন
বোবা। কথা হারিয়ে গেছে। প্রচণ্ড ভয়ে বাকহারা।
ততক্ষণে শুদ্ধ দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে গেছে। আর
দেখা যাচ্ছে না তাকে। তবে কি সত্যি সত্যি পড়ে

গেল? মরে গেল? শীতল আর ভাবার সাহস করল না। শুধু অসহায় সুরে ডেকে উঠল,' শু.....শুদ্ধ ভাই! কে আছো ওকে বাঁচাও!'একথা বলে চট করে উঠে দাঁড়াল শীতল। কোলের উপরে থাকা চিপসের প্যাকেট পড়ে গেল মেঝেতে। হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল করুণ সুরে। ডাকতে লাগল বড় মাকে, বড় আব্বুকে।কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনি হতে লাগল বড় আব্বুর বলা পুরনো কথাগুলো, 'তোমরা একেকজন আমার জীবন বাগানের জীবন্ত ফুল। তোমাদের কারো কিছু হলে আমি একটুও ভালো থাকব না। খুব কষ্ট পাব। বেঁচে থাকার শক্তি হারাব। আর তোমরা ভালো থাকলে আমি ভালো থাকব। সুখে থাকব। আমার জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ থাকবে।'শুদ্ধ ভাইয়ের কিছু হলে বড় আব্বুর কি হবে?সায়ন, শুদ্ধ দুটোই উনাদের সন্তান হলেও শুদ্ধ ভাইকে বড় আব্বু একটু বেশিই ভালোবাসে। আর বড় মা ভালোবাসে সায়ন ভাইকে। মোটকথা,শুদ্ধ ভাই সত্যি সত্যি মরে গেলে তাকেই বা ধমকাবে কে? মারবে কে? এটা ওটা কিনে দেবে কেন? খোঁচা মেরে কথা বলবে কে? চৌধুরী নিবাসের সবথেকে খারাপ মানুষটা হচ্ছে শুদ্ধ ভাই।

তাই বলে সে কখনোই চায় নি সে হারিয়ে যাক।
ফুরিয়ে যাক। তার এমন করুণ পরিণতি হোক। আর
কেন চাইবে? শাষণ করলে রাগ, ঝাল দেখালেও সে
জানে শুদ্ধ সবার ভালো চায় সবসময়। অথচ সেই
মানুষটা থাকবে না একথা ভাবতেও পারছে না সে।
এ কি হয়ে গেল? কি ঘটে গেল তাদের সাথে।

আচমকা শীতলের চিৎকার শুনে থমকে দাঁড়িয়েছে
শারাফাত চৌধুরী। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন হাউমাউ
করে কান্না করা শীতলের দিকে। সিঁড়ি দিয়ে
নামছিলেন তিনি। উদ্দেশ্যে কড়া করে এক কাপ চা
পান করার। মাথাটা ধরেছে খুব। কাজের চাপ বেশি
থাকায় বিশ্রাম হচ্ছে না তেমন।

শরীরটা খারাপ লাগায় বাড়িতেই ছিলেন। মাথা ব্যথার
কথা সহধর্মিনীকে জানলে নিচে আসতে বলে সিঁতারী
চুলায় চা বসিয়েছে। উনি যতবারই চা বানাবে দুই জা
‘ও সুড়সুর করে চলে আসবে। দাঁত বের করে
হাসবে। হাসির মানে চায়ের ভাগ চায়। চা দিলে গরম
চায়ে চুমুক দিয়ে চোখ বন্ধ করে বলবে, ‘ভাগ্যিস পার্স
হারানোর বাহানায় বড় ভাইয়ার সাথে তোমার
পরিচয়টা হয়েছিল। নাহলে এত স্বাদের চা মিস করে

ফেলতাম। সাধের জীবনটাও অর্ধেক বৃথা হয়ে যেত।’
বাড়ির বাচ্চারা শুনে ফেললে লজ্জার অন্ত থাকবে না।
তাই সিঁতারা দু’ জাকে ধমকে থামালেও তার মুখে
থাকে লাজুক, মিষ্টি হাসি। উনাকে লজ্জা পেতে দেখে
হেসে উঠে সিরাত আর সিমিন। কথায় কথায়
খোঁ’চা’তে থাকে গম্ভীর শারাবাত চৌধুরীকে প্রেম
রোগের রোগী বানানোর অপরাধী হিসেবে।

এই মূহুর্তে সিঁতারার পাশে দাঁড়িয়ে সিমিন চিংড়ি মাছ
কাটছেন। বাড়ির

ছেলেমেয়ে গুলো উনার হাতের চিংড়ির মালাইকারী
পছন্দ করে। সায়ন তো একাই খাবে তিন/চার পিচ।
খেতে খেতে বলবে,-‘ওহ ছোটো আম্মু, স্বর্ণের বরের
দেখি সোনা বাঁধানো কপাল। শাশুড়ির হাতের অমৃত
খাবার ফ্রিতে খেতে পারবে।’

একথা শুনে শীতল স্বর্ণের দিকে একবার তাকিয়ে
গালভর্তি হেসে জবাব
দিবে,

-‘শুধু আপুর না, আমার বরেরও।’

কথাটা সায়নের খুব একটা পছন্দ হবে না। সে
খাওয়া থামিয়ে সিরিয়াস কণ্ঠে প্রতিবাদ করবে,

-‘চিংড়ি, ইলিশে, তোর বরের এলার্জি আছে। সে এসব খেতে পারবে না। আর খেলেও আমার ভাগে কম পড়বে তাই সাধাসাধি করব না।’

-‘তুমি কি করে জানলে আমার বরের এলার্জি আছে?’

-‘জানি, জানি, সব জানি।’

-‘কিভাবে জানো শুনি?’

-‘শুধু আমি না শুদ্ধও জানে, জিগা ওরে?’

-‘শুদ্ধ ভাই আপনিও জানেন?’

-‘হুম।’

-‘বলুন না সেই সৌভাগ্যবান কে?’

-‘তুইও চিনিস তাকে।’

-‘চিনি? চেনাজানার মধ্যে?’

-‘হুম।’

-‘আমাদের পাড়ার কেউ?’

-‘হুম।’

-‘কে সে, প্লিজ বলুন না, বলুন?’

-‘পাড়ার মোড়ের গাবু পাগলা।’ একথা শুনে শীতলের মুখের হাসি মিলিয়ে যাবে। অভিমান এসে জড়ো হবে তার ডাগর ডাগর চোখের পাতায়। মুখ দিয়ে সব সময় লাল ঝড়ে এমন ছেলেকে বিয়ে করবে না।

গাবু তার বর হতেই পারে না। অতঃপর সে সায়ন, শুদ্ধর নামে নালিশ জানাবে শারায়াত চৌধুরীকে। খেতে বসে ছেলে মেয়েদের ঝগড়া দেখে হাসবে সকলে। বলা বাহুল্য, শুদ্ধ খায় অল্প সল্প। সবকিছুতে খুঁতখুঁতে স্বভাব ছোটোবেলা থেকেই। কোনো খাবার সে গপগপ করে খায় না। যা খাবে সীমিত। পাতেও তুলবে পরিমানমতোই। এই ব্যাপারটা উনার ভালো লাগে। মুগ্ধও করে। তার ভাষ্যমতে, থাকলেই খেতে হবে কিংবা নষ্ট করতে হবে, এমনটা তো নয়। খাবারের মর্ম বোঝা উচিত।

মোটকথা, সেও চিংড়ি খায় তবে একটাই সমস্যা এলার্জি। অগত্যা এক টেবিলে বসে সবাই খেলেও সে ছুঁয়ে দেখে না। ব্যাপারটা ভাবলে খারাপলাগলেও কিছু করার নেই। এসব পূর্বের কথাগুলো স্মরণ করে সিমিন মনে মনে হাসছিল। দোয়া করছিল পুরো পরিবারটা যেন আজীবন সুখে ভরা থাকে।

তখন সিরাত ফোনে কথা বলতে বলতে রান্নাঘরের দিকে এলেন। উনার মা আগের তুলনায় এখন সুস্থ আছেন। এজন্য তার মুখে হাসি ফুটেছে।

ক’দিন পর মেজো জাকে হাসতে দেখে খুশি হলো দুই জা। সিরাত কথা বলে ফোনটা রেখে সিঁতারাকে বলল,

-‘ভাবি? সামনেই তো রোজার মাস। রোজার আগে কোথাও থেকে ঘুরে এলে কেমন হয়?’

-‘কোথায় যাবি?’-‘কাছেকোলে কোথাও যাই? অথবা চলো পিকনিক করি? বাচ্চাগুলোও খুশি হবে। আচ্ছা শুদ্ধ করে ফিরবে?’

-‘ দু’দিন ধরে তাকে ফোনেই পাচ্ছি না। এত কিসের কাজ আল্লাহ জানে।’

-‘বিয়ে দিয়ে দাও। বউয়ের টানে বাইরে থাকার কথা মাথায় আনবে না।’

-‘রাজি হলে দিয়েই দিতাম। কিন্তু দুই বজ্জাতের এক বজ্জাতও বিয়েতে রাজি না। তাদের নাকি সময় নেই।’

একথা বলতে না বলতেই শীতলের চিৎকার শোনা গেল। চুলা অফ করে

কোনোমতে ছুটে গেলেন তিন জা। গিয়ে দেখেন শীতল ফোনের দিকে তাকিয়ে হাউমাউ করে কাঁদছে। কাঁপছে থরথর করে। শুদ্ধ ভাই! শুদ্ধ করে ডেকে

চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে ফোনের দিকে।
ততক্ষণে তার চিৎকার শুনে বাকিরাও ছুটে এসেছে।
জিজ্ঞাসা করছে কি হয়েছে? কি দেখে ভয় পেয়েছে?
আর শুদ্ধর নাম ধরে চিৎকার করল কেন? শুদ্ধ ঠিক
আছে? শীতল ধপ করে বসে পড়ল। তার শরীরের
শক্তি যেন কেউ শুষে নিয়েছে। তবুও ঢোক গিলে
ছলছল চোখে বড় মার উদ্দেশ্যে বলল,-‘শুদ্ধ ভাই
জেট থেকে লাফ দিয়েছে বড় মা। নিচে অনেক বড়
বড় পাহাড়।’

-‘বলিস কি? তুই কি করে জানলি?’

-‘ভিডিও কলে দেখলাম।’

-‘কই দেখি? আমাকেও দেখা?’

-‘কল ঢুকছে না।’

একথা বলে ঠোঁট ভেঙ্গে কেঁদে ফেলল শীতল।
রীতিমতো ফোঁপাচ্ছে সে। শারাবাত চৌধুরীও ততক্ষণে
ছুটে এসেছেন। বসেছেন শীতলের পাশে। হাত
বাড়িয়ে পানির গ্লাস নিয়ে খাওয়ার ইশারা করে শান্ত
হতে বললেন।

পানি খেয়ে সে গড়গড় করে বলল কী কী দেখেছে।
শীতলের কথা শুনে সবাই চিন্তায় পড়ে গেলেন।

নিজেরাও যোগাযোগ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। শীতল তখন ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল,- ‘বড় আবু শুদ্ধ ভাই বোধহয় রাগ করে এই সিধান্তটা নিয়েছে। তাছাড়া কেন জেট থেকে লাফ মেরে মরতে চাইবে বলো?’

-‘রাগ? কিসের রাগ?’

-‘ভাইয়া বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে গেছে। আমাকে ফোনটা দিয়েছে বিয়ের কাজ কতদূর এগোলো জানার জন্য। দিনে দুবার আমাকে শুধায় বিয়ের কাজ কতদূর এগোলো। আসলে নিজের বিয়ের কথা মুখ ফুটে বলতে পারে না তাই আমাকে বলে। প্লিজ বড় আবু ভাইয়ার বউ দেখো। বউয়ের অভাবে উনার মনের দুঃখ বেড়ে গেছে। সেই দুঃখে বোধহয় উনি সুইসাইড করতে চাচ্ছে।’ শীতলের কথা শুনে সিঁতারী আঁতকে উঠলেন। শীতলের থেকে ফোনটা নিয়ে নিজেই কল দিলেন শুদ্ধর নাম্বারে। না পেলেন না। সিঁতারীর চিন্তিত মুখে দেখে শীতল পুনরায় বলল,
-‘বড় মা, শুদ্ধ ভাইকে বিয়ে দিচ্ছে না বলেই সে এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে। তোমরা আমার কথা শোনো আমি একফোঁটাও মিথ্যা কথা বলছি না।’

-‘তুই বলিস, সে বিয়ের জন্য পাগল অথচ আমি জিজ্ঞাসা করলে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে।’

-‘লজ্জা পায়। এমনকি আমাকে কি বলেছে জানো? বলেছে জোর করে বিয়ে করিয়ে দিতে নয়তো অঘটন ঘটিয়ে ফেলবে। কতবার যে বললাম মেয়ে দেখে বিয়ে করিয়ে দাও। কেউ শুনলে না। বিয়ের শোকেই ভাইয়া পৃথিবীকে বাই বাই করে দিলো বোধহয়।’

একথা শীতল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। এইটুকু সময়ে চোখ মুখ লাল করে ফেলেছে। হেঁচকি উঠছে। এবার শারাফাত চৌধুরী শীতলের মাথায় হাত রেখে বললেন,

-‘ কিছু হবে না মা। ভয় পেও না। শুদ্ধ এর আগেই স্কাই ড্রাইভিং করেছে।’

-‘বড় আব্বু নিচে বড় বড় পাহাড় ছিল। শু..শুদ্ধ ভাই পড়ে যাচ্ছিল।’

-‘পড়তো না। ওর পিঠে ব্যাগ দেখেছো না ওটা তে প্যারাসুট আছে। সময় মতো ব্যাগের চেন খুলে দিলেই আর পড়বে না। বাতাসে ভাসতে থাকবে।’একথা শুনে শীতল বিষ্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইল। রিক্স নিয়ে এসব করার কি দরকার? সে চোখ মুছল। এই সামান্য

ব্যাপার না বুঝে বোকার মতো কেঁদে ফেলল। ছিঃ!
ছিঃ!

তখন তার মাথায় খেলে গেল একটা মেয়েকেও লাফ
মা'র'তে দেখেছে। এদের কত্ত সাহস! অথচ উঁচু ভবন
থেকে নিচে তাকালেই তার বুকের ভেতর ধড়ফড়
করে। দম আঁটকে আসে। তার কান্না থেমেছে দেখে
আর দাঁড়াল না সে। নিজের রুমে গিয়ে দরজা
আঁটকে শুদ্ধকে মেসেজ করল,
'মেয়েদের সাথে উড়াউড়ি হয়ে গেলে কল দিবেন,
জরুরি কথা আছে।'

মেসেজটি সেভ করে তার মাথায় ক্লিক করল বড়
আবু বোধহয় তাকে শান্ত করতে একথা বলল। নাকি
ঘটনা সত্যি? যখন চিৎকার করল সবাই ছুটে
এসেছিল। চিন্তা ভাসছিল সবার চোখে মুখে। কিছু
একটা ভেবে সে

দরজা খুলে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দেখল বড় মা প্রেসার
বাড়িয়ে ফেলেছে।

সিরাম, সিমিন চিন্তিত মুখে উনার হাত-পা ডলছে।
মুখে কিসব বলছে। শখ আপু মায়ের পাশে বসে
প্রেসার মাপছে। বড় আবু কাউকে বারবার ফোন

করছে। তারপর তার ধারণায় সঠিক তাকে বুঝ দিতে বড়রা তখন অভিনয় করল। মনে মনে একথা ভেবে সে পুনরায় ডুকরে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে ছুট দিলো রুমের দিকে। চোখের সামনে ভাসতে লাগল শুদ্ধর লাফ মারার ভয়ংকর দৃশ্যটা। ধরতে গেলে আমাদের জীবনটা খুব ছোট। শুদ্ধর কাছে জীবনের মানে হলো মর্জিমতো জীবনের স্বাদ খুঁজে নেওয়া। খাওয়া-দাওয়া, আর ঘুম জীবনের মানে হতে পারে না। সে তার জীবনে এভেভেঞ্জার পছন্দ করে। এভেভেঞ্জার নাহলে জীবনের মানে বড্ড পানসে। জীবন চলতি পথে সুখ ও দুঃখের কাহিনী সাজায়। এসবে ভিড়ে তার মনে হয় জীবনকে নিয়েও একটু বাজি ধরা যাক। আজ হলেও মরতে হবে কাল হলেও। ভাগ্যে যদি লেখা থাকে অবিবাহিত অবস্থায় মারা যাবে তাহলে কি কেউ সেই নিয়তি খন্ডাতে পারবে? পারবে না, কখনো না! তাহলে হাত গুঁটি বেঁচে থাকবে?

অবশ্য জীবনের মায়া যাদের কম তারা জীবন বাজি ধরতে পছন্দ করে। এটাই স্বাভাবিক। এই যে উড়ন্ত জেট থেকে লাফ মেরেছে এটাও কি কম সাহসের

ব্যাপার? তার দেখে ঐশ্বর্যও তাই করেছে। এই মেয়েকে দেখেও অবাক লাগে। সাধারণ মেয়েরা সাপ, খোপ দেখে ভয়ে কাল ঘাম ছুটিয়ে ফেলে। অথচ ঐশ্বর্য তার বিপরীত। খুব মেয়ে স্কাই ড্রাইভিং করার সাহস দেখায়। মুখে বললেও অনেকে শেষ মুহূর্তে এসে ফিরে যায়। নতুবা ভয়ে, আতঙ্কে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কামরান, অর্ক জেটের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছে। দু'জনই বাতাসে গা ভাসিয়ে আকাশে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ভয় ডর নেই দু'টোর। কামরান আর অর্ক নিজেরাও রেডি হয়ে তাকাচ্ছে একে অপরের দিকে। এরপর দুই বন্ধু হাসতে হাসতে লাফ দিলো। ওদের দেখে আরো দশ বারোজনও লাফ দিলো। একজোড়া কাপল নিজেদের এক বেল্ট বেঁধে একসাথে লাফ মেরেছে। মেয়েটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে ছেলেটাকে। চিৎকার করছে প্রাণপণে। সেই জায়গাটুকু মুহূর্তের মধ্যেই পিঁপড়ার মতো আরো অনেককে দেখা গেল। ঐশ্বর্য দাপুটের সাথে দমে আছে প্যারাসুটে। চোখে- মুখে অত্যাধিক খুশির মাত্রা। স্কাই ড্রাইভিং তার কাছে খুব পছন্দের রাইড। এই রাইডে লাইফ রিস্ক আছে।

মারাত্মক খুশি আছে। মোদাকথা, লাইফ রিস্ক আছে
বলেই তার ভালো লাগে। সে

আকাশপানে একবার তাকিয়ে তাকাল শুদ্ধর দিকে।
শুদ্ধ তাকিয়ে আছে নিচে থাকা বিশাল সমুদ্রের দিকে।
টলটল করছে নীল পানি। ওপর থেকে অসাধারণ
লাগছে। ভাবছে অন্যকথা। মুখে মিটিমিটি হাসি। তার
থেকে কিছুটা দূরে অর্কের ডাক শুনে শুদ্ধ সেদিকে
তাকাল। অর্ক দাঁত কেলিয়ে চিৎকার করে বলল,
-‘চল ফিরে যাই?’

-‘তোরা যা।’

-‘শীতল কাঁদছে ভাই?’

-‘কাঁদুক।’

-‘মজা করছি না কামরানের কসম।’

-‘তোরা কি জানলি শীতল কাঁদছে?’

-‘ফোন করেছিল তোকে। এই হারামজাদা তোর লাফ
মা’রা দেখিয়েছে ওকে।’

-‘তারপর?’

-‘কল কেটে গেছে। মেয়েটা বোধহয় ভয় পেয়েছে।
‘শুদ্ধ কিছু বলল না দৃষ্টি সরিয়ে নিলো। কিছু বলেও
লাভ হবে না যতক্ষণ না নিজে কথা বলবে।’

এরপরের ঘটনাও তার জানা। শীতল কাঁদবে, সেই কান্না দেখে তার মা সহ বাড়িসুদ্ধ সবার কানে ঘটনাখানা পৌছে যাবে।

তার মায়ের উচ্চতায় ফোবিয়া আছে। ছেলে লাইফ রিক্স নিয়ে আকাশে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এই কথা ভেবে হয় উনার প্যানিক এ্যাটাক হবে নতুবা টেনশনে প্রেসার বাড়িয়ে ফেলবে। মূলত এজন্যই কোনো কাজের কথা কাউকে বলতে চায় না। এখন কিছু করারও নেই, কাঁদতেই থাক। কাঁদলে চোখ পরিষ্কার থাকে। তাকে চুপ থাকতে থেকে কামরান হাসল। তারপর ভ্রুঁ নাচিয়ে বলল,

-‘বুকের জ্বালা কমাতে ল্যান্ড করো বন্ধু।’

-‘ভ্রম করতেই তো হবে। না করলে তোর একটা ব্যবস্থা কিভাবে করব?’

-‘কিসের ব্যবস্থা বন্ধু?’

-‘এখানে থাকার ব্যবস্থা।’ কামরানের হাসিটা মিলিয়ে গেল। চোখ মুখ শুকিয়ে গেল। শুদ্ধর শীতল কণ্ঠে থ্রেট মানে কপালে দুঃখ আছে। দেশে ফিরে বিয়ের পিড়িতে বসার কথা। না, না, যেভাবেই হোক শুদ্ধকে মানাতেই হবে। বোঝাতেই হবে খুব অনুতপ্ত সে। এই

পাপ আর জীবনেও করবে না। কিন্তু সেটা আর সম্ভবও হলো না তার আগেই শুদ্ধ পাশ কাটিয়ে চলে গেল। এর পরপরই সংকেত পেল দ্রুত জেট উঠার। সবাই একে একে এলে এবার জেট ছুটল ল্যান্ড করার উদ্দেশ্যে। প্রায় তিন ঘন্টার পর জেট ল্যান্ড করলে শুদ্ধ দ্রুত পায়ে ছুটল রুমের দিকে। যেতে যেতেই কল করল সিঁতারার নাম্বারে। ছেলেকে সুস্থ দেখে সিঁতারা যেন হাফ ছেড়ে বাঁচল। বকলো এমন কাজ না করার জন্য। শুদ্ধ হাসল। তবে আশেপাশে শীতলকে না দেখে বুঝল সে কাঁদতে ব্যস্ত। কাঁদুক, আর একটু কাঁদুক। কাঁদলে মন পরিষ্কার থাকে। মোটকথা,

কেউ যখন কারো জন্য ব্যাকুল হয়ে কাঁদে তখন দেখতে ভালোই লাগে। তার তো লাগে। মহারানী আর ঘন্টা খানিক কাঁদুক। সে এখন ফ্রেশ হয়ে, খেয়ে, তারপর নাহয় কল ব্যাক করবে। এই নিয়ে এগারোবার কল দিয়ে ভ্রঁজোড়া কুঁচকে নিলো আহনাফ। আজ সকাল থেকে শখকে কলে পাচ্ছে না সে। গেল কই মেয়েটা? সকালথেকে মিষ্টি কণ্ঠটা

শুনতে পায় নি। বুকের ভেতর খাঁ খাঁ করছে। অসহ্য লাগছে।

সকালের শুরুটা এত জঘন্য কাটল দিনটা কি হবে কে জানে। দিনগুলো বড্ড বেশি বেইমানি শুরু করেছে, কাটতেই চায় না, কবে বছর কাটবে? কবে শখকে বউ করে ঘরে তুলবে? কবে বাহুডোরে জাপটে ধরে বুকের জ্বালা কমাবে? এসব কবে হবে? কবে? কবে? কবে?সে দেশ ছেড়েছে কয়েক সপ্তাহ হয়েছে। শখ এয়ারপোর্টে এসেছিল তার সাথে দেখা করতে। যদিও এতটা কল্পনা করে নি। কিন্তু শখের এই ছোট কাজে ভীষণ খুশি হয়েছিল। বড় রা না থাকলে জোর করে হলেও একটু জড়িয়ে ধরতো। কিন্তু সায়ন থাকায় সেই সাহস করে নি। অপেক্ষার ফল সুমিষ্ট হয়। সে সুমিষ্ট ফল পেতেই অপেক্ষা করতে হবে। এসব ভেবে সে রান্না শেষ করে ফ্রেশ হতে গেল। একটুপরে অফিসে যেতে হবে। এদেশে নিজের কাজ নিজে করতে হয়। তাই সব কাজ তারই করা লাগে। যদিও কাজ করতে মন্দ লাগে না। তবে কাজের ফাঁকে গল্প করার একটা মানুষ থাকতো বেশ

হতো। সেই মানুষটা যদি শখ হলে তাহলে তো কথায় নেই।

আহনাফ ফ্রেশ হয়ে মাথা মুছতে মুছতে ফোন হাতে নিতেই দেখে শখের মেসেজ এসেছে, ‘ল্যাবে আছি। স্যার আছে। চিন্তা করবেন না আমি ঠিক আছে।’ এই ছোট্ট একটা মেসেজে তার বুকে শীতলতা নামল। কিছুটা চিন্তামুক্ত হলো। সেও ছোট্ট একটা মেসেজ সেন্ড করে রাখল, ‘ভীষণ ভালোবাসি শখপাখি।’

মেসেজটা দেখে শখ মুখ টিপে লাজুক হাসল। সারাদিনে পাঁচ সাতবার শুনতে হয় এই ম্যাজিক্যাল বাক্যটা। শোনার অপেক্ষায় করে সে। কারণ আহনাফের কণ্ঠে আদুরে সুরে বলা বাক্যটা শুনলে তার মন ভরে যায়। একদল খুশি বুকপাজরে ডানা ঝাপটাতে থাকে। প্রেম, প্রেম, তালবিহীন

ছন্দে সুখরা গুনগুনিয়ে গাইতে থাকে, নাচতে থাকে, তাদের আপন সুরে আপন তানে। দু’দিন ধরে পার্টি অফিসে ঝামেলা চলছে। ঝামেলার সুত্রপাত অংকনের হৃদিস পাওয়া নিয়ে। ছেলেটাকে সায়ন গুম করেছিল জানতে বাকি নেই কারো। তবে কোথায় রেখেছে? বাঁচিয়ে রেখেছে নাকি মে’রে ফেলেছে?

নাকি অন্যকিছু করার পরিকল্পনা এঁটেছে সে? এখন অবধি তার কোনো খবরই পাওয়া যায় নি। অংকনের বাবা পাগলা কুকুরের মতো হিংস্র হয়ে উঠেছে। আবু সিদ্দিককে হুমকিও দিয়েছে অংকনের খোঁজ বের করতে।

নয়তো আবু সিদ্দিকের কচি কাঁচা মেয়ে নিয়ে ১৮+ খেলাধুলার ভিডিও ফাঁস করে দেবো।

চাপে পড়ে আবু সিদ্দিক ইনিয়ে বিনিয়ে সায়নের থেকে কথা বের করার চেষ্টাও করেছে। কিন্তু ধূর্ত সায়ন সেসব কথার ধারে কাঁছে ঘেঁষে না। হয় প্রসঙ্গ পাল্টায় নতুবা গালিগালাজ শুরু করে। তখন আবু সিদ্দিকি কথা বলার সাহস পান না। সায়নের এমন বেপরোয়া কাজে কনক বরাবরের মতো আজই খোঁচা মেরেছে। সায়ন দু'একবার হেসে উড়িয়েও দিয়েছে। কিন্তু কনক যখনই মা তুলে গালি দিলো তখন নিজেকে সামলাতে পারল না। ক্ষীণ সিংহের মতো তেড়ে গিয়ে শক্ত থাবায় কনকের শার্টের কলার চেপে ধরে একের পর ঘুষি দিতে থাকল। শক্ত হাতের ঘুষির তোপে নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে গেল কনকের। পার্টি অফিসে থাকা অন্য ছেলেরা কোনো

তাদের থামায়। কনক আপাতত হসপিটালে। দুটো দিন সেখানে থাকতে হবে। হাতাহাতিতে সায়নেরও লেগেছে তবে হসপিটালে যাওয়ার মতো হয় নি। রাগে ফুঁসছে সে। আফসোস করছে আরো দু'চার ঘা কেন বসল না? কেন জন্মের মতো কথার বলার শক্তি কেড়ে নিতে পারল না।

ঘটনা শুনে আবু সিদ্দিক পার্টি অফিসে এসেছে। তার সঙ্গে এসেছে নতুন এক মুখ। সায়ন তাকে দেখেও কথা বলার আগ্রহ প্রকাশ করল না। ধপ করে বসল চেয়ারে। তারপর টি-শার্ট পেছনে ঠেলে সিদ্দিকের উদ্দেশ্যে বলল,-‘আজ থেকে আপনার দল আপনি সামলান।’

-‘কেন? তুই কোথায় যাবি?’

-‘সেই কৌফিয়ত আপনাকে দেবো না।’

-‘সায়ন! আজকাল বড্ড চেটাং চেটাং কথা বলিস তুই। কার সাথে কথা বলছিস ভুলে যাস না।’

-‘ভুলি নি এখনো। ভুললে স্ব-শরীরের বসে থাকার শক্তি পেতেন না।’

-‘তিন রাস্তার মোড়ে পাৰ্টি অফিস বানাচ্ছিস শুনলাম।
কি এমন হলো যে নতুন করে পাৰ্টি অফিসের দরকার
পড়ল?’

-‘কেন এর উত্তর আপনি ভালো করেই জানেন
সিদ্দিক ভাই। তাও যখন আমার মুখ থেকে শুনতে
চাচ্ছেন তাই বলছি, আমি আর আপনার দলে থাকব
না। না মানে, না! আর না আপনার হয়ে কাজ করব।
এবার থেকে আমার দলের লিডার আমি।’-‘আখের
গুছিয়ে নিয়ে এখন আমাকে ই বুড়ো আগুল
দেখাচ্ছিস? তা পারবি তো টিকতে?’

-‘সায়নের আখের টাখের প্রয়োজন পড়ে নি,
পড়বেও না। আপনার মতো আমি বস্তি থেকে উঠে
আসি নি সিদ্দিক ভাই। আর না ফিকিনি ঘরের ছেলে।
আর না দলে ঢুকে আপনি আমায় বাঙিল বাঙিল
টাকার বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। তাই এসব বালের
কেছা অন্যকে শুনান যদি দান-ভিক্ষা আসে। আমি
শুরু করলে কিন্তু খুব একটা ভালো হবে না।’

সিদ্দিক অপমানটুকু গিলে নিলো। চোয়াল শক্ত করে
দাঁতের দাঁত চেপে তাকিয়ে রইল সায়নের দিকে।

সায়ন কিছু মিছু আন্দাজ করেছে কি না জানতে উনি
নিজেকে সামলালেন। তারপর শুধালেন,

-‘শুনলাম নির্বাচন করবি।’

-‘করব।’

-‘এতদিন তোকে আমার ডানহাত বানিয়ে লোকের
কাছে মুখ চেনালাম।

সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরলাম। রাজনীতিতে রাজ করার
কৌশল শেখালাম। তুই কি না এখন আমার পেছনেই
বাঁশ দিতে উঠে পড়ে লেগেছিস?’-‘উহুম, ভুল বললেন
ভাই। বরং আপনিই আমার কারনে সকলের মুখে
মুখে এসেছেন। নয়তো আগে যা ভেড়াচু’দা ছিলেন
আপনাকে দিয়ে আর যায় হোক অন্তত রাজনীতি
হতো না। তাই ওসব শা’ও’য়া’র ভান্ডামি বাদ দেন।
নয়তো ভান্ডামি করার জন্য ওইটাই আর থাকবে না।’

-‘তোর কি মনে হচ্ছে না তুই ইচ্ছে করে শত্রুতা
তৈরি করছিস?এর ফল ভালো হবে না সায়ন।’

-‘নাহলে নাই। ভালো জিনিসে এলার্জি আমার।’

-‘তাহলে আমার বিপক্ষে সত্যি সত্যিই দাঁড়াচ্ছিস?’

-‘বোধহয়।’

-‘হঠাৎ এই সিধান্ত কেন?’-‘বউ বলেছে অন্যের পা না চাটতে। সে আবার চাটাচাটি একদমই পছন্দ করে না। তার কথা মাথায় রেখে সিধান্ত নিলাম বাঁচতে হলে বীরের মতো করে বাঁচব নয়তো প্রাণের মায়া ছেড়ে দেহ মাটিতে লুটাব।’

একথা বলে সায়ন উঠে দাঁড়াল। তার বরাদ্দকৃত রুমে তার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো নিয়ে হাঁটা ধরল তিন রাস্তার মোড়ের দিকে। তাকে যেতে দেখে দাঁড়িয়ে থাকা গুটি ত্রিশেক ছেলেও সিদ্দিকের দিকে তাকিয়ে হাঁটা ধরল। আজ থেকে তাদের দল আলাদা। পার্টি আলাদা। লিডার আলাদা।

আজ থেকে তারা শাহরিয়ার ভাইয়ের লোক। মোটকথা, তারা এতদিন সিদ্দিকের সঙ্গে ছিল সায়নের কথায়। সিদ্দিক যদি শাহরিয়ার ভাইয়ের ছোটো বোনকে কি’ড’ন্যা’প করার ব্যাপারে সঙ্গ না দিতো তাহলে তারাও দল ছাড়ত না। আর না এতদিনের গড়া অবস্থান শাহরিয়ার ভাই এভাবে পায়ের তলা পিষে চলে যেতো। শুদ্ধ রুমে ফিরে ফ্রেশ হয়ে বের হতেই দেখে ফোনের আলো জ্বলছে। ফোনের ডিসপ্লেতে ভাসছে চেনা জানা নাম ‘ব্যাঙাচি।’ সে

গায়ে টি-শার্ট জড়িয়ে কলটা রিসিভ করতেই দেখতে
পেল শীতলের মুখ। কেঁদে কেঁটে

চোখ,মুখ, মালোপোয়ার মতো ফুলিয়েছে। নাক টিয়া
পাখির মতো লাল।তবে টিয়ার নাক টিকালো আর
শীতলের নাক বোচা। একথা ভেবে তার ঠোঁটে হাসি
খেলে গেল। তাকে হাসতে দেখে শীতলের চোখজোড়া
জলে ভরে উঠল। নিচের ঠোঁট কামড়ে কোনোমতে
কান্না আঁটকিয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে শুধাল,

-‘আপনি মারা গেলেন কিভাবে?’

অবাস্তুর প্রশ্ন শুনে শুদ্ধ মাথা মুছতে মুছতে ত্যাড়াভাবে
জবাব দিলো,-‘প্রেমসাগরে ডুব দিয়ে। ডুববি? আয়।’

-‘বড় মাকে কল করে ঠিকই তো কথা বললেন অথচ
আমাকে একটা কল দিলে কি এমন হতো?’

-‘তোকে কেন দিবো? তুই কি আমার বউ যে কাজ
থেকে ফেরামাত্রই তোকে কল করব?’

-‘বউ হলেই কল দেওয়া যায়? অন্যকেউ হলে দেওয়া
যায় না?’

-‘না যায় না।’

-‘কেন যায় না?’

-‘জানি না। তবে এক্সপেরিমেন্ট করতে চাইলে আমার বউ হয়ে যা দেখবি সব খবরাখবর তোকেই আগে জানাব।’

-‘আপনার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে শুদ্ধ ভাই।’

-‘রাখ তোর সারপ্রাইজ। তুই আবার আমার রুমে ঢুকেছিস? সুন্দর করে বললে ভালো লাগে না শুনতে, না? ফিরতে দে আমায়।’-‘আপনার রুম সাউন্ড প্রফ তাই এসেছি। স্পেশাল সারপ্রাইজ দিতে সাউন্ডপ্রফ রুম লাগত।’

একথা শুনে শুদ্ধ ভ্রঁ কুঁচকে তাকাল। বোঝার চেষ্টা করল এর মাথায় কি ঘুরছে। তার কুঁচকানো ভ্রঁ দেখে শীতল হাসল। তারপর ব্যাক ক্যামেরা অন করে মেঝেতে পড়ে থাকা কাঁচের ভাঙ্গা পারমিউমের বোতলগুলো দেখিয়ে বলল,

-‘আপনার জন্য কেঁদেছি আমি। চিন্তা করেছি। রুমে ফিরেও কত কল দিয়েছি। অথচ আপনি ইচ্ছে করে আমার কল ধরেন নি। কেন ধরেন নি? না ধরার কারণে একটা একটা করে আছাড় মেরে আপনার প্রতিটা পারফিউমের বোতল ভেঙেছি।’

শুদ্ধ দেখল সত্যি সত্যিই তার শখের পারফিউমগুলো
মেঝেতে লুটোপুটি খাচ্ছে। কাঁচ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।
বিছানার চাদর বিন ব্যাগের উপর।

সিলিং ফ্যানের বাতাসে বালিশের তুলো উঠছে।
একথায় রুমের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় বয়ে
গেছে। ভীষণ শখের জিনিসপত্রের অবস্থা
দেখে সে চোঁচিয়ে উঠল,-‘শীতলের বাচ্চা! রুমের কি
অবস্থা করেছিস? এসব ঠিক করতে টাকা কি তোর
বাপ দিবে?’

-‘আমার বাপ কেন দিবে?’

-‘দিবে না তো কোন হুঁশে এসব করেছিস
বে’য়া’দ’ব?’

-‘বেশ করেছি আরো করব।’

-‘কেন করবি? তোর বাপ কি স্বজ্ঞানে তোকে আমার
হাতে তুলে দিয়েছে যে, আমি বউয়ের ভুলকে আমি
ফুল মেরে নেবো?’

-‘তুলে দিলে মেনে নিলেন?’

-‘নিতাম।’

-‘ওকে ডান। ফিরে আসুন।’

-‘ফিরলে কি হবে?’-‘বাবাকে বলব আমাকে আপনার হাতে তুলে দিতে। তারপর আমিও দেখব, আপনি কতটা কি মেনে নিতে পারেন।’

-‘পরশু রাতের ফ্ল্যাইটে ফিরছি আমি। রেডি থাক।’

একথা শুনে রাগে বোম হয়ে থাকা শীতলও একরোখা কণ্ঠে জবাব দিলো,

-‘ঠিক আছে।’কল কেটে রুমের অবস্থা দেখে ঢোক গিলল শীতল। এখন কি হবে? কে পরিষ্কার করবে এসব? রাগের মাথায় মাথা কাজ করছিল না। বিশুদ্ধ পুরুষকে না পেয়ে রাগ তুলেছে তার জিনিসপত্রের উপর। এখন খারাপ লাগছে খুব। বেশি খারাপ লাগছে নামিদামি পারফিউমের কাঁচের বোতল গুলোর জন্য। আহা, কাজটা ঠিক হয় নি। অন্যসময় এসে সে নিজেও ব্যবহার করতো। ঘেঁটেঘুটে দেখত। রাগের সময় কেন যে মাথা ঠিক থাকে না। কিন্তু এখন কি করবে? বাড়ির কেউ যদি জানে এসবের পেছনে সে দায়ি। তাহলে সবার আগে নিজ শক্তিতে জ্বলে উঠবে তার মা। না, মার খাওয়া যাবে না। এমন কিছু করতে হবে যেন তার ঘাড়ে দোষ না পড়ে। শুদ্ধ ভাইও থ্রেট দিলো একঘন্টার মধ্যে রুম পরিষ্কার করতে নাহলে

তার খবর আছে। যদিও এসব ফাঁকা বুলিতে খুব একটা ভয় পায় না সে। কিন্তু শুদ্ধ ভাই জানিয়েছে সিগারেট খাওয়া ছবিটা উনি সবার আগে দেখাবে শারায়ত চৌধুরীকে। উনি এ বাড়িতে শীতলের সবচেয়ে বড় প্রশয়দাতা কী না। একথা শুনে শীতল চুপসে গেছে। সে জানে বড় আবু ওই ছবিটা দেখলে খুব কষ্ট পাবে। তাই শুদ্ধর শর্ত অনুযায়ী সে রুম ঠিকঠাক করার

দায়িত্ব নিয়েছে। অপরাধ যখন করেছে শাস্তিও মাথা পেতে নিতেই হবে।

এসব ভেবে আর সময় নষ্ট করল না শীতল কোমরে ওড়না বাঁধতে গিয়ে থেমে গেল। রুমে তো কেউ নেই। তাই ওড়নাটা চেয়ারের উপর রেখে রুম পরিষ্কারের কাজে লেগে গেল। তবে তার মুখ বন্ধ থাকল না। শুদ্ধকে সে গালাগাল দিতে দিতে কাঁচ পরিষ্কার করল। শুদ্ধ তার করা কাহিনী দেখে লেপটপ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে উঠে রুমের বাইরে গেল। প্রচণ্ড ক্ষুধা লাগায় গেল খাবার খেতে। অর্ক, কামরান, হাসান, স্যাভিও এসে বসেছে কেবল। শুদ্ধ চেয়ার টেনে হাসানের পাশে বসল। গল্পে গল্পে একে একে

সবাই খাবার নিয়ে খেতেও আরম্ভ করল। কি একটা
ব্যাপারে অর্ককে পঁচিয়ে বাকিরা সবাই হাসছে।

শুদ্ধ খেয়াল করল হাসান থমথমে মুখে বসে আছে।
মুখে বিষণ্ণতার ছাপ স্পষ্ট। খাওয়াতে আশ্রয় নেই
খাবার নাড়াচাড়া করছে শুধু। তাছাড়া এসে অবধি
খেয়াল করলে হাসান কেমন থমথম মুখে আছে। কথা
বলছে খুব কম। হাসছে যেন জোরপূর্বক। কোনো
সমস্যায় না পড়লে এমনটা করার কথা না। এতক্ষণ
কিছু না বললেও সে এবার সরাসরি হাসানের
উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ল,

-‘কি হয়েছে তোর? কোনো সমস্যা?’

হাসান ঘাড় ঘুরিয়ে শুদ্ধর দিকে তাকাল। শুনল।
এরপর জবাব দেওয়ার আগে কামরান বলল,-‘সমস্যা
মানে? বিরাট সমস্যায় পড়ছে ব্যাডায়।’

-‘কি সমস্যা সেটাই জানতে চাচ্ছি।’

-‘প্রথম সমস্যা, ওর বউ ওরে কাছে ঘেঁষতে দেয় না।
দ্বিতীয় সমস্যা ওর বউ মুক্তি চায়।’

শুদ্ধ ভ্রুঁ কুঁচকে হাসানকে বলল,

-‘মুক্তি বলতে?’

-‘তালাক।’

-‘কেন?’

-‘আমাকে নাকি পছন্দ না।’

-‘পছন্দ না তো কবুল বলেছিল কেন?’

-‘সেটাই তো কথা। এখন সে আমাকে সহ্য করতে পারে না। কাছে গেলে চিৎকার চোঁচামেচি করে। বাসায় বাবা-মা, ছোটো ভাই-বোন আছে কিছু বলতেও পারি না। আবার তার ইগনোর করার ব্যাপারটা সহ্যেতেও পারি না। কাছে গেলেই চোঁচিয়ে বাড়িসুদ্ধ সবাইকে জানায়। লুচা, লম্পট কিছু বলতে বাদ রাখে না। বার বার একই ঘটনা ঘটায় লজ্জায় আমিই কাছে যায় না। এখন তার একই কথা মুক্তি চায়।’-‘দিয়ে দে।’

-‘আমি তো মুক্তি দেওয়ার জন্য কবুল বলি নি ভাই। স্বল্প পরিচিত হলেও কিভাবে যেন ভালোবেসে ফেলেছি। ওকে ছাড়তে পারব না আমি। আর ছাড়লে হয়তো আমিই বাঁচব না।’

একথা শুনে অর্ক একটা গালি দিয়ে চোখ মুখি খিঁচিয়ে বলল,

-‘তাহলে বউয়ের ঝাল সহ্য কর শালা?’

-‘(....)’

-‘বিয়ে করেছেো প্রায় সাড়ে তিনমাস অথচ বাসর সারতে পারো নি। এই আবার নিজেকে পুরুষ দাবি করো।’

এবার শুদ্ধ মুখ খুলল। ফিচেল হাসল। তারপর হাসানকে দারুণ একটা বুদ্ধি দিলো। বুদ্ধিটা বোধহয় হাসানের পছন্দও হলো। সে সম্মতি সূচক মাথা নাড়িয়ে মৃদু হাসল। শুদ্ধর খাওয়া ততক্ষণে শেষ। সে চেয়ার ছেড়ে বেসিনে হাত ধুতে গেলে কামরান চোঁচিয়ে বলল,-‘এই শালা কি বুদ্ধি দিলি ওকে? হাসান ভুলেও একাজ করিস না ভাই। তোর আধডোবা সংসার পুরোপুরি ডুববে, সঙ্গে বউটাকেও মারবি তুই।’

কামরানের কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠল। এই গর্দভ কথার মানেই বুঝে নি। সবাই হাসছে দেখে রেগে গেল কামরান। সে প্রতিবাদী সুরে কিছু বলার আগে শুদ্ধ পুনরায় বলল,

-‘ বউকে মারা প্রতিটা স্বামীর স্বামীগত অধিকার। সে সূত্রে ওর বউকে ও মারবে তাতে তোর বউয়ের কি?’

-‘ একথা বলতে পারলি শুদ্ধ? এটা তোর থেকে আশা করি নি।’

-‘না করলে নাই। তবে স্বামী বউকে না মারলে কাকে মারবে?’

-‘মারবে কেন? সময় দেওয়া যায় না?’

-‘কিসের সময়? বউ কি সাজিয়ে রাখার জিনিস যে সাজিয়ে রাখবে? স্বামীর দেওয়া হাজার হাজার টাকার গিফ্ট নিতে পারবে। হি হি করতে করতে তার দেওয়া শাড়ি গয়না গায়ে জড়াতে পারবে। অথচ স্বামী কাছে গেলেই হাজারটা বাহানা। মামার বাড়ির আবদার?’

শুদ্ধ থামতেই কামরান ফুঁসে উঠল। সে পুনরায় কিছু বলার আগে অর্ক তার বাহুতে ঘুষি মেরে বলল,

-‘শালা, বেরসিক। এই মারা সেই মারা না আদরের সাগরের ডুবে মারার কথা বলছে শুদ্ধ। শালা ছাগল ছাগলই থেকে গেলি।’

-‘ওহ রে। আগে বলবি না?’ কামরানের কথায় শুদ্ধ আপাতত কথা বাড়ল না। শুধু হাসানের দিকে একবার তাকিয়ে যেতে যেতে,

-‘কিছু কিছু ক্ষেত্রে দু’জনের মুডের অপেক্ষা করার প্রয়োজন পড়ে না।

বউয়ের কাছে এমন মুড়ে যাওয়া উচিত যাতে একজনের উন্মাদনায় আরেকজন উন্মাদ হতে বাধ্য হয়।’

একথা বলে শুদ্ধ চুলে ব্যাক ব্রাশ করতে করতে স্থান ত্যাগ করল। তাকে যেতে দেখে কামরান কপাল চাপড়ে বলল,

-‘এই শালা প্রচুর অশ্লীল। ওর বউটাকে বাঁচতে দিলে হয়। তোরা আমার কথা মিলিয়ে নিস, ওর বউ টিকবে না। দেখবি বিয়ের পরদিনই ওর বউ পালাবে।’

একথা শুনে আরেকদফা হাসির রোল পড়ল। শুদ্ধ রুমে এসে লেপটপ অন করে দেখে শীতল এখনো রুম পরিষ্কার করছে। রুম একদম আগের মতো ঝকঝকে, তকতকে। ভালোই খাঁটুনি হয়েছে ওর বেহাল দশা দেখে বোঝা যাচ্ছে। সে ফোন হাতে নিয়ে কল দিলো। শীতল বিছানা টান টান করে নিচের নামতেই ফোনের রিংটোন বেজে উঠল। কোমরখানা অবশ।

হাঁপিয়ে উঠেছে। সে এদিক-ওদিক দৃষ্টি বুলিয়ে দেখল সবকিছু ঠিকঠাক। তখন ফোনের রিংটোন বেজে

উঠল। মুখে বিরক্তিকর শব্দ করে ফোন হাতে নিয়ে
দেখল অপ্রিয় মানুষটার নাম। মুখ থমথমে করে কল
রিসিভ করল সে। তারপর বলল,-‘শুদ্ধ ভাই টাকা
দেন।

-‘কিসের টাকা?’

-‘পরশুদিন দিন না আমাদের বিয়ে?’

-‘তাতে কি?’

-‘বিয়ের শাড়ি কিনতে হবে।’

-‘শাড়ি পরেই বিয়ে করতে হবে কোথাও লেখা আছে
নাকি? সবাই শাড়ি পরে তুই লুঙ্গি আর ফতুয়া পরবি।
পরা বলে কথা। কি পরলি ওটা মেইন ফ্যাঙ্ক্ট না।’

-‘ শুধু শুধু কথা পেঁচাবেন না বলে দিলাম।
সাইন্টিস্টকে বিয়ে করছি কি এমনি এমনি নাকি?
টাকা দেন নয়তো বিয়ে ক্যাসেল।’

-‘কত দিতে হবে?’

-‘আপাতত দশ দেন।’

-‘দশ মানে? দশ টাকায় শাড়ি হবে?’

-‘ দশ টাকা না দশ লাখ!’

-‘কিহু! থাক, করব না বিয়ে। লাগবে না বউ। স্ক্যামা
দে বইন। এত দামি শাড়ি পরা বউ রাখার জায়গা

নাই আমার রুমে। সিঙ্গেল আছি সিঙ্গেলই মরব।

‘-সত্যি দিবেন না?’

-‘না।’

-‘তাহলে বিয়ে করব না।’

-‘করিস না। তোকে বিয়ে করার জন্য মরে যাচ্ছি না।’

-‘তাই না? ঠিক আছে বিয়ে ক্যাসেল। যে পুরুষ বউকে শাড়ি কিনে দিতে পারে না তাকে বিয়ে করার মানেই হয় না।’

-‘যে মেয়ে বিয়ের আগেই হবু বরের থেকে দশ লাখ টাকার শাড়ির চেয়ে হার্ট এ্যাটার্ক করানোর পায়তারা জুড়ে আমিও তাকে বিয়ে করব না। ‘

-‘ওকে ক্যাসেল!

-‘ক্যাসেল!

অতঃপর কল কেটে গেল। কিছুক্ষণ আগের নেওয়া সিধান্তটা মাঠে মারা গেল। এরপর আর কেউ কারো সঙ্গে কেউ কথা বলল না। দুদিন পেরিয়ে গেল। দু’জনই দৈনন্দিন কাজে নিজেদের বিজি রাখল। অনলাইনে একে অপরকে এন্টিভ দেখল তবুও তাদের কথা হলো না। মেসেজ হলো না।

শুদ্ধর দেশের ফেরার দিন শুদ্ধ ল্যাভে কাজ করার
এক ফাঁকে শীতলকে মেসেজ করল,
-‘ এই মুহূর্তে এয়ারপোর্টে আছি, রেডি থাক,
আসছি।’

মেসেজ পাওয়ামাত্রই শীতল চটজলদি ব্যাগ প্যাক
রেডি করে শতরুপা চৌধুরীর বাড়িতে যাওয়ার
উদ্দেশ্যে রওনা হলো। বাড়ির গাড়িতে বসে যেতে
যেতে রিপ্লাই করল,

-‘বাড়িতেই আছি জলদি আসুন।’সকল ব্যস্ততা সামলে
কেবল ফ্রি হয়েছে শাহাদত চৌধুরী। পরনে এখনো
সেনাবাহিনীর পোশাক। নেইম প্লেটে জ্বলজ্বল করছে
উনার নিক নেইম। পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে মাথায়
ক্যাপ। অন্যন্যা সময় মুখভঙ্গি কঠোরতা
বজায় থাকলেও এখন ঠোঁটে এঁটে আছে মুচকি হাসি।
কারণ উনি ফোনে কথা বলছে দুই মেয়ে ও
সহধর্মিনীর সঙ্গে। একে একে নিচ্ছে বাড়ির সব
সদস্যের খোঁজ।

স্বর্ণ,শীতলের বাবার সাথে কথা বলে চলে গেল। তারা
এখন বড় হয়েছে। অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে।
বাবা-মার পারসোনাল কথা থাকতে পারে ভেবে একটু

স্পেস দিলো আর কি! মেয়েরা চলে যাওয়ামাত্রই শাহাদত চৌধুরী সিমিনকে অপলক দেখে বললেন,-‘রাতে ঘুম হচ্ছে নাকি ঠিকঠাক?’

-‘হচ্ছে তো।’

-‘তুমি বরাবরই মিথ্যা বলায় কাঁচা সিমিন। কি হয়েছে, বলো আমায়?’

-‘মেয়ে দু’টোকে নিয়ে খুব চিন্তা হয়। ছোটো টা একটা কথাও শোনা না।

এত বড় বিপদ থেকে বেঁচে ফিরলো অথচ মনে ভয় ডর কিছু নেই। আগে যেমন সারা বাড়ি নেচেফুটে বেড়াতো এখনো তাই। মেয়ে বড় হচ্ছে। কিছু বলতে তো পারো?’

-‘ছোটো মানুষ কি বলব? ঠিক হয়ে যাবে।’

একথা শুনে সিমিন মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকালেন। অশ্রু লুকানোর বৃথা চেষ্টা আর কি! শাহাদত চৌধুরী বুঝলেন অন্য কিছু ঘটেছে। নয়তো সামান্য ব্যাপারে কান্নাকাটির করার মতো মেয়ে সিমিন নয়। উনি এবার হেসে বললেন,

-‘এখন কি গোলাপ নিয়ে মন ভালো করতে আসব, হুম?’

স্বামীর কথা শুনে সিমিন উঠে দরজা আঁটকে দিলেন।
এরপর ডুকরে কেঁদে ফেললেন। শাহাদত চৌধুরী
উনাকে সময় দিলেন। কারণ উনি খুব ভালো করেই
জানেন একটুপরে সিমিনই মুখ খুলবে। সত্যি সত্যি
সেটাই হলো। সিমিন আঁচলে চোখ মুছে কণ্ঠস্বর নিচু
করে বললেন,- ‘শুদ্ধ আর শীতলের মধ্যে কিছু একটা
চলছে।’

-‘ক্লিয়ার কার্ট কথা বলো।’

-‘ওরা বোধহয় দু’জন দু’জনকে পছন্দ করে।’

-‘এমন মনে হওয়ার কারণ?’

এবার সিমিন খুলে বলতে লাগল নিজের কানে শোনা
কিছু কথা। দুদিন আগে দুপুরে বিয়ের ব্যাপারে শুদ্ধ
শীতলের সব কথায় শুনেছেন তিনি।

শুদ্ধ আজকের ফ্ল্যাট ফিরবে এবং তারা বিয়ে করবে
একথাও সুস্পষ্ট।

বাড়িতে জানাজানি হলে সবাই কি মেনে নেবে? নাকি
এই নিয়ে বিরাট ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে? শীতল
নাহয় দুরন্ত, অবুজ, কিন্তু শুদ্ধ সে কিভাবে একাজ
করতে পারে? তার মতো বিচক্ষণ ছেলের থেকে
এসব আশা করা যায় না। একই বাড়িতে থাকে

তারা। ভাই-বোন। ভাই-বোনের মধ্যে এসব জানলে মানুষের কি বলবে? শুদ্ধ পুরুষ মানুষ তাকে হয়তো কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু শীতলের গায়ে কলঙ্ক লাগাতে কেউ কার্পন্য করবে না। নিজের কথা শেষ করে উনি পুনরায় কাঁদতে লাগল। অজানা ভয়ে দুদিন থেকে একেবারে মিইয়ে গেছেন তিনি। প্রেসার একদমই লো। শাহাদত চৌধুরী সিমিনের কথা শুনে জবাবে এমন একটা কথা বললেন যা শুনে সিমিন কথা হারিয়ে ফেললেন। বাকহারা হয়ে তাকিয়েই রইল। তখন শাহাদত চৌধুরী উনার বরাদ্দকৃত ফ্ল্যাটে লক খুলে ভেতরে প্রবেশ করলেন। বসলেন বিলাশবহুল সোফায়। তারপর এসির পাওয়া বাড়িয়ে বললেন,-‘আমি জানি।’

-‘কি জানো তুমি?’

-‘যা হচ্ছে পুরোটাই একটা প্ল্যান সিমিন। শুদ্ধ শীতলের উপর কেউ তীক্ষ্ণ নজরে রাখছে। তারা কোথায় যাচ্ছে, কি করছে, সবটাই নোট করছে। এমনকি তাদের হাতের ফোনটাও বর্তমানে অন্যের দখলে।’

-‘ফোন অন্যের দখলে মানে? কিছুক্ষণ আগেই তো শীতলের হাতে ফোন দেখলাম। ওটাই শুদ্ধ দিয়েছিল। যক্ষের ধনের মতো ফোনটাকে আগলে রাখে তোমার মেয়ে।’

-‘ যুগ আপডেট। এখন ঘরে বসে থেকে ইনকাম করা যেমন সহজ হয়ে গেছে। তেমনি ঘরে বসে অন্যের ক্ষতি করাটাও সহজ হয়ে গেছে। ফোন শীতলের হাতে। অথচ তার ফোন নং, ফেসবুক আইডি, হোয়াইস এ্যাপ, ইন্সটা সব অন্যের আয়ত্তে। কারো ক্ষোভের নজরে পড়েছে আমাদের সরল মেয়েটা। যা হচ্ছে এগুলো সব পরিকল্পনা মাফিক। তুমি টেনশন কোরো না। মোটকথা, যা ভাবছ সেসব হবে না। সম্ভবও নয়।’

-‘আমার মেয়েটা ছোটো শাহাদত। আবেগী। এ বয়সে মেয়েরা ভুল পথে পা বাড়ায়।’

-‘শীতল বয়সে ছোট অবুজ হলেও, শুদ্ধ তা নয়। শীতল যদি পাগলামি করেও শুদ্ধ তাকে কখনোই পাত্তা দেবে না। আমাদের শুদ্ধ সেরকম নয় সিমিন। তার পারসোনালি হাই লেভেলের। মানছি, শীতল শুদ্ধর সাপে নেউলে সম্পর্ক। কিন্তু হঠাৎ করে শুদ্ধ

এত পরিবর্তন দেখে সন্দেহ হলো না তোমার? যে ছেলেকে বোম মারলে বাড়তি কথা বলানো যায় না। সে এখন শীতলের সাথে তাল মিলিয়ে বকবক করে যায়। ছেলেটাকে অযথা ভুল বুঝো না।’

-‘হুম।’এদিকে স্যান্ডি লাফিয়ে উঠেছে লেপটপের সামনে থেকে। অবশেষে তার কষ্ট সফল। সে দ্রুত কল করল শুদ্ধকে। শুদ্ধ কল রিসিভ করলে স্যান্ডি প্রফুল্ল সুরে বলে উঠল,

-‘কালপ্রিটের আসল নাম ইয়াসির সিকদার। থাকে ঢাকাতেই। মাফিয়া। ধামকাদার খবর আবু সিদ্দিকের খুব কাছের কেউ।’তখন দুপুর একটা। বিরক্ত মুখে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে স্যান্ডি।

বিরক্তিতে চোখ, মুখ, কুঁচকে আছে তার। পাশের জনকে ইশারায় কিছু জিজ্ঞাসা করে গালি ছুঁড়ল নিজের ভাষায়। কোনোভাবেই কিছু হচ্ছে না।

এইদিকে শুদ্ধ জানিয়েছে দু’দিনের মধ্যে কাজ না হলে তার গফকে বলে দিবে সে আরেকটা নতুন গফ জুটিয়েছে। হা’রা’ম’জা’দা শুদ্ধ মুখে মুখেই

হুমকি দিয়েছে তা নয়, বিদেশী গফকে লিপকিস করার ভিডিওটা প্রমাণ হিসেবে রেখেছে তার

সেলফোনে। এটা যদি লিপা দেখে তার খবর করে
ছাড়বে। তার বাপ আবার পুলিশ। পুলিশের মেয়েকে
ঠকানোর কেসে চৌদ্দ শিকের ভাত কপালে নাচছে।
হঠাৎই বিপ বিপ শব্দে রেড এলাট

বাজতেই লেপটপের দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠেছে
সে। লোকেশন শো করছে। জায়গাটা ঢাকার মধ্যে।
লাল গোল মার্ক করার জায়গাটা একটা বাজার।
অবশেষে তার কষ্ট সফল। সে দ্রুত কল করল
শুদ্ধকে। খুশিতে তার মন বাকুম বাকুম করছে।
তিনবারের বেলায় শুদ্ধ কল রিসিভ করা মাত্রই স্যান্ডি
প্রফুল্ল সুরে বলে উঠল,-‘কালপ্রিটের আসল নাম
ইয়াসির সিকদার। থাকে ঢাকাতেই। মাফিয়া।
ধামাকাদার খবর আবু সিদ্দিকের খুব কাছের কেউ।’
শুদ্ধর ভ্রুঁজোড়া কুঁচকে গেল। আবু সিদ্দিক জড়িত সে
আগেই জেনেছে। এই সুযোগে প্রমাণসহ সাইনকে
দেখিয়েছে বিধায় সাইন দলও ছেড়েছে।

কিন্তু ইয়াসির? এই ছেলে কে? তার সাথেই বা
কিসের শত্রুতা? মাফিয়া? মাফিয়া এলো কোথা
থেকে? তার যতদূর মনে পড়ছে কোনো মাফিয়ার
সাথে চৌধুরীর বাড়ির কারো কোনো ঝামেলা হয় নি।

তবে? নাকি এটার পেছনেও অন্য গল্প রয়েছে। সে
আপাতত নিজের ভাবনার ছেদ ঘটিয়ে বলল,-‘সে
মাফিয়া কিভাবে জানলি?’

-‘যেই কোডটা পাঠিয়েছিলি ওটা দিয়ে এখন তার
ডিটেইলস্ শো করছে।’

-‘ছবি আছে?’

-‘আছে। শালারে দেখে আমিই ফিদা ভাই।’

-‘তার কাছে পৌছানোর উপায়?’

-‘জানাচ্ছি।’

-‘ওকে।’

একথা বলে স্যান্ডি কল কেটে পুনরায় কাজে লেগে
পড়ল। শুদ্ধর ফোনে পরপর নোটিফিকেশন এলো।
চেক করে দেখল একটি ছেলে। দেশী ও
বিদেশী সংমিশ্রনে তার মুখাবয়। তাকে একপলক
দেখে শুদ্ধ আধশোয়া হয়ে বিছানায় বসল। ব্যস্ত হাতে
ফোনে টুকটাক কি করতেই তার সামনে দেওয়াল
ভেদ করে একটি পর্দা তৈরি হলো। সেই পর্দায়
ভাসতে থাকল ইয়াসিরের ছবি এবং তার সম্পর্কে
নানান তথ্য। ইয়াসিরের জন্ম ইতালির

রাজধানী রোমে। তবে বড় হয়েছে সুইডেনে। তার বাবা বাঙ্গালী হলেও মা বিদেশী। তাদের দু'জনের সংমিশ্রনে ইয়াসির। ভাই-বোন আছে কি না তা জানা যায় নি। শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কেও কিছু বলা নেই। তার বাবা মা কোথায়? সে কেন মাফিয়া হলো এসব অজানা। তবে সব কথার এক কথা সে বর্তমানে সুইডেনের নামকরা মাফিয়। বিশাল বড় গ্যাং রয়েছে তার। তবে এ অবধি তাকে কেউ দেখে নি। সে দেখতে কালো নাকি ফর্সা, লম্বা নাকি খাঁটো তাও জানে না কেউ। তবে সংবাদ মাধ্যমে জানা গেছে, ইয়াসির শিকদার খুব সাধারণ পোশাক, সাধারণ বেশে চলাফেরা করে। অথচ ছেলে হয়েও তার প্রকৃত রূপ চোখ ধাঁধানো। তথ্য অনুযায়ী এইটুকু পড়ে শুদ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার ছবিটা জুম করে দেখল। ছবিতে দেখা যাচ্ছে

ইয়াসিরের ঠিক সামনাসামনি 9×19 মিলিমিটার পারাবেলাম, M1911, CZ -75, সিহর্স এসই, পেলিকান 1200, এমটিএম দ্বৈত ও প্লানো 1404 মডেলের পিস্তল। এত পিস্তল দেখেও তার ঠোঁটে হাসি নেই। ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে সেগুলোর

দিকে। তার একহাতে কারুকাজ করা খচিত রক্ত
মাখানো ছুরি। শুদ্ধ ছবিটা আর একটু জুম করে
দেখল ইয়াসিরের পেছন সাইড। এরপরই সে হো হো
করে হেসে উঠল। কারণ তার ধারণা

সঠিক। ইয়াসিরের নাম ইয়াসির হলেও ছবি মানুষটা
ইয়াসির নয়। এই ছবিটা কোনো এক অ্যাকশন মুভির
তামিল নায়ক। শ্যুটিং সেটে ছবিটি

তোলা। মোদাকথা, কোনো মাফিয়া এভাবে শো অফ
করবে না। তারা যেসব কাজে যুক্ত যত পারে
নিজেদের আড়ালে রাখবে নয়তো তাদের ভয়ংকর
কাজ সর্বসম্মুখে চলে আসার সম্ভবনা থাকে। ইয়াসির
যদি এটা নাহয় তবে সে কে? কেনই বা সে নিজেকে
এভাবে পুরো পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছে? এমন
নানান জটিল প্রশ্নের গোলকধাঁধায় সমাধা পেল না
শুদ্ধ। তবে বুঝল এখানে অন্য ঘাপলা আছে। যেটা
ধরতে পারছে না সে।

হতে পারে ইয়াসিরের নামটাও ফেইক। এমনও হতে
পারে এই ইয়াসিরই তাদেরই চেনা জানা আপন
কেউ। মরার পাখনা গজিয়েছে বলে এভাবে
লুকোচুরিতে নেমেছে। শুদ্ধ দুই পা নাচাতে নাচাতে

কিছু একটা ভেবে ফিচেল হাসল। এই হাসির মানে কি? কি চলছে তার মনে? এই প্রশ্নের উত্তর জানা গেল না। যাবেও না যতক্ষণ না সে নিজে থেকে কাউকে কিছু জানায়। ঘড়ির কাঁটা তখন টিকটিক করে চলছে নিজ নিয়মে। রুমের এককোণে রাখা ট্রলিটা টেনে সে সবকিছু গুছিয়ে নিলো। আর ঘন্টা খানিক পরেই তার ফ্লাইট। যেসব কাজের জন্য তাকে ডাকা হয়েছিল সেসব কাজ শেষ। ফাইনাল রেজাল্ট জানা যাবে তিনমাস পর। ড্রয়িংরুম থেকে অর্ক, হাসান আর কামরানের কথা শোনা যাচ্ছে। দেশে ফেরার আনন্দে তারা ছোটো বাচ্চাদের মতো খুশিতে ডগমগ করছে। একটু পর পর পঁচাচ্ছে হাসানকে। হাসান নিজেও বন্ধুদের সাথে তাল মিলাচ্ছে। তার মনটা বেশ ভালো। যতটা মন খারাপ নিয়ে দেশ ছেড়েছিল এখন ডাবল খুশি নিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছে। শুদ্ধর পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোচ্ছে সে। একটু টাইট দেওয়াতে বউটা মিনমিন করছে। যে মেয়ে ভুল করেও কল/মেসেজ দেয় না সে প্রতি ঘন্টায় খোঁজ নিচ্ছে। এদিকে শুদ্ধ বড় স্যারের সাথে কথা বলে কিছু ব্যাপারে আলোচনা সেরে নিলো। প্রয়োজনীয় সবকিছু

ঠিক আছে কি না চেক করল। এরপর সময় হয়ে
এলে সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল এয়ারপোর্টের
দিকে। যেতে যেতে

কত গল্প, হাসাহাসি, আড্ডা হলো। টুকটাক
ফর্মালিটিজ পূরণ করে ঠিক সময়ে প্লেন উড়তে শুরু
করল। সবার মনে তখন আপন দেশের মা, মাটি
ছোঁয়ার অপেক্ষায়।

শুদ্ধ দেশে ফিরছে কাউকে জানায় নি। সেদিন তার
রুমে লাস্ট শীতলের সাথে কথা হয়েছিল। এরপর
শীতলের ফোন সায়নের কাছে বিধায় আর কথা বলার
সুযোগ মিলে নি। তবে সে অবগত শীতল তার দেশে
ফেরার কথা শুনে সেদিনই ফুপির বাসায় চলে গেছে।
বোকা মেয়েটা সত্যি সত্যি ভেবেছিল তাকে বিয়ে
করার জন্য দেশে ফেরার কথা বলেছিল। তা হয়
নাকি? তারা একই বাড়িতে জন্ম, এক সাথে বেড়ে
ওঠা, লোক সমাজেও পরিচিত ভাই-বোন হিসেবে।
মোদাকথা, দু'জনের কারো মনে কারোরই জন্য অন্য
কোনো ফিলিংস নেই। যদি থাকত তাহলে নাহয় ভাবা
যেতো। এইটুকু ভেবে শুদ্ধ নিজেই হতবাক হয়ে গেল,
আসলেই কি ভাবা যেতো?

বোধহয় যেতো না। এর বিশেষ কারণ সায়ন ও স্বর্ণ।
সে তাদের কথা সব জানে। তারা দু'জন দু'জনকে যে
পাগলের মতো ভালোবাসে তাও জানে। সায়ন চালাক
আর স্বর্ণ মুখচোরা বলে বাসার কেউ এতদিন খেয়াল
করে নি। করবে না তাও কিন্তু নয়। আজ অথবা কাল
তাদের কথা বাড়িশুদ্ধ সবাই জানবে। শাহাদত চৌধুরী
কিভাবে নেবে ব্যাপারটা জানা নেই তবে ভিলেন হবে
শারফাত চৌধুরী নিজে। উনি কখনো স্বর্ণের সাথে
সায়নের বিয়ে হতে দেবে না। যদিও দেয় তবে
রাজনীতি ছাড়ার শর্তে দেবে। যেটা সায়ন কখনো
মানবে না। আর এসব নিয়ে একটা ঝামেলা হবে
বলারও অপেক্ষা রাখে না।

যদিও ঝড় ঝাপ্টা সময়ের সাথে সাথে ঠিকঠাক হয়ে
তাদের বিয়েও হবে। সংসার হবে। সায়ন স্বর্ণকে
মেনেও নেবে। কিন্তু ভুলক্রমে যদি তার সঙ্গে
শীতলের কিছু হয়ও তাদের বাড়ির কেউ মানবে না।
কারণ এটা হয় না।

লোক সমাজ বলেও কিছু আছে। যদি তাদের দুই
ভাইয়ের সাথে স্বর্ণ ও শীতল জড়িয়ে যায়ও তখন
আপনাআপনিই খারাপ বদনাম রটে যাবে। একই বাড়ি,

একই পরিবারে থেকে একই ঘটনা, যেগুলো শুনতেও
বিশ্রী লাগবে।

তাছাড়া পুরুষ মানুষ কলঙ্ক দাতা তবুও তাদের গায়ে
কলঙ্ক লাগে না। যা লাগে সবটাই মেয়েদের গায়ে।
তখন দেখা যাবে সাইন স্বর্ণ বেঁচে গেলেও একই
ঘটনা ঘটায় শীতলের গায়ে তার নামের কলঙ্ক লেপ্টে
যাবে। বাজে কথা রটানো হবে। চৌধুরী বাড়ির শিক্ষা
নিয়ে কথা উঠবে। এগুলো হবে জানা সত্ত্বেও এসবে
জড়ানো ঠিক হবে না। কারণ বাড়ির সদস্যকে নিয়ে
ওর একটা পরিবার। আর পরিবারের দিকে কেউ
কাঁদা ছুঁড়াছুড়ি করলে সহ্য করতে পারবে না। বলা
বাহুল্য, শীতল, শখ, স্বর্ণের মতো ধীর, শান্ত, স্বভাবের
নয়। যদি হতোও তাহলে তাকে শাসন করা লাগত
না। আর না মার, ধমকের উপর রাখতে হতো। কিন্তু
প্রকৃতপক্ষে শীতল হয়েছে খুবই

দুষ্ট। চঞ্চলতা তার রন্ধে রন্ধে। তাকে ছাড়া কাউকেই
ভয় করে না। বারণ শুনে না। তার উপরে তার আর্মি
বাবাকে কাছে পায় না দেখে শারফাত চৌধুরী একটু
বেশিই লায় পায়। প্রশয় পায়। এইটুকুতেই মেয়েটা
সাপের পাঁচ পা দেখে। এবং আবদার না মেটানো

অবধি ওর জেদে অটল থাকে। এজন্য একটু আধটু
শাষণ করে এই যা। তারমানে এই না সে শীতলকে
ভালোবেসে হাবুডুবু খাচ্ছে। শাষনের আড়ালে
ভালোবাসা চুইয়ে চুইয়ে

পড়ছে। এসব করতে বয়েই গেছে তার। শীতল
ভালোবাসলে তার দিন যাবে ভালোবাসার সংজ্ঞা
বোঝাতে বোঝাতে। বোঝানো পরও তার প্রশ্ন হতে
পারে, ‘ভালোবাসলে কি হয় শুদ্ধ ভাই? ধরুন আমি
বাসলাম না তো তাতে কি বাংলাদেশ এতিম হয়ে
যাবে?’ এসব পাগলের সাথে পাগলামি

করার বয়স তার নেই। এসব ভাবতে ভাবতে শুদ্ধর
ঠোঁটের কোণে হাসি খেলে গেল। গতদিন তার ফোনে
শখের নাম্বার থেকে বড় একটা লিস্ট এসেছে।
সবগুলো মেয়েদের সাজগোজের জিনিস। নামগুলো
মন রাখা কঠিন। এক একটা নাম পড়ে মনে হয়েছে
এর থেকে জীবাণুর নাম মনে রাখা সহজ। অন্তত
কাজে দিবে। মোটকথা, শখ কখনো এসব মেয়েলি
হাজিবাজি আনার কথা তাকে বলবে না। একাজ কার
বুঝতে একটুও কষ্ট হয় নি তার। এসব নানান কথা
ভাবতে ভাবতে শুদ্ধ শরীর এলিয়ে চোখজোড়া বন্ধ

করে নিলো। অতঃপর লং জার্নি পার করে যথাসময়ে
দেশের মাটিতে পা রাখল। এরপর বন্ধুরা একে
অপরের থেকে বিদায়

উবার নিয়ে বাসার পথে রওনা হলো। গলা ছেড়ে গান
গাইতে গাইতে ধারালো একটা করাত কিনে
গুদামঘরে ঢুকল আজম। অন্যহাতে প্যাকেট মোড়া
টাকিলা। আজকের আসর সেই জমবে। টাকিলা
গলায় ঢালতে ঢালতে করাতের কাজ সারবে। বহুদিন
টাকিলার স্বাদ নেওয়া হয় না। শাহরিয়ার ভাইকে
সাহস করে সে বলতেও পারে না একটা টাকিলা
কিনে দিতে। গতকাল রাতে শাহরিয়ার ভাইপার্টি
অফিস রুমে তাকে ডেকে হঠাৎ শুধাল,
-‘বিদেশি ব্যান্ড নাকি খাঁটি বাংলা?’

আজম কথার মানে বুঝতে না পেরে মুখ কাঁচুমাচু
করছিল। সাহস করে জিজ্ঞাসাও করতে পারতে
পারছিল না। পরে চট করে কথাটা ধরে ফেলে
দাঁত বের করে হাসল। ধরে নিলো ভাইয়ের মন
ভালো। কারণ মন ভালো থাকলে ভাই সবাইকে নিয়ে
আড্ডা দেয়, মজা করে, নিজের খরচে ব্যান্ড চাখার
সুযোগ দেয়। আজও হয়তো সেই দিন বোধহয়। মনে

মনে এসবই ভাবছিল সে। খুশিতে ছলমল করছিল তার মুখ, চোখ। তখন সায়ন দশ আগুলের সাহায্য আগুল ফুটাতে ফুটাতে বলল,

-‘ ভোঁতা জং ধরা করাত আনবি। এরপর ভোঁতা করাত দিয়ে ধীরে সুস্থে এবড়ো-থেবড়ো করে ওদের চার হাত-পা কাটবি। ভুলেও যেন কাটাকাটি স্মুথ নাহয়। আর হ্যাঁ, পাঁচজন ওরা। $5 \times 8 = 20$ হয়। মোট ২০ টা হাত পা চটের বস্তায় ভরে ঠিক সকাল দশটার মধ্যে আমার সামনে এনে হাজির করবি। যদি দশটা এক’ও বাজে তাহলে তোকেও ওই অবস্থা দান করব।’-‘ওকে ভাই।’

-‘ আর হ্যাঁ, চেয়ারে বেঁধে কাটবি। জ্যান্ত অবস্থায়।’

-‘ঠিক আছে ভাই।’

-‘সিদ্ধিকের দিকে নজর রাখতে বলেছিলাম।’

-‘ রেখেছি। সে এখন পাগলা কুকুরের মতো দৌড়ে বেড়াচ্ছে। ক্ষমতার লোভে বউটাকেও অন্যের বিছানায় পাঠায়। সব খবর আছে ভাই। ইশারা করামাত্রই সব ভাইরাল করে দেবো।’

-‘ভ্রম।’

-‘কনকের বোনকে রেপ করেছে কে?’

-‘জানি না ভাই। তবে কনক কাল আপনার নামে পুলিশ কেস করেছে। তার মতে, পুরনো শত্রুতার জের ধরে আপনিই একাজ করেছেন।’

-‘আমি বুঝি না, কনক আমার মারা খেতে এত লাইক করে ক্যান। একা একা আর কতজনকে মারা দেবো আমি? আমিও তো মানুষ। এনার্জি বলেও একটা ব্যপার আছে। সিদ্ধিক যে এত আদর যত্ন করে ওর পেছন মারা দিলো। অথচ সে ওদিক ওদিক তাকিয়ে সত্যিটা না জেনে সমানে আমার নামই জপে যাচ্ছে। শালায় সত্যি সত্যিই আমারে টুরু লাভ মারে। আমিই খালি এসব বালছাল কিছু বুঝি না তাই।’ আজম মুখ টিপে হাসল। সায়েন তখন এক বাউল টাকা টেবিলের উপর রেখে নিতে ইশারা করল। সে নিলো। এরপর দলবেঁধে টাকিলা নিয়ে চলে এলো ডালের গুদামঘরে। এখানে আজ কাজ আছে মেলা। সব সারতে হবে। ভাই ওদেরকে খুশি করেছে তাই তারাও ভেবেছে সকাল দশটা নয়, রাত দশটার আগেই কাজ সেরে ফেলবে। এসব নিয়ে আলোচনা করতে করতে তারা গলায় টাকিলা ঢেলে লেগে গেল আদেশকৃত

কাজে। তাদের দেখে ছটফট করতে লাগল পাঁচজন
যুবক। বাইরে থেকে মনে হবে কেউ

গুদামঘরে রড কাটার কাজ করছে। নতুবা পুনরায়
তা মেরামতের কাজ করছে। আসলে সেসব কিছুই
না। তারা একপাশে গ্রিল মেশিন অন করে অন্য
পাশে জ্যান্ত মানুষের হাত পা কাটছে। পরেরদিন
সকাল দশটা,

দরজায় কড়া নাড়ছে পবিত্র মাহে রমজান মাস।
পরশুদিন থেকে রোজা শুরু। রোজা উপলক্ষ্যে বাজার
সদাইয়ের লিস্ট করতে বসেছে সিঁতারা। উনাকে
সাহায্য করছে সিরাত ও সিমিন। তিন জন মিলে বড়
লিস্ট করে ধরিয়ে দিলেন সাওয়ান চৌধুরীর হাতে।
সাওয়ান চৌধুরী যেতে গেলে চট করে উনার পথ
আগলে ধরল সাম্য, সজুন। জেদ ধরল তারা বাবার
সাথে যাবে। বাজার করে বাড়ি আনবে। তারা বড়
হয়েছে কাজ করতে পারবে। সায়ন, শুদ্ধ ভাইয়ের
মতো তারা এবার দায়িত্ব নেবে। সেই দায়িত্ব পালন
করবে। সাওয়ান চৌধুরী বোঝাতে পারলেন না এ সময়
বাজারে খুব ভিড় থাকে। প্রচন্ড গরম। এত গরমে
শরীর খারাপ করবে। অন্য আরেকদিন বাজার করতে

নিয়ে যাবেন। কিন্তু না তারা শুনলোই না। অগত্যা
জেদের কাছে হার মেনে তাদের নিয়ে যেতেই হলো।
শারাগাত চৌধুরী বারবার গাড়িতে করে যেতে
বললেন। কিন্তু সাম্য, সৃজন এবারও গো ধরল তারা
রিকশায় যাবে। দুই ছেলের কথামতো সাওয়ান
চৌধুরী তাদের নিয়ে রিকশায় চড়ে বসলেন। পাড়ার
মোড় পার হতেই দেখা গেল সায়ন দাঁড়িয়ে আছে
পার্টি অফিসের সামনে। ছেলেপুলে নিয়ে কোথাও
যাচ্ছে বোধহয়। কানে ফোন ধরে কথা বলায় ডাকল
না কেউ। বাপ, ছেলেরা মিলে গল্পে গল্পে এগিয়ে
গেলেন বাজারের দিকে।

আজ সরকারী ছুটির দিন। শখ, স্বর্ণ, শীতল কেউ
দুদিন বাসায় ছিল ন। শতরূপা চৌধুরীর বাসায়
বেড়াতে গিয়েছিল ওরা। কিছুক্ষণ হলো বাসায় ফিরে
ফ্রেশ হতে গেছে। দুদিন আগে শীতল হঠাৎই গোঁ
ধরল সে ফুপির বাসায় যাবে। বলামাত্রই ব্যাগ প্যাক
নিয়ে রেডি। মূলত শুদ্ধ আসার কথা শুনে সে দ্রুত
পালানোর পায়তারা জুড়েছিল। পরে তাকে একা না
ছেড়ে শখ, স্বর্ণ ওর সাথে গিয়েছিল। দুটো দিন থেকে
যখন শুনল শুদ্ধ ফিরতে আরো দেরি হবে তখনই

বাসায় ফিরে এসেছে। আপদ এখন বাসায় নেই, আসতে দেরি হবে, একথা ভেবে শীতলের প্রাণবন্তরূপটা ফিরে এসেছে। এখন ক’দিন ইচ্ছে মতো ঘুরবে, ফিরবে। কিয়ারার সাথেও কথা হয়েছে আজ শপিংমলে যাবে দু’জন। দেখে আসবে এবারের ইদে কোন ড্রেসের চাহিদা বেশি। কোন, কোন কালারটা ক্রেতারা পছন্দ করছে। রোজা শুরু হতে না হতেই তার ড্রেস নিয়ে চিন্তিত। এই নিয়ে সিমিনের কানের কাছে কিছুক্ষণ ঘ্যান ঘ্যান করে বকা খেয়ে তারপর থেমেছে।

হাতের কাজ সেরে সিঁতারা চৌধুরীর মনে পড়ল সকালের ওষুধটা খেতে ভুলে গেছেন। রুমে ড্রেসিংটেবিলের সামনেই রাখা উনার ওষুধের পাতা। যেতেও ইচ্ছে করছে না। উনার সোফায় বসে দেখলেন শীতলকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এসেছে। তাই তাকে বললেন,-‘শীতল, আমার রুম থেকে ওষুধের পাতাটা এনে দে তো মা।’

-‘কোন ওষুধের পাতা বড় মা?’

-‘সাদা পাতা।’

-‘কোথায় আছে?’

-‘ড্রেসিংটেবিলের উপর।’

-‘আচ্ছা।’

একথা বলে সে চলে গেল গেল বড় মায়ের ঘরে।
সামনে রাখা ওষুধের পাতা। সে সেটা নিয়ে বের
হতেই চোখ পড়ল একটা এ্যালবামের দিকে।

এটা চিনে সে। দেখেছেও বহুবার। তবুও বড়সড়
এ্যালবামটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলো রুম থেকে।
এখানে বড় মা, বড় আব্বুর, বিয়ের সব ছবি আছে।
আছে তাদের সব ভাইবোনদের ছোটোবেলার স্মৃতি।
দাদা-দাদীর ছবিও আছে। সে বড় মাকে ওষুধটা দিয়ে
সোফায় হাঁটু মুড়ে ছবি দেখতে বসল। আগেও
দেখেছে তবুও বারবার দেখতে ভালোই লাগে।
হাসাহাসি হয়। ততক্ষণে সিঁতারা সরে এসে বসেছে
তার পাশে। উনিও দৃষ্টি দিয়েছে

এই দিকেই। এক একটা ছবি মনে করিয়ে দিচ্ছে
একটা একটা মুহূর্তের কথা। গল্পে গল্পে শীতলকে
সেসব গল্প শুনাতেনও। শীতল মন দিয়ে তা শুনছে।
কখনো খিলখিল করে উচ্চযোগে হেসে উঠছে। তার
সঙ্গে তাল মিলাচ্ছেন সিঁতারাও। তখন কলিংবেশ বেজে
উঠল। সিমিন এদিকেই আসছিলেন দেখে উনিই

দরজা খুলে দিলেন। দরজা খুলে কারো সাথে কথা
বলছে মানে পরিচিত কেউই হবে ভেবে সিঁতারা
কিংবা শীতল কেউ পাত্তা দিলো না। নিজেরা
নিজেদের গল্পে মেতে থাকল। তখন শীতল একটা
ছবির দিকে তাকিয়ে ডাকল,

-‘বড় মা?’

-‘হুম।’

-‘কলেজে থাকাকালীন শুদ্ধ ভাই হাবাগোবা টাইপের
ছিল, তাই না?’

-‘মোটোও না। আমার ছেলের চোখ, নাক, মুখ,
ঠোঁটের আর্ট দেখেছিস?’

-‘হুম দেখেছি, পুরাই দেশি হাম্মা টাইপের।’

-‘কিহ্! আমার ছেলের চোখ, মুখ, হাম্মা টাইপের?’

-‘হুম, কেন তুমি জানতে না? এই দেখো, শুদ্ধ
ভাইয়ের এই ছবিতে গরু গরু চোখ গুলো ভালো
করে দেখো। মোটা, চওড়া, করে কাজল দিয়ে দিলে
পুরাই দেশি গরু।’তখন পাশে কাউকে বসতে দেখে
দু’জনই তাকাতেই দেখে ক্লান্ত শরীরে শুদ্ধ এসে
বসেছে। শীতল চোখ সরিয়ে ছবির দিকে তাকিয়ে

আড়চোখে আরেকবার তাকাল শুদ্ধর দিকে। শুনে
নিলো নাকি? মার না খেতে হয়!

তবে হাবাগোবাটা আর হাবাগোবা নেই, সুদর্শন
পুরুষে পরিণত হয়েছে।

মুখে যত যায় বলুক বিশুদ্ধ পুরুষের পুরুষালি চোখ
গুলো অদ্ভুত সুন্দর। চোখ, মুখের আর্ট সত্যিই মুগ্ধ
করার। প্রশস্ত বুক। মাথাভর্তি চুলে নিউ হেয়ার কাট।
লম্বায় কত হতে পারে? সঠিকটা জানা নেই তবে
অনেকটাই লম্বা। তাকে চোখ তুলে উপরে তাকিয়ে
কথা বলতে হয়। যদিও চৌধুরীরা সবাই উচ্চতায়
এমন। সে আর তাকাল না আর না আগ বাড়িয়ে
কোনো কথা বলল। দেখা যাবে কিছু বলতে গেলে
ত্যাঁড়াব্যঁকা কথা বলে বসে থাকবে।

সিতারা ছেলেকে দেখে চট করে একগ্লাস পানি
এগিয়ে দিলেন। কুশল বিনিময় করলেন। সিরাত,
সিমিন তাকে ক্লান্ত দেখে ফ্রেশ হয়ে খাওয়ার তাড়া
দিলেন। শীতল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল তার মা
চাচীদের ব্যস্ততা। কিছুক্ষণ আগে তারাও দুদিন পর
তো বাড়ি এলো। কই কেউ তো এমন করল না।
অথচ বিশুদ্ধ পুরুষের কদর দেখো। সে মুখটা বাঁকিয়ে

একটা খোঁচা মেরেই দিলো,-‘ যান, যান, ফ্রেশ হয়ে
খেয়ে নিন শুদ্ধ ভাই। রাজ্য জয় করে ফিরেছেন কত
ধকল গেছে। একটু বিশ্রাম না নিলে হয়? তাছাড়া
মেয়ে মানুষের সাথে আকাশে আকাশে উড়াউড়ি করা
কি চারটে খানি কথা নাকি?’

একথা শুনে শুদ্ধ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। বাড়ি আসতে
না আসতেই খোঁচা মারা শুরু। এরপর শুরু করবে
জ্বালাতন করা। ফলস্বরূপ তার শক্তহাতে মার খেয়ে
এরপর যদি থামে। তাকে তাকাতে দেখে শীতল উঠে
সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে পুনরায় শুনিয়ে শুনিয়ে
বলল,-‘মানুষ রাজ্য জয় করে আসে। অনেক অনেক
টাকা ইনকাম করে। অথচ কাউকে কিছু দিয়ে
আফসোস করে সেটা আবার কেড়েও নেয়। হায়রে
দুনিয়া। পৃথিবীতে মানবিকতা বলে কিছু নেই। আল্লাহ
এসব জল্পাদদের তৌফিক দান করো। রমজানের
উসিলায় এদের মনে মায়া দাও, আমিন!’আজ প্রায়’ই
দু’দিন হলো আহনাফের সঙ্গে কোনোভাবে যোগাযোগ
করা যাচ্ছে না। ফোন বন্ধ। মাঝে মাঝে কল ঢুকলেও
কল রিসিভ করছে না সে। আর না নিজের
অবস্থানের কথা জানাচ্ছে। একমাত্র ছেলের খোঁজ

নিতে না পেরে আহনাফের বাবা-মা অস্থির হয়ে
উঠেছে। পরিচিত যাদের জানে/চিনে তাদের থেকেও
খোঁজ পান নি তারা। অগত্যা ভেবেই নিয়েছে
শখের সাথে বোধহয় কিছু হয়েছে। নয়তো বলা নেই,
কওয়া নেই, এভাবে

যোগাযোগ বন্ধ করার কারণ কি? এসব ভেবেই
উনারা রওনা দিয়েছেন

চৌধুরী বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে। সরাসরি কথা বলা
দরকার। ছোট ছোট সমস্যাগুলোই একটা সময় বিরাট
আকার ধারণ করে। মোটকথা, মাত্রই কদিন হলো
ওদের এনগেজমেন্ট হয়েছে, এরমধ্যে কি এমন হলো
যে সে যোগাযোগ করা বন্ধ করে দিলো। কই
আহনাফ তো এতদিন এমন কিছু করে নি। হ্যাঁ
বহুবার রাগ করেছে কিন্তু এভাবে একেবারেই লাপাত্তা
হয়ে যায় নি। অর্থাৎ বুঝতে হবে ঘটনা অন্যকিছু।
তবে অন্যকিছুটা কি গিয়েই নাহয় জানা যাবে।

এদিকে এতকিছু ঘটে যাচ্ছে অথচ শখ কিছুই জানে
না। জানবে কিভাবে

রুমে ফোন রেখে ভাই-বোনদের সঙ্গে বাগানে এসেছে
সে। শশুড়-শাশুড়ি ননদ একের পর এক কল করেই

যাচ্ছে ক্ষুণাক্ষরেও টের পায় নি। ফোন সাইলেন্ট থাকায় আশেপাশের কারোর কানে পৌঁছায় নি ফোনের টোন।

দুপুরে খেয়ে বই পড়তে পড়তেই ঘুমিয়েছিল একটু। বিকেলে ফ্রেশ হয়ে একটা বই হাতে নিতেই সাম্য, সৃজন টেনে বাগানে এনেছে। শীতল নাকি ডাকছে। এসে দেখে শীতল গাছে উঠে বসে আছে। স্বর্ণও ঘাসের উপর বসে আছে। দেখে মনে হচ্ছে তাকেও জোর করে ঘুম থেকে টেনে তোলা হয়েছে। শখ স্বর্ণের দিকে একবার তাকিয়ে উপরে তাকাল। শীতল মগ ডালে বসে পা দুলাতে দুলাতে পেঁয়ারা খাচ্ছিল। ওড়না কোমরে পেঁচিয়ে রাখা। শখ তাকে দেখে নিজেও ঘাসের উপর বসল। শীতল তখন চারটা পেঁয়ারা ছুঁড়ে দিলো ভাইবোনের দিকে। সাম্য, সৃজন, শখ, স্বর্ণও কামড় বসাল ডাসা ডাসা পেয়ারায়। লাল পেয়ারা। খেতে খুবই মজা। পেয়ারায় কামড় বসিয়ে কিছু একটা ভেবে শীতল শখকে ডাকল,

-‘আপু?’

-‘ভূম।’

-‘তোমার হবু শশুড়ের এন্টিনায় সমস্যা আছে নাকি?’

ছোটো বোনের মুখে হবু শশুড়ের নামে একথা শুনে
ভাবাচ্যাকা খেয়ে গেল শখ। পেয়ারা চিবানো থামিয়ে
চোখ তুলে তাকাল দাঁত বের হাসা শীতলের দিকে।
বোনকে তাকাতে দেখে শীতল সাহস পেল। সে
বুকভরে দীর্ঘশ্বাস টেনে বলল,-‘আমার মনে হয়
সমস্যা আছে।’

-‘ছিঃ! ছিঃ! এসব কি বলছিস শীতল! এসব বলতে
নেই।’

-‘তুমিই বলো সমস্যা না থাকলে ভাইয়ার একটা
ছোটো ভাই ডাউনলোড করল না কেন? করলে
তোমার সাথে আমিও ওই বাড়িতে আস্তানা গেড়ে
বসতে পারতাম।’

শখ বিষ্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে। এই পাঁজিটা কিসের
বলে? বোনের মুখ দেখে শীতলের পেট ফেটে হাসি
পেল। কিন্তু হাসল না। বরং শখকে আর একটু
ভড়কে দিতে বলল,

-‘তোমার শশুড়কে ফোন দিয়ে বলো তো আরেকটা
ছেলে ডাউনলোড দিতে। কাজকর্ম যা করার এখন
থেকেই শুরু করতে বলো। কানা, বোঁচা যেমনই হোক
ছেলে হলেই হবে। দাও, দাও, এন্ফুণি ফোন দাও।’

এমনিতে অনেক দেরি হয়েছে তাছাড়া শুভ কাজে দেরি করতে নেই।’

একথা বলে শীতল থামতেই সাম্য গেটের দিকে উঁকিঝুঁকি মেরে একটা সাদা গাড়ি বাড়ির মধ্যে আসছে দেখে বলল,-‘শীতল আপু গাছ থেকে নামো। শুদ্ধ ভাই কিন্তু বাসাতেই আছে। তোমার জন্য আমাদেরকেও না পানিশমেন্ট পেতে হয়।’

-‘এ্যাই! এ্যাই বে’য়া’দ’ব আমি তোর শুদ্ধ ভাইকে ভয় পাই? জানিস, তোর পিয়ারের শুদ্ধ ভাই আমাকে ভয় পায়, এই আমাকে, এই শীতলকে ভয় পায় ওই শোয়াইব শুদ্ধ ভাই।’

-‘যাহ্! ঢপ মারার আর জায়গা পাও না?’

-‘আমি ঢপ মারছি? আমি? প্রমাণ দিবো দেখবি?’

-‘ভুম দেখব।’

-‘ঠিক আছে। আগামী লাল শুক্রবারেই প্রমাণ দেবো তখনই মিলিয়ে নিস

আমার কথা। এই শীতল মিথ্যা বলে না রে পাগলা, বলে না।’

-‘ঠিক আছে।’

শখকে পঁচিয়ে শীতল এবার স্বর্ণকে বলল,

-‘আপু, তিন রাস্তার মোড়ে বড় একটা কসমেটিকের দোকান আছে না?

ওই দোকানের মালিকের ছেলেটার নাম রিহান। সে তোমাকে খুব পছন্দ করে। কিন্তু ভয়ে বলতে পারে না। সে আমাকে দু’ডজন চুড়ি ঘুষ দিয়েছে তোমাকে কথাটা জানানোর জন্য।’-‘ওহ।’

-‘সে আরো বলেছে আমি তাকে দুলাভাই ডাকলে আরো অনেক কিছু দিবে।’

-‘ডেকেছিস?’

-‘না।’

-‘কেন?’

-‘তুমি পারমিশন দিলে ডাকব।’

-‘দুলাভাই হিসেবে তাকে পছন্দ হয়েছে?’

-‘না।’

-‘কেন?’

-‘ব্যাটার দাঁত হলুদ। দেখলে মনে হয় বারো মাস জন্ডিসে ভুগে। আহনাফ ভাইয়ের মতো স্মার্ট না। কিন্তু আমার মতো কিউট মেয়ের দুলাভাই হতে হবে স্মার্ট, হ্যান্ডসাম, চকলেট বয় টাইপ। নয়তো সমাজে মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না।’

-‘তাহলে কি ক্যাসেল?’

-‘হুম।’

-‘তাহলে চুরিগুলো ফেরত দিয়ে বলে দিস আগে দাঁতের চিকিৎসা করতে তারপর তোকে শালি বানানোর চিন্তা করতে।’

-‘ওকে।’এভাবে কথায় কথায় গল্পে গল্পে ভাই-বোনরা মিলে দুষ্টুমি করতে লাগল।

তখন সেখানে নিঃশব্দে শুদ্ধ উপস্থিত হলো। তাকে দেখামাত্র সবাই চুপ।

শীতল পাতার আড়ালে নিজেকে লুকানোর চেষ্টায়। শুদ্ধ সব ক’টার মুখ দেখে জানাল আহনাফের বাবা মা এসেছে। ভদ্রভাবে সবাই গিয়ে যেন দেখা করে, কথা বলে। অহেতুক হি হি করলে একেক টাকে মেরে গাছে ঝুলিয়ে রাখবে। ভাইয়ের কথা শুনে স্বর্ণ, শখ, সাম্য, সৃজন ভদ্র বাচ্চার মতো ধীরে সুস্থে হেঁটে বাড়ির দিকে গেল। এবার শুদ্ধ মুখ তুলে তাকাল পাতার আড়ালে থাকা শীতলের দিকে। বুঝতে বাকি নেই সে ধরা পড়ে গেছে। তাই শীতল বোকা বোকা হাসল। হেসে হেসে বলল,

-‘কতদিন পর আপনাকে দেখলাম শুদ্ধ ভাই। এত শুকিয়ে গেছেন কেন?’

-‘মেয়েদের সাথে উড়াউড়ি করা চারটেখানি কথা না, তাই না?’

-‘হে, হে, কথাটা চেনা চেনা লাগছে। কোথায় যেন শুনেছিলাম। তা কেমন চলছে আপনার উড়াউড়ি?’

-‘ভালোই।’

-‘দোয়া করি যেন ভালোই যায়।’

-‘ভূম।’ একথা বলতে বলতে শুদ্ধ বাগানের এক কোণে কেটে রাখা বরই গাছের বড় বড় দুটো ডাল টেনে এনে রাখল পেয়ারা গাছের গোড়ায়। শুকনো ডাল কাঁটায় ভরে আছে। তাকে গাছের গোড়ায় ডাল রাখতে দেখে এবার শীতল আর্তনাদ করে উঠল,

-‘এ কি করলেন শুদ্ধ ভাই?’

-‘কি করলাম?’

-‘গাছের নিচে কাঁটা রাখলেন কেন? নামব কিভাবে আমি?’

-‘তুই কি করে নামবি আমি কি জানি?’

-‘কাঁটা সরান।’

-‘পারব না। আর নেমে কি করবি? মগডালে বসে বসে কার এন্টিনায় কি সমস্যা হিসাব কর। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। নিরিবিলা স্থান। একটুপরেই তেনারাও সঙ্গ দিতে আসবে। ভাব, ভাব, মন দিয়ে ভাব, আমি আসছি।’

একেতে গাছের নিচে বরইয়ের কাঁটা দিয়ে রাখল তার উপরে ভূতের ভয় দেখাচ্ছে। ভীষণ রাগ হলো শীতলের। সে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল,-‘আমি কি আপনার এন্টিনার কথা বলেছি নাকি? বলেছি শখ আপুর শঙড়ের...!’

-‘আমারটার কথা বলিস নি বলেই এখনো শ্বাস নিতে পারছিস। বললে আজই জানাযা সম্পূর্ণ করতাম।’

-‘কাঁটা সরান শুদ্ধ ভাই। সত্যি বলছি আপনাকে বলি নি। আর আমি যা বলি শুনে নেন কিভাবে? এমন খরগোশমার্কী কান হলে তো সমস্যা।’

-‘আমার কান খরগোশমার্কী?’

-‘হুম। না, না, আমি তা বলি নি।’

শুদ্ধ ঠান্ডা দৃষ্টিতে শীতলের দিকে তাকিয়ে আরো দুটো বরইয়ের ডাল এনে গাছের আশেপাশে বিছিয়ে রাখল। যাতে লাফ দিয়েও নামতে না পারে। এরপর

কোনোদিকে না তাকিয়ে চলে গেল বাড়ির দিকে।
আর বেচারী শীতল চোঁচিয়ে বলতেই থাকল,
-‘যাবেন না শুদ্ধ ভাই। নাক ছুঁয়ে বলছি আর
কোনোদিন গাছে উঠব না।

দয়া করে কাঁটা সরিয়ে যান। শুদ্ধ ভাই! ও ভাই! ভাই
রে! এ কে কোথায় আছিস নামা আমাকে। বাঁচা
রে!’সায়ন একঘন্টা আগে বাসায় ফিরে ফ্রেশ হয়ে
খেয়ে শুয়েছিল। ঘুমানোর ইচ্ছে না থাকলেও এপাশ-
ওপাশ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এটুকু সময়ে
একটা স্বপ্নও দেখেছে স্বর্ণকে নিয়ে। তাদের বিয়ের
স্বপ্ন। স্বর্ণ কী সুন্দর করে সেজেছে। নীল শাড়ি
পড়েছে। শীতল আর শখ স্বর্ণকে রেখে গেছে তার
রুমে। ফুলে ফুলে ভরা পুরো রুম। সে খুশিতে
ডগমগ হয়ে মুখ ভর্তি হাসি নিয়ে রুমে এসেছে। কিন্তু
রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখে স্বর্ণ বিছানায় নেই। তার
জানামতে, নতুন বউরা বিছানার মাঝখানে লজ্জায়
নত হয়ে বসে থাকে। মুখের সামনে থাকে একহাত
ঘোপটা। কিন্তু তার বউ কই? বউ নাই দেখে তার
বুকে বিজলি পরার উপক্রম। চোখের ভাসে
ঝিকিমিকি বাতির আলো। সে পাগলা ভেড়ার মতো

এদিক ওদিক পানে তাকিয়ে খুঁজতে থাকে প্রাণপ্রিয় বউকে। খুঁজতে খুঁজতে দেখে স্বর্ণ চুপ করে সিলিংয়ের উপর পা ঝুলিয়ে বসে আছে। তাকে ফ্যানের উপর বসে থাকতে দেখে সে শুধায়,-‘একি রে তুই ওখানে কেন? নেমে আয় বউ! আজ না আমাদের সোহাগ রাত।’

-‘সোহাগ রাত না ছাই।’

-‘ওমা এ কি কথা? বিয়ে হয়ে গেছে আমাদের। আর নেই ভাবনা। আর নেই চিন্তা। দ্রুত নেমে আয় জান। দু’জন মিলে করে ফেলি বেবি আনার প্ল্যান।’

-‘না সায়েন ভাই, আমি আপনার সাথে বাসর করব না।’

-‘কেন সোনা? কি অপরাধ আমার। কি করেছি আমি, বল?’

-‘আপনি কেন ক্যাটকেটে হলুদ শর্ট পরে বিয়ে করতে গেলেন না? কেন বলুন?’

-‘আমার তো হলুদ কালার শর্ট নেই সোনা। তোর হলুদ শাড়ি কেটে নাহয় একটা বানিয়ে দিস।’

একথা বলতে না বলতে স্বর্ণ লাফ দিয়েছে তার উপর। সে স্বর্ণকে ক্যাচ করে জাপটে ধরে পাগলের

মতো চুমু দিতে শুরু করেছে। চুমুতে চুমুতে ভিজিয়ে
ফেলেছে স্বর্ণের চোখ, গাল, ঠোঁট, খুতনী, গলা ও
মুসন গ্রীবা। এতদিনের অপেক্ষা তর যে আর নয়
না। কম্পিত হাতে খুলেও ফেলেছে বউয়ের পরনের
শাড়ি। মুখ ডুবিয়েছে গলায়। মন, মস্তিষ্ক, হাত ও
উন্মাদ

দেহখানা যেন এখন পাগলা ঘোড়ার ন্যায় অবাধ্য।
তখন তীব্র ঝাঁকুনিতে ঘুম ভেঙ্গে যায় তার। দু'চোখ
খুলে দেখে শুদ্ধ ভ্রুঁ কুঁচকে তাকিয়ে আছে। তার
বাসরঘরে শুদ্ধ কোথা থেকে এলো? বউ কই তার?
সে কিছু বলার আগে বিরক্তি নিয়ে শুদ্ধ বলল,
-‘রুমের দরজা খোলা রেখে কোলবালিশকে পাগলের
মতো চুমু খাচ্ছিলে কেন? মাথা টাথা কি একেবারেই
গেছে?’

সায়ন ঘাড় ঘুরিয়ে আশেপাশে তাকাল। ফুলে ভরা
রুমে ফুল কই? আর বউ? বউ কই তার? সে এবার
মাথা চুলতে আমতা আমতা করে বলল,

-‘আমার বউ কোথায়? এখানেই তো ছিল।’

-‘ডাস্টবিনে ফেলে এসেছি। যাও, ধূলো ঝেড়ে তুলে নিয়ে এসো। আসার সময় বাবা কিজন্য ডাকছে শুনে এসো।’

-‘বাবা ডাকছে?’

-‘হুম।’

-‘তুই যা, শাওয়ার নিয়ে আসছি।’

-‘কিছুক্ষণ আগেই না শাওয়ার নিয়ে লাঞ্চ করলে?’

-‘আরে ভাই স্বপ্নে কিছু দোষ ছিল।’

শুদ্ধ সায়নের কথার মানে বুঝে মুখ কুঁচকে বিরক্তি নিয়ে চলে গেল। আর সায়ন গায়ের উপর থেকে চাদর সরিয়ে ওয়াশরুমের দিকে যেতে যেতে বিরবির করল, ‘দিনে দুপুরে কী হতচ্ছাড়া স্বপ্ন দেখলাম রে বাবা, ছ্যাহ্!’

এরপর নিজেকে বকতে বকতে ওয়াশরুমে চলে গেল। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে এবার একা একাই হেসে ফেলল। স্বর্ণ জানলে তাকে ঝাঁটা পিটা করবে। এদিকে ড্রয়িংরুমে সবাই উপস্থিত হয়েছে আহনাফের বাবা মায়ের জন্য। কুশল বিনিময় সেরেছেন। উনারা এখন ইনিয়ে বিনিয়ে শখের সাথে কথা বলছেন। বোঝার চেষ্টা চালাচ্ছেন শখের সাথে কোনো সমস্যা

হয়েছে কি না। কিন্তু শখ জানিয়েছে তাদের মাঝে
কোনো সমস্যা হয় নি। কিছুক্ষণ আগেও আহনাফের
সাথে কথা হয়েছে। এ কথা শুনে আহনাফের বাবা
বললেন শখের ফোন থেকে একটা কল দিতো। শখ
দিলো। একবার কল দিতেই আহনাফ কল ধরে
বলল,

-‘হ্যাঁ সোনা বলো। এতক্ষণে মনে পড়ল আমার
কথা?’

বড়দের সামনে এমন সন্তোষে লজ্জায় কুঁকড়ে গেল
শখ। বড়রাও মুখ এদিক ওদিক করলেন। তখন
আহনাফের বাবা ফোনটা নিয়ে বললেন,-‘সমস্যা কি
তোমার? আমাদের কারো কল ধরছো না কেন?’

-‘কেন ধরছি না ভালো করেই জানো। যাই হোক,
তোমরা এখানে কেন হঠাৎ?’

-‘যাদের বাড়ির মেয়েকে নিয়ে এত সমস্যা তাদের
জানাতে হবে না পুরো ঘটনা?’

-‘না, বাসায় যাও।’

-‘একথা আগে ভাবা উচিত ছিল।’

-‘কথা বাড়িও না বাবা। বাসায় যাও।’ উনাদের বাবা-
ছেলের কথা শুনে ভ্রুঁ কুঁচকে তাকিয়ে আছেন

শাৰাফাত চৌধুৰী। সাওয়ান চৌধুৰীৰ কপালেও চিত্তাৰ
ভাঁজ। শুদ্ধ দুই হাত পেছনে মুড়ে ৰাজকীয় ভঙ্গিমায়
দাঁড়িয়ে আছে। বোঝাৰ চেষ্টা কৰছে মূল ঘটনা।

কথাত গুৰুটা মোটেও পছন্দ হয় নি তাত। এয়া বাবা
ও ছেলে উল্টাপাল্টা কিছু বললে আজ ধোলাই দিতে
খামতি ৰাখবে না সে। পেটপুৰে ধোলাই খাইয়ে
এৰপৰ বাসায় পাঠাবে। তাত আবার অহেতুক
পায়তারা সহ্য হয় না।

তখন ভেজা চুল মুছতে মুছতে দ্ৰুতপায়ে সায়েন নেমে
এলো। তাত গলায় বুলানো হালকা আকাশি ৰঙ্গা
তোয়ালে। পৰনে মেকন টি-শাৰ্ট ও কালো টাউজাৰ।
সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতেই চোখাচোখি হলো স্বৰ্ণেৰ
সাথে। তাকে অসময়ে গোসল কৰতে দেখে ভ্ৰুঁ
কুঁচতে তাকিয়ে আছে সে। সায়েন গা ঘেঁষে দাঁড়াল
একদম স্বৰ্ণেৰ পাশাপাশি। বাকিৰা আহনাফদেৰ কথা
শোনাৰ মগ্ন। তখন স্বৰ্ণ কণ্ঠস্বৰ খাদে এনে
বলল,-‘অসময়ে গোসল কেন?’

-‘কোনো কথা বলবি না বে’য়া’দ’ব। বিয়ে কৰতে বলি
কৰিস না তাহলে স্বপ্নে আসিস কেন? দূৰে যা, যাহ
বলছি।’

স্বর্ণ তার কথার আগামাথা কিছুই বুঝলো না। ওদিকে আহনাফের বাবা পারছেনো ছেলেকে দু'থাপ্পড় দিতে। তখন শারাত চৌধুরী গলা খাঁকারি দিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তারপর নিজে কথা বলার জন্য হাত বাড়িয়ে ফোন চাইলেন। আহনাফের বাবা ফোন এগিয়ে দিলে শারাত চৌধুরী স্বভাবসুলভ গুরু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,

-‘কি হয়েছে আহনাফ? কোনো সমস্যা?’

হঠাৎ উনাকে দেখে আহনাফ ভ্যাচাকা খেয়ে গেল। সে দ্রুত নিজেকে সামলে সালাম দিলো। শারাত চৌধুরী বাড়তি কথায় না গিয়ে আসল প্রসঙ্গে কথা তুললেন। সরাসরি জানতে চাইলেন এসবের মানে কি। শখ

কিছু করেছে? কিংবা অন্যকিছু? আহনাফ মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ চুপ থাকল। তারপর নিঃশব্দে শ্বাস টেনে বুকে সাহস নিয়ে স্পষ্টস্বরে জানাল,-‘আঙ্কেল, বিয়ের ডেটটা এগিয়ে আনা যায় না?’

-‘কেন?’

-‘ দেড় বছর আমার কাছে অনেক বেশি মনে হচ্ছে।’

-‘কিন্তু শখের পড়া..! ”

জবাবে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন শারীফাত
চৌধুরী। অনুধাবন করার চেষ্টা করলেন ছেলেটার
ব্যাকুলতা। কাতরতা। এ বয়স। এ সময়। এই
উপলব্ধির সাথে পরিচিত তিনি। আজ বয়স বেড়েছে।
চুলে দু'একটা

পাক ধরেছে মানে এই না অনুভূতিরও লোপ
পেয়েছে। মনে মনে কিছু একটা ভেবে উনি ফোন
থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সরাসরি শখকে শুধালেন,-‘মা,
তোমার কি মতামত? বিয়ের ডেট কি এগিয়ে আনব?’
শখ আমতা আমতা করে ওড়নার একটা কোণা শক্ত
করে চেপে ধরেছে।

সত্যি বলতে, সে জানে আহনাফ কেন এমন করছে।
আসলে সে শখকে ছাড়া থাকতে পারছে না। তার
একটা দিন একটা বছর মনে হচ্ছে। দেড় বছর তার
কাছে নাকি দেড় যুগের সমান। এই দূরত্ব না ঘুচালে
সে পাগল হয়ে যাবে। তার একটাই অভিযোগ চৌধুরী
বাড়ির বড় কন্যা দিনকে দিন তাকে পাগল বানিয়ে
দিচ্ছে। ফোনের অপরপাশে থেকে চুপ করে শুনছে
আহনাফ। সে একমনে আল্লাহকে ডেকে যাচ্ছে যাতে
শখ মুখ ফুটে তার সম্মতি জানায়। শারীফাত

চৌধুরীও দেখছে আহনাফের অস্থিরতা আর শখের
নির্লিপ্ততা। তখন সায়েন মুখ খুলল। আহনাফের
উদ্দেশ্যে বলল,

-‘ডেট এগোবে ঠিক আছে। কিন্তু শখের পড়াশোনার
কথা আগে ভাবতে হবে। এতদিন এত কষ্ট করে
তীরে এসে তরী ডুবানো যাবে না। গার্ডিয়ান হিসেবে
তোমাকেও তো বুঝতে হবে আহনাফ। ডাক্তারী
পেশাকে অন্যের সাথে গুলিয়ে ফেললে চলবে
না।’ একথা শুনে আহনাফের মুখটা মলিন হয়ে গেল।
এবার সাওয়ান চৌধুরী বললেন,

-‘আবার কবে দেশে ফিরবে বাবা?’

-‘তিন মাস পর।’

-‘তুমি কি তিনমাস পর বিয়ের অনুষ্ঠান সারতে
চাচ্ছে?’

-‘জ্বি আক্কেল।’

-‘শখকেও নিয়ে যাবে?’

-‘জ্বি। আমি এই তিনমাসে সব ব্যবস্থা করে ফেলব।’

-‘তা নাহয় বুঝলাম। কিন্তু এভাবে তো পড়াশোনায়
ব্যাড ইফেক্ট পড়বে।’

-‘আমি আছি। সব সামলে নেবো, ইনশাআল্লাহ্!’

এ পর্যায়ে আহনাফের বাবা প্রচণ্ড বিরক্ত হলেন।
ধমকে উঠে ছেলেকে বললেন,

-‘এবার কিন্তু বাড়াবাড়ি করছো আহনাফ। হুট করে
দেশ ছেড়ে, আপন মানুষ ছেড়ে, পড়াশোনায় ইফেক্ট
পড়বে এটা তো ভুল বলেন নি উনারা। বারণ শুনছো
না কেন? সমস্যা কি তোমার?’

উনার ধমকে থমকে গেল ড্রয়িংরুম। শখও নীরবে
কাঁদতে লাগল। তবুও আহনাফ দমলো না। সে মলিন
মুখে জবাব দিলো,-‘ওকে ছাড়া আমার উপরেও খুব
বাজে ইফেক্ট পড়ছে বাবা। এই আমিটা দিন দিন
বড্ড বেশি এলোমেলো হয়ে যাচ্ছি। বউ আমার,
বিয়েও করব আমি, তাহলে আগে করলে কি সমস্যা?
ওকে আজ হলেও আমার কাছে আসতে হবে ;কাল
হলেও। তাহলে আগে পিছের হিসাব করে কি লাভ?
নিজেদের কথা সাইডে রেখে আমার কথাটাও ভাবো
তোমরা, প্লিজ।’

থমকে গেল সবাই। কথা হারিয়ে গেল। একটা ছেলে
কতটা ভালোবাসলে এভাবে সবার সামনে প্রিয়
মানুষটাকে কাতর সুরে চাইতে পারে। আপন করার
আকুলতা দেখাতে পারে। আহনাফের কথায় শখের

বুক পাজর ভেঙ্গে এলো। বলা বাহুল্য, এই ক’দিনে মানুষটার প্রতি তারও মায়া পড়ে গেছে। একটু একটু করে ভালোবাসতে শিখেছে। সেও চায় মানুষটাকে।

শখকে কাঁদতে দেখে সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। তখন শুদ্ধ এগিয়ে এসে বসল বোনের পাশে। হাত বাড়িয়ে ফোনটা হাতে নিলো। আহনাফ শুদ্ধকে দেখে সালাম দিলো। শুদ্ধ জবাব নিয়ে বাড়তি কথায় না গিয়ে সরাসরি শখের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ল,- ‘আহনাফ স্পষ্টভাবে তোকে চাইছে। এবার বল তুই কি চাস?’

-‘(.....)’

-‘মুখ খোল। জবাব দে। রাজি থাকলে জানা, না থাকলেও। প্রয়োজনে আহনাফকে ক্যাসেল করে দেবো। পৃথিবীতে ভালো ছেলের অভাব নেই।’

একথা শুনে শখ যেন আঁতকে উঠল। ভেজা চোখ তুলে তাকাল ভাইয়ের দিকে। আহনাফকে ভালোবেসে ফেলেছে। পরিস্থিতি যা এখন মুখে কিছু বলতে হবে। কিন্তু কিভাবে বলবে সেও রাজি। তিনমাস পর বিয়ে হলেও তার সমস্যা নেই। বোনের চুপ থাকতে দেখে শুদ্ধ বলল,

-‘তাহলে বাদ?’

-‘আ..ম আমার কোনো সমস্যা নেই ভাইয়া।’

-‘তাহলে তিনমাস পরেই? ‘

-‘হুম।’

তখন সাওয়ান চৌধুরী কথা ধরলেন,

-‘কিন্তু তোর পড়াশোনা?’

একথার জবাব শখের দেওয়া হলো না। কারণ আহনাফের চোখে চোখ রেখে শুদ্ধ পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করে বসল,-‘শখের পড়াশোনা নিয়ে তোমার আপত্তি আছে?’

-‘না ভাইয়া।’

-‘ভেবে বলছো?’

-‘জ্বি ভাইয়া।’

-‘ ভালোবাসলে ভালোবাসার মানুষের চাওয়া-পাওয়াকেও ভালোবাসতে হয়। খেয়াল রাখতে হয়। তার ভালো-মন্দ সকল সমস্যার সমাধানদাতা হতে হয়। আশা করি, তুমিও তাই হবে।’

এইটুকু বলে সে মেজো চাচ্চুর দিকে তাকাল। উনার বলা কথার জবাবে বলল,

-‘বিয়ের পরেও মেয়েদের পড়াশোনা হয়। শুধু প্রয়োজন হয় নিজের চেষ্টা আর আপনজনদের

সার্পোট। নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে এ দুটোই যথেষ্ট।
তাছাড়া, বিয়ের পর আহনাফ যদি শখের পড়াশোনায়
সামান্যতর বাঁধার কারণ হয় আমি কথা দিচ্ছি বোন
রাখব না ওর কাছে। কারণ, ওকে মনে রাখতে হবে
সে চৌধুরীদের সম্পত্তি নয় স্বয়ং চৌধুরীদের কলিজা
নিয়ে যাচ্ছে। যাকে তাকে এই অমূল্য রত্ন আমরা
দেবো না। যাকে দেবে তাকে অবশ্যই যোগ্য হতে
হবে। কতটুকু যোগ্য কথায় নয় কাজে করে দেখাতে
হবে।' শুদ্ধর প্রতিটা শব্দের ভার বুঝতে বাকি রইল না
কারো। এটা যেন ঠান্ডা মাথায় শীতল কণ্ঠে ভ্রমকি।
এরপর আহনাফের কথা অনুযায়ী তিনমাস পর বিয়ের
ডেট ঠিক করা হলো। গুমোট পরিবেশ কাটাতে
সকলে অন্য প্রসঙ্গে কথা তুলল। আহনাফও হাফ
ছেড়ে খুশি মনে কল কাটল। এরপর
আর কিছুক্ষণ থেকে আহনাফের বাবা-মা বিদায়
নিলেন। শখ চলে গেল নিজের রুমে। একে একে
ড্রয়িংরুম ফাঁকা হতেই সাইনও রুমের দিকে যাওয়ার
জন্য পা বাড়াল। রুমে না সে যাবে স্বর্ণের রুমে।
কারণ পাজিটা তাকে বিয়ে করতে চাই না অথচ স্বপ্নে
এসে কিসব করে যায়। কেন করে এসব? এর জবাব

তাকে দিতেই হবে। না দিলে চড়িয়ে দাঁত ফেলে
দেবে বেয়াদবটার। কিন্তু সে যাওয়ার আগেই শুদ্ধ
পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বলল,

-‘বাগানে যাও। কেউ তোমাকে ডাকছে।’একথা বলে
শুদ্ধ রুমে চলে গেল। সায়ন ভেবেছে স্বর্ণ বোধহয়।
তাই সেও পা বাড়াল বাগানের দিকে। কিন্তু গিয়ে
কাউকে দেখল না। খুঁজল এদিক ওদিক। হঠাৎ কারো
কান্নার শব্দে আর একটু এগিয়ে যেতেই কান্নার শব্দ
তীব্র হলো। ভালো করে খেয়াল করে দেখল স্বর্ণ নয়
শীতল গাছের উপর বসে ভ্য ভ্য কাঁদছে। গাছের
নিচে কাঁটা বিছিয়ে রাখা। তাকে দেখামাত্রই সায়ন
বিচলিত হয়ে বলল,

-‘এ কি কান্ড ওখানে কেন তুই? আর এভাবে কাঁটা
বিছিয়ে রাখা কেন?’

-‘ ওই কুত্তা বিছিয়েছে। ‘

-‘কুত্তা? কুত্তা এভাবে কাঁটা বিছিয়েছে? বলিস কি? এ
দেখি ডিজিটাল কুত্তা। একে তো জাদুঘরে রেখে আসা
উচিত। সেই সাথে নামকরণ করা উচিত, ‘কাঁটা
বিছানো কুত্তা।’

অন্যসময় হলে সায়নের কথা শুনে শীতল খিলখিল করে হাসত। কিন্তু এখন মোটেও হাসতে ইচ্ছে করছে না তার। তাই নাক টেনে ফোঁপাতে ফোঁপাতে জবাব দিলো,-‘এই কুত্তা সেই কুত্তা নয়। এটা মানুষ কুত্তা।’

-‘মানুষ আবার কুত্তা হয় কিভাবে? কি বলছিস পাগলের মতো। কাঁটা সরাই। নেমে আয় দেখি।’

একথা বলে সায়ন একে একে কাঁটাগুলো সরালে শীতল গাছ থেকে নেমে এলো। কোমরে গুঁজে রাখা ওড়নাটা ঠিকঠাক করে ধপাধপ পা ফেলে ছুটলো বাড়ির ভেতর। দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে চলে গেল শুদ্ধর রুমে। ভিজিয়ে রাখা দরজা খুলে দেখল শুদ্ধ খালি গায়ে দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলছে। সে রাগে ফসফস করে কোনোমতে নিজেকে সামলে তার রুমে চলে গেল। ওয়াশরুমে গিয়ে মাথাতে পানিও দিলো।

তারপর ভেজা চুল

মুছে ধপ করে শুয়ে পড়ল বিছানার উপর। খানিকক্ষণ পরে মাগরিবের আজান দিলো। সন্ধ্যার নাস্তা করার জন্য সিরাত সবাইকে ডাকছে। সেও গেল। সায়ন বাদে একে একে সবাই হাজির হয়েছে। শুদ্ধ কোথাও যাবে বোধহয় রেডি হয়ে নিচে নেমেছে। শীতল তাকে

দেখামাত্র থমথমে মুখে সোফা ছেড়ে মেঝেতে বিছানো
কার্পেটের উপর বসল। তারপর এক হাত বাড়িয়ে ট্রে
থেকে হালিমের বাটি হাতে তুলে নিলো। শুদ্ধও এসে
বসেছে পাশের সোফায়। শীতল গরম হালিম মুখে
দিতেই ছাকা খেয়ে উফ করে ঠোঁট চেপে ধরল। শুদ্ধ
ভ্রুঁ কুঁচকে কিছু বলার আগেই শীতল উঠে হনহন
করে রান্নাঘরে চলে গেল। এই অসভ্য মানুষটার সাথে
কথা বলবে না সে। ততক্ষণে সবাই বসেছে
ড্রয়িংরুমের সোফায়। সিরাত, সিমিন বাহারি সব নাস্তা
চা এনে রাখছে সবার সামনে। তুলে নিয়েছে যে যার
পছন্দের সব নাস্তা। হঠাৎ কারেন্ট চলে গেল। এবং
তখনই শুদ্ধর মুখ থেকে ব্যথাতুর শব্দ বেরিয়ে এলো।
সবার কানে পৌঁছে গেলে সেই শব্দ। সবাই বিচলিত।
কি হয়েছে উতলা হয়ে জানতে চাইতে না চাইতে
জেনারেটরও অন হয়ে গেল। ঝকঝকে আলোয় ভরে
উঠল ড্রয়িংরুম। শুদ্ধ তখনো মুখ কুঁচকে চোখ বন্ধ
করে সটান হয়ে বসে আছে। তার একটা হাত পিঠের
পেছনে। সিঁতারা ছেলের হাত খেয়াল করে
বললেন,-‘আব্বা কি হলো তোর? এমন করছিস
কেন?’

-‘না, কিছু না।’

সিতারা শুনলো না। জোর করে শুদ্ধর টিশার্ট উঁচিয়ে
দেখে আঁতকে উঠে বললেন,

-‘একি কাণ্ড! এটা কি করে হলো?’

উনার কথা শুনে সবার দৃষ্টি শুদ্ধর পিঠের দিকে।
কারো ধারালো চার আঙ্গুলের দাগ বসে গেছে। বিন্দু
বিন্দু রক্ত বের হচ্ছে। কেউ যেন খামচি দিয়ে মাংস
উঠানোর পায়তারা জুড়েছিল। শুদ্ধর অবস্থা দেখে
সিরাত দৌড়ে গিয়ে এন্টিসেপটিক এনে লাগিয়ে
দিলেন। সিমিন হায় হায় করে উঠলেন। ভর সন্ধ্যায়
খারাপ জ্বিনের কারবার ভেবে সূরা পড়ে শুদ্ধর মাথায়
ফুঁ দিলেন। সিরাত ঝাঁড়ু হাতে পুরো ড্রয়িংরুম
খুঁজলেন বিড়াল টিড়াল আছে নাকি দেখতে। কিন্তু
কিছুই পেল না। হঠাৎ করে এমন কাণ্ড ঘটায়
সকলেই হতবাক। চোখের পলকে কি থেকে কি ঘটে
গেল কিছুই বুঝলেন না কেউই। তবে শুদ্ধ আশেপাশে
তাকিয়ে একজনকে না পেয়ে দীর্ঘশ্বাস চাপল। কাজ
সেরে তখনই পালিয়েছে সে। পরপর শুদ্ধর ফোনে
কল আসায় সে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু সিতারা উঠতে
দিলেন না কিছু খেয়ে ওষুধ খাইয়ে তবেই ছেলেকে

ছাড়লেন। যে ক্ষত হয়েছে প্রচুর ব্যথা হবে। শুদ্ধ কথা
বাড়িয়ে ওষুধ খেয়ে বেরিয়ে গেল। কয়েকধাপ এগিয়ে
পেছনে ফিরে তাকাল শীতলের বেলকনি বরাবর।
কেউ নেই। তবে সে নিশ্চিত শীতল ওখানেই লুকিয়ে
আছে। দেরি হয়ে যাচ্ছে ভেবে পুনরায় যাওয়ার জন্য
পা বাড়াতেই শীতলের কণ্ঠের গান কর্ণকুহরে
পৌঁছাল। সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। শীতল তখনো
চোঁচিয়ে গেয়ে যাচ্ছে,

বন্ধু হাইটো যখন যায় পিছন ফিইরা ফিইরা চায়
দেখলে তারে মনের ভিতর মনের ভিতর দো'তারা
বাজায়।

বন্ধুর মাথায় বাবড়ি চুল দেখতে লাগে বিউটিফুল।
রংয়ে ঢঙ্গে রহিম সাইজ্জা আমারে নাচায়। 'বন্ধু হাইটো
যখন যায় পিছন ফিইরা ফিইরা চায়
দেখলে তারে মনের ভিতর মনের ভিতর দো'তারা
বাজায়।

বন্ধুর মাথায় বাবড়ি চুল দেখতে লাগে বিউটিফুল।
রংয়ে ঢঙ্গে রহিম সাইজ্জা আমারে নাচায়।'

উপর থেকে চাঁচিয়ে গান গাইছে শীতল। আর নিচে
দাঁড়িয়ে গান শুনে হতবাক শুদ্ধ। তার বোধগম্য হলো
না আসলেই গান নাকি আস্ত খোঁচা?

গানই যদি হয় খাপে খাপ মিলল কিভাবে? ‘দেখলে
তারে মনের ভিতর দো’তারা বাজায়।’ এই লাইনের
মানে কি? তাকে দেখে ওর মন দোতারা বাজে? তা
ধীর গতিতে বাজে নাকি বুলেটের গতিতে? ভয়ংকর
ব্যাপার তো। হুম, পরখ করা দরকার। পরখের আগে
অবশ্য চ্যالাকাঠ দরকার। বেশি শক্তপোক্ত না হলেও
চলবে। ওই এক বারি দিলে ভূত পালিয়ে যায় এমন
হলেই হয়। তাছাড়া এইবার বাড়ি এসে বুঝল
আশপাশে চ্যالাকাঠ দেখে নি। আগে ছাদে, বাগানে
চ্যالাকাঠ পড়ে থাকত। চ্যالাকাঠগুলোর হাত-পা
গজিয়েছে বোধহয়। হঠাৎ উড়ে উড়ে কোন গর্তে
লুকিয়েছে তাও

জানা দরকার। এত দরকারে দরকারী কাজগুলো
সেরে ফেলবে যদিও।

ততক্ষণে শীতলের গান থেমে গেছে। থামার কারণ
পরের লিরিক্স ভুলে গেছে সম্ভবত। শুদ্ধ নিশ্চিত
তাকে বের হতে দেখেই শীতল গান গেয়েছে।

আর গান থেমেছে মানে সে উঁকি মেরে হলেও দেখবে
দাঁড়িয়ে আছে কী না। একথা ভাবামাত্রই জানালার
পর্দার আড়াল থেকে হুঁদুরের মতো মুখ বের করে
উঁকি মারল শীতল। তাকে জানালা বরাবর তাকিয়ে
থাকতে দেখে চট করে মাথা সরিয়ে নিলো।
সেকেন্ডের ব্যবধানে আবারও উঁকি মারল। তখন শুদ্ধ
চোঁচিয়ে বলল,-‘ নেমে আয়। মারব না।’

-‘(....)’

-‘কথা কানে ঢুকল না? আয় বলছি, ভাজা বাদাম
কিনে দিবো।’

-‘(.....)’

-‘আমাকে যেতে হলে খবর আছে তোর।’

-‘(.....)’

-‘এক থেকে দশ গুনব। এর মধ্যে না এলে আজ
সারারাত কান ধরে দাঁড় করিয়ে রাখব।’

একথা শুনে শীতল পর্দার আড়ালে থেকে জবাব
দিলো,

-‘আমি কিছু করি নি শুদ্ধ ভাই।’

-‘আমি কখন বললাম তুই কিছু করেছিস? আয়, আয়,
দ্রুত আয়, বের হতে হবে আমাকে।’

-‘আমি এত বোকা না। বাদামের লোভ দেখিয়ে চালাকাঠ দিয়ে মারার ধান্দা। কি ভেবেছেন বুঝি না কিছু?’

-‘ভালোই তো চালাক হয়েছিস। চালাক হওয়া খুবই ভালো। তবে কতটা চালাক হয়েছিস পরীক্ষা নেবো সময় করে। এখন আয়। নয়তো চলে যাব কিন্তু?’-‘কোথায় যাবেন?’

-‘পাত্রী দেখতে।’

-‘আমি যাব না?’

-‘না, আগে আমি দেখে আসি পছন্দ হলে সবাই গিয়ে দেখে আসিস।’

-‘মেয়ে কি করে? দেখতে কেমন? গায়ের রং সাদা নাকি কালো? আমার মতো লম্ব চুল নাকি বব কাটিং? কাজল পরলে সুন্দর দেখায় তো?’

-‘সুন্দরী বউ লাগবে না আমার। আমি চাই বুদ্ধিমতী বউ। সুন্দরীরা বোকা আর মাথামোটা টাইপের হয় সেটার জলজ্যান্ত প্রমাণ তুই।’

একথা শুনে শীতলের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। মন ভার হলো। সে মুখ গোমরা করে জবাব দিলো,

-‘ চোখের সামনে থেকে বিদায় হোন, নামব না আমি।’

-‘ওকে। আচ্ছা শোন, একটা কাজ করে দিতে পারবি? করলে কচকচে পাঁচশ টাকার নোট দেবো।’

-‘কি কাজ শুদ্ধ ভাই?’

-‘একটা মোটা চ্যালাকাঠ আমার রুমে রেখে আসবি। আজকাল বাড়িতে জংলী বিড়ালের উপদ্রব বেড়েছে। মুখের ভাষাও জ’ঘ’ন্য। শায়েস্তা করা লাগবে। এসে যদি দেখি কাজ কমপ্লিট করেছে তাহলে সাথে সাথে টাকা পেয়ে যাবি।’-‘সত্যি তো?’

-‘হুম।’

-‘আচ্ছা।’

-‘ থাক তাহলে রাতে দেখা হচ্ছে। টাকা নেওয়ার জন্য রেডি থাকিস।’

একথা বলে শুদ্ধ সময় দেখে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল চৌধুরী বাড়ির গেট পেরিয়ে। শুদ্ধ চালাকিও ধরে ফেলেছে সে। তবে চালাকি খাটল না দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল। শুদ্ধকে জব্দ করতে পেরে খুশির অন্ত নেই।

দুটো ডানা থাকলে আকাশে এখনই দুচক্কর মেরে
আসার মতো খুশি তার অন্তরে। সন্ধ্যায় বাড়ির
সদস্যের সামনে ওই দুঃসাহসিক কাজটা করতে পেরে
মন যেন পুরো পৃথিবীর সামনে বলতে চাচ্ছে, ‘
পৃথিবী এত সুন্দর ক্যা? সুখ এত শান্তির ক্যা?’

একথা বলে সে ধারালো নখের দিকে তাকিয়ে নখের
উপর চুমু খেলো। তারপর কায়দা করে ভ্রুঁ জোড়া
নাচিয়ে দুষ্ট হেসে বলল, ‘আসবি আর লাগতে? আজ
পিঠে দিয়েছি এবার মুখে দেবো। সুন্দরী মেয়েদের
সাথে উড়াউড়ি করার স্বাদ জন্মের মতো ঘুচিয়ে
দেবো।’

মুখ ভেংচি দিয়ে কথাটা বলে স্মরণ হলো শুদ্ধ পাত্রী
দেখার কথা বলল। আসলেই কি তাই? গেলে যাক।
তার মতো বিশুদ্ধ পুরুষকে কোন মেয়ে সঙ্গী হিসেবে
নিয়ে কপাল পুড়াতে চায় সেও দেখবে। অবশ্য সেই
মেয়ের জন্য অগ্রিম আকাশসম সমবেদনা। একথা
বলে মিটিমিটি হাসতেহাসতে রুমে চলে গেল সে।
খুব শান্তি লাগছে। রাগ মিটেছে। এতক্ষণ রাগে মাথা
টাথা হ্যাং হয়ে যাচ্ছিল যেন। ইচ্ছে করছিল দাঁতের
তলে দিয়ে পিষতে।

এত রাগ হতো না, যদি না পেয়ারাগাছের লাল
পিঁপড়ে কামড়ে অবস্থা খারাপ করে দিতো। পিঁপড়ের
জ্বালায় লাফ মেরে নামতে পারত। গাছে উঠতে
নামতে ভালোই পারে সে। তিনবোনের মধ্যে সেই
একমাত্র গাছে উঠতে পারে। শুধু নিচে কাঁটা বিছানো
থাকায় নামতে পারে নি। কাহিনী এখানে শেষ হলে
তাও হতো। মনকে বুঝ দিতে পারত। হারামি
পিঁপড়ের কামড়ে কান্নাকাটি করে মানুষ হাসাতে চায়
নি। এখন তো বড় হয়েছে। পিঁপড়ের কামড়ে কাঁদলে
লোকে কি বলবে? তাই সেকথা গোপনই থাক। কিন্তু
পেয়ারার ফুলের উপর বসা হারামজাদা মৌমাছিটাও
ভুনভুন করে উড়ে এসে ঠিক ঘাড়ের উপর দিয়েছে
হুল ফুঁটিয়ে। একহাতে ডাল ধরে আরেক হাত দিয়ে
মৌমাছি সরাতে গিয়ে দেখে তিনটে মৌমাছি। তিনটে
কামড়ে ধরে আছে। তারপর কোনোমতে তিনটেকে
পিষে মেরে কাঁদছিল সে। খুব জ্বলছিল। মৌমাছির
কামড়ে জ্বালা যত বাড়ছিল তার সব রাগ জমা হচ্ছিল
শুদ্ধর উপর। তার কারণে এসব হয়েছে। তারপর
আর কি সুযোগমতো সেও নখ দিয়ে তাকেও জ্বালিয়ে
দিলো, দেখ কেমন লাগে!

অতঃপর এখন শান্তি আর শান্তি। আজ মন ভালো
থাকা পড়তে বসল।

কিছুক্ষণ বই নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখে তার মনে হলো
কাল থেকে রমজান মাস। পবিত্র মাস। এ মাসে পড়ে
কি হবে? ইদের পর মেলা সময় আছে।

তখন পড়লেই হয়। এখন মন ভালো উপন্যাসের
বইটা শেষ করা যাক।

যেই ভাবা, সেই কাজ, সে উঠে গিয়ে অর্ধেক পড়া
উপন্যাসের বই নিয়ে শুয়ে পড়ল। উপুর হয়ে শুয়ে
বুকের নিচে বালিশ নিয়ে মনযোগ সহকারে
পড়তে লাগল। পড়তে পড়তে তার একটা লাইন বেশ
পছন্দ হলো,-‘কাউকে জীবন্ত লাশ বানাতে চাও? তবে
তার সবাস্তে তীব্র ভালোবাসার জীবাণু ছড়িয়ে দাও।
রন্ধে রন্ধে তুমি নামক রোগ ছড়িয়ে দাও। তোমার
নাম তার মনকুঠুরিতে খোদাই করতে বাধ্য করো।
যদি করো, দেখবে সে মরবে না তবে ভালোও থাকবে
না। প্রাপ্তি হিসেবে দেখবে পুরো মানুষটাই তোমার
দখলে। তোমার আয়ত্তে।’

--- বাণীতে আলো

কথাখানা ভারি পছন্দ হলো শীতলের। চিৎ হয়ে শুয়ে
বইটা বুকের উপর রেখে গভীর চিন্তায় মগ্ন হলো।
ভাবল অনেক কিছু। তার শত্রু ওই একটা। তাকে এই
মন্ত্বে কারু করলে কেমন হয়? সুনশান এরিয়া।
চারদিকে অন্ধকার জঙ্গল। সেই জঙ্গল পেরিয়ে শুদ্ধ
পাঁচ মিনিটের পথ পায়ে হেঁটে এসে থেমেছে নির্জন
এক স্থানে। তারপর আশেপাশে তাকিয়ে প্রবেশ করল
জঙ্গলের আরো গভীরে। সারি সারি গাছ। অন্ধকার
পথ। কাঁটা ঝোপে ভরা মেঠো পথ পেরেয়ি এসেছে
আধা ভাঙ্গা পুরনো এক খুপড়ির কাছে। খুপরিটা
দেখে মনে হচ্ছে কয়েক বছর আগে কোনো বাড়ি
বানাতে গিয়েও বানানো হয় নি। অবহেলায় ইট খসে
গেছে। সবুজ লতা পাতায় ভরা গেছে খুপড়ির দুর্বল
প্রচীর। আশপাশের বড় বড় গাছের পাতা ঝরে
শুকিয়ে মাটিতে পড়ে আছে। কদম ফেলার সাথে
সাথে মড়মড় শব্দ হচ্ছে। সে খুপড়ির এক কোণে
শুকনো পাতার

স্তূপ সরিয়ে হাঁটু গেঁড়ে বসে মাটি স্পর্শ করতে খট
করে শব্দ হলো। মুহূর্তে সেখানে গোলাকৃতি লোহার
প্লেট দেখা গেল। আশ্চর্যজনকভাবে প্লেটের মাঝখানে

হালকা নীল আলো জ্বলে উঠল। ঘুরছে প্লেটটা। প্যাটার্ন
লক চাচ্ছে। শুদ্ধ অদ্ভুত কায়দায় প্যাটার্ন আঁকলে
ইংলিশে S অক্ষরটি ভেসে লক খুলে গেল। দেখা
মিলল একটি গেটের। গেটে পা রাখতেই সাপের
মতো পেঁচানো সিঁড়ি। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে লোহার প্লেটের
মাধ্যমে গেট বন্ধ পুনরায় বন্ধ করে সিঁড়ি বেয়ে নামল
সে এলো। তারপর নির্দিষ্ট এক স্থানে দাঁড়াতেই শরীর
স্ক্যান হলো। স্ক্যান করার কারণ শরীরে যদি
কোনোভাবে ক্ষতিকর কিছু লেগে থাকে তাহলে সেটা
রিমুভ হয়ে যাবে। নতুবা এলার্ট দেবে। এখানে
প্রবেশের আগে এমন অনেক সতর্কতা মানতে হয়
তাকে। মানার মতো সিস্টেম অন রেখেছে। তাছাড়া
পারসোনাল ল্যাবে অনেক কিছু আছে সেগুলো
একদিকে যেমন উপকারী তেমনি ক্ষেত্রবিশেষ হয়ে
দাঁড়ায় প্রাণনাশী। শুদ্ধর শরীর স্ক্যান হয়ে গেলে
দরজার দিকে এগিয়ে গেল। পিপ পিপ শব্দে বোতাম
চেপে পাসওয়ার্ড ইন করল। মুহূর্তেই গেট খুলে
যেতেই চোখ পড়ল এক মানবীর দিকে। মানবী
এ্যপ্রোণ পরিহিত

অবস্থায় সোফায় গা এলিয়ে বসে আছে। চোখজোড়া বন্ধ। অথচ ঠোঁটে অমায়িক হাসি। হঠাৎ সেই হাসি মুছে গেল। দ্বিতীয় কারো উপস্থিতি টের পেয়ে চোখ খুলে তাকাল। শুদ্ধকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উঠে দাঁড়াতেই শুদ্ধ ভেতরে প্রবেশ করে বলল,-‘ঐশ্বর্য কোথায়?’

-‘কেবলই ফ্রেশ হতে গেল। চলে আসবে এম্মুণি।’

-‘হঠাৎ জরুরি তলব?’

-‘কাজ হয়ে গেছে।’

-‘কোনটা?’

-‘পুরনোটা।’

-‘নতুন কোনো সিমটম দেখা দিয়েছে?’

-‘হুম।’

-‘কি?’

-‘ছেলেটার পুরুষালি হরমোনগুলো ব্লক হয়ে নারীর দেহের হরমোন তৈরি হচ্ছে। এবং পুরুষালি অবয়ব কেটে ধীরে ধীরে নারী দেহের গঠন প্রকাশ পাচ্ছে।’-‘তারমানে আমার ধারণায় সঠিক মেডিসিন বদলে দিয়েছে কেউ।’

-‘হুম। তবে অবাক করার মতো ব্যাপার ঘটেছে সব...!

‘

-‘যেমন?’

-‘ছেলেটার কণ্ঠস্বর মেয়েদের মতো শোনাচ্ছে। শরীরে অস্বাভাবিক ভাবে পশম এবং তার পুরুষালি স্তনবৃত্ত প্রাপ্ত বয়স্ক নারীর মতো দেখাচ্ছে। যা আমাদের ধারণার বাইরে ছিল। কথা হচ্ছে এই মেডিসিন কোথা থেকে এলো? কারা বানাল? তাদের মূল উদ্দেশ্য কি? এটার রেজাল্ট ভয়াবহ। কেউ যদি প্রতিশোধমূলক কাজ করতেও এটা বাজারজাত করে তাহলে পুরুষসমাজ হুমকির মুখে।’

একথা শুনে শুদ্ধ ঘাড় ঘুরিয়ে একবার তাকিয়ে পাশের রুমে চলে গেল। পরনের পোশাক ছেড়ে ল্যাবের পোশাক পরে গেল নির্দিষ্ট একটি কক্ষে। কাঁচের তৈরী বিশালাকা কক্ষে শুয়ে আছে জীবন্ত পুরুষ। শ্বাস চললেও চলাফেরা নেই। কথা বলে মাঝে মাঝে। চোখে মেলে তাকায় না। খাবার নিজে হাতে তুলে খায় না। তাকে শুধু বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে বিশেষ এক উপায়ে। তবে তার মরার দিন ঘনিয়ে এসেছে। বর্তমানে তার যা অবস্থা ভদ্রসমাজে চলাফেরা করতে

পারবে না সে। কারণ সাধারণ মানুষ তার কাছে
খাদ্যে পরিণত হতে পারে। আবার সাপের ন্যায়
খোলস ছাড়তেও পারে। শুদ্ধ মুখে মাক্র পরে এগিয়ে
গেল তার কাছে। কে বলবে বড়লোক বাপের ছেলে
এটা? যাই হোক, কর্মফল বলে একটা কথা আছে।
এসব ভাবতে ভাবতে শুদ্ধ নিজে পরখ করল। মাত্র
চার সপ্তাহে এসব সিমটেম দেখা দিয়েছে। আর
কিছুদিন নাহয় অপেক্ষা করা যাক। দেখা
প্রয়োজন, তাদের আর কী কী দেখতে হয়। তারপর
নাহয় পরবর্তী ধাপ অনুযায়ী এগোনো যাবে। এরপর
সে আর কিছুক্ষণ সেখানে থেকে ঐশ্বর্যের সাথে দেখা
করল। কথা হলো গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে। সেসব
করতে করতেই রাত বাজল একটা। ঐশ্বর্যকে সব
বুঝিয়ে দিয়ে বের হয়ে ফিরতে ফিরতে বাজল রাত
দেড় টা। সায়নের পার্টি অফিস তখনো খোলা। পার্টি
অফিস পেরিয়ে চৌধুরী বাসায় যেতে হবে। শুদ্ধ কি
মনে করে অফিসের ভেতরে প্রবেশ করল। তাকে
দেখামাত্রই আজমসহ সকলেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেল।
শাহরিয়ার ভাইয়ের ছোটো ভাই মানে তাদেরও ভাই।
মুখে মুখে শুদ্ধকে ভাই ভাই ডেকে ব্যস্ত রাখতে

চাইলেও খুব একটা লাভ হলো না। শুদ্ধ চট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর আজমকে বলে বসল,-‘ভাইয়া কোথায়? উহুম, বাড়তি কথা নয় কাজের কথা বলো।’

-‘ভাই একটু কাজে গেছে। চইলা আসবে নে।’

-‘কোথায় গেছে?’

-‘কনককে মারা দিতে। হালায় বহুত জ্বালাইতাছে। শাহরিয়ার ভাইয়ের ঠা/প না খাইয়ে মা’দা’চো’,দ শুধরাইবো না। আপনে বসেন ভাই। ঠান্ডা খান।’

-‘কনক মানে সিদ্দিকের চ্যালা?’

-‘হ ভাই।’

-‘কি করেছে সে?’

-‘কনকের বইনরে কেরা জানি রেপ করছে এহন কনক দোষ দিতাছে শাহরিয়ার ভাইয়ের। পুলিশ কেসও করছে। পুলিশ আইছিল কিছুক্ষণ আগে।’-‘তারমানে ভাইয়া থানায় এখন, তাই তো?’

-‘হ। না মানে হইছে কি ভাই....!’

-‘চলো।’

-‘ভাই কিতাছি যে, চৌধুরী বাড়িতে জানাইতে মানা করছিল শাহরিয়ার ভাইয়ে। জানাইলে আমারে আগে

কোপাইবে কইছে। সকালটা হইলেই ভাইয়ে জামিন
পাইয়া যাইব। আপনে থানায় যাইয়েন না ভাই।
শাহরিয়ার ভাইয়ে গোস্সা করবো।’

শুদ্ধ শুনল। তারপর এক পকেটে হাত গুঁজে আজমের
কাঁধে হাত রেখে হাঁটতে হাঁটতে বলল,

–‘তোমার শাহরিয়ার ভাই নির্বাচনে দাঁড়াবে, তা
জনো?’

–‘জে ভাই, জানি।’–‘এসব কেস ভাইয়ার নামের আগে
পিছে থাকলে তার নির্বাচন করার সাধ ঘুচে যাবে।
রাজনীতি করো অথচ সিদ্ধিকের চাল ধরতে পারো
নি? সিদ্ধিকের এখন একটাই লক্ষ্য ভাইয়াকে নির্বাচন
করতে না দেওয়া। এ এজন্যই কনকের বোনের
কেসটা ভাইয়ার ঘাড়ে চাপাতে চাচ্ছে হয়তো।

যাতে কেস জারি হয় তার নামে। নির্বাচনের আগেই
ভাইয়াও মুখ খুবকে পড়ে। যদি ভাইকে ভালোবাসো
এবং তার স্বপ্ন পূরণ করতে চাও তাহলে চলো যাই
গা রাতের দাগ রাতেই মুছি। দাগ পড়বে না দাগকে
অবহেলা করতে নেই। কোন দাগ কার জীবনের মোড়
ঘুরিয়ে দেয় বলা মুশকিল।’

তার কথাগুলো আজম হতবাক হয়ে শুনল। আসলেই তো! এভাবে তো ভেবে দেখে নি। এজন্য শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে চলা উচিত। কারণ এরা জানেও বেশি। জ্ঞান রাখেও বেশি। দুজন কথা না বাড়িয়ে চলল থানার দিকে। যেতে যেতে শুদ্ধ ফোনে কারো সাথে কথা বলল। কথাশুনে মনে হলো কোনো বড় মাপের মানুষ। এটাও বুঝল, শুদ্ধর রাজনীতিবিদের সাথে যোগাযোগ আছে। সঙ্গে এটাও বুঝল সায়নের জামিন হলো বলে।

থানায় অলরেডি জানানো হয়ে গেছে। ঘটনা বুঝে আজম হঠাৎ আমতা আমতা করে বলল,-‘ভাই একখান কথা কইতাম অনুমতি পাইলে।’

-‘হুম।’

-‘রাগ কইরেন না। ভুল কইলে মাফ কইরে দিয়েন। মুনের কথা চাইপ্লা রাখতে পারি না দিইখা কইতাছি।’

-‘(...)’

-‘ভাই? আপনে ওসব কাজ ছাইড়া আমগো লগে মাঠে আইসা পড়েন। কি দরকার শুধু শুধু অবুজ ইঁন্দুরের হোগায় ইনজেকশন মারা? আমগো চাইরপাশে বড় বড় মেলা ইঁন্দুর আছে। তাও মুখোশ পরা ইঁন্দুর।

আমি আর শাহরিয়ার ভাই মাঠে নামছি হেগোরে সাফ
করনের লিগা। আপনে আমাগো সঙ্গ দিলে আরো
ভালো হইতো। কারণ আপনার তো আবার ইঁদুরে
হোগায় ইনজেকশন মারার অভিজ্ঞতা আছে। পারবেন
ভালোই।

আমরা রোজ আপনере ইঁদুর আইনা দিমু আপনে
খালি ইনজেকশন মারবেন।’-‘ আমি খালি ইনজেকশন
মারি একথা কে বলেছে?’

-‘শীতল আপায়।’

-‘এসব ভাষা ব্যবহার করেছে?’

-‘না, না, ছিঃ! ছিঃ! আপা পড়ালেহা জানা মাইয়া।
এসব ভাষা কয় নাই।

আপা ভালো ভাষা কইছে।’

-‘শুনি কত ভালো ভাষা ব্যবহার করেছে?’-‘আসলে
হইছে কি, আমিই ভাইরে আপনার কথা
জিগাইছিলাম। তখন আমি নতুন। কাউরেই চিনতাম
না। শীতল আপায় ভাইয়ের সাথেই ছিল। আপারে
গাড়ি কইরা কলেজে নামাইয়া দিতে যাইতেছিলাম।
আপনের কথা কওনের পর আপায় কইছিল, আপনে
সাইটেশ। আমি বুঝি নাই, এডি আসলে কি। কাম

কি। পরে আপা আমারে বুঝাইতে কইল, আপনে
বিজ্ঞানী। পরীক্ষা নিরিক্ষা করনের লিগা নাকি ইঁদুরের
বামে ইনজেকশন মারেন। আপা শিক্ষিত মাইয়া তাই
কইছিল, বাম। বাম কি তাও বুঝি নাই তহন। পরে
আপা চইলা গেলে শাহরিয়ার ভাই কইছিল বাম মানে
হইল পাছা। ভদ্রলোকেরা পাছাকে সন্মান দেখনোর
লিগা বাম কয়। আমার আবার এত ভালো ভাষা মুখে
আছে না। তাই আমি কইছি হোগা, ভালো করছি না
ভাই?’-‘আসলে হইছে কি! আমিই ভাইরে আপনার
কথা জিগাইছিলাম। তখন আমি নতুন। কাউরেই
চিনতাম না। শীতল আপায় ভাইয়ের সাথেই ছিল।
আপারে গাড়ি কইরা কলেজে নামাইয়া দিতে
যাইতেছিলাম। আপনার কথা কওনের পর আপায়
কইছিল, আপনে সাইটেশ। আমি বুঝি নাই, এডি
আসলে কি! কাম কি! পরে আপা আমারে বুঝাইতে
কইল, আপনে বিজ্ঞানী। পরীক্ষা নিরিক্ষা করনের
লিগা নাকি ইঁদুরের বামে ইনজেকশন মারেন। আপা
শিক্ষিত মাইয়া তাই কইছিল, বাম। বাম কী তাও বুঝি
নাই তহন। পরে আপা চইলা গেলে শাহরিয়ার ভাই
কইছিল বাম মানে হইল পা’ছা। ভদ্রলোকেরা পাছাকে

সন্মান দেখনোর লিগা বাম কয়। আমার আবার এত
ভালো ভাষা মুখে আছে না। তাই আমি কইছি হোগা,
ভালো করছি না ভাই?’-‘(.....)’

-‘আপনে আমাদের দলে চইলা আছেন ভাই। মিইল্লা
ঝুইল্লা কাম করলে

আমরাই হইব এহানকার রাজা।’

-‘ক্ষমতার লোভ ভালো জিনিস নয় আজম। ক্ষমতার
লোভ মানুষকে পশুতে পরিণত করে। বিবেকের
দুয়ারে মরিচা ধরায়। তাছাড়া আমি আমার কাজ নিয়ে
সন্তুষ্ট ছিলাম আর তাই আছি।’

-‘ শুদু শুদু ইঁদুরগুলানের উপ্রে এত রাগ ক্যান
আপনের? হেরা যতই ছুডু প্রাণী হোক হেগোরে কি
লাগে না কন?’

-‘(.....)’

-‘ভাইয়ে কি রাগ হইলেন নাকি?’

-‘ ভুলভাল বকবক শোনার অভ্যাস আছে আমার।
বলো তুমি। সমস্যা নেই।’

-‘হে, হে, বাঁচাইলেন ভাই।’এরপর আজম নিজের
মতো করে বকবক করতেই থাকল। শুদ্ধ শুনছে কী
না বোঝা গেল না। কারণ সে ব্যাকটোরিয়ার নাম

মনে করায় ব্যস্ত। এ সময়, এ অবস্থায়, হঠাৎ ব্যাকটোরিয়ার নাম মনে করার কারণ জানা না গেলেও কাউকে শিক্ষা দেওয়ার প্ল্যান এঁটেছে একথা শতভাগ নিশ্চিত।

কারণ আর যাই হোক, সে অকারণে কিছু করে না। এদিকে প্রতিটা টিভি চ্যানেলের ব্রেকিং নিউজ চাঞ্চল্যকর একটি ঘটনা।

বার বার দেখা হচ্ছে নামিদামি একটি কালো গাড়ি। গাড়ির ডিকি খোলা। এবং ডিকির মধ্যে রাখা মানুষের কাটা হাত-পা। ছবি সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না যদিও কারণ আবছা করা যাতে কেউ ভয় না পায়। কার গাড়ি? কাটা হাত-পা কাদের? কোন অপরাধের দরুণ এমন ভয়াবহ মৃত্যুদণ্ড বোধগম্য হলো না কারো। সাংবাদিকরা ছবি তুলছে। প্রচার করছে নিজ চ্যানেলে। তখনই সাক্ষী হতে হলো আরেকটা একটি ঘটনার। জানা গেল এ গাড়িটি রাজনীতিবিদ আবু সিদ্দিকের বড় ছেলের। সে বাইরের দেশে থাকলেও দিন তিনের হলো দেশে এসেছে। পেশায় রাগবি (Rugby) প্লেয়ার। বাবার মতো রাজনীতির ধাঁরে কাঁছেও নেই। শান্ত ও ধীর স্বভাবের। নাম কায়েশ

সিদ্দিকী। বয়স ছাব্বিশের কাছাকাছি। কিছুক্ষণ আগে কায়েমের গাড়ি দেখালেও এখন কায়েশকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া দেখাচ্ছে। আবু সিদ্দিক সেই মুহূর্তে একটি বারে গলায় লাল পানি ঢালছিলেন। উনার মন মেজাজ ছিল অত্যন্ত ফুরফুরে। দলীয় অন্য সদস্যরাও ছিলেন আমোদ ফুটিতে। ঠিক সেই মুহূর্তে কনকের মাধ্যমে ছেলের বিপদের কথা পৌঁছে গেল সিদ্দিকের কানে। ছেলের গাড়িতে নাকি কাটা কাটা হাত-পা পাওয়া গেছে। হিসাবে মোট পাঁচজন ছেলের হাত-পা। সিদ্দিক মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। নেশার ঘোরে পাজোড়া হড়কে গেলেও দ্রুত ধরে ফেলল কনক। ফোন কলে পুনরায় খোঁজ নিয়ে জানলেন ঘটনা সত্য। এসবের মানে কি? ছেলে একাজ করতেই পারে না। অসম্ভব। কেউ না জানলেও উনি খুব ভালোই করেই জানেন রক্তে ফোবিয়ার আছে তার। র'ক্ত ট'ক্ত দেখতে পারে না। এর আগে রক্ত দেখে বহুবার প্যানিক এ্যাটাক হয়েছে তার। হাসপিটালে থেকে অনেকবার। চিকিৎসা চলমান। এমনকি ছেলের কারণে বাসায় মুরগি কবুতরও জবাই হয় না। অথচ কার এত বড় স্পর্ধা হলো যে

ছেলেটাকে এভাবে ফাঁসাল? কিসের রাগ তুলল? সে
যেই হোক

তাকে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। বরং এর পেছনে কারা
আছে সেটাও বের করতে হবে। এমন ভয়ংকর প্ল্যান
যার মাথা থেকে বেরিয়ে সে সাধারণ কেউ নয়
নিশ্চয়ই!

এসব ভেবে উনি সময় নষ্ট না করে উঠে দাঁড়ালেন।
চট করে উনার স্মরণ হলো সায়নের কথা। সায়ন
থাকলে এসব ঝামেলা চুটকি মেরেই সমাধান করে
দিতো। কিন্তু এখন সে নেই। নতুন করে পাখা
গজিয়েছে তার, এখন ক'দিন উডুক। সময় করে টুপ
করে পাখা ঝেটে দিলেই হবে। সদ্য উড়তে শেখা
পাখি উচ্চতায় গেলে নিজেকে অন্যকিছু মনে করে।
সায়নের একই অবস্থা। দল ছেড়ে সে ভেবেছিল
একাই দল গোছাতে পারবে। অবশ্য সে পারলেও
করতে তাকে করতে দেওয়া হবে না। কারণ সোনার
ডিম পারা হাঁসকে তার ক্ষমতা বুঝতে দেওয়া
বুদ্ধিমানের কাজ না। এতে মালিকের বিপদ কী না!
কায়েশের ঘটনা যখন টিভি চ্যানেলের ব্রেকিং নিউজ
আজম, শুদ্ধ আর সায়ন একসাথে থানা থেকে বের

হচ্ছিল। তখন আজমকে তাদের দলের একজন বল
করে ঘটনা জানাতেই সেও সায়নের কানে কথাখানা
পৌঁছে দিলো। সায়ন শুনে হঠাৎ হো হো করে হেসে
উঠল। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরার উপক্রম।
শুদ্ধ কিছু না বললেও আজম বলল,

-‘হাসেন ক্যা ভাই? আমরাও কন আমিও একটু
হাসি।’

-‘এমনি এমনি হাসছি না রে পাগলা। ঠা’প খেয়ে বাপ
ডাকার সময় এসে গেছে বেচারী সিদ্দিকের। ওর
নাজেহাল অবস্থা দেখে হাসছি।’

-‘কিন্তু একাম করলো কেডায়?’

-‘আছে একজন।’

-‘কেডা ভাই?’

-‘আমার ছায়াসঙ্গী।’এরপরের প্রশ্ন করার সাহস হলো
না আজমের। তবে ধারণা করে ঠোঁট টিপে হাসল।
সায়ন আজমকে চলে যেতে বলে দুই ভাই এগোলো
বাড়ির পথ ধরে। দুজনের কাছে দুটো বাইক। মাঝারি
গতিতে পাশাপাশি বাইক চালাচ্ছে দুভাই। কারো মুখে
কথা নেই। অথচ কিছুক্ষণ আগের ঘটনায় দুজনই
অবগত। তারা এও জানে, কায়েশকে পরিকল্পনা

ছাড়াই ফাঁসিয়ে দিয়ে পাশার পুরো চাল উল্টে দিয়েছে
সুবর্ণ চৌধুরী স্বর্ণ। এই স্বর্ণ মাঝে মাঝে এমন সব
কাজ কারবার করে সায়ন না হেসে পারে না। এটাও
যে রাগের বহিঃপ্রকাশ খুব করে জানে সে। আর তার
একটা কাজেই খেলার মোড় চূড়ান্ত সীমানায় নিয়ে
যাবে এটা হয়তো সিদ্ধিক আন্দাজও করতে পারবে
না। যদিও চালটা একটু পেঁচানো। এই যেমন সিদ্ধিক
ওর দলেরই এক ছেলেকে দিয়ে কনকের বোনকে
রেপ করাল। তাও এত নিঁখুতভাবে
বোঝার উপায় নেই এটা তার পূর্ব পরিকল্পনা। রেপ
করার স্থানে আবার রেখে এসেছিল সায়নের নাম
খোদাই করা ব্রেসলেট। শুদ্ধ দিয়েছিল ওই
ব্রেসলেটটা। সেটা পেয়ে কনকের ধারণা পূর্ব শত্রুতার
জোরে একাজ সে করেছে। এরমধ্যে সিদ্ধিকও যাতা
বুঝিয়েছে। বিচারের দাবিতে কেসের কথা আগে
স্মরণ করিয়েছিল। যাতে সায়নকে কেসে ফাঁসিয়ে
নির্বাচন আঁটকাতে পারে। বোকা কনক বিশ্বাস করে
সায়নের নামে কেস ঠুকেছে। যাতে কেস থাকায়
নোমিনেশন আঁটকে যায়। তাদের প্ল্যান এই অবধিই
ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু ঠান্ডা মাথার স্বর্ণ ব্যাপারটা

সহজেই হজম পারে নি।সায়নের গায়ে রেপ কেসের
দাগ তার মনে ভয়ংকর জেদ সৃষ্টি করেছে।

ফলস্বরূপ আজমকে দিয়ে ছেলেগুলোর কাটা হাত পা
নিয়ে সিদ্দিকের ছেলের গাড়ির ডিকিতে রাখিয়েছে।

এদিকে সিদ্দিক যখন সায়ন এরেস্ট হয়েছে বলে
আমোদে ফুর্তিতে ব্যস্ত তখন স্বর্ণই সিদ্দিকের ছেলেকে
কট খাইয়ে দিয়েছে। এসব করার পর তাকে আগে

জানিয়েছে। সব জেনে সে চুপ করে থানায় বসেছিল।
বসেছিল বললে ভুল হবে যদিও, গরম গরম হালিম
খাচ্ছিল পুলিশদের সাথে। বেশ ভালোই স্বাদের ছিল।

এই অমৃত স্বাদের টানে হলেও সে আবার থানায়
যাবে। যেতেই হবে!অতঃপর তারা পাকিং লটে বাইক
পার্ক করে এমনভাবে বাড়িতে প্রবেশ করল যেন
কেউ টের না পায়। কিন্তু ড্রয়িংরুমে পা রাখতেই
দেখে শীতল আর শারাফাত চৌধুরী বসে বসে লুডু
খেলছে। টুকটাক খাবার দাবারও

দেখা যাচ্ছে। তাদের দেখে শীতল আড়চোখে বড়
আব্বুর দিকে তাকাল।

এতক্ষণ ছলেবলে বড় আব্বুর কাছে শুদ্ধ নামের
অনেককিছুই বলেছে।

বারণও করে দিয়েছে যাতে এসব না শুধায় তাহলে
শুদ্ধ তাকে আবারও মারবে। একথা শুনে উনি
জানিয়েছেন বলবে না। এতেই খুশিতে ডগমগ
শীতল। এত রাতে ছেলের ফিরতে দেখে উনি
ঘড়ির দিকে তাকালেন।

তারপর গমগম সুরে বললেন,

-‘ক’টা বাজে এখন? ভদ্রঘরের ছেলের এতরাতে
বাসায় ফিরে? দিন দিন

বোধবুদ্ধি লোপ পাচ্ছে নাকি তোমাদের?’

তখন সায়ন জবাব দিলো,-‘একটা কাজ ছিল বাবা।’

-‘মধ্যেরাতে কিসের কাজ? আর মানুষ রাজনীতি করে
না? নাকি দেশে

তুমিই একমাত্র রাজনীতিবিদ?’

সায়ন মাথা চুলকে কথা বাড়াল না। বাবা যে তার
উপর ভীষণ বিরক্ত সে জানে। আজকে সুযোগ
পেয়েছে কথা শুনাতে একবিন্দুও ছাড় দেবে না।

ছেলের চুপ থাকতে দেখে শারায়াত চৌধুরী এবার
শুদ্ধকে বললেন,

-‘আর শুদ্ধ, তুমি শীতলকে রাত জেগে বসে থাকতে
বলেছো কেন? ও বাচ্চা একটা মেয়ে রাত জাগলে

শরীর খারাপ করবে না? এসবও বলে দিতে হবে আমাকে?’

বাবার কথা শুনে শুদ্ধ কপাল কুঁচকে তাকালে শারায়াত চৌধুরী বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,

-‘খবরদার বলছি ওর দিকে চোখ গরম করে তাকাবে না। নিজেরা রাত বিবেরে ফিরবে আর বাচ্চাটাকে খেতে দেওয়ার জন্য রাত জাগিয়ে বসে রাখবে? আজ দেখলাম এরপরে যেন এসব না দেখি।’ একথা বলে শীতলকে রুমে যেতে বলে উনিও চলে গেলেন। ছেলেরা বড় হয়েছে এখন কী আর কড়া শাসন মানবে? তবুও যতটুকু না করলে নয়! বাবার জেরার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে সায়ন জানাল খাবে না। প্রচুর ঘুম পাচ্ছে তার। একথা বলে দ্রুতপায়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে গেল। ভেবে নিলো স্বর্ণের রুমে খোলা পেলেই ঢুকে পড়বে। বুকের ভেতরটা কুটকুট করছে। হাত নিশাপিশ করছে কাউকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরার জন্য।

ঠোঁটটাও কেমন করে জানি চুলচুল করছে কারো ঠোঁটের ডুব দেওয়ার বাহানায়। কিন্তু স্বর্ণের রুমের

বন্ধ দেখে বিরক্ত হলো। দু'বার নক করল। তারপর ফিসফিস করে ডাকল,-‘জান! এ্যাই জান! দরজা খোল।’

-‘(...)’

-‘আরে বাল দরজাডা খুল। দুটো চুমু খেয়েই চলে যাব। শরীরের শক্তি পাচ্ছি না সোনা, কাছে আয় একটাবার। কতক্ষণ দেখি নাই তোকে। ওই হারামজাদা সিদ্দিকের বউয়ের কসম, তোর কপালে, দুচোখে, দুই গালে, নাকে, ঠোঁটে, খুতনীতে, গলায়, আর কাঁধে একটু চুমু খাব। এইটুকুতেই হয়ে যাবে আমার। খোল সোনা।’

-‘(.....)’

-‘ঘুমের ঢং মারাও? আমি জানি তুই ঘুমাস নি। স্বর্ণ! এ্যাই স্বর্ণকোমল!

বালের বউ আমার, তোর ঘুমের মায়েরে ভালোবাসা দিবসের শুভেচ্ছা। এবার তো খোল।’

-‘(.....)’

-‘চুমুর জন্য ক্ষুধার্ত আমি। তুই একজন ক্ষুধার্ত মানুষকে খেতে দিলি না।

পাষাণী কোথাকার। বদদোয়া করলাম তোকে তোর
বাচ্চারা যেন ল্যাংটা হয়ে জন্মায়।’

এত ডেকেও সাড়াশব্দ না পেয়ে বকতে বকতেই
নিজের রুমের দিকে পা বাড়াল সায়ন। আর স্বর্ণ
দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ঠোঁট কামড়ে হাসছিল। ওদিকে
শুদ্ধ গা এলিয়ে সোফায় বসেছে। গা ঘামার কারণে
পিঠের সেই ক্ষততে প্রচণ্ড জ্বলছে। জংলীটা তখন
সর্বশক্তি দিয়েই খামচি বসিয়েছে।

কী মনে করে শীতল পানির গ্লাসটা এগিয়ে দিলেও
নিলো না। তাই দেখে

শীতল মুখ বাঁকাল। মনে মনে গালি দিলো। তখন
শুদ্ধ বলল,

-‘আবার নালিশ করেছিস?’

-‘না, না, আমি কিছুই করি নি।’

-‘এটাও বিশ্বাস করতে হবে?’

-‘আমি টিভিতে মুভি দেখছিলাম। বড় আবু পানি
নিতে এসেছিলেন।

আমাকে বসে থাকতে দেখে ঘুমাতে যেতে বললে
আমি বলেছি সায়ন ভাইআর শুদ্ধ ভাই এখনো ফিরে
নি। উনারা এলে খেতে দিতে হবে।’-‘খেতে দে।’

-‘আচ্ছা।’

শীতল খাবার গরম করে খেতে ডাকলে শুদ্ধ খেতে
বসল। তার পাশের চেয়ারে আইসক্রিম নিয়ে বসল
শীতল। তারপর পটানোর সুরে বলল,

-‘শুদ্ধ ভাই, আপনি ওই হাদিসটা জানেন?’

-‘কোন হাদিস?’

-‘শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগে পারিশ্রমিক
দেওয়ার কথা বলা হয়েছে ‘ওই হাদিসটা।’

-‘চ্যালাকাঠ রেখে এসেছিস?’

-‘সেই কক্ষণ।’

-‘যা, ঘুমাতে যা।’

-‘যাব তো। আমার পারিশ্রমিক দেন। আমরা মুসলিম
ঘরের ছেলে-মেয়ে, আমাদের উচিত অক্ষরে অক্ষরে
হাদিস পালন করা, তাই না?’-‘হুম, হুম, তা তো
অবশ্যই। আমার কাছে টাকা নেই রুমে চল দিচ্ছি।’

-‘এতক্ষণ বসে ছিলাম একটু বাড়িয়ে দিয়েন।
জানেনই তো শ্রমিকদের খুশি করলেও আল্লাহও খুশি
হোন।’

-‘ও নিয়ে ভাবিস না। তোকে খুশির চূড়ান্ত লেভেল
অবধি ঘুরিয়ে আনার দায়িত্ব আমার।’

-‘ বলছিলাম যে, দেশে ফিরলেন আমাদের জন্য কিছু
মিছু আনেন নি?

না মানে প্রতিবারই তো আনেন।’

-‘তারমানে আবার আমার ট্রলি হাতিয়েছিস তুই?’

-‘ ইয়ে মানে একটু হাতিয়েছিলাম। কই চকলেট
টকলেট পেলাম না তো।’

একথা শুনে শুদ্ধ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। এত মারে,
বকে, তাও শুধরানোর নয় এই মেয়ে। এই কী
কখনো বড় হবে না? বুদ্ধি সুদ্ধি হবে না? জবাবের
অপেক্ষায় তাকিয়ে থাকতে দেখে সে বলল,

-‘প্রতিবার তোদের জন্য আনি এবার শুধু আমার জন্য
এনেছি। একটা পারফিউমও তো আস্ত রাখিস নি।
তাই আরো ভালো ভালো পারফিউম
এনেছি।’-‘এগুলোর দাম কী ওগুলোর চেয়েও বেশি?’

-‘হুম।’

-‘আমি গিয়ে দেখি তাহলে?’

-‘যাবি? যা। খবরদার নষ্ট যেন না নাহয়।’

-‘আচ্ছা।’

একথা বলে শীতল খুশিতে গদগদ হয়ে দৌড়ে চলে
গেল। শুদ্ধ ধীরে সুস্থে খেয়ে রান্নাঘরে সব রেখে

রুমের দিকে গেল। পাখি খাঁচায় ঢুকে পড়েছে বাড়তি
তাড়া নেই যদিও। তখন পাখিকে একটু শিক্ষা দেওয়া
যাক। মনে মনে এসব ভেবে রুমে গিয়ে দেখে শীতল
ট্রলি নিয়ে বিছানার মাঝখানে বসেছে। দুটো ট্রলি
থাকায় প্রথমে যেটা খুলেছে সেটা শুদ্ধর কাপড়ের।
সেখানে কিছু না পেয়ে কাপড় চোপড় এলোমেলো
করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছে। আরেকটা খুলে
পারফিউমের মোড়ক খুলে দেখেছে। পুরো রুম
পারফিউমের গন্ধে মৌ মৌ করছে। শুদ্ধ আপাতত
কিছু বলল না, রুমের দরজা লক করে স্টাডি
টেবিলের উপর বসল। খাতা ও কলম টেনে নিয়ে
ঘসঘস করে কিসব লিখল। তারপর ঝরঝরে হাতের
লেখায় পূর্ণ খাতাটি শীতলের হাতে ধরিয়ে দিয়ে
বলল,-‘এখানে পনেরোটা ব্যাকটোরিয়া ও কোন
ব্যাকটোরিয়ায় কোন রোগ হয় লেখা আছে। এগুলো
মুখস্ত করে, লিখে, এরপর রুম থেকে বের হবি।’
শীতল হতবাক। এই মধ্যরাতে কোন দুঃখে
ব্যাকটোরিয়ার নাম মুখস্ত করতে যাবে? নিজের পড়া
ধরে ছুঁয়ে দেখে না অথচ..! সে খাতাতে চোখ বুলিয়ে
দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল। তারপর বলল,

-‘এতরাতে ব্যাকটোরিয়ার নাম মুখস্থ করব কেন শুদ্ধ ভাই?’

-‘কোন ব্যাকটোরিয়ার কারণে কোন রোগ হয়। কোন ওষুধে রোগ সারে।

একটা মেডিসিন তৈরি করতে কত খাঁটুনি খাঁটা লাগে। এসবও তো জানা দরকার, তাই না? তাছাড়া মেডিসিন ট্রায়াল দিতে ইঁদুরের হোগ..না মানে বামে ইনজেনশন মারি কেন এর পেছনের কাহিনীও জানতে পারবি।’

শীতল মুখ লটকে তাকিয়ে রইল। মধ্যরাতে এসব অত্যাচার সহ্য হয়? সে খাতাতে চোখ বুলিয়ে নিলো। এত বড় বড় ইংলিশ বানান উচ্চারণ করবে কীভাবে? পড়তে গিয়ে দাঁতগুলো না ঝরঝর করে পড়ে যায়। সে খাতা থেকে নজর সরিয়ে বিছানা থেকে নামতে নামতে বলল,-‘অনেক রাত হয়েছে। বড় আব্বু রাত জাগতে বারণ করেছে। শরীরটাও খারাপ লাগছে শুদ্ধ ভাই। কাল মুখস্থ করে দেবো।’

একথা বলে দরজার কাছে গিয়ে দেখে দরজা লক করা। পার্স ইন করলে দেখাচ্ছে রং পার্সওয়াড। সে বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে পেছনে ঘুরে দেখে শুদ্ধ নেই।

ওয়াশরুম থেকে পানি পরার শব্দ আসছে। অর্থাৎ
জব্দ করার সব পথ ঠিকঠাক করে সে গেছে ফ্রেশ
হতে। শীতল পুনরায় পার্স দিলো। না, তাও হলো না
বরং শুদ্ধর ফোনে এলার্ট নোটিফিকেশন আসতে
থাকল। শীতল কাঁদো কাঁদো হয়ে পুনরায় বিছানায়
বসল। এবার কি হবে? বিশ মিনিট পর শুদ্ধ মাথা
মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলো। কালো টাউজার আর
সাদা টি-শার্ট। তাকে মলিন মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে
দেখে শুদ্ধ শুধাল,

-‘মুখস্তু? বল দেখি?’-‘শুদ্ধ ভাই আর কখনো আপনার
অবাধ্য হবো না। টাকাও লাগবে না। যেতে দিন
প্লিজ।’

একথা শুনে শুদ্ধ এগিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়াল। ঠান্ডা
হাতে শীতলের কপাল স্পর্শ করে তাপমাত্রা দেখে
বলল,

-‘জ্বর নেই তো। তাহলে ভুল বকছিস কেন?’

-‘সত্যি বলছি।’

-‘এই সত্যি এই অবধি কতবার বলেছিস?’

-‘বুঝতে শেখার পর থেকেই তো বলছি। তাও ধরেন
হাজার দশেক পার হয়েছে বলা।’

-‘রেখেছিস কথা?’

-‘না।’-‘তাহলে এবারও রাখতে হবে না। তুই এটা মুখস্ত করতে করতে আমার জামা কাপড়গুলোও দ্রুত গুছিয়ে ফেল। পারফিউমগুলোর জানপ্রাণ খেয়েছিস না? এবার নিজ দায়িত্বে নতুন পারফিউমগুলো সাজা দেখি।

আর চ্যالাকাঠ কই?’

-‘খাটের নিচে।’

শুদ্ধ সেটা বের করে দেখে লাল মেহগুনি গাছের শক্তপোক্ত চ্যলাকাঠ। বিড়াল মারার কথা শুনে মোটাসোটাই এনেছে। সে চ্যলাকাঠটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে বলল,

-‘ কাজে হাত দেওয়ার আগে চ্যলাকাঠটাকে ঝটফট সালাম কর দেখি।’

-‘আর করব না বললাম তো।’

একথা বলেই শীতল ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কেঁদে দিলো। না মারতেই কেঁদে কেঁটে একাকার অবস্থা। তখন শুদ্ধ বলল,

-‘সন্ধ্যায় খামচি মেরেছিলি কেন? জানে ভয় নেই? একবারও মনে হয় নি

এর ফল কি হতে পারে?’শীতল এবার বুঝল তখনকার রাগ তোলার জন্য তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এখানে এনেছে। সে ভেজা চোখে পিটপিট করে তাকাল। বুঝল কিছু না বললে মার হজম করতে হবে। কিন্তু বিনাবাক্যে মার না খেয়ে তার ভুলও চোখে আগুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া দরকার। তাই আর কিছু না ভেবে সে পেছনে ঘুরে কামিজের চেনের কিছুটা নামিয়ে দিলো। সাথে সাথে শুদ্ধর নজর আঁটকাল শীতলের ফর্সা মসৃণ পিঠে চেপে লেগে লাগা কালো রঙা অন্তর্বাসের চিকন ফিতায়। শীতলের বোকামিতে শুদ্ধ নিজে খেঁই হারিয়ে ফেলল। এক ধাপ পিছাতে গিয়ে হাত থেকে চ্যালাকাঠ পড়ে গেল। তখন শীতল কান্নামিশ্রিত গলায় বলল,

-‘দেখুন আপনার জন্য মৌমাছি কামড়ে কী করেছে। ওহ নিজের ব্যথাটা ব্যথা আর আমারটা বুঝি শরীর না? আমার বুঝি ব্যথা লাগে না? কষ্ট হয় না, না?’-‘দেখুন আপনার জন্য মৌমাছি কামড়ে কী করেছে। ওহ নিজের ব্যথাটা ব্যথা আর আমারটা বুঝি শরীর না? আমার বুঝি ব্যথা লাগে না? কষ্ট হয় না, না?’

শুদ্ধ হতভম্ব। ততক্ষণে দৃষ্টি আঁটকে গেছে মৌমাছির
কামড়ে ফুলে লাল হয়ে থাকা শীতলের ঘাড় ও পিঠের
কিছু অংশে। এসব কখন হলো? ইশ! কি অবস্থা
করেছে! গাছে কী তবে মৌমাছি ছিল? মনে মনে
জবাব পেয়ে এবার বুঝে নিলো শীতলের রাগ
মিটানোর মূল কারণ। তাকে মৌমাছির কামড়েছে
বলে সে সুযোগ বুঝে রান্ধসীর মতো খামচি দিয়েছে।
ভাগ্যিস বলে নি, ‘শুদ্ধ ভাই, আপনার জন্য মৌমাছির
আমাকে কামড়েছে এখন আমি আপনাকে কামড়াব।
নিন এবার ঘুরে দাঁড়ান দেখি গুনে গুনে সব ক’টা
কামড় শোধ করি।’ একথা ভেবে শুদ্ধ গলা খাঁকারি
দিয়ে চ্যাকাঠ যথাস্থানে রেখে দিলো।

যা পানিশমেন্ট পাওয়ার পেয়েছে বাড়তি কিছু করলে
ওভার ডোজ হয়ে যাবে। তখন আবার আরেক বিপদ।
তাই একবার তাকিয়েই দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছে। শীতল
তখনো অভিযোগ করে যাচ্ছে। কেন হলো, কিভাবে
কী করল সেসবই বলছে। শুদ্ধ তার কথা শুনল কী
না বোঝা গেল না। তবে ভেজা চুল মুছতে মুছতে
নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল,

- ‘এ্যান্টিসেপটিক লাগিয়ে নে।’

উক্ত কথা বলেই ভেজা তোয়ালে মেলে দিতে
বেলকনিতে গিয়ে দাঁড়াল। ঠান্ডা দমকা বাতাস ছুঁয়ে
দিলো তার পুরুষালি শরীর। শিরশিরিয়ে উঠল
লোমকূপ। ধীরে ধীরে চেপে রাখা শ্বাসটুকু ছাড়ল।
বুক ভরে শ্বাস টানল। ভোরে বৃষ্টি নামবে বোধহয়।
আকাশ মেঘলা হয়ে আছে। চাঁদ-তারকার দেখা নেই।
সে টাউজারের পকেটে এক হাত গুঁজে কিছু ভাবল।
একবার

রুমের মধ্যে উঁকি মেরে দেখল শীতল ড্রয়ার খুলে
এ্যান্টিসেপটিক নিয়ে

ড্রেসিংটেবিলের আয়নায় সামনে দাঁড়িয়ে পিঠে, ঘাড়ে,
এ্যান্টিসেপটিক লাগাচ্ছে। সে আর তাকাল না।
তাকানোর প্রয়োজনও বোধ করল না। ‘কন্ট্রোল’
জিনিসটাতে লাল কার্ড দেখাতে বরাবরই পারদর্শী
সে। যদিও সেটা একটু একটু করে গড়ে তোলা
কঠোর পরিশ্রমের ফল। এত সোজা না সামান্য
কিছুতে নিজের আত্মসংযমকে পায়ে পিষে ফেলা।
আবেগের বশে ভুল করে বসা। বলা বাহুল্য, রিসার্চের
ক্ষেত্রে নগ্ন নারীদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যাপারে
অনেককিছু জানতে হয়েছে। পড়তে হয়েছে। এমনকি

নোট করতে হয়েছে। সাইন্সের স্টুডেন্টদের কাছে
শুরুর দিকে ব্যাপারটা অস্বস্তিকর হলেও দিনকে দিন
কাজের ক্ষেত্রে মানিয়ে নিতেই হয়। একটা সময়
স্বাভাবিক হয়ে ধরা দেয়। যদি তা না হতো তাহলে
নারীদের শরীরে থাকা গোপন অসুখের চিকিৎসা
হতো না। আর না অসুখের প্রতিষেধক তৈরি হতো।
এমনটাও না, নারীদের অসুখের মেডিসিন নারী তৈরি
করে। কথাটা সম্পূর্ণ ভুল। নারী ও পুরুষরা মিলে
অনেক প্রচেষ্টার ফল হিসেবে

একেকটা প্রতিষেধক সৃষ্টি করে। রিসার্চ করে দেখে
কতটা কাজে দেবে।

কতটা উপকারী। মোটকথা, সে ভালো করে জানে
শীতল চঞ্চল। অশান্ত মাথামোটা। কোনো কিছুই
ভেবে করে না। একবারও ভাবে না বোকামির কাজ
কী রূপ প্রভাব ফেলতে পারে। যেমন সেদিনই
বোকামি করে ফোন তার কামিজের মধ্যে ঢুকিয়ে
নিয়েছিল। অন্যকেউ হলে এমনটা করত? করত না।
বরং দশবার ভাবত। সেদিনের মতো আজকেও
আচমকা তার

কামিজের চেইন খুলে দাঁড়িয়ে গেছে তার সামনে। একবারও ভাবে নি যে সে আগের ছোটো শীতল আর নেই। এখন হাতে পায়ে বেশ বড় হয়েছে। শরীরে পরিবর্তন ধরা দিয়েছে। এখন আর এসব বোকামি চলে না। কিন্তু মেয়েটা বুঝলে তো? এসব আবার সায়নের কাছে করে না। সে সায়নের কাছে সমস্ত গোপন কথা জমা রাখে। এমন সব গোপন কথা তাদের মুখে বোম পড়লেও কেউ বলবে না। আর না তাদের দেখে কেউ টের পাবে না। অথচ সে এত মারে। বকে। তবুও তার কাছে উদ্ভট কর্মকান্ডগুলো করে।

যদিও এসবে অভ্যাস হয়ে গেছে আজকাল। এজন্য বোধহয় অন্তর্বাসের কালো ফিতা দেখেও তেমন কিছু মনে হয় নি। হচ্ছে না। বরং স্বাভাবিক।

সব স্বাভাবিক! এর কারণও হতে পারে কঠোর আত্মসংযম। তবে একদিন নির্দিষ্ট কারো প্রতি সমস্ত কন্ট্রোল হারাবে। বাঁধা, নিষেধের দুয়ারে তালা লাগিয়ে বদ্ধ উন্মাদ হবে। এতটাই উন্মাদ হবে যা কেবল সেই নারীই তার উন্মাদনায় মাতাল হবে, কাতর হবে। ছটফটিয়ে কান্নারত স্বরে অভিযোগ

ছুঁড়বে, ‘আপনার নামের মতো আপনি শুদ্ধ পুরুষ
নন। আপনি অশিষ্ট ও অসভ্য পুরুষ।’

এদিকে শীতল এ্যান্টিসেপটিক লাগিয়ে কামিজের
চেইন আঁটকে নিলো। বিকাল থেকে যা ঘটেছে
এসবের মূল হোতা ওই শুদ্ধ। সে মূল অপরাধী। যার
প্রমাণ রয়েছে তার গায়েও। এতকিছুর পরেও একটা
সরি বলল না। কেন বলল না, হুম? বলতেই হবে।
সে ভুল করলে তাকে ছাড়ে না। বরং চ্যালাকাঠ দিয়ে
মেরে আধমরা করে দেয়। আজ সে ভুল করেছে
অর্থাৎ তাকে সরি বলতেই হবে। না বললেই
আগামীকাল এমনকিছু ঘটাবে তার
জন্য ওই বিশুদ্ধ পুরুষই দায়ী থাকবে। এসব ভেবে
গুঁটি গুঁটি পায়ে গিয়ে দাঁড়াল বেলকনিতে। বেলকনির
লাইট অবধি জ্বালায় নি পাষাণ মানব। ঘুটঘুটে
অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কোন রাজ্যের রাজ্যপাঠ চালাচ্ছে
কে জানে।

তার উপস্থিতি টের পেয়েও তাকাল না শুদ্ধ। পূর্বের
ন্যায় একই ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে। তবে শীতল
একটু পর পর ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। গা ঘেঁষে
দাঁড়াল। ঘুটঘুটে অন্ধকার চারিদিক। গাছগুলোকে

দেখতে দানবের মতো লাগছে। যেন এই বুঝি মাথা
তুলে হাউ মাউ করে তেড়ে ফুঁড়ে আসবে। আশপাশের
কোথাও একটা পেঁচা ডাকছে। কি অদ্ভুত স্বর! সেই
মুহূর্তেই কারেন্ট চলে গেল। বাতাসের গতি বাড়ল।
ঝড় উঠছে। চোখের পলকেই বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা
আঁছড়ে পড়ল মাটির বুকে। শান্ত হতে লাগল উতপ্ত
মাটির বুক। ছড়াল সোঁদা মাটির গন্ধ। শীতল
আশপাশের গাছগাছালির দিকে তাকাল না। বরং
একটু সরে গেল। ভয়ে মুখ চুপসে গেছে। কখন না
জানি তেনাদের চোখে চোখ পড়ে যায়? আচ্ছা যদি
সত্যি সত্যিই চোখে চোখ পড়ে যায় তাহলে কী করা
উচিত? লাজুক মুখে হাসা উচিত নাকি ভয়ে জ্ঞান
হারানো উচিত? কি করবে সে? কোনটা করলে ভালো
হবে?

এসব ভেবে পরক্ষণেই ভাবল, আরে ধূর, পাশে শুদ্ধ
ভাইয়ের মতো এক ষাঁড়মার্কী তেনা(ভূত) থাকতে
এক ভয় কিসের? একথা ভেবে মুখ টিপে হাসল।
তারপর খিলের ফাঁক গলিয়ে বৃষ্টির পানি ছুঁতেই মন
ভালো হয়ে গেল। ভুলে গেল কিছুক্ষণ আগের ঘটনা।
মুখভর্তি হাসি নিয়ে মিষ্টি করে ডাকল,-‘শুদ্ধ ভাই?’

-‘ যা করতে বলেছি করে বিদায় হ।’

কর্কশ কণ্ঠে কথাটা বলতে দেখে শীতলের মুখের হাসি নিভে গেল। মলিন মুখে তাকাল পাশে দাঁড়ানো বর্বর মানবটার দিকে। সবসময় খ্যাক খ্যাক করে কেন? একটু ভালো করে বললে কি হয়? ততক্ষণে জেনারেটর অন

হয়ে গেছে। ঝকঝকে আলোয় ভরে গেছে শুদ্ধর রুম। তাই সে বলল,

-‘রুমে চলুন।’

-‘রুম কি তোর বাপের? নাকি তোর শশুড়ের যে তোর কথামতো রুমে যেতে হবে?’

-‘বড় আব্বুকে বলে দিবো কিন্তু আপনি অকারণে আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেন।’

-‘আমিও বলব যখন তখন আমার রুমে এসে আমাকে বিরক্ত করিস!’

-‘কই যখন তখন আসি? এখন এসেছি কারণ আপনার কারণ মৌমাছির কামড় খেতে হয়েছে। যা করেছেন তা দেখবেন না?’-‘আমি করেছি? আমি করলে দাঁড়িয়ে থাকার অবস্থায় থাকতি? কথা বাড়াস না রুমে যা।’

-‘রুম কি আপনার বাপের? নাকি আপনার শশুড়ের
যে আপনার কথামতো রুমে যেতে হবে?’

একথা বলে সে নিজেই খিলখিল করে হেসে হাতের
পানি ছুঁড়ল শুদ্ধর দিকে। এবার শুদ্ধর মেজাজ বিগড়ে
গেল। সে শক্ত হাতে শীতলের লম্বা বেনুগি হাতে
পেঁচিয়ে টান দিতেই শীতল ব্যথাতুর শব্দ করে উঠল।
চুল ছাড়াতে মোচড়ামুচড়ি করতে লাগল। তখন শুদ্ধ
হাতের বাঁধনে দ্বিগুন চাপ প্রয়োগ করে বলল,

-‘এত জ্বালাস কেন আমাকে? কি সুখ পাস আমাকে
জ্বালিয়ে?’

-‘উফ! লাগছে শুদ্ধ ভাই। ছাড়ুন।’

-‘ আর জ্বালাবি?’

-‘জ্বালাব!’একথায় শুনে হাতের মুঠ আর একটু শক্ত
করতেই শীতল ও মাগো করে

কেঁদে উঠল। আর জ্বালাবে না বলে কথা দিলো।

তখন শুদ্ধ চুল ছাড়ল। ছাড়া পেয়ে মুখ ভেংচি দিয়ে
রুমে চলে গেল শীতল। একে একে ছড়ানো জামা
কাপড়গুলো গুছিয়ে রাখল। পূর্বের ন্যায় সব
পারফিউমের কৌটা গুলো থরে থরে সাজাল।এবারের
পারফিউমের বোতলগুলোর ডিজাইন অন্যরকম

সুন্দর। সবগুলো বোতল কাঁচের অফ হোয়াইট কালার
বিধায় লাইটের ঝলকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। সে
সাজাতে সাজাতে প্রতিটা পারফিউম নিজের গায়ে
স্প্রে করেছে। সুগন্ধ শুঁকছে। সব ক’টা মিলিয়ে অদ্ভুত
সুগন্ধ বের হচ্ছে শরীর থেকে। এসব করতে করতেই
হঠাৎ স্মরণ হলো উপন্যাসের প্রিয় উক্তিটার কথাটা।
বিরবির করে একবার আওড়ে নিলো,

‘কাউকে জীবন্ত লাশ বানাতে চাও? তবে তার সবাঙ্গে
তীব্র ভালোবাসার জীবাণু ছড়িয়ে দাও। রন্ধে রন্ধে
তুমি নামক রোগ ছড়িয়ে দাও। তোমার নাম তার
মনকুঠুরিতে খোদাই করতে বাধ্য করো। যদি করো,
দেখবে সে মরবে না তবে ভালোও থাকবে না। প্রাপ্তি
হিসেবে দেখবে পুরো মানুষটাই তোমার দখলে।
তোমার আয়ত্তে। ‘

মনে মনে একথা আওড়ে সে উঁকি মেরে দেখল
শুদ্ধকে। দুই পকেটে হাত গুঁজে এখনো ওভাবেই
দাঁড়িয়ে আছে। অশান্ত পুরুষ শান্ত হওয়ার কারণ
বুঝল না সে। তার জানামতে এতটাও বৃষ্টিপ্রেমী না
শুদ্ধ ভাই, তবে? এই নিয়ে আর ঘাটাঘাটি করল না

শুধু চোঁচিয়ে বলল,-‘আরেকটা ট্রলি কোথায়? কই খুঁজে পাচ্ছি না তো শুদ্ধ ভাই?’

শুদ্ধ এসে ট্রলি বের করে বিছানায় আধশোয়া হয়ে বসল। ফোন স্কল করতে করতে হাসানের মেসেজ এলো। তার বউটা জন্ম হয়েছে। আগের মতো খারাপ ব্যবহার করছে না। বরং স্বামীকে চোখে হারাচ্ছে। মেসেজটা ফ্রেন্ডদের চ্যাট গ্রুপে বলায় মজা করা শুরু হয়ে গেল। হাসানকে পঁচাচ্ছে সবাই। বেবি নিয়ে নেওয়ার বুদ্ধি দিচ্ছে। কেউ বিনামূল্যে টিপস্ও দিলো। শুদ্ধ বন্ধুদের মশকরা দেখে হাসল শুধু। এদিকে কার্পেটের উপরেই বসে পড়েছে শীতল। ট্রলির চেইন খুলে দেখছে কী কী এনেছে। তার পছন্দের চকলেট দেখে চটজলদি মুখ পুরলো। আরো দুটোর খোসা ছাড়িয়ে পাশে রাখল। তারপর খচমচ করে চিবাতে চিবাতে তিনটে একই রকম লেডিস ওয়াচ দেখে বুঝল ওদের তিনবোনের জন্য। এত চমৎকার স্মার্ট ওয়াচ! তবে তিনটের মধ্যে কোনটা নিবে বুঝতে উঠতে পারল না। তাই তিনটেই শুদ্ধর সামনে নিয়ে গেল। একবার ওয়াচগুলোর দিকে তাকিয়ে নিজের

হাতের দিকে তাকাল। তারপর খুশিতে গদগদ হয়ে
শুধাল,-‘আমার কোনটা শুদ্ধ ভাই?’

-‘একটাও না। তিনটের মধ্যে দুটো শখ আর স্বর্ণের
জন্য। আর একটা..!’

-‘আর একটা?’

-‘ঐশ্বর্যের।’

-‘ঐশ্বর্য কি আপনার বোন লাগে?’

-‘আমি বলেছি সে আমার বোন?’

-‘বোন না তো একই রকম ওয়াচ নিলেন কেন?’

-‘এর কৌফিয়ত তোকে দিতে হবে? তোর যা
নেওয়ার নিয়ে বিদায় হ।’

একথা শোনামাত্রই শীতলের হাসি মিলিয়ে গেল।
অন্ধকার নেমে এলো

স্নিগ্ধ মুখজুড়ে। তিনটে ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে
ফিরে গেলে ট্রলির কাছে। ঘড়িগুলো আগের স্থানে
রেখে ট্রলির চেইন আঁটকে উঠে দাঁড়াল।

খোসা ছাড়ানো চকলেটটা ছুঁড়ে মারল কার্পেটের
উপর। অপমানে পুরো মুখ থমথম করছে। তখন শুদ্ধ
বলল,-‘কি হলো নিলি না?’

-‘লাগবে না। দরজা খুলে দিন।’

-‘ হঠাৎ কি হলো? মুখ চুপসে গেল কেন? কিছুই পছন্দ হয় নি?’

-‘অনেক রাত হয়েছে কাল নেবো।’

-‘পেটে পেটে হিংসে কেন তোর? মন পরীক্ষার কর।’

-‘আমি খারাপ তাই আমার মন মানসিকতা খারাপ।
কথা বাড়াবেন না দরজা খুলুন।’

শুদ্ধ ঙ্গ কুঁচকে তাকিয়ে রইল। সে উঠছে না দেখে
শীতল একের পর এক ভুল পার্স ইন করতে লাগল।
শুদ্ধ উঠে এক হাত টেনে দরজা থেকে সরাতেই
শীতল চোঁচিয়ে বলল,

-‘সব সময় সবকিছু ভালো লাগে না। যেতে
দিন।’-‘বস। ভুল পার্সে দরজা লক হয়ে গেছে। একটু
পর নিউ পার্স ইন করলে দরজা খুলবে।’

একথা শুনে শীতল বসল। মেঝের দিকে তাকিয়ে
ভাবছে কিছু। সে হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল। বিছানায়
আধশোয়া শুদ্ধর আপাদমস্তক দেখল। কিছু চিন্তা
করল। কিয়ারা প্রায়ই বলে শুদ্ধ ভাই সুদর্শনের সেরা।
তার পার্ফেক্ট হাইট, চোখ, নাক, ঠোঁট, কথা বলার
ভঙ্গিমা, হাঁটার স্টাইল, পোশাকের ধরনে অভিজাত্যের
ছাপ। আসলেই কি তাই? যদিও খেয়াল করা হয় নি।

সময়ই বা কোথায়? কারণে অকারণে ধমকের উপর রাখলে খেয়াল করা সম্ভব? তাছাড়া শত্রুকে কেউ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে? এই চৌধুরী বাড়িতে অঘোষিতভাবে তার একটাই শত্রু, শোয়াইব শুদ্ধ। কথা বলার ইচ্ছে না থাকলেও থমথমে কণ্ঠে বলে বসল,-‘আপনি কি ঐশ্বর্যকে ভালোবাসেন।’

-‘সে তোর অনেক বড়। সন্মান দিয়ে কথা বল। নয়তো চ্যলাকাঠ তোর পিঠে ভাঙ্গব বেয়াদব।’

-‘(.....)’

-‘ভালোবাসার কি বুঝিস তুই?’

-‘বুঝি না বলেই তো বুঝতে চাই?’

-‘বুঝতে হবে না। তাছাড়া কাকে ভালোবাসি না বাসি এর কৌফিয়ত তোকে দেবে না।’

-‘কেন দিবেন না?’

-‘কেন দিবো? তুই কে?’

-‘আমি কেউ না?’

-‘না।’

-‘সত্যি কেউ না?’

-‘বললাম তো না।’

একথা বলে শুদ্ধ উঠে দরজায় নিউ পার্স ইন করে
বলল,

-‘ বের হ।’

অভিমানী চোখে তাকিয়ে শীতল রুম থেকে বেরিয়ে
গেলে শুদ্ধ স্বজোরে

দরজা আঁটকে দিলো। বিরবির করে বকতে বকতে
শুয়ে পড়ল। বকবক করে মাথাব্যথা বাড়িয়ে দিয়েছে
ফাজিলটা। পরেরদিন সকালবেলা,

ঘড়িতে সকাল আটটা। খাবার টেবিলে বসেছে বাড়ির
সবাই। বড়রা গল্প করছে। গিন্নিরা খাবার পরিবেশন
করছে। কিন্তু বাড়ির কনিষ্ঠ তিন সদস্য শীতল, সাম্য,
সৃজন মন খারাপ করে চুপ করে বসে আছে।
একটুপরেই শুদ্ধ এসে চেয়ার টেনে বসল। তার
উপস্থিতি বুঝেও শীতল তাকাল না।

আর না কোনো কথা বলল। তারপর সাইন এলো। গা
ঘেঁষে বসে পড়ল স্বর্ণের পাশে। অতি সন্তপর্নে স্বর্ণের
একটা হাত গুঁজে নিলো তার হাতে।

স্বর্ণে জানে হাত ছাড়ানো সম্ভব নয় তাই অযথা বৃথা
চেষ্টা করল না। বরং মুচড়ামুচড়ি করলে অন্যের
নজরে পড়ার সম্ভবনা আছে। শারায়াত চৌধুরী তখন

সাওয়ান চৌধুরীর সাথে জরুরি ব্যাপারে কথা বলায়
ব্যস্ত। এদিকে এখনো খেয়াল করেন নি। তবে
সিঁতারার ইশারায় তাকালেন অভিমানে পূর্ণ তিনটে
মুখপানে। গলা খাঁকারি দিলেন। তবুও তাকাল না
উনার বাগানের তিনটে ফুটফুটে ফুল। বুঝলেন
গুরুতর কিছু।

তাই আদর দিয়ে ডাকলেন। প্রিয় বড় আব্বুর ডাক
উপেক্ষা করার সাহস নেই কারো। তাই সাম্য টেবিলে
থুতনী রেখে অভিমানী স্বরে জবাব দিলো,

-‘আমরা বুঝে গেছি তুমি আমাদেরকে আর
ভালোবাসো না বড় আব্বু।’

-‘একথা কেন মনে হলো বাবা?’

এবার সৃজন জবাব দিলো,

-‘আমরা তোমার একটা কাজে ভীষণ কষ্ট পেয়েছি
বড় আব্বু।’

-‘কি কাজে কষ্ট পেয়েছো বলো আমাকে? না বললে
বুঝব কি করে?’এবার শীতল মুখ তুলল। সবাইকে
একবার করে দেখে নিয়ে টেবিলের নিচ দিয়ে
সাম্যকে টিমটি কেটে আসল প্রসঙ্গে কথা বলার

ইঙ্গিত দিলো। বোনের ইঙ্গিত পেয়ে সাম্য কণ্ঠে এক
আকাশ সমান দুঃখে ঢেলে বলল,

-‘তুমি নাকি আজকের দিনে বড় আম্মুকে বিয়ে
করেছিলে। অথচ আমাদেরকে কাউকেই নিয়ে যাও
নি। কেন বড় আব্বু?’

সাম্যের কথা শুনে বড়দের হাত থেমে গেছে।
বিশ্ফোরিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সাম্যের দিকে।

সাম্যের কথা শেষ হতেই পুনরায় সৃজন বলল,

-‘আমরা গেলে খুব মজা করতে পারতাম। কিন্তু কেন
নিয়ে গেলে না আমাদের?’

সাম্য, সৃজনের কথা শুনে সায়েন মিটিমিটি হাসতে
হাসতে বাবার দিকে তাকাল। শারায়ফাত চৌধুরীর
চোখ, মুখে অস্বস্তি ফুটে উঠেছে। জবাবে কি বললেন
সেটাই চিন্তা করছেন বোধহয়। সিন্তার চৌধুরী
তরকারী আনার ছুঁতোয় রান্নাঘরে চলে গেলেন। বাবা-
মার অবস্থা দেখে সায়েনের মাথায় শয়তানি বুদ্ধি উদয়
হলো। বাবার থেকে একটানা গাল মন্দ খেতে খেতে
অরুচি এসে গেছে। এই সুযোগে বাবাকে ফাঁদে
ফেলার বাঁশ রেডি করে ফেলেছে। এদিকে সাম্য,
সৃজন এখনো জবাবে আশায় শারায়ফাত চৌধুরীর

দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের আরেকটু উষ্ণে দিতে
সায়ন কিছু বলার আগে শীতল মলিন মুখে
বলল,-‘আমরা ছোটো বলে কেউ আমাদের গুরুত্ব
দেয় না। এতদিন জানতাম বাড়ির কেউ ভালো না
বাসলেও বড় আবু আমাদের ভালোবাসে। কিন্তু আজ
জানলাম বড় আবুও আমাদের না জানিয়ে বিয়ে করে
নিয়েছে।

আর কিছু বলার নাই। আহ্ কষ্ট!’

এবার তাদের কথার সুর ধরে সায়নও হতাশার সুর
ধরে বলল,

-‘তোরা ছোটো। আমি তোদের সবার বড় তাইই
আমাকে সাথে নেয় নি। আসলে এই পৃথিবীতে
ভালোবাসা বলে কিছু নেই রে। থাক কষ্ট পাস না।
আমার বাপের বিয়েতে রোস্ট খেতে পাস নি তো
তাতে কী, বল? আমার বিয়েতে তোদের ডাবল রোস্ট
খাওয়াব।’

সৃজনের প্রতিবাদী স্বর,

-‘না। আমি বড় আবুর বিয়েরই রোস্ট খাব।’

সাম্যেরও একই কথা,

-‘আমিও।’এদিকে সিরাত, সিমিন, শখ, সাওয়ান চৌধুরী পারছে না হেসে মেঝেতে গড়াগড়ি খেতে।
দম ফাঁটা হাসি চেপে রাখাও কত যে কষ্টের হারে
হারেই টের পাচ্ছেন উনারা। ছেলের কথা শুনে
শারাফাত চৌধুরী কপাল কুঁচকে তাকালেন।
বেয়াদবটা কী বলছে এসব? কোথায় ছোটো ভাই-
বোনদের বুঝিয়ে সুজিয়ে প্রসঙ্গ বাদ দিবে তা না। সে
নিজেই আরো উস্কে দিচ্ছে। বড় আব্বুর বিয়েতে
সায়ন ভাইয়াও ছিল না শুনে ছোটোরা আরেকদফা
হতাশ হলো। কষ্ট পেল। নাস্তার প্লেটও দূরে ঢেলে
দিলো। খাবে না তারা।

মনের দুঃখে আজ সারাদিন না খেয়ে থাকবে।
শারাফাত চৌধুরী কাতর চোখে সহধর্মিনীকে মুখ
টিপে হাসতে দেখে হতাশ হলেন। এবার উপায়?
কিভাবে এদের বলবে উনি বিয়ে করেছিলেন বলেই
সায়ন, শুদ্ধ, শখ এ পৃথিবীতে এসেছে। বিয়েটা
জরুরি। কারণ বিয়ে না করলে তারা পৃথিবীর মুখ
দেখত না। উনি সিঁতারাকে ইশারা করলেন বাঁচিয়ে
দিতো। বিনিময়ে যত খরচ করা লাগে করবেন।
এছাড়া উপায় নেই। বাড়ির ছানাপোনারা আঁটঘাঁট

বেঁধে নেমেছে বুঝতে বাকি নেই। তবে উনাদের
কাউকেই কিছু বলতে না দিয়ে শেষ বোমটা ফাটাল
শুদ্ধ। শারায়াত চৌধুরীকে আরেক দফা বিশ্বয়ের
সাগরে চুবিয়ে ভাইবোনদের উদ্দেশ্যে বলল,
-‘কে কে বিয়েতে যাস নি কাউন্ট কর।’ শুদ্ধর কথা
শুনে সবার আগে হাত তুলেছে সিরাত। আবেগে হাত
তুলে বেচারী লজ্জায় মুখ কাঁচুমাচু করছে। উনাকে
লজ্জা থেকে বাঁচল সায়ন। সে সিমিনকে হাত তুলতে
ইশারা করল। সিমিন হাত তুলে সায়নের দিকে
তাকাল সায়ন মাথা নাড়ালো। অর্থাৎ সেও যায় নি।
তারপর শুদ্ধর দিকে তাকাল শুদ্ধ তাকাল শখের
দিকে। শখ তাকাল স্বর্ণের দিকে। স্বর্ণ ঘাড় ঘুরিয়ে
তাকাল শীতলের দিকে। শীতল তাকাল সাম্যের দিকে
আর সাম্য তাকাল সৃজনের দিকে। সজুন তাকাল
পাশের ফাঁকা চেয়ারে। কেউ নেই দেখে তাকাল বড়
আবুর দিকে তাকাল। এবার উনার মুখ দেখার মতো
হয়েছে। কাউন্ট করে দেখা গেল না যাওয়ার সংখ্যা
বেশি। এবং সকলেই উনাদের বিয়েতর এটেন্ড করার
তীব্র ইচ্ছের কথাও জানিয়েছে। অর্থাৎ ছেলে
মেয়েদের অনুপস্থিতিতে মাকে বিয়ের করার

পনিশমেন্ট হিসেবে মা-বাবার আবার বিয়ে দেওয়া হবে। এবারে সাক্ষী হবে ছেলের মেয়েরা। একথা শুনে শারাফাত চৌধুরী নাকচ করে গুরু গম্ভীর সুরে বললেন,-‘ পাগলে হলে তোমরা? ছেলেমানুষী বাদ দাও অন্যকিছু ভাবো।’

একথা শুনে শুদ্ধ গ্লাসে পানি ঢালতে ঢালতে জবাব দিলো,

-‘সাম্য, সৃজন তোরা তাহলে জেনে নে কেন আমাদেরকে বিয়ের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল? না বলা অবধি ছাড়বি না। অন্যায় করেছে, কেন করেছে, এর জবাব দিতেই হবে।’

আরেক ফাজিলের কথায় শারাফাত চৌধুরীর মনে হলো দেওয়ালে মাথা ঠুকতে। এতদিন খাইয়ে পড়িয়ে এক একটা বাঁশ তৈরি করেছেন। এখন কারণে অকারণে সেই বাঁশ নিজেকেই হজম করতে হচ্ছে। সিতারা সেই কক্ষণ লজ্জা থেকে বাঁচতে রান্নাঘরে চলে গেছেন আর বের’ই হোন নি।

ছেলে মেয়েদের সাথে না পেরে শারাফাত চৌধুরীকে রাজি হতেই হলো।

উনি কোনোমতে নাস্তা সেরে উঠতেই সায়ন বলল,-
‘বাবা একটা রিসোর্ট বুক করে ফেলি? সেখানে বিয়ে
বাসরের ব্যবস্থাও থাকে।’

-‘আহাম্মক কোথাকার।’

একথা বলে উনি দ্রুতপায়ে স্থান ত্যাগ করলেন। তবে
যেতে যেতে ঠিকই শুনলেন অউহাসির শব্দ। বাবাকে
তড়িঘড়ি যেতে দেখে সায়ন সকলের দিকে তাকিয়ে
বলল,

-‘বাবাকে বাঁশ দেওয়ার বুদ্ধিটা কার মাথা থেকে
বেরিয়েছে হাত তুল। সে গিফ্ট পাবে।’

একথা শুনে শীতল গদগদ হেসে এক হাত তুলল।
ভোররাতে তার স্মরণ হয়েছে আজ বড় আবু ও বড়
বড় মায়ের বিবাহ বার্ষিকী। কোনোবারই
জাঁকজমকভাবে কিছু করা হয় না। কারণ শারায়ত
চৌধুরী পছন্দ করে না। এজন্য সেই সাম্য আর
সৃজনের মাথায় একথা ডুকিয়েছে যে তাদের বড়
আবু তাদের ভালোবাসে না। ভালোবাসলে কেন
উনাদের বিয়েতে নিয়ে গেল না? ব্যস, বাকিটা
ইতিহাস! আজ রাতে সেহরী খেয়ে কালকে থেকে
রোজা। তাই আজ দুপুরে বিয়ের কাজ সারা হবে।

বাড়িতে বিয়ে বিধায় আনন্দের সীমা নেই। তবে
বিয়ের খাওয়া-দাওয়া হবে রিসোর্টে। ইতিমধ্যেই
তিনঘন্টার জন্য রিসোর্ট বুকিং করেছে সায়ন। তারই
এক বন্ধুর রিসোর্ট বলে হয়েছে। তিনঘন্টার মধ্যে
কাজ সারতে হবে সন্ধ্যায় আবার আরেকজনের
গায়ের হলুদের অনুষ্ঠান হবে। বাড়িতে এত আনন্দ
দেখে শীতল খুশিতে ডগমগ হয়ে কল করল শাহাদত
চৌধুরীকে। হাসতে হাসতে জানাল পুরো ঘটনা।
অতঃপর কথার মাঝে থেমে গিয়ে ধীরে ধীরে
বলল,-‘তুমি আসবে না বাবা?’

-‘না মা। তোমরা মজা করো।’

-‘কাউকে বলে দেখো না বাবা কয়েক ঘন্টার জন্য
হলেও এসো।’

-‘তোমরা মজা করো মা। আমি দূরে থেকেও
তোমাদের সাথে আছি।’

-‘বিশেষ দিনগুলো তোমাকে কাছে পাই না কেন
বাবা? মাঝে মাঝে খুব রাগ হয় তোমার চাকরির
প্রতি। দায়িত্বের প্রতি। এই দায়িত্ব দায়িত্ব করে
আমাদেরকে সময় দাও না তুমি।’

শাহাদত চৌধুরী মেয়ের ছলছল চোখ দেখে নিঃশব্দে হাসলেন। এ নতুন কিছু না। বিশেষ দিনগুলো বাবাকে কাছে না পেলে মেয়েটা এভাবেই অভিযোগ করে বসে। স্বর্ণ বুঝদার। শীতলের মতো যখন তখন আবদার জুড়ে বসে না। তবে মাঝে মাঝে তার চোখজোড়াও বলে ‘ও বাবা এসো।’

কিন্তু আবেগে পড়ে দায়িত্বের অবহেলা কখনো করেন নি করবেনও না। এতে মৃত্যু সই। বাবা আসবে না জেনে শীতল মুখ ভার করে ফোনটা তার মায়ের হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল। সারাদিন বিয়ের ঝামেলা শেষে ক্লান্ত দেহে বাসায় ফিরেছে সবাই। শুদ্ধর সাথে সাইনের কিছু একটা নিয়ে খুব কথা কাটাকাটি হয়েছে। তবে সাইন ভাইয়ের কথায় হেসেছে। হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খাওয়ার অবস্থা তার। ভাইকে হাসতে দেখে শুদ্ধ রাগে জেদে সবার আগে রিসোর্ট থেকে বাসায় এসে ফ্রেশ হতে ওয়াশরুমে ঢুকেছে। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়েও রাগে গা কাঁপছে। এর কারণও শীতল। সব দোষ ওই বেয়াদবটার। আজ সারাদিন

তাকে জ্বালিয়ে মেরেছে। আর এসব ভুলভাল কাজে
ওকে উস্কে দিয়েছে

সায়ন। ভালোবাসার জীবানু টীবানু বলে আজাইরা সব
যুক্তি দিয়ে ব্রেন ওয়াশ করেছে গান্ধীটার। কদিন
ধরেই হচ্ছে এসব। মাথামোটা গান্ধীটাও সেসব ব্রেনে
ঢুকিয়ে তাকে জ্বালাচ্ছে। যখনই শীতলের দিকে
তাকিয়েছে তখনই দেখে শীতল আগে থেকেই তার
দিকে তাকিয়ে আছে। মানে হয় এসবের? সে সময়
নিয়ে শাওয়ার নিয়ে বের হতেই দেখে শীতল বিছানায়
বসে আছে। পরনে অনিয়ন কালারের শাড়ি। খোলা
চুল। কপালে ছোট্ট একটা কালো টিপ। দুপুর থেকে
মাথায় হিজাব পরা থাকলেও এখন এলোচুল।

ওকে দেখেই শুদ্ধ খাটের নিচে থাকা চ্যালাকাঠটা
নিয়ে এক বারি বসিয়ে দিলো শীতলের বাহুতে।
শীতল ‘উফ মা’ বলে কঁকিয়ে উঠল। অন্যসময় হলে
হাউমাউ করে কেঁদে উঠত। কিন্তু এখন কাঁদার তো
দূর বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তারই পায়ের পাতার
উপর উঠে দাঁড়িয়েছে। চোখে ভয়ের লেশমাত্র নেই।
শীতলের পাগলামি দেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে
শুদ্ধ। কেবল শাওয়ার নিয়েছে তারপরেও দরদরিয়ে

ঘামছে সে। কানের পাশ দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে সরু চিকন ঘাম। তার পায়ের পাতার উপর দাঁড়ানো শীতলকে বড্ড বেশি অচেনা লাগছে। চোখে অন্যরকম চাহনী। ঠোঁটে যেন সর্বনাশা কিছুই ইঙ্গিত। তবে সে কিছুতেই এসবে প্রশ্ন দেবে না। তাই শীতলকে স্বজোরে ধাক্কা দেওয়ার আগেই শীতল শুদ্ধর কাঁধ শক্ত করে আঁকড়ে ধরল। অতঃপর কিছু বুঝে ওঠার আগেই শুদ্ধর কানের দুই ইঞ্চি নিচে নরম মাংসে চুমু ঐঁকে বসল। হঠাৎ ই নরম ওষ্ঠ ছোঁয়ায় কেঁপে উঠল শুদ্ধর সর্বাঙ্গ। চোখে, মুখে স্তম্ভিত ভাব। কেবলই কী ঘটল তা বুঝে ওঠার আগেই শীতল ফিসফিস করে বলল,

-‘শুদ্ধ ভাই? আপনার নামে যদি দু’একটা কলঙ্ক মাখি আপনি কি রাগ করবেন, হুম?’ ঘড়িতে তখন বেলা এগারোটা,

থমথমে মুখে বাড়ির বড় কর্তা শারাদাত চৌধুরী বসে আছে বিলাশবহুল সোফায়। পরনে সাদা পাজামা-পাজ্জাবী। চোখে, মুখে একরাশ বিরক্তি।

উনি একই স্থানে বসে আধাঘন্টা যাবৎ দেখে যাচ্ছেন অন্যসব সদস্যের হুঁটোপুঁটি। এটা ওটা নিয়ে চিৎকার-

চাঁচামেঁচি। বাবা-মায়ের বিয়েতে তার ছেলে-মেয়েরা
আদৌও বরযাত্রী রূপে গিয়েছি কী না জানা নেই
উনার। হয়তো চৌধুরী বাড়িতে এই ঘটনা বিরল।
যদিও এটা অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। কারণ এ বাড়িতে
একেক পন্ডিতের বসবাস। এরা নিজেরা একেক টা
নিউটন কিংবা আলবার্ট আইনস্টাইন। নতুবা এ
বয়সে বাবাকে নতুন করে বিয়ের পিঁড়িতে বসায়?
নাকি এসব অত্যাচার করে? এখানে উনিই বর। অথচ
উনার মতের দাম নেই। কিছু বলার সুযোগ নেই।
কিছু বলতে গেলে বড় দামড়া দুটো ঠিকই পাল্টা যুক্তি
দাঁড় করাচ্ছে। নতুবা অবুজ বাচ্চাগুলোকে ভুলভাল
বুঝিয়ে আরো উস্কে দিচ্ছে। তারা মূলত চাচ্ছেই
উনাকে অস্বস্তিতে ফেলতে। বড় গাধা কিছুক্ষণ আগে
বলেছে, ‘সে নাকি ভালো বাবা ডিভার্জ করে।’ তার
মায়ের উচিত ছিল জেনেবুঝে একজন ভালো মানুষকে
বিয়ে করা।’ একথা দ্বারা বোঝাল উনি ভালো মানুষ
না। ছেলের কথা শুনে শুধু চিৎকার করে বলতে
পারেন নি, ‘এ্যাঁই বেয়াদব, তোকে পয়দা করলাম
আমি। বড় করলাম আমি। পড়ালেখাও শেখালাম

আমি। অথচ এখন তুই আমাকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বাঁশ দিচ্ছিস! এই তোর শিক্ষা!’

কিন্তু বুকের কথা মুখ ফুটে বলতে পারেন নি কিছুই। পারবেন কিভাবে? ছেলের মতো বেহায়া নাকি উনি? ব্যাপারটা এখানে থামলেও হতো। তা অবশ্য থামে নি। বাড়ির বউরা শতরূপাকেও ঘটনাখানা জানিয়েছে। এই মাত্রই শতরূপা দ্বিতীয় বিয়ের জন্য অভিনন্দন জানাল। সেও নাকি গেস্ট নিয়ে রিসোর্টে ভাইয়ের বিয়ে খেতে যাবে। ছিঃ! ছিঃ! এসব কী সহ্য হয়? তাছাড়া লোকে কী বলবে? সামনে না বলুক পেছনে তো ঠিকই বদনাম করবে। বলবে, বুড়ো বয়সে ভীমরতি। ছেলের বিয়ে দেওয়ার বয়সে উনি নিজেই বিয়ের পিঁড়িতে বসছে। একটুপরেই সূর্যোদয় রিসোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা দিবে উনারা। অথচ বাড়ির মেয়ে বউয়ের সাজগোজ শেষ হয় নি।

যে যার মতো সময় নষ্ট করছে অথচ কিছু বলতেও পারছেন না। কারণ একবার বলতে গিয়ে কনিষ্ঠ বিচ্ছু সাম্যের কথায় অপদস্থও হতে হয়েছে। তাই ভেবেছেন কিছুই বলবেন না। বললেই তখনকার মতো শুনতে হবে ‘বিয়ের জন্য বড় আকস্মিক তর

সইছে না। শীতল, শখ, স্বর্ণ তিনবোন এক রুমে রেডি
হচ্ছে। স্বর্ণ শখের শাড়ির কুচি ঠিক করে দিচ্ছে।
তারা তিনবোনই শাড়ি পরবে। কালার আলাদা হলেও
এক কোয়ালিটির শাড়ি সব। সঙ্গে মেচিং হিজাব।
এদিকে শীতল এখনো মুখ ভোঁতা করে চুপ করে
বসে আছে। ভাব দেখে মনে হচ্ছে এন্ফুণিকেন্দে
দেবে। কারণ তার একচোখের আইলাইনার মোটা তো
আরেক চোখেরটা ত্যাড়া বাঁকা, এবড়োথেবড়ো।
তখন সৃজন না জ্বালালে এমন হতো না।

পাজিটাকে বার বার বারণ করা সত্ত্বেও তাকে
নড়িয়েছে। ফলস্বরূপ কষ্ট বৃথা। এখন মুছতে গিয়ে
পুরো মুখি কালি হয়ে গেছে। শীতল মুখ কাঁদো কাঁদো
করে আয়নায় নিজেকে দেখল। ভূতের মতো
দেখাচ্ছে। হুট করে কারো সামনে দাঁড়ালে নির্ঘাত
অক্লা পাবে। নিজের করুণ অবস্থা দেখে শীতল
দুঃখভরা কণ্ঠে শখকে ডাকল। বলল, -‘আপু,
আইলাইনার ঠিক করে দাও।’

-‘এই তো সোনা আর একটু দাঁড়া হয়ে গেছে আমার।
তার আগে ঝটপট মুখ ধুয়ে আয় দেখি।’

শখের কথা শুনে শীতল ওয়াশরুমে গিয়ে পুরো মুখ ধুয়ে এলো। গরমের যে অত্যাচার মেকাব করার ভুল করা যাবে না। তাছাড়া শুদ্ধ ভাই আছে। সে নিরামিষ টাইপের পুরুষ মানুষ মেকাব টেকাব পছন্দ করে না। দেখা যাবে মুখের উপরেই বলে বলবে, ‘এ্যাই তুই অন্য গাড়িতে যা। এমনিতেই ওয়েদার গরম। তোর মুখের এত আটা ময়দা দেখে আরো গরম লাগছে।’ মানুষটার মুখের লাগাম নেই যাতা বলে অপমান করে বসতে পারে। সেই সুযোগে থাকে বোধহয়। শাড়ির সাথে হিজাবও তো পরতে হবে। নয়তো এক আছাড়ে নাড়িভুড়ি বের করে দিয়ে তাকেই জিজ্ঞাসা করতে পারে, ‘বারণ করেছিলাম হিজাব ছাড়া বের হতে? আর বের হবি? আর আমার কথার অবাধ্য হবি?’ কি দরকার শুধু শুধু বকা খাওয়ার। হিজাবের সাথে ভারী মেকাব তার নিজেরও পছন্দ নয়। স্কিণেও সুট করে না। কারণ স্কিন সেনসিটিভ। একটু এদিক ওদিক হলে দুগালে, কপালে, নাকে, খুতনীতে ব্রণের দেখা মিলে। যদিও আজকাল মুখ ফ্রেশ আছে। দাগ টাগও তেমন নেই। স্বর্ণ কোথায় থেকে কিসের কিসের যেন গুঁড়া এনে

দিয়েছে। সেসব দিলে পুরো স্কিণ চকচক করে।
এখনো করছে। তাই ওসব মেকাব টেকাব না দিলেও
চলবে। এসব ভাবতে ভাবতেই আয়নায় তাকিয়ে
শীতল তার মুখের পানি মুছল। চোখের পাতার
উপরিভাগ আরেকটু ঘষাঘষি করল। অনিয়ন কালার
শাড়ি পরেছে সে। ফর্সা গায়ে রংটা যেন ফুটে
উঠেছে। শাড়িতে কী একটু বড় বড় লাগছে নাকি,
হুম? লাগবেই তো, সে এখন কলেজে পরে। কলেজ!
ভাবা যায়? কলেজে পরা মেয়ে বড় তো অবশ্যই
হয়েছে, তাই না?

মনে মনে একথা ভেবে মুখ টিপে হাসল শীতল।
হঠাৎ মাথায় শয়তানি বুদ্ধি উদয় হলো। আচ্ছা শুদ্ধ
ভাই এখন কি করছে? ঘন্টা খানিক আগে
সাম্য, সৃজনকে চুল কাটাতে নিয়ে গিয়েছিল। বিচ্ছু
দুটো জেদ ধরেছিল তারা শুদ্ধ ভাইয়ের মতো করে
চুল কাটবে। ওই কাটে নাকি শুদ্ধ ভাইকে হিরো
হিরো লাগে। আজ তারাও হিরো হিরো লুক নিতে
চায়। পরে শুদ্ধ যেখানে চুল কাটে সেখানে নিয়ে
গিয়েছিল। নিজেও চুল কেটেছে আর বাকি দুটোরও
কাটিয়েছে। তা সেই মানুষটা আর নিচে নামে নি

কেন?তাকে একবার জ্বালিয়ে এলে কেমন হয়, হুম?
জ্বালিয়ে আসতে আসতে শখ, স্বর্ণ আপুও রেডি হয়ে
যাবে। দু'জন সাজালে সেও চটজলদি রেডি হয়ে
নিতে পারবে। হ্যাঁ, যেই ভাবা, সেই কাজ। সে শখকে
আসছি বলে শাড়ির কুচি ধরে উপরে গেল। শুদ্ধর
রুমের দরজা হালকা করে ভিজিয়ে রাখা। অর্থাৎ
রুমেই আছে সে। আচ্ছা দুম করে ঢুকে গিয়ে শুদ্ধ
ভাইকে একটু চমকে দেওয়া যাক? চমকে গিয়ে
খুশিও হতে পারে। খুশির ঠেলায় কিছু টাকাও দিতে
পারে। সকাল থেকে দুই হাত চুলাকাছে টাকা আসার
সম্ভবণা শতগুন। তাই সাড়াশব্দ না করে ঢুকতে গিয়ে
আচমকা নাকের উপর কুশন এসে পড়ল। কুশন
ক্যাচ করে মুখ ভোঁতা করে দেখে শুদ্ধই ছুঁড়ে
মেরেছে। এও বুঝল নক না করে ঢুকার শাস্তি।
শীতল কুশন ধরে রেখে গমগমে সুরে বলল,-
অপ্রয়োজনে আসি নি প্রয়োজনেই এসেছি।’

-‘বলে বিদায় হ।’

-‘ফুল এনে দেন।’

-‘ফুল কি করবি?’

-‘চুলে লাগাব।’

-‘এই বুদ্ধি নিশ্চয়ই তোর মাথা থেকে বেরিয়েছে?’

-‘হুম। আমি ছাড়া সৎ বুদ্ধির মানুষ এ বাড়িতে আর ক’জন আছে?’

-‘তা অবশ্য ঠিক।’

-‘এবার ঝটপট ফুল এনে দিন দেখি।’

-‘ওসব ফুল টুল গুঁজতে হবে না। হিজাব পর।’

-‘না। আমি হিজাব পরব না।’

-‘ তাহলে আর যাওয়ার দরকার নেই। রুমে গিয়ে ঘুমা।’

-‘কেন যাব না? আমার বড় আকবুর বিয়ে আমি যাব। আর হিজাব ছাড়াই যাব।’

-‘তাহলে আমিও তোর পায়ের নলা কাটব, আজই কাটব। নিচে গিয়ে বল কেউ যেন হিজাব ছাড়া বের না হয়। আমার চোখে পড়লে খবর আছে এক একটার।’-‘এত সুন্দর শাড়ির সাথে হিজাব ভালো দেখাবে না শুদ্ধ ভাই।’

-‘না দেখাক।’

-‘প্লিজ।’

-‘উহুম, অজুহাত চলবে না। যা বলেছি সেটাই কনফার্ম।’

-‘এই শাড়ির সাথে কোন কালারের হিজাব পরব তাহলে?’

-‘বাড়িতে কী মেয়েমানুষের অভাব যে এখন আমাকে হিজাব চুজ করে দিতে হবে?’

-‘দিলে কি হয়?’

-‘তুই যাবি এখান থেকে?’

-‘বাড়ির মেয়েরা শাড়ি পরলে খ্যাচখ্যাচ করতে নেই। সুন্দর নজরে একটু তাকাতে হয়। প্রশংসা করতে হয়। একটু প্রশংসা করলে কারো জাত যায় না, হুহ!’ শাড়ির কথা শুনে শুদ্ধ এতক্ষণে খেয়াল করল শীতল শাড়ি পরেছে। এই শাড়ির নামধাম জানে না যদিও। তবে শাড়িটা সুন্দর। মানিয়েছেও বেশ। আচ্ছা মানালেই কী শাড়ি পরতে হবে? অবিবাহিত মেয়ের ঘনঘন শাড়ি

পরা কিসের? তারা জানে না শাড়ি পরলে নজর লাগে? নজর লাগলেই বাড়িতে ঘটকের আনাগোনা শুরু হয়। তখন প্রস্তাব আসতেই থাকে। যা চরম মাত্রায় অসহ্যকর! একথা ভেবে তার বিরক্তির মাত্রা দ্বিগুন বাড়ল। আজ প্রচুর গরম। এ গরমে শাড়ি পরে যাবে শীতল? সামলাতে পারবে? নাকি গিয়ে হাসফাঁস

করে বলবে, 'কেউ আমাকে বাড়ি নিয়ে চল। শরীর
খারাপ করছে। আমি মরে যাচ্ছি।' এসব তো নতুন
না। এসব বহু পুরনো কথা। জানা কথা। তার প্রতিটা
কাজকর্ম সম্পর্কে সকলেই অবগত কী না। এইতো
দু'মাস আগের এক ঘটনা, সেদিন শারায়াত চৌধুরীর
বন্ধুর

মেয়ের বিয়েতে সে ছাড়া বাড়ির সবাই গিয়েছিল।
সেদিনও শীতল শাড়ি পরেছিল। এই মেয়ের আবার
শাড়ি পরতে অকেশন লাগে না। মন ভালো থাকলেই
মাঝে মধ্যে শাড়ি পরে। তবে এখনো শাড়ি সামলাতে
শেখে নি।

তবে কবে শিখবে কিংবা আদৌও শিখবে কী না তা
অবশ্য জানাও নেই। তো সেদিন বিয়ে বাড়ি গিয়ে কুঁচি
পায়ে বেঁধে পড়েছিল। মুখ খুবকে পড়ে খুতনী কেটে
গিয়েছিল। রক্তারক্তি অবস্থা। নতুন বর-বউকে রেখে
সবাই ওকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। পরে সাওয়ান
চৌধুরী তাকে ফোন করে শীতলকে বাড়ি আনার কথা
বলেন। অগত্যা ল্যাবের কাজ রেখে বকতে বকতে
বেয়াদবটাকে আনতে যায়। খুতনী শক্ত করে চেপে
ধরার পরেও রক্ত বন্ধ হচ্ছিল না। কাঁদছিলও খুব।

ওর কান্না দেখে ভেবেছিল ব্যথায় কাঁদছে। রাগ টাগ
ভুলে সাত্বনা দিয়েছিল, ‘কাঁদিস না। মেডিসিন নিলেই
ব্যথা কমে যাবে।’ একথা শুনে সে জবাব দিয়েছিল,
‘সেলাই টেলাই যেন না করে শুদ্ধ ভাই। সেলাই
করলে খুতনীতে দাগ পড়ে যাবে। তখন বিয়ে হবে না
আমার। বরপক্ষ এসে বলবে খুতনী কাঁটা বউ নিবো
না আমরা। এভাবে একের পর পাত্র ফিরে গেলে
তখন বিয়েই হবে না আমার।’ তার কথা শুনে
ডাক্তারও হো হো করে হেসে ফেলেছিল। পরে সেলাই
না দিলেও খুতনীতে হালকা দাগ এখনো রয়েছে
গেছে। দূর থেকে বোঝা না গেলেও খুব কাছ থেকে
বোঝা যায় দাগটা। তবুও এ মেয়ের হুঁশ হয় না।
প্রচলিত প্রবাদে আছে ন্যাড়া বেল তলায় একবারই
যায়। আর শীতল যায় বারে বারে। কেন যায়? কারণ
বেল বারবারই তারই মাথায় পড়ছে কী না সেটাই
দেখার জন্য যায়। নতুবা এই মেয়ের এতদিনে
কান্ডজ্ঞান হতো। যার যা ভালো লাগে করুক
কাউকেই কিছু বলবে না। শুদ্ধ হাতের বইটা সেক্ষে
রেখে উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল,
-‘আমার পাঞ্জাবী..!’

শুদ্ধর কথা শেষ হতে দিলো না শীতল। তার আগেই
হড়বড় করে বলল,

-‘এখন কোনো কাজ করতে পারব না শুদ্ধ ভাই।’

-‘কেন?’

-‘শাড়ি পরে কাজ করলে শাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে।
তাছাড়া এ জীবনে একটা শাড়ি এনে তো বলতে
পারলেন না, ‘শীতল ধর, এটা তোর জন্য। পরিস
কেমন?’

-‘(....)’

-‘মানুষের বড় ভাইরা দেখি তার ছোটো বোনকে
কত কিছু কিনে দেয়। অথচ আপনি?’

-‘(....)’-‘জীবনে তো এক টাকাও খরচ করতে
দেখলাম না। এত টাকা কোথায় রাখবেন শুনি?’

শুদ্ধ শুধু শুনে গেল। সে আপাতত ভেবে পেল না
মানুষ এত বেইমান হয় কিভাবে? তিন বোনকে একই
রকম ড্রেস কিনে দেওয়ার দুইমাস হয় নি।
তিনজনেরই নাম খোদাই করা একই রকম স্বর্ণের
ব্রেসলেট। নুপুর। দুলা। ড্রেস। হিজাব। আরো কত কী
এনে দিয়েছে। যতবারই টাকা থেকে আসে ততবারই
কিছু না কিছু আনে। অথচ এ বেইমান বলছে সে

নাকি কখনো কিছু এনে দেয় নি। ঠোঁট মোছা মুরগী
কোথাকার। আগে ভালো জিনিস তুলে নিয়ে এখন
বলে কী না কিছুই নেয় নি। ঘষেটি বেগম বেগমও
এত তাড়াতাড়ি পাল্টি খায় নি যত তাড়াতাড়ি এই
মেয়ে পাল্টি খেতে পারে। সে কথা বাড়াল না হালকা
আকাশী রংয়ের পাঞ্জাবী বের করে বিছানার উপর
রাখল। আজ এটাই পরবে। তারপর ওয়ালেট থেকে
দুইশত টাকার নোট পাঞ্জাবীর উপর রেখে ওয়াশরুমে
চলে গেল। শীতল বুঝল পাঞ্জাবী

আইরণ করে দিলো টাকা তার। টাকা যেহেতু পাওয়া
যাবে তাহলে দেবী কিসের? টাকার বেলাতে সে
আবার না করতে পারে না। তাই একগাল হেসে
আঁচল কোমরে গুঁজে আধভেজা চুলগুলো হাতখোঁপা
করে নিলো। তারপর শুদ্ধর বের করা পাঞ্জাবীটা নেড়ে
চেড়ে মুখ কুঁচকাল। এটা তার ভালো লাগল না। শুদ্ধ
ভাইকে তো সাদা পাঞ্জাবীতে বেশ লাগে। তাই সে
কার্ড খুলে হ্যাংগারে ঝুলানো অনেকগুলো পাঞ্জাবীর
মধ্যে থেকে খুঁজে খুঁজে সাদা পাঞ্জাবী বের করল। এই
পাঞ্জাবীটা একটু বেশিই সুন্দর। এর আগে পরে নি
বোধহয় একেবারে নতুন। বুকের কাছে ডিজাইনও

বেশ। সে পাঞ্জাবীটা নিজ গায়ে ধরে আয়নার সামনে
দাঁড়িয়ে খুব আফসোস করল। মেয়েদের যদি পাঞ্জাবী
পরার নিয়ম থাকত সেই কবেই এটা চুরি করে নিয়ে
যেতো। কিন্তু তাতো আর নেই, আহা! কেন যে
এমন নিয়ম বের হয় না? নারী-পুরুষ সমান
অধিকার। তাহলে পুরুষ পাঞ্জাবী পরলে নারী পরতে
পারবে না কেন? একথা ভাবার পরমুহূর্তে পাঞ্জাবীটা
নিজের গায়ের উপর থেকে সরিয়ে শাড়ি পরা
নিজেকে দেখে মুচকি হাসল। ছোট

ছোট চুল কানের পেছনে চুল গুঁজে বিরবির করে
উচ্চারণ করল, ‘উহুম শাড়িতেই নারী।’

অতঃপর গুনগুন করতে করতে সে যত্ন করে
পাঞ্জাবীটা আইরণ করল। ড্রেসিংটেবিলের একটি
তাকে ওয়াচের কালেকশন। একেকটা একেক
রকমের। সে গ্লাস সরাতে গিয়ে বুঝল লক করা।
কিছু ভেবে পারফিউম রাখা তাকের গ্লাস খুলতে
গিয়েও দেখল সেটাও লক। টানাটানি করেও খোলা
গেল না। তবে সে রাগ করা দূর ফিক করে হেসে
ফেলল। একবার ভেঙ্গেছে দেখে বেচারী ভয়ে এবার
লক করে রেখেছে। তবে কী বিশুদ্ধ পুরুষ মনে মনে

তাকে ভয় পায়, হুম, হুম?কতক্ষণ একা একা হাসল
সে। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল সাজগোজ করা হয় নি
তার। শখ বোধহয় ডাকছে। এই রুমটা তো
সাউন্ডপ্রুফ ডেকে মরে গেলেও কারো ডাক কানে
পৌঁছাবে না। তাই সে ওয়াশরুমের দরজায় থাবা
দিয়ে বলল,

-‘শুদ্ধ ভাই, আইরণ করে দিয়েছি।’

একথা বলে পুনরায় দরজায় আরেক থাবা বসিয়ে
বলল,

-‘সাইন্টিস্ট মানুষের মেলা টাকা। দুইশ টাকায় লস
হয়ে যায় তাই হাজার টাকা নিয়ে গেলাম।’

একথা বলে দুইশ টাকার নোটটা ওয়ালেটে রেখে
দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

আসলে হিজাব পরবে না বলে শুদ্ধকে রাগাতে
এসেছিল। আর পাঞ্জাবী আইরণ করার কাজ এ নতুন
নয়। বাবা এলে বাবার টা করে দেয়। সায়ন
ভাইয়েরটা করে। সাম্য, সৃজনের করতে হয়। বড়
আবু, মেজো আবুও কখনো কখনো আইরণ করার
কাজ দেয়। কখনো বা বোতাম লাগানোর হুকুম
আসে। বাড়ির ছোটো সদস্য হলে এমন টুকটাক সব

কাজ করতেই হয়। অভ্যাসও আছে। শীতল শাড়ি ধরে কোনোমতে সিঁড়ি বেয়ে নেমেই ছুঁটল শখের রুমে। শখ, স্বর্ণ রেডি হয়ে বসে আছে। সিঁতারা, সিমিনের কথা শোনা যাচ্ছে। তারা বাকিদের তাড়া দিচ্ছেন। সিরাত সাইনকে কল করে বকাবকি করছে। ছেলেটা গাড়িতে তেল ভরার নাম করে সেই কখন বেরিয়েছে এখনো ফেরার নাম নেই। কোথায় যাওয়ার কথা বললেই এই ছেলের কাজ বাঁধে। এতক্ষণ টইটই করে ঘুরে শীতল এবার তাড়াতাড়ি করে ওকে সাজিয়ে দেওয়ার তাড়া দিলো। শখ, স্বর্ণ একসাথে শীতলকে রেডি করে দিলো। সাজ বলতে আইলাইনার, কাজল, ঠোঁটে লিপবাম, হাতে চুরি এই তার সাজ। তারপর শীতল নিজেই হিজাব বেঁধে নিলো। শখ, স্বর্ণ একদম হালকা সাজে তৈরি। শখ আর শীতলের জোড়াজুড়িতে

স্বর্ণ শাড়ি পরতে বাধ্য হয়েছে। সে শাড়ি সামলাতে পারলেও এক অভদ্র পুরুষকে সামলানো খুব মুশকিল হয়ে যায়। শুধু ড্যাভড্যাভ করে তাকিয়ে থাকে। সুযোগ পেলে বলে, ‘জান রে আর কত ধৈর্যের পরীক্ষা নিবি? হয় চুপিচুপি বিয়ে কর নয়তো বাড়িতে জানাতে দে।

তোর কারণে আমার বাচ্চাদের স্কুলে ভর্তি করাতে
দেরি হয়ে যাচ্ছে।’

স্বর্ণ বিরক্ত হয়। চোখ পাকায়। তা দেখে সায়ন
কিছুক্ষণের জন্য চুপচাপ থাকলেও একটুপর যা তাই।
মাঝে মাঝে তার পাগলামি দেখে সন্দেহ হয় এই
পাজি পুরুষটা নাকি রাজনীতি করে। মানুষ জবাই
করে গবাদিপশুর মতো। তার হাত কাঁপে না। অন্তর
কাঁপে না। অথচ সেই পুরুষ তার কাছে এলেই যেন
সবটুকু ধৈর্য হারায়। কথার লাগাম ছুটায়।
রোমান্টিকতার তার কথায় কথায় ঝরে পড়ে। ব্যাকুল
চোখে তাকেই দেখতে থাকে। অথর্ সে বাইরের
পৃথিবীর কাছে কঠিন, পাষণ্ড, পুরুষ হলেও কেবল
তারই কাছে

সায়ন অন্যরকম। তিনবোন রেডি হয়ে বেশ কয়েকটা
সেলফি তুলল। তারপর একে একে ড্রয়িংরুমে গিয়ে
দাঁড়াল। তিনবোনকেই অনিন্দ্য সুন্দর দেখাচ্ছে।
চৌধুরী নিবাসের এক একটা জীবন্ত পুতুল যেন
তারা। শারফাত চৌধুরী চায়ের কাপে চুমুক দিতে
গিয়েও থেমে গেলে। দেখলেন তিন রাজকন্যাকে।

মনে মনে আওড়ালেন, ‘মাশাআল্লাহ! মাশাআল্লাহ!
মাশাআল্লাহ!’ মেয়েগুলো

বড় কী সত্যিই বড় হয়ে যাচ্ছে? উনার কাছে তো
ছোটোই আছে। এখনো মনে হয় কেবলই পৃথিবীতে
এলো তারা। কেউ বাবা ডাকল তো কেউ বপ বু বলে
বাড়ির মাতিয়ে তুলতো। মেয়েরা বড় হলেও যত
মুশকিল। তাদের বাপের বাড়ি থাকার মেয়াদ ফুরিয়ে
আসে। নিজের বাবার মেয়ে বিদায় করার তাড়া না
থাকলেও অন্যের কাছে যেন মেয়ে ভারী হয়ে আসে।
পথ ঘাটে লোকমুখে শুনতে হয়, ‘মেয়ের বিয়ে দিবেন
না?’ একথা ভেবে হঠাৎ কেন জানি বুক ভার হয়ে
এলো উনার। কত আদর যত্নে গড়ে তুলেছেন তিন
রাজকন্যাকে। এমন না শখ আপন মেয়ে বলে তাকে
আলাদা ভাবে দেখেছে। উনি ভাবেন উনার তিনটা
মেয়ে। আর তিনটাই উনার। তিনটার একটা কষ্ট
পেলে উনার বুকে বিঁধে। শীতলটা কিডন্যাপ হলো
সেদিন কী উনার বুকের ভাঙ্গন দেখেছিল? না কেউ
দেখে নি! শীতল বাসায় ফেরার পর আল্লাহর দরবারে
দুই হাত তুলে উনারা তিন ভাইই দুই চোখের পানি
ঝরিয়ে শুকরিয়া আদায় করেছিল একথা কেউ জানে

না। জানবেও না!একবার রিকশার চাকায় স্বর্ণের
ওড়না বেঁধে গিয়ে প্রচন্ড ব্যথা পেয়েছিল গলায়।
গলার চামড়া ছিলে যাচ্ছে তাই অবস্থা হয়েছিল।
মেয়েটা তিনদিন কথা বলতে পারে নি। সেই তিনদিন
উনি একটু পর পর গিয়ে মাথায় হাত বুলিয়েছেন।
উনার মনের অবস্থা বুঝে বুঝদার স্বর্ণ উনার দুহাত
মুঠোয় পুরো অনেক কষ্টে বলেছিল, ‘আমি ঠিক আছি
বড় আব্বু। কই,ব্যথা নেই তেমন একটা।’ অথচ
গলায় প্রচন্ড ব্যথা ছিল। সাম্য, সৃজনের জ্বর এলে
এখনো জ্বালিয়ে মারে। রাত বিরেতে কেঁদে কেটে
বাড়ি মাথায় তুলে। কী জেদ তাদের। পরে উনিই
বুকে নিয়ে হেঁটে হেঁটে ঘুম পড়ান। গল্প শুনান। গল্পের
ছলে সূরা পড়ে ফুঁ দেন। সায়ন, শুদ্ধ বড় হয়েছে।
কিন্তু তারা বাড়ি না ফিরলে উনি আগে টের পান।
বাবার মন বলে হয়তো বুঝতে পারেন। কিছুদিন
সায়ন আহত হয়ে বাড়ি ফিরল রাগ দেখালেন ঠিকই
কিন্তু তার সেবাযত্নের ত্রুটি রাখেন নি। কথা না
বললেও বাসায় ফিরে সব খোঁজই নিতেন।শুদ্ধ তো
প্রায়ই ঢাকাতেই থাকে। ঢাকায় থাকলে তাকে কি?
তার ফ্ল্যাটের কর্মরত লোকদের সাথে উনার সরাসরি

কথা হয়। শুদ্ধ বরাবরই খুঁতখুঁতে স্বভাবের। যার তার হাতে খাবে না যার তার জিনিস নেবো না। রান্নার ব্যাপারেও তাই। হয় নিজে রান্না করে খাবে নতুবা তার ঠিক করা রাঁধুণী রান্না করে দিয়ে যাবে। ছেলের যাতে সুবিধা হয় উনি সেই খেয়াল রাখেন। বাকি রইল শখের কথা। সে আর ক'দিনের অতিথি মাত্র। ভাবলে বুক পাঁজর ভেঙ্গে আসে। শখটা বড্ড নরম স্বভাবের। কষ্ট পেলেও বলবে না কষ্ট পাচ্ছি। শখের পরপরই স্বর্ণের পালা তারপর ছোট শীতলের। কী অদ্ভুত, পেলেপুষে বড় করে কলিজাগুলোকে নাকি পরের বাড়িতে দিতে হবে। মায়ার বাঁধন কাটিয়ে চলে যাবে পরের বাড়ি। তখন চাইলেও জোর দেখাতে পারবেন না। শখ, স্বর্ণ বরাবরই বুঝদার। তবে শীতল? এই মেয়ে মাথাতেই বড় হয়েছে বোধবুদ্ধি হয় নি। নতুবা রাত দিন যেচে পড়ে শুদ্ধর পায়ে পাড়া দিয়ে ঝগড়া করে। মার খায়। সে বাড়ির ছোটো কন্যা হিসেবে সবারই যেমন আদরের তেমনি আহ্লাদী'ও। সত্যি বলতে মেয়েটা ছোটো থেকে বাবাকে কাছে পায় না বলে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা তার জন্যই বরাদ্দ

থাকে। এজন্য মাঝে মাঝে তার ভুলচুক চোখে দেখেও
দেখেন না।

এদিকে বাড়ির তিন গিন্নিও একেবারে তৈরি। উনাদের
পরনে জামদানী শাড়ি। ম্যাচিং হিজাব। স্বর্ণের গয়নায়
স্পষ্ট চৌধুরী বাড়ির গিন্নি উনারা। শারফাত চৌধুরী,
সাওয়ান চৌধুরী, সাম্য, সৃজন, সবার পরনে আজকে
সাদা পাজামা-পাঞ্জাবী। একটুপরে শুদ্ধও নিচে নামল।
বরাবরের মতোই চুপচাপ সে। মুখভঙ্গি গম্ভীর্যভাব।
তাকে দেখে শীতল মিটিমিটি হাসছে। পাঞ্জাবী বদলে
যাওয়ায় বিশুদ্ধ পুরুষ যে বিরক্ত বুঝতে বাকি নেই
তার।

তবে এই লোক আদৌও জানে সাদা পাঞ্জাবী-
পাজামাতে তাকে ঠিক কী পরিমান সুদর্শন লাগছে?
জানে না বোধহয়! জানলে নাচতে নাচতে এসে তাকে
একটা ধন্যবাদ দিতো। যদিও এটা তার থেকে আশা
করা আকাশ কুসুম ভাবনা। শুদ্ধ নেমে এসে
দাঁড়াতেই সাওয়ান চৌধুরী তার কাঁধ ধরে এবার
বলেই ফেললেন, ‘কি রে বাপ সাদাতে কী দারুণ
দেখাচ্ছে তোকে।’ শুদ্ধ নিশুচপ। এটা তার কাছে নতুন
কিছু না। একথা অনেক শুনেছে তাই

তার মতে বিশেষভাবে পাত্রা দেওয়ার মতো কিছু না
এটা। তবে অদূরে দাঁড়ানো সিরাত সিঁতারার উদ্দেশ্যে
বললেন, ‘আমাদের শশুড়ের আকার গঠন পেয়েছে
শুদ্ধ, তাই না ভাবি? আকরা তো এমনই উঁচা লম্বা
দেখতে শুনতে ছিল।’ সিঁতারা মেজো জায়ের কথা
শুনে হেসে সম্মতি সূচক মাথা নাড়ালেন। শুদ্ধ বসেছে
বাবার পাশে। তবে কথা বলছে সাওয়ান চৌধুরীর
সাথে। সবাই এখানে হাজির হলেও সায়নের দেখা
নেই। তার খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেল, ঘামে ভিজে
হত্তদন্ত হয়ে বাসায় কেবল ফিরছে সায়ন।

সবাইকে রেডি দেখে একপ্রকার দৌড়ে যেতে যেতে
শারায়াত চৌধুরীর উদ্দেশ্যে বলল,

–‘নতুন বরদের বকবক করতে নেই বউ বাচাল হয়।’
একথা বলে রুমের দিকে ছুটল সে। এদিকে সময়
হয়ে গেছে তাই শুদ্ধ যাওয়ার কথা বলল। কারণ
সময় নির্ধারণ করে রিসোর্ট বুক করা। দেখা যাবে
তাদের টিলেমীর কারণে বিশেষ কাজটা সম্পূর্ণ করা
আগেই সময় শেষ। এরচেয়ে কেউ যাক ওখানে।
পরপর দুটো গাড়ি পাকিং লটে দাঁড় করানো। একটায়
বড়রা উঠল। আরেকটাতে ছোটোরা সবাই। বড়দের

যাওয়ার কথা জানালে উনারা সাবধানে আসতে বলে
চলে গেলেন। শুদ্ধ বসেছে ড্রাইভিং সিটে। পাশে
বসেছে শীতল। তার কোলে সাম্য। পেছনের সিটে
শখ, স্বর্ণ আর সৃজন। এইদিকে এখনো সায়নের
আসার নাম নেই।

তখন শীতল মুখ কাঁচুমাচু করে বলল,-‘ আমি গিয়ে
সায়ন ভাইয়াকে ডেকে আনি।’

একথা বলে সাম্যকে কোল থেকে নামতে বলতেই
শুদ্ধ বলল,

-‘প্রয়োজন নেই। সময় হলে ঠিকই চলে আসবে।
তাছাড়া চোখ থাকতেও যারা অন্ধ তাদের বিশ্বাস
সেই। তাই আগেই বলে দিচ্ছি কেউ পড়ে টরে গেলে
হসপিটালে যেতে পারব না আমি।’

একথা শুনে শীতল মুখ বাঁকাল। খোঁচাটা যে তাকেই
মারল বুঝতে বাকি নেই। তবুও শুদ্ধর বারণ অমান্য
করে নামতে গেলে শুদ্ধ পুনরায় বলল,

-‘বারণ করেছি।’

-‘ওয়াশরুমে যাব।’একথা বলে সে শাড়ি সামলে নিচে
নামল। গুঁটি গুঁটি সায়নের রুমে গিয়ে দেখল সায়ন

কেবল শাওয়ার নিয়ে বের হয়েছে। তাকে দেখে
গালভর্তি হেসে বলল,

-‘কিরে বনু শাড়ি পরেছিস? তোর বোনও পরেছে
নাকি?’

শীতল তাড়া দিলো,

-‘ভ্রম। উফ তাড়াতাড়ি করো ভাইয়া।’

-‘এইতো হয়ে গেছে।’

একথা বলে সায়ন পাঞ্জাবী খোঁজার যুদ্ধে নামল। কিন্তু
সাদা পাঞ্জাবীর

খোঁজ মিলল না। সায়নের সাথে শীতলও হস্ত হয়ে
খুঁজে একটা দলামলা পাঁকানো সাদা পাঞ্জাবী খুঁজে
পেল। সেটার অবস্থা দেখে শীতল থমথমে মুখে
বলল,-‘ ছ্যাবলামার্কী দুলাভাই নেবো না আমি। কালই
গিয়ে রিহানকে আপুর নাম্বার দিয়ে আসব।’

-‘এই না! ভুলেও না। তুই না আমার গুড সিস্টার?’

-‘তাহলে এম্ফুণি এই মুহূর্তে চকচকে,স্মার্টমার্কী,
দুলাভাই চাই আমার।’

-‘তাহলে বোন দিবি তো?’

-‘ভ্রম।’

-‘ওকে।’

একথা বলে সে কার্ড থেকে পাঞ্জাবী বের করল।
সে জানে বাড়িতে না থাকলেও তার ড্রেস ঠিকই রেডি
পাবে। শীতলকে আর দু'মিনিট অপেক্ষা করতে বলে
সে দ্রুত রেডি হয়ে এলো। চুল ঠিক করল।
পারফিউম স্প্রে করল। এবার একেবারে পারফেক্ট লুক!
তারপর শীতলের সামনে দাঁড়িয়ে ভ্রু জোড়া নাঁচিয়ে
বলল,

-‘চলবে?’

শীতল খিলখিল করে হেসে মাথা নাড়িয়ে জবাব
দিলো,

-‘চলবে না দৌড়াবে। এবার চলো নয়তো তোমার
জাঁদরেল ভাই আবার ঐতিহাসিক লেকচার শুরু
করবে।’

শীতলের কথা শুনে সায়েন হেসে ফেলল। তখন তার
মাথায় দুট্টু বুদ্ধি ভর করল। সে ফিচেল হেসে
বলল,-‘শুদ্ধ আমার ভাই হলে তোর কে হয়, হুম?’

-‘শত্রু!’

-‘পরম শত্রুকে বশে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। তবে কি
দিয়ে বশ করা হয়, জানিস?’

-‘কি দিয়ে?’

শীতলের পাল্টা প্রশ্ন শুনে সায়ন কিছুক্ষণ চুপ থাকল।

তারপর বলল,

-‘ক্ষেত্রবিশেষ ধনুকের তীর মিস গেলেও
ভালোবাসার তীর কখনো মিস যায় না। ট্রাই করে
দেখতে পারিস। আর শুদ্ধর বিশেষ গুন কি জানিস?
সে একান্ত কারো জন্য মরতে রাজি কিন্তু ছাড়তে
রাজি নয়।’-‘খুব মারে।’

-‘জান দিয়ে ভালোবাসতেও জানে।’

-‘মিথ্যা কথা। তার মন নেই। সে পাষণ পুরুষ।’

-‘ওই পাষণ পুরুষদের মন জয় করতে পারলে এক
পৃথিবী সমান সুখ তোর পায়ের কাছে এনে দেবো।’

-‘সে আমাকে ভালোবাসবে না ভাইয়া।’

-‘বাধ্য করবি।’

-‘বাধ্য করে ভালোবাসা হয়?’

-‘হয় না। তবে ভালোবাসা দিয়ে ভালোবাসা আদায়
করা যায়।’-‘যদি না পারি?’

-‘আমি আছি তোর পাশে।’

-‘পথ খুব কঠিন।’

-‘প্রাপ্তি কিন্তু অমূল্য রত্ন।’শাঁ শাঁ শব্দে গাড়ি চলছে
হাইওয়ের উপর দিয়ে। শীতলরা ভাই-বোনরা মজা

করতে করতে যাচ্ছে রিসোর্টের উদ্দেশ্যে। কখনো
তারা একযোগে গান গাইছে। কখনো হইহই করছে।
কখনো পেছনের গাড়িকে টেক্সা দিতে পেরে
একযোগে হেসে লুটোপুঁটি খাচ্ছে। এরিমধ্যেই পুরনো
ঘটনা স্মরণ

করে একে ওকে পঁচাচ্ছে। গাল ফুলাচ্ছে। তো খুনশুঁটি
মারামারি করছে। গাড়ির মধ্যে শুদ্ধই শুধু নিশ্চুপ। সে
একমনে অভিজ্ঞ হাতে গাড়ির হুইল ঘুরাতে ব্যস্ত।
কিছু জিজ্ঞাসা করলে হ্যাঁ/ না তে জবাব দিচ্ছে।
নতুবা চুপ থাকছে। যা স্বভাব তার। শুদ্ধর পাশের
সিটেই শীতল বসেছে। পেছনের সিটে সাম্য, সৃজন,
সায়ন, শখ আর স্বর্ণ। পেছনে বসতে চেয়েছিল কিন্তু
সায়ন ইশারায় স্বর্ণের পাশে বসতে চাওয়ায় সে
সামনে বসেছে। সায়নকে সুযোগ দিয়েছে স্বর্ণের
পাশে বসতে। কিন্তু এখানে বসে তার দম আঁটকে
আসছে। অস্থির অস্থির লাগছে। শুদ্ধর গায়ের
পারফিউমের সুগন্ধ নাকে এসে ধাক্কা দিচ্ছে। ঝাঁক
ঝাঁক কথারা পেটে খুচাখুচি করলে কণ্ঠস্বর যেন কেউ
চেপে ধরে আছে। কম্পিত হাতজোড়া মুঠ করে ধরায়
হাতের তালু ঘেমে একাকার। বুকের ভেতরে

ধুকপুকানি শব্দটা যেন বেড়েই চলেছে। এসব কেন হচ্ছে? ভয়ে নাকি অন্যকিছু? যদি অন্যকিছু হয় তাহলে সেটা কি? খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে এসবই ভাবছে সে। তবে তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে অন্য চিন্তা। বিগত কয়েকমাস যাবৎ সায়ন তাকে শুদ্ধর ব্যাপারে বারবার সিরিয়াস হতে বলছে। নানান ভাবে বোঝাচ্ছেও।

বোঝানোর মূল কারণ যাতে তার মনে শুদ্ধর প্রতি সফট কর্ণার তৈরি হয়। কিন্তু কেন জানি তার সাথে স্বাভাবিক হতে গেলে উল্টো কিছু ঘটে যায়। কথায় কথায় দ্বন্দ লেগে যায়। দ্বন্দের রেশ ধরে মারও খেতে হয়। এমনটা কেন হয়? মনের টান নেই বলে? নাকি জোরপূর্বক সে স্বাভাবিক হওয়ার ভাণ করে বলে? কিছুক্ষণ আগেও সায়ন ভাই কিসব বলে মনের অশান্তি বাড়িয়ে দিলো। ধুর, ভালো লাগে না এসব। আর কিভাবে শুদ্ধকে বাধ্য করবে সম্পর্কে জড়াতে? শুরুটা করবেই বা কী দিয়ে? মানুষটা যে পরিমানের রাগী যদি থাপ্পড় মেরে বসে? থাপ্পড় না মারলেও চ্যাকাঠ দিয়ে আধমরা ঠিকই করবে। অতঃপর জিজ্ঞাসাও করতে পারে, ‘আমার সাথে প্রেম

করবি? শখ মিটেছে প্রেম করার? না মিটলেও বল,
যত্ন করে বাকি হাড়িগুড়ি ভেঙ্গে প্রেমের ভূত মাথা
থেকে নামাই?’

মনে মনে এসব ভেবে একবার শুদ্ধর দিকে তাকাতেই
চোখাচোখি হলো।

বিনিময়ে সে মিষ্টি করে হাসল। কিন্তু হাসির বিনিময়ে
শুদ্ধ নজর সরিয়ে সামনে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। অশান্ত
ব্যাপ্তির হঠাৎ শান্ত হয়ে বসে থাকার কারণ খুঁজছিল
শুদ্ধ। তাছাড়া সে খুব ভালো করে জানে শীতলের
দস্য পণা মানে সব স্বাভাবিক। আর চুপচাপ থাকা
মানেই বুঝতে হবে কোনো জট পাঁকানো পায়তারা
করছে। সে আবার তাকাল। এবারও চোখাচোখি
হলো। শীতল পূর্বের মতো করে হাসল। তা দেখে
শুদ্ধ ভ্রুজোড়া কুঁচকে গেল। সন্দেহ আরো প্রবল
হলো। একে এখন বকবক করাতে হবে নতুবা
রাগাতে হবে। নাহলে পেট থেকে কথা বের করা
যাবে না। আর কথা না বের করলে জানা যাবে না
মনে মনে কী ঘোঁট পকাচ্ছে। তাছাড়া বাড়ি এসে
অবধি খেয়াল করেছে সায়নের সাথে গোপন মিটিং
চলে শীতলের। সায়ন কীসব বলে আর সে মুখ

ভোঁতা করে শোনে। বলা বাহুল্য, চৌধুরী বাড়ির
ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বিচ্ছু হচ্ছে শীতল
আর সায়ন।

এদের পেটে পেটে প্রচুর শয়তানি বুদ্ধি। দুই বিচ্ছু
একসাথে গুজুরগুঁজুর করা মানেই বড় কোনো
কেলেঙ্কারির পূর্বাভাস। এসব ভেবে শুদ্ধ বলল,-‘পানি
খাবি?’

-‘না।’

-‘খারাপ লাগছে?’

-‘না।’

-‘তবে?’

-‘পানি খাব।’

শুদ্ধ পানি দিলো। সেও সময় নিয়ে পানি খেলো। মুখ
মুছে বোকা বোকা হাসল। তারপর বলল,
-‘আপনার ফোনটা দিন তো শুদ্ধ ভাই।’

শুদ্ধ কথা বাড়াল না লক খুলে দিলো। শীতল ব্যস্ত
হাতে নোটপ্যাডে কিছু টাইপ করে শুদ্ধকে দেখাল।
সেখানে লেখা, “আমার কিছু বলার আছে।”

শুদ্ধ লেখাটা দেখল। বলতে অনুমতি দিতেই শীতল
টোক গিলে কপালে জমা ঘাম মুছে জানাল পরে
বলবে। শুদ্ধও আর জোড়াজুড়ি করল না।

তখন সাম্য বলল আইসক্রিম খাবে। তার দেখে
বাকিরাও জানাল তারাও খাবে। অগত্যা একসাইডে
গাড়ি দাঁড় করিয়ে শুদ্ধই নামল গাড়ি থেকে।

রাস্তা পার হয়ে ওপাশে চলে আইসক্রিম আনতে।
শীতলের প্রচুর অস্থির লাগছে। কিছু কথা মনের
ভেতর টগবগ করে ফুটছে। কি মনে করে গাড়ি
থেকে নামল সে। তার দেখে সাইনও নামল।
শীতলের চিন্তিত মুখ দেখে মুখ টিপে হাসল। তারপর
ফিসফিস করে বলল,-‘নার্ভাস?’

-‘হুম।’

-‘আজ মনের কথা বলতেই হবে।’

-‘আমি পারব না ভাইয়া। তাছাড়া পৃথিবীতে কি
ছেলের অভাব, বলো?’

-‘পৃথিবীতে ছেলের অভাব না। তবে একজন নিঃস্বার্থ
জীবনসঙ্গী পাওয়া খুব টাফ। শুদ্ধ তোর জন্য বেস্ট
অপশন।’

-‘ভাই..য়া? বাদ দাও না, প্লিজ!

-‘তোৰ ভালোৰ জন্যই বলছি বোন। শখ আৰ তুই কেউ’ই আমাৰ কাছে কম না। দু’জনই আমাৰ জানবাচ্চা। আমি যা করছি জেনেবুঝে করছি। বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে তোৰ ধারণা নেই। তুই ভাবতেও পারবি না এই পৃথিবীতে ভালোবাসাৰ নামে কত কী ঘটছে প্রতিনিয়ত। একটা মেয়ের জন্য একজন ছায়াসঙ্গী কতটা জরুরি। তিঙু কথা কি জানিস? মেয়েৰা যদি লয়্যাল জীবনসঙ্গী পায় তবে সে ইহজীবনেই জান্নাতের সুখ পায়। আৰ যদি জীবনসঙ্গী অমানুষ হয় তাহলে দুনিয়াতে নরক যন্ত্রণা অনুভব করে।’-‘তুমি যেমন আমাৰ ভাইয়া তেমনি শুদ্ধ ভাইয়াও তো..!’

-‘শুদ্ধৰ আসন বদলে ফেল। আমি শুধু তোৰ ভাইয়া;শুদ্ধ নয়।’

-‘তুমি এরকম কেন করছো ভাইয়া? কেন বুঝছো না ভয় পাচ্ছি আমি। খুব ভয় লাগছে আমাৰ। বাড়িতে জানাজানি হলো আব্বু আম্মু মেৰেই ফেলবে আমাকে।’

-‘তুই শুধু শুদ্ধকে কাৰু কর বাকিসব সেই সামলে নেবে। আমি যেমন তোৰ বোনের সমস্যায় ঢাল হয়ে

দাঁড়ায়, তেমনি তোর রক্ষাকবজ হবে শুদ্ধ। আমার
কথাটা শোন বোন। আমার আল্লাহর করে কসম
বলছি,

এসবের পেছনে আমার কোনো স্বার্থ নেই। আমি শুধু
চাই তোরা ভালো থাক।’

-‘শুদ্ধ ভাই কেন? আর কেউ কেন নয়?’

-‘কারণ আমার মতে ওর মতো লয়্যাল ছেলে তোর
জন্য খুঁজে পাব না। এতদিন তোকে যথাসাধ্য
বুঝালাম। কে, কী, কেন, কিভাবে, এক প্রশ্নের উত্তর
বারবার দিয়েছি। এবার যা করার তোকেই করতে
হবে। এখন যদি মনে হয় তুই পারবি না তাহলে
আমিও আর কিছু বলব না। শুদ্ধ আসছে

আপাতত টপিক চেঞ্জ কর।’ শীতল মাটির দিকে
তাকিয়ে আছে। ভীষণ কান্না পাচ্ছে তার। হঠাৎ করে
সব জটিল হয়ে যাচ্ছে কেন? যাকে নিয়ে ওসবকিছু
ভাবে নি হঠাৎ তাকে

ভালোবাসবে কিভাবে? স্বপ্ন সাজাবে কিভাবে? যাকে
ভাই বলে ডেকেছে তাকে কিভাবে.....! সায়ন
শীতলের মনের কথা বুঝলেও কিছু বলল না।

কারণ সে বেঁচে থাকতে শীতলকে না অন্য কারো
সাথে সম্পর্কে জড়াতে দেবে। আর না অন্য কারো
বউ হতে দেবে! শখকে আঁটকাতে পারবে ন। কারণ
সে তার আপনবোন। আপন রক্ত। তাকে রাখার
অজুহাতও নেই।

তবে শীতলকে চোখের সামনেই রাখবে। কারণ
চাচাতো বোন বিয়ে করা জায়েজ। শীতল মেয়ে হয়ে
জন্মেছে যখন বিয়ে তো দিতেই হবে। তাহলে
শুদ্ধর সাথে কেন নয়? সেই পাত্র শুদ্ধ কেন নয়? যদি
সে বেঁচে থাকে তবে

শীতলই হবে শুদ্ধর সহধর্মণী। সে তাদের বিয়ে
দেবে। নিজে প্রধান সাক্ষী হবে। এবং একদিন
দেখিয়ে দেবে এ টম এ্যান্ড জেরীই হবে বেস্ট জুটি।
বেস্ট কাপল! শুদ্ধকে আসতে দেখে শীতলকে
স্বাভাবিক হতে বলে অন্য কথার প্রসঙ্গ টানল সায়ন।
এমন সব কথা বলল শীতল না হেসেও পারল না।
তাকে হাসতে দেখে সায়ন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।
অতঃপর আইসক্রিম খেতে খেতে তারা হইহই করে
আনন্দে ডুবে গেল। এবার সায়ন সামনের সিটে।
আর শীতল বসেছে পেছনে বোনদের সাথে। এতক্ষণ

চুপ থাকলে এবার তার খিলখিল হাসি শোনা যাচ্ছে।
কিছুক্ষণ চুপ থাকায় যেন চারপাশ কেমন শুষ্ক হয়ে
গিয়েছিল। কি একটা কথায় বোনরা খুব হাসছে।
তাদের এত হাসতে দেখে সায়ন ঘাড় ঘুরিয়ে একবার
তাকাল। তারপর আরাম করে বসে মনে মনে
আওড়াল, ‘তোরা সারাজীবন এভাবে হাসি খুশিতে
থাক। তোরা ভালো থাকলে আমিও ভালো থাকব।
আর তোদের ভালো রাখতে যখন যা করার আমি
সায়ন তাইই করব।’

শারফাত চৌধুরীর গাড়ি রিসোর্টে প্রবেশ করার
পরপর শুদ্ধদের গাড়িও এসে থামল। একে একে
নামল সবাই। অসম্ভব সুন্দর রিসোর্ট। গোছগাছ।
ছিমছাম পরিবেশ। শারফাত চৌধুরী ভেবেছিলেন
ছোটো করেই হয়তো আয়োজন করা হবে। কিন্তু
এসে হতবাক হয়ে গেছেন। কারণ সায়ন শুদ্ধ বিশাল
আয়োজন করেছে। অনেক পরিচয় মুখের দেখা
পাচ্ছেন। শশুড় বাড়ির লোক সহ বিজনেস
পার্টনাররাও এসেছে। সকালে উনাকে হাসি মুখে
অভিনন্দন জানাচ্ছেন। ফুলের বুকো তুলে দিচ্ছেন।
এমনকি উনার বসার আসন করেছে রাজকীয়ভাবে।

কোথায় উনিই ছেলেদের বিয়েতে এসব করে তাক
লাগিয়ে দেবেন তা না। বরং উনার বিয়েতেই ছেলেরা
এসব করে হতবাক করে দিচ্ছেন, কী কান্ড, কী
কান্ড! তারপর বাড়ির মেয়ে-বউয়েন শুদ্ধ ভিআইপি
আসনে বসাল। কারো কিছু প্রয়োজন হলে তাকে
জানাতে। কত চেনা মুখ এসে কথা বলছে শুদ্ধ ও
সায়নের সাথে। বুক মিলিয়ে কোলাকুলি করছে।
ওরাও হাসি মুখে অতিথির সাথে কথা বলছে। শীতল
জুসের গ্লাস হাতে নিয়ে শুদ্ধকেই খেয়াল করছে।
মানুষটা সবার সাথে হাসি মুখে কথা বলে। শুধু তার
সাথে কথা বলতে গেলে যেন হাসি ফুরিয়ে যায়।
তারও একদিন সময় আসবে তখন সব শোধ তুলবে।
এসব ভাবতে ভাবতে তার মুখের হাসি চওড়া হলো।
মনের ভেতর সমস্ত ভয় হাওয়ায় উড়িয়ে দিলো।
এতক্ষণ চেপে থাকা চঞ্চলতা আবার যেন ফিরে
এলো। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। তারপর বড়
আবুর পাশে গিয়ে বসল। শারফাত চৌধুরী হাসিমুখে
তাকালে ফিসফিস করে বলল,
-‘বড় আবু আমি কিন্তু বরযাত্রী। আমাকে যেন দুইটা
রোস্ট দেওয়া হয়।’

ফিসফিস করে বলা কথাটা আশেপাশের সবাই শুনে
ফেলল। অতঃপর অউহাসিতে ফেটে পড়ল সকলে।
মজাও করল অনেকে। এরপর বিয়ের কাজ সম্পূর্ণ
হলো। এবং বাড়ির ছেলেরা হলো মেয়ে অর্থাৎ
সিতারার প্রধান সাক্ষী আর মেয়েরা হলো শারাফাত
অর্থাৎ বরপক্ষের মূল সাক্ষী।

এই মুহূর্তে এত চমৎকারভাবে কাটল যেন সবটাই
স্বপ্ন। আর স্বপ্নটাকে

স্মৃতিচারণে সহায়তা করতে হলো ফটোশুট হলো।
ফটোশুট করতে গিয়ে ঘটল আরো অনেক মজার
মজার কাহিনী। হাসতে হাসতে কাহিল হলো।

তন্মধ্যে শুধু বর বউয়ের ছবি তোলার সময় ক্যামেরা
মান জানাল একটু ক্লোজ হয়ে দাঁড়াতে। অথচ এত
মানুষের সামনে শারাফাত সিতারা যেন

একটু লজ্জা পাচ্ছিলেন। পাশাপাশি দাঁড়ালেও ফাঁক
থেকে যাচ্ছিল। বার বার বলার পরও একই অবস্থা।

তখন শুদ্ধ মুখ খুলল,-‘বাবা, ক্যামেরামান বোধহয়
ক্লোজ হতে বলছে। আমার জানামতে ক্লোজ মানে
দূরত্ব মিটানো/ঘনিষ্ঠ।’

সর্বসম্মুখে একথা বলায় শারায়াত চৌধুরী অপ্রস্তুত
হাসলেন। কাশলেন।

এদিক ওদিক তাকিয়ে স্ত্রী সাথে আরেকটু ক্লেশ হতে
যাবেন তখন সায়েন বলল,

-‘প্রাচীনকালে বিয়ে করেছো। বাসর সেয়েছো।
আমাদেরকে পৃথিবীতে আনাতে সাহায্য করেছো।
এখন আমরাও নতুন প্রজন্ম আনার পায়তারা করছি।
অথচ আজ দেখি তোমার লজ্জা পুরোপুরো ভাঙ্গে নি।
এই দিনও দেখতে হলো? আম্মু তুমি অন্তত কিছু
বলো? দেখো তোমার স্বামী লজ্জা পাচ্ছে।’

সায়েনের কথা শুনে পুনরায় হাসির রোল পড়ল।
হাসতে হাসতে সকলের নাজেহাল খারাপ। শারায়াত
চৌধুরী কটমট করে তাকিয়ে ছবি তুললেন।

বাবার চাহনি দেখে সায়েন ইনোসেন্ট লুক নিয়ে
তাকিয়ে হাসল। ভাবখানা এমন তার মতো নিষ্পাপ
ছেলেই হয় না। সে নাদান বাচ্চা। এ কদিন হলো
পৃথিবীতে এসেছে।

এরপর চৌধুরী নিবাসের সদস্যদের একসাথে অনেক
ছবি তোলা হলো।

শায়াফাত তিনকন্যাকে নিয়ে ছবি তুললেন গুনধর
পুত্রাও বাদ গেল না। ভাইরা আদরের বোনদের
সাথে ছবি তুলল। চমৎকার এক একটা দৃশ্য ঠিক
করা হলো সবাই একসাথে দাঁড়ানো ছবিটায় বড় করে
বাঁধাই করে ড্রয়িংরুমে রাখবে।

এরপর খাওয়া_দাওয়ার পর্ব এলো। সবাই খেতেও
বসল। বড়রা এদিকে আর ভাইবোনরা সবাই এক
টেবিলে। ওয়েটার খবার বেড়ে দিতে এলে শুদ্ধ তাকে
যেতে বলে নিজেই সবাই খাবার সার্ভ করে দিলো।
প্রত্যেকটা পদ যত্ন করে তুলে দিলো ভাই বোনদের
প্লেটে। কে কোন খাবারটা পছন্দ করে সে অবগত।
সবাইকে একে একে দিয়ে শীতলের প্লেটে হাড়ওয়ালা
মাংস তুলে দিলো। বিড়ালস্বভারের শীতল হাড় গোঁড়
খেতে পছন্দ করে।

সবাইকে দিয়ে নিজে বসতেই সাইন শুদ্ধর প্লেট
সাজিয়ে সামনে এগিয়ে দিলো। শুদ্ধ ঘাড় ঘুরিয়ে
তাকাল বড় ভাইয়ের দিকে। সাইন খেতে ইশারা করে
নিজে খেতে শুরু করল। ক্ষুধায় পেট চোঁ চোঁ করায়
সবাইই খাচ্ছে।

সায়ন হঠাৎ পরপর আরো দুইপিচ রোস্ট শুদ্ধর প্লেটে
তুলে দিলো। শুদ্ধ ভ্রুঁজোড়া তাকালে সায়ন
বলল,-‘ছোটো ছোটো টুকরো করে শীতলের প্লেটে
তুলে দে। রোস্ট খেতে গিয়ে

আমার বোনের লিপস্টিক নষ্ট হয়ে যেতে পারে।’

-‘তোমার বোন তুমি দাও।’

একথা শুনে সায়ন ভ্রুঁ কুঁচকাল। তারপর অতি
সন্তপণে তার পাশে বসা স্বর্ণকে ইশারা করে বলল,
-‘আমি তোঁর বোনকে দিচ্ছি তুই আমার বোনকে দে,
শোধবোধ!’

তাদের দুই ভাইয়ের ফিসফিস কথা কেউ খেয়াল
করে নি। বোনরা খেতে খেতে তখনকার ছবি তোলা
নিয়ে গল্প করছিল। সাম্য, সৃজন বোরহানির গ্লাস
ফাঁকা করতে ব্যস্ত। শুদ্ধ আর কথা বাড়াল না মাংসের
ছোট টুকরো শীতলের প্লেটে তুলে দিতে থাকল।
শীতল মুখ তুলে তাকাল। খুশি হলো।

তবে কিছু বলতে গেলে শুদ্ধ বলল,-‘ দ্রুত খাওয়া
শেষ কর নয়তো এখানে রেখেই চলে যাব।’

শুদ্ধর কথা শুনে শীতল দাঁত কপাটি বের করে
হাসল। তারপর জবাব দিলো,

-‘যান। আপনাকেই নিতে আসবে হবে।’

-‘রাইস দেবো?’

-‘না।’

-‘স্যালাড?’

-‘না।’

-‘পানি?’

-‘না।’

-‘তাহলে মুখের দিকে তাকিয়ে না থেকে খাওয়া শেষ কর।’

-‘হুম।’ শীতলের হঠাৎ সায়নের দিকে নজর পড়ল। সায়ন মিটিমিটি হাসছে। ওর আর বুঝতে বাকি রইল না বড় মহারাজ আবার কলকাটি নেড়েছে। তবে শুদ্ধকে জ্বালানোর সুযোগও মিস করল না। শুদ্ধ মাংসের টুকরো দিতেই থাকল সে খেতেই থাকল। দুটোর জায়গায় তিনটে রোস্ট খাওয়াও শেষ। চার নাম্বার চলমান। শুদ্ধ নিজের খাওয়া রেখে দাঁতে দাঁত চেপে শীতলের প্লেটে মাংসের টুকরো দিতে দিতে বলল,

-‘কত বছরের অনাহারী তুই?’

-‘খবরদার বলছি খাওয়ার খোঁটা দিবেন ন। বড় আব্বুকে বলে দিবো কিন্তু।’

-‘বল। এম্মুণি বল। না বললে থাপড়ে গাল ফাটিয়ে দেবো বেয়াদব।’

-‘যান, খাবই না আর।’

-‘খাবার নষ্ট হোক তারপর দেখ তোর অবস্থা কি করি।’

-‘খেলেও বকছেন না আবার খেলেও বকছেন, সমস্যা কি আপনার?’

-‘শেষ কর।’ তারপর খাওয়া দাওয়ার পর্বও শেষ করল তারা। এদিকে সময়ও শেষের দিকে। মেহমানরা অনেকেই চলে গেছেন। উনারাও যাওয়ার জন্য কেবল পাকিং লটে দাঁড়িয়েছেন। এরিইমধ্যে সায়েন শুদ্ধর কথা কাটাকাটি সবার কানে গেল। দুই ভাইয়ের হঠাৎ কী হলো কেউ কিছুই বুঝলেন না। শুদ্ধ যে প্রচণ্ড রেগেছে তার হাতে থাকা কোল্ড ড্রিংকসের ক্যান ছুঁড়ে মারা দেখে বুঝল সবাই। ওদিক ফাঁকা। আশেপাশেও তেমন কেউ নেই। শুদ্ধ সহজে রাগে না। সচারচর তাকে সহজে রাগতে দেখা যায় না। কিন্তু যখন রাগে, যার উপর রাগে তার জীবনে ঝড় তুলে দিতে

বিন্দুমাত্র কার্পণ্যবোধ করে না। এতক্ষণ তো সব ঠিকই ছিল। হঠাৎ কি হলো যে দুই ভাই রণমূর্তিরূপ ধারণ করল? দুই ভাইয়ের কথা সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে দেখে শারায়াত ও সাফওয়ান চৌধুরী এগিয়ে গেলেন। শুদ্ধ অগ্নিচোখে তাকিয়ে আছে বড় ভাইয়ের দিকে। তবে সায়ন হাসছে। আর এই হাসিই শুদ্ধর রাগের মাত্রা শতগুন বাড়াল। সে কাউকেই কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে গাড়ি ছাড়াই হনহন করে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল। না কারো ডাক শুনল। না কেউ তাকে থামাতে পারল। সায়নকে জিজ্ঞাসা করলেওকোনো জবাব পাওয়া গেল না। এরপর অনেকগুলো গিফ্টবক্স গাড়িতে তুলে বাকিদের থেকে বিদায় নিয়ে উনারাও বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। এদিকে সিদ্দিকের অবস্থা পাগলা কুকুরের মতো। ছেলেকে কোনোমতেই জাবিন করাতে পারেন নি উনি। এই উকিল তো সেই উকিল কেউই কেস নিচ্ছে না। কেন নিচ্ছে এর জবাব এখনো মেলে নি। ছেলেটা দেশে এসেই ফেঁসে গেছে। কতবার বারণ করেছিলেন চোখ-কান খোলা রেখে চলতে।

উনার চারপাশে শত্রুপক্ষ হিজগিজ করছে। কিন্তু ছেলে কৰ্নপাতই করে নি। এদিকে কনকের ধৰ্ষিত বোনটা মারা গেছে। কনক এখন নিজে যেন ভেঙ্গে পড়া কলাগাছ। তাকে দিয়ে কোনো চাল চালাবে সেই সুযোগ নেই।

কিন্তু থেমে থাকলে হবে না। উনি কাঁটা হাত-পা গুলো দেখেছেন। কাটার ধরণ দেখে চিনতে অসুবিধা হয়নি একাজ আজমের। সায়নের হাতডান আজম। অর্থাৎ সায়নই এসব ঘটিয়েছে। ভেবেছিলেন ছেলেটাকে কদিন প্রাণপণে উড়তে দিবেন। বন্দির আগে মুক্তির স্বাদ নেওয়াবেন। কিন্তু এই ছেলে আজকাল যা করছে মনে হচ্ছে এখনই ছাই দিয়ে খপ করে ধরতে হবে। যাতে পিছলে যেতে না পারে। এসব ভেবে সে কল করল ইয়াসির নামে সেভ করা নাম্বারে। কিন্তু কল রিসিভ হলেও কেউ কথা বলল না। শুধু শোনা গেলো কোনো মেয়ের চাপা গোংড়ানোর সুর। কান্নার শব্দ। একটু পরে কল কেটে মেসেজ এলো,
-‘ডো’ন্ট ডিস্টার্ব পার্টনার। উফ! চরম মুডে আছি। মুড নষ্ট হলে তোমার মেয়ে বউকে দিয়ে আমার মুড উঠাব বলে দিলাম।’

মেসেজ পড়ে রাগে সিদ্ধিকের পুরো শরীর জ্বলে
উঠল। হাতের ফোনটা শক্ত করে চেপে ধরে দাঁতে
দাঁত চেপে বলল,

-‘ব্লাডি হোর ওসব নিয়েই থাক তুই। তোরও তেজ
কমাব। শুধু সময়ের অপেক্ষা।’এয়ারপোর্ট থেকে
বেরিয়ে কেবল রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে রুবাব। সুদর্শন
যুবকটাকে দেখে অনেকেই ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে।
পরনের পোশাকেই স্পষ্ট উচ্চ বংশের ছেলে সে।
হাঁটার স্টাইল নজরকাড়া। হাতে থাকা নামিদামি
ওয়াচে টাইম দেখে বারবার তাকাচ্ছে নক্ষত্রভরা
আকাশ পানে। চলমান

শিপে থাকাকালীন বারবার আকাশ দেখে। আকাশের
রং দেখে অবস্থা বোঝার চেষ্টা করে। সেটাই আজকাল
অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিকে সন্ধ্যার আজান
হয়েছে একঘন্টা পেরিয়ে গেছে। ধরিনীর বুকে
নেমেছে গাঢ় অন্ধকার। ঘড়ির তখন ক’টা হবে? সাড়ে
সাতটার মতো। যানজটে রাস্তায় জ্যাম বেঁধেছে।
যানজটও তার ভালো লাগছে। আপন দেশে বলে
হয়তো। সে পুনরায় আকাশের দিকে তাকিয়ে
বুকভরে শ্বাস টানল। দেশে ফিরল প্রায় সাত মাস

পর। কাউকে বলে না আসায় গাড়ি আসে নি বাড়ি থেকে। উবারই শেষ ভরসা। আর দাঁড়িয়ে না থেকে দুই হাতে দুটো ট্রলি নিয়ে সামনে এগোতেই একটা গাড়ির এসে থামল তার সামনে। এভাবে গাড়ি থামায় বিরক্তও হলো। দুটো গালি ছুঁড়ে মারার আগে গাড়িতে বসা

একজন মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল,-‘আপনে কি রুবাব ভাই?’

-‘জি। আপনাকে তো ঠিক চিনলাম না?’

-‘শুদ্ধ ভাই আমারে পাঠাইছে গাড়িতে উইঠা আহেন। যাইতে যাইতে কথা হবে নে।’

-‘শুদ্ধ পাঠিয়েছে?’

-‘জ্বে।’

-‘আমি তো আসার কথা কাউকেই জানাই নি তাহলে জানল কিভাবে?’

-‘আমি কইতাম কেমনে? আমারে খালি ফুন দিয়ে কইল আপনরে যেন চৌধুরী বাইত পৌঁছাইয়া দেই।’

-‘ওকে।’

মুখে একথা বললেও ফোন বের করে চেক করল শুদ্ধর মেসেজ এসেছে কি না। যার তার গাড়িতে ওঠা

যাবে না। কারণ বিপদ বলে কয়ে আসে না। সে দেশে থাকে না মানে দেশের অবস্থার কথা জানে না তা কিন্তু নয়।

হ্যাঁ মেসেজ এসেছে। তাহলে যাওয়ায় যায়। তারপর আজমের সাথে গল্প করতে করতে সে রওনা হলো চৌধুরী বাড়ির উদ্দেশ্যে। সারাদিন বিয়ের ঝামেলা শেষে ক্লান্ত দেহে বাসায় ফিরেছে সবাই। শুদ্ধর সাথে সায়নের কিছু একটা নিয়ে খুব কথা কাটাকাটি হয়েছে। তবে সায়ন ভাইয়ের কথায় হেসেছে। হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খাওয়ার অবস্থা তার। ভাইকে হাসতে দেখে শুদ্ধ রাগে জেদে সবার আগে রিসোর্ট থেকে বাসায় এসে ফ্রেশ হতে ওয়াশরুমে ঢুকেছে। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়েও রাগে গা কাঁপছে। এর কারণও শীতল। সব দোষ ওই বেয়াদবটার। আজ সারাদিন

তাকে জ্বালিয়ে মেরেছে। আর এসব ভুলভাল কাজে ওকে উস্কে দিয়েছে

সায়ন। ভালোবাসার জীবানু টীবানু বলে আজাইরা সব যুক্তি দিয়ে ব্রেন ওয়াশ করেছে গাধীটার। ক'দিন ধরেই হচ্ছে এসব। মাথামোটা গাধীটাও সেসব ব্রেনে

টুকিয়ে তাকে জ্বালাচ্ছে। যখনই শীতলের দিকে তাকিয়েছে তখনই দেখে শীতল আগে থেকেই তার দিকে তাকিয়ে আছে। মানে হয় এসবের? সে সময় নিয়ে শাওয়ার নিয়ে বের হতেই দেখে শীতল বিছানায় বসে আছে। পরনে অনিয়ন কালারের শাড়ি। খোলা চুল। কপালে ছোট্ট একটা কালো টিপ। দুপুর থেকে মাথায় হিজাব পরা থাকলেও এখন এলোচুল।

ওকে দেখেই শুদ্ধ খাটের নিচে থাকা চ্যালাকাঠটা নিয়ে এক বারি বসিয়ে দিলো শীতলের বাহুতে। শীতল ‘উফ মা’ বলে কঁকিয়ে উঠল। অন্যসময় হলে হাউমাউ করে কেঁদে উঠত। কিন্তু এখন কাঁদা তো দূর বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তারই পায়ের পাতার উপর উঠে দাঁড়িয়েছে। চোখে ভয়ের লেশমাত্র নেই। শীতলের পাগলামি দেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শুদ্ধ। কেবল শাওয়ার নিয়েছে তারপরেও দরদরিয়ে ঘামছে সে। কানের পাশ দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে সরু চিকন ঘাম। তার পায়ের পাতার উপর দাঁড়ানো শীতলকে বড্ড বেশি অচেনা লাগছে। চোখে অন্যরকম চাহনী। ঠোঁটে যেন সর্বনাশা কিছুই ইঙ্গিত। তবে সে কিছুতেই এসবে প্রশ্ন দেবে না। তাই

শীতলকে স্বজোরে ধাক্কা দেওয়ার আগেই শীতল
শুদ্ধর কাঁধ শক্ত করে আকঁড়ে ধরল। অতঃপর কিছু
বুঝে ওঠার আগেই শুদ্ধর কানের দুই ইঞ্চি নিচে নরম
মাংসে চুমু এঁকে বসল। হঠাৎ ই নরম ওষ্ঠ ছোঁয়ায়
কেঁপে উঠল শুদ্ধর সর্বাঙ্গ। চোখে, মুখে স্তম্ভিত ভাব।
কেবলই কী ঘটল তা বুঝে ওঠার আগেই শীতল
ফিসফিস করে বলল,-‘শুদ্ধ ভাই? আপনার নামে যদি
দু’একটা কলঙ্ক মাখি আপনি কি রাগ করবেন, হুম?’
শুদ্ধ হতবাক। হতভম্ব চোখের চাহনি। ঘাড়ের কাছটা
ঘিরঘির করছে। কি হয়ে গেল? কি ঘটাল এই মেয়ে?
এর ধারণা আছে সে কি করছে? আর কিসের
আবদার করছে? তার নামের কলঙ্ক মাখার? কলঙ্কের
মানে বুঝে সে? আবদার করে কলঙ্ক মাখা যায়? তাও
আবার তার নামের কলঙ্ক?

সে কিয়ৎকার কোনো কথায় বলল না। বলা বাহুল্য,
বলতে পারল না।

শুধু নিশ্চুল হয়ে শীতলের কাজল চোখের দিকে
তাকিয়ে রইল। ঝোকের বশে অঘটন ঘটিয়ে এখন
মৃদুভাবে কাঁপছে শীতল। এবং কাঁপুনির মাত্রা বাড়ছে।
চোখে চোখ রাখতে পারছে না। ঘামছে। বুঝতে বাকি

নেই সায়ন ফাঁদে পা দিয়েছে শীতল। সায়নের কথায় তার রাগ ভাঙ্গানো এ কাজটা করেছে। মোটকথা, দুটোতে মিলে তাকে গেমের গুঁটি বানাচ্ছে। কিন্তু সে সেটা হতে দেবে না। আজ অবধি নিজের বানানো গেমের অন্যকে গুঁটি বানাতে অভ্যস্ত সে। হঠাৎ গুঁটি হবে কিভাবে তাও জেনে শুনে? হাস্যকর!

এদিনের অভিজ্ঞ খেলোয়ারের অভ্যাস কি ছাড়া যায়? মোটেও না! তাই সে ঠান্ডা চাহনী নিক্ষেপ করে হাড় হিম করা কঠে বলল,- ‘সত্যি ভালোবাসিস আমাকে?’

-‘হুম!’

-‘কতটা?’

-‘অনেকটা।’

-‘বিয়ে করবি?’

-‘(.....)’

শীতল নিশ্চুপ। শুদ্ধর ঠান্ডা চাহনি দেখে ঠকঠক করে কাঁপছে। চোখের পানি আপনাআপনিই গড়তে শুরু করেছে। তাকে কাঁপতে দেখে শুদ্ধ পুনরায় বলল,

-‘প্রেম চাস নাকি প্রেমিক?’

-‘দুটোই।’

-‘উহুম যে কোনো একটা অপশন।’

-‘প্রেমিক ।’

-‘সামলাতে পারবি?’

-‘পা..পারব ।’

-‘বাড়ির সবার সামনে দাঁড়িয়ে এখন যা বললি বলতে পারবি? তোর বড় আব্বুর থেকে আমাকে চেয়ে নিতে পারবি? কি হলো বল, একবুক সাহস নিয়ে উঁচু কণ্ঠে বলতে পারবি, তুই আমার বউ হবি!’-‘(.....)’

-‘কি রে পারবি না?’

-‘(.....)’

-‘কথা বল? এখন চুপ কেন? সৎ সাহস নেই? কি রে উত্তর দে? এখনই সব ভালোবাসা উবে গেল?’

-‘(.....)’

-‘সর যা । তোরা কেউ আমার চোখের সামনে আসবি না । আজকের পর থেকে তোরা আমার কেউ না । কেউ না! যারা অকারণে আমার ইমোশন নিয়ে খেলতে চায় । মিথ্যা ভালোবাসার দাবি নিয়ে এসে আমাকে ফাঁদে ফেলে চরমভাবে দুর্বল করতে চায় । তারা আমার কেউ হতেই পারে না ।’

একথা বলে শীতলকে নিজের থেকে সরিয়ে বাইকের
চাবি নিয়ে হনহন করে রুমে থেকে বেরিয়ে গেল।
গ্যারেজ থেকে বাইকটা নিয়ে বের হতেই
সায়নের সাথে মুখোমুখি হলো। সায়ন কিছু বলতে
গেলে বাইকের গতি দ্বিগুন বাড়িয়ে পাশ কাটিয়ে চলে
গেল। শুদ্ধর থমথমে মুখ দেখে সায়ন
‘ওহ শিট!’ বলে ছুটল বাড়ির দিকে। প্রাণপণে ছুটে
তার বাইকের চাবিটা নিয়ে সেও বাইক ছুটাল
রাগান্বিত ভাইয়ের পেছন পেছন। বাইকের গতি
বাড়িয়েছে সায়নও। কিছুদূর গিয়ে দূর থেকে সে
শুদ্ধকে একটু দেখতে পেল। শুদ্ধর বাইকের স্পিড
দেখে সায়নের কালঘাম ছুটে গেল। ভাই যে বড্ড
ক্ষিপেছে। এখন এই পাগলটাকে থামাবে কিভাবে?
কিভাবে কি করবে সে? তার মাথাও কাজ করা বন্ধ
করে দিলো। অজানা এক ভয়ে বুক কাঁপতে লাগল।
এই ছেলের বাইকের যা গতি না থামালে নির্ঘাত সে
এক্সিডেন্ট করবে। আপাতত আর কিছু ভেবে পেল না
সে তাই বিপরীত পথ ধরল। কিন্তু তাতেও কাজ
হলো না। তবে আগে পিছে চলতে থাকল দুই

ভাইয়ের দুটো বাইক। সায়ন যখন একটু নাগাল পেল
তখন চেষ্টা করে বলল,-‘শুদ্ধ! শুদ্ধ দাঁড়া!’

-‘(....)’

-‘বাইক থামা ভাই!

-‘(....)’

-‘আমার কথাটা অন্তত শোন।’

-‘(....)’

-‘শীতলকে ভালোবাসতে হবে না। জীবনেও বলব না
ওকে ভালোবাসার কথা। যা বলেছি তার জন্য আমি
সরি। ভুলে যা সব। শীতলকেও বারণ করে দেবো।
সেও তোকে আর কখনো জ্বালাবে না। ভালোবাসার
দাবি নিয়ে তোর সামনে আসবে না। এবার একটু
শান্ত হ। স্পিড কমা ভাই। এ্যাই ভাই আমার কথা
শোন না ইয়ার, প্লিজ, প্লিজ থাম!’

-‘(.....)’

-‘সামনে হাইওয়ে। স্পিড কমা কুত্তার বাচ্চা। এ্যাই..
এ্যাই ভাই এক্সিডেন্ট হয়ে যাবে। পায়ে পড়ি এবার
থাম...থাম না! শু...দ্ধ!-‘কুত্তার বাচ্চা বাইক থামা!
এ্যাই....এ্যাই ভাই এক্সিডেন্ট হয়ে যাবে তো। পায়ে
পড়ি ভাই থাম...থাম না। শু....দ্ধ!’

সায়নের ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে শুদ্ধর মন গলল না। শুনেও
শুনল না ভাইয়ের আত্ননাদ। শুধু চোয়াল শক্ত করে
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে রইল। তার মস্তিষ্কে
তখনো এলোমেলোভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে কিছুক্ষণ
আগের ঘটনা। চোখের পাতায় জ্বলজ্বল করে ভাসছে
কারো কান্নাভেজা চোখ। কানে বাজছে কম্পিত স্বরে
বলা ‘শুদ্ধ ভাই, আপনার নামে কলঙ্ক মাখতে
চাই।’ এদিকে সায়ন তখনো অনুরোধ করেই যাচ্ছিল।
বার বার বলছিল বাইক থামাতে। বসে কথা বলতে।
শুদ্ধ নিজেও অনুভব করল তার শরীর অবশ হয়ে
আসছে। হাত কাঁপছে। কাঁপা হাতে ব্রেক ধরে রাখা
মুশকিল। তখন তার বাইক হাইওয়ে পেরিয়েছে।
এরপর এলো নির্জন এক রাস্তা। এরপর ছুটে চলেছে
বিজের উপর দিয়ে। বিজের নিচে নদীর পানি
অশান্তভাবে বয়ে চলেছে। বইছে অবাধ্য বাতাস।
মাথার উপরে নক্ষত্রভরা আকাশ।

বিজের উপর দুভাইয়ের বাইক তীব্র গতিতে ছুটে
চলেছে। কেউ থামছে না। কারো থামার ইচ্ছেও নেই
বোধহয়। তখন একটি মালভর্তি ট্রাক দ্রুত গতিতে

ছুটে এলো। তাদের দেখে বারবার হর্ণ বাজাচ্ছে ট্রাক
ড্রাইভার।

ট্রাক দেখে সায়নের গলা শুকিয়ে কাঠ। এত বাতাসে
কপালে সুরু ঘাম।

শুকনো গলায় সায়ন তখনো প্রাণপণে চেষ্টাচ্ছে,-‘ট্রাক
আসছে ভাই। স্পিড কমা। আল্লাহর দোহায় লাগে
কথা শোন।’

শুদ্ধ শুনল কী না বোঝা গেল না। তবে তাকে অবাক
করে দিয়ে ব্রেক থেকে দুই হাতই সরিয়ে নিলো।

ব্যাপারটা খেয়াল করে সায়ন চিৎকার করে বলল,
-‘আমার কসম পাগলামি করবি না শুদ্ধ। তোর
কারণে আমার মায়ের একফোঁটা চোখের পানিও যদি
পড়ে তোকে মাফ করব না, কখনো না!’

একথা শোনামাত্রই শুদ্ধর কী হলো কে জানে সে
আচমকা ব্রেক কষল। একটুর জন্য ট্রাকের সাথে
বাইকের ধাক্কা লাগে নি। ট্রাকওয়ালা খেঁকিয়ে বাংলা
গালি দিতে দিতে চলে গেল। শুদ্ধ তখনো দুচোখ বন্ধ
করে অনড় হয়ে বসে আছে। সায়ন দ্রুত বাইক
থামিয়ে নেমে পড়ল। বাইক স্ট্যান্ড করার সময় হুঁশে
নেই। বাইক আছড়ে পড়ল মাটিতে। সেসব পরোয়া

না করে দ্বিকবিদিক ভুলে এগিয়ে এলো শুদ্ধর কাছে।
শুদ্ধর শাটের কলার ধরে বাইক থেকে নামিয়ে
স্বজোরে এক ঘুষি বসিয়ে দিলো নাক বরাবর। দ্বিতীয়
ঘুষি বসানোর আগে খপ করে ধরে ফেলল শুদ্ধ।
হঠাৎ গায়ে হাত তোলায় সেও রাগান্বিত দৃষ্টিতে
তাকিয়ে রইল বড় ভাইয়ের দিকে। তীব্র
রাগে সেও ফুঁসছে। তখন সায়ন শুদ্ধর বুকে স্বজোকে
ধাক্কা দিতেই শুদ্ধ দু'পা পিছিয়ে গেল। সায়ন এক
ধাপ এগিয়ে আরেক ধাক্কা মেরে চেষ্টা করে বলল,
-‘কুত্তার বাচ্চা ভাব মা’রা’ও আমার সাথে, ভাব?
তোমার ভাবকে চু’দা’র সময় নাই আমার। কখন
থেকে ডাকছি? কতবার ডাকলাম! কথা কানে যায়
না? বড় হয়ে গেছো? খুব বড়? এতই বড় হয়েছ বড়
ভাইয়ের কথা
শোনার মুড আসে না তোমার? তাহলে শুনো রাখো,
তোমার বালমার্কী মুডের মাকে চু’দে দফারফা করার
ক্ষমতা আমি রাখি।’-‘ভাষা ঠিক করো।’
-‘কিসের ভাষা ঠিক করব? করব না। মারবি? মার।
আয়!’

শুদ্ধ চোখ বন্ধ করে রাগ সংবরণ করার চেষ্টা করছে।
রাগে মাথা থেকে পা অবধি জ্বলছে। সায়ন যদি তাকে
মেরে টুকরো টুকরো করে ফেলেও তবুও সে ভাইয়ের
গায়ে হাত উঠাতে পারবে না। কখনো না! তাকে চুপ
দেখে সায়ন পুনরায় চোঁচিয়ে বলল,

-‘সামান্য ব্যাপারে এত সিনক্রিয়েট করার কি আছে?
কি এমন হয়েছে যে এত রাগ দেখাতে হবে? মানুষ
চাচাতো বোনকে ভালোবাসে না? আমি বাসি নি?
আমি মরে গেছি নাকি আমার দেহ পঁচে গেছে?’

-‘তোমার কাছে সামান্য হলেও আমার কাছে তা নয়।’

-‘তাহলে তোর কাছে কি, বল? কি সমস্যা তোর?
শীতল তোর যোগ্য না? কোনদিক থেকে কম সে?
পেশার ভিত্তিতেও কম মেয়ে তো দেখিস নি।

আমার বোন কি ওইরকম? আজকাল কার যুগে ওর
মতো সরল, নরম কাঁদা মাটি আর পাৰি? ভালো
জিনিস জুটাতে চাচ্ছি গায়ে লাগছে না, না?’-‘তোমার
বোন বিশ্বসুন্দরী হোক। রূপে, গুনে, অনন্য হোক
তাতে আমার যায় আসে না। যে মেয়ে সর্বসম্মুখে
আমাকে চাইতে পারবে না সেই মেয়ে আমার না
হোক!’

-‘সে ছোটো মানুষ। তোমার মতো বাল পাকনা বুদ্ধি নিয়ে ঘুরে না এটা বুঝো না? আগে সময় দিয়ে দেখতি তারপর নাহয় যা সিধান্ত নেওয়ার নিতি।’

-‘ ছোটো। অবুজ। সরল বলে এতদিন ছাড় দিয়েছি। কিন্তু তোমরা আজ যা করেছো যথেষ্ট করেছো। এবার থামো নয়তো আমাকে বাড়ি ছাড়তে হবে। ’

ভাইয়ের কথা শুনে সায়েন থমকে গেল। হতবাক তাকিয়ে রইল ভাইয়ের কঠিন মুখের দিকে। দুই ভাইয়েরই চোখ লালবর্ণ। দু’জনই হাত মুঠিবদ্ধ করে চোখে চোখ করে কথা বলছে। দু’জনেরই জেদী ও কঠিন কণ্ঠস্বর।

শুদ্ধ কথায় সায়েন কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল,

-‘সত্যিই কি শীতলের প্রতি তোর কোনো ফিলিংস নেই?’

-‘(...)-‘যদি না থাকে তাহলে তাকে এত প্রশ্ন দিস কেন? এত বকিস, মারিস তবুও মেয়েটা তোর কাছেই যায়। কেন যায়? কারণ তুই শাষণের সাথে প্রশ্নও দিস। তোর রুমের পার্স আমি ভাই হয়ে জানি না কেন?ফোনের লক আমাকে দিস নি কেন? তোর পছন্দের পারফিউম ভেঙ্গেচুড়ে শেষ করার

পরও তুই নীরব কেন? তোর রুমে অন্য কারো
টোকর পারমিশন নেই, তাহলে শীতল ইচ্ছেমতো
দুকে কেন? দুকতে দিস কেন? জবাব দে। শীতলকে
কিডন্যাপ করার পর এত উন্মাদ হয়েছিলি কেন?
সামান্য জ্বর এলে বকতে বকতে সবার আগে তুই
ডাক্তারের কাছে ছুটিস কেন? কেন তুই ব্যাতিত
অন্যকেউ তাকে বকলে কড়া ভাষায় অপমান করতে
ছাড়িস না? এসবের উত্তর দিতে পারবি? বুকে হাত
রেখে বলতে পারবি তুই শখ, স্বর্ণের মতো
শীতলকেও একই নজরে দেখিস? বল, মুখে
একটাবার হ্যাঁ বল। তাহলে আমিও কথা দিচ্ছি আর
কখনো এ ব্যাপারে কথা বলব না। আর না শীতলকে
তোর চোখের সামনে থাকতে দেবো।’-‘(.....)’

-‘তবে কি ধরে নেবো নীরাবতায় সম্মতির লক্ষণ?’

-(.....)’

শুধুর কাছে জবাব নেই। সে নিশ্চুপ। বলা বাহুল্য সে
ছোটো থেকে নিজ মর্জিতে চলা ছেলে। আজ অবধি
তার উপর কেউ কখনো কারো সিধান্ত চাপিয়ে দিতে
পারে নি। ভদ্রতা কিংবা অন্য কিছুর অজুহাতে সেও
কারো সিধান্ত মুখ বুঝে মেনে নেয় নি। যদি নিতো

তাহলে আজ সাইন্টিস্ট নয় মেরিনার পেশায় কর্মরত থাকতে হতো। দিনের পর দিন থাকতে হতো শিপে। পরিবার-স্বজন ছাড়াই সময় কাটত সমুদ্রের শান্ত/অশান্ত পানির উপর। অথচ সে বরাবরই চাইত সাইন্টিস্ট হতে। নতুন কিছু তৈরির নেশা তাকে জেঁকে ধরত। কিছু করার জন্য হাত নিশাপিশ করত। মোটকথা, সে বরাবরই একরোখা। জেদি। যা করবে ঠিক করে করেই ছাড়ে। এবং যা আমার সেটা কেবল আমারই' এই নীতিতে বিশ্বাসী ছিল এখনো আছে। যেখানে সে অন্যের মতের ভিত্তিতে কখনো এক পা ফেলে নি। সেখানে জীবনসঙ্গী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তা মানবে কেন? আর কাকে মানার কথা আসছে? ওই বেয়াদব, অবাধ্য গান্ধীটাকে?যে ভালোবাসার মানে বোঝে না? শাসন বোঝে না? চোখের নিগূঢ় চাহনী বোঝে না! শাসনের আড়ালে আগলে রাখা বোঝে না। যার নিজের অনুভূতি সম্পর্কে সামান্য জ্ঞানটুকু নেই তাকে চাইবে? তাকে? না,কখনো না! মোদাকথা, যে মেয়ে মুখ ফুটে তাকে চাইতে পারে না। যার চোখমুখে বিন্দু পরিমান ভালোবাসার লেশ মাত্র থাকে না। যে বাবা-মায়ের মারের ভয়ে ভালোবাসার কথা

জানাতে ভয় পায়, পিছিয়ে যায়, তাকে চাইবে সে?
তাহলে বলতেই হয় এটা ভুল ধারণা। কারণ সে সস্তা
না। তাকে পেতে হলে অবশ্যই সর্বসম্মুখে দাঁড়িয়ে মুখ
ফুটে চাইতে হবে। চোখে চোখ রেখে বলতে হবে ‘
শুদ্ধ ভালোবাসি।’ নয়তো তাকে পাওয়া তার জন্য
অসম্ভবই। বলা বাহুল্য, আজ যদি কেউ
একফোঁটা শুদ্ধ ভালোবাসার দাবী নিয়ে মুখোমুখি
দাঁড়াত। আর সে যদি তা অনুভব করতে পারত ওই
ভালোবাসাটুকু তাহলে সে চাওয়ার আগেই নিজেকে
বিলিয়ে দিতো। শুধু পরিবার নয় পুরো পৃথিবী দুই
হাতে সামলে নেওয়ার দায়িত্ব নিতো। কিন্তু তা হয়
নি! হয় নি! কি হয়েছে? কেউ মিথ্যা ভালোবাসার দাবি
নিয়ে সামনে এসেছে? যেখানে ভালোবাসা, ভরসা,
বিশ্বাস বলে কিছু ছিল না। তাহলে কেন গ্রহন করবে
মিথ্যে ভালোবাসা? সে কি এতই ঠুনকো? নাকি এতই
সস্তা? পৃথিবীর বুকে এমন কেউ আছে যে মিথ্যে
ভালোবাসার কথা জেনেও গ্রহন করে? কিংবা করতে
পারবে? তাও আবার এসবে সাহায্য করে তারই বড়
ভাই। সেও একবারও ভাবল না এভাবে ভালোবাসা
হয় না। এসব সম্পূর্ণ মনের ব্যাপার। দু’ একদিনের

কোনো গেম নয়! ভাবনার মতো জীবন এত সহজও
নয়। মন এত বোকা নয় যে ওকে ভালোবাস বললেই
ভালোবাসা হয়ে গেল। এরা যা করেছে
মোটোও ভালো করে নি। মোটেও না। মনে মনে
এসব ভেবে শুদ্ধ বাইকের উপর বসতেই সায়ন তার
বাইকের চাবি কেড়ে থমথমে সুরে বলল,
-‘কথা শেষ করে যা।’

-‘কিসের কথা?’

-‘সমস্যা কি তোর?’

-‘আমার কোনো সমস্যা নেই।’

-‘তাহলে জবাব দিয়ে যা।’

-‘চাবি দাও।’

-‘শীতলকে মেনে নে।’

-‘(....)’এতকিছু বলার পরও শুদ্ধর নীরাবতা সহ্য
হলো না সায়নের। সে পকেট হাতড়ে তার ফোন বের
করে আজকের তোলা শীতলের একটা ছবি বের
করল। তারপর সেই ছবির উপর শুদ্ধর একহাত
চেপে ধরে তেজি সুরে বলল,

-‘এবার বল ভালোবাসিস না। তার প্রতি কোনো
ফিলিংস কাজ করে না। যদি মিথ্যা বলিস তাহলে

শীতল যেখানেই থাকুক যে অবস্থাতেই থাকুক
ধড়ফড়িয়ে মরুক। আমি গিয়ে দাফন করব তাকে।’

একথা শুনে শুদ্ধ হাত ছাড়াতে গেলে সায়নের জেদটা
যেন বেড়ে গেল। সে শুদ্ধর হাতটা আরো শক্ত করে
চেপে ধরল। সে উত্তর জেনেই ছাড়বে। ভাইয়ের
ছেলেমানুষি দেখে শুদ্ধ বিরক্ত হলো। তবে কোনো
ভাবেই তার হাতটা শীতলের ছবির উপর ধরো রাখা
গেল না। এবার উত্তরও সুস্পষ্ট।

সায়ন বুঝে আচমকা হো হো করে হেসে উঠল।
হাসতে হাসতে মাটিতেই বসে পড়ল। চোরের ধর্ম
চুরি করে বলা, ‘ আমি চুরি করি নি।’ অথচ তলে
তলে শিক কেটে বসে থাকে। অবশ্য চোরের ধর্মে
একটু হেরফের না হয়ে একপক্ষে ভালোই হয়েছে।
নতুবা ‘ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না’, এ
প্রবাদটির একটু হলেও কদর কমে যেতো। সে খুব
ভালো করে জানে এই ছেলে ভাংবে তবুও মচকাবে
না। হঠাৎ কিছু মনে হতেই সায়ন তড়িৎবেগে দাঁড়িয়ে
গেল। এগিয়ে এসে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল শুদ্ধকে।
ইশ! তখন

রাগের মাথায় মেরে, বকেছে দিয়েছে। পরক্ষণেই
শুদ্ধর গালে চুমু ঐঁকে বলল, ‘সরি ভাই!’

শুদ্ধ বিরক্তমুখে নিজেকে ছাড়িয়ে বাইকের চাবি নিয়ে
ওর বাইক স্টার্ট করল। তাকে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে
দেখে সায়েনও হাসতে হাসতে বাইক টেনে তুলে।
তারপর ধীরে সুস্থে বাইক স্টার্ট করল। দুজনেই
স্বাভাবিক গতিতে যাচ্ছে। তখন সায়েন বলল,-‘বাড়ি
চল। ‘

-‘কাজ আছে তুমি যাও।’

-‘দেরি হবে?’

-‘হুম।’

-‘যেখানে যাচ্ছি যা প্রথম সেহরিতে যেন বাড়িতেই
হয়।’

শুদ্ধ জবাব দিলো না। অনেকটা পথ দুই ভাই
একসাথে এসে হাইওয়ে থেকে ভিন্ন পথ ধরল। কিছু
কথা, কিছু প্রশ্ন, অপ্রকাশিত থেকেও প্রকাশ হয়ে
গেল আজ। তবে একটা কথা না বললেই নয় মাঝে
মাঝে নীরাবতা রাগ বাড়ায়। রাগে বাড়ে অভিমান।
অভিমানে বাড়ে দূরত্ব। শুদ্ধ জানে না আজকের পর
থেকে শীতলের সাথে ঠিক কতটা স্বাভাবিক হতে

পারবে। আর শীতলই বা সেটা কীভাবে নেবে। তবে
যেটাই হোক এর শেষও দেখে ছাড়বে। ‘বড় মামী!
মেজো মামী! ছোটো মামী! শখ! স্বর্ণ! ছুটকি! কই রে
সব?’

ট্রলি হাতে দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে সমানে চেষ্টাচ্ছে
রুবাব। ড্রয়িংরুমে কেউ নেই দেখে তার কণ্ঠস্বর
সমানে বাড়ছে। সারাদিনের ধকল কাটিয়ে সবাই
ফ্রেশ হয়ে বিশ্রাম করছিল। আজ রাতে প্রথম সেহরি।
আগামীকাল প্রথম রোজা। বাড়ির সবাই রোজা
থাকবে। ছোটো, বড়, সবার পছন্দের দিকটাও খেয়াল
রাখতে হবে। বাচ্চাগুলো ঘুম থেকে উঠে ঝাল
তরকারী খেতে পারে না। তারা খাবে দুধ-ভাত। একে
একে সেসবকিছুরই যোগাড় করতে হবে। তাই তিন
গিনি বিশ্রাম নিয়ে একটু পরে নিচে নামতেন। কিন্তু
খুব পরিচিত কারো হাঁকডাক শুনে একে একে সকলে
ছুটে এলেন। সাম্য

কোথা থেকে দৌড়ে এসে রুবাবের গলা ধরে ঝুলে
পড়ল। সৃজন পিঠের উপর উঠে বসল। গলায় টান
খেয়ে রুবাব ওমা গো বাঁচাও! বাঁচাও! করে চেষ্টাচ্ছে।
সিরাত এসে বাদর দুটোকে কোনোমতে সরাল।

রুবাব কাশতে কাশতে অভিযোগ ছুঁড়ল,-‘চৌধুরীর
এক একটা ছানা একেক রকমের বজ্জাত। পেছন
পাকা সব ক’টা। ছোটো দুটোকে দেখছি বড় দুটো
কই? শালারা কল ধরছে না।’

একথা বলে সিরাতকে দেখে গালভর্তি হেসে বলল,
-‘আরে শাশুড়ি মা যে কেমন আছো, বলো!
সিরাত হেসে রুবাবের মাথাভর্তি কোঁকড়াচুলো
এলোমেলো করে দিলো।

বলা বাহুল্য, এটা উনার বহু পুরনো অভ্যাস! উনি
যখনই রুবাবের চুল এলোমেলো করে দিতেন রুবাব
গাল ফুলিয়ে সোজা অভিযোগ জানাত সাওয়ান
চৌধুরীর কাছে। আদুরে সুরে সাওয়ান চৌধুরীর গলা
জড়িয়ে ধরে বলত,

-‘মেজো মামা, ওহ মেজো মামা, মামী আমার চুল নষ্ট
করে দিচ্ছে। আমি কিন্তু খুব রেগে যাচ্ছি। বড় হলে
তোমার মেয়ে নিয়ে পালালে দোষ দিবে না কিন্তু।’

ছোটো রুবাবের কথা শুনে সবাই হেসে লুটোপুটি
খেতো। শতরূপা ছোট রুবাবের গালে চুমু ঐঁকে
বলতেন,

-‘পালানোর ভাড়া আমি দেবো বাপ। তুই শুধু বড় হো আর দোয়া কর যেন ভুল করে হলেও তোর না হওয়া বউ পৃথিবীতে ল্যান্ড করে।’মায়ের কথা শুনে ফোঁকলা দাঁত বের করে সে কী হাসি রুবারের। আনন্দ যেন ধরে না। এরপর থেকে যখনই সিরাত চুল এলোমেলো করে দিতো তখনই দাঁত করে হেসে বলত,

-‘ওহ মেজো মামী, আমার চুল এলোমেলো করার অপরাধে তোমাকে একদিন আমার শাশুড়ী বানাবোই বানাব।’

রুবার যতবার একথা বলতো সিরাতও ততবারই শব্দ করে বলতেন, ‘আমিন!’

কিন্তু বছর ঘুরে যেদিন সাম্য সজুন হলো সেদিন রুবারের সে কী রাগ!

কারণ তার বউ পৃথিবীতে ল্যান্ড করে নি। বউয়ের জায়গায় দুটো বাদড় এসেছে। বলতে গেলে এই পাজিদুটোই তার প্ল্যান বরবাদ হয়ে দিয়েছে।এতদিন পর রুবাবকে দেখেই সিরাত চুল এলোমেলো করে দিয়ে বলল,

-‘এতদিন পর মনে পড়ল? তা কেমন আছিস বাপ?’

-‘আমি তো বিন্দাস আছি। তোমরা কেমন আছো বলো?’

-‘আমরাও ভালো আছি।’

তারা কথা বলতে সিঁতারা এসে দাঁড়াতেই রুবাব উনাকে দেখামাত্র ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল। গালে গালে লাগিয়ে চমৎকার করে বলল,

-‘বড় মামী আমার ভাগের আচার আছে তো? নাকি শীতল একাই সবটা ঝেড়েছে? ভাগে কম পেলে ওর কান ছিঁড়ে ফেলব বলে দিলাম?’

-‘আছে বাপ। অনেক আচার আছে। এবার বল দেখি এত শুকিয়ে গেছিস কেন? খাওয়া দাওয়া করিস না? এবার কিন্তু সহজে ছাড়ছি না তোকে, মনে রাখিস?’

-‘উপর মহল সেসব শুনবে মামী? টাইমমতো ঠিকই জয়েন করতে হবে।’

-‘দরকার নাই ওসব ছাঁইপাশের চাকরি। ছেড়ে দে ওই চাকরি। পানিতে ভেসে বেড়ানো চাকরি করতে হবে না। দরকার হলে দুই মামার অফিসে বসবি।’-‘হা, হা, তা বললে হবে। তা ছোটো মামী কই, ফোনকলে মামার সাথে প্রেম করছে নাকি?’

তখন সিমিন তার পেছন থেকে কান টেনে ধরে বললেন,

-‘না রে পাজি ছেলে প্রেম করছি না। আমার সাথে প্রেম করার সময় নেই তোর মামার।’

-‘বলো কি! তাহলে এই স্বামীকে টেনে বেড়ানো কি দরকার? ডাস্টবিনে ফেলে দাও, আমি তোমাকে নিউ ব্র্যান্ডের স্বামী এনে দেবো।’

একথা শুনে সিমিন হাতের চাপ বাড়াতেই রুবাব মুচড়ামুচড়ি করে কান ছাড়াল। শখ, স্বর্ণ এলে তাদের সাথেও কথা হলো। গল্প হলো। মজার সব গল্পে হাসাহাসিও হলো। কথায় কথায় একগাদা নাস্তা সামনে রাখা মাত্রই রুবাব খেতে শুরু করল। তখন শিষ বাজাতে বাজাতে বাইকের চাবিটা কায়দা করে আগুলের ডগায় ঘুরাতে ঘুরাতে সায়ন এলো। রুবাব তাকে দেখে দ্রুত উঠে কোলাকুলি করে বলল,

-‘বড় ভাই ভালো আছেন? রাজ কার্য সেরে ফিরলেন বুঝি? বিয়ে সাদি কী করবেন না? আর কত কচি সেজে থাকবেন?’ একথা শোনামাত্র সায়ন ওর কানে কানে কিছু একটা বলতেই সে ছিঁটকে সরে গেল। নাক, মুখ কুঁচকে বলল,

-‘ছিঃ! তুমি একটা অশ্লীল।’

সায়ন রুবারের কাঁধ জড়িয়ে ধরে একই সোফায় বসল। তিন গিনি তখন রান্নাঘরে। ডায়নিং টেবিলে শখ, স্বর্ণ, সাম্য সৃজন রুবারের আনা পিজ্জা ভাগাভাগি করতে বসেছে। এদিকে আর কেউ নেই দেখে সায়ন রুবারকে বলল,

-‘ভাই সন্মান নিবা, সন্মান?’

রুবার কলার ঝাঁকিয়ে ভাব মেরে বলল,

-‘অবশ্যই নেবো। আমার বোন নিবা অথবা আমাকে সন্মান দিবে না তা তো হবে না।’

-‘কে বলেছে তোমাকে সন্মান দেবো না সোনা? এসো, সন্মান নাও। তা সন্মান কোথায় নিবা? সামনে নাকি পেছনে? তা ঠিকঠাক লোড নিতো পারবা তো?’

একথা শুনে রুবার এক লাফে উঠে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বলল,

-‘বড় মামী সায়ন ভাইয়ের দ্রুত বিয়ে দাও। এর বিয়ে দেওয়া ফরজ হয়ে গেছে।’

একথা শুনে সিঁতারা পেঁয়াজ কাটতে কাটতে জবাব দিলেন,-‘ও একবার নিজের মুখে বিয়ের কথা বলুক দু’দিনের মধ্যে ওকে বিয়ে করাব আমি।’

সিঁতারার কথা শুনে সায়ন ঠোঁট কামড়ে হেসে স্বর্ণের
দিকে তাকাল। স্বর্ণ কিছু অনুভব করে তাকাতে
চোখাচোখি হয়ে গেল দু'জনের। সায়ন চোখ
ইশারা করে উপরে যাওয়ার কথা বললে স্বর্ণ যেন
শুনেও শুনল না। ঠাঁই সেভাবেই বসে রইল। অগত্যা
সায়ন চুলে ব্যাক ব্রাশ করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে
উপরে উঠতে উঠতে গান ধরল,
কইতে আমার শরম লাগে
প্রেম আগুনে পুঁইড়া ছাই।
সানডে মানডে ক্লোজ কইরা দিতে একজন মানুষ
নাই।
ও ভাইরে ভাই..!
বড় ভাইয়ের গান শুনে শখ মুখ টিপে হাসতে হাসতে
বেচারী একসময়
ভীষম খেলো। তবুও তার হাসি থামছে না। তাকে
এভাবে হাসতে দেখে সাম্য, সৃজন একে অপরের মুখ
চাওয়াচাওয়ি করল। কিন্তু কিছু বুঝতে না অগত্যা
খাওয়াতে মন দিলো। সবার সাথে টুকটাক কথা হলেও
এখন অবধি শীতলের সাথে দেখা নি রুঝাবের। যেটা

অতি আশ্চর্যের ব্যাপারও বটে। সে বাড়িতে নেই?
নাকি

তার উপস্থিতি এখনো বুঝতে পারে নি? তবে যায়
হোক তার জন্য দেখা করাটা ফরজ। তাই সে
শীতলের খোঁজ নিয়ে নিজেই গেল দেখা করতে।
গিয়ে দেখে শীতল রুমে নেই। রাত তখন সাড়ে
দশটা। এত রাতে মেয়েটা গেল কোথায়? সে চিন্তিত
হয়ে কপালে ভাঁজ ফেলে বের হতেই সায়নের
মুখোমুখি হলো। সায়নকে কথাটা জানাতেই সায়ন
শুধুর রুমের দরজায় হাত রেখে দেখে দরজা ভিজিয়ে
রাখা। দরজা খোলা রাখার তো কথা না।

কৌতুহলবশত দরজা সামান্য খুলে উঁকি মারতেই
দেখে আলুথালু বেশে শীতল বসে আছে। পরনে
এখনো শাড়ি। কেঁদে কেটে একাকার অবস্থা। চোখ
ফুলে লাল হয়ে আছে। মেঝেতে বসে হাঁটুতে মুখ
গুঁজে থাকায় সে এখনো দেখে নি। তবে একটুপরে
রুমে কারো উপস্থিতি বুঝে চোখ তুলে তাকাতেই
দেখে রুবাবা, সায়ন দাঁড়িয়ে আছে। তাদের
দেখামাত্রই শীতল ঠোঁট উল্টে ভ্যাঁ ভ্যাঁ কেঁদে দিলো।

কান্নার দমকে কথা বলতেও পারছে না সে। সায়ন
দ্রুত হাঁটু গেঁড়ে বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল,
-‘কি হয়েছে পাখি কাঁদছিস কেন?’

রুবাবও বসল। সেও ভ্রঁ কুঁচকে তাকিয়ে আছে।
তারপর সায়নের থেকে শীতলকে ছাড়িয়ে আলতো
করে শীতলের দু’চোখের পানি মুছে দিলো।

তারপর মাথা নাড়িয়ে কাঁদতে বারণ করে বলল,
-‘কি হয়েছে ছুটকি? বল আমাকে?’

-‘শু..শুদ্ধ ভাই।’-‘ওর সাথে কথা হয়েছে আমার
জরুরি কাজ পড়ে গেছে ফিরতে দেরি হবে।’

-‘র..রেগে আছে খুব।’

-‘রাগিয়েছিস কেন? তোকে শিখিয়ে দেই একটা তুই
করিস আরেকটা।’

-‘তোমার কথামতোই তো কানের দুই ইঞ্চি নিচে
কিস করলাম। তাতেই তো আরো রেগে গেল।’

একথা শুনে সায়ন ভ্রঁ কুঁচকে তাকাল রুবাবের
দিকে। কিস এলো কোথা থেকে? সে তো এসব
করতে বলে নি। ওয়েট, ওয়েট, শীতল শুদ্ধকে কিস
করেছে? কিন্তু এই বুদ্ধি কে দিলো? সে এবার
বিশ্বয়ভরা দৃষ্টিতে শুধাল,

-‘কি? কী বললি আবার বল? তুই ভাইকে কিস করেছিস?’

শীতল মুখ কাঁচুমাচু করে সম্মতি সূচক মাথা নাড়িয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল,

-‘রু রুবাব ভাইয়াই তো শিখিয়ে দিলো। আমি তো রাজি ছিলাম না। কিন্তু ভাইয়া বলল, এটা করলে শুদ্ধ ভাই দ্রুত পটে যাবে। পটে গেলে আমার মিশন সাকসেস হবে।’

এতক্ষণে সায়ন বুঝল শুদ্ধর রাগের কারণ। যেখানে ভালোবাসার শুরুই হয় নি সেখানে এসব। আর শুদ্ধ যে ব্যক্তিত্বের ছেলে সে কখনোই এসব ছ্যাবলামি পছন্দ করবে না। এটা তো জানা কথা। সায়ন এবার রুবাবের দিকে তাকিয়ে দাঁত কটমট করে বলল,-‘শালা বলদ, কি করেছিস এটা? আমাকে একবার জানাতে পারলি না?’

রুবাবও দাঁত খিশমিশ করে বলল,

-‘আমি কী করে জানব ওই শালা এতটা রেগে যাবে? কোনো মেয়ে যদি ভালোবাসার কথা বলে কিস করে আমি তো কুপোকাত। আমি আমার কথা ভেবে বুদ্ধিটা দিয়েছিলাম। কে জানত পাশা উল্টে যাবে?’

সায়ন দীর্ঘশ্বাস। সে শীতলের মাথায় হাত রেখে
আদুরে সুরে ডাকল,

-‘শীতল! জানবাচ্চা আমার। এভাবে কাঁদে না পাখি।
আমরা তোর সাথে আছি না, হুম?’

-‘শুদ্ধ ভাই খুব কষ্ট পেয়েছে ভাইয়া।’

-‘তা পেয়েছে। শোন আজ থেকে আমরা আর কোনো
প্ল্যান করব না। সব সময়ের হাতে ছেড়ে দিবো।
এরপর যা হয়, হবে, কেমন?’-‘কিন্তু...!’

-‘উহুম আর কোনো কিন্ত না। ধরে নে, আমাদের
মিশন সাকসেস।’

-‘সাকসেস? কীভাবে? আমি উনাকে পটাতে পারলাম
না। ভালোবাসার জীবাণু শুদ্ধ ভাইয়ের রন্ধে রন্ধে
ছড়াতে পারলাম না। আর প্রাপ্তি হিসেবে তাকেও তো
পেলাম না।’

-‘ওই যে বললাম সময় কথা বলবে।’

-‘ঠিক আছে। তাহলে শুদ্ধ ভাই ফিরলে কি আমি সরি
বলব? ভাইয়া খুব রেগে আছে আমার উপর।’

-‘তা বলতে পারিস।’

শীতল ঘাড় কাত করে তাদের কথায় সম্মতি জানাল।
শুদ্ধ ওভাবে রেগে বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে তার

মন ভার হয়ে আছে। কেঁদে কেটে যাচ্ছে তাই অবস্থা।
অপরাধবোধ কাজ করছে নিজের মধ্যে। বুঝতেও
পারছে, মিথ্যে ভালোবাসার দাবী নিয়ে শুদ্ধর সামনে
দাঁড়ানো উচিত হয় নি তার। কেননা মিথ্যে ভালোবাসা
বিষের মতো। শুদ্ধ ভাই বুঝে নিয়েছে হয়তো। এজন্য
রাগ দেখিয়ে চলে গেল। কিন্তু গেল কেন? তাকে
মারত। মেরে ওর ভুল ধরিতে দিতে পারত।
বরাবরের মতো একটু বকতে পারত। ধমকাতে
পারত। এতদিন শুদ্ধর মারা, বকা, ধমকানোয় কষ্ট
পেতো অথচ আজ এসব না করাতে এত কষ্ট পাচ্ছে।
এসব ভেবে তার চোখের পানি ঝরঝর করে গড়িয়ে
গেল। আবার ওকে কাঁদতে দেখে দুই ভাই উতলা
হয়ে গেল।

শীতল সায়ন আর রুবাবের হাত দুটো আঁকড়ে ধরে
ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল,

-‘কিভাবে সত্যি সত্যি ভালোবাসতে হয়? সত্যিকারের
ভালোবাসা কেমন হয়? প্লিজ শেখাও আমাদের। আমি
শিখতে চায় ভাইয়া। আমার বারবার মনে হচ্ছে আমি
শুদ্ধ ভাইকে খুব কষ্ট দিয়ে ফেলেছি? বড্ড ভুল
করেছি।

এই ভুল শুধরাতে হবে আমাকে।'রুবাব সায়নের
দিকে তাকালে তাদের চোখাচোখি হলো। তারা
শীতলকে বোঝাল,

-‘ভালোবাসা শেখানো যায় না পাগলি। এটা মনের
কারবার। একদিন মন বলে দেবে তুইও কাউকে
ভালোবাসিস। যার দেখা পাওয়ার জন্য ছটফট করবি।
যার কথা শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকবি। হাজার
হাজার, লক্ষ কোটি মানুষের ভিড়ে তোর দু’চোখ খুব
প্রিয় একটা মুখই খুঁজে বেড়াবে।

তার হাসিতে আনন্দরা ঝুমঝুম করবে আবার তার
সামান্য কষ্টে বুকটা দুমড়ে মুচড়ে যাবে। যাকে কোটি
কোটি বার ‘ভালোবাসি’ বললে বিতৃষা আসবে না।
অরুচি হবে না। বিরক্ত লাগবে না। এটাই হচ্ছে
ভালোবাসা।’

শীতল কথাগুলো মন দিয়ে শুনে ভাবতে লাগল। তবে
এখন ভাবার সময় দিলো না দুভাই। তাকে রুমে
পাঠিয়ে ফ্রেশ হয়ে দ্রুত নিচে নামার তাগাদা দিলো।
তবে শীতল কথাগুলো মাথা থেকে সরাতে পারল না।
ফ্রেশ হয়ে চুল মুছতে ভাবল। সিঁড়ি বেয়ে নামতে

নামতে ভাবল। সবার সাথে এক টেবিলে বসে রাতের
খাবার খেতে খেতে ভাবল। সবাই আছে শুদ্ধ নেই।
রাত বাড়ছে সেহরিতে আবার উঠতে হবে তাই
সকলে ঘুমাতে চলে গেল। তবে শীতলের চোখে ঘুমের
রেশমাত্রই নেই। সে ভেজা চুল ছেড়ে দিয়ে অন্ধকার
বেলকনিতে বসে আছে। কেন বসে আছে জানে না।
তবে বসে থাকতে ভালো লাগছে। আচ্ছা, শুদ্ধ ভাই
এখনো ফিরছে না কেন? এত রাত করে বাইরে থাকা
কিসের? কি এমন জরুরি কাজ করছে যে এত রাত
হচ্ছে? এসব ভাবতে ভাবতে বাইকের শব্দ পেল। মূল
ফটক দিয়ে শুদ্ধ বাইক নিয়ে পাকিংলটে গেল।
সেখানে বাইক রেখে বাড়িতে প্রবেশ করলে
কলিংবেল চাপতে হবে। তাতে সবার ঘুম ভেঙ্গে যেতে
পারে ভেবে সে দৌড়ে নিচে গেল। কলিংবেল চাপার
আগে দরজা খুলে দিলো। শুদ্ধ কেবল হাত
বাড়িয়েছিল কলিংবেল চাপার জন্য। তার আগে দরজা
খুলে শীতলকে দেখতে পেল। ফোলা ফোলা চোখে
ঠোঁটে মিষ্টি হাসি এঁটে তার দিকে তাকিয়ে আছে
শীতল। শুদ্ধ তার পাশ কাটিয়ে যেতে গেলে শীতল
মিনমিন করে বলল,-‘খাবার বাড়ব?’

শুদ্ধ হ্যাঁ/না কিছু না বলে উপরে উঠতে গেলে শীতল
পুনরায় বলল,

-‘মুরগীর মাংসের তরকারীটা খুবই মজা হয়েছে।
গরম করে খাবার রুমে দিয়ে আসি?’

এবারও শুদ্ধ নীরবে সিঁড়ি দিয়ে উপরে চলে গেল।
শীতল ছলছল চোখে তাকিয়ে সেও শুদ্ধর পিছু পিছু
যেতে যেতে আবার ডাকল,

-‘শু..শুদ্ধ ভাই।’

শুদ্ধ নিজের রুমের সামনে দাঁড়িয়ে পার্স দিয়ে দরজা
খুলে ভেতরে ঢুকে গেল। একবার পেছন ফিরে
তাকালে দেখে পেতো অপরাধবোধে কাতর হওয়া
এক মানবীকে। যে অশ্রুভেজা চোখে তার দিকেই
তাকিয়ে আছে।

শুদ্ধ চলে গেলে শীতলের মনে পড়ল সরি বলা হয়
নি। সে চোখজোড়া মুছে দরজায় পার্স ইন করতেই
ইনকারেক্ট পার্স দেখাল। একবার দুইবার
তিনবার করে একই পার্স দিলে বারবার ইনকারেক্ট
পার্স দেখাল। অবাক হলো। চতুর্থবার পার্স দিতে
দরজায় হাত লাগানো মাত্রই কারেন্টের শক

লাগল। শকে গোটা শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল ওর।
দ্রুত হাত সরিয়ে দু'পা পিছিয়ে অবাক হয়ে দরজার
দিকে তাকিয়ে রইল। আগে কখনো এমন হয় নি।
একবার পাস দেওয়া মাত্রই দরজা খুলে যেতো। তবে
কি পাস বদলে দিয়েছে শুদ্ধ ভাই? কিন্তু পাস বদলাল
কেন? তাকে রুমে ঢুকতে দিবে না তাই? ছোটো
একটা ভুলের কারণে এত বড় শাস্তি? এভাবে কী
দূরে সরিয়ে দেবে? ওদিকে বন্ধ রুমের বিছানায় বসে
ফোন হাতে নিয়ে বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে আছে
শুদ্ধ। হাতে থাকা ফোনে একের পর এক বার্তা
আসতেই আছে। বারবার ভুল পাস ইন করায়
কারেন্টের শক লেগে পাস ইন করা থেমে গেছে।
শীতল থামতেই নোটিফিকেশন আসাও থেমে গেছে।
শুদ্ধ নোটিফিকেশনে দিকে তাকিয়ে মলিন হাসল।
শক খেয়ে খুব বেশি কষ্ট পেল নাকি? পেলে যাক!
মাঝে মাঝে কষ্ট পাওয়া ভালো। নিজে একটু কষ্ট
অনুভব করলে অন্যের কষ্টটা খুব সহজে উপলব্ধি
করতে পারবে।

তাছাড়া কেবল তো শুরু। এসব ভেবে সে ফোনটা
বিছানার উপর ঢিল ছুঁড়ে ফেলল। তারপর দুই হাতে

মাথার চুল খামছে ধরে বিরবির করে আওড়াল,-
সোনা যত পোড়ানো হয় তত নাকি খাঁটি হয়।
আজকে থেকে তোকে পোড়ানোর দায়িত্ব আমার।
আমাকে চাওয়ার কথায় যেভাবে পিছিয়ে গেলি
একদিন তুই নিজেই সর্ব সম্মুখে আমাকে চেয়ে নিবি।
চাইতেই হবে মিলিয়ে নিস। আমিই চাইতে বাধ্য
করব তোকে। যদি না পারি না তবে আমার নামও
শোয়াইব শুদ্ধ নয়। রেডি থাক চৌধুরী কন্যা, রেডি
থাক।'ঘড়িতে সময় তিনটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট।
এলার্মের শব্দে একে একে ঘুম থেকে উঠেছেন তিন
চৌধুরী গিন্নি। তিন জা কাজ গুছিয়ে হাতে হাতে গরম
খাবার এনে রাখছেন ডায়নিং টেবিলে। মাঝে মাঝে
ডাকছেন ঘুমে মগ্ন ছেলে-মেয়েদের। কিন্তু কারোই
উঠার নাম নেই। ডাকাডাকিতে একে একে উঠে
পড়েছেন শারাবাত ও সাওয়ান চৌধুরী। বসেছেন
ড্রয়িংরুমে।এভাবে বসে থাকলে সময় যাবে না তাই
টিভি ছাড়তেই দেখলেন একটা চ্যানেলে বড় বড়
পাহাড় দেখাচ্ছে।সেসব পাহাড়ে নবী ও সাহাবী
কতদিন থেকেছিলেন, কেন থেকেছিলেন, সেসব
দেখানো হচ্ছে। দুইভাই সোফায়

বসে মনোযোগ সহকারে তা দেখছেন। আজকে প্রথম
সেহরি। সবাই এক সাথে সেহরি করলেও থাকছেন
না শাহাদত চৌধুরী। ভাইয়ের কথা স্মরণ হতেই মন
ভার হলো উনাদের। ভাইটা চাকরির কারণে থাকতে
পারে না। সাওয়ান চৌধুরী আর না ভেবে কল দিলেন
শাহাদত চৌধুরীকে। রিসিভ হতেই ফোনের ডিসপ্লিতে
ভেসে উঠল শাহাদত চৌধুরী হাস্যেজ্জ্বল মুখ। উনিও
ফ্রেশ হয়ে ফোন হাতে নিয়েছিলেন ফোন দেওয়ার
জন্য। ভাইয়ের

কল পেয়ে খুব খুশিও হয়েছেন বটে। উনারা কথা
বলার মাঝে শখ গিয়ে দাঁড়াল। বাবার হাত থেকে
ফোনটা নিয়ে কথা বলল ছোট্ট চাচ্চুর সাথে। আবদার
করল একসাথে ইফতার করল। শাহাদত চৌধুরী
আদুরে সুরে জানালেন অবশ্যই চেষ্টা করবেন।
তারপর তিনভাই আর কিছুক্ষণ কথা বলে কল
কাটলেন। শখকে দেখে সিতারা বললেন বাকিদেরকে
ডেকে আনতে। ঘুমে থেকে উঠে ছেলে-মেয়েগুলো
ভাত গিলতে পারে না। ধীরে ধীরে খাবে নাহয়।
এতবড় দিন কিছু না খেলে কীভাবে হবে? শখ মায়ের

কথা শুনে দোতলায় গিয়ে স্বর্ণকে ডাকল। এরপর ঘুমকাতুরে শীতলকে।

শীতলকে ডেকে ওয়াশরুমে পাঠিয়ে এরপর ডাকল শুদ্ধ আর সায়নকে।

নয়তো দেখা যেতো পাজি মেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। দোতলায় একে একে সবাইকে ডেকে গেল গেস্টরুমে। রুবাব গেস্টরুমে ঘুমাচ্ছে। তাকে কয়েকবার ডেকে এরপর এসে বসল ডায়নিং টেবিলে। ডাকাডাকির পর ফ্রেশ হয়ে একে একে এসে বসল ডায়নিং টেবিলের চেয়ারে। শীতল মুখ ভোঁতা করে দেখল সবাই থাকলেও শুদ্ধ নেই। তাকে কী কেউ ডাকে নি? এখন না উঠলে খেতে পারবে না ধীরে সুস্থে? এসব ভেবে ডাকার জন্য উঠতে গেলে দেখে শুদ্ধ নামছে সিঁড়ি দিয়ে। তার চোখ মুখে ঘুম জড়িয়ে আছে। গোসল দিয়েছে নাকি? চুল ভেজা কেন? ভোরবেলা গোসল দেয় কোন পাগলে? ল্যাভে কাজ করছিল বোধহয়। শীতল খুব মনযোগ দিয়ে দেখল পাষাণ মানুষটাকে। শুদ্ধ এসে বসল সৃজনের পাশে। অথচ তার পাশের চেয়ারটাও ফাঁকা। একটুপরে সেই চেয়ারে এসে বসল রুবাব। সে

রুবাবকে দেখে মিষ্টি করে হাসতে গিয়ে হাসতে
পারল না। আচ্ছা সে কী শুদ্ধ ভাইয়ের বসার আশা
করেছিল? কিন্তু কেন? উত্তর খুঁজে পেল না শীতল।
তাই মন খারাপ করে প্লেট টেনে নিলো নিজের
দিকে। ততক্ষণে

যে যার পছন্দের খাবার নিয়ে খেতে শুরু করেছে।
সাম্য, সৃজনের চোখে

এখনো ঘুম। তারা এখনো ঢুলছে। অথচ গতকাল
সবাইকে বলেছে তারা রোজা থাকবে। এবার সব
রোজা করবে। গতবার ছোট ছিল তাই করতে
পারে নি। এবার ত্রিশটা রোজাই করবে। তারাও
দেখিয়ে দেবো তারা বড় হয়ে গেছে। ওদের কথা
কথা শুনে সবাই হেসেছিল। শারাবাত চৌধুরী খেতে
হঠাৎ চোখ পড়ল শীতলের দিকে। শীতল মাথা নিচু
করে চুপ করে বসে আছে। প্লেটে শুধু সাদা ভাত
আর চিংড়ি মাছ।

ঘুম থেকে উঠে আসায় চোখ মুখ ফুলে আছে। ঘুম
থেকে উঠলে এভাবে চোখ ফোলার কথা তাহলে কী
মেয়েটা কেঁদেছে? হয়তো। কারণ শীতল বিশেষ
বিশেষ দিনগুলোতে বাবাকে পাশে পাওয়ার আশা

করে। যখন পায় না তখন খুব কাঁদে। আজও বোধহয় বাবার জন্য কেঁদেছে মেয়েটা। সিমিনের মুখটাও মলিন লাগছে। উনি দীর্ঘশ্বাস চেপে কিছু বলার আগে দেখলেন রুবাব স্বযত্নে শীতলের প্লেটে সলেট মাংসের পিচ তুলে দিলো।

সায়ন খোসা ছড়িয়ে চিংড়ি তুলে দিলো। শখ পানির গ্লাস এগিয়ে দিলো। স্বর্ণ সাম্য, সৃজনের দুধভাত মেখে দিচ্ছে। শুদ্ধ মা-চাচীদেরও বসা পড়ার তাগাদা দিচ্ছে। কী চমৎকার সেসব দৃশ্য! টুকটাক কথাবার্তা হচ্ছে। সবাই খাচ্ছে। যার যেটা লাগবে তুলে নিচ্ছে, তুলে দিচ্ছে। এরপরেও যেন কিছু একটা মিসিং। কি সেটা? আচ্ছা শীতল কথা বলছে না। হাসছে না। তার মাঝে চঞ্চলতাও দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু কেন? শুদ্ধ আবার বকেছে নাকি মেয়েটাকে? মনে মনে একথা ভেবে উনি কপাল কুঁচকে তাকালেন শুদ্ধর দিকে। ছেলেটা আপনমনে খাচ্ছে। ছোটো ছোটো লোকমা তুলে খায় সে। খাওয়ার কায়দা দেখে বোঝা যায় পুরোই জেন্টেলম্যান! মুখভঙ্গি দেখে বোঝার উপায় নেই মনে কী চলছে। শুদ্ধর বাঁ পাশে রুবাব আর রুবাবের পাশে সায়ন। বলা বাহুল্য, চৌধুরী বাড়ির

নজরকাড়া তিন সুদর্শন যুবক। আজকাল ছেলেদের
বিয়ের প্রস্তাব আসে। আজও এসেছে। আজকের
প্রস্তাব এমন ছিল যে যৌতুক হিসেবে চেকে মর্জিমতো
যত সংখ্যা বসিয়ে নিতে পারবে। তবুও শুদ্ধকে নাতী
জামাই করবেন সেই লোক। যৌতুকের কথা শুনে
রাগ হলেও উনি নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন।
জানিয়েছেন ছেলে বিক্রি করবেন না। তবে ছেলের
সাথে কথা বলে দেখবেন ছেলের মত থাকলে উনাকে
জানাবেন। মূলত কথাটা বলেছিলেন এড়িয়ে বাঁচার
জন্য। উনি খুব ভালো করেই জানেন শুদ্ধর কানে
একথা গেলে জবাবে এমন কিছু বলবে যে পাল্টা
জবাব দিতে কথার খেঁই হারিয়ে ফেলবেন।
তবুও চুপ থাকলে হবে না কিছু বলতে হবে।
ছেলেগুলোও বড় হয়েছে। বিয়েসাদী দিতে হবে।
বাড়িতে বউ আনতে হবে। অন্যবাড়ির ছেলেরা
এস.এস.সি না দিতেই বিয়ের জন্য লাফাতে শুরু
করে। অথচ এদেরকে বিয়ের কথা বলতে বলতে
গলা শুকিয়ে যায়। বয়স কী বসে থাকে? বাপ হতে
হবে না? এসব ভেবে মনে মনে কথা গুলিয়ে নিলেন।
তারপর গলা খাঁকারি দিলে সবাই বুঝল উনি বিশেষ

কিছু বলবেন তাই তাকাল। তখন তিনি বললেন,-‘সায়ন, শুদ্ধ, রুবাব তিনজনকেই বলছি যথেষ্ট বড় হয়েছে। নিজেরাও যে যার মতো কিছু না কিছু করো। বয়স থেমে থাকে না। বিয়ে করতে হবে। বাড়িতে বউ আনতে হবে। আমার বিজনেস পার্টনারের মেয়েটা খুব লক্ষী। দেখতে শুনতে মাশাআল্লাহ্!’

এইটুকু বলে থামলেন। কথার মাঝে কথা বলে নি কেউ কারণ সবাই তার পরেরটুকু শুনতে চাই। উনি পরের কথাটুকু পেশ করলেন,

-‘আহনাফ আর ফিরলে শখের অনুষ্ঠান সেরে ফেলব। এরপর সায়নের। একে একে শুদ্ধ, রুবাব তারপর স্বর্ণ। ভেবেছি সায়নের জন্য মেয়েটাকে দেখতে যাব। কোনো সমস্যা আছে তোমার?’

শেষ কথাটা সায়নকে উদ্দেশ্য করে বললেন তিনি। সায়ন একমানে খেতে খেতে একবার চোখ তুলে বাবার দিকে তাকাল। তারপর বলল,-‘সামনে নির্বাচন।’

-‘তো?’

-‘তো বিয়ে টিয়ে বাদ।’

-‘আমি আমার পার্টনারকে কথা দিয়েছি।’

-‘ভালো করেছ। এবার নিজে করো নয়তো শুদ্ধ
কিংবা রুবারের ঘাড়ে ঝুলিয়ে দাও।’

সায়নের কথা শুনে রুবার ভীষম খেলো। কোনোমতে
পানি দিয়ে মুখের খাবার গিলে দুঃখী দুঃখী স্বরে
জবাব দিলে,

-‘বিয়ে করতে আমার কোনো সমস্যা নেই বড় মামা।
কিন্তু ঘাড়ের উপর বড় ভাইদের রেখে বিয়ে করলে
লোকে কি বলবে? লোকে ভাববে না বড় ভাইয়ের
কোনো সমস্যা আছে। ছোটো ভাই হয়ে এটা অন্যায়
হয়ে যাবে না?’

তার কথা শুনে সায়ন ভ্রুঁ কুঁচকাল। তারপর ক্ষ্যাপাটে
স্বরে জবাব দিলো,-‘ কেউ কিছু বললে সে ‘কেউ’
টাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিবি। বেশি না কয়েক
মিনিটে বুঝিয়ে দেবো সমস্যা আছে কী না । সেই
শালার এমন অবস্থা করব এক সপ্তাহ হাঁটতে গেলে
কুঁত পাড়বে।’

সাওয়ান চৌধুরী গলা খাঁকারি দিলেন। তবে উনার
ঠোঁটে মিটিমিটিহাসি।তবে ছেলের কথা শুনে শারায়াত
চৌধুরী বিরক্তিতে মুখ কুঁচকে নিলেন। উনি আজকাল

ভীষণ বিরক্ত সায়নের প্রতি। ছেলেটা ভীষণ লাগামছাড়া কথাবার্তা বলে। ইদানিং একটু বেশিই বলে। যার দরুণ বারংবার উনাকে অস্বস্তিতে পড়তে হয়। আর ছোটো ছোটো ভাই বোনদের সামনে এভাবে

কেউ কথা বলে? এখন কি ভদ্রতাজ্ঞান নতুন করে শেখাতে হবে? সায়ন নিজেও যেন বুঝতে পারল ব্যাপারটা তাই দাঁত কপাটি বের করে পুনরায় বলল,-‘না মানে পিটিয়ে পিঠের ছাল তুলে ফেলার কথা বলছি আর কি। ভাবো একবার কতবড় সাহস আমাদের নিয়ে ভুলভাল ভাবে।’

তার কথায় সাম্য ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে জবাব দিলো,-‘পিঠের ছাল তুললে হাঁটতে কুঁত পাড়বে কেন ভাইয়া? তুমি দেখি কিছুই জানো না। স্যার যখন আমার পাছায় মারে তখন আমার হাঁটতে কষ্ট হয়। তুমি বরং তাদের পাছার ছাল তুলে নিও।’

একথা শুনে শখ, স্বর্ণ একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। হাসিতে ঠোঁট কোণ বেঁকে আসছিল তাদের। কারোই বুঝতে বাকি নেই সায়নের কথার

ডাবল মিনিং। আপাতত প্রসঙ্গ বদলাতে শারীফাত
চৌধুরী এবার শুদ্ধকে বললেন,

-‘আর তোমার? তোমার কি সমস্যা?’-‘আমার কোনো
সমস্যা। তোমরা গিয়ে দেখে আসতে পারো।’

একথা শোনামাত্রই শীতলের হাত থেমে গেল। ডাব
ডাব করে তাকিয়ে রইল শুদ্ধর দিকে। মানে কি?
গতকালই না চুমু খেয়ে ভালোবাসার কথা বলল? আর
আজই অন্যকে বিয়ের কথা বলছে তাও তারই
সামনে? শুদ্ধ

ভাই তাহলে সত্যিই তাকে মেনে নেবে না? সায়েন
ভাই তখন বলল মিশন সাকসেস। তাহলে কি সায়েন
ভাই মিথ্যা বলেছিএ? তাকে বুঝ দিতে ওসব
বুঝিয়েছিল? শীতলের মাথা কাজ করছে না। সে
তাকিয়ে দেখছে তারই সামনে বসা নিষ্ঠুর মানুষটাকে।
এত পাষণ্ড কীভাবে হতে পারে? শীতল তাকিয়ে
আছে অনুভব করে শুদ্ধও হঠাৎ চোখ তুলে তাকাল।
দু’জনের

চোখাচোখি হলো। বাঁধ ভাঙ্গা কান্নায় ঠোঁট ভেঙ্গে
আসলেও সে নিজেকে সামলে নিলো। দৃষ্টি সরিয়ে
নিলো। তার এই সামলানোটাই সহ্য হলো না শুদ্ধর।

সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মনে মনে বলল,- ‘কলিজায়
তীর বিঁধেছে রক্তাক্ত হয় নি। রক্তাক্ত হলে চোখের
জল গাল বেয়ে গড়াতো। গড়াচ্ছে না যেহেতু তাহলে
কলিজা এফোঁড় ওফোঁড় হতে বাকি রয়ে গেছে
এখনো। নো প্রবলেম, আই উয়িল ট্রাই মাই বেস্ট।’
মনে মনে একথা বলে সে ঠোঁটে কুটিল হাসি ফুটিয়ে
বাবাকে বলল,

-‘মেয়ের গায়ের রং কুচকুচে কালো হোক। অশিক্ষিত
হোক। গরীব হোক আমার সমস্যা নেই। শুধু তাকে
সত্যবাদী হতে হবে। সর্বদা স্পষ্টভাবে যেন সবার
সামনে সত্য কথা বলার সাহস রাখে। এইটুকু হলেই
চলবে।’

-‘যতটুকু খোঁজ নিয়ে জেনেছি মেয়ে তেমনই। দেখতে
শুনতেও ভালোই। মুখের আদল আমাদের শীতলের
মতো খুব আদুরে।’

-‘বাহ্ তাহলে আর কি! আমি যেমন আমার সঙ্গী তো
তেমনই হওয়া চাই।

বিশেষ করে অন্যের কথায় সিধান্ত নেওয়া
মাথামোটাকে বউ করতে চাই না আমি। এরা বউ

হিসেবে জঘন্য টাইপ হয়।’-‘তাহলে এখানেই কথা বলি? ‘

-‘বলো। মনমতো মিলে গেলে শখের অনুষ্ঠানের আগে আমার বিয়েটা সারতে চাই।’

সাফওয়ান চৌধুরী এবার হাসতে হাসতে বললেন,

-‘কি রে বাপ বিয়ের জন্য এত পাগল হয়ে গেলি যে?’

-‘কুচক্রি মানুষের বদনজরে পড়েছি। জানোই তো নজর কতটা খারাপ জিনিস তাই বিয়েটা সেরে নজর কাটাতে চাচ্ছি। বলা তো যায় না, কে কখন কোন অপরাধে ফাঁসিয়ে দিলো।’

-‘হা, হা, দারুণ বললি তো।’

-‘মানুষ যা করে সেটা প্রকাশ করতে ভয় পায়। আমার আবার ওসব ভয় টয় কোনো কালে ছিল না আর এখনো নেই। তাই হয়তো অবলীলায় সব কথা বলতে পারি।’একের পর এক শুদ্ধর খোঁচামার্কী কথা শুনে সায়ন আড়চোখে শীতলের দিকে তাকাল। দেখল শীতলের চোখের কোণে অশ্রুতে চিকচিক করছে। শীতলও বুঝেছে শুদ্ধ তাকে মিন করে কথাগুলো বলেছে। হ্যাঁ, ভুল যখন করেছে তখন শাস্তি গ্রহনযোগ্য। তাই বলে এভাবে? শুদ্ধ ভাই কী বুঝেছে

না ছুরির থেকেও তার কথার আঘাত ধারালো হয়ে
বুকপাজরে বিঁধছে? নাকি সেই আঘাত অদৃশ্য বলে
দেখেও দেখছে না। বুঝেও বুঝছে না। সে

ভাত নাড়াচাড়া করতে করতে দু'ফোঁটা চোখের জল
ফেলল। সন্তপণে মুছে নিলো। তখন শারাদাত চৌধুরী
মাথা নাড়িয়ে এও বললেন,-‘আরো একটা নম্র-ভদ্র
মেয়ের সন্ধান আছে। মেয়ে বিসিএস ক্যাডার।

মেয়ের নানাজান যৌতুক হিসেবে চেকের পাতায়
ইচ্ছেমতো এমাউন্ট বসানোর কথা জানিয়েছে। একে
বিয়ে করতে তিন ভাইয়ের কে রাজি আছো স্পষ্টভাবে
জানাও। তোমাদের সম্মতি পেলে এগোবো।’

যৌতুকের কথা শুনে সকলে হতবাক। চৌধুরী বাড়ির
ছেলেরা যৌতুক নিবে? কিন্তু কিসে কম তারা? বাড়ি-
গাড়ি, টাকা-পয়সা, নাকি অর্জিত মান সন্মানে? সায়েন
চোখ মুখ কুঁচকে নিলো। ঠোঁটের কাছে গালিরা এসে
সুড়সুড়ি দিচ্ছে। কিন্তু সে তো বাড়িতে গালিটালি দেয়
না। ওসবের জন্য চৌকাঠ পেরোতে হবে। কিন্তু
কতক্ষণ আর শোনা যায়? তাই সে গপাগপ খাবার
গিলে উঠতে উঠতে বলল,-‘যৌতুকের মায়েরে আলাভু
করলেও ওসব ছাঁইপাশ আমার লাগবে না। উঠছি

আব্বাজান। আর হ্যাঁ মেয়ে খুব বেশি পছন্দ হলে তোমরা তিনভাই ভাগাভাগি করে নিতে পারো। একটা ক্যাডার আম্মা পেলে আমরা নাহয় ধৈই ধৈই করে নাচতে নাচতে বাসর সাজিয়ে দেবো।’

একথা বলে সায়েন একটা পানি বোতল নিয়ে রুমে চলে গেল। শারায়াত চৌধুরী খেঁকিয়ে উঠে কিছু বলতে গেলে সাফওয়ান থামিয়ে দিলেন। কী দরকার শুধু শুধু কথা বাড়ানোর। নিজের দিকে ঝড় ধেড়ে আসতে পারে

ভেবে রুবাবও কোনোমতে খেয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করল। দুভাই পালালো আরেকজন এখনো বাকি। সবাই যেন তার জবাবের আশায়। কিয়ৎকাল চুপ থেকে শারায়াত চৌধুরী পুনরায় শুদ্ধকে বলল,-‘ওরা তো না বুঝেই পালিয়ে গেল। তুমি অন্তত কিছু বলো। লাগলে সময় নাও ভেবে পরে জানিও।’

-‘ভাবাভাবির কিছু নেই। সবই তো তোমার উপর নির্ভর করছে।’

-‘আমার উপর? যেমন?’

-‘ছেলে তোমার। জন্ম দিয়েছো তুমি। পড়ালেখা করিয়ে বড় করলে তুমি। ছেলেদেরও খুব ভালো করে

চেনো তুমি। তাছাড়া বলতেই হয় তুখোড়
বিসনেসম্যান তুমি। তাহলে হিসাব নিকাশ তোমারই
ভালো বোঝা উচিত, তাই না? তুমিই নাহয় বলো
তোমার ছেলেদের দাম কত? কত হলে ছেলে বিক্রি
করবে?’

ছেলের কথায় শারাবাত চৌধুরী রাগলেন না বরং
হাসলেন। তবে হাসিটা যেন ঠোঁটের কোণে অদৃশ্য
রয়ে গেল। মূলত কথাটা বলেছেন ছেলেদের
মন পরীক্ষা করতে। যদিও জানতেন রেজাল্ট তবুও
পরীক্ষা করতে মন সায় দিলো। এত কথা, এত
গল্পের মাঝে কেউ খেয়াল করল না বাড়ির আদুরে
কন্যার ছলছল চোখ। শীতল আর বসে থাকতে পারল
না উঠে রুমে গেল। তাকে যেতে দেখে শুদ্ধ নিজেও
উঠে হাত ধুতে ধুতে বাবার উদ্দেশ্যে বলল,-‘নতুন
কাজ ধরেছি বিয়ের ব্যাপারে ক’দিন পরে কথা এগিও
বাবা। কিছু দিন যাক আমিই বলে দেবো তোমায়।’

শুদ্ধর কথায় এবার বড়রা ভ্রঁ কুঁচকে তাকালেন।
কেবল বলল পাত্রী মন মতো হলে শখের আগেই
বিয়ে সারবে। এখন আবার বলছে কদিন পর। এই

ছেলের মাথায় কখন কী ঘুরে কে জানে। উনাদের
তাকাতে দেখেও

শুদ্ধ কারো দৃষ্টি পরোয়া করল না। সে ধীরে সুস্থে
পানি পান করে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে মনে
মনে বলল,

-‘ভালোবাসি না বাসবোও না। কাছ ঘেঁষি না ঘেঁষতেও
দেবো না। না নিজে কারো হবো না তোকে অন্যের
হতে দেবো। যাতনা দিবি? দে! যন্ত্রণায় পোড়াবি?
পোড়া! মনকে অন্তত বোঝাবে পারব আমার অভিলাষী
আমার দহনের একমাত্র কারণ।’একথা বলে শীতলের
রুম পার হতে হতে শুনতে পেল শীতলের ফুঁপিয়ে
কান্নার শব্দ। সে নিঃশব্দে হাসল। যাক খোঁচাটা
তাহলে ঠিকভাবে কাজ দিয়েছে। যাক শান্তি! কেমন
লাগে বুঝা এবার। সে দাঁড়াল না নিজের রুমের
দরজায় পার্স ইন করতে করতে বলল,

-‘তোকে ডুবতেও দেবো না হাত টেনে পাড়েও তুলব
না। তোকে অথৈই জলে নাকানিচুবানি খাওয়াব।তুই
অন্যের কথায় আমার কাছে এসে সেই পথই বেছে
নিয়েছিস। এখন তুই পুড়বি অভিলাষী। পুড়তে পুড়তে
একটা সময় ঠিকই মুখ থেকে কথা বের হবে তোর।

কতদিন চুপ থাকবি? কতক্ষণ চুপ থাকবি? কতবার
নিজেকে সামলাবি? দেখি, আমিও দেখি।

কান্না করছিস,কর। তোর চোখের পানিই তোকে
ভালোবাসা চেনাবে।’_’শুদ্ধ! ওহ শুদ্ধ! কই তুই বাপ?
জলদি বের হয়ে আয় আব্বা!’

উক্ত কথাটি বলতে বলতে দোতলার দিকে হ্রস্ব হয়ে
ছুটে চলেছেন সিমিন চৌধুরী। দু’চোখের পানিতে
ঝাপসা দেখছেন সবকিছু। পা জোড়া চলতে চাচ্ছে না
যেন। কান্নাভেজা কণ্ঠস্বরের সাথে হাত-পাও
থরথরিয়ে কাঁপছে উনার। তবুও শুদ্ধকে ডেকেই
যাচ্ছেন। রমজান মাস, সকলে দেরি করে ঘুম থেকে
ওঠে। খাওয়া-দাওয়ার ঝামেলা নেই বিধায় কেউ
ডাকাডাকিও করেন না। যাদের কাজ থাকে করে
বাকিরা ঘুমায়। এখন কেবল সকাল দশটা। শারায়াত
ও সাওয়ান চৌধুরী আজ দেরি করে অফিসে গেছেন।
কিছুক্ষণ হলো সিরাত সাম্য আর সৃজনকে নিয়ে গেছে
কোচিং করাতে। রমজান মাস বিধায় এ একমাস
সকাল নয়টায় ক্লাস হবে। বাচ্চা দুটোকে ঘুম থেকে
টেনে তুলে নিয়ে গেছে। আজকে যাবে না বলে কত

কী করল কিন্তু ছাড় পেল না তাই মুখ গোমড়া করে
মায়ের সাথে গেছে তারা। শখ

গতরাতে জানিয়েছিল ল্যাভে কাজ আছে ফিরতে দেরি
হবে। সময় মতো সেও কখন বেরিয়ে গেছে কেউ
জানে না। সায়েন সেহরির খেয়ে মসজিদে গিয়ে
বাড়িতেই আসে নি। কোথায় গেছে, কেন গেছে,
কেবলই সে জানে।

স্বর্ণ, শীতল, শুদ্ধ যার যার রুমে ঘুমাচ্ছে বোধহয়।
বাড়িতে আর তেমন কেউ নেই বিধায় সিঁতারা, সিমিন
ভাবলেন হাতের কাজ সেরেই কুরআন

তেলাওয়াত করতে বসবেন। ইফতারে কী কী
আইটেম বানাবেন। কখন রান্না শুরু করবেন। এসব
নিয়ে দুই জা গল্প করতে করতে টুকটাক কাজ
সারছিলেন। প্রতিবছর উনারা তিন জা কুরআন খতম
দেন। শুধু উনারাই না শারায়াত চৌধুরীর, শুদ্ধও
দেয়। বাদবাকিরা খতম দিতে না পারলেও

প্রত্যেকদিন দু'এক পারা করে কুরআন পড়ে। বলা
বাহুল্য, সায়েন, শুদ্ধ, শখ, স্বর্ণ, শীতল কুরআন পড়া
শিখেছে ছোটো কর্তা শাহাদত চৌধুরীর কাছে। আর
শাহাদত চৌধুরী শিখেছিল উনার বাবা অর্থাৎ শুদ্ধর

দাদার থেকে। চমৎকার করে কুরআন পড়তেন উনি।
এত সুরেলা কণ্ঠে কুরআন পড়েন শুধু শুনতেই ইচ্ছে
করত। এবং অতি গর্বের বিষয় চৌধুরী বাড়ির
প্রত্যেকটা ছেলেমেয়ে সহি শুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে
পারে। আজ প্রথম রোজা। প্রত্যেকটা রোজাদার
রোজা রেখেছে। সবার প্রার্থনা রমজানের ত্রিশটা
রোজাই করবে। এটি পবিত্র মাস। পবিত্র এক একটি
দিন। সবার মতো চৌধুরী নিবাসের সবাই চেয়েছিল
দিনটা খুব ভালো কাটাতে। কিন্তু হঠাৎ বিপদ এসে
হানা দিয়েছে দোর গোড়ায়। কেবলই সিরাতের নাম্বার
থেকে সিমিনের কাছে কল এসেছে সাম্য, সৃজন
এক্সিডেন্ট করেছে। দুই

ভাইয়েরই গুরুতর অবস্থা। মাথায় ভীষণ চোট
পেয়েছে বাচ্চাদুটো। রক্ত বন্ধ হচ্ছে না দেখে
পথচারীরাই ধরে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। দুচোখের
সামনে ছেলেদের এক্সিডেন্ট দেখে সিরাত সেই মুহূর্তে
জ্ঞান হারিয়েছেন।

পানি টানি ছিঁটিয়েও জ্ঞান ফেরানো যায় নি উনার।
পরে উনাকেও দ্রুত হাসপিটালের ভর্তি করানো
হয়েছে। কোনো এক দয়াবান সিমিনকে ফোন

কল করে এসব জানিয়েছে। শুদ্ধর রুম সাউন্ডপ্রুফ।
নিচের কোনো শব্দই তার রুম অবধি পৌঁছায় না।
একথা স্মরণ হতেই দোতলার দিতে ছুটছেন তিনি।
এদিকে শুদ্ধও নামাজ পরে ঘুমায় নি। আপনমনে
রুমের সঙ্গে লাগোয়া ল্যাবে কাজ করছিল। কিছুক্ষণ
আগে ঐশ্বর্যের কল পেয়ে রেডি হয়ে রুম থেকে বের
হচ্ছিল। ইমিডিয়েট কিছু জিনিসপত্র ঐশ্বর্যের কাছে
পৌঁছাতে হবে। সেগুলো হাতে পেলে জরুরি
কাজগুলো সারবে ঐশ্বর্য! হ্যাঁ বলতেই হয় মেয়েটার
ধারালো ট্যালেন্ট। তার সঙ্গে কাজ করতে গেলে তা
বোঝা যায়। শুধু ট্যালেন্ট না তার এটিটিউডও হাই
লেভেলের। কাজের ক্ষেত্রে তার মতো সহকারী
পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের। আর এখন অবধি তার ভাগ্য
সর্বদা তার সাথেই ছিল। এখনো আছে!

আপনমনে কিছু ভাবতে ভাবতে রুমের দরজা লক
করতে করতেই ঘাড়

ঘুরিয়ে তাকাল শীতলের রুমের দিকে। মহারানী
এখনো ঘুমাচ্ছে হয়তো।রোজা আছে সারাটাদিন চটে
থাকবে তার মেজাজ। কিছু বললেই খ্যাক করে
উঠবে। একটা কথা বললে দশটা কথা শোনাবে। ভুল

করলে মারতে গেলে মায়া মায়া চোখে তাকিয়ে
বলবে, ‘রোজাদারকে মারতে নেই শুদ্ধ ভাই। মাফ
করে দিন। মাফ করা মহৎগুন।’ অথচ যত রাজ্যের
আজাইরা কাজ করে বেড়াবে। এসব নতুন কিছু নয়
প্রতিবছরই এসব হয়। সবটাই তার জানা। এসব
কথার রেশ না কাটতেই হঠাৎ তার কানে এসে
পৌঁছাল

সিমিনের কান্নারত কণ্ঠস্বর। ছোটো মা এভাবে কাঁদছে
কেন? হঠাৎ কার কী হলো? ওদিকে কিছুক্ষণ আগে
ফ্রেশ হয়ে শুদ্ধকে বকতে বকতে চুলে বেনুনি করছিল
শীতল। পরনে পার্পেল কালার থ্রি-পিচ। কোচিং
আছে।

মন খারাপ বিধায় যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু শুধু
শুদ্ধকে জ্বালানোর সুযোগ মিস করতে চায় না সে।
ওই বিশুদ্ধ পুরুষ কি ভেবেছে? দু’একটা কড়া কথা
বললেই সে আবেগ গ্রামের আবেশী সেজে পথে ঘাটে
বিরহের গান গেয়ে বেড়াবে? দুঃখী সেজে শুয়ে বসে
কাঁদতে কাঁদতে আমচুর হয়ে যাবে? না, মোটেও তা
করবে না! বরং আগে যা জ্বালাতো তার থেকেও

এখন বেশি করে জ্বালাবে। সে জানে মহামানব এখনো বাড়িতেই আছে। তার কাছে গিয়ে এখন থমথমে সুরে বলবে, 'এ্যাই শুদ্ধ ভাই গাড়িতে করে আমাকে কোচিংয়ে সামনে রেখে আসেন। এত রোদের মধ্যে হেঁটে যেতে পারব না আমি।' একথা শোনামাত্রই যখন না বলবে তখনই কেঁদে কেটে একাকার করে ফেলবে। বড় আব্বুকে ফোন করে বলবে একথা। গতদিন খোঁচা মারা হয়েছিল না? তারই শোধই তুলবে সে। কী ভেবেছে কী সে যা বলবে সব মেনে নেবে? এসব ভাববে ভাবতে বিনুনিতে পাক দিচ্ছিল সে।

হঠাৎ মায়ের কান্না শুনে বেনুনিতে রাবার বাঁধতে পারল না তার আগেই

দৌড়ে বের হলো। এইদিকে ঘটনা জানতে শুদ্ধও এগোচ্ছিল ফলস্বরূপ আচমকা শীতলের সাথে ধাক্কা লাগে তার। বিরক্তিতে চোখ, মুখ, কুঁচকে আসে। প্রশস্ত বুকুর সাথে নাকে বারি লেগে শীতলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে ব্যথাতুর শব্দ। তবে অপ্রস্তুত ঘটনায় কেউ কিছু বলার সুযোগ পায় না। হতুদন্ত হয়ে সিমিন উপস্থিত হয় সেখানে। ওদের দেখে

হাউমাউ করে কেঁদে ফেলেন। উনি কাঁদতে পারে না।
একটু কাঁদলেই শ্বাসকষ্ট শুরু হয় উনার। শুদ্ধও বুঝল
সিরিয়াস কিছু ঘটেছে নতুবা এভাবে কাঁদার মানুষ
নন তার ছোটো চাচী। উনাকে আশ্বস্ত করতে সে
এগিয়ে একপেশে মা তুল্য চাচীকে বুকে জড়িয়ে
ধরল। তারপর খানিকটা নরম সুরে বলল,-‘ কি
হয়েছে? এভাবে ছুটছো কেন পড়ে ব্যথা পাবে তো?’
-‘ ব..বাপ ও ও..ই।’
-‘ছোটো চাচ্চু ঠিক আছে?’
-‘হুম।’
-‘তাহলে?’
-‘একজন কল করেছিল সাম্য, সৃজন নাকি এক্সিডেন্ট
করেছে। চল বাপ। এন্ফুগি আমাদের হাসপাতালে
যেতে হবে।’
-‘কে কল করছিল? চেনো তাকে? পরিচয় দিয়েছে?’
-‘তাকে চিনি না তবে বলল পথচারী।’
শুদ্ধ ভ্রুঁ কুঁচকাল। সিমিনের হাতে থাকা ফোনটা নিয়ে
কললিস্টের প্রথমে থাকা সিরাতের নাম্বারে কল
দিলো। তবে কল রিসিভ করল এক মহিলা।

শুদ্ধ বিনয়ীভাবে কথা বলে জেনে নিলে পুরো ঘটনা।
কোন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাও শুনে
নিলো। ততক্ষণে বাড়ির সকলে দৌড়ে এসে হাজির।
মুহূর্তেই বাড়িতে কান্নাকাটির হিড়িক পড়ে গেল।
জায়ের সন্তান বলে বাড়ির কোনো ছেলে-মেয়েকেই
কখনো আলাদা নজরে দেখেন না চৌধুরী গিন্নিরা।
তাদের মতে, সবগুলোই বাড়ির সন্তান। তাদেরই
সন্তান। বাড়ির ছোটো সদস্য হিসেবে শীতল, সাম্য,
সৃজন সবার কাছেই একটু
বেশি আদরের, আল্লাদের। বলা বাহুল্য তারাই এ
বাড়ির প্রাণ। বিনোদন পর্বের মূল উৎসও। অথচ
আদরের বাচ্চা দুটোর এ ঘটনায় চৌধুরী বাড়ি শুদ্ধ
হয়ে গেল। শারফাত ও সাওয়ান চৌধুরীর কাছেও
খবর চলে গেল।

উনারা অফিস থেকে ছুটলেন হাসপাতালের উদ্দেশ্যে।
তাদের সবাইকেও যেতে হবে কারণ সাম্য, সৃজনের
রক্ত লাগবে। শুদ্ধ আর সময় নষ্ট করল না। শুধু মা-
চাচীর উদ্দেশ্যে বলল,
- ‘গাড়ি বের করি দ্রুত এসো।’

একথা বলে গাড়ির চাবি নিয়ে দ্রুতপায়ে পার্কিংলটের দিকে ছুটল। তার গাড়ি বের করতে করতেই সিঁতারা, সিমিন, শীতল, স্বর্ণ এসে দাঁড়িয়েছে।

তারা যাবে হাসপাতালে। শুদ্ধ ড্রাইভিং সিটে বসে কাঁদতে থাকা শীতলের দিকে একবার তাকাল। কাঁদতে কাঁদতে চোখ, মুখ লাল করে ফেলেছে। রিতিমতো ফোঁপাচ্ছে এখনো। কান্না আর প্যারা দেওয়া ছাড়া এই মেয়ে পারেই বা কী? তাছাড়া ওকে কিছু বলা না বলা সমান। তাই শীতলকে কিছু না বলে স্বর্ণকে বলল,

-‘বাড়ি খালি করে দলবেঁধে যাওয়ার প্রয়োজন দেখছি না। ওকে নিয়ে বাড়িতে থাক আমি আপডেট জানাব।’

স্বর্ণ সম্মতি জানালেও শীতল শুদ্ধর কথা তোয়াক্কা না করে আগে শুদ্ধর পাশের সিট দখল করে বসে পড়ল। ধমকে তাকে গাড়ি থেকে নামানোর আগেই শীতল জেদী সুরে বলল,

-‘গাড়িতে না নিলে রিকশা করে যাব তাও যাবোই।’ তর্ক করার মতো সময় নেই দেখে কেউ কথা বাড়াল না। শুদ্ধ গাড়ি স্টার্ট করে দ্রুতগতিতে

চৌধুরী নিবাসের গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল। অগত্যা স্বর্ণ একাই বাড়িতে থেকে গেল। আচ্ছা, সায়ন কোথায়? সে শুনেছে ঘটনা?

সাম্যের নাকি রক্ত লাগবে। তার আর সায়নের রক্ত এক। সাম্যকে রক্ত দিতে গেলে সায়নকে প্রয়োজন। কিন্তু সেই বান্দা এখন কোথায়? বাড়ি ফিরছে না কেন এখনো? একবার কল করে দেখবে? এসব ভেবে ফোন হাত নিতেই দারোয়ান কাকা দৌড়ে এলো তার কাছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল,

-‘আম্মা, সর্বনাশ হই গেছে। কেরা জানি সায়ন বাবার পার্টি অপিস চুরচুর কইরালাইছে। সায়ন বাবা কারে জানি খুব পিডাইতাছে।’-‘কাকে মারছে?’

-‘মুই তারে চিনি না। তয় হুনলাম ওই গোলামের পুঁত নাকি পার্টি অপিসে আগুন দিতে আইছিল।’

-‘ওহ।’

-‘আপনে যাইবেন আম্মা? চলেন আপনেরে নিয়া যাই?’

-‘না। আমি গিয়ে কি করব?’

-‘সায়ন বাবা মারপিট করতেছে তাও যাইবেন না?’

-‘ তারা পুরুষ-পুরুষ মারামারি করছে। সেখানে আমি অবলা মেয়ে গিয়ে কি করব? যাই হোক, কাকা আপনি বার বার গেট ছেড়ে বাইরে যাবেন না। আমি একা বাসায়। আর আপনিও যদি বারবার এদিক-ওদিক যান তাহলে বাবার কানে গেলে ভালো কিছু হবে না।’-‘আর যামু না আম্মা। ‘

-‘ঠিক আছে।’

একথা বলে স্বর্ণ সোজা বাড়ির ভেতর চলে এলো। তার এমন কাঁঠখোঁটা জবাবে দারোয়ান কাকা অবাক হলেন না। কারণ উনি এ বাড়িতে চাকরি করেন তাও পাঁচ সাত বছর হবে। বাড়ির সবাইকে পুরোপুরি না চিনলেও মোটামুটি চিনেন, জানেন। চৌধুরী নিবাসের এতগুলো সদস্যদের ভিড়ে সবাই হাসিখুশি হলেও এই মেয়ে বরাবরই একটু অন্যরকম। অবাক করা ঘটনাগুলোতেও কেন জানি অবাক হয় না এই মেয়ে। যেমন, ছোটো ভাই এক্সিডেন্ট করেছে তারা কী উচিত না কেঁদেকেটে একশা হওয়া? যেমন শীতল হয়েছে। কিংবা সায়নের পার্টি অফিস কে বা কারা ভেঙ্গেছে এটা নিয়েও একটু চিন্তিত হওয়ার কথা। কিংবা সায়ন কাকে মারছে এটা শুনে ছুটে গিয়ে দেখার কথা। কিন্তু

না, সে বরাবরের মতো শান্ত। তার হাবভাব এমন যেন কিছুই ঘটে নি, সব স্বাভাবিক। সব!পার্টি অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে কিছুতেই সায়নকে ছাড়াতে পারছে না রুবাব। বারবার ছাড়তে বলেও কাজ হচ্ছে না। সে সমানে একটা ছেলের মুখে ঘুষি মেরেই যাচ্ছে। তাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে ওরা পূর্ব পরিচিত।

তাহলে কিসের বশে শত্রুতা? শত্রুই যখন তখন খালি হাতে পায়ে লাগতে আসার মানে কি? যদিও বুঝতে পারছে সায়ন এমনি এমনিই মারছে না ছেলেটাকে। সে মার খাওয়ার কাজই করেছে। যখন একথা বুঝেছে তখন সায়নকে বাঁধা না দিয়ে আরাম করে বসেছে। রোজা না থাকলে চিপস খেতে খেতে আর একটু মজা নেওয়া যেতো। একথা ভেবে সে আইফোন বের করে সেলফি নিলো। সেলফিতে দেখা যাচ্ছে তার পেছনে সায়নরা মারামারি করছে। এমন সময় কারো সেলফির কথা মনে আসতে পারে? তার আসে। তার ফোনের অনেক ছবিই উদ্ভট পরিস্থিতিতে তোলা সেই তুলে যাতে স্মরণ করতে সুবিধা হয়। ঘড়িতে তখন বেলা সাড়ে দশটা। চড়া রোদ। গায়ে রোদ পড়তেই

সারা গা চিটমিটিয়ে উঠছে দেখে রুবাব ছায়ায়
দাঁড়িয়ে দেখতে থাকল সায়নের মার। ভাইটা তার
ভালোই মারপিট পারে। রাজনীতি টাজনীতি না করে
সরাসরি সিনেমার হিরো হলেও পারত। দেখতে
শুনতে হিরোমার্ক। বেশ ভালো অভিনয়ও জানে।
তাহলে হিরোর চরিত্রে অভিনয় করতে তার কী
সমস্যা? সে কি কোনো ডিরেক্টর কিংবা প্রডিউসরের
সাথে একবার কথা বলে দেখবে? দেখা উচিত। কারণ
এসব ট্যালেন্ট কাজে লাগানো উচিত।

এরা দেশের এক একটি রত্ন। এদের যত্ন করা
আবশ্যিক। এসব ভেবে সে সময় দেখল। সেহরির
পর মসজিদে নামাজ পড়ে বাড়ির দিকে যায় নি
কেউই। দুই ভাই বাইক নিয়ে টইটই করে ঘুরেফিরে
পার্টি অফিস দেখাতে এনেছিল সায়ন। কিন্তু এসে
দেখে পার্টি অফিসের ভেতর ভাঙচুর করছে কনক।
তার রাগ যেন আকাশচুম্বী। যা সামনে দেখছে তাই
ভাংছে। কনক বোনের কবর জিয়ারত করে ছুটে
এসেছে সায়নকে মারতে। কারণ তার ভাষ্যমতে
সায়নই ওর বোনের মৃত্যুর জন্য দায়ী। তাই সায়নকে
না পেয়ে তার জিনিস নষ্ট করছে। সব ভাঙ্গা হলে

যখনই আগুন দিতে যাবে তখন সেখানে সায়ন আর
রুবাব উপস্থিত হয়। আজ প্রথম সেহরি বিধায় ছেলে
পুলেও যে যার বাড়িতে সেহরি সেরেছে। আজ কেউ
ছিল না এদিকটায়। তবে তালা মারা ছিল অফিসের
মূল ফটকে। তালা ভেঙ্গে ঢুকেছে কনক।

দূরে দাঁড়িয়ে তার পাগলামি দেখছিল সায়ন। কিন্তু
তাকে যখন আগুন দিতে দেখল তখনই দৌড়ে এসে
আঁটকায় সায়ন। স্বাভাবিক স্বরে বলে,-‘দেখ ভাই
আমি ভদ্র হয়ে গেছি। রোজা আছি। নামাজে যাওয়ার
আগে না হওয়া বউকে ছুঁয়ে কথা দিয়েছি এই
একটামাস গালি টালি দেবো না। অকারণে কাউকে
মারব না। তবে হ্যাঁ, যেই চো’দ’না অকারণে আমার
পেছনে সুড়সুড়ি দিতে আসবে তাকে সুস্থভাবে
ফিরতেও দেবো না। তুইও দুষ্টুমি করিস না মায়ের
ছেলে মায়ের কোলে ফিরে যা। বারবার এককথা
বলতে পারব না। যা, যা, বাড়ি যা।’

-‘বাড়ি যাব? যাব তো! আগে তোর তিনবোনের এক
বোনকে দে খেয়ে কবরে গুঁইয়ে আসি।’

-‘এই বালের বাল রাগ উঠাস না বলে দিচ্ছি। তুমি
আমার বিয়ে করা বউ না যে আদর করার লোভে

ঘরে আঁটকাতে তোমার আঁচু'দা কথাবার্তা গোথাসে
গিলে যাব।'-'হা হা, আমার কথা গিলবি কেন? আর
গিলতে পারলে তো গিলবি? যে ছেলে দিনের বেলা
বোন বোন করে মুখে ফ্যানা তুলে ফেলে রাতের বেলা
আবার ঠিকই বোনের সাথে খোলাখুলি, লাগালাগির
বাদ রাখে না কিছু, সে আমার কথা এত সহজে
গিলতে পারবে না। তবে তুই জিনিয়াম রে সায়ন।
তুই গিলতেও পারোস।'

বোনদের নিয়ে নোংরা কথা সহ্য হয় না সায়নের।
মাথা এলোমেলো হয়ে যায়। মেজাজ সামলানো দায়
হয়ে পড়ে। এখনই হচ্ছে। তাই সে চোয়াল শক্ত করে
পুনরায় সাবধান করল,

-‘লাস্টবার বলছি মুখে লাগাম দে।’কনক যেন এবার
আরো ক্ষীণ হয়ে উঠল। বোনের কবরে অনবরত হাত
বুলানোয় তার হাতে এখনো মাটি লেগে আছে। সেই
মাটি হাতে সায়নের টি-শার্টের কলার চেপে ধরে
বলল,

-‘ওই মা’দা’রচো’দ কেন লাগাম দেবো? বল কেন?
আমার সাথে শত্রুতা, আমাকে খুন করতি আমার
বোনের দিকে কেন হাত বাড়ালি? কেন এত কষ্ট

দিয়ে মারলি আমার বোনটাকে? কেন মারলি বল?
আমি তোর তিন বোনের কাউকে অসন্মান করেছি?
বাজে টোনে কথা বলেছি? তবে তুই কেন করলি?
আজ কয়েকটা দিন আমার বোনটা আমাকে ভাইয়া
বলে ডাকে না। ঘরে ফিরলে ছুটে আমার কাছে আসে
না। আমার মা আমার সাথে কথা বলে না। ‘ভাইয়া’
ডাক শোনার জন্য বুক জ্বলে যাচ্ছে। আমার পুরো
দুনিয়া অন্ধকার করে দিয়েছিস তুই। তোকে আমি
ক্ষমা করব না। কখনো না। আজ এক অসহায় ভাই
হয়ে অভিশাপ দিচ্ছি তুইও জীবনে একবার হলেও
আমার জায়গায় এসে দাঁড়াবি। আল্লাহ যেন তোকে
দাঁড় করায়। আমার চোখের পানি যেন তোর জীবনে
অভিশাপ হয়ে আসে। আমার মতো তুই একবার
‘ভাইয়া’ ডাক শোনার জন্য পাগল হয়ে যাস। তোকেও
যেন বোনের নগ্ন দেহের সামনে দাঁড়াতে হয়। চোখে
দেখতে হয় আদরের বোনের ক্ষত বিক্ষত লাশ।
বোনকে দেওয়া নামটা রেখে সবাই যখন ধর্ষিতা নামে
ডাকবে তখন শুনতে কেমন লাগে তুইও যেন বুঝিস।
তোর জীবনেও যেন এমন তিক্ত অভিজ্ঞতা আসে।’

সায়ন আর সহ্য করতে পারল না। শক্ত হাতে ঘুষি
মেরে দিলো কনকের নাক বরাবর। গলিগলিয়ে রক্ত
বেরিয়ে এলো। পাল্টা আক্রমণ কনকও করল। সেও
বসাল আরেক ঘুষি। তবে সায়ন একের পর
এলোপাথারি মারতে শুরু করলে রুবাব তাদের
আঁটকাতে চাইলেও পারল না। আজম শিষ বাজাতে
বাজাতে এসে দাঁড়িয়েছে কেবল। ঘটনা বুঝে দৌড়ে
গেল তাদের কাছে। সায়ন যেন উন্মান। ভিড়ে জমে
গেছে পথচারীদের। রুবাব আর আজম কোনোমতো
ছাড়াতে গেলে সায়ন বলল,-‘এ্যাই শুয়োরের বাচ্চা
এ্যাই কতবার বলব তোর বোনকে রেপ করি নি।শালা
বা’ই’নচোদ আমার কী মেয়ের অভাব রে? আমাকে
কী তোর মতো ভদ্রমাসের কুকুর পেয়েছিস যাকে
তাকে লাগিয়ে বেড়াব? আমার এক ইশারায় যথেষ্ট
তোর বোনের থেকেও শতগুন সুন্দরী মেয়েকে
বিছনায় তোলার। রেপ রেপ করে আমাকে তুমি রোজ
রোজ একই ভোজনগান শোনাও? আজ তোমার
ভোজনগান তোমারই পেছনে ভরব শালা।’

একথা বলে সায়ন কনককে ধাক্কা মেরে অফিসরুমে ঢুকল। তারপর ড্রয়ার খুলে একটা পেনড্রাইভ এনে কনকের মুখের উপর ছুঁড়ে মেরে বলল,

-‘ভ্যাড়াচুদা এটা দেখ কে তোর বোনকে রেপ করিয়েছে। সেই সাথে শুনে নাও তোদের চো’দার সময় নেই এই সায়নের। আমার রুচিও এত জঘন্য না। সর চোখের সামনে থেকে, যা সর। আজকের পর থেকে যদি আমার চোখের সামনে পড়িস তাহলে তুই শেষ।’

একথা বলে কনককে আরেকটা কিক মারতেই রুবাব কানে ফোন ধরা অবস্থায় চিৎকার করে উঠল। সায়ন ভ্রুঁ কুঁচকে তাকালে রুবাব বলল,-‘ভাই শুদ্ধ কল করেছে দ্রুত হাসপাতালে চলো। তোমার আর সাম্যের নাকি একই ব্লাড।’

-‘হুম, তো?’

-‘জুনিয়রদের এক্সিডেন্ট হয়ে গেছে ভাই, দ্রুত চলো।’

এরপর সংক্ষিপ্ত আকারে পুরো ঘটনা শুনে সায়ন প্রাণপণে বাইক নিয়ে ছুটতে শুরু করল। তাদের যেতে দেখে কনক মুখভর্তি রক্ত থু করে ছুঁড়ে

ফেলল। তারপর হাত দিয়ে নাক মুছে মাটিতে শুয়ে
বলল,-‘মৌমাছির চাকের মতো তোর বিপদ ঘুরঘুর
করছে রে সায়ন। কতদিক সামলাবি তুই? কতবার
সেভ করবি বোনদের? তোর বাগানের সেরা ফুল
টাকে তুলবেই ইয়াসির। দুমড়ে মুচড়ে শেষ করবেই
সে। আজকাল তোর সময়টা খুব ভালো যাচ্ছে রে।
তবে ভালোর পরে মন্দের আসন তা ভুলে যাস না?
আমার বিশ্বাস তোদের নাকানিচুবানি খাওয়াতে শুধু
ইয়াসিরই যথেষ্ট! রেডি থাক একে একে সব ব্যথা
ফিরিয়ে দেওয়া হবে তোদের।’“RLRC’ নামের এক
উন্নতমানের হাসপাতালের ওটির সামনে বসে আছে
চৌধুরী নিবাসের প্রত্যেকটা সদস্য। চোখভর্তি জল
নিয়ে চাতক পাখির ন্যায় তাকিয়ে আছে ওটির
দরজার দিকে। সাম্য, সৃজনের অপারেশন এখনো
চলমান। গাড়ির কাঁচ দুকে গেছে বাচ্চা দুটোর মাথায়
ও বুকে।

গুরুতর আঘাত পাওয়ার সাথে সাথেই জ্ঞান
হারিয়েছিল তারা। পথচারী মানুষটি সিমিনকে ভুল
তথ্য জানিয়েছিল। জানিয়েছিল সিরাত তেমন আঘাত

পায় নি। অথচ হাসপাতালে এসে দেখা গেছে
সবচেয়ে সে বেশি

আঘাতপ্রাপ্ত। অসহায় মা হয়ে যখনই বুঝেছে গাড়িটা
তাদের দিকে ধেয়ে আসছে তখনই সে বাচ্চা দুটোকে
বুকে আগলে নিয়েছে। ফলস্বরূপ তার পিঠে লেগেছে
সম্পূর্ণ আঘাত। ডাক্তারদের ধারণামতে মেরুদণ্ডের
হাঁড় ভেঙ্গে গেছে উনার। পরীক্ষা করা হয়েছে রিপোর্ট
পেলে জানা যাবে মোট কয়টা হাঁড় ভেঙ্গেছে। এদিকে
সাম্য আর সৃজন জমজ। জন্মগত ত্রুটি থাকায় কম
বয়সে বেশি পাওয়ারের চশমা পরে তারা। এখন
আবার এত বড় এক্সিডেন্ট! মাথায় নাকি আঘাত
পেয়েছে। তিনজনেরই ক্রিটিক্যাল অবস্থা। তাদের
চিন্তায় সকলে অস্থির। পথচারীরা প্রথমে যে
হাসপাতালে ভর্তি করেছিল সেখান থেকে ইমিডিয়েট
এখানে আনা হয়েছে। এই হাসপাতালে সবসময়
বিদেশী

ডাক্তারদের আনা গোনা থাকে। চিকিৎসার মানও
অনেক উন্নত। তাছাড়া

এই হাসপাতালে শুদ্ধসহ তার সব ফ্রেন্ডদের শেয়ার
আছে। কাজের সূত্রে

চেনোজানা পরিচিত ডাক্তারও আছে। তাদের মধ্যে
অর্থোপেডিক সার্জন,
নিউরো সার্জন, স্পাইন স্পেশালিস্টদের জরুরি মিটিং
বসেছে। উনারা সবাই একেকজন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স,
জার্মানি, ইতালির নামকরা ডাক্তার।

রিপোর্টে সিরাতের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবেন। আর
সাম্য আর সৃজনের মাথায় জন্য নিউরোলজিস্ট মি.
জুম এবং নিউরোসার্জন ইমালিনিয়ার তত্ত্বাবধানে সাম্য
আর সৃজন। সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া অবধি উনারাই
বেস্ট চিকিৎসা করে যাবেন। তিনজন গুরুতর আহত
হওয়ায় তিনজনেরই ইমিডিয়েট রক্ত প্রয়োজন।

হাসপাতাল কতৃপক্ষ চেষ্টা করে যাচ্ছেন সবদিক
সামাল দেওয়ার। কিন্তু সাম্যের শরীরে অন্যের রক্ত
শুষ্ট করছে না। এক ব্যাগের খানিকটা রক্ত তার
শরীরে প্রবেশ করা মাত্রই তার শরীরে দেখা দিচ্ছে
লাল লাল গুঁটি।

ডাক্তাররা ব্যাপারটা খেয়াল করামাত্রই রক্ত দেওয়াও
বন্ধ করে দিয়েছে।

একথা জানামাত্রই শুদ্ধ রুঝাবকে কল করে জানিয়েছে
সে আর সায়েন সেখানেই থাকুক হাসপাতালে যেন

উপস্থিত হয়। তার কল পেয়ে ঝড়ের গতিতে
উপস্থিত হয়েছে দুই ভাই। রোজা অবস্থাতেই শুয়ে
পড়েছে ছোট ভাইদের রক্ত দেওয়ার জন্য। সাম্যকে
রক্ত দিলো সায়ন। সৌভাগ্যবশত এবার আর কিছু
হলো না সাম্যের। সৃজনের রক্ত মিলে শীতলের
সাথে। বাড়িতে এই দু'জনের রক্ত আবার ও
পজেটিভ। কিন্তু শীতলের বয়স কম। ওজন কম।
এর আগে কাউকে রক্ত'ও দেয় নি সে। তাছাড়া বাচ্চা
মেয়েটা রোজা আছে তাই শীতলের রক্ত নিতে কেউ
রাজি না। শীতল

বারবার অনুরোধ করেও কাউকে রাজি করাতে পারল
না। তখন সে

শুদ্ধর সামনে দাঁড়িয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল,
-‘আমার ছোটো ভাইরা কষ্ট পাচ্ছে। তাদের রক্ত
প্রয়োজন। আমার দেহে অনেক রক্ত থাকার পরেও
যদি ভাইদের দিতে না পারি তাহলে নিজেকে মাফ
করতে পারব না শুদ্ধ ভাই। প্লিজ আমাকে রক্ত দিতে
দেন।’

শুদ্ধ নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তখন থেকে
সমানে কেঁদেই যাচ্ছে।

শীতলের কথা শুনে বড়রা এগিয়ে এলেন। সাওয়ান চৌধুরী চোখ মুছে শীতলের দুইহাতে চুমু ঝঁকে ভেজা কণ্ঠে বললেন,-‘সোনা মা আমার তুমি নিজেও তো বাচ্চা। রক্ত দিলে তুমিও অসুস্থ হয়ে যেতে পারো। রক্ত ম্যানেজ হয়ে যাবে মা।’

-‘আমার কিছু হবে না চাচ্চু। তোমার বোঝার চেষ্টা করো সত্যি বলছি, আমার কিছু হবে না। আমাকে রক্ত দিতে দাও। আমি রক্ত দেবো।’

শীতল নিজের কথায় অটল। সে রক্ত দেবে। এসময় মেয়ের জেদ দেখে সিমিন দুম করে একটা কিল বসিয়ে দিলেন শীতলের পিঠে। শীতল ঠোঁট উল্টে কেঁদে কেঁদে বলল,

-‘নিবা না তো আমার রক্ত? সত্যি নিবা না? তাহলে আমিও বলছি, এখন আমার রক্ত না নিলে আমি এন্ফুণিই বাসায় যাব। তারপর ধারালো ছুরি দিয়ে হাত কেটে রক্ত ঝরাব। যে রক্ত আমার ভাইয়ের গুরুতর অবস্থাতে কাজে লাগে না সেই রক্ত শরীরেই রাখব না।’ একথা শুনে অনেকে তাকে বোঝালেও কাজ হলো না। জেদী একরোখা শীতলের জেদের কাছে সবাইকে হার মানতেই হলো। সে ছোটো ভাইকে রক্ত দিবেই

দিবে। তার এমন পাগলামিতে শুদ্ধও আর বারণ
করল না। নার্সকে ইশারা করে শীতলকে ভেতরে
নিয়ে যেতে বলল। একটুপরে এক
মেয়েকেও সেখানে পাঠাল। মেয়েটি নার্সকে যেতে
বলে শীতলের সাথে টুকটাক কথা বলতে বলতে রক্ত
নেওয়ার প্রসেস শুরু করল। গল্পে গল্পে
বোকা শীতলটা খেয়াল করে নি শুদ্ধর ইশারায় হাফ
ব্যাগেরও কম রক্ত নেওয়া হয়েছে। এবং সেটা যেন
শীতলের চোখে না পড়ে তাই অন্য ব্যাগ ভর্তি রক্ত
রেখে দেওয়া হয়েছে। ব্যাগভর্তি রক্ত দেখে শীতল
ভেবেছে ওর রক্ত। তাই রক্ত দেওয়া শেষে তার মুখে
হাসি ফুটেছে। কিন্তু উঠতে গিয়ে মাথা ঘুরে উঠে চোখ
অন্ধকার দেখছে। দুর্বলতায় পড়তে গেলে শক্ত এক
জোড়া হাতের মালিক তাকে আগলে ধরেছে।
শীতলের মাথা ঠেকছে এক মানবের প্রশস্ত বুকে।
শীতলের চোখ বন্ধ করে আঁকড়ে ধরেছে সেই
মানুষটাকে। নাকে বিঁধছে পরিচিত Creed Aventus
নামের আইকনিক ও বিলাসবহুল পারফিউমের
সুঘ্রাণ। যেটা ফুটি-উডি-স্মোকি এবং খুবই ব্যালেন্সড।

তাদের বাড়িতে শুদ্ধই ভাই এটাই ব্যবহার করে। সেই হিসেবে

নেত্রজোড়া না খুলেই আত্মবিশ্বাসের সাথে বলে দিতে পারবে এটাই তার শুদ্ধ ভাই। পড়তে নিলে শুদ্ধ এখন নিশ্চয়ই তাকে ঝাঁড়ি মারবে। সেকথা ভেবে সেভাবে বুকে মাথা ঠেকিয়ে বিরবির করে বলল,-‘ একদম ঠিক আছি শুদ্ধ ভাই। সামান্য এই একটু মাথা ঘুরছে এই যা।’

একথা শুনে শুদ্ধ বেশ কিছুক্ষণ সেভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর পাশের একটা কেবিন দেখিয়ে সিমিনকে বলল শীতলকে গুইয়ে দিয়ে আসতে। কিছুক্ষণ রেস্ট নিক সেখানে। শুদ্ধর কথা শুনে সিমিনও তাই করলেন।

এদিকে শুদ্ধর কল পেয়ে ছুটে এসেছে হাসান, কামরান, অর্ক। কিছুদিন ধরে বিশেষ কাউকে নজরজারীতে রাখতে গা ঢাকা দিয়েছিল ওদেরকে। কাজের কাজ হয়ে গেছে। এবং পাকাপোক্ত খবর এনেছে আজকের এই ঘটনাটা পরিকল্পনামাফিক। এসব ঘটিয়েছে মাফিয়া কিং ইয়াসির শেখ।

তবে কারো কাছে সেটা প্রকাশ করল না নিজেদের
মাঝে গোপন রাখল। তারা ম্যাজিকের মতো ব্যাগ ব্যাগ
রক্তের ব্যবস্থাও করে ফেলল। তাদের একেক জনের
উপস্থিতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ডাক্তাররা, নার্সরা।
চৌধুরীরা

এতদিন ভেবেছিল সাধারণ বেশে চলা ছেলেগুলো
হয়তো খুব সাধারণ। কিন্তু আজ বুঝল তারা একেক
জন্য বড় মাপের মানুষ। তারা যা সেটা কাউকে
বুঝাতে দেয় না।

দুই ঘন্টা পেরিয়ে গেলে ওটির লাল বাতি নিভে গেল।
রক্তমাখা ডাক্তারী পোশাকে বেরিয়ে এলেন কয়েকজন
ডাক্তার। বিপদ এখনো না কাটলেও জানালেন গা,
মাথা থেকে কাঁচ বের করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে
যা হবে ভালোই হবে। তবে অবজারভেশনে থাকবে
তারা। সিরাতের অবস্থা পূর্বের মতোই আশঙ্কাজনক।
ডাক্তারদের রিকুয়েস্ট করে বাড়ির সবাই

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে এক নজর সাম্য, সৃজনকে
দেখলেন। জানবাচ্চা দুটোর সারা শরীরে ব্যাভেজ
নিয়ে নিখর হয়ে শুয়ে আছে। চোখজোড়া বন্ধ। কখন
খুলে সেই চোখ? পূর্বে মতো চৈঁচিয়ে ডাকবে

সবাইকে? গলা ফাটিয়ে কানমাথা ঝারাপালা করে দেবে? টাকা নেওয়ার আবদার নিয়ে ঝুলে পড়বে শুদ্ধ সায়নের গলা ধরে? খাবার নিয়ে শীতলের সাথে ঝগড়া করবে কখন? আজ প্রথম রোজা। প্রথম ইফতার। হরেক রকমের ইফতার নিয়ে শেষে মারামারি করবে না ভাই-বোনরা? আলুর চপ, কে কার ডিমের চপ কেড়ে খেতে পারে এই নিয়ে দুষ্ট বুদ্ধি আঁটবে না? কবে হবে এসব? কখন হবে? এসব ভাবতে ভাবতে সবাই কাঁদতে কাঁদতে মন থেকে দোয়া করলেন। রোজাদারের দোয়া মহান আল্লাহ ফেলবেন না নিশ্চয়ই!ঘড়িতে তখন বিকাল সাড়ে চারটা। শীতল চুপ করে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে কেবিনের বেডে। এখনো মাথা ঘুরছে তার। খুব দুর্বল লাগছে।রক্ত দেওয়ার আগে বুঝে নি এত খারাপ লাগবে। রোজা থাকায় কিছু খেতেও পারছে না। ঘুমও আসছে না। সিমিনের থেকে শুনেছে সাম্য সৃজন নাকি ভালো আছে। ডাক্তার বলছে খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যাবে।

একথা শুনে সে মহান আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাচ্ছে প্রতিটি ক্ষণে।কিন্তু চিন্তা হচ্ছে মেজো মার

জন্য। বাড়িতে মায়েদের মধ্য সবচেয়ে বেশি ফ্রেন্ডলি
সিরাতে। তারা বোনরা পারসোনাল সব কথাগুলো
আগে মেজো মাকেই জানায়। সমাধানও পায় জলদি
জলদি। মেজো ঠিক হয়ে যাবে তো? এসব ভাবতে
ভাবতে তার চোখের কোণ গড়িয়ে জল গড়িয়ে গেল।
আঘাত পেয়ে কতই না কষ্ট পেয়েছে মেজো মা।
চোখের উপর হাত রেখে নীরবে কাঁদতে কাঁদতে
কারো উপস্থিতি টের পেল। কান্নার শব্দ যেন সেই
ব্যক্তি বুঝতে না পারে তাই নিজেকে সামাল। কিন্তু
লাভ হলো না। চোখ মুছতে না মুছতেই চোখ ভিজে
উঠল। কেবিনের দরজা ভিজিয়ে রুবাব ভেতরে
এলো। বসল বোনের শিয়রে। এক হাত শীতলের
মাথায় রাখলে শীতল চোখ খুলল। জোরপূর্বক হাসার
বৃথা চেষ্টা করল। তাকে চোখ মুখ দেখে রুবাব
দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মেয়েটা কারো কষ্ট দেখতে পারে
না। পর কিংবা আপন কাউকে কষ্ট পেতে দেখলে
সেও কষ্ট পায়। এর নরম হলে কিভাবে হবে? এই
পুতুলটাকে শুদ্ধ সামলাবে কিভাবে? কিভাবে দুনিয়া
দারী বোঝাবে? মনে মনে এসব ভেবে সে শীতলের
মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো। তারপর বোনের মন

ভালো করতে ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে বলল,-‘শুদ্ধ পাঠাল
তোর খোঁজখবর নিতে।’

-‘শুদ্ধ ভাই কোথায়?’

-‘কোথায় যেন গেল। যাওয়ার আগে বলে গেল তোর
খেয়াল রাখতে।’

একথা শুনে শীতলের মুখ মলিন হয়ে গেল। ভেজা
চোখের কোণে জমল অশ্রুকাণ্ড। সেদিনের পর থেকে
শুদ্ধ তার সাথে কথা বলে না। সে বলতে গেলেও না।
এইতো কিছুক্ষণ আগে রক্ত দিতে চাইলে সবাই বারণ
করল। কত বকল। কিন্তু শুদ্ধ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল।
তার দিকে তাকালোও না কিছু বললোও না।
অন্যসময় হলে ধমকে উঠত নতুবা চালাকাঠের বারি
বরাদ্দ রাখত। সামান্য একটা ভুল করেছেই নাহয়
তাই বলে কথা বলায় বন্ধ করে দিতে হবে? সে জানে
না তাকে না জ্বালালে, তার সাথে ঝগড়া না করলে
তার দিন ভালো যায় না? একদন্ড শান্তিও পায় না।
তবুও এত পাষণ্ড হতে হবে? কেন হতে হবে? একটু
নরম হলে কি হয়? তার বেলায় এত কঠিন
পানিশমেন্ট কেন? এসব ভেবে সে কান্না সামলাতে
পারল না। ঠোঁট উল্টে শব্দ করে কেঁদে দিয়ে

বলল,-‘সেদিনের পর থেকে শুদ্ধ ভাই আমার সাথে কথা বলে না। উনার রুমেও ঢুকতে দেয় না। আমাকে একবারে পর করে দিয়েছে।’

শীতলকে এভাবে কাঁদতে দেখে রুবার ভাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। হাসিও পেল খুব। তবে এখন হাসলে চলবে না তাই স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল,

-‘আরে ধুর, কাঁদছিস কেন বোকা মেয়ে? শুদ্ধ খেয়াল রাখতে তো আর কমতি রাখছে না। জানিস কতবার দেখে গেছে তোকে? যাওয়ার আগে বারবার তোর দিকে খেয়াল রাখার কথা বলে গেছে।’

-‘যে খেয়ালে পর পর অনুভব হয় সেই খেয়াল লাগবে না আমার। তুমি শুদ্ধ ভাইকে বলো আবার আগের মতো হয়ে যেতে।’

-‘সেটা আর হবে না রে পাগলি।’

-‘কেন হবে না?’

-‘ঘুমন্ত সিংহকে খুঁচিয়েছিস তুই অথচ তার হিংস্র থাবা হজম করবি না?’

-‘শুদ্ধ ভাই ঘুমন্ত সিংহ? কিসব বলছো ভাইয়া? কিছুই তো বুঝছি না।’

রুবাব হাসল। এই পাগলিটাকে কী করে বোঝাবে তার শুদ্ধ ভাই শাসনের আড়ালে পৃথিবী সমান ভালোবাসা লুকিয়ে রেখেছে। সে ছোট। সরলমনা বিধায় ছেলেটা তার নিজের সুপ্ত অনুভূতিটুকু সন্তপণে লুকিয়ে রেখেছে।

একবুক ভালোবাসা বুকে রেখে কখনো বুঝতে দেয় না এই চঞ্চলার প্রতি ভীষণভাবে দুর্বল সে। দুর্বল না হয়ে ও কী আর থাকা যায়? কথায় কথায় এত মারে। বকে। তবু এই মেয়েটা তার কাছেই যায়। তার আবদার শুদ্ধর কাছে। কারণে অকারণে রাগ-অভিমান দেখানোর মানুষটাও ওই শুদ্ধই। শুদ্ধকে ভয় পায়না তাও না। ভয় পায় আবার তর্কও করে। এত মার খায় তবুও ঘুরে ফিরে তারই জিনিসপত্র ঘাটাঘাটি করে। কারণ তার শুদ্ধ ভাই তাকে প্রশয় দেয়। শাসনের আড়ালেই থাকে প্রশয়। এই অবুজ মেয়েটাও বুঝে না সেসব। কবে বুঝবে আর? তবে একটা কথা না বললেই নয়। এই পাগলিটার মধ্যে এমন কিছু আছে যা যার জন্য শুদ্ধর মতো সংযমী এক ছেলেও মন হারিয়েছে। শীতল নিজের অজান্তে তার মনেপ্রাণে প্রেমপুষ্প ফুটিয়েছে। তবে সে সত্যিই সন্দিহান এই

ছেলে আদৌও কখনো নিজের মুখে ভালোবাসার কথা
প্রকাশ করবে কী না। শীতলের সৌভাগ্য হবে কী না
শুদ্ধ মুখে ম্যাজিক্যাল শব্দ শোনার। মনে মনে এসব
ভেবে রুবাবকে হাসতে দেখে শীতল মুখ ঘুরিয়ে
নিলো। সে কষ্ট পাচ্ছে অথচ রুবাব ভাই হাসছে। সব
ভাইগুলো কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। কেউ তাকে
ভালোবাসে না। সব কষ্ট দেয়। শীতলকে মুখ ঘুরাতে
দেখে রুবাব বোনের মুখটা ওর দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে
বলল,

-‘নির্দিষ্ট একটা সময় সবার জীবনে প্রেম আসে। সেই
প্রেম ধরা দেয় বসন্তরূপে। রঙ্গিন কিছু স্বপ্ন লুটোপুটি
খায় নিদারুণ প্রেমানুভূতিতে। তবে এ বসন্তের
কারণে, বারণে রয়েছে ভিন্নতা। মিশে রয়েছে মুগ্ধতা
ও দগ্ধতা। এই বসন্ত ফাগুনের আগুনের ন্যায়। সেই
আগুন নিজেকে যেমন পোড়ায় সেই সাথে অন্যকেও
পোড়ায়।’ রুবাবের কথার আগা মাথা কিছুই বুঝল না
শীতল। শুধু ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রইল। রুবাবও
বুঝল শীতল কিছুই বুঝে নি তাই কথা বাড়াল না
বুন্ধি খাঁটিয়ে অন্য প্রসঙ্গ তুলল। সেই মুহূর্তে দরজা

খুলে হস্তদন্ত হয়ে শখ ছুটে এলো। কেঁদে ফেলল মুখে
হাত চেপে। এসবের কিছু জানতে না সে।

ফোন বন্ধ রেখে ল্যাবে কাজ করছিল। পরীক্ষাও ছিল।
বিকেলে বাড়িতে ফিরে স্বর্ণের থেকে সব শুনে
তাৎক্ষণিকই ছুটে এসেছে। স্বর্ণও আসছিল হঠাৎ
মাঝপথে কী কাজ পড়েছে বিধায় বাড়ির দিকে ফিরে
গেছে। শখ শীতলের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে
দুবোন নীরবে কাঁদল। তখন রুবাব ওদের ধমকে
থামাল। দুজনকে চোখ, মুখে পানি দিয়ে আসতে বলে
উঠে দাঁড়াল। ইফতারের সময় হয়ে এসেছে বাড়ির
সবাই রোজা আছে। এত এত টেনশনে ভুলে
গিয়েছিল। তাই ইফতারের ব্যবস্থা করতে দ্রুতপায়ে
কেবিনের বাইরে যেতে হাসপাতাল ম্যানেজার এসে
জানাল, সবার জন্য ইফতারের আয়োজন করা
হয়েছে। ইফতার গ্রহন করলে খুব খুশি হবে। 'সবাই
এটাও বুঝল শুদ্ধর কারণে স্পেশালভাবে সেবা
পাচ্ছেন উনারা।

এদিকে শুদ্ধ, সাইন, অর্ক, হাসান, কামরান কেউ
নেই। আপাতত বাড়ির কয়েকজনই আছে
হাসপাতালে। সেই মুহূর্তে শুদ্ধও জানাল হাসপাতালে

ইফতার সেরে নিতে। এবং ইফতারের পর শীতলকে
বাড়ি পাঠিয়ে দিতে। ‘অবলা গরুর গায়ে নাম্বার বসাতে
চামড়া পুরিয়ে দেওয়া হয়। যাতে সেই নাম্বার
কোনোভাবেই না ওঠে। তেমনি তোমার শরীরে আমি
আমার নাম সেভাবেই খোদাই করব শীতল রাণী।
যেন আমার নামটা তোমার শরীরে জ্বলজ্বল করে।
সেই নামের উপর আমি চুমু খাব। চুমুতে চুমুতে
ভিজিয়ে দেবে তোমার নরম কায়া। শিহরিত হবে
তোমার সর্বাঙ্গ। আহা! সেদিনের অপেক্ষায়।’

একথা বলে ইয়াসির লেপটপের দিকে তাকিয়ে হো
হো করে হেসে উঠল।

লেপটপে জ্বলজ্বল করছে শীতলের হাস্যেজ্বল ছবি।
মেয়েটাকে দেখলেই খুব করে ছুঁতে ইচ্ছে করে। এত
আদুরে কেন মেয়েটা? পবিত্র একটা ভাব রয়েছে
সর্বাঙ্গে। আচ্ছা, মোমের মতো ফর্সা ত্বকে তার কঠোর
স্পর্শ সহ্য করতে পারবে শীতলরানী? নাকি অসহ্য
হয়ে আজ ভাইদের রক্ত দেখে যেভাবে কেঁদেছে
সেভাবে কাঁদবে? কাঁদলে কাদুক না। কিছু কিছু
ক্ষেত্রে কাঁদা ভালো। একা একা বিরবির করে সে
রেড ওয়াইনের বোতল থেকে ঢকঢক করে ওয়াইন

গিলল। বাম পা থেকে ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে। এই আর নতুন কি? এসবে অভ্যস্ত সে। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার তাকে সুট করেছে একটি মেয়ে। মুখ ছিল কালো কাপড়ে বাঁধা। অদ্ভুত সুন্দর দুটো চোখ। হাতের নিশানা অবাক করার মতো। কে সে? সে কেন তার উপর হামলা করল? তাকে তো কখনো দেখে নি। চেনেও না। তবে একপলক দেখে মনে হয়েছে সে যেন এক—‘অগ্নিকন্যা’। তখন পালাতে গিয়ে গাছের কাঁটার আঁচড় লেগেছে বুকে, গালে, গলায়। মেয়েটার পরে ঘন্টা খানিকের ব্যবধানে আরো দু’বার আক্রমণ হওয়ায় বুঝতে বাকি নেই স্বয়ং শুদ্ধ এসেছিল এখানে। তবে ভীষণ মজাও পেল শুদ্ধ সব জেনে যাওয়ায়। প্রথমে আদরের বোন কিডন্যাপ এরপরছোটো ভাইদের গুরুতর এক্সিডেন্ট। আহা! এখন সে যে ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের রূপ ধরবে একথা ভালো করে জানে। আচ্ছা ছানাদুটোকে একেবারে মেরে দিলে কেমন হয়? মারলে শুদ্ধ, সায়ন কতটা তড়পাবে? ধুর, ওদের কথা ভাবলে নেশা জমবে না। সেসব কথা আপাতত বাদ বলে চোখ বন্ধ করে হেলান দিয়ে বসলেও পুনরায় তার মাথায় ঘুরপাক

খেতে লাগল সাহসী মেয়েটির কথা। মেয়েটা কে?
আচ্ছা, চৌধুরী বাড়িতে এমন কোনো মেয়ে আছে
নাকি যার নিশানা এত নিঁখুত? এত চমৎককার!
একথা ভেবে সে উঠে বসল। ঠোঁটে চিমটি কাটতে
কাটতে ভাবতে লাগত ঘন্টা চারেক আগের ঘটে
যাওয়া ঘটনা.....!

রাত তখন আড়াইটা। অমাবস্যার রাত বিধায় ঘুটঘুটে
অন্ধকার চারিপাশ। এমন সময় ‘চন্দ্রবিন্দু নিকেতন’
নামে ভাঙ্গা বাড়ির নামনে দাঁড়িয়ে আছে এক মানবী।
বয়স আন্দাজ করা না গেলেও ধারণা মতে উচ্চতা
৫.৫”। পরনে ব্ল্যাক জিন্সের সঙ্গে লেডিস লেদার
জ্যাকেট। মাথায় হেলমেট। সে গত দুসপ্তাহ যাবৎ
ঝাউবনের আড়ালে দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে তীক্ষ্ণ নজর
রাখে। কেন রাখে? সে কে? এসব জানে না ইয়াসির।
তবে অন্ধকার রুমে বসে গতকাল থেকে মেয়েটাকে
দেখে মিটিমিটি হাসছে। লুকোচুরি খেলা পছন্দ করে
না। আজ যাবে নাকি নারীটির মুখদর্শন করতে?
গেলে মুখই দেখবে একথা দিতে পারছে না যদিও।
কারণ সে নারীলোভী। নারীদেহ নেশার মতো টানে
তাকে। রেড ওয়াইন আর নারীতে বিশ্রীভাবে আসক্ত

সে। কী আর করার পুরনো অভ্যাস তো। ছাড়ার
ইচ্ছে নেই যদিও। মনে মনে এসব ভাবতে ভাবতে সে
ভাঙ্গা বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে বের হলো।
নিঃশব্দে চলাফেলা করায় পারদর্শী সে। কিন্তু গিয়ে
দূরে থেকে খেয়াল করল মেয়েটি সেখানে নেই।
পালিয়ে গেল নাকি? আশেপাশেও কেউ নেই।
কাউকে না দেখে ইয়াসির শিষ বাজাল। মুহূর্তের তার
মতো করে আরেকটা শিষ বাজল। অবাক হলো
ইয়াসির। ওই মেয়েটা নাকি? শিষ বাজাতেও পারে?
বাহ্, দারুণ তো। তা আর কী কী পারে সে? তবে
শত্রুকে দুর্বলভাবে নেওয়ার বোকা সে নয়। তার
প্যান্টের পকেট থেকে পিস্তল বের করে হাতে নিতেই
একটা গুলি চলে গেল তার কানের পাশ দিয়ে।
নিশানা দেখে হাসল সে। এর সাথে খেলাটা খুব
জমবে মনে হচ্ছে। তবে খুঁকির বুকে পাটা আছে
বলতেই হয়। ইশ! তাকে একনজর দেখার মনটা
আকুঁপাকু করেছে.... একথা ভেবে পা বাড়াতেই
জঙ্গলের শুকনো
গাছে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। আগুনের
আলোয় দেখা গেল

কালো কাপড়ে মুখ বাঁধা এক নারীর মুখ। উফ! উফ!
দারুণ দুটি চোখ। চোখেও যেন অগ্নিবর্ষণ হচ্ছে।
ইয়াসির তাকে আপাদমস্তক দেখে জিহবা দিয়ে ঠোঁট
ভিজিয়ে একটি বাক্যই উচ্চারণ করল, ‘অগ্নিকন্যা।’
তবে এই শব্দ উচ্চারণ করার আগেই মেয়েটি...! শুদ্ধ
সায়নকে বাড়িতে পাঠিয়ে পুনরায় এসেছে
হাসপাতালে। যা লাগবে হাসপাতাল থেকে ব্যবস্থা
করা হবে। সারাদিন রোজা থেকে দৌড়াদৌড়ি করে
প্রায় সবাই ক্লান্ত। তাছাড়া মেডিসিনের প্রভাবে
পেশেন্টরা ঘুমাচ্ছে।

এখানে আপাতত সবাই না থাকলেও চলবে।
রুবাবকে বলেছিল বাকিরা যেন বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়।
বাকিরাত সে থাকবে হাসপাতালে। রুবাবও ওর
কথামতো তাই করেছে। এবং শুদ্ধকে কলে
জানিয়েছেওতা। কিন্তু শুদ্ধ এসে দেখে রুবাবের কাঁধে
মাথা রেখে শীতল ঘুমাচ্ছে। ওকে দেখে রুবাব ইশারা
করল কথা না বলতে। কারণ কেবলই ঘুমিয়েছে
মেয়েটা।

শুদ্ধর বিরক্ত মুখে তাকিয়ে বিরবির করতে করতে
চলে গেল নার্সদের সাথে কথা বলতে। আর কোনো

সমস্যা হয়েছে কী না জানা দরকার। না তেমন
কোনো সমস্যা হয় নি দেখে ফিরে এলো আইসিইউ
এর সামনে। তারপর ধীর কণ্ঠে রুবাবকে
বলল,-‘তুইও বাড়ি চলে যা।’

-‘কিন্তু শীতল?’

-‘ওটা তো ঘুমালে মরা গরু। এভাবে কেউ ঘুমায়?
ঘাড় ব্যথা করবে না? দাঁড়া ওকে কেবিনে শুঁইয়ে
দিয়ে আসি। আমার একটা কথা যদি শোনে
বেয়াদবটা। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে থাপড়ে দাঁত
ফেলে দিতে।’

-‘থাক বকিস না।’

-‘না বকব না কোলে তুলে নাচব।’

একথা বলতে বলতে শুদ্ধ রুবাবের কাঁধ থেকে
শীতলের মাথা নিজের বুকের কাছে নিলো। এরপর
ধীরে সুস্থে শীতলকে কোলে তুলে হাঁটা ধরল
কেবিনের দিকে। রুবাব ঠোঁট কামড়ে মৃদু হাসল।
ভালোও নাকি বাসে না আবার যত্নেরও কমতি রাখে
না। শীতলকে ঠিকঠাকভাবে শুঁইয়ে দিয়ে এসে
রুবাবকেও চলে যেতে বলল। এদিকে সেহরীর সময়
হয়ে আসছে। রুবাব ওদেরকে সাবধানে থাকতে বলে

রওনা হলো বাড়ির পথে। শুদ্ধ কেবিনে ফিরে পাশের
ফাঁকা বেডে শরীর এলিয়ে দিলো। কি ভেবে যেন ঘাড়
কাত করে তাকাল ঘুমন্ত শীতলের দিকে। এই বোকা
রাণীটা জানে তার জন্য কত কী ঘটেছে। এমনকি সে
এতরাতে কোথায় থেকে ফিরল? কার সাথে দেখা
করতে গিয়েছিল? কিছু জানে না। হয়তো জানবেও
না কারণ বর্তমানে তার ত্রি-সীমানায় আছে কঠোর
নজরদারী। সতর্কতা।

না রেখেও উপায় ছিল না কারণ ঘোর বিপদ যে দোর
গোড়ায়। এসব ভেবে সে নিঃশব্দে উঠে বসল। রক্ত
নেওয়ার সময় যেখানে সূঁচ ফুটানো হয়েছিল সেখানে
লাল হয়ে আছে। মেয়েটার শরীর এত নাজুক
আলতো স্পর্শেও লাল হয়ে যায়। সে হাত থেকে
নজর সরিয়ে তাকাল ওই আদুরে

মুখটা দিকে। এই আদুরে পুতুলটাকে ভালোবাসার
কারণ জানে না। তবে ছোটো থেকে কেন জানি মনে
হতো এই জীবন্ত পুতুলটা শুধু তারই রুমে শোভা
বাড়াবে। তারই হবে। হতেই হবে। কারণ পুতুলের
জন্য তার বুকটা হবে নিরাপদ আবাসস্থল। একথা
ভেবে সে উঠে দাঁড়াল। বোতল থেকে পানি খেয়ে

পুনরায় শুতেই সায়নের থেকে মেসেজ এলো, 'she's okay.' মেসেজ দেখে স্থির শ্বাস ছাড়লেও বুকের দাবানল যেন তখনও জ্বালন্ত।

এবং এটাও অবগত এই দাবানল এত সহজে থামার নয়। মনে মনে এসব ভেবে ঘুম আসবে না জেনেও চোখ জোড়া বন্ধ করে নিলো। কারণ তার পাশের বেডে থাকা ঘুমকুমারীর চোখের পাতা পিটপিট করছে। এতক্ষণ সে অভিনয় করছিল বুঝতে বাকি রইল না। দিনকে দিন এত ফন্দিবাজ হচ্ছে মেয়েটা। তবে এই মুহূর্তে পাজিটার বাচলতার হাতে থেকে বাঁচতে তাকেও এখন ঘুমানোর অভিনয় করতে হবে। সত্যি সত্যিই শুদ্ধ চোখের

পাতা বন্ধ করতেই শীতল চোখ খুলে তাকাল। কিছুক্ষণ ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল ঘুমন্ত শুদ্ধকে। বালিশ ছাড়াই ঘুমাচ্ছে মানুষটা। সে উঠতে গেলে হতচ্ছাড়া বেড শব্দ করতেই চোখ বড় বড় হয়ে গেল। যখন দেখল শুদ্ধর ঘুম ভাঙ্গে নি তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন। অতঃপর সে বেড থেকে নেমে কেবিনের বাইরে গেল। তাকে যেতে দেখে শুদ্ধ ভ্রুঁ কুঁচকে মাথা উঁচিয়ে তাকাল। পাক্সা এক মিনিটের

মধ্যে কেবিনে না এলে চড়িয়ে ভেতরে আনবে বলে
ভেবেও নিলো। মিনিট না চল্লিশ সেকেন্ডের
মাথায় ফিরে এলো শীতল। সাম্য, সৃজন ও সিরাতকে
দেখতে গিয়েছিল। সব ঠিকঠাক দেখে কেবিনে এসে
নীরবে পায়চারী করল। নখ কামড়াতে কামড়াতে
শুদ্ধর দিকে দু'একবার উঁকিঝুঁকিও মারল। সে
ঘুমাচ্ছে ভেবে একবুক সাহস নিয়ে এগিয়ে এলো।
তারপর ধীরে ধীরে শুদ্ধর মাথা ধরে বালিশে রাখল।
শুদ্ধর কাঁচা ঘুম না ভাঙ্গিয়ে কাজটা করতে পেরে মিষ্টি
করে হাসল। তারপর কিছুক্ষণ শুদ্ধর মুখপানে
তাকিয়ে বিরবির করল,

-‘এই যে বিশুদ্ধ পুরুষ আমাকে ভালোবাসতে
শেখাবেন? দখিনা হিসেবে আমার আমিটাকে দিয়ে
দেবো।’

একথা বলে একটু থামল। তারপর মুখ বাঁকিয়ে শুদ্ধর
টিকালো নাকের উপর আলতো করে টোঁকা মেয়ে
পুনরায় বলল,-‘এই নাকের ডগায় এত রাগ কেন
শুনি? এখন এক ঘুষিতে নাক ফাটিয়ে দেই? একটা
ভুল করেছি নাহয় তাই বলে কথা বলা বন্ধ করে
দিতে হবে?’

একটা সুযোগ তো দিন। আর কষ্ট দেবো না তো। ওই ভুলটাই নাহয় ফুল করে ভালোবাসা সমতে আপনার কাছে অপর্ণ।’

শীতল আপনমনে বিরবির করে কথাগুলো বলে দ্রুত সরে এলো। কখন উঠে যায় বলা যায় না। কি দরকার এত রিস্ক নেওয়ার? তারপর সে উঠে এসে তার বেডে শুয়ে চোখজোড়া বন্ধ করে নিলো। অথচ শীতল টেরও পেল না পাজি পুরুষটা সব শুনেছে। সব শুনে মনে মনে হেসে কুটিকুটি হচ্ছে। এবং এই শান্তরূপী পুরুষটা ঘন্টা তিনেক আগে কী কান্ডটাই না ঘটিয়ে এসেছে সে।

—★ঘন্টা তিনেক আগের ঘটনা(গতপর্বের শেষাংশ থেকে এর সূচনা),

কালো কাপড়ে মুখ বাঁধা এক নারীর মুখ। উফ! উফ! দারুণ দুটি চোখ। চোখেও যেন অগ্নিবর্ষণ হচ্ছে। ইয়াসির তাকে আপাদমস্তক দেখে জিহবা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে একটি বাক্যই উচ্চারণ করল, ‘অগ্নিকন্যা।’ তবে এই শব্দ উচ্চারণ করার আগেই মেয়েটি শুট করে বসল তার বুক বরাবর...!যদিও টার্গেট বুঝে দ্রুততার সাথে বসে পড়েছিল মাটিতে। এরপরপরই

উঠে দাঁড়িয়ে মেয়েটা আর পায় নি। এদিক ওদিকে
খুঁজতে গিয়ে শুনতে পায় কারো ফিসফিসানি শব্দ।
সেই শব্দ অনুসরণ করে একটু এগোতেই হাতের
ঘড়িটা রেড এলার্ট দিতে থাকল অনবরত। অর্থাৎ
এখানে সেইভ নয় সে। সেটা দেখেও হাসল। ছোটো
থেকে বড় হয়েছে রিস্ক নিতে নিতে।

জীবন নিয়ে বাজি ধরতে তার ভালোই লাগে।
মোদাকথা, মাফিয়া কিং

তো এমনি এমনি হয় নি। সামান্য একটা রেড
এ্যালার্টি যদি পিছনে যায় তাহলে কী ভালো দেখায়?
না, মোটেও না! তাছাড়া কাপুরুষরা পালায়।

একথা ভেবে সে ত্রুষ্ক হেসে পেছনে সরতেই কারো
উপস্থিতি টের পেল। চট করে পেছনে ঘুরে পিস্তল
তাক করতেই দূর হতে জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় ধীরে ধীরে
স্পষ্ট হলো শোয়াইব শুদ্ধর শক্ত পোক্ত শারীরিক
অবয়। তার থেকে পাঁচহাত দূরত্বে দারুণ এক
ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটি। তীক্ষ্ণ চাহনীতে
তাকিয়ে আছে তারই দিকে। ছেলে হয়েও সে বলতে
বাধ্য এই সাইন্টিস্টের এটিটিউডের হাই লেভেলই
তার পারসোনালিটির পরিচয় দেয়। বডি ফিসনেস

দেখতে যেমন তেমনি ধারালো তার ধূর্ততা। নয়তো
এত তাড়াতাড়ি তাদের মুখোমুখি হওয়ার কথা না।
শুদ্ধও আজ সরাসরি দেখল মাফিয়া কিং এর সুদর্শন
রূপ। ইয়াসিরের নীলাভ চোখ আর ফেস বলে দিচ্ছে
দেশী বিদেশী মিলিয়েই তার মুখাবয়। অদ্ভুত রকমের
সুন্দর দুটি চোখ। ডান চোখের পাশটায় কাটা দাগ।
নিঁখুত শারীরিক গঠন এবং
গায়ের রং ফর্সা। বয়সটা সম্ভবত পয়ত্রিশ থেকে
আঁটত্রিশের কাছাকাছি। এই হচ্ছে মাফিয়া কিং
ইয়াসিন খান!

এতদিন ছবি কিংবা ভিডিওতে দেখার পর শুদ্ধকে
সামনাসামনি দেখে
ফিচেল হাসল ইয়াসির। শুদ্ধকে এখানে দেখে কিছুটা
অবাকই হয়েছে। তবে বিষয়ভাবটা চট করে
লুকিয়েও ফেলল। শত্রুকে দুর্বলতা দেখাতে নেই।
দু'জন মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। হাইট প্রায় সমানে
সমান। মুখে রা শব্দ নেই কারো। তবে চার চোখে
ভয়াল শিকারী চাহনী। সেই চাহনীতে যেন ধ্বংস
অনিবার্য। তাদের দেখে মনে হচ্ছে একজন ভয়ানক
হার্পিয়া তো আরেকজন আকুইলা ক্রিসায়েটোস।

দু'জনই শক্তিশালী শিকারী। শুদ্ধ ইয়াসিরের দিকে তাকিয়ে একটা কাঠের গুঁড়ির উপর পা তুলে রাজকীয় ভঙ্গিমায় বসল। বসার ভঙ্গিমাও ছিল চমৎকার। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ এখনো ইয়াসিরের দিকে। তাকে বসতে দেখে ইয়াসিরও বুঝে নিলো কিছু বলতে চায় শুদ্ধ। কী বলে শোনা দরকার। তাই সেও এক পায়ের উপর পা তুলে বসল মরা গাছের গুঁড়ির উপর। তারপর হাতে থাকা পিস্তল দিয়ে ঘাড়ের কাছটায় চুলকাতে চুলকাতে বলল,

-‘ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলতে পারি না আমি কাজের কথায় আসা যাক।’-‘যাক।’

-‘FGSL নামে যেই ফর্মুলা তৈরি করেছিস ওটা আমার চাই।’

ফর্মুলার কথা শুনে শুদ্ধ অদ্ভুত কায়দায় এক ভ্রাঁ বাঁকিয়ে বলল,

-‘তারপর?’

-‘ওটা আমার লাগবে।’

-‘এইটুকুই?’

-‘এইটুকুই যে নয় সেটা বুঝতে এখনো বাকি আছে নাকি চৌধুরী? যখন আমার মুখেই শুনতে চাচ্ছিস

তখন বলছি শোন, তোর বাড়ির সবচেয়ে আদুরে
ফুলটা আমার চাই। চাই মানে চাই-ই চাই। ফুল দে
পাক্কা প্রমিস

দেশ ছেড়ে চলে যাব আর জ্বালাব না তোদের। খুব
যত্নে রাখব ভাই দিয়ে দে।’

-‘ফুলে যেমন সৌরভ আছে তেমনি কাঁটাও আছে
সেটা জানিস?’

-‘সেই কাঁটা কে, তুই বুঝি?’

-‘ধরে নে তাই।’ একথা শুনে ইয়াসির হো হো হেসে
উঠল। কিন্তু হাসতে হাসতে কোথায় থেকে একটা
গুলি এসে বিঁধল তার বাঁম পায়ে। গুলি ক্যাত করে
গেঁথে গেছে মাংসে। গুলি এলো কোথা থেকে? কে
করল? ইয়াসির উত্তেজিত হলো না সেভাবেই বসে
রইল। শুদ্ধ ফিচেল হাসল। তারপর কঠে অবাধ
কঠোরতা ঠেলে জোর গলায় বলল,

-‘ওটা আমার সঞ্জীবণী ফুল। আমার! ওই অমৃত ফুল
যেমন প্রাণ দেয় তেমনি প্রাণ নেয়’ও। এবং সেই ফুল
রক্ষা করে বিষধর সাপ। সেসব কাল কেউটে সাপের
বিষ হজম করতে পারবি না তুই। বরং মেপেগুনেও
শেষ করতে পারবি না ঠিক কতটা সাপ ছড়িয়ে

ছিটিয়ে আছে শুধু ওই একটা ফুলের পেছনে। তোকে আমি বারবার ওয়ার্নিং দেবো না। ধরে নে এটাই ফাস্ট এ্যান্ড লাস্ট চান্স। এরচেয়ে বেটার হয় বিদেশী মাল বিদেশে ফিরে যা।’-‘দেশটা কি তোর বাপের কেনা?’

-‘না তোর বাপের কেনা তবুও থাকতে পারবি না।’
শুদ্ধর কথা শুনে ইয়াসির বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়াল।
তারপর আজাইরা প্যাঁচাল বাদ দিয়ে বলল,

-‘কোথায় যেন শুনেছিলাম অন্যের জিনিস কেড়ে নেওয়ার মজা অমৃত সমান। অভিজ্ঞতা আছে নাকি?’
-‘না, ওসব ছোটোলোকী কারবার। ছোটো লোকদের মাঝে এসব দেখা যায়। আর আমরা হলাম চৌধুরী। আমাদের সঙ্গে সেসব যায় না। তবে তোর সঙ্গে কিন্তু খুব যায়।’

-‘(....)’

একের পর এক অপমানজনিত কথা শুনে ইয়াসিরের মুখ থমথমে হলো। ইচ্ছে করল এখনই একটা বুলেট শুদ্ধর বুকে গেঁথে নিতো। কিন্তু তাতে খেলা শেষ যাবে। এত সহজে জিতে গেলে খেলার মজা আসে

না। তাই সে গা ঝাড়া দিয়ে আশেপাশে তাকাতে
তাকাতে বলল,

-‘বাংলার আকাশে বাতাসে প্রেম প্রেম গন্ধে ছড়াছড়ি।
প্রেমের নেশালু সুগন্ধে আমার লোভী মনটাও যে
এবার শীতল হতে চাইছে। শীতলের শীতলতা সর্বঙ্গে
মাখতে ইচ্ছে করছে।’

-‘লোভে পাপ আর পাপে কাফন ছাড়াই সাড়ে
তিনহাত মাটির কবর।’

-‘চ্যালেঞ্জ করছিস?’

-‘চ্যালেঞ্জ গ্রহন করতেও তো যোগ্যতা লাগে। এই
যোগ্যতা আছে নাকি তোর?’

-‘শোয়াইব মুখ সামলে বস। হাত ফঁসকে গেলে শেষ
নিঃশ্বাস এখানেই ছাড়তেই হবে।’

-‘সরি, বিন্দুমাত্র ভয় পেলাম না এবার অন্যকিছু ট্রাই
কর দেখি।’

শুদ্ধর কণ্ঠে ব্যঙ্গাতুর সুর স্পষ্ট। শীতলের
কিডন্যাপিংয়ের পর থেকেই শুদ্ধর কাজ ছিল পাতাল
ফুঁড়ে হলেও ইয়াসিরকে খুঁজে বের করা। সে তাইই
করেছে। মাঝের দিনগুলোতে স্থির হতে পারে নি।
শান্তিতে একদন্ড ঘুমাতে পারে নি। বারবার মনে

হয়েছে চৌধুরী বাড়ির মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়েছে কেউ। এত বড় কলিজা! এত দুঃসাহস! সেই ব্যক্তিকে তার মুখোমুখি চায়। পাওয়ার পর কী করবে ওটা পরের হিসাব, তবে চায়। সে কথায় নয় বরং কাজে বিশ্বাসী। গোপনে সারা ওর মুদ্রাদোষও বটে। ঠিক এই স্বভাবের কারণে গোপনে ইয়াসিরকে খুঁজে বের করে ফেলেছে সে। স্কাইড্রাইভিং ছিল ছুঁতো মাত্র। সেখানে মূলত গিয়েছিল ইয়াসিরের খোঁজ পেতে। পারসোনাল জেট ভাড়া করেছিল ইয়াসিরের জেট ফল করতে।

আর এসব করতে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে রাশিয়ান সাইন্টিস্ট মিখাইল ইগর এর নাম। ইগনের সাথে শুদ্ধর সম্পর্ক বরাবরই তিক্ত। কারণ ইগর প্রচণ্ড অহংকারী ও সুবিধাবাদী। তাছাড়া সে মুসলিমদের দেখতে পারে না। এবং ষাটোর্ধ্ব বয়সী ইগর নিজেকে সর্বদা সর্বোত্তম ভাবে। অন্যের শ্রম, মেধা তার কাছে হয়। এবং বলা বাহুল্য, ইগর হায়ার করেছে এই মাফিয়া কিং ইয়াসিরকে খানকে। কেন করেছে? কারণ শুদ্ধ মাস ছয়েক আগে ইগরের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছে। কোটি টাকার অফার দেওয়ার

পরও তার তৈরি করা একটা ফর্মূলা ইগরকে দেয়
নি। এটাও মূলত তার রাগ। ধূর্ত লোকটি নিজেকে
আড়ালে রেখে বাংলাদেশেও এসেছিল। হাত
মিলিয়েছিল সায়নের চরম শত্রু আবু সিদ্দিকের
কাছে। আর সিদ্দিকের মাধ্যমেই ইয়াসিরকে টোপ
হিসেবে ব্যবহার করেছে। কিন্তু সিদ্দিক আর ইগর
হয়তো জানে না ইয়াসিরও আরেক চিঁজ। তাদের
থেকে লক্ষ্যকোটি

টাকা হাতাতে দু'জনকে নিয়ে আরেকটা কড়া দান
সাজিয়েছে। যে দানে

ইয়াসির হয়তো ভেবেছে একাই বাজিমাত করবে।

কিন্তু ও হয়তো ভুলে গেছে বাপেরও বাপ থাকে..!

কিছুক্ষণ চুপ থেকে ইয়াসির উঠে দাঁড়াল। পা থেকে
এখনো রক্ত ঝরছে দেখে রুমাল বের করল। তারপর
পা বাঁধতে বাঁধতে হাসতে হাসতে বলল,।-‘ইয়াসিরের
নজর পড়েছে অথচ সে জিনিস পাই নি এমনটা
কখনো হয় নি। তবে তোর ফুল হবে তুলব জানি না
তবে ওয়াদা করছি তুলবোই।’

একথা বলতে না বলতেই ক্ষীণ গতিতে একটা ঘুষি
এসে পড়ল তার নাক বরাবর। শুদ্ধ থামল না।

পরপর দুটো দানবীয়রঘুষি মারতেই ইয়াসিরও পাল্টা আক্রমণ করতে উদ্যত হলো। সেই মুহূর্তে সেখানে উপস্থিত হলো সায়ন। ছোটো ভাইকে মারতে দেখে চোঁচিয়ে উঠল,

-‘এ্যাঁই হারামজাদা ছাড় আমার ভাইকে, ছাড়। আমার ভাইয়ের গায়ে একটা টোঁকা পড়লে তোর নতুন করে করে খাৎনা করাব শালা।’

ইয়াসির শুনল তবে থামল না। সেও একটা ঘুষি মেরে দিয়ে বলল,

-‘সরি ব্রো, দুম করে মেরে দিয়েছি আর একটু আগে বলবেন না? আর

আপনার ভাইটা যা দুষ্ট একথা কথাও শোনে না। তাছাড়া আমাদের ফুল ভাগাভাগি হচ্ছে আপনি এর মধ্যে আসবেন না।’-‘হ্যারে শুদ্ধ মাসির ছেলে মামাতো ভাই কয় কী এসব? এ্যাঁই চ্যাংরা এই চিনোস আমারে? এক্কেবারে খাইয়ালামু।’

-‘আমি ছেলে হয়ে ছেলে খেতে পারি না, রুচিতে বাঁধে।’

একথা শুনে শুদ্ধ ও সায়ন দুই ভাই একে অপরের
দিকে তাকাল। সায়ন এগিয়ে গিয়ে ইয়াসিরের শাটের
কলার ঠিকঠাক করে বলল,

-‘ওভার স্মার্ট সেজো না ব্রো। খাওয়া-খাওয়ার ব্যাপারে
আমি কিন্তু কম যাই না? যাও এবার রাস্তা মাপো
নয়তো এমন দোচন দেবো মুখ কুঁচকে আউচ করারও
সময় পাবে না।’ একথা বলতে না বলতে সেখানে
কালো পোশাধারী অনেকগুলো ছেলে এসে হাজির
হলো। এসে দাঁড়াল ইয়াসিরের দিকে। বুঝতে বাকি
রইল না তারা ইয়াসিরের লোক। তবে তাদের দেখে
শুদ্ধ ও সায়ন ভয় পাওয়া তো দূর কপালও কুঁচকাল
না। ছেলেগুলো শুদ্ধ ও সায়নের দিকে এগোতেই
পরপর একইসাথে পাঁচটা অদৃশ্য গুলি এসে বিঁধল
ফাঁকা মাটিতে। ভয়ে পিছিয়ে গেল তারা। বুঝল কেউ
আড়ালে আছে। তবে ইয়াসির ইশারায় ছেলেদের
পিছিয়ে যাওয়ার আদেশ দিয়ে বলল,

-‘শশুড়বাড়ির লোকদের অসন্মান করতে নেই। বউ
গোস্তা করে। পিস্তল নামা।’

শীতলকে বউ বলায় রাগে শুদ্ধর মাথা চিরচির করে
উঠল। সে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল,

-‘সময় ভিক্ষা দিলাম কলিজার হেফায়ত কর। নয়তো
তোর কলিজাখানা ইঞ্চি ইঞ্চি করে কাটার দায়িত্ব
নেবো এবার। আই শোয়ার, জাস্ট ইঞ্চি
ইঞ্চি!’এরপরই সেখানে গোলাগুলি শুরু হয়। কে
মরল আর কে বাঁচল দেখার সময় নেই তাদের।
ইয়াসিরকে আহত করে ফিরে আসে দুই ভাই।
এরপর

বারোতলা বিল্ডিংয়ের ছাদে বসে কিছু ব্যাপারে
আলোচনা করে। কথার মাঝখানে সায়েন হঠাৎ থেমে
যায়। তারপর থেমে থেমে বলে,

-‘আমার মনে হয় শীতলের হাতে পিস্তল তুলে
দেওয়ার সময় এসে গেছে।’

সায়নের কথা শুনে ছাদের রেলিংয়ের উপর দুই পা
ঝুলিয়ে বসল শুদ্ধ।

এখান থেকে পড়লেই কেব্লাফতে। অমাবস্যার রাত
হলেও বাতাস বইছে।

বাতাসে উঠছে মাথায় চুল। ভাইয়ের দেখাদেখি বসল
সায়নও। দু’জনের হাতে বিয়ারের বোতল। মুখ
থমথমে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে শুদ্ধ জবাব

দিলো,-‘তোমার বোন বড্ড নাজুক। পিস্তলের ভার
সওয়া দূর পিস্তল দেখলেই জ্ঞান হারাবে।’

-‘ইয়াসির শালা যেভাবে পেছনে লেগেছে ওর এবার
পাকাপোক্ত সেফটি প্রয়োজন। আমরা যতই ওর নজর
রাখি নিজের সেফটি নিজের কাছে। দেখছিস না, এত
কড়াকড়ি নজরদারীর পরেও পুনরায় আক্রমণ করে
বসল বাস্টার্ডটা। ভাবতে পারছিস এসিডের
ছিঁটেফোঁটা শীতলের মুখে পড়লে কি হতো?’

-‘কি আর হতো? ওই ব্লাডি বিচটার শরীরে ৩১৩
রকমের জীবাণু পুশ করে বসে বসে মজা দেখতাম।’
ভাইয়ের কথা শুনে সায়ন নীরবে মাথা দুলিয়ে মুচকি
হাসল। আজকে হাসপাতালে রুবাব না থাকলে সাম্য,
সৃজন, সিরাতের সাথে শীতলকেও হাসপাতালে
এডমিট করতে হতো। কারণ হাসপাতালেও ছদ্মবেশে
কেউ একজন এসে শীতলের মুখে এসিড ছুঁড়তে
চেয়েছিল। যে ব্যক্তি ছুঁড়তে চেয়েছিল সে ধরাও
খেয়েছে। আজম এতক্ষণ বোধহয় যত্নআত্তি করছে।
তার হিসাব আগামীকাল করা হবে। সায়ন আপাতত
হাসি সামলে গম্ভীর কণ্ঠে বলল,

-‘কেউ নাকি আমার বোনকে ভালোবাসে না, বাসবেও না, তবে এত দরদ আসে কোথা থেকে?’

-‘বাসি না তো। আর বাসলেই বা কি? তোমার বোন ভালোবাসা বুঝে? ভালোবাসা পিষে গুলে খাওয়ালেও বুঝবে না কিছু।’

-‘পাগলিটা তোকে চোখে হারায় কিন্তু নিজের অনুভূতি বুঝতে পারে না। কথা বল ওর সাথে। আর ভাব কি করবি?’

-‘কিসের কথা বলছো? সেফটির ব্যাপারে?’

-‘হুম।’

-‘পৃথিবী এত সুন্দর কেন জানো? কারণ পৃথিবীতে অতি চালাকের সাথে সাথে বোকাদেরও বসবাস। বোকারা আছে বলেই ভালোবাসার অস্তিত্ব এখনো টিকে আছে। খেয়াল করে দেখবে চালাকরা কিছু ভালোবাসার মাঝেও ফায়দা খোঁজে। আর বোকারা কষ্ট পাবে জেনেও নিঃস্বার্থ ভাবে ভালোবেসে।’

-‘কিন্তু পরিস্থিতি?’-‘স্বর্ণ ইন্টেলিজেন্ট। আবেগী হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেবে না সেটা আমিও জানি আর তুমিও জানো। মূলত এ কারণে ওর হাতে পিস্তল

তুলে দিয়ে তুমি নিশ্চিত্তে থাকতে পারো। কিন্তু শীতল বোকা, আবেগী, মাথামোটা।

ধীরে-সুস্থে হাজারবার ভেবে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া ওর বদঅভ্যাস। মাঝে মাঝে ওর দুষ্টবুদ্ধিতে ওই ধরা খায় দেখো না? তাকে যদি পিস্তল দিয়ে সেটা লুকিয়ে রাখতে বলো দেখবে কোথায় রাখবে সেটা ভাবতে ভাবতে অসুস্থ হয়ে পড়বে। তাই ওকে নিয়ে এসব চিন্তা করা যাবে না। ও যেমন আছে তেমনই থাকুক। বরং এসব জানলে ভয় পাবে। সেই ভয়ই কেড়ে নেবে তার ডানা ঝাপটে মুক্তমনে উড়ে-উড়ে, ঘুরে-ঘুরে বেড়ানোর সুখ।

এরচেয়ে সে তার মতোই থাকুক। আমি আছি তো। ভরসা রাখো আমার উপর। কথা দিচ্ছি আমি জীবিত থাকতে তোমার বোনের উপর ফুলের টোঁকাও পড়তে দেবো না।’

শুদ্ধর কথাগুলো সায়নও গভীরভাবে ভাবল। শুদ্ধর কথাগুলো ভুল বলে নি। অতঃপর দুইভাই আরো কিছু ব্যাপারে আলোচনা করল। আধাঘন্টা পর সেখানে আর কয়েকজন হাজির হলো। তাদের নিয়ে একটা মিটিং হলো। টানা দেড় ঘন্টা সেই মিটিং শেষ করে

সায়ন গেল বাড়ির দিকে আর শুদ্ধ হাসপাতালে। সময় যেন বহমান স্রোত। সে আপনমনে বইতে থাকে নিজস্ব গতিতে।

আমাদের জীবনে সুখ কিংবা দুঃখ কোনোটাই স্থির নয়। সুখের পরেই যেমন দুঃখের আগমন। তেমনি দুঃখের পরপরই সুখ এসে ভুলিয়ে দেয় কিছু কষ্ট। কিছু ব্যথা। এদিকে দেখতে দেখতে কেটে গেছে প্রায় দু'দুটো সপ্তাহ। সাম্য, সৃজন সিরাত আজ সকালে হাসপাতাল থেকে বাড়ি এসেছে। চিকিৎসা এখনে চলমান তাদের। আরো সপ্তাহ খানিক ওদের হাসপাতালে থাকার কথা থাকলেও বাচ্চা দুটো বাড়ি আসার জন্য কেঁদে কেঁটে হয়রান। ঘুরে ফিরে একই কথা হাসপাতালে ভালো লাগে না। শুদ্ধ, সায়ন, রুবাব, শখ, স্বর্ণ, শীতল যে যেমন ভাবে পারে তাদের সময় দেয়। হাসাতে চায়। কিন্তু ওরা একসাথে কান্না জুড়ে আবদার ধরে বাড়ি চলো, বাড়ি চলো, এই জায়গা ভালো না। পরে দু'জন নার্সকে তাদের দেখভালের জন্যও আনা হয়েছে। রিপোর্টে এসেছে সিরাতের মেরুদন্ডের হাঁড় না ভাঙলেও ফাটল ধরেছে। বড্ড ভুগতে হবে উনাকে। এখনো সোজা

হয়ে দাঁড়াতে পারে না। প্রচণ্ড ব্যথা করে। ডাক্তারও জানিয়েছেন শারীরিক ক্ষত সারলেও এই সমস্যা দীর্ঘদিন থাকবে। সব মিলিয়ে এ ক'টা দিন চৌধুরী নিবাস যেন নেতিয়ে পড়েছিল। সুখ হারিয়ে গিয়েছিল যেন বাড়িটা থেকে। আজ গোটা চৌদ্দ দিনের মাথায় বাড়িটি আবার গমগম করছে। কথার হাঁট বসেছে। হাসি খুনশুঁটিতে বাড়ি মেতে উঠেছে। বিলাশবহুল ড্রয়িংরুমে বসেছে সকলের আনন্দমেলা। সব সদস্যা উপস্থিত। কোনো একটা কারণে হাসছে সবাই। শারায়ত চৌধুরী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে সবাই হাসি মুখ। এতগুলো দিন যেন শ্বাস নিতেও কষ্ট হতো উনার। হবে নাই বা কেন? এই বাড়ির বাচ্চাগুলোই তো বাড়ির প্রাণ। তারা কেউ অসুস্থ থাকলে ভালো থাকা যায় নাকি?

আজকে পনেরো রমজান। অথচ এতগুলো দিনে সবাই মিলে একসাথে ইফতার করতে পারে নি। তাই আজ বাড়িতে চলছে ইফতার পার্টি। সব কাজ হাতে হাতে করছে সবাই। সিরাত হুইল চেয়ারে বসে আছে। রোজ প্রতিবেলায় অনেকগুলো মেডিসিন নিতে হয়। যার ফলে রোজা রাখতে পারেন না। এই নিয়ে

আফসোসের শেষ নেই উনার। সিঁতারা, সিমিন দুই
জা কত কিছু বলে বোঝায়। মানসিক সাপোর্ট দেন।
জায়েদের সাপোর্ট পেয়ে উনার বাপের বাড়িতেও যান
নি উনি। কারণ উনি খুব ভালো করে জানেন এখানে
উনার বিন্দুপরিমাণ অযত্ন হবে না। বরং এই বাড়ি
ছেড়ে গেলে আরো অসুস্থ হয়ে পড়বেন। বিয়ের আগে
ভাবতেন বাপের বাড়ির মতো শান্তি আর কোথাও
নেই। কিন্তু এখন ভাবেন নিজের সংসার ছাড়া শান্তি
বুঝি আর কোথাও মিলবে না। এখানেই শান্তি,
এখানেই সব স্বস্তি। শুদ্ধ কিছুক্ষণের জন্য বাইরে
গিয়েছিল। এসে দেখে তার রুমের দরজা হাট করে
খোলা। ভেতরে কে গেছে বুঝতে বাকি নেই তার।
পুরনো সেই পার্স আবার দেওয়াতে শীতলের
অত্যাচার আবার বেড়ে গেছে। কদিন পার্সে কাজ না
করায় কাঁদো কাঁদো মুখে দরজা থেকে ঘুরে যেতো।
এখন পার্সে কাজ করছে দেখে এখন সোজা রুমে
টুকে পড়ে। দু'দিন ইগনোর করেছিল দেখে এতিমের
মতো মুখ করে তাকাতো। এটা ওটার ছুঁতোয় কথা
বলতে আসতো। চারদিন আগে রাতে বাসায়
ফিরতেই দেখে তারই রুমের দরজার কাছে বসে

আছে। সরতে বলতেই কান ধরে কেঁদে কেঁদে বলেছিল, ‘সরি!’ সে জবাব না দিলে ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলেছিল, ‘সরি বলছি তো নাকি? আর কতবার বলব? কেউ আমার উপর রেগে থাকলে আমার খুব কষ্ট হয়।’ এভাবে সরি বললে কী আর রাগ করে থাকা যায়? নাকি রাগের অভিনয় চালিয়ে যাওয়া যায়? অগত্যা থমথমে মুখে বলেছিল সে মাফ করে দিয়েছে তবে এইশেষবার। অথচ মাফ পাওয়ার খুশিতে সে পূর্বের আবারও বাদরামি শুরু করেছে। যখন তখন রুমে আসা। রুমের জিনিসপত্র ঘাটাঘাটি করা। কিছু বললে মুখ ভেঙ্গানো। খেতে বসে তার ভাগের খাবারে ভাগ বসানো। কফি এনে দিতে বললে আড়ালে গিয়ে এঁটো করে দেওয়া। এভাবেই দিন কাটছে।

এখন নিশ্চয়ই কোনো আবদার নিয়ে এসেছে। কারণ কিছুক্ষণ আগেও দেখেছে শখের ফোন নিয়ে অনলাইনে ইদের ড্রেস দেখছে। হয়তো গত বারের মতো কোনো ড্রেস দেখিয়ে দাঁত বের করে বলবে, ‘শুদ্ধ ভাই এই ড্রেসটা কিনে দেন না? এটা কিনে দিলে ঠিক পুতুলের মতো একটা বউ পাবেন।’

-‘দাম কত?’

-‘নয় হাজার তিনশ বিশ টাকা।’

-‘একটা ড্রেসের দাম নয় হাজার টাকা? টাকা কি গাছের শুকনো পাতা যে চাইলেই পাওয়া যায়?’

-‘দেন না শুদ্ধ ভাই?’

-‘ বলছি তো, টাকা নাই।’-‘ওই যে ওই লকারের সেকেন্ড দ্রয়ারে অনেকগুলো নতুন টাকার বান্ডিল আছে। ওখান থেকে নিন?’

-‘তুই আবার আমার লকার খুলেছিস?’

-‘আমি লকার খুলি নি রুমে এসে দেখি খোলা। উঁকি মেরে দেখি অনেক টাকা। নতুন কড়কড়া টাকা দেখে টাকা না হাতালে নাকি পাপ হয়। তাই পাঁচটা হাজারের নোট মেরে দিয়েছি।’

-‘পাঁচ হাজার নিয়ে আবার ড্রেস কেনার আবদার করছিস? তুলে আছাড় মারার আগে চোখের সামনে থেকে যা, যা বলছি।’ একথা শুনে ওই মুহূর্তে মন খারাপ করে চলে গেলেও পরে ড্রেসটা নিয়েই ছেড়েছে। আর রুমে যতই টাকা পড়ে থাক সে কখনো হাত দেয় না বরং সেটা তুলে ঠিক জায়গায় রাখে। এবং সেও বুঝে তাকে রাগাতে পাজিটা এসব

বলে। পুরনো কথার ছেদ ঘটিয়ে শুদ্ধ রুমে ঢুকে
দেখে শীতল চার হাত-পা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিছানায়
শুয়ে আছে। একটা বালিশ ওর বুকের উপর। ঠোঁটে
মিটিমিটি হাসি। তাকে দেখামাত্রই লাফ মেরে উঠে
হড়বড় করে বলল,

-‘ শুদ্ধ ভাই দারুণ একটা খবর আছে।’

শুদ্ধ ওর কথায় কোনো জবাব না দিয়ে ওয়াচ খুলে
ওয়ালেটটা বের করে রাখল। সে জানে কিছু না
বললেও দারুণ খবরটা শীতল তাকে বলবেই।

তখনো শীতলের চোখে মুখে আনন্দ ঝরে পড়ছে।
কিছু একটা নিয়ে খুব খুশি বোধহয়। তখন সত্যি
সত্যিই শীতল বলল,-‘কিছুদিন আগে আমলকি গাছের
ডালে একটা পাখি বাসা বেঁধেছিল। আজ দেখে এলাম
বাসায় দুটো ছানা ফুটেছে।’

-‘আবার গাছে উঠেছিলি?’

-‘ক ক কই নাতো।’

-‘তাহলে কিভাবে বুঝলি বাসায় দুটো ছানা ফুটেছে?’

-‘মাটিতে দাঁড়িয়েই দেখলাম।’

-‘তোৰ বাপ কোন কোম্পানিৰ ভিটামিন খাওয়াছে
তাকে যে মাটিতে দাঁড়িয়ে উঁচু গাছের মগডালের
সবকিছু দেখতে পাচ্ছিস?’

একথা শুনে শীতল মুখ ভোঁতা করে চলে গেল।
তাকে যেতে দেখে শুদ্ধ ফ্রেশ হতে ওয়াশরুমে
যাওয়ার আগে শীতল পুনরায় হাজির। ওড়নায়
আঙ্গুলে পেঁচাতে পেঁচাতে বলল,

-‘কিয়ারা ফোন করেছিল ওর বাবা নাকি কোথায়
থেকে সাদা পেঁচার ছানা এনেছে। কি নাম রাখবে
তাই জিজ্ঞাসা করছিল।’-‘পেঁচাটা ছেলে নাকি মেয়ে?’

-‘ছেলে।’

-‘তাহলে তোর বাপের নামটা বলে দিতি?’

-‘ বলেছি।’

-‘তোৰ বাপের নাম বলেছিস?’

-‘না। পেঁচাটা দেখামাত্রই কেন জানি আপনার কথা
মনে পড়েছিল। তাই কিয়ারাকে বলেছি নাম রাখতে

__শোয়াইব শুদ্ধ।’একথা বলে শীতল নিজেই খিলখিল
করে হেসে একছুটে দৌড়ে পালাল। চোখের পলকেই
শুদ্ধর নাগালের বাইরে সে। নয়তো চ্যাকাঠের দর্শন
পেতে হতো খুব ভালো করেই জানে সে। ওর কথা

এবং দৌড়ে পালানো দেখে শুদ্ধ ভ্রাঁ কুঁচকাল। তারপর
বিরবির করে বকতে বকতে ওয়াশরুমে চলে গেল।
তখন বিকেল ৫:০০।

এক ধরনের নরম ও কোমল আলোয় সঁজেছে
পশ্চিমাকাশ। ক্লান্ত হয়ে ম্লান হয়ে এসেছে দিনের
আলো। সূর্য্য নেমেছে পাটে। পাখিরা ফিরছে
আপনগৃহে। পাড়ার মোড়ে মোড়ে বসেছে ছোট, বড়
ইফতারের দোকান।

ক্রেতাদের ভিড়ে জমজমাট দোকানপাট। কোথাও
কোথাও কোরআন তেলওয়াও, গজল, ওয়াজ বাজছে।
কোথাও বা হরদমে চলছে ইফতার পার্টির আয়োজন।
এসবকে পেছনে ফেলে ব্যস্তপায়ে ছুটছে একদল ব্যস্ত
পথচারী।

এদিকে চৌধুরী বাড়ির রান্নাঘরে তাড়াহুড়ো লেগে
গেছে গৃহিনীদের। দ্রুত

হাতে কাজ সারছেন উনারা। রাতের রান্না শেষে এখন
ইফতার সাজাতে লেগে পড়েছেন দুই জা। দুপুর
থেকে একটানা সিঁতারা সিমিন একাহাতে সামাল
দিচ্ছেন সব কাজ। সিরাত বসে আছে রান্নাঘর থেকে
একটু দূরে।

মুখটা বড্ড বেজার। ঝটপট কাজ করা মানুষ কাজ ছাড়া থাকতে পারে না। অথচ অসুস্থতা উনাকে বসে থাকতে বাধ্য করছে। খুব খারাপ লাগা কাজ করছে জা দের ঘামার্ত মুখ দেখে। তবুও উনি বলেছেন বসে বসে কিছু কাজ উনাকে দিতে। একথা শোনামাত্র সিঁতারা খ্যাঁক করে বলেছে,-‘এখানে থাকলে চুপ করে বসে থাক নয়তো খুন্তির বারি একটাও বাইরে পড়বে না।’

বড় জায়ের কথা শুনে ফিক করে ফেলে সিরাত। হাসে সিমিনও। সিঁতারা ভ্রুঁ কুঁচকে জা দের দেখে বেগুনি ভাজতে আরম্ভ করেন। সিমিন দুপুরের দিকে ফালুদার জন্য সাগুদানা রান্না করে ফ্রিজে রেখেছিলেন। এখন তা বের করে ফলমূল কেটে গুছিয়ে রাখলেন। নানান রকমের জিনিস দিয়ে চমৎকার করে ডেকোরেশন করে শীতল। সে আবার এসব কাজ ভালোই পারে। কিন্তু এই নিয়ে তিনবার মেয়েটাকে ডাকার পরেও সাড়াশব্দ নেই।

তিনি বিরক্ত হয়ে আরেকবার হাঁক ছেড়ে ছাড়লেন,
-‘শীতল! এ্যাঁই শীতল! এবার গেলে মার একটাও মাটিতে পড়বে না বলে দিলাম।’

ছোটো জায়ের ডাকাডাকি শুনে সিরাত জবাব দিলেন,-‘মেয়েটা রোজা আছে থাক না একটু রেস্ট করুক।’

-‘এত বড় ধিঁঙ্গি মেয়ে ফলগুলো তো কাটতে পারে। সব কথা বলে দিতে হবে? একটা কথা যদি শোনে।’ একথা শুনে সিতারা আঁচলে মুখটা মুছে শরবতের চিনি গুলাতে গুলাতে বললেন,

-‘মেয়েটার শরীরটা বোধহয় ভালো না। পাখির দানা খেয়ে রোজা আছে। সেদিন রক্ত দিলো। থাক ওকে এ গরমের মধ্যে আর ডাকিস না ছোটো।’

দুই জায়ের কথা শুনে সিমিনের রাগে গজরাতে গজরাতে এঁটো থালা বাসন ধুঁতে ধুঁতে বললেন,

-‘তোমাদের আদরে আদরে ও আরো বাদর হচ্ছে। ওর বয়সী সাদিকাকে দেখো কী সুন্দর সংসার করে খাচ্ছে। অথচ এর গড়িমসি করতে করতে বছর যায়। ভালো কথা বললেও যদি শুনতো। শুনবি না তো, শুনিস না। শশুড়বাড়ি গিয়ে শাশুড়ীর খোঁচা খেতে খেতে নাকে জল, চোখের জল, এক হবে তখন আমার কথা মনে পড়বে।’

তখন রুবাব এসে জবাব দিলো,-‘যে বাড়িতে আমার বোনকে কাজ করে খেতে হবে সে বাড়িতে বিয়েই দেবো না। আমাদের রাজকুমারীকে যে যত্নে রাখতে পারবে আমরা তার হাতেই আমাদের বোনকে তুলে দেবো।’

-‘কল্পনার রাজ্য থেকে বেরিয়ে আয় বাবা। শশুড়বাড়ি গেলে রাজকুমারী যতই আদরের হোক সেই আদর আর শশুড়বাড়িতে থাকে না। এজন্য বলছি বোনের ভালো চাইলে কাজ শেখা।’

রুবাব হাসল। তারপর সিঁতাকে বলল,

-‘শীতলকে শিখিয়ে পড়িয়ে নাও বড় মামি।’

-‘ও ছোটো মানুষ ওকে আর কী কাজ শেখাব? বড় হোক একদিন সবই শিখে যাবে।’

তখন দৌড়াতে দৌড়াতে সিঁড়ি বেয়ে নামল শীতল। দুপুরে গোসল সেরে একটুখানি শুয়েছিল কখন চোখ লেগে গেছে খেয়ালই করে নি। মায়ের ডাক শুনেছিল তবে তখন আরামের ঘুম হারাম করে উঠে আসতে ইচ্ছে করছিল না। আরামে আরামে ঘুমিয়ে বিকেলও কাবাড় করে ফেলেছে।

মেয়েটাকে এভাবে ধড়মরি করে দৌড়ে নামতে দেখে
সিমিন মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এমনভাব করলেন যেন
খুব রেগে আছেন। তখন শীতল ওড়নায় আগুল
পেঁচাতে পেঁচাতে আমতা আমতা করে
বলল,-‘ডেকেছিলে আম্মু?’

-‘হুম।’

-‘কেন?’

-‘আমরা এখানে শুয়ে আছি তুইও এসে শুঁতি তাই।’
সিমিনের কথা শুনে শীতল ভ্যাচ্যাকা খেয়ে গেল।
বুঝল মাকে রাগিয়ে দিয়েছে। তাই মায়ের রাগ
ভাঙ্গাতে এগিয়ে আসতেই দেখতে পেল কাটা ফলমূল
এবং তারই পাশে ফালুদার কাপ। বুঝল একাজ
তাকেই করতে হবে। তাই সে কথা না বাড়িয়ে
প্রতিটা সদস্যের জন্য ফালুদা রেডি করার কাজে
লেগে পড়ল। রান্নাঘরে স্পেস কম। মায়েরা অন্য
কাজকর্ম করছে

দেখে সে সব সামগ্রী নিয়ে রান্নাঘরের সামনে বসল।
তারপর সে বাদাম কুচি, টুটিফুটি, চকলেট স্প্রিঙ্কলস,
রোজ সিরাপ, স্ট্রবেরি সিরাপ, ম্যাঙ্গো বা ভ্যানিলা
আইসক্রিম, হুইপড ক্রিম, কালারফুল ফলের কুচি,

চকলেট সস বা ক্যারামেল সস দিয়ে মনমতো করে
সাজাল। রুবাব শীতলের বা পাশে বসে চুপ করে
দেখছিল। সে বুঝে পায় না সাজানো গোছানোর
ব্যাপারে মেয়েরা এত এক্সপার্ট কেন? এই যে
ফালুদার কাপ এত সুন্দর করে সাজাল শীতল। কত
কী যে দিলো সেগুলো নাম বলতে পারবে কী না
সিওর। তাড়াছা যাবে তো ওই পেটেই তাহলে এত
কাহিনী করার কি আছে? সবগুলো একসাথে বড়
একটা বোলে নিয়ে ঝালমুড়ির মতো সব আইটেম
একসাথে দিয়ে নাড়া দিয়ে কপাকপ গিলে নিলেই
হয়। অযথা টাইম ওয়েস্ট করার দরকার আছে?
মানে মেয়েটা পারেও বটে! শীতল সেগুলো সাজিয়ে
ফ্রিজে তুলে হাত ধুঁয়ে বের হতেই সিঁতারা
বললেন,-‘ও মা ফোনটা শুদ্ধকে একটু দিয়ে আয় না।’
-‘আচ্ছা।’
-‘বাগানের দিকে গেছে দেখ।’
-‘হুম।’
-‘আর শোন আসার সময় কয়েকটা লেবু তুলে
আনিস।’
-‘আচ্ছা।’

একথা বলে রান্নাঘর পেরিয়ে বাইরে এসে পিলারের পাশে দাঁড়িয়ে গেল।

শুদ্ধর ফোনের লক খুলতে চেষ্টা করল কিন্তু হলো না।

তাই বিরবির করে বকতে বকতে বাগানে গেল।

বাগানে কেউ নেই। তাই গেল বাড়ির পেছন দিকের

পুকুরপাড়ে। তাদের পুকুরপাড়টা শান বাঁধানো।

অনেক জাতের মাছা ছাড়া বিধায় কেউ গোসল করে

না। বাইরের লোক এসে মাছ মেরে দিয়ে যায়।

এদিকটায় নির্জন তাই খুব একটা আসা হয় না। তবে

শুদ্ধকে মাঝে মাঝে দেখা যায়। সে এখানে এসে

দাঁড়িয়ে থাকে প্রায় সময়। এই যেমন এখনো দুই

পকেটে হাত গুঁজে দাঁড়িয়ে আছে। বাতাসে উঠছে

তার কপালের উপর পড়ে থাকার অবাধ্য চুল। পরনে

সাদা টিশার্ট, টাউজার।

সে পেছনে থেকে চুপিচুপি এসে ভাও করার আগেই

শুদ্ধ বলল,-‘এখানে কি?’

-‘ফোন দিতে এসেছি।’

শুদ্ধ হাত বাড়াল। শীতল ফোন এগিয়ে দিয়ে শুদ্ধর

পাশাপাশি দাঁড়াল। সে শুদ্ধর বুক বরাবর। হঠাৎ

দমকা বাতাসে শীতলের চুল এলোমেলো হয়ে গেল।

উড়ন্ত চুলের ঝাপটা লাগল শুদ্ধর চোখে, মুখে।
ব্যাপারটা খেয়াল করে ধমক খাওয়ার আগেই শীতল
চুল গুছিয়ে হাতখোঁপা করে নিলো। সাওয়ান চৌধুরীর
রাজ হাঁসের মাংস ভীষণ পছন্দ। উনি মাঝে মধ্যেই
রাজহাঁস কিনে আনেন। কিছুদিন আগে খাবেন বলে
এনেছিলেন

কিন্তু সাম্য সৃজনের এক্সিডেন্টের জন্য খাওয়া হয়ে
ওঠে নি। ফলস্বরূপ রাজহাঁস দুটো দিনের বেশিরভাগ
সময় পুকুরে ভেসে বেড়ায়। সন্ধ্যারপর দারোয়ান
কাকা ওদের গ্যারেজে রাখে। শীতলের হঠাৎ নজর
গেল ভেসে বেড়ানো হাঁস দুটোর দিকে। সে
বলল, ‘পুকুরে ভেসে বেড়ানো হাঁসগুলো কত সুখী তাই
না, শুদ্ধ ভাই? ইশ! আমিও যদি হাঁস হতাম।’

আফসোসের সুরে বলা শীতলের কথা শুনে পুকুরে
তাকাল শুদ্ধ। হাঁস দুটোকে আপনমনে ঘুরে বেড়াতে
দেখে সত্যিই মনে হচ্ছে তারা ভীষণ সুখী। তারা
পুকুরে ভাসতে ভাসতে ছোট ছোট মাছ, পোকা ধরে
খাচ্ছে।

কখনো নিজস্ব ডাকছে। পাশাপাশি ভাসছে। টলটলে
স্বচ্ছ জলে ধবধবে হাঁসদুটোকে দেখতে সত্যিই খুব

সুন্দর দেখাচ্ছে। হঠাৎ পুরুষ হাঁসটি নারী হাঁসটিকে
চেপে ধরে সঙ্গমে লিপ্ত হলো। যা ঘটল সেটা ছিল
অনাকাঙ্ক্ষিত।

এ দৃশ্য দেখে মুহূর্তেই ঠোঁটে হাসি এঁটে দাঁড়িয়ে
দেখতে থাকা শীতলের হাসি মিলিয়ে গেল। বিশ্বয়ে
চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল। ফর্সা আদুরে গালদুটো
রাঙ্গা হয়ে উঠল। কান দিয়ে যেন গরম ধোঁয়া
বেরোতে লাগল। নারী হাঁসটি পালাতে গিয়ে পারল না
আঁটকা পড়ল পুরুষ হাঁসটির নিচে। শুদ্ধ পাশে থাকায়
সে আর তাকিয়ে থাকতে পারল না। দ্রুত দৃষ্টি সরিয়ে
অন্যদিকে তাকাল। কেন জানি হাত-পা ভীষণ
কাঁপছে। অসীম লজ্জায় চোখ তুলে তাকাতেও পারল
না পাশের মানুষটার দিকে। কত শখ করেই না হাঁস
হতে চেয়েছিল। কিন্তু কী থেকে কী হয়ে গেল।
একরাশ লজ্জায়

একছুটে পালিয়ে যেতে যেতে বিরবির করল, ‘না, না,
আমি হাঁস হতে চাই না, ছিঃ! ছিঃ!’ একথা বলতে
বলতে পালিয়ে গেল ঠিকই তবে ভুলেও আর পিছু
ফিরে তাকাল না। কিন্তু একবার তাকালে হয়তো
দেখতে পেতো তার বিশুদ্ধ পুরুষ নিচের ঠোঁট কামড়ে

ধরে হাসছে। হাসছে তার চোখজোড়াও। কী চমৎকার
সেই হাসি। সেই হাসি নিদারুণভাবে স্বচ্ছ জলে ফুটে
উঠেছে। শীতল চলে গেলে বুঝতে পেরে সে হাসতে
বলল,

— ‘কেবল তো শুরু লাজুকলতা। এখনই লজ্জায়
ডুবলে চলবে? সর্বনাশের চিপাগলি যাওয়ার কথাও তো
স্মরনে রাখতে হবে।’

একথা বলে সে মিটিমিটি হাসতে হাসতে পুকুরপাঁড়ে
দাঁড়িয়ে রইল। আর শীতল দৌড়াতে দৌড়াতে
বাড়িতে ঢুকল। মেয়েকে দৌড়ে আসতে দেখে
সিমিন কটমট করে তাকিয়ে রইলেন। সব সময়
ফিঙ্গে ডানার মতো এই মেয়ে ছুটে বেড়ায়। স্থিরতা
বলতে কিছু যদি থাকে এর মধ্যে। এ নিয়েও সাবধান
করেছেন। সাবধান করলেই বা কী? এ মেয়ে শুধরাবে
না। তবে ভেবেও নিলেন অকারণে দৌড়াদৌড়ি
করতে গিয়ে যদি মুখ খুবকে পড়ে তাহলে তখনই
আরেক ঘা বসাবেন। শীতল লাজুক মুখে হাসতে
হাসতে এসে দাঁড়াতেই মায়ের সামনে পড়ে থমকে
দাঁড়িয়ে গেল। হাসি লুকানোর বৃথা চেষ্টা করে মুখ
ভোঁতা করে মনে মনে ভাবল, - ‘কাজ করি না বলে

আম্মু রেগে আছে। সমস্যা নেই এখন কাজ করে সব
তামা তামা করে ফেলব। পরে কাজ করার উসিলায়
নতুন জামার বায়না করব।’

একথা ভেবে চমৎকার করে হাসল। তারপর ছোলা
বাটি হাতে তুলে নিয়ে ডায়নিং টেবিলে রাখতে গেল।
কিন্তু বিধির বাম। পাপোসে পা আঁটকে ছোলার বাটি
নিয়ে নিজেও উপুড় হয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কাঁচের
বাটি ভেঙ্গে ছোলা ছটিয়ে গেল। শীতল মায়ের মার
খাওয়ার ভয়ে তাড়াহুড়ো করে উঠার আগে সিমিন
দ্রুত এগিয়ে গেলেন। একটা কাজও করে না।
কালেভাদ্রে যা করে তাতেও অঘটন ঘটিয়ে বসে।
ইফতারের সময় হয়ে গেল আর এখন এই অঘটনই
ঘটাতে হলো? উনি রাগে দুম করে একটা কিল
বসিয়ে দিলেন শীতলের পিঠে। শীতল চোখ বড় বড়
তাকিয়ে রইল মায়ের দিকে। পরমুহূর্তে আরেকটা
মারতে গিয়ে সেটা মেয়েটার ঠোঁটে লেগে ঠোঁট দিয়ে
গলগল করে রক্ত বেরিয়ে গেল। এদিকে সিঁতারী দ্রুত
সিমিনকে আঁটকাতে গেলে খেয়াল করল শীতল
কেমন করছে। কিলটা এমনভাবে পিঠের উপর
পড়েছে ঠিকঠাক নিঃশ্বাস নিতেও পারছে না। রুবার

আর সিঁতারা ব্যাপারটা খেয়াল করে দ্রুত বুকে আগলে নিলেন। মাথায়, পিঠে হাত বুলিয়ে শান্ত হতে বললেন। এদিকে ইফতারের সময় হয়ে যাওয়ায় শারাবাত আর সাফওয়ান চৌধুরীও নিচে এসে বসেছেন কেবল। সায়নও পার্টি অফিস থেকে ফিরে কেবল দরজা দিয়ে ঢুকেছে।

সবাইকে রান্নাঘরের সামনে হুলস্থল করতে দেখে সে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল। নিচে বসে থাকা শীতল, ভাঙ্গা কাঁচের বাটি আর ছড়ানো ছিটানো ছোলা দেখে বুঝে নিলো আসল ঘটনা। শীতলের ঠোঁট থেকে রক্ত বের

হচ্ছে দেখে দ্রুত ঘাড় ঘুরিয়ে গেটের দিকে তাকাল। শুদ্ধকে বাগানের দিকটায় ফোনে কথা বলতে দেখে এলো। সে যদি দেখে তাহলে নির্ঘাত তুলকালাম বাঁধাবে। মনে মনে একথা ভেবে সে দ্রুত পকেট থেকে রুমাল বের করে শীতলের ঠোঁটে চেপে ধরল। শীতল তখনো পিঠ বাঁকিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছে। তখন সায়ন তার ঠোঁটে রক্ত মুছতে মুছতে আদুরে সুরে বলল,-‘দেখে শুনে হাঁটবি না? ইশ! কতখানি কেটে গেছে।’

একথা বলে ফের সিমিনের দিকে তাকিয়ে বলল,
-‘ছোটো আম্মু এভাবে কেউ মারে? দেখো তো ঠোঁটটা
কেটে কি অবস্থা হলো। বকবা, মারবা ঠিক আছে।
মারেরও তো সিস্টেম থাকা লাগে। ‘

এদিকে সিমিনও হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।
মারটা এভাবে লাগবে উনিও বুঝতে পারেন নি।
শীতল তখন রক্তমাখা ঠোঁট ফুলিয়ে মায়ের দিকে
তাকাল। তার চোখের দিয়ে ঝরছে অঝর অশ্রধারা।
অভিমানী চোখজোড়া অভিমানে টইটুস্বর।

এদিকে চেঁচামেঁচি শুনে শারাবাত ও সাফওয়ান
চৌধুরী ছুটে এলেন। সিমিন মেরেছে শুনে শারাবাত
চৌধুরী থমথমে মুখে শীতলকে উঠিয়ে ড্রয়িংরুমের
সোফায় বসালেন। যত্ন করে রক্ত মুছে দিলেন।
ভাসুরকে দেখে সিমিন মাথায় আঁচল টেনে মাথা নিঁচু
করে এককোণে দাঁড়িয়েছে। সিতারা এবার বকতে
লাগলেন সিমিনকে। সিরাতও তাই। রুবাব সবার
বকাবকি শুনে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দেখে শুদ্ধ দাঁড়িয়ে
আছে। সে ভ্রুঁজোড়া কুঁচকে তাকিয়ে আছে শীতলের
দিকে। সিতারার বকাবকি শুনে বুঝল মেরেছে
সিমিন। তাও আবার ছোলা ফেলে দেওয়ার জন্য। সে

দাঁড়াল না বাইকের চাবিটা পকেটে পুরে তখনই
বেরিয়ে গেল। এদিকে ব্যস্ত থাকায় কেউ সেদিকে
খেয়াল করল না। ভাই-বোনরা হাতে হাতে ইফতার
টেবিল সাজিয়ে ফেলল। শখ শীতলের ঠোঁটে
এ্যান্টিসেপটিক লাগিয়ে দিলে সে বাবাকে বল দিলো।
ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদতে কাঁদতে অভিযোগ জানাল।
শাহাদত চৌধুরী থমথমে মুখে বললেন,

-‘আমি এবার ছুটিতে গিয়েই তোমাকে আমার কাছে
নিয়ে চলে আসব। আর থাকতে হবে না ওখানে।
আমার মেয়েকে শুধু ধরে ধরে মারবে আর বসে বসে
দেখব, তা হবে না।’

-‘তাই যাব। থাকব না আমি। কত কষ্ট করে সারাদিন
রোজা ছিলাম অথচ শেষ মুহূর্তে এসে মেরে রক্তারক্তি
করে রোজাটাকে দুর্বল করে দিলো।’-‘থাক, কাঁদে না
মা। ইফতার করে ওষুধ খেয়ে নিলেই ব্যথা সেরে
যাবে।’

সিমিনও অযু করতে যেতে যেতে শুনল বাবা ও
মেয়ের কথা। তবে চোখ তুলে তাকালেন না
সেদিকে। তাকালেই চোখের পানি লুকানো মুশকিল

হয়ে যেতো যে। তারপর সকলে একে একে ইফতার করতে বসে খেয়াল করল শুদ্ধ নেই। কল দিলেও ধরল না সে। হঠাৎ না বলে কোথায় গেল?

তাকে নিয়ে সবার মাঝে একটু চিন্তাও কাজ করছিল তখন শুদ্ধ ফিরল।

হাতের ইয়া বড় ব্যাগটা রেখে ওর মাকে হাতে ধরিয়ে দিলো। ভারী বড় সড় ব্যাগটা ধরে সিঁতারা বললেন, -‘এতে কি আছে বাপ? এত ভারী কেন ব্যাগটা?’

শুদ্ধ সেকথার জবাব দিলো না। শখ আর স্বর্ণকে উদ্দেশ্যে করে ভারী গলায় বলল,-‘ বাহারি রকমের যত যা ইফতার আছে সব সরা।’

শখ ভাইয়ের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে তার মায়ের দিকে তাকাল।

তাকে সরাতে না দেখে শুদ্ধ জোরে একটা ধমক দিলো। সে এত জোরে ধমক দিয়ে শীতলও চমকে উঠেছে। সে বিষয় নিয়ে তাকিয়ে দেখছে সামনের বিশুদ্ধ পুরুষটাকে। ভাইয়ের ধমক শুনে শখ এবার সাহস নিয়ে

আমতা আমতা করে বলল,

-‘ই ইফতার করব না ভাইয়া?’

-‘কর । তবে শুধু ছোলা দিয়ে কর ।’

ছেলের ত্যাড়ামিতে শারফাত চৌধুরী এবার প্রচণ্ড
বিরক্ত মুখ খুললেন,

-‘এতকিছু থাকতে শুধু ছোলা দিয়ে ইফতার করবে
কেন?’বাবার কথায় শুদ্ধ সিমিনের দিকে একবার
তাকিয়ে ঘুরে বাবার দিকে তাকাল। তারপর ঠান্ডা
স্বরে বলল,

-‘সামান্য ছোলা নিয়ে যখন এত কান্ড ঘটে গেল
তারমানে বুঝতে হবে এ ছোলা মহামূল্যবান কিছু।
একদিন ছোলা না খেলে মানুষ মারা যেতেও পারে।
এ পাপ কি আর জেনেশুনে করা যায়? তাই ইফতার
আজ ছোলা দিয়েই হবে।’-‘এতকিছু থাকতে শুধু
ছোলা দিয়ে ইফতার করবে কেন?’

বাবার কথায় শুদ্ধ সিমিনের দিকে একবার তাকিয়ে
ঘুরে বাবার দিকে তাকাল। তারপর ঠান্ডা স্বরে বলল,

-‘সামান্য ছোলা নিয়ে যখন এত কান্ড ঘটে গেল
তারমানে বুঝতে হবে এ ছোলা মহামূল্যবান কিছু।
একদিন ছোলা না খেলে মানুষ মারা যেতেও পারে।
এ পাপ কি আর জেনেশুনে করা যায়? তাই ইফতার
আজ ছোলা দিয়েই হবে।’

একথা বলে নিজেই সব সরাতে গেলে সিঁতারা এসে
ছেলেকে থামালেন।

শুদ্ধ হাত থেকে সেসব কেড়ে টেবিলে রেখে
ছেলেকে বসালেন চেয়ারে। তারপর পাশে দাঁড়িয়ে
ওর মাথায়, পিঠে হাত বুলিয়ে শান্ত হতে
বললেন,-‘ইচ্ছে করে মারে নি অসাবধানে লেগে
গেছে।’

-‘ওকে ফাইন তাহলে রক্তাক্ত হলো কেন?’

-‘মা মেয়েকে শাসন করবে না?’

-‘বারণ করলাম কখন? এর আগেও ছোটো আম্মু
নানান কারণে মেরেছে কিছু বলেছি কখনো? কিন্তু
মারেরও একটা সিস্টেম থাকা লাগে। আমিও তো
কতবার মারি রক্তাক্ত হয় কি? এতটা রক্ত ঝরেছে
কখনো?’

-‘ঠিক আছে তোর বোনকে আর কেউ মারবে না
এভাবে। শান্ত হ বাপ।’

শুদ্ধ শান্ত হলো না বরং পুনরায় সিমিনের উদ্দেশ্যে
বলল,-‘আমাদের বাড়িতে সাম্য, সৃজন, শীতল এরা
চঞ্চল এই কথা তো কারো অজানা নয়। তারা ছোটো
থেকেই দুরন্ত। তারমধ্যে এখন দু’জন গুরুতর

অসুস্থ। তাদের অসুস্থতা আমাদের বাড়িটাকে মিইয়ে
দিয়েছে। আগের মতো বাড়িতে প্রানবন্ত ভাবটা নেই।
খুনশুটির মুহূর্ত নেই। গত কয়েকটা দিন ধরে
মনেপ্রাণে চেয়ে যাচ্ছি কবে সব ঠিকঠাক হবে। কবে
আমাদের বাড়িটা আবার প্রাণ ফিরে পাবে। কিন্তু
এরমধ্যেই সামান্য একটা কারণে আরেকজনকে মেরে
রক্তাক্ত করলে। খুব দরকার ছিল? যেভাবে মারলে
এতে যদি ওর শ্বাস আঁটকে যেতো? তোমার আরো
ভালো করে জানা যে ও কাঁদতে পারে না। তাছাড়া
সারাদিন রোজা আছে। কিছুদিন আগে সে রক্ত
দিয়েছে। এমন তো নয় ইচ্ছে করে ছোলা ফেলেছে।
তাহলে এভাবে মারার দরকার ছিল কী? হ্যাঁ মানছি,
তোমার মেয়ে। শাষণ করবে তুমি। সেই রাইট
অবশ্যই তোমার আছে কিন্তু এভাবে কেন? রক্তাক্ত
হবে কেন? সে নাহয় অবুজ তুমি তো তা নও ছোটো
আম্মু? একবার তাকিয়ে দেখো ঠোঁটটা কিভাবে
কেঁটেছে। এখন খাবে কিভাবে?’শুদ্ধর কথা শুনে
সিমিন মুখ ভোঁতা করে তাকিয়ে আছে মেয়ের দিকে।
পাজিটা মাকে নাস্তাবুদ হতে দেখে মিটিমিটি হাসছে।
কতবড় ফাজিল!

তবে হাসলে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। ঠোঁটের একপাশ অনেকটাই ফুলে কালচে রক্ত জমে আছে। প্রচণ্ড ব্যথা হবে। তখন উনিও সুযোগ বুঝে অভিযোগ দিলেন,
-‘মারাটাই চোখে দেখলি কেন মারলাম দেখলি না? ও সপ্তাহ খানিকের মধ্যে বই হাতে নিয়েছে কী না একবার জিজ্ঞাসা কর। বাড়িতে পড়তে বসে না, কোচিংয়ে যায় না, কিয়ারাকে অবধি ডাকতে আসতে বারণ করেছে। সারাটা দিন খালি টইটই করে ঘুরা, গাছে উঠে পাখি দেখা, ফল পাকড় পাড়া এসবই করে বেড়ায় সে। ডাক্তার দেখিয়ে মেডিসিন গুলো যে এনে দিলি হাত দিয়ে ছুঁয়েছে নাকি জিজ্ঞাসা কর। এখনই জিজ্ঞাসা কর।’

মায়ের অভিযোগ শুনে শীতলের মুখটা লটকে গেল।
একটা অভিযোগও

মিথ্যা নয়। সিমিন তখন আরো বললেন,
-‘এগুলো নাহয় বাদই দিলাম। কিন্তু আমার মন বলছে ও আবার কোনো কান্ড ঘটাবে। ওই আঠাখোরের মতো আবার কাউকে...!’ ভাসুরের সামনে সিমিন আর পুরো কথা শেষ করতে পারলেন না। তার আগেই থেমে গেলেন। তবে সকলে বুঝল উনার

কথার অর্থ তাই সকলের দৃষ্টি শীতলের দিকে। শীতল
নিজেও হতবাক। হতভম্ব চোখে তাকিয়ে আছে মায়ের
দিকে। প্রেম না করেই প্রেমের অপবাদ মানা যায়?
তখন সায়ন সিমিনের কথা ধরল,

-‘তোমার কেন মনে হলো ও প্রেম করছে?’

-‘ ওর রুমে ময়লা কাপড় আনতে গিয়ে দেখি ময়লার
ঝুড়িতে দলামলা পাকানো এক ঝুঁড়ি কাগজ। এগুলো
কিসের কাগজ? এত কেন? কীসব ভেবে একটা
কাগজ খুলে দেখি সেখানে লেখা, ‘আমার মুডি
সাইটেশ।’ সাইটেশ কি বা কে একমাত্র আল্লাহ মাবুদ
জানে।’

মায়ের কথা শুনে শীতল মাথা নিচু করে মুখ গলার
সাথে মিলিয়ে নিলো।

ইশ! এভাবে ফাঁস হয়ে যাবে কে জানত। কাগজগুলো
পুড়িয়ে ফেললেই

হতো এখন না জানিনা এই কাগজের জন্য বাঁশ খেতে
হয়। যদি সত্যিই বাঁশ খেতে তাহলে চোখ বন্ধ করে
শুদ্ধ নাম বলে দিবে। মার এমনিতেও খেতে হবে
ওমনিতেও খেতে হবে। সেদিন বিশুদ্ধ পুরুষ তাকে
চেয়ে নিতে বলল না? আজ ধরা খেলে বড় আবু না

বড় মাকেও বলবে, ‘ তোমাদের ছোটো পুত্রের নববধূ
হওয়ার টোকেনটা আমাকেই দাও বড় আব্বু।’ওদিকে
সায়ন আর রুবাব পারছে না হেসে গড়াগড়ি খেতে।
সায়ন বসে থেকেই শুদ্ধকে পা দিয়ে খোঁচাচ্ছে। ইঙ্গিত
দিচ্ছে কিছু একটার। এদিকে শুদ্ধ নিশ্চুপ। বাকিরাও
চুপ থেকে শীতলের থেকে জবাবের অপেক্ষায়।
সিমিনের কথা শুনে শারফাত চৌধুরী এবার গলা
খাঁকারি দিলেন। উনি কথা বলবেন বুঝে বাকিরা
নিজেদের কৌতুহল দমিয়ে রাখলেন। এরপর
উনি স্বভাবসুলভ গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন,

-‘এসব কি শুনছি মা?’

-‘না মানে বড় আব্বু..!’

-‘তোমার মা যা বলছে তা কী সত্যি?’

সবাইকে এড়িয়ে গেলেও বড় আব্বুকে উপেক্ষা
করতে পারে না শীতল। তাই আঙ্গুল মুচড়াতে
মুচড়াতে আমতা আমতা করে জবাব দিলো,

-‘সাইটেশ কোনো আঠাখোর বা রাস্তার টোকাই না
বড় আব্বু। সে আমার দেখা সুপার জেন্টেলম্যান।
আমি তাকে পছন্দ করি। সুযোগ পেলে বিয়ে করে
বিদেশ চলে যাব।’

শীতলের কথা শুনে সবার চোখ বড় বড় হয়ে গেল।
বলে কী এই মেয়ে?

মাথা টাথা পুরোটাই গেছে নাকি? তবে শীতলের কথা
শুনে শারায়াত চৌধুরী রাগলেন না। বরং ঠান্ডা স্বরে
কথা চালিয়ে গেলেন,-‘তা কে সেই জেন্টেলম্যান? কি
করে, বাসা কোথায়? ‘সাইটেশ’ এটা তার পদবি নাকি
পেশা?’

-‘সাইটেশ তার পদবী। আসলে সে তামিল মুন্ডির
হিরো। আমাদের শুদ্ধ ভাইয়ের মতোই নামকরা
সাইন্টিস্টও। দেখতে পুরাই জেন্টেলম্যান। নাম পিউর
ক্যারেঙ্টা সাইটেশ। সায়েন,রুবাব ভাইও চিনে। ভাইয়া
তোমরা কিছু বলো?’

শীতলের কথা শুনে সায়েন আর রুবাবের হাসি ভস
করে মিলিয়ে গেল। নিচে থেকে শুদ্ধকে খোঁচানো
সায়নের পা টা ও থেমে গেল। তারা একে অপরের
দিকে তাকিয়ে বোকা বোকা হেসে বলল,

-‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছেলে দেখতে শুনতে ভালোই মানাবে
ওদের।’

এবার সাফওয়ান চৌধুরী বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন,

-‘ তোরা মুন্ডির হিরোর কথা বলছিস? কী কান্ড বল দেখি! কোথায় আমি ভাবলাম সত্যি টাতি বোধহয়।’
একথা বলে তিনি হো হো করে হেসে ফেললেন।
সিতারাও ফিক করে হেসে বললেন,

-‘আমিও তো সত্যিই ভেবেছি।’ বড় মা ও মেজো চাচ্চুর কথা শুনে শীতল খিলখিল করে হেসে উঠল।
তার হাসি দেখে সকলে বোকা বনে গিয়ে নিজেরাও হাসলেন। মেয়েটা পারেও বটে! এদিকে এতক্ষণ সাইন আর রুবার যেন শ্বাসটা আঁটকে রেখেছিল।
ভেবেছিল আজকে বোধহয় সত্যিটা ফাঁস হয়েই যাবে।
কিন্তু এই মেয়েটা

আবার পাল্টি খেলো। আর পাল্টি খেয়ে করল কি?
সাইন্টিস্টকে বানিয়ে দিলো সাইটেশ। আর শুদ্ধ নামের জান খেয়ে নাম দিয়ে দিলো ক্যারেঙ্টা। যদিও পিউর বা ক্যারেঙ্ট মানেই শুদ্ধ। শীতল কথা শেষ করে আড়চোখে শুদ্ধর তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। ভ্রুঁ কুঁচকে তাকিয়ে আছে বিশুদ্ধ পুরুষ। হয়তো ভাবছে তার পাশে বসে তারই নাম বদলে তাকেই সুঁড়সুড়ি দিচ্ছে। এর আগে শুদ্ধ অভিযোগ করেছে যে মেয়ে কারো সামনে তাকে চেয়ে নিতে পারবে না সেই

মেয়েকে সে বিয়েই করবে না। এজন্য সাহেব কত রাগ দেখিয়েছিল। কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিল। তার রুমেও যেতে দেয় নি। আজ দেখ বলতে পারবে না কী না। যদিও এটা ছোট রিভেঞ্জ! যখন ফাইনাল মোমেন্টে আসবে তখনো স্ব-গৌরবে বড় আব্বুর কাছে চেয়ে নেবে। বুঝে নেবেই নেবে বিশুদ্ধ পুরুষটাকে। সে কী ভেবেছে? তার করা পাগলামির পরিমান একটু বেশি বলে এটাও পাগলামি? না, মোটেও না!

এদিকে এখনো মেয়ের বাদরামী বন্ধ হয় নি দেখে সিমিন ফুঁসে উঠলেন। কটমট করে তাকিয়ে শুদ্ধকে অভিযোগ করলেন,-‘শুনলি, শুনলি, বেয়াদবটার কথা? ও কী এমনি এমনি মার খায়?’

শীতলের ইঙ্গিত বা কথার ধাঁচে শুদ্ধ রাগ হঠাৎ উধাও। কী বলবে নিজেই বুঝে উঠতে পারছে না। তবে সায়ন আর রুবাবোর মুখ দেখে কেন জানি ভীষণ হাসি পেল। হাসলে মেইন টার্গেট মিস হয়ে যাবে তাই মুখটা যথেষ্ট থমথমে করে রাখল। আর সিমিন এতকিছুর পরও মেয়ের করা বাদরামী কমছে না দেখে অব্বারে কাঁদতে লাগলেন। আপাতত প্রসঙ্গ পাল্টানো খুব দরকার। তাই সে থমথমে মুখে বলল,

-‘ আজ থেকে বাড়ির ছোটোরা লাখ টাকার জিনিসও যদি নষ্ট করে কেউ কিছু বলবে না। বলবে না বলবেই না, মারধর তো দূর। যার যা ক্ষতি হবে ক্ষতিপূরণ আমি দেবো। তারপরও যেন এই ঘটনা পুনরাবৃত্তি না হয়।’

এইটুকু বলে ঘাড় বাঁকিয়ে শীতলের দিকে একবার তাকাল। পাজি মেয়ে কাঁটা ঠোঁটে এখনো হাসছে মুচকি মুচকি হাসছে। তাকে এভাবে হাসতে দেখে শুদ্ধ ধমকে উঠল। হঠাৎ ধমকে ওঠায় শীতল চমকে উঠে বলল,-‘ হিরোকে ভালো আমি কি করব?’

-‘এক থাপ্পড়ে সব দাঁত ফেলে দেবো বেয়াদব। কোথায় কী বলতে হয় তাও জানিস না?’

-‘ আশ্চর্য তো! এইতো সেদিনই তো কিছু বললাম না চুপ ছিলাম বলেই কত ধমকালেন। বকলেন। অথচ আজকে বলছি বলেও ধমকাচ্ছেন।’

-‘এত কথা শুনতে চাই নি। আগামীকাল থেকে সকাল, সন্ধ্যা, দুই বেলা আমার কাছে পড়তে বসবি।’
একটা শুনে শীতল আঁতকে উঠল। মাকে দেওয়া বাঁশ তার দিতে ঘুরলো কীভাবে? এতক্ষণ ভালোই তো চলছিল এরমধ্যে পড়াশোনা এন্টি নিলো

কোন ফাঁক দিয়ে? তার উপরে শুদ্ধ ভাইয়ের কাছে
নাকি পড়তে হবে। এ হতে দেওয়া যাবে না। শুদ্ধ
ভাই তুখর স্টুডেন্ট তার পড়ানোর ধাঁচ কেমন হবে
ধারণা আছে। এত এত পড়া দেয়। হাতের লেখা
একটু খারাপ বলে অপমান করে। পড়া না মারলে
কান ধরে দাঁড় করিয়ে রাখে নতুবা মারে। না সে
কিছুতেই পড়বে না। নয়তো এই লোক পূর্বের যত
রাগ জমে আছে পড়ানোর নাম করে সব রাগ তুলবে।
একথা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে কিছু বলতে গেলে ঠোঁটে
টান খেলো। ব্যথা পেয়ে দুই হাতে ঠোঁটে চেপে ধরে
অস্পষ্ট সুরে বলল,-‘না শুদ্ধ ভাই তা না হয় না।
তাছাড়া আপনি এত বিজি মানুষ আপনাকে এত কষ্ট
করতে হবে না।’

-‘আমার ব্যস্ততা নাই আমি বুঝে নেবো। আর হ্যাঁ,
আগামীকাল থেকে

তোরা তিনবোন একা কোথাও যাবি না। শখ, স্বর্ণ
কথাটা স্মরনে রাখিস। প্রয়োজনে রুবাব দিয়ে আসবে
নিয়ে আসবে। আমার কথা নচচড় হলে এক একটা
আমি নিজে শায়েস্তা করব।’

হঠাৎ এমন কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করার কারণ বুঝল না কেউই। তবে মুখ ফুটে কিছু বলার সাহস করল না। সায়নের সাথে শুদ্ধর চোখাচোখি হলে সায়নের ঠোঁটের কোণের মৃদু হাসির দেখা দিলো। কী সুন্দর করে এক টিলে চারপাখি মেরে দিলো। সিমিনকে বাঁশ দিলো, শীতলকে একা পড়ানোর ব্যবস্থা করে ফেলল, ভাইদেরকে আঁছিলা বাঁশ খাওয়া দেখল, এবং এই সুযোগে শখ, স্বর্ণের সেপটির কথা ভেবে স্বয়ং রুবাবের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে দিলো। শুদ্ধ যখন নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তখন সবাই বিনাবাক্যে মেনে নেবে। কিন্তু তার বাঘিনী কি মানবে? সে দিনের বেলা সেফটি নিয়ে চললেও রাতের বেলা মানবে না। এটা তো আরেক জাতের ঘাড়ত্যাড়া। অতঃপর এসব কথা বাদ দিয়ে সবাই হইহই করে ইফতার করল। ভাই ও বোনদের পছন্দের আলুর চপ নিয়ে কাড়াকাড়ি হলো। হাসাহাসি হলো। গল্পে গল্পে একটু আগের সব রাগ বাগ মিটে গেল।

পরেরদিন সকাল থেকে সত্যি সত্যিই শুদ্ধর কাছে পড়তে আসতে হলো। ভেবেছিল কোনো বাহানা

দেখিয়ে ব্যাপারটা ঘেঁচে দেবে। কিন্তু না স্বয়ং তার জননী ঘুম থেকে টেনে তুলে তাকে পড়তে পাঠিয়েছে। সঙ্গে শুদ্ধর হাতে মোটা একটা চ্যালাকাঠ তুলে দিয়ে বলে গেছে, ‘মাংস তোর হাড়ি আমার। কখন কী পড়ালি দেখতে আসব না আমি শুধু রেজাল্ট দেখব।’

একথা বলে উনি বিদায় নিতেই শুদ্ধ তাকে চ্যালাকাঠ দেখিয়ে বলেছে।

-‘এটাকে সালাম। আজ থেকে এটাই তো শিক্ষাগুরু। এর যা দাপট সেটা তোর সেনাবাহিনী বাপেরও নেই। এবার বই বের কর।’ মুখ লটকে শীতল বই বের করলে শুদ্ধ তাকে পড়িয়েছে। বারবার একটা পড়া বুঝিয়েছে। শীতল বলেছে বুঝেছে। কিন্তু সেটা যখন তাকে করতে দিয়েছে তখনই বেঁধেছে ঝামেলা ফলে কপালে ঝুটল চ্যালাকাঠে বারি।

এভাবেই রোজ শুদ্ধর কাছে না চাইতেও পড়তে বসতে হলো শীতলের।

কখনো পেট ব্যথা, মাথা ব্যথা, চোখ ব্যথা, বলে কত কী অজুহাত সৃষ্টি করলেও ছাড় পায় নি। এভাবেই দিন দিন শীতলের পড়ার চাপ বাড়ল।

নিত্যদিনের সাথী হলো মার, ধমক। তবে শুদ্ধ যখন
তাকে কিছু বুঝাতে
একমনে কিছু লিখত তখন সে ডাবডাব করে
তাকিয়ে থাকত। একবার দেখত শুদ্ধর হাতের সুন্দর
লেখা, আরেকবার দেখত সুন্দর মানুষটাকে। মনে মনে
কত কী বলত। মুখ টিপে হাসত। শুদ্ধও বুঝত তবে
কিছু বলত না। কী বলবে? শীতলকে ওর কাছাকাছি
রাখার জন্যই তো পড়ার কথা বলেছিল। নয়তো
রিসার্চের কাজ ছেড়ে পড়ানোর সময় কোথায় তার?
আর এ কাজ করার কারণ ভালোবাসা সৃষ্টি একমাত্র
ওষুধ ভালোবাসার মানুষটার খুব কাছাকাছি থাকা।
একা সময় কাটানো। পড়ানোর ফাঁকে একটু গল্প।
মারলে গাল ফুলিয়ে থাকলে একটু প্রশ্রয় দেওয়া।
পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে দুচোখ ভরে দেখা। মন ভরে
শরীরের সুভাষ টেনে নেওয়া। কলম নেওয়া ছুঁতোয়
ছুঁয়ে দেওয়া। মাঝে মাঝে তার খিলখিল করা হাসি
দেখে বুকের তোলপাড় ঝড়টা বহুকষ্টে দমানো।
এগুলোই ভালোলাগার এক একটি অংশ। আর এর
থেকেই একটু একটু করে সৃষ্টি ভালোবাসার।

দেখতে দেখতে রোজা প্রায়ই শেষের পথে। সকলের কেনাকাটা এখনো বাকি। শুদ্ধর জরুরি কিছু কাজ থাকায় রুবাব, শারাবাত ও সাফওয়ান চৌধুরী মিলে একদিন ইফতারের পরে বাকিদের নিয়ে শপিংয়ে গেলেন।

সবাই সবার জন্য মিলেঝুলে মাঝরাত অবধি কেনাকাটা সারল। পরদিন বাড়ির মেয়েরা টেইলার্সে ড্রেস বানাতে দিয়ে এলো। সপ্তাহখানিক পরেই সিঁতারা, সিমিন টুকটাক কেনাকাটা করতে গিয়ে মেয়েদের ড্রেসও নিয়ে এলেন। যার যার ড্রেস তাকে বুঝিয়ে দিলেন। শীতল পরে দেখবে ভেবেড্রেসটা রেখে দিয়েছিল। সারাদিন রোজা থেকে ইফতার সেরে রুমে এসে শুতেই চোখ গেল শপিং ব্যাগটার দিকে। দ্রুত উঠে আনন্দে ঝুমঝুম করে ইদের ড্রেস টা হাত নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখতেই মন টা খারাপ হয়ে গেল। ড্রেস মনমতো না হওয়ায় কান্না পেল এবং রুমে বসে সে কাঁদতে থাকল।

আজকে ইফতার পার্টি থাকায় ফ্রেন্ডদের সাথেই ইফতার সেরেছে শুদ্ধ। ফ্রেন্ডদের সাথে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে গিয়েছিল তার ল্যাবে। সেখানে কিছু কাজ

সেরে রাত সাড়ে দশটার দিকে বাড়ি ফিরল। বাড়ির মেয়েরা তখন কিছু একটা নিয়ে খুব হাসাহাসি করছিল। ক্লান্ত বিধায় সেদিকে না গিয়ে সোজা রুমে চলে গেছে। সময় নিয়ে শাওয়ার নিয়ে বের হতেই ওর ফোনের রিংটোন বেজে উঠল। ডিসপ্লিতে সাওয়ান চৌধুরীর নাম দেখে

কলটা রিসিভ করল। ড্রেসিংটেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ভেজা চুল মুছতে মুছতে শুনল, আজ সিরাতের মেডিসিন আনতে হবে। না আনলে রাতে মেডিসিন মিস হয়ে যাবে। এদিকে উনি মিটিংয়ে আঁটকে গেছেন এজন্য শুদ্ধকে আনার কথা বললেন। অগত্যা শুদ্ধ পুনরায় রেডি হয়ে রুম বের হতেই শীতলের কান্নার শব্দ শুনে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। এইতো কিছুক্ষন আগেও দাঁত বের হাসছিল। এখন আবার কি হলো? আবার মার খেলো নাকি? একথা ভেবেই সে রুমের দরজায় নক করলে শীতল চোখ তুলে তাকাল। সকল আবদার মেটানোর মানুষটাকে দেখে ঠোঁট ভেঙ্গে কেঁদে অসহায় কণ্ঠে বলল,-‘শুদ্ধ ভাই সর্বনাশ হয়ে গেছে।’

শীতলের করুণ আৰ্তনাদ শুনে শুদ্ধ ভেতরে প্রবেশ
করল। গুরুতর কিছু হয়েছে ভেবে জিজ্ঞাসা করল,
-‘কি হয়েছে?’

-‘আমার ইহজীবনের হাসি-খুশি সব ধূলোয় মিশে
গেছে।’

-‘অযথা না বকে ঝেড়ে কাশ।’

-‘টেইলার্সে ইদের ড্রেস বানাতে দিয়েছিলাম ওই
হারামজাদা সালোয়ারে ইলাস্টিক না দিয়ে বেল্ট
দিয়েছে। বেল্টের সালোয়ার পরতে পারি না আমি।
ঘন্টায় ঘন্টায় গিটু বেঁধে যায়। এর আগের সালোয়ারে
খালি গিটু বেঁধে যাওয়ায় ওয়াশরুমে কাটা একটা
কম্প্যাস রেখেছিলাম। যতদিন ওই সালোয়ার পরেছি
ততদিন কাটা কম্প্যাসটাকে সাথে সাথে রাখতে
হয়েছিল।’-‘তা গিটুর সাথে কাটা কম্প্যাসের কি
সম্পর্ক?’

একথা শুনে শীতল ঢোক গিলে নাক টানতে টানতে
জবাব দিলো,

-‘কারণ কাটা কম্প্যাস দিয়ে গিটু খুলতে সুবিধা হয়।
কিন্তু আমি এবার ওসব আপদ সহ্য করতে পারব না।
আমি নেবোই না এই সালোয়ার।’

শুদ্ধ দুই আঙ্গুলে কপাল ডলে দীর্ঘশ্বাস চাপল। এজন্য মরাকান্না কাঁদতে হবে? সে শীতলের কান্নারত মুখের দিকে একবার তাকিয়ে হাতে থাকা সালোয়ারের দিকে তাকাল। তারপর ইশারা করে বলল,

-‘এটা ঠিক হবে না আর?’

-‘হবে। কিন্তু আম্মু বলেছে এটাই পরতে হবে। টেইলার্সে অনেক ভিড় পরে ঠিক করে এনে দেবে।’-‘ঠিকই তো বলেছে।’

-‘মনমতো ড্রেস না পারলে ইদ হয় নাকি? এটা যদি ঠিক না হয় এই ইদে কোনো ড্রেসই পরব না বলে দিলাম।’

-‘তোর কী একটাই ড্রেস যে কাঁদতে বসেছিস?’

-‘একটা না সব মিলিয়ে পাঁচটা। তবে পাঁচটা ড্রেস কবে কখন পরব প্ল্যান করেও ফেলেছি। এখন এটা মনমতো নাহলে সব প্ল্যান ভেঙে দিতে হবে।’

একথা বলে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে পুনরায় কেঁদে ফেলল সে। তাকে এভাবে কাঁদতে দেখে শুদ্ধ বলল,

-‘টেইলরকে দিলে এটার সমাধান হবে, তাই তো?’

-‘হুম।’

-‘ঠিক আছে রেডি হয়ে নিচে আয়।’

-‘আচ্ছা।’

শীতল ঘাড় কাত করে দুইহাতে চোখ মুছে রেডি হতে গেল। শুদ্ধ বিরবির করতে করতে সিরাতের থেকে প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে গেল পাকিং লটে। ওর বাইকটা বের করে বাইকের উপর বসতেই শীতল শপিং ব্যাগ হাতে বেরিয়ে এলো। আজকে হিজাব পরে নি তবে মাথায় ওড়না টানা। পরনে সাদা রঙ্গের থ্রিপিচ। শুদ্ধ তাকে আপাদমস্তক দেখে বসতে ইশারা করলে উঠে বসল। কাঁধে হাত রাখল। তারপর বাইক স্টার্ট করে বেরিয়ে গেল শীতলের বিরাট সমস্যার সমাধান খুঁজতে। এদিকে শুদ্ধরা যেতেই সাইন স্বর্ণের অন্ধকার রুমের লাইটটা জ্বালাল।

তারপর পুনরায় এগিয়ে এসে স্বর্ণের কোমর জড়িয়ে ধরে কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। স্বর্ণ সাইনের মাথার চুল টেনে দিতে দিতে লেপটপে কিছু একটা করছে। সাইনের কেন জানি সেটা পছন্দ হলো না। সে চট করে চিৎ হয়ে শুয়ে স্বর্ণের মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিলো। মুগ্ধ নয়নে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল,

-‘বারণ করেছিলি বলেই তো দূরে ছিলাম হঠাৎ
জরুরি তলব কেন?’

-‘মিস করছিলাম।’

-‘আমাকে নাকি আমার স্পর্শকে?’

-‘দুটোই।’

-‘তাহলে বিয়ের কথা বাসায় জানাই?’

-‘আপুর অনুষ্ঠানের পর এমনিতেই আমাদের পালা।
তখন জানিও আর বাঁধা দেবো না।’

সায়ন কিছুক্ষণ স্বর্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে ভ্রুঁজোড়া
কুঁচকে নিলো। এরপর কিছু একটা ভেবে বলল,

-‘কোন খা’ন’কি’র বাচ্চার...!’ স্বর্ণ সায়নের মুখ চেপে
ধরে কথা থামিয়ে দিতেই দরজার ওপাশ থেকে
সিমিন বন্ধ দরজায় টোকা দিয়ে বলল,

-‘স্বর্ণ? এ্যাই স্বর্ণ? ঘুমিয়েছিস মা?’

ছোটো মায়ের কথা শুনে সায়ন চট করে উঠে স্বর্ণের
ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট আঁকড়ে ধরল। মুহূর্তের মাঝেই
জোকের মতো চুষে নিতে থাকল স্বর্ণের ঠোঁট। স্বর্ণ
শব্দ ছাড়াই নিজেকে ছাড়াতে চাইল সায়ন যেন আরো
জোরে আঁকড়ে ধরল। তার অবাধ্য হাতজোড়া স্বর্ণের
কামিজের ফালিতে হাত রাখতেই স্বর্ণ তার হাত

খাপচে ধরল। বাঁধা পেয়ে সায়ন ঠোঁট ছেড়ে কানে
কানে বলল,

-‘আমাকে এতদিন কাছে আসতে দিস নি। ঠিক
কতটা ছটফট করেছি জানিস? পানিশমেন্ট জমা
আছে।’

-‘আম্মু এসেছে। কি বলে দেখি তারপর পানিশমেন্ট
যা দেবে মাথা পেতে নেবো।’

-‘প্রমিস?’

-‘প্রমিস।’ একথা শুনে সায়ন স্বর্ণের অঙ্ককার
বেলকনিতে চলে গেল। ঠোঁটে তার ফিচেল হাসি।
এদিকে স্বর্ণ ওড়নায় মুখ মুছে খোলা চুল বাঁধতে
বাঁধতে দরজা খুলল। বলল,

-‘ওয়াশরুমে ছিলাম তাই দেরি হলো, এসো রুমে
এসো।’

-‘তোরা বাবা তোকে ফোন করছে ধরছিস না কেন?
কী বলে শুনতো মা।’

-‘ফোন ভাইব্রেশন করা। ওয়াশরুমে থাকায়
ভাইব্রেটও শুনতে পাই নি।

আচ্ছা দেখছি। ‘

একথা বলে শাহাদত চৌধুরী কল দিতেই ডিসপ্লেতে
ভেসে উঠল বাবার মুখ। সে সালাম দিলো।
বিনয়ীভাবে কুশল বিনিময় করল। সে বরাবরই কম
কথা বলে বিধায় কী বলবে খুঁজে পেল না। তখন
শাহাদত চৌধুরী একটা বিয়ের প্রস্তাবের ব্যাপারে
জানালেন। একটা ছেলেকে দেখালেন। ছেলেটা
ভলিবল খেলছে। সেনাবাহিনী বিধায় শারীরিক গঠন
ফিটফাট। ছেলের নাম মুস্তাকিম। চমৎকার একটা
ছেলে। ডিপার্টমেন্ট তার সাহসী কাজের কথা মুখে
মুখে আলোচিত। তার বাবা মেজর আনিসুল হক।
তিনি স্বর্ণ আর মুস্তাকিমের বিয়ের প্রস্তাব রেখেছেন।
মুস্তাকিমকে উনার ভীষণ পছন্দ। এখন স্বর্ণ পজেটিভ
ইঙ্গিত দেয় তাহলেই কথা এগোবেন।

স্বর্ণ বাবার কথা শুনে একবার তাকাল বেলকনির
দিকে। এসব শুনে ওই পাগলটা বেরিয়ে না আসে।
মেয়েকে চুপ থাকতে দেখে শাহাদত চৌধুরী
বললেন,,-‘ নিজের পছন্দ থাকলেও জানাতে পারো
মা। আমি তোমার পছন্দকেও সমান গুরুত্ব দেবো।
এবার বলো দেখি আছে নাকি কেউ?’

স্বর্ণ বাবার মুখের দিকে একবার তাকাল। তারপর সরাসরি বলল,

-‘আছে। তবে আমাকে একটু সময় প্রয়োজন বাবা। কিছু জানাতে হলে সবার আগে আমি তোমাকেই জানাব, প্রমিস।’

শাহাদত চৌধুরী নীরবে শুধু হাসলেন। মৃদু মাথা নাড়িয়ে সম্মতি প্রকাশ করলেন। মুস্তাকিমকে ভীষণ পছন্দ বিধায় হাত ছাড়া করতেও নারাজ উনি। তাই বললেন,

-‘তাহলে শীতল..!’

শীতলের নামটা উঠতেই বুদ্ধিমান স্বর্ণ উনাকে বলল,

-‘শীতল এখনো অনেক ছোটো বাবা। হাত-পায়ে বড় হলেও বড্ড অবুজ। আমার মতে এখনই ওকে এসবের মধ্যে জড়ানো ঠিক হবে না। কয়েক বছর যাক তখন নাই..।’

এবারও শাহাদত চৌধুরী মেয়ের কথায় সম্মতি জানিয়ে কল কাটলেন। সিমিন মেয়ে ও স্বামীর কথা শুনলেও আগ বাড়িয়ে কোনো মন্তব্য করেন নি। কারণ উনি জানেন স্বর্ণ বুঝদার। যা সিধান্ত নেবে জেনেবুঝে নেবে।

অন্তত আরেকটার মতো লাফাতে লাফাতে গিয়ে
শুকনো মাটিতে মুখ খুবকে পড়বে না। তারপর উনি
নিচে যেতে স্বর্ণ দ্রুত দরজা আঁটকে ঘুরে দাঁড়াতেই
সায়ন তাকে দেওয়ালের সাথে চেপে ধরে হিসহিসিয়ে
বলল,

-‘ছেলেটা কেমন? করবি বিয়ে?’স্বর্ণ সায়নের হাতটা
গলা থেকে সরিয়ে নিজেই রাগান্বিত সায়নের গলা
জড়িয়ে ধরল। তারপর মুচকি হেসে বলল,

-‘আমার শাহরিয়ার সায়ন কি কম যে অন্যকে বিয়ের
কথা ভাবতে হবে আমার?’

একথা সায়নের কানে পৌঁছাতেই রাগ গলে জল হয়ে
গেল। স্বর্ণকে ঠেলে দেওয়ালে ঠেকিয়ে গ্রাবীয় নাক
ঘঁষতে ঘঁষতে বলল,-‘শখের অনুষ্ঠান হওয়ার এক
সপ্তাহের মধ্যে তোকে আমার ঘরে তুলব। জান,
বিশ্বাস কর সত্যিই অধৈর্য্য হয়ে গেছি। আজকাল কষ্ট
হয় নিজেকে সামলে নিতে। তোকে দেখলেই অবাধ্য
মন বলে তোর মাঝে ডুব দিতে।’

স্বর্ণ হাসল। তারপর সায়নের কপালের চুল সরিয়ে
আচমকা চুমু ঐঁকে বসল। এদিকে সায়ন হতভম্ব। সে
বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে। এ প্রথম স্বর্ণ নিজে

থেকে তাকে চুমু দিলো. তাও কপালে। কিন্তু এই মেয়েটা কী জানে তার কপালে দেওয়া ছোট একটি চুমু তার হৃদপিণ্ডে পৌঁছে গেছে।

কাছে না আসায় অভিমানে পূর্ণ উতপ্ত বুকটা একেবারে হিমশীতল হয়ে গেছে। আজ চাঁদ রাত। পুরো একটামাস সিয়াম সাধনার পর আগামীকাল ইদ উদযাপিত হবে সারাদেশে। দেখতে দেখতে চোখের পলকেই যেন কেটে গেল দিনগুলো। প্রতি বছর শারায়াত চৌধুরী সম্পদের হিসাব অনুযায়ী মোটা অংকের অর্থ যাকাত দেন। জামা-কাপড় বিতরণ করেন। বস্তির অসহায় মানুষদের সাহায্য করেন। মসজিদে মসজিদে ইফতার করান। মসজিদ তৈরি কিংবা মেরামতের কাজে টাকা দান করেন। এতিম দুস্ত বাচ্চাদের ইদ রঙ্গিন করতে নানান ব্যবস্থা করে থাকেন। এ বছরে বিপদ যেন পিছুই ছাড়ছে না। অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদের কারণে এই বছরে সেসব কাজ দেরিতে হলেও ভাই ও দুই ছেলেকে নিয়ে সেটা সম্পূর্ণও করেছেন। উনার একটা বিশেষ গুন উনি দানের কথা কখনোই কাউকে বলেন না।

কত দান করলেন। কাকে দিলেন। কেন দিলেন।
কীভাবে দিলেন। যা দেন সব নিজের মাঝে রাখেন।
শায়াফাত, সাফওয়ান, শাহাদত, সায়ন, শুদ্ধ, রুবাব,
এদের সবার আয়ের কিছু অংশ একত্রে বিরাট
এমাউন্ট আসে। তখন দু'হাত ভরে দান করা যায়।
যদিও ছেলেদেরকে কখনো দিতে বলে নি তারাই
নিজে থেকে দেয়। চৌধুরী বাড়ির সেফটির কথা
স্মরণে রেখে

জামা-কাপড় বিতরণের আয়োজন বাড়ির বাইরে
করেন। মজার ব্যাপার হলো ইদ সম্মুখে এলে বস্তি
এলাকায় ট্রাকভর্তি সামগ্রী নিয়ে যাওয়া হয়।

ইদের বাজার ও জামা-কাপড় তুলে দেওয়া হয় গরীব
মানুষদের মাঝে। দিনভর সেগুলো বিতরণ করা হয়।
তারা জানে না কে দেয়? যারা হাতে তুলে দেয়
তাদের জিজ্ঞাসা করলেও জবাব মিলে না। বলে না।
জোর করলে বলেন, 'যারা দেয় তারা দোয়া কুড়াতে
দেয়। আপনারা মন থেকে দোয়া করুন।' নরম মনের
সরল মানুষটা সেটাই করেন। আর প্রতি বছর এভাবে
আড়ালে থেকেই সাহায্য করে আসছেন চৌধুরী বাড়ির
পুরুষরা।

যাদের মাঝে শো অফ করার লেমমাত্র নেই।

চাঁদ রাত বিধায় ইফতারে পরপরই হই-ভুল্লোড়
বেঁধেছে চৌধুরী বাড়িতে। ছোটোরা কাড়াকাড়ি করে
খেয়েছে ইফতারের সব খাবার-দাবার। এত খাবার।
এত আইটেম। তবুও ভাই-বোনদের খাবার কেড়ে
খাওয়ার স্বাদ যেন অমৃত। সায়েন শীতলের আলুর চপ
কেড়ে খেয়ে নিয়েছে। এটা নিয়ে দু'জন ঘ্যানঘ্যান
করে কেবল থেমেছে। তারা থামতেই সাম্য শখের
হাতে থাকা খেঁজুর কেড়ে মুখে পুরে দিয়েছে। শখ
রাগী চোখে তাকাতেই দুট্টাটা খিলখিল করে হাসছে।
শখকে তারা কেউই ভয় পায় না। কারণ তাদের শখ
আপু কখনোই কাউকে বকে না। বরং মিষ্টি করে
কথা বলে। আদুরে সুরে 'এমন করে না সোনা ভাই।
ওটা কেন করলি পাখি? কী লাগবে, মন খারাপ কেন
আমার কলিজার ভাইজানের?' শখ সর্বদা এভাবেই
কথা বলে। কত কী বোঝায়। ভাই-বোনের আবদার
মিটাতে কত কিছু কিনে দেয় তাই বোনদের মধ্যে
শখ আপু বেস্ট। আর বোনদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ
শীতল। কারণ সে সবকিছুতে আগে ভাগে ভাগ
বসায়। ইফতার সেরে সব ভাই-বোনরা ছাদে উঠেছে

চাঁদ দেখতে। হইহই করে চাঁদ দেখে মাদুর পেতে বসেছে। সায়ন, শুদ্ধ, রুবাব, শখ, স্বর্ন, শীতল, সাম্য, সৃজন সব কটাই উপস্থিত এখানে। গল্প হচ্ছে। হাসাহাসি হচ্ছে। খুনশুটি মারধর হচ্ছে। রুবাব কখনো এটা ওটা বলে শীতলকে রাগাচ্ছে, কখনো সাম্য, সৃজনের পেছনে লাগছে। সায়নও তাদের সাথে মেতে আছে। আর শুদ্ধ রেলিংয়ে হেলান দিয়ে পকেটে দু'হাত গুঁজে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পাশের ছাদে। সেখানে কয়েকজন ছেলে আড্ডা দিচ্ছে। বারবার এদিকে তাকাচ্ছে। সে ব্যাপারটা খেয়াল করে এবার ফোনটা বের করে কাউকে ফোন করল,-‘শুদ্ধ বলছি।’

অসময়ে পাশের বাসার শুদ্ধ ভাইয়ের কল পেয়ে সৌরভ অবাকই হলো। সে সালাম দিয়ে কুশল বিনিময় করল। শুদ্ধ পুরুষালি গুরুগম্ভীর কণ্ঠে সালামের জবাব দিয়ে বলল,

-‘তোদের ছাদে ক’জন ছেলেকে দেখছি। দুই মিনিটের মধ্যে নিচে নামতে বলে।’

-‘কোনো সমস্যা ভাই? কিছু করেছে তারা?’

-‘না। তবে না নামলে কিছু হবে।’

-‘আচ্ছা আমি এম্মুণি নামতে বলছি।’ শুদ্ধ কল কাটতেই ছেলেগুলোর মধ্যে একজনের কাছে কল এলো। ওরা এদিকে একবার তাকিয়ে শুদ্ধকে সালাম দিয়ে নিচে নেমে গেল। এদিকে এতকিছু ঘটল বাকিদের কারোই খেয়াল নেই। তারা নিজেদের গালগল্লে ব্যস্ত। শুদ্ধ সেখানে দাঁড়িয়ে দেখছে চৌধুরী বাড়ির চাঁদের হাট। আনন্দে ঝুমঝুম করা প্রতিটা প্রাণ চৌধুরী বাড়ির হাট। তারা নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে আলো ছড়ায়। সুখ বিলায়। এজন্যই চৌধুরী বাড়িতে এত সুখ। এত আনন্দ। সবার মাঝে হঠাৎ তার চোখ গেল সাম্য, সৃজনের হাসিমাখা মুখের দিকে। মাত্র কয়েকটা দিন হয়েছে ব্যান্ডেজ খোলা হয়েছে। বাচ্চা দুটো যেন নতুন করে বেঁচে উঠেছে। আবারও তাদের মধ্যে ফিরে এসেছে চঞ্চলতা। যদিও আগের তুলনার খানিকটা সুস্থও বটে। তবে ওষুধ চলবে আরো কিছুদিন। ওদিকে কথায় কথায় ভাইবোনদের মধ্যে সাম্যের ছোট বেলার একটা ঘটনা মনে করল সায়েন। হাসতে হাসতে ঘটনাখানা মুখেও বলল। সেটা স্মরণ করে একযোগে হেসে উঠল সবাই। হাসতে হাসতেই গড়াগড়ি খাওয়ার মতো অবস্থা তাদের। কথাও বলতে

পারছে না কেউ হাসির চোটে। রুবাব মনে করতে
পারছে না কারণ রুবাব ছিল না। তাই
সায়নও ঘটনাখানা বলতে লাগল, একদিন সাম্য, সৃজন
দুই ভাই খেলনা নিয়ে মারামারি লাগিয়েছে। দু'জন
দু'জনাকে খামচি মেরে রক্তারক্তি অবস্থা। ওদের
খামচাখামচি দেখে চুপ করে পেছন থেকে সিরাত
এসে দুটোকেই আরেক ঘা বসিয়েছে। মায়ের মার
খেয়ে একসাথে চিৎকার করে কাঁদছিল ওরা। শুদ্ধকে
ভাই-বোনরা ছোটো থেকে একটু বেশিই ভয় পায়।
আবদার করে তবে লিমিট রেখে।

সেদিন ঢাকা থেকে শুদ্ধও ফিরেছে ঘন্টা খানিক
হয়েছে মাত্র। ফ্রেশ হয়ে

বাইরে যাওয়ার জন্য বের হতেই দেখে দুই বানর
গলা ফাটিয়ে কাঁদছে। তাদের চোখ, মুখ খামচানো।
রক্ত বের হচ্ছে একটু একটু। তাকে দেখেই দুটোরই
হঠাৎ কান্না বন্ধ হয়ে গেল। তবে ফোঁপানো বন্ধ হলো
না। ওদের কান্নারত মুখ দেখে শুদ্ধ ভ্রুঁ কুঁচকে
জিজ্ঞাসা করেছিল,

-‘ কি হয়েছে? চোখ, মুখের এই অবস্থা কেন
তোদের?’

তারা কিছু বলার আগে সিরাত পুরো ঘটনা তাকে
জানায়। ওরা দুই ভাই

নিজেদের এ অবস্থা করেছে দেখে দুটোকে কান
ধরতে বলে। তারা ধরে। ড্রয়িংরুম তখন ফাঁকা।
সিরাত তখন বকতে বকতে যান এ্যান্টিসেপ্টিক
আনতে। তখন শুদ্ধ বলে,-‘বাইরের কাউকে পাস নি?
ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি করেছিস কেন? এবার থেকে
মারামারি করতে ইচ্ছে করলে বাইরে থেকে কাউকে
মেরে আসবি। মারার পর আরো দু’ঘা বসিয়ে শাসিয়ে
আসবি যাতে বাড়িতে বিচার নিয়ে না আসে। বোঝা
গেল? তবুও আমি যেন না দেখি নিজেরা নিজেরা
মারামারি করেছিস। মনে থাকবে?’

দু’জনই কান ধরে ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল।
তখন শুদ্ধ বলল,

-‘আজকের পর থেকে যদি শুনি নিজেরা মারামারি
করেছিস দুজনকে উল্টো করে ঝুলিয়ে মারব। কিন্তু
এখন ভুল যখন করেই ফেলেছিস তখন পানিশমেন্টও
ফরজ হয়ে গেছে। ‘

একথা বলে সে সৃজনকে বলল বাবা-মায়ের সম্পর্কে
কিছু বলতে। সৃজন বলল,

-‘আমি উমম আমার বাবা-মাকে উমম খুব ভালোবাসি। তারাও আমাকে উমমম খুব উম ভা..লোবাসে..!’

-‘এক বাক্যে কতবার উমম উমম করলি? স্মার্ট ছেলেরা এভাবে কথা বলে? স্পষ্টভাবে কনফিডেন্টলি আবার বল। এবার যতবার উম বলবি ততটা মার খাবি।’

মারের ভয়ে এবার উম ছাড়া সৃজন তার টাস্ক পূরণ করল। এবার এলো সাম্যের পালা। শুদ্ধ তাকে বলল নিজের সম্পর্কে বলতে। সাম্য বলতে শুরু করল,-‘আমি সোহানুর চৌধুরী সাম্য। আমি একজন মানুষ। আমার দুটো চোখ, দুটো গাল, একটি মুখ, একটি নাক ও একটা সু-স্বাস্থ্যবান বাম আছে। বাম আমাদেরকে বসতে সাহায্য করে। প্রাণীদের বাম মানুষের মতো নয় তাই তারা মানুষের মতো করে বসতে পারে না। আ..ম..।’

সাম্যের কথা শুনে শুদ্ধ ফোন থেকে চোখ সরিয়ে বলল,’গদর্ভ একটা। তোর ইয়ে আছে সেটা গর্ব করে বলতে হবে?’

-‘তুমিই তো বললে নিজের সম্পর্কে বলতে। তাই আমার যা আছে তাই নিয়ে বললাম।’

এটাই ছিল সেই ঘটনা মনে করে আজ এত হাসাহাসি। তাদের আড্ডার মাঝে সাফওয়ান চৌধুরী একটা ছেলেকে নিয়ে ছাদে এলেন। ছেলেটার বয়স সতেরো কী আঠারো। হাতে ডাবের কাঁদি। অন্যহাতে ধারালো বটি। উনি ছেলেটাকে ইশারা করতেই ছেলেটা ডাব কেটে সব বাচ্চাদের হাতে ধরিয়ে দিলেন। রোজা থেকে ডাবের পানি শরীরে এনার্জি আনে এজন্য মোড়ের দিকে গিয়ে ডাব বিক্রি করতে দেখে সবার জন্য এনেছেন। এসব করতে করতে বেজে গেছে রাত সাড়ে আটটা। হঠাৎ শীতল চাঁচিয়ে উঠে স্বর্ণকে বলল,-‘মেহেদী দিবো কখন আপু? আয়, হায়, আমার তো মেহেদীর কথা মনে ছিল না। চলো চলো, দ্রুত চলো।’

একথা বলে শখ আর স্বর্ণকে টানতে টানতে নিচে নিয়ে গেল। ওদেরকে দেখে সাম্য, সৃজনও সুড়সুড় করে চলে গেল। ছাদে ছিল তখন তিনভাই। ওরাও এবার নিচে নেমে এলো। আজমের কল পেয়ে সায়ন গেল পার্টি অফিসে। আজ ফিরবে কী বলা যাচ্ছে না।

তবে স্বৰ্ণকে ইশায় বলে গেছে হাতভর্তি করে মেহেদী পরতে। বাড়ি ফিরে যেন স্বর্ণের মেহেদী রাঙা দুই হাত দেখতে পায়। স্বর্ণ জবাবে কিছু না বললেও তার চোখজোড়া হেসে উঠেছে। মাঝে মাঝে সায়ন যখন তাকে শাড়ি পরতে বলে। চোখজোড়ায় মোটা করে কাজল পরতে বলে তখন মুখে বিরক্ত হলেও মনে মনে খুশি হয়। এখন যেমন সায়নের কথায় জবাব না দিলেও সে খুব খুশি হয়েছে।

এবং ব্যক্তিগত পুরুষটাকে খুশি করতে মেহেদী পরবে। তবে হাতভর্তি করে নয় খুব সাধারণভাবে। তবুও সায়ন এসে মুগ্ধচোখে হাত নেড়েচেড়ে দেখবে। চুমু খাবে। মানুষটা বরাবরই বড্ড পাগল। বাইরে যেমনই হোক না কেন তাকে খুব যত্ন করে ভালোবাসে। এদিকে বাড়ির গিন্নি কাল সকালে কী কী রান্না করবে সেসব আলোচনা করছে। আজ রাতেই কিছু কাজ এগিয়ে রাখছেন হাতে হাতে। মেয়েরা ড্রয়িংরুমে হইহই করে মেহেদী দিতে বসেছে। স্বর্ণ দিয়ে দিচ্ছে শীতলকে আর শখ দিয়ে দিচ্ছে সাম্যকে। সৃজন আপাতত গাল ফুলিয়ে বসে টিভি দেখছে। মেয়েদের মেহেদী দেওয়া কখন হবে কে জানে। সাড়ে

দশটা তো বেজেই গেছে। তাই সিঁতারা বাকিদের
টেবিলে খাবার দিয়ে বড় থালায় ভাত এনে সব
কটাকে খাওয়াতে বসলেন। আর একটু রাত বাড়লেই
না খাওয়ার বাহানা জুড়ে বসবে বাচ্চাগুলো। খাওয়ার
ইচ্ছে না থাকলেও

সিঁতারার জোড়াজুড়িদে শুদ্ধ আর রুবাব অল্প করে
খেলো। তারপর

হাঁটাহাঁটির কথা বলে বাগান পেরিয়ে বাইরে গেল।
হাঁটতে হাঁটতে মোড় পাড় করে কিছুদূর গিয়ে যেতেই
রুবাব একটা দোকান থেকে সিগারেট আর লাইটার
কিনে আনল। একটা তার ঠোঁটে গুঁজে আরেকটা
শুদ্ধর দিকে এগিয়ে দিলো। শুদ্ধ সেটা নিয়ে
সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে বলল,-‘ঝগড়া করেছিস?’
একথা শুনে রুবাব একপলক তাকিয়ে পরপর দুটো
টান মেরে জবাব দিলো,

-‘হয়েছে।’

-‘ঐশ্বর্যকে আনমনা হয়ে কাজ করতে দেখলাম।’

-‘(...)’

-‘আজ কিছু কাজে ভুল করেছে বকা খেয়েছে। হাতে
ব্যান্ডেজ দেখলাম।’

-‘কি হয়েছে হাতে?’

-‘ রান্না করতে গিয়ে নাকি হাত পুড়িয়েছে।’

-‘ এখন একটা গালি দেই, দেই গালি? দেশে ফেরার পর থেকে একবারও দেখা করে নি। বিয়ের কথা বললেই ওর নাকি চাঁদি গরম হয়ে যায়। শালা শশুরটা মরেও না আমার পথও ক্লিয়ার হয় না।’-‘ এখন একটা গালি দেই, দেই গালি? দেশে ফেরার পর থেকে একবারও দেখা করে নি। বিয়ের কথা বললেই ওর নাকি চাঁদি গরম হয়ে যায়। শালা শশুরটাও মরে না আমার পথও ক্লিয়ার হয় না।’

-‘তোকে না মেরে মরবে কেন?’

-‘সেটাই। ওরা বাবা-মেয়ে পয়দা হয়েছে আমার জীবন জ্বালানোর জন্য। নয়তো এমন খাপে খাপ হা’রাম’জা’দা’ বাপের হারামজা’দী কন্যা হয় কী করে? ইয়ে শুদ্ধ ভাই রে শোন না, হাত কি বেশি পুড়েছে?’

-‘হুম।’

-‘ডাক্তার দেখিয়েছে? কি বলেছে ডাক্তার?’ঐশ্বর্যের হাত পোড়ার কথা শুনে রুবাবের উতলা ভাব দেখে শুধু মুচকি হাসল শুদ্ধ। এ পাগল দুটো, দু’জন দু’জনকে এত ভালোবাসে অথচ ভাব খানা এমন

করে যেন কেউ কাউকে চেনে না। কখনো কথা হয়
নি। কারণ

বাংলা সিনেমার মতো তাদের এক হওয়ার মাঝে
দাঁড়িয়ে আছে ঐশ্বর্যের বাবা রাশিয়ান সাইন্টিস্ট
মিখাইল ইগর। ঐশ্বর্যের মা রেজিনা মাহতিমের
দ্বিতীয় স্বামী। মায়ের ভুল মানুষকে সঙ্গী করার মাসুল
দিচ্ছে ঐশ্বর্য। ওই বেচারী পড়ে গেছে অথৈ সাগরে।
রেজিনা যদি ইগরের প্রেমের জালে গা না ভাসাতেন
তাহলে ঐশ্বর্যও স্বাভাবিক ভাবে লাইফ লিড করতে
পারত। কিন্তু সেটা হয় নি। কারণ ঐশ্বর্যের সৎ বাবা
মিখাইল ইগর ঐশ্বর্যকে সব সময় হাতের পুতুলের
মতো নাচিয়ে যাচ্ছে। উনি সাইন্টিস্ট হয়েও উনার
আবিষ্কার ভুল পথে ব্যবহার করেন। এমনকি ঐশ্বর্যকে
শুদ্ধর সঙ্গে কাজ করতে পাঠানো ছিল মিখাইলের
একটি বড় প্ল্যানের অংশ। যেটা ঐশ্বর্য আগেই শুদ্ধকে
জানিয়ে দিয়ে তার সাথে দেশে ফিরে এসেছে।
ইগরের থেকে পালিয়ে বাঁচতে আছে শুদ্ধর গোপন
ল্যাবে। সেখানেই রাত-দিন এক করে রিসার্চের কাজ
চালিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। খুব তাড়াতাড়ি তাদের একটি
আবিষ্কার উন্মোচন করা হবে বিশ্ববাসীর কাছে। সেটা

নিয়ে জোর কদমে কাজ চলছে। সে নিজেও কাজের মাঝে পড়ে থাকত ল্যাবে কিন্তু ইগরের লোক আর ইয়াসির আঠার মতো পেছনে পড়ে আছে। অলটাইম তার দিকে নজর রাখছে। নজর ফাঁকি দিয়ে ওই ল্যাবে যাওয়াটাও রিস্কি হয়ে যাবে বলে যাচ্ছে না। এমন ভাব করে চলতে হচ্ছে ঐশ্বর্যের কোনো খোঁজ সে জানে না। অথচ শুদ্ধর সাথে তার প্রতিনিয়ত কাজ নিয়ে কথা হয়। মেয়েটা সত্যিই মারাত্মক লেভেলের ট্যালেন্ট। তার কাজের ধরণ, ভাবনা, অবিশ্বাস্য রকমের সুন্দর। আর রুবাব কীভাবে যেন তারই প্রেমে পিছলে পড়েছে। প্রায় অনেকদিনই ঐশ্বর্যের পেছন লেগে থেকে তাদের সম্পর্কটা এক জায়গায় স্থির হয়েছে। এটা জানার পর থেকে ইগরের অত্যাচার আরো বেড়ে গেছে। সে এখন পাগলের মতো ঐশ্বর্যকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। হাতের কাছে পেলে হয়তো ঐশ্বর্যকে শ্বাস নেওয়ার সময়টুকুও দেবে না। হাত পোড়ার কথা শুনে রুবাব পকেট থেকে ফোন বের করে কল দিলো ঐশ্বর্যকে। ঘাড়ত্যাড়া মেয়েটা কল রিসিভ করছে না। মানে হয় এসবের? কয়েকবার চেষ্টা করেও কাজ হলো না দেখে চোখ,

মুখ, কুঁচকে থমথমে মুখে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।
রাগে মুখ থমথম করছে। তখন শুদ্ধ বলল,

-‘তোমার শশুরকে খেলিয়ে দেশে আনতে হবে। গেম টা
উনি শুরু করলেও সমাপ্তি টানার দায়িত্ব আমার। স্যার
মানুষ বলে কথা এক্সট্রা সন্মান না দিলে চলে?’

-‘বা’লের শশুড় আমার। শালা আমার জীবনটাকে
তেজপাতা বানিয়ে দিলো। ওইটাকে যত তাড়াতাড়ি
সম্ভব যা করার করে আমার বউটাকে আমাকে দে।
নয়তো আমি মামাকে বলে দিবো তুমি শীতলের মন
নিরে ছুঁ কিতকিত খেলতে শুরু করেছো।’ একথা বলে
রুবাব একটু থামল। তারপর পুনরায় বলল,

-‘মাঝে মাঝে ঐশ্বর্যের ছেলেমানুষী আমার সহ্য হয়
না। ও নিজেও জানে ওর হা’রা’ম’জা’দা বাপ কখনো
আমাকে মেনে নেবে না। নিলে আরো দুই বছর
আগেই নিতো। ওকে ভালেবাসি! সংসারটা আমি ওর
সাথেই করব বলে এতদিন ধরে অপেক্ষা করছি। শুধু
তার জেদের কারণে মা আমার সাথে কথা বলে না।
আমি এখানে আছি বলে সেদিন এলো ঠিকই থাকল
না। ঐশ্বর্যও জেদ ধরে আছে বিয়ে করলে নাকি ওর
বাবা আমাকে মেরে দিবে। আমার ভালো জন্য

আমাকে বিয়েটা করবে না। মানে বাবার হাতে মরতে
দিবে না অথচ আমাকে দহনে পুড়িয়ে আধমরা করে
রাখবে। এই নাকি আবার ভালোবাসা? এদিকে
সমন্ধির পোলা ইগর তোর ফমূর্লা না পেয়ে পাগল
কুকুর হওয়ার অবস্থা। না, সবকিছুতে প্যাঁচের উপর
প্যাঁচ। মানে দিনকে দিন আমার জীবনটা প্যাঁচ
লাগানো ইয়ারফোন হয়ে গেছে, বাল।’নিশ্চুপ শুদ্ধ
জবাব দিলো না। হাঁটছে দুভাই। সিগারেট টানছে
ধীরে সুস্থে।

রুব্বারের ভেতরের অস্থিরতা যেন টের পাচ্ছে শুদ্ধ।
নীরবে কিছুদূর গিয়ে সামনে দাঁড় করানো সায়নের
বাইকের চাবিটা পকেট থেকে বের করে রুব্বারের
হাতে ধরিয়ে দিলো শুদ্ধ। রুব্বাব চাবি হাতে নিয়ে
কিছু বলার আগেই শুদ্ধ বলল,

-‘এতদিন ঐশ্বর্য শুধু আমার দায়িত্বে ছিল। যতটুকু
পেরেছি বড় ভাইয়ের মতো সব সময় সেভ করেছি।
কিছুক্ষণের জন্য তোর দায়িত্বে ছাড়লাম, কাজেই
সাবধান।’

-‘মানে?’

-‘এখানে একটু দাঁড়া জবাব পেয়ে যাবি।’

একথা বলে রাস্তার ওপর পাশে দাঁড় করানো
কামরানের গাড়িতে উঠে বসল সে। চোখের পলকে
শাঁ শাঁ করে চলে গেল গাড়িটা। রুবাব বিরক্ত
মুখে বাইকের উপর বসতেই উপলব্ধি করল কেউ
তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ তুলে তাকিয়ে ঐশ্বর্য
দেখে আর পলক ফেলল না। তারপর ঝট করে
ঐশ্বর্যের হাত ধরে নাড়িয়ে ঘুরিয়ে দেখে বলল,-“শুধু
যে বলল হাত পুড়িয়েছো, কই দেখি?”

-‘আমার? কই নাতো। বরং ভাইয়া তো বলল তুমি
নাকি হাত পুড়িয়েছো। এজন্যই তো রিস্ক নিয়ে বের
হলাম।”

এবার দু’জনের বুঝতে বাকি নেই এটা শুধুর
চালাকি। আসলে দুজনেই দু’জনকে কাছে পাওয়ার
জন্য উতলা। অথচ পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা
বিবেচনা করে দূরে সরে আছে। তবে দু’জন
দু’জনকে সেভ দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলো। কিন্তু
রুবাব বোধহয় ঐশ্বর্যকে স্বস্তি দিতে নারাজ। এক
ঝটকায় সে ঐশ্বর্যকে নিজের আরো কাছে টেনে
ঠোঁটজোড়া দখল করে নিলো। শুষে নিতে থাকল
প্রিয়শী ওষ্ঠজোড়া। ঐশ্বর্য রুবাবের বুকে ধাক্কা দিলে

রুবাব একটা কামড় বসিয়ে দিলো। যেন বাঁধা দেওয়ায় বিরক্ত সে।

কিছুক্ষণ এভাবে থেকে রুবাব সরে গেল। ঐশ্বর্য ঠোঁট মুছতে মুছতে অন্য দিকে তাকিয়ে হাঁপাচ্ছে। অথচ খুব ভালো করে বুঝতে পারছে রুবাবের চঞ্চল দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ। বরাবরের মতোই ঐশ্বর্যের পরিপাটি লুক। পরনে কালো জিন্স আর সাদা লেডিস শার্ট। চুল পনিটেইল করে বাঁধা। হাতে স্মার্ট ওয়াচ। কানে ছোটো ছোটো দুটো টপ। ঠোঁটে চ্যাপটিক আর ভাসা কাজলহীন চোখ। মেয়েটার এই বেশে যেন ইনডিপেনডেন্স গ্রামার লুকটা ফুটে উঠেছে। রুবাব আপাতত বাইকের চাবি নিয়ে ঐশ্বর্যের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর বাইকে বসে তাকেও বসতে ইশারা করে বলল,

-‘আল্লাহ শুধু কবুল বলার তৌফিক দান করুন তারপর শায়েস্তা কাকে বলে হারে হারে যদি টের না পাইয়েছি তো আমিও রুবায়েত কবির নয়।’

ঐশ্বর্য একথা শুনে ঠোঁট টিপে হেসে বাইকের পেছনে উঠে বসল। কিছু বলতে হলো না বিনাবাক্যো মাথা রাখল রুবাবের কাঁধে। জোরে নিঃশ্বাস টেনে নিলো

প্রিয় মানুষ গায়ের ঘ্রাণ। তাতেই মন খারাপের রেশ
কোথায় যেন দৌড়ে পালিয়ে গেল। বেহায়া মন
ঝুমঝুম করে গেয়ে উঠল। বলতে থাকল একনাগাড়ে,
'কতদিন পর!পার্টি অফিসের চেয়ারে বসে পায়ের
উপর পা তুলে ভ্রুঁ কুঁচকে সিগারেট ফুঁকছে সায়ন।
ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি। ব্যস্ত হাতে টাইপ করছে
কাউকে। সে কেউটা আর অন্য কেউ নয় তারই
স্বর্ণকোমল। তার কথামতো হাতে মেহেদী দিয়ে
কয়েকটা ছবি পাঠিয়েছে স্বর্ণ। সায়ন সেটাতে লাভ
রিয়েঙ্ট দিয়ে নানান দুষ্টুমার্কী কথা বলে চলেছে। স্বর্ণ
সিন করলেও কিছু বলছে না। শুনছে পাজি প্রেমিকের
কথা।এদিকে অনেক্ষণ ধরে তারই পাশে দুহাতে
মেহেদী লাগিয়ে বসে আছে আজম। কী যে খুশি
ছেলেটা। চোখে, মুখে যেন অসীম আনন্দ ঝরে পড়ছে
তার। বার বার চোখের সামনে হাত নিয়ে দেখছে
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। এইতো কিছুক্ষণ আগে সে কিছু
জিনিসপত্র তার হাতে দিয়ে পাঠিয়েছিল চৌধুরী
নিবাসে। বলেছিল সিঁতারার হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে
আসতে। সে গিয়ে শীতলদের মেহেদী দিতে দেখে
নিজেও বসে পড়েছে হাতে মেহেদী পরতে। গল্পে

গল্পে কত মজা যে করেছে সময়টুকুতে। অনেক দেৱী
হচ্ছে দেখে সায়েন কল করলে জানল সে বসে বসে
মেহেদী পৰছে। একহাতে শীতল মেহেদী পৰাচ্ছে
আৰেক হাতে শখ। তাৰ মেহেদী পৰাৰ কথা শুনে
সায়েন বিৰবির কৰে গালি দিয়ে কাজ শেষ কৰেই
আসতে বলেছে। এতে আজম যেন আকাশেৰ চাঁদ
পেয়ে গেছে। সে ধীৰে ধীৰে মেহেদীৰ পৰে ৰাতের
খাবাৰ খেয়ে তাৰপৰ এসেছে। বাড়িৰ সবাই নাকি
বলেছে কাল যেন বেড়াতে যায়। শীতল বলেছে
মেহেদী ৰং কেমন আসে তা দেখিয়ে আসতে।
মেহেদী ৰং দেখলে নাকি বোঝা যায় মনে কতটুকু
ভালোবাসা আছে। ভালোবাসা পৰীক্ষা কৰানোৰ জন্য
সে যেন অবশ্যই যায় চৌধুৰী নিবাসে। একথা শুনে
আজম ঘাড় কাত কৰে সম্মতি জানিয়েছে। কিন্তু
চাইলেই কী যাওয়া যায়? সায়েন না বললে তো
যেতেই পাৰবে না। এসব ভেবে সে এবাৰ সাহস
কৰে বিড়াল সুৰে ডাকল,-‘ভাই?’

-‘হুম।’

-‘শখ আপা, স্বর্ণ আপা, শীতল আপা, সাম্য, সৃজন
হেগোরে আমি নিজ ভাই বুনের নজরে দেখি। হেগোর
কিছু হইলে আমারও খুব বুক পুড়ে।’

-‘মেয়ে মানুষের মতো হুদাই কথা প্যাঁচাইয়া মেজাজ
খাইন না আজম্য।’

-‘না মানে আমি যদি কাইলকা হেগোরে ইদ সেলামী
দেই আফনে কী রাগ করবেন, ভাই?’

-‘হঠাৎ?’

-‘আমার তো কোনো ভাই বুন নাই। কেউ ইদের দিন
আমার থিকা টাকা পয়সা চাইতে আছে না। টাকার
লিগা ঝগড়া করে না।’

একথা শুনে সায়েন চোখ তুলে ঘাড় ঘুরিয়ে আজমের
দিকে তাকাল। দুই কী একপল তাকিয়ে আজমের
অস্বস্তি ভরা মুখখানা দেখল। তারপর দৃষ্টি সরিয়ে
উঠে দাঁড়িয়ে একটা জরুরি কাগজ খুঁজতে খুঁজতে
বলল,

-‘তোরা ভাই-বোনদের তুই সেলামী দিবি আমি কেন
রাগ করব?’

-‘এ্যাঁ?’

-‘এখনই তো বললি তারা কষ্ট পেলে তুইও কষ্ট পাস। তাহলে তারা যাতে খুশি হয় সেটা নাহয় কর এবার। এখানে আমার পারমিশনের প্রয়োজন নেই।’-‘না মানে অল্প টাকা দিলে হেগোরা মাইন্ড খাইব না তো?’

-‘যুগ হিসেবে আমার ভাই বোনরা সব সময় অল্পতে খুশি। তবে যে যেটাই দিক হাসি মুখে খুশি মনে দিতে হবে। নয়তো তারা লাখ টাকার বান্ডিলও ছুঁয়ে দেখবে না।’

-‘তাও কন না ভাই কত দিবো?’

-‘পাঁচ টাকা, দশ টাকা যা তোর সামর্থ্য তাই দিবি।’

-‘চারশ করি দেই?’

-‘দে।’

একথা শুনে আজম তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে হাত ধুঁয়ে এলো। ভালোই রং এসেছে। সে প্যান্টে হাত মুছে বেঞ্চার উপর বসে খাম আর কড়কড়ে

একশ টাকার একটা বান্ডিল নিয়ে ভাগ করতে বসল। সায়ন কাজ ফেলে আড়চোখে বার বার দেখতে লাগল আজমের খুশি। আজমের ভাই-বোন নেই। ইদে ভাইবোনদেরকে ইদ সেলামী দেওয়ার আনন্দ

উপভোগ করতে পারে না। এবার সুযোগ পেয়েছে
দেখে ছেলেটার ঠোঁটে হাসি যেন ধরছে না। তার চোখ
মুখ বলে সে ভীষণ খুশি। কথা হচ্ছে, মাঝে মাঝে
কারো খুশির কারণ হতে মন্দ লাগে না।’_’ওই কিরে,
কিরে?’

_’মধু, মধু।’

শীতলের প্রশ্নে সাম্যের জবাব শুনে একযোগে হেসে
উঠল ভাই বোনরা সবাই। মেহেদী দেওয়া কেবল
শেষ হলো। রাত তখন এগারোটা একুশ।

মা-চাটীসহ বাড়ির প্রত্যেকটা নারী/মেয়ের হাত
মেহেদীতে রাঙা। সবার প্রথমে দেওয়ায় শীতলের
হাতের মেহেদী শুকিয়ে গেছে অনেক আগেই।

তবুও গাঢ় রং পাওয়ার আশায় কেবলমাত্র হাত ধুয়ে
দেখল চমৎকার রং এসেছে। ফর্সা হাতে মেহেদীর
গাঢ় রং টা ফুটে উঠেছে। ফোন থাকলে রং ঢং করে
ছবি তুলতে পারত। কিন্তু ফোনটাই তো নেই।

ফোনের কথা মনে করে মনটা ভীষণ খারাপ হলো।
পরক্ষণে মায়ের ফোনটা নিয়ে কয়েকটা ছবি তুলে
বাবাকে পাঠিয়ে দিলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই শাহাদত

চৌধুরীর রিপ্লাই এলো,-‘আমার আন্মা! মাশাআল্লাহ্ খুব হয়েছে মা।’

বাবার কথা শুনে শীতল হাসল। আরো টুকটাক কথা বলল বাবার সাথে।

তারপর কী ভেবে তার মেহেদী রাজা হাতের ছবিগুলো সেভ করল শুদ্ধর What’s app এ। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেও সিন হলো না দেখে ফোনটা রেখে রুমে চলে গেল। রুমে গিয়ে কাল কীভাবে সাজবে, কী পরবে সব বের করে গুছিয়ে রাখল। যাতে সকালে সবার আগে রেডি হয়ে সেলামী হাতাতে পারে। এবার কারো থেকে কম করে সেলামী নিবে না কারণ এই সেলামী দিয়ে আরেকটা ফোন কিনবে। এসব ভেবে সবচেয়ে সুন্দর ড্রেস বের করে আরেকবার গায়ে মেলে ধরল। বড় আবু, মেজো চাচ্চু, বাবা দিয়েছে মোট চারটা ড্রেস। রুবাব, সায়ন ভাইয়া দিয়েছে দুটো। তবে সে বড় মাকে বলতে শুনেছে শুদ্ধ এবার সবাইকে টাকা দিয়েছে, যার যার পছন্দমতো ড্রেস কিনে নিতে। কিন্তু কই তাকে তো কেউ টাকা দেয় নি। তার ভাগের টাকা কই? তারমানে কি শুদ্ধ ভাই তার টাকা মেরে দিলো?

একথা ভেবে সে টাকার খোঁজে ছুটতে গিয়েও থেমে
গেল। বড় মা হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণে। এখন
ডাকা বোধহয় ঠিক হবে না। কিন্তু টাকা?কাল সকালে
নাহয় শুদ্ধ ভাইয়ের থেকে টাকা বুঝিয়ে নেবে।একথা
ভেবে

সে পুনরায় নিজের ড্রেস হাঁতাতে শুরু করল। সেসব
বের করতে গিয়ে শুদ্ধর একটা টিশার্ট খুঁজে পেল।
এটা চুরি করা কত নং টি-শার্ট মনে নেই তবে
এগুলো শুদ্ধর সেটা মনে আছে। কারণ তার পরনের
জামা কাপড় কিংবা ব্যবহার করা সুগন্ধি সবকিছুর
মধ্যে স্পেশাল কিছু একটা থাকে।

জিনিস সাধারণ তবে দেখে মনে হয় অসাধারণ।
এমনকি পছন্দ নিয়েও কিছু বলার নেই,জহুরী চোখে
তাকিয়ে খুঁজে খুঁজে ইউনিক জিনিস খুঁজে বের করতে
পটু সে। কিছু চাইলে টাকা নাই বললেও কানের
কাছে একটু ঘ্যান ঘ্যান করলে সেটাই কিনে দেয়।
তখন আর দাম কোনো ব্যাপার না।

বলা বাহুল্য,শুদ্ধ ভাই এমনিতে খুব ভালো কিন্তু কিছু
করলেই চ্যালাকাঠ দিয়ে মারে, এই যা! এসব কথা
ভাবতে ভাবতে ড্রেসিংটেবিলের সামনে

গিয়ে দাঁড়াল শীতল। চুল আঁচড়ে লম্বা বেনুনি গাঁথল।
তারপর নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে লাজুক মুখে
বিরবির করল ‘এত গ্লো করছি কেন?’ একথা বলে
লজ্জা পেয়ে দুই হাতে মুখ ঢাকল। কিন্তু তার লজ্জার
জান কবজ করতে তখনই আচমকা হেঁচকি উঠতে
লাগল। একবার..দুইবার.

তিনবার..করে একের পর এক হেঁচকি উঠতেই
থাকল বেচারীর। মানে হয় এসবের? কোনো কাজ
করতে গেলে অঘটন ঘটিয়ে ঘটে বসে। এখন একটু
লজ্জা পাবে তারও জো নেই মরতে মরতে এখনই
হেঁচকি উঠতে লাগল। শুদ্ধ ভাই ঠিকই বলে সে
কোনো কাজে না সে হচ্ছে ননীর পুতুল।

নির্দিষ্ট কারো রুমের শোভা বাড়ানো ছাড়া ওকে দিয়ে
আর কিছু হবে না।

ধুর, ফুরফুরে মেজাজ একেবারেই বিগড়ে গেল।
হেঁচকির ঠ্যালায় আগে ঢকঢক করে পানি গিলে শুয়ে
পড়ল।

রাত বাড়ার সাথে সাথে স্তব্ধ চৌধুরী নিবাস। ঘুমে
বিভোর চৌধুরী বাড়ির প্রত্যেকটা সদস্য। ঘড়িতে
তখন রাত আড়াই টা। পায়ে হেঁটে মূল ফটক পেরিয়ে

শুদ্ধ তখন বাড়ি ফিরল। রুবাব ফিরেছে অনেক আগে
কয়েক ঘন্টা আগে কথা হয়েছে তার সাথেও।
ঐশ্বর্যকেও ল্যাবে পৌঁছে দিয়েছে। সায়েন ফিরবে কখন
ঠিক নেই। সকাল হবে হয়তো। তার দলের একজন
ছেলের বাবা মারা গেছে কিছুক্ষণ আগে। উনি নাকি
প্রায় এগারো বছর ধরে বিছানাগত হয়ে পড়েছিলেন।
অতঃপর চাঁদ রাতে মারা গেলেন। ইদ কিংবা ইদের
আনন্দটুকু পুরোপুরিভাবে উপভোগ করতেও পারলেন
না। খুব খারাপ লাগল কথাটা শুনে। কিন্তু মৃত্যু কি
আর বলে আসে? চিরন্তন এই সত্যকে মেনে নিতেই
হবে। মৃত্যু প্রভাবশালী, ধনী, গরীব দেখবে না। যখন
যার দুয়ারে দাঁড়াবে তাকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করতে
হবে। বাইরে এখনো পটকা ফুটছে। গান বাজছে।
চাঁদ রাত উদযাপন করতে বাঙালি। রাত অনেক
হয়েছে তাই শুদ্ধ নিজের কাছে থাকা চাবি দিয়ে
দরজা খুলে

ভেতরে প্রবেশ করল। নিঃশব্দে দরজা আঁটকাল।
তারপর ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা পানির বোতল নিয়ে
এগোলো রুমের দিকে। শীতলের রুম টা পার হতে
গিয়ে দেখল দরজা আঁটকানো। সচারচর দরজা বন্ধ

করে ঘুমায় না শীতল। ভয় করে। দরজা বন্ধ মানে
এখনো ঘুমায় নি বোধহয় ব্যাঙাচি।

ইদের ড্রেস পরে এখনই সাজতে বসেছে নাকি কে
জানে। সাজতে পারে। তার যা স্বভাব সে যদি এখন
ইদের ড্রেস পরে ঘুরে বেড়ায় তাও অবাক হবে না।
কারণ সে কাজগুলো করে ওই রকম। শুদ্ধ আর
দাঁড়াল না রুমে

গিয়ে একেবারে শাওয়ার নিলো। রাতে ঘুমানোর
আগে শাওয়ার নেওয়া তার বহুদিনের পুরনো
অভ্যাস। শাওয়ার নিয়ে ঘুমালে নাকি ঘুমও ভালো
হয়। শাওয়ার নিয়ে মাথা মুছতে মুছতে এসে
দাঁড়াতেই হঠাৎ তার নজর পড়ল আয়নার দিকে।
মাথা থেকে হাত নামিয়ে হাত রাখল কানের দুই ইঞ্চি
নিচে নরম মাংসে। কিছু মনে হতেই নিচের ঠোঁট দাঁত
দিয়ে কামড়ে ধরল। ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি খেলে
গেল বোধহয়। দ্রুত হাত সরিয়ে তোয়ালে বেলকনিতে
মেলে দিয়ে অনেকগুলো খাম আর কচকচে নতুন
টাকার বেশ কয়েকটা বাউল নিয়ে বসল। মা-চাচী
থেকে শুরু করে এই বাড়ির দারোয়ান কাকার ছেলে
মেয়েদের নামও তালিকাভুক্ত করে লিস্ট বানাল। বাদ

গেল না ল্যাঁবে কাজ করা তার প্রত্যেকটা
সহকারীদের নাম। সবার জন্য একে একে সেলামী
রেডি করে সব খাম একসাথে রাখলেও
একটা খাম সরিয়ে রাখল। এমন জায়গায় রাখল
কেউ খুঁজে না পায়।

অতঃপর সব ঠিকঠাক করে শুয়ে পড়ল। ঘড়ির কাঁটা
ঘুরতে ঘুরতে সদ্য একঘন্টা পেরিয়ে বোধহয়। তখন
কেউ নিঃশব্দে প্রবেশ করল। পা টিপে
এলো বিছানার কাছে। চোখের উপর হাত নাড়িয়ে
দেখল ঘুমিয়েছে কী না। সাড়াশব্দ না পেয়ে এবার
আর একটু কাছে এলো। বুকের কাছটায় প্রাণভরে
শ্বাস টেনে নিলে। উফ! সেই পাতালকরা ঘ্রাণ! এত
টানে কেন? এত ভালো লাগে কেন? কী আছে এ
ঘ্রাণে? এত পাগল পাগল লাগেই বা কেন? মন বলে
ঘ্রাণের সাথে মানুষটাকেও কেড়ে নিতে। বুকের
কাছটার শার্ট খাবলে ধরে চোখে চোখ রেখে বলতে
ইচ্ছে করে, ‘এ্যাই যে বিশুদ্ধ পুরুষ খুব তাড়াতাড়ি
আমার হয়ে যান না, প্লিজ! নাহয় এ বুকটা আমার
নামে লিখে দিন। আপনার এই বুকে মুখ ডুবিয়ে
দুনিয়াধারী ভুলতে চাই আমি। আমার পুরো

পৃথিবীটাকে আমি শুদ্ধময় করতে চাই। শুদ্ধর তীব্র
ভালোবাসায় ডুবে শীতল হতে চাই।’ একথা বলে সে
আচমকা ঠোঁট ছুঁয়ে দিলো শুদ্ধর বুকে। মুগ্ধ নজরে
তাকাল ঘুমিয়ে থাকা সুদর্শন পুরুষটাকে।

দৃঢ় কপাল, বুদ্ধিদীপ্ত দুটো চোখ, বাঁকা দ্রু, টিকালো
নাক, একজোড়া

পাজি ঠোঁট। যারা হাসতে জানে না। হাসলেও তা
মেপেগুনে মানুষ বুঝে। শীতল বিছানায় ভর দিয়ে
গালে হাত দিয়ে মেঝেতে বসল। তারপর কিছু একটা
ভেবে ফিক করে হেসে দ্রুত নিজেকে সামলে শুদ্ধর
হাতটা টেনে নিলো। বাম হাতে লুকানো মেহেদী বের
করে ধীরে ধীরে লিখল, ‘আমার বউ নাই। আমি
এতিম।’ হঠাৎ বাঁ হাতের তালুতে শিরশিরে কিছু
অনুভব করল শুদ্ধ। চট করে চোখজোড়া না খুলেও
বুঝল কেউ তার হাতে কেউ ফুঁ দিচ্ছে। ততক্ষণে
শীতলের মেহেদী দেওয়া শেষ। সে এখন ধীরে ধীরে
ফুঁ দিচ্ছে যেন তাড়াতাড়ি শুকায়। এভাবে বসে থেকে
ফুঁ দিতে দিতে সে কয়েকবার হামি তুলল। রীতিমতো
তুলছে। চোখের রাজ্যের ঘুম। কিছুটা সময় ঘুমের

সাথে যুদ্ধ করতে করতে শুদ্ধর হাতে দিকে তাকিয়ে
হাসল।

সকালে কী হবে পরে দেখা যাবে এখন মন যখন যা
যা বলেছে করেছে।

তারপর ওভাবে বসে থাকতে থাকতে একপর্যায়ে ওর
চোখ লেগে গেল। ধীরে ধীরে ঘুম গাঢ় হয়ে মেহেদীর
উপর পড়তেই শুদ্ধ চট করে শীতলের মুখটা ধরে
ফেলল। নয়তো হাতের মেহেদী শীতলের পুরো মুখে
লেপ্টে যেতো। কিন্তু হাতে লিখনটা কি? সেটা দেখার
জন্য নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে ভ্রুঁজোড়া কুঁচকে
ফেলল। এসব কি? সে এতিম? বউ নাই বিধায়
এতিম বানিয়ে দিলো এই মেয়ে? শুদ্ধ চোয়াল শক্ত
করে শীতলকে দিকে একবার তাকিয়ে আবার তাকাল
নিজের হাতের দিকে। তারপর বিছানা

থেকে নেমে শীতলের মাথাটা আগে ঠিকঠাকভাবে
বিছানায় রাখল যেন ঘাড়ে ব্যথা না পায়। তারপর সে
শীতলের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে মেহেদী তুলে ঘুমন্ত
শীতলকে জিজ্ঞাসা করল,-‘আমি এতিম? আমার বউ
নাই? কে বলল নাই? দেখবি আমার বউকে? উম তুই
একা দেখলে হবে না যদিও। তবে চল এক কাজ

করি বাড়িসুদ্ধ সবাইকে দেখাই? এতে তুইও খুশি, বড়রাও খুশি,তোদের খুশিতে আমিও খুশি।’

একথা বলে সে মেহেদীর টিউব তুলে নিয়ে পুনরায় নিজের হাতের দিকে তাকাল। তারপর মিটিমিটি হাসতে হাসতে শীতলের বাম গালে লিখে দিলো, ‘আমার বউ।’আজ ইদ। মুসলিমদের ঘরে ঘরে বয়ে যাচ্ছে ইদআনন্দ। চৌধুরী গিন্নিরা ফজরের পরপরই উঠে রান্নাঘরে চলে এসেছেন। ব্যস্তহাতে সামলাচ্ছেন রান্নাবান্না। ইদের নামাজ শুরু হবে সকাল সাড়ে সাতটাই। সবাই গোসল সেরে রেডি হতে হতে খাবার রেডি করে ফেলতে হবে। এই ইদে শাহাদত চৌধুরী আসতে পারবে না ভেবে সিমিনের মনটা খুব খারাপ ছিল। মেয়ে দুটোও ভিডিও কলে কথার বলার সময় মলিন মুখে তাকিয়ে ছিল বাবার দিকে। তবে তাদের চোখ দুটো যেন চিৎকার করে বলছিল, ‘এসো বাবা। এসো। আজকের দিনটা নাহয় আমাদের দাও।’ শাহাদত চৌধুরীও মলিন হেসেছিলেন। কিন্তু গতকাণরাত তিনটাই তিনি কাউকে না বলে উপস্থিত হয়েছেন। আজকে সকালে সবার সামনে উপস্থিত হয়ে সবাইকে চমকে দেবেন ভেবে বাইরে বের হোন

নি। সিমিনকেও বলে দিয়েছে আপাতত কাউকে না জানাতে। সিমিনও হেসে সম্মতি জানিয়েছে। সায়ন সকাল বেলা বাইরে থেকে বাড়ি এসে আগে রান্নাঘরে ঢুকল। হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হওয়ার সময় নেই যেন। সে মাকে দেখামাত্র হড়বড় করে বলল, ‘আম্মু দাও খেতে কিছু ভীষণ ক্ষুধা লেগে আমার।’ ছেলের কথা শুনে সিঁতারা পাশ ফিরে তাকিয়ে তাকে আপাদমস্তক দেখে বললেন,

-‘তুই কেবল বাড়ি ফিরলি? তোর কি আক্কেল জ্ঞান হবে না রে সায়ন?’

-‘আমি আবার কি করলাম?’

-‘সারারাত বাইরে কি এত কাজ তোর?’

সায়ন আর জবাব দিলো না পারল না কারন তার আগেই সিরাত তার মুখে মাংস পুরে দিয়ে বলল,

-‘লবণ ঠিকঠাক আছে নাকি দেখ তো বাপ?’

সায়ন মাংসটুকু চিবিয়ে খেয়ে দাঁত বের করে হেসে বলল,

-‘একটা খেয়ে বোঝা যায় নাকি? একবাটি দাও।’ তার কথা শুনে সিরাত সিমিন একযোগে হেসে ফেলল। সায়ন একবার একাই দুই কেজি মাংস খেয়ে

ফেলেছিল লবণ চেক করতে দিয়ে। তবুও বলতে পারে নি লবণ ঠিকঠাক হয়েছে নাকি। তবে ছেলের ক্ষুধা লেগেছে শুনে সিরাত ঝাটফট একবাটি মাংস তুলল বাটিতে। সিমিন ফ্রোজেন পরোটা ভেজে আগে খেতে দিলো ছেলেটাকে। সায়ন খাবারের প্লেটটা হাতে নিয়ে টেবিলে বসতেই স্বর্ণ নেমে এলো। পাশ কাটিয়ে যেতে গেলে সায়ন তাকে ডাকল। স্বর্ণ তার কাছে গেলে পরোটা আর মাংস ছিঁড়ে স্বর্ণের মুখের সামনে ধরে বলল, ‘ইদ মোবারক। দেখ তো লবল হয়েছে নাকি আমি আবার ওসব বালছাল বুঝি না।’ স্বর্ণ খাবার মুখে নিয়ে মাথা নাড়াল অর্থাৎ ঠিক আছে। তখন শখও এসে দাঁড়াতেই তার মুখে খাবার তুলে দিলো সায়ন। তবে শখ গিলতে পারল না। থম মেরে মুখে খাবার নিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল। একটুপর সায়ন খেয়াল করল শখ নীরবে কাঁদছে। সে হাতের খাবার ফেলে তড়িৎ উঠে দাঁড়িয়ে পানি এগিয়ে দিয়ে বিচলিত হয়ে বলল, ‘ঝাল লেগেছে? কাঁদছিস কেন? নে পানি খা’ সে এত জোরে কথাটা বলেছে রান্নাঘরের তিন জাও ছুটে এসেছে। এবার শখ ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে কান্না

আঁটকাতে গিয়েও পারল না। দুহাতে মুখ চেপে ধরে
বেশ শব্দ

করে কেঁদে ফেলল। এই ইদটাই সো বাবার বাড়ি
করতে পারবে। এরপর থেকে অন্যের ঘরের ঘরনী।
তখন বাবার বাড়ি আসতে গেলে পারমিশন নিতে
হবে। শশুড়বাড়ির লোকদের ভালো-মন্দ দেখতে
হবে। আহনাফের সাথে দেশে বাইরে গেলে তখন
প্রবাদ জীবন। মেয়েদের জীবনটা কে যে এমন?
তাকে এভাবে কাঁদতে দেখে সবার চোখে পানি চলে
এলো। অশ্রু টলমল করে তাকিয়ে রইল শখের
দিকে। সায়ন এগিয়ে গিয়ে বোনকে জড়িয়ে নিতেই
শখের কান্নার যেন বাঁধ ভাঙল। সে ভাইয়ের বুকে
মুখ লুকিয়ে শব্দ করে কেঁদে বলল,-‘আমাকে পর
করে দিও না ভাইয়া। আমি তোমাদেরকে ছাড়া
থাকতে পারব না। ‘

সায়ন বোনের মাথায় হাত রেখে রাখল। বাইরের
মানুষজন জানে সে পাষণ। তার মনে মায়া দয়া
একটু কম সে নিজেও মানে। কিন্তু বোনদের
চোখের পানি সহ্য করতে পারে না সে। কলিজা
ফেটে চৌচির হয়ে যায় যেন। সে শখকে বলল,

-‘কাঁদে না। ইদের দিন কেউ কাঁদে? সেলামী নিবি না
যা নতুর জামা পড়ে আয়।’কথাটা বলতে গিয়ে গলা
কেঁপে উঠল। সিঁতারা চোখ মুছতে মুছতে চলে
গেলেন। শারায়াত চৌধুরী ড্রয়িংরুমের সোফায় বসে
তাকিয়ে আছে এ দিকে। চোখের কোণে ভেজা।
সায়ফওয়ান চৌধুরীও ভাই-বোনের দৃশ্য দেখে চোখ
মুছতে মুছতে বাগানের দিকে চলে গেলেন। সিঁতারা
সিমিন

শখকে সায়নের বুক থেকে সরিয়ে বুঝিয়ে শুনিয়ে
থামালেন। ক্ষুধার্ত সায়নের ক্ষুধা যেন নিমিষেই
হারিয়ে গেল। সে চোখ মুছতে মুছতে সিঁড়ি বেয়ে
উপরে চলে গেল। স্বর্ণের রুম পার করে শীতলের
রুমের কাছাকাছি আসতেই আবার থমকে দাঁড়িয়ে
গেল। শীতল হাউমাউ করে কাঁদছে। নিচে একজন
কাঁদছে বিয়ে হয়ে যাবে তাই কিন্তু এর আবার কি
হলো? এবার কি ইদ বোনের চোখের পানিতে ভেসে
যাবে নাকি? সে এক পা দুই পা করে এগিয়ে রুমের
দরজায় নক করল। তারপর ডাকল,-‘শীতল? রুমে
আছিস?’

সায়নের কথা শোনামাত্রই শীতল হুড়মুড় করে
বেরিয়ে এলো। এতক্ষণে সাহায্যের মানুষটার নাগাল
পেয়ে ঠোঁট ভেঙ্গে কেঁদে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল,

-‘সর্বনাশ হয়ে গেছে ভাইয়া?’

-‘বলিস কি? কার এত বড় সাহস আমার বোনের
সর্বনাশ করে? তার নামটা বল শুধু আমিও তার
সর্বনাশের মাথায় বারি না দিয়েছি তো আমার নামও
সায়ন না।’

-‘আমার একুলও গেল ওকুলও গেল। আমার ইদের
ড্রেসটা বোধহয় পরা হবে না আর।’

-‘কেন কি হয়েছে ড্রেসের?’

সায়ন একথা বলতে বলতে খেয়াল করল শীতলের
গালে ওয়ান টাইম ব্যান্ডেজ লাগানো। সে বিচলিত
হয়ে কিছু বলতে যাবে তাকে অবাকের

চূড়ান্ত সীমানায় ধাক্কা দিয়ে শীতল ব্যান্ডেজ টেনে
তুলে ফেলল। ওমনি তার গালে ফুটে উঠল মেহেদীর
রং। সেখানে আবার লেখা ‘আমার বউ।’সায়ন চোখ
বড় বড় করে তাকিয়ে আছে শীতলের দিকে শীতলের
করুন চোখজোড়া যেন বলছে, ‘বাঁচাও আমাকে।’ সে
এবার বিস্মিত সুরে বলল,

-‘কি রে বনু তোর গালে এটা কি?’

-‘কিভাবে কি হলো বুঝলাম না। আমি ঘুমিয়েছিলাম ঘুম থেকে উঠে দেখি গালে এটা।’

-‘জ্বিন টিনের কাজ নয় তো?’

-‘জ্বিন আসবে কোথা থেকে? আমি তো শুদ্ধ ভাইয়ের রুমে ছিলাম..!’

-‘ওয়েট! ওয়েট শুদ্ধর রুমের কেন?’এবার শীতল ধরা পড়ে গেল। খাবি খাওয়া মাছের মতো আমতা আমতা করতে লাগল। সায়ন, শীতলের কথার মাঝে সেখানে রুবাবও উপস্থিত হলো। সে কিছু বলতে গেলে শীতলের দিকে তাকিয়ে কথা হারিয়ে শুধু ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রইল। শীতল হাত দিয়ে গাল ঘষতে ঘষতে লাল করে ফেলেছে। তবুও গালের রং একটুও উঠে নি বরং ফর্সা গালে গাঢ় রং ফুটে উঠেছে। এখন এই লেখা নিয়ে নিচে যাবে কিভাবে? কেউ কিছু বললে জবাবে কি বলবে? সাধের ড্রেস পরা হবে না বোধহয়। কত প্ল্যান করেছে অথচ একটাও হবে না একটাও না। সবচেয়ে বড় কথা শুদ্ধ ভাই যদি জানে তার হাতে সে ওসব লিখেছে তাহলে চ্যালাকাঠির বারি এদিক ওদিক হবে না। এসব ভেবে সে ফুঁপিয়ে

ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বোনকে কাঁদতে দেখে সায়ন বোনকে নিয়ে বীরপুরুষের মতো শুদ্ধর রুমে ঢুকল। আর এর হেস্তনেস্ত আজ করেই ছাড়বে। পেয়েছে টা কি সে? শুদ্ধ ফ্রেশ হয়ে এসে গেছে সায়ান, রুবার থমথমে মুখে তার বিছানায় বসে আছে। ওকে দেখে সায়ন গম্ভীর মুখে বসতে বলল। সে বসে তাকাল শীতলের দিকে। পাশে বসে হেঁচকি তুলে কাঁদছে শীতল। বোনকে কাঁদতে দেখে সায়নের মুখটা আরো গম্ভীর হয়ে উঠল। সে মেকি রাগ দেখিয়ে শুদ্ধকে বলল,

-‘আমার বোনকে ভালোবাসিস না অথচ তার গালে ‘আমার বউ’ লিখে স্ট্যাম্প ছেপেছিস কেন? খুব সাহস বেড়েছে তাই না? বলব বাবাকে ধরে বিয়ে দিয়ে দিতে?’

-‘কি ছেপেছি?’

-‘ওমা এখন বিড়াল দেখি কয় মাছই চিনে না।’

-‘হেয়ালি না করে সোজা কথা বলো নয়তো উঠলাম।’

-‘কিসের উঠাউঠি? আগে বল ওর গালে এসব কে লিখেছে?’

-‘কিসের লেখা? কার গাল? কিছুই তো বুঝলাম না।’

একথা বলে শুদ্ধ তাকাল শীতলের গালের দিকে।

তারপর ভ্রুঁ কুঁচকে বলল,

-‘গালে এসব কি লিখে ঘুরছিস? বউ হওয়ার খুব শখ
না থাপড়ে দাঁত ফেলে দেবো, বেয়াদব।’

আচমকা শুদ্ধর ধমকে শীতল চোখ বড় বড় তাকিয়ে
রইল। আশ্চর্য তো

তাকে কেন ধমকাচ্ছে শুদ্ধ ভাই? সে নিজেও তো
জানে না কিভাবে কী হলো?এক আকাম করে
ঘুমিয়েছিল উঠে দেখে আরেক আকাম ঘটে ঘ হয়ে
বসে আছে। কথা সেটা না কথা হচ্ছে এখন এর
সমাধান কি? এই বিপদ থেকে বাঁচবে কিভাবে?
কিভাবে মেহেদীর রং রিমুভ করা যায়?সিমিন যদি
দেখে আজ আর তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

এদিকে শুদ্ধও স্বীকার করার মানুষ না। সায়ন আর
রুবাবও কথা না নিয়ে নড়বে না। ভাইদের কথা শুনে
শুদ্ধ এবার প্রচণ্ড বিরক্ত হলো। সামনে থেকে উঠতে
গেলে রুবাব তাকে আঁটকে দিয়ে বলল,

-‘এ্যাঁই খবরদার উঠবি না। এন্ফুণি আমাদের প্রশ্নের
জবাব দে।’

প্রায় আধাঘন্টা যাবৎ এদের ঘ্যান ঘ্যান শুনতে শুনতে
বিরক্ত শুদ্ধ। না এরা বাইরে যাচ্ছে আর না তাকে
কোথাও যেতে দিচ্ছে। তখন থেকে এক ভাষণ দিয়েই
যাচ্ছে। কতক্ষণ সহ্য করা যায়? তাই সেও এবার
শীতলের দিকে তাকিয়ে দাঁত দাঁতে চেপে উত্তর
দিলো,-‘তোদের বোনকে জিজ্ঞাসা কর গতরাতে আমি
ঘুমানোর পর আমার রুমে এসেছিল কেন? শুধু আসে
নি এসে চুপিচুপি আমার হাতে মেহেদী দিয়ে লিখেছে,
‘আমার বউ নাই। আমি এতিম।’ এসব লিখে সে
নিজেই কখন আমার হাতের উপর ঘুমিয়ে পড়েছে।
ফলস্বরূপ তার বাম গালে মেহেদীর রং জ্বলজ্বল
করছে ‘আমার বউ’ লেখা। এখানে আমার কি দোষ?
সে দোষ যখন করেছে এখন শাস্তিস্বরূপ আমার
বউয়ের ট্যাগ নিয়ে ঘুরুক।’ শীতল হতবাক হয়ে কান্না
করা ভুলে গেল। ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রইল শুদ্ধর
মুখপানে। শুদ্ধর কথা শুনে রুবাব শুদ্ধর হাত টেনে
দেখল শুদ্ধর হাতের মেহেদীর রং ও বেশ গাঢ়। এবং
লেপ্টানোর চিহ্নমাত্র নেই। অথচ শীতল যদি তারই
মেহেদীর উপর ঘুমাতো তাহলে লেপ্টে যাওয়ার কথা
ছিল। অতঃপর যা বোঝার বুঝে গেল তারা দু’জনও।

এদিকে শুদ্ধর করা চালাকি ধরতে পেরে তারা শুধু
পারল না মাটিতে গড়াগড়ি করে হাসতে। এদিকে
বোকা শীতল সমাধান না পেয়ে ফিসফিস করে
কেঁদেই চলেছে। তাকে কাঁদতে দেখে সায়ন হাসি
গিলে শুদ্ধকে বলল,

-‘ মেহেদী রিমুভ করার অপশন জানা নেই? থাকলে
তাড়াতাড়ি রিমুভ কর দে নয়তো দু’জনের কপালে
শনি নাচছে।’

একথা বলে সে রুবাবকে নিয়ে চলে গেল। আর শুদ্ধ
শীতলের মুখপানে তাকিয়ে বলল,-‘ কে যেন বলেছিল
আমার নামে কলঙ্ক মাখতে চায়। সামান্য মেহেদীর
ল্যাগ লাগায় কেঁদে কেঁটে একাকার অবস্থা। অথচ
মেহেদীর থেকে কলঙ্কের দাগ তো কয়েক লক্ষ গুন
ভারী।’

একথা বলে শুদ্ধ রুম থেকে বেরিয়ে গেল। শীতলও
মন খারাপ করে নিজের রুমের দিকে হাঁটা ধরল।
যেতে যেতে মনে করল ঘন্টা খানিক আগে ঘটনা,
তখন ভোরবেলা। ভোরের আলো কেবলই ফুটতে
শুরু করেছে। খোলা জানালা ভেদ করে সূর্যের আলো
চোখে পড়তেই শীতলের ঘুম ভাঙ্গে। পিটপিট করে

একবার চোখ খোলো তো আবার বুজে। বেশ কয়েকবার একই কাজকরে নিজেকে বিছানায় ধাতস্থ করে লাফিয়ে উঠে বসে। সে তো মেঝেতে বসেছিল বিছানায় কখন এলো? এলো তো এলো ঘুমিয়ে পড়ল কখন? সে না শুদ্ধ ভাইয়ের হাতে মেহেদী দিতে এসেছিল তারপর দিয়েওছিলো। এরপর কি হলো? একথা মস্তিষ্কে ধাক্কা দিতেই তড়িৎ পাশ ফিরে তাকাল। শুদ্ধ তার থেকে দূরত্বে ওপাশ ফিরে উপুড় হয়ে ঘুমাচ্ছে। শীতল আঙুঠে ধীরে বিছানা থেকে উঠে গেল শুদ্ধর কাছে। শুদ্ধ হাত টেনে নিয়ে চোখ বুলিয়ে দেখে লেখায় ভালোই রং হয়েছে। বাহ্ টকটক করছে। সে মুখ টিপে হেসে ভাবল বাড়ির সবার সামনে শুদ্ধকে খুব লজ্জা দিবে। এতদিন বিয়ের শোক ভেতরে চেপে মনে মনে ঠিক বিয়ের জন্য লাফাত। এখন সেই শোক মন টপকে হাতে এসে পৌঁছেছে ফলে হাতে লিখে রাখে, ‘আমার বউ নাই। আমি এতিম।’ আহা, আহা, বিশুদ্ধ পুরুষের কতই না কষ্ট! এসব ভাবতে ভাবতে তার হাসি চওড়া হলো। আজ ইদের দিন। অনেক কাজ বাকি তাই সে আর দাঁড়াল না। শুদ্ধর হাতটাকে আঙুঠে করে রেখে

যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েও থেমে গেল। পেছনে ফিরে
ঘুমন্ত শুদ্ধর দিকে তাকিয়ে আরেকটু কাছে এলো।
তারপর আরেকটু.. তারপর কানে কানে ফিসফিস
করে বলল, ‘ইদ মোবারক বিশুদ্ধ পুরুষ। একটুপরে
সেলামী নিতে আসব কিন্তু, হুম।’ একথা বলে সরে
গিয়ে দ্রুতপায়ে শুদ্ধর রুম থেকে বেরিয়ে গেল।
নিজের রুমে গিয়ে হাতের মেহেদী দেখে খুশিতে মন
ভালো হয়ে গেল। মেহেদীর রংটা কি যে দারুণ
এসেছে। সে এবার নাচতে নাচতে ফ্রেশ হতে গেল।
ওয়াশরুমের দরজা আঁটকে মিররের দিকে তাকিয়ে
ফ্লায়িং কিস ছোঁড়া তার বদ অভ্যাস। আজও একই
কাজ করতে গিয়ে মিররে তাকাতেই ধপ করে হাসি
নিভে গেল। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে গালে হাত
দিয়ে ঘষে মেহেদী উঠানোর বৃথা চেষ্টা করল। লেখার
উপরে মেহেদীটুকু উঠে গেলে গালে জ্বলজ্বল করে
উঠল ‘আমার বউ।’

সে এবার হতবাক হয়ে বিরবির করল, ‘আমার বউ
মানে? ও খোদা, কার বউ হলাম আমি? রাতের মধ্যে
কার বউয়ের ট্যাগ পেয়ে গেলাম?’ এসব মনে করে
মন খারাপ করে শীতল ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে এলো।

শুদ্ধকে ওর রুমে দেখে কিছু বলার আগে শুদ্ধ তাকে মুখ মুছতে ইশারা করলে তাই করল। তারপর তাকে কিছু বলতে না দিতে তুলোতে কিছু একটা নিয়ে তার গালে আলতো করে ঘষতে লাগল। আশ্চর্যের ব্যাপার মেহেদীর রং পুরোপুরি না উঠলেও হালকা হয়ে এলো। দু'একবার এভাবে ঘষায় দাগ

অনেকটাই হালকা হলো। পুরোপুরি উঠবে না জেনে সেও আর ঘষলো না। একটা ওয়ান টাইম ব্যান্ডেজ গালে লাগিয়ে বলল,-‘কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলবি ব্যথা পেয়েছিস। ‘

এবার শীতলের ঠোঁটে হাসি ফুটল তার কান্না থেমে গেছে। তাকে হাসতে দেখে শুদ্ধ মুখের দিকে কয়েকপল তাকিয়ে চলে গেল। শীতলও সমাধা পেয়ে উড়ন্ত প্রজাপতির মতো ছুটতে ছুটতে নিচে গেল সে। আর গিয়েই বাবাকে দেখে চিৎকার করে উঠল। ইদের দিনে বেস্ট সেলামী যেন পেয়ে গেছে সে। ড্রয়িংরুমে তখন যেন চাঁদের হাঁট বসেছে। বাকিরা শীতলের গালের দিকে খেয়াল করে কি হয়েছে জানতে চাইলে শুদ্ধর বলা কথাটা বলেছে সবাইকে। একটু পরে বাড়ির পুরুষরা একসাথে নামাজে যাবে।

ইদের দিন এটাই যেন অন্যতম দৃশ্য। গিন্নিদের রান্না শেষ। বাড়ির পুরুষরা শাওয়ার নিয়ে রেডি হতে লেগে পড়েছে। কিন্তু রেডি হতে গিয়ে বেঁধেছে আরেক সমস্যা। নিজেদের কেনা আনা পাঞ্জাবী পছন্দ হচ্ছে না সাম্য, সৃজনের। অথচ তারা নিজেরা চুজ করে কিনেছিল। এমন ভাব করেছিল এটা কিনে না দিলে ওখানেই শুয়ে গড়াগড়ি খাবে। এখন এই নিয়ে বেঁধেছে চিৎকার চোঁচামেঁচি। শারফাত চৌধুরীরা তিন ভাই পরেছে একই রকম পাঞ্জাবী। সায়নরা সব ভাইয়েরা পড়েছে এক রকম পাঞ্জাবী। বাড়ির মেয়েরা একই রকমের ড্রেস। বাড়ির গিন্নিরা একই রকমের শাড়ি। এসব রুবাব দিয়েছে সবাইকে। সাম্য সৃজন তো নিজের বাপের টাকায় কেনা পাঞ্জাবী ফেলে ভাইয়ের সাথে মিলিয়ে পাঞ্জাবী পরে এখন বেজায় খুশি। বাড়ির সবাই এখন হালকা মিষ্টি মুখ করে নামাজে যাবে। সবাই উপস্থিত থাকলেও শুদ্ধ নামে নি দেখে সিঁতারা সেমাইয়ের বাটি নিয়ে ছুটলের ছেলের রুমে। শুদ্ধ কানে ফোন ঠেকিয়ে পাঞ্জাবীর হাতা গোটাতে গোটাতে কথা বলছে কারো সাথে। মাকে দেখে স্বল্প কথায় কথা সেরে মুচকি হাসল। সিঁতারা

ছেলেকে দেখে মনে মনে বলেই ফেললেন,
‘মাশাআল্লাহ্! মাআল্লাহ্!’ উনি নিজের হাতে সেমাই
ছেলের মুখে তুলে দিয়ে কপালে চুমু ঐঁকে দিলেন।
শুদ্ধ মায়ের হাতে দুইবার সেমাই মুখে নিয়ে মাকে
জড়িয়ে ধরে বলল, ‘ইদ মোবারক।’ সিতারাও হেসে
ছেলেকে ইদ মোবারক জানিয়ে তাড়াতাড়ি নামতে
বলে চলে গেলেন। উনি যেতেই শীতল শুদ্ধর রুমে
উঁকি দিলো। দেখল বিশুদ্ধ পুরুষকে। না মানতেই হয়
বিশুদ্ধ পুরুষ দেখতে আসলেই সুদর্শন। এমন একটা
মানুষ ব্যক্তিগত পুরুষ হলে মন্দ হয় না। বরং
ভালোই হয় যখন তখন জাপটে ধরে যায়। কিন্তু এই
ষাঁড়টাকে পটাতেই তো পারে না সে। কম চেষ্টা তো
করলো না। এসব ভেবে সে মুখ ভেংচি দিতেই শুদ্ধ
বলল,-‘মেজরের মেয়ে হয়েও ভদ্রতা জ্ঞানের এত
অভাব কেন তোর?’

-‘গরু চোখে আবার দেখে ফেলেছেন? যাই হোক
আসব, শুদ্ধ ভাই?’

-‘কি বললি?’

-‘কই কিছু না তো। ইয়ে রুবাব ভাইয়া আতর দিতে
বলল।’

শুদ্ধ আতর দিলে শীতল শুদ্ধর আপাদমস্তক দেখে
যেতে গিয়ে ফট করে বলে বসল,

-‘সোলামীতে কি টাকা ই দিতে হয় শুদ্ধ ভাই আর
কিছু দেওয়া যায় না?’

-‘ঝেড়ে কাশ।’-‘ না মানে সবার তো আর হ্যান্ডসাম
শুদ্ধ ভাই নাই। আমার আছে তাই তাকেই যদি
আমার নামে কেউ লিখে দিতো তাই বলছিলাম আর
কি।’

-‘ধর কেউ সত্যি সত্যিই লিখে দিলো তাহলে কি
করবি?’

একথা শুনে শীতল থেমে গেল। চটজলদি পেছনে
ফিরে শুদ্ধর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল। তারপর আচমকা
শুদ্ধর বুকের বাঁ পাঁশে চুমু ঐঁকে মিষ্টি হেসে বলে
বসল,

-‘তার বুকজমিনে এভাবে চুমু ঐঁকে আগে আমার
নামটা আগে খোদাই করতাম। তাহলে কেউ নজর
দিতেও পারত না কেড়ে নেওয়ার কথাও ভাবত
না।’-‘তার বুকজমিনে এভাবে চুমু ঐঁকে আগে আমার
নামটা আগে খোদাই করতাম। তাহলে কেউ নজর
দিতেও পারত না কেড়ে নেওয়ার কথাও ভাবত না।’

শুদ্ধ জবাব দিলো না শুধু শীতল দৃষ্টিতে তাকিয়ে
রইল। বুকের কাছটায় অদ্ভুত শিহরণ হচ্ছে। বারে
বারে এভাবে মনের কথা জানালে আর কত সংযম
করা যায়? আর কত ধৈর্যের পরীক্ষা দেওয়া যায়? সে
তো মানুষ।

তারও তো ধৈর্যের সীমা পরিসীমা আছে। চাওয়া-
পাওয়া আছে। ইচ্ছে আকাঙ্ক্ষা আছে। আজকাল ইচ্ছে
করে শীতলকে জানিয়ে দিতে যে তার বুকের গহীনে
ছোট্ট একটি রাজকুঠুরি আছে। সেই কুঠুরিটা দলিল
করা একমাত্র ব্যক্তিগত নারীর জন্য। সেই নারীর
জন্য কুঠুরিতে একটু একটু করে জমা করেছে প্রেম
সাগর। সেই সাগরে ঢেউ নেই। পানি নেই। নেই
কোনো গর্জন। তবুও ভালোবাসার কমতি নেই
সেখানে। বরং দিনকে দিন তা বেড়েই চলেছে।
এদিকে শীতল একবুক আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে
শুদ্ধর দিকে। আর কীভাবে বোঝালে বুঝবে শুদ্ধভাই?
কতভাবে বোঝাব সেও এ মানুষটাকেই খুব করে
চায়। যতটা চাইলে নিজের করে পাওয়া যাবে ঠিক
ততটা চায়। এবার আর মিথ্যা ভালোবাসা নিয়ে
মানুষটার সামনে দাঁড়ায় নি। এবার সত্যি সত্যি

অনুভব করছে কিছু একটা। পূর্বের মতো আজও
শুদ্ধকে চুপ দেখে শীতলের হাসি ধীরে ধীরে মুছে
গেল। সে তবুও শেষ আশাটুকু নিয়ে তাকিয়েই রইল
যেন বিশুদ্ধ পুরুষ কিছু বলে। কিন্তু তাকে হতাশ করে
শুদ্ধ সামনে থেকে সরে গেল। ড্রেসিংটেবিলের
সামনের দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করল। আতর লাগল।
পুরো রুমে সেই সুগন্ধে মাতোয়ারা হয়ে উঠল।
শীতলের খুব ইচ্ছে করল তার বুকে মুখ লুকিয়ে
সুগন্ধ নিতে। কিন্তু এবার করলে সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে
যাবে। মার জুটতে পারে কপালে তাই আর দাঁড়াল না
নিচে চলে গেল। বাড়ির পুরুষরা একে একে নামাজে
চলে গেল। শীতল নিজেও ভাবল গোসল সেরে
ফুলপরী সেজে রেডি হয়ে থাকবে। বাবা-চাচা,
ভাইয়ারা ফিরলেই সালামীর জন্য ধরবে। কিন্তু হঠাৎ
পেট ব্যথা অনুভব করায়নস্মরণ হয়ে গেল আজকের
ডেট। সে চট করে উঠে রুমের দিকে ছুটল। মেয়েকে
এভাবে যেতে দেখে সিমিন খেঁকিয়ে উঠে আস্তে যেতে
বললেন। কিন্তু শীতল শুনলে তো সে দৌড়ে চলে
গেল তার রুমে। এরপর গোসল, সাজগোছ তো দূর
পেটের ব্যথায় জুবুজুব হয়ে বিছানায় পড়ে রইল।

অনেকক্ষণ হয়ে গেছে শীতল নামছে না দেখে সিমিন
উপরে এলেন। মেয়েকে পেটে বালিশ চেপে ধরে শুয়ে
থাকতে দেখে যা বোঝার বুঝে গেলেন। এই কষ্টের
ভাগ তো আর নেওয়া যায় না। কিন্তু কষ্ট যাতে একটু
কম হয় তাই খাবার, মেডিসিন, হট ওয়াটার পট এনে
দিলেন। শীতল ঘুমাবে বলে মাকে যেতে বলে চোখ
বন্ধ করে নিলো। সিমিন আর কথা বাড়ালেন না
দরজা হালকা ভিজিয়ে

চলে গেলেন। সিঁতারা, সিমিন শীতলের কথা জিজ্ঞাসা
করলে সমস্যার কথা বলায় চুপ হয়ে গেলেন।

ওদিকে ঈদগাহ মাঠে নামাজের জন্য কাতারে কাতারে
দাঁড়িয়ে শতশত মুসল্লি। যথাসময়ে নামাজ শেষ করে
চলল কোলাকুলি। তারপর সেখান থেকে ফিরে
চৌধুরীরা ফিরে এলেন বাড়িতে। খাওয়া-দাওয়াও
করলেন।

সাম্য সৃজন একে একে সবার থেকে সালামি নিলো।
শারাফাত চৌধুরী ছোটো ভাই, ছেলে-মেয়ে কিংবা
বাড়ির বউদেরকে সালামি দিতেও বাদ রাখেন না।
সিঁতারাও দেয় দুই জাকে। সালামি দেওয়া-নেওয়ার
পর্ব শেষ করে যে যার মতো ঘুরতে বের হলো।

রুবার বের হলো ঐশ্বর্যের সাথে দেখা করতে। সায়ন ঘুমানোর নাম করে স্বর্ণকে ইশারা করে গেল নিজের রুমে। শুদ্ধ আশেপাশে চোখ বুলিয়ে কাজ্জিত কাউকে না পেয়ে নিজের রুমে গিয়ে টুকটাক ফোনকল সারল। কথা বলতে বলতে খেয়াল করল এখনো একটা পড়ে আছে। খামের উপরে নাম লেখা ‘সুবহানা চৌধুরী।’ তারমানে সে সালামি নিতে রুমে আসে নি। এমনটা তো হওয়ার কথা না।

নিচেও তো নেই তাহলে গেল কোথায়? কিয়ারার সাথে রাস্তা ঘুরতে বের হয়েছে নাকি? যদি তাই হয় তো মার একটাও মাটিতে পারবে না। কান টেনে লম্বা করে দেবে। একথা ভেবে শীতলের রুম পার হতে গিয়ে দেখল দরজা ভিজিয়ে রাখা। রুমে আছে নাকি? ইদের দিন রুমে বসে থাকার মেয়েও তো সে নয়। তবুও একবার নক করতেই শীতল খ্যাঁক করে বলে উঠল, ‘ওই কে রে বাল? উঠতে পারব না যার দরকার ভেতরে চলে আসুন।’

ঝাঁঝালো কণ্ঠে শুনে শুদ্ধ বিরবির করে বলল,
_‘বেয়াদবটাকে ম্যানার্স শিখাতে পারলাম না। ওই কে রে বাল আবার কি কথা? চড়িয়ে দাঁত ফেলে দিলে

যদি শিক্ষা হয়।'বিরবির করতে করতে সে রুমে ঢুকে
দেখে শীতল পেটে বালিশ চেপে চুপ করে শুয়ে
আছে। মুখটা শুকিয়ে এইটুকু হয়ে আছে। সকালে
যেই ড্রেসে দেখে গেছে এখনো পরনে ওই ড্রেস।
তারমানে শাওয়ারও নেয় নি, কিন্তু কেন? কেন এর
উত্তর খুঁজতে গিয়ে কিছু একটা বুঝে নিলো। সব
কথা মুখে না বললেও বুদ্ধিমানরা ঠিক ঠিকই ধরে
ফেলে। হঠাৎ শুদ্ধকে দেখে শীতল শোয়া থেকে উঠে
দাঁড়িয়েছে। ওড়না কোথাও? তড়িঘড়ি ওড়না খুঁজতে
গিয়ে খেয়াল করল ওড়না দিয়ে তার পায়ের পেটি
বাঁধা। কোমর থেকে পা অবধি কেমন কামড়াচ্ছিল
তাই পা বেঁধে রেখেছিল। ওড়নায় যা গিটু মারা
মেরেছে খুলতেও দু'মিনিট লাগবে তাই পাশে রাখা
তোয়ালে গলায় ঝুলিয়ে নিলো। শুদ্ধর দৃষ্টি ততক্ষণ
ছিল শীতলের স্টাডি টেবিলের চেয়ারে। চেয়ারে
ঝুলানো নতুন টি-শার্ট। একদিন পরে তারপর আর
খুঁজে পায় নি। এই লোভী বিড়াল হাতিয়েছে আন্দাজ
করে খোঁজও করে নি। শুদ্ধর পরনে এখনো সকালের
সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি। শীতল

মুগ্ধ হলো। মিনমিন করে বলল, ‘কিছু বলবেন শুদ্ধ ভাই?’

– ‘ডাকাতি করে নয় হাজার টাকা দিয়ে ড্রেস কিনে নিলি। বলিস নি তো সেটা তুলে রাখার জন্য?’

– ‘পরে পরব।’

– ‘পরে কেন?’

– ‘এমনি।’

– ‘যা শাওয়ার নিয়ে আয় ঘুরতে বের হবো।’

– ‘শরীর ভালো লাগছে না। মাথা ঘুরছে। আপুদের নিয়ে যান।’ অথচ অন্যসময় হলে ঘুরতে যাওয়ার কথা শোনামাত্রই সেই লাফিয়ে উঠত। আজ যেন তার সব খুশি ফুরিয়ে গেছে। শুদ্ধ সালামির খামটা এগিয়ে দিলে শীতল অভিমানে থমথমে মুখ তাকিয়ে রইল। সকালে তো বললই সালামি হিসেবে টাকা নিবে না এবার। যা চেয়েছে দিলে পারলে যেন সেটাই দেয়। নতুবা টাকা ফাঁকা লাগবে না তার। বাবা এসেছে একটু ঢং করে মুখ ফুলালেই টাকা পেয়ে যাবে। কিন্তু টাকা তো চায় না তার। চায় জলজ্যান্ত বিশুদ্ধ পুরুষটাকে। একদম আপন করে। নিজের করে।

শীতল খাম ধরছে না দেখে শুদ্ধ বলল, _'ধরছিস না কেন?'

_ 'লাগবে না।'

_ 'না লাগলেও ধর।'

_ 'আমার বাবার অনেক টাকা আছে অন্যের টাকা না নিলেও চলবে।'

শুদ্ধ ভ্রুঁ কুঁচকাল। নিচের ঠোঁট কামড়ে কোনোমতে হাসি আঁটকে বলল,

_ 'তোর বাপের যা আছে সেটা নিবি না তাই তো? তা তোর বাপের কিসের অভাব? কি লাগবে, কিসে খুশি তোর বাপ?'

_ 'মেয়ের খুশির ধার ধারে না আসছে মেয়ের বাপের খুশি ঠেকাতে।'

একথা বলে শীতল মুখ বাঁকাল। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে তাই বসল। একটু আগে খাওয়া শীতলের এঁটো পানিটুকু শুদ্ধ পান করে বলল, _ 'আজ বিশেষ দিন যেহেতু অখুশি রাখব না কাউকে, বল কি চাস?'

_ 'আর কতবার বলব?'

— 'যতবার জানতে চাইব।'

—‘এতবার জানিয়েও যখন প্রাপ্তির খাতা শূন্য তাহলে
জানাব কেন?’

একথা বলে শীতল অভিমানপূর্ণ চোখে শুদ্ধর দিকে
তাকাল। তবে তার

চোখ যেন বলে দিচ্ছে মনের কথা। কণ্ঠস্বর যেন
চিৎকার করে বলতে চাচ্ছে, ‘আমার হয়ে যান বিশুদ্ধ
পুরুষ। ইদ সালামি হিসেবে আপনার ‘আমিটা’ শুধু
আমার জন্য চিরস্থায়ী হোক।’

শীতলকে চুপ থাকতে দেখে শুদ্ধ পুনরায় খাম এগিয়ে
দিলো। শীতল

পুনরায় গোঁ ধরে বলল, —‘বললামই তো সালামি
লাগবে না।’

—‘অন্যদের দিয়ে দিবো?’

—‘হুম।’

—‘ভেবে বলছিস?’

—‘হুম।’

—‘সালামি হিসেবে স্বয়ং শুদ্ধ ছিল, তাকেও কি
তবে..?’

—‘হুম।’ একথা বলে শীতল তড়িৎ তাকাল শুদ্ধর
দিকে। চোখ-মুখে বিস্ময়। তাকে আরেকদফা অবাক

করে দিয়ে শুদ্ধ হাত ধরে টেনে বুকে জড়িয়ে নিলো
শীতলকে। আকস্মিক কান্ডে শীতল বাকহারা।
নড়চড়ও ভুলে গেছে যেন।

বুকের ভেতর অদ্ভুত শিহরণ। হাত-পা যেন কাঁপছে।
তার মাথা ঠেঁকেছে শুদ্ধর বুকে। তবে কি শুদ্ধ ভাই
মেনে নিচ্ছে তাকে? সত্যি? সত্যি সত্যিই তার
ব্যক্তিগত পুরুষ হবে শুদ্ধ ভাই? তার এখনো স্বপ্ন স্বপ্ন
লাগছে কেন? নাকি সত্যিই স্বপ্ন দেখছে একটুপরেই
ঘুম ভেঙে যাবে? যদি স্বপ্ন হয় তো এই ঘুম না
ভাঙ্গুক। আর যদি সত্যি হয় তো আজ পৃথিবীর
সবচেয়ে সুখী মানুষ সে। তার অবস্থা দেখে শুদ্ধ
ফিচেল হাসল। বাঁধন একটু শক্ত করে ধরল। তারপর
একটু ঝুঁকে কানে কানে বলল, ‘ইদের দিন সম্পর্কের
দৃঢ়তা বাড়াতে কোলাকুলি করা উত্তম।’

একথা শুনে শীতল শুধু লাজুক হাসল। তার
গালজোড়া কেন জানি লাল হয়ে উঠেছে। সে এখনো
বিশ্বাস করতে পারছে না। হঠাৎ কি ভেবে তার
কম্পিত হাতজোড়া রাখল শুদ্ধর পিঠের উপর। না
স্বপ্ন নয় এই যে প্রিয় পুরুষটাকে ধরতে পারছে।

ছুঁতে পারছে। অনুভব করতে পারছে। তখন শুদ্ধ
হঠাৎ বলল,

-‘এবার সবার সামনে আমাকে গ্রহন করতে যদি
পিছিয়েও যাস তাহলে আমায় চিরতরে হারাবি।
ওয়াদা করে বলছি, সত্যিই হারাবি। কেঁদে মরে
গেলেও আমাকে পাবি না। যেন না পাস এজন্য
তোকে আমার বিয়েতে প্রধান সাক্ষী করে অন্য
মেয়েকে নিয়ে বাসরে ঢুকব আমি।’ একথা শুনে শীতল
শক্ত করে খামচে ধরল শুদ্ধকে। কয়েকবার মাথা
নাড়িয়ে বোঝাল এসব শুনতে চাস না। এসব কথা
শুনলে তার নিঃশ্বাস আঁটকে আসে। তার অবস্থা দেখে
শুদ্ধর বুকের ভারটা যেন কমে এলো।

বুঝল, হারানোর ভয়টা ভালো ভাবেই শীতলের মনে
ঢুকাতে পেরেছে।

তাই মনে মনে খুশি হয়ে সামনে তাকাতেই দেখে
সিমিন দাঁড়িয়ে আছে।

উনাকে দেখে শুদ্ধ সোজা হয়ে দাঁড়াতেই শীতল বাঁধা
দিলো। মাকে না দেখে শুদ্ধকে খাবলে ধরে পুনরায়
মাথা রাখল প্রিয় পুরুষটার বুকে। এবার শুদ্ধ তাকে
সরাল না বরং সিমিনের আগুন চোখে চোখ রেখে

তাকিয়ে রইল একদৃষ্টিতে। তখন সিমিন হাতের প্লেটটা স্বজোরে আছড়ে ফেলতেই শীতল চমকে উঠল। বিস্ফোরিত দৃষ্টিকে মাকে দেখে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। মেয়ের বেহায়াগিরি নিজের চোখে দেখে রাগটাকে সামলাতে পারলেন না তিনি। মারতে তেড়ে আসতেই শুদ্ধ শীতলকে আড়াল করে মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর ঠান্ডা সুরে বলল,-‘এখানে এই বিষয়ে কোনো কথা হবে না ছোটো আম্মু। যাবতীয় কথা হবে ড্রয়িংরুমে সবার সামনে।’

একথা বলে সে শীতলের হাত ধরে টেনে নিচে নিয়ে গেল। শুরুর দিকে জোরে হাঁটলেও কিছু একটা মনে করে ধীরে সুস্থে সিঁড়ি দিয়ে নামল।

এদিকে সিমিনের সাথে তখন সাম্য সৃজনও গিয়েছিল। কারণ সকাল থেকে শীতলকে তারা দেখে নি। এদিকে সালামি টাকা গুনার সময় হয়ে গেছে। কিন্তু তারা শুদ্ধ শীতলকে জড়াজড়ি অবস্থায় দেখে সিমিনের প্লেট ছোঁড়া দেখে বিপদের সংকেত বুঝে গেছে। তাই দৌড়ে চলে গেছে সায়নের কাছে। ঘুমন্ত সায়নকে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ডাকছে,-‘সায়ন ভাইয়া!

এই সায়ন ভাইয়া, ওঠো তাড়াতাড়ি দেখো সর্বনাশ
হয়ে গেছে।’

-‘প্যাঙ্গার দল জ্বালাস না তো। ঘুমাতে দে।’

-‘ওইদিকে গিয়ে আগে দেখো কি হয়েছে? শুদ্ধ ভাইয়া
আর শীতল আপু চুপিচুপি প্রেম করছিল। তখন
ছোটো আম্মু দেখে ফেলেছে। এখন ওদের দুমদুম
করে মারবে বোধহয়।’

-‘শুদ্ধ আর শীতলের প্রেম কবে হলো যে তারা প্রেম
করছিল?’

-‘জড়াজড়ি করলেই তো প্রেম হয়ে যায়। তুমি কিছুই
জানো না দেখছি।’

এবার সায়নের ঘুম ছুটে গেল। চোখ বড় বড় তাকিয়ে
কিছু বলার আগে শুনতে পেল নিচে গোলমাল হচ্ছে।
তাহলে ঘটনা সত্যি নাকি? সে তড়িৎ

লাফ মেরে উঠে নিচে যাওয়ার জন্য ছুটল। সিঁড়ি
বেয়ে নামতে নামতেই দেখল বড়রা সবাই জড়ো হয়ে
গেছে। শুদ্ধর কোমরের কাছটার পাঞ্জাবি
খামচে ধরে তার পেছনে শীতল দাঁড়িয়ে আছে।
ফিসফিস করে কাঁদছে।

সে গিয়ে দাঁড়াতেই সিমিন শাহাদত চৌধুরীর উদ্দেশ্যে বললেন,-‘এবার হলো তো? মিলল আমার কথা?’

-‘সিমিন থামো। ব্যাপারটা আগে বুঝতে দাও। শুদ্ধ কি হয়েছে?’

শুদ্ধ তখনো শিনা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। না আছে তার চোখে ভয়। আর না কণ্ঠে বিব্রতবোধ। শাহাদত চৌধুরীর কথায় সে এবার অকপটে জবাব দিলো,

-‘আমি শীতলকে বিয়ে করতে চাই। কবে, কখন, জানি না তবে সে বউ হলে আমার বউ হবে।’

অকপটে বলা কথা শুনে থমকে গেল ড্রয়িংরুম। হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন সকলে। তখন সিমিন খেঁকিয়ে উঠে বললেন,-‘এ হয় না এটা রক্তের অপমান!’

-‘কেন হয় না?’

-‘কারণ তোমরা ভাই-বোন..!’

শুদ্ধ এবার উনার কথা কেড়ে ভুলটা সংশোধন করে দিলো,

-‘উহুম একটু ভুল হলো। আমরা চাচাতো ভাই-বোন। যেখানে আমাদের ধর্মে জায়েজ আছে সেখানে আর কোনো বাড়তি কথার কারণ দেখছি না।’

এবার সিরাত মুখ খুললেন,

-‘মানলাম ধর্মে জায়েজ তবুও মানুষ কি বলবে?’-‘বাইরের মানুষের ধাঁর কবে ধারলাম আমি ,ঠিকঠাক মনেও তো পড়ছে না? আর তোমরা কেউ বলে দাও নি কেন চাচাতো ভাই-বোনের মধ্যে কিছু হওয়া যাবে না। এখানে মূলত ভুলটা আমাদের নয়, তোমাদের!’

একথা শুনে এবার সিমিন রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বললেন,

-‘এত যুক্তিতর্ক শুনতে চাই না। আমি মানি না তোমাদের সম্পর্ক।’

-‘সেটা তোমার ব্যাপার। জানানো দরকার তাই জানালাম মানলে ভালো নয়তো আমাদের পথ আমরা বেছে নেবো।’-‘আমি শীতলকে বিয়ে করতে চাই। কবে, কখন, জানি না তবে সে বউ হলে আমার বউ হবে।’

অকপটে বলা শুদ্ধর কথা শুনে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন সকলে। এ ছেলে কি বলে এসব? বলা নেই, কওয়া নেই, ডিরেক্ট বিয়ে! তাছাড়া এরা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বিশ ঘন্টায় পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করে।

মারামারি করে, সুযোগ খুঁজে বেড়ায় কে কাকে বকা
খাওয়াবে। কিছুদিন আগেও শুদ্ধ শীতলকে চালাকাঠ
দিয়ে মারল। মার খেয়ে শীতল শুদ্ধর সিগারেট খাওয়া
ছবি সবাইকে দেখাল। মরা কান্না কেঁদে সিঁতারা
শুদ্ধকে না বকা অবধি থামলই না। কথা খোঁচাখোঁচি
করার ব্যাপারটা নাহয় বাদই রইল!

তাহলে কিভাবে কি..? নাকি দু'জনে মিলে প্রাঙ্ক
করছে? আজকালকার ছেলে-মেয়েরা যা বিচ্ছু হাট
অ্যাটাক করার মতো কাজবাজ করে বলে, 'প্রাঙ্ক।'।
এজন্য আগ বাড়িয়ে কিছু না বলে সকলেই আগে
ঘটনা বোঝার চেষ্টা করছেন। তবে শুদ্ধর কথা শুনে
সিমিন খেঁকিয়ে উঠে বললেন,-'এ হয় না এটা রক্তের
অপমান!'

- 'কেন হয় না?'

- 'কারণ তোমরা ভাই-বোন..!'

একথা শুনে শুদ্ধ ফিচেল হেসে ভুল সংশোধন করে
দিলো,

- 'উহুম, একটু ভুল হলো যে ছোটো আম্মু? হ্যাঁ,
আমরা ভাই-বোন তবে চাচাতো ভাই-বোন। আর
চাচাতো ভাই-বোনের বিয়ে স্বয়ং ইসলাম ধর্মে জায়েজ

আছে। যা ধর্মে জায়েজ সেখানে বাড়তি কথার কারণ দেখছি না।’

-‘ধর্ম নিয়ে যখন এতই জ্ঞান রাখো তাহলে সম্পর্কে জড়ালে কেন? ধর্মে কি বলা নাই প্রেম ভালোবাসা হারাম?’

-‘কাউকে মন থেকে ভালোবাসা হারাম না বরং অবিবাহিত অবস্থায় দীর্ঘ দিন সম্পর্ক চালিয়ে যাওয়া হারাম। মন থেকে কাউকে ভালোবেসে বিয়ে করতে চাওয়া হারাম না বরং গোপনে প্রেমের নামে স্পর্শ করাটা হারাম। আমি যেসব কিছুই করি নি। বরং হারাম কিছু যেন না ঘটে তাই আজকে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব রাখছি।’-‘কেমন সাধু তা তো চোখেই দেখলাম। আমি না দেখলে...।’

সিমিনের কথা আঁটকে গেল। উনি ফোঁস ফোঁস করতে করতে অন্যদিকে তাকালেন। রাগে শরীর জ্বলে যাচ্ছে উনার। তবে ভাসুরের সামনে উনি থামলেও শুদ্ধ থামল না। সে অকপটে উত্তর দিলো,-‘কি দেখেছো? ওহ, জড়িয়ে ধরেছিলাম তোমার মেয়েকে এটা? বুকে জায়গা দিয়েছি তবে আমার মনে কোনো নোংরা চিন্তা ছিল না আর না হাতের স্পর্শে

ছিল অবাধ্যতা। হয়তো ভাবছো তুমি দেখেছো বলে
আমি সবাইকে জানালাম। তা কিন্তু নয়! বরং আজ
ইদের দিন আমার গোপন

ভালোবাসা উন্মুক্ত করেছি ওর জন্য। কেন জানো?
কারণ তোমার মেয়ে সালামি হিসেবে আমাকে চেয়েছে
আমার টাকা নয়! তার চাওয়াটুকুকে পূরণ করতে
আজই আমি বিয়ের কথা জানাতাম কারণ লুকোচুরি
প্রেম করার মতো ধৈর্য্য আমার নেই। আর ধৈর্য্য নেই
বলেই তোমার হাঁটাচলার শব্দ শুনেও আমি ওকে বুক
থেকে সরাই নি। ভদ্র সেজে দাঁড়িয়ে যায় নি তোমাকে
দেখে। যদি সেরকম ইচ্ছে থাকত তবে ধরতে পারতে
না তুমি। যেমনটা এতদিন পারো নি...!’ একথা বলে
শুদ্ধ থেমে সায়নের দিকে তাকাল। তবে তার এই
তাকানোর মানে কেউই বুঝল না। আর বুঝল না
বলেই এবার সিরাত মুখ খুললেন,

-‘মানলাম ধর্মে জায়েজ তবুও মানুষ কি বলবে?’

-‘বাইরের মানুষের ধাঁর কবে ধরলাম মনে পড়ছে না।

আর তোমরা বলে দাও নি কেন চাচাতো ভাই-বোনের
মধ্যে কিছু হওয়া যাবে না। এখানে মূলত ভুলটা
আমাদের নয়, তোমাদের!’

একথা শুনে পুনরায় সিমিন রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে
বললেন,

-‘এত যুক্তিতর্ক শুনতে চাই না। আমি মানি না
তোমাদের সম্পর্ক,ব্যস!’

-‘সেটা তোমার ব্যাপার। জানানোর দরকার তাই
জানালাম মানলে ভালো নয়তো আমাদের পথ আমরা
বেছে নেবো।’

-‘পথ বেছে নেবে মানে?’

-‘মানে হলো এটাই যে, তুমি যা ভাবছো একদম
তাই।’এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুই পক্ষের কথা
শুনছিলেন শারাফাত চৌধুরী। ছেলের কথার ভঙ্গিমা
বলে দিচ্ছে সে এই ব্যাপারে ভীষণ সিরিয়াস। তবে
যাকে নিয়ে এত কথা হচ্ছে তার মতামতও জানা
দরকার। তাই উনি হাত উঠিয়ে সবাইকে থামতে
বললেন। তারপর শুদ্ধর পেছনে লুকিয়ে থাকা
শীতলকে ডাকলেন,

-‘মা এদিকে এসো।’

উনার ডাক শুনে শীতল হুঁদুরের মতো উঁকি দিয়ে
বলল,

-‘যেতে গেলে আম্মু খপ করে ধরে খুব মারবে তুমি বলো আমি শুনছি।’

-‘শুদ্ধকে কি কোনো কারণে তোমাকে ফোর্স করেছে? কোনো কিছু নিয়ে ভয় দেখিয়ে এসব বলাচ্ছে? নাকি দুজন প্ল্যান করে আমাদের সাথে প্রাঙ্ক করছো?’ শারাবাত চৌধুরীর কথা শুনে শুদ্ধর ভ্রুঁ কুঁচকে তাকাল। ফোর্স? এখানে ফোর্সের কথা কোথা থেকে এলো? ফোর্স করলেই মানবে এত সরল নয় নিশ্চয়ই চৌধুরীকন্যা? যেখানে সে নিজেই চুমু টুমু খেয়ে, শরীরে জীবানু ছড়িয়ে, একা একাই তার নামে গায়ে কলঙ্ক টলঙ্ক মেখে একাকার করে ফেলেছে, সেখানে সে নাকি ফোর্স করবে, হাস্যকর! তবে শুদ্ধ আর কথা বাড়াল না শীতলের মুঠোয় থেকে পাঞ্জাবি ছাড়িয়ে হাতটা টেনে সামনে দাঁড় করিয়ে দিলো। আর মুখে বলল,-‘প্রাপ্তি আর মুক্তি তোর হাতে যা করবি ভেবে করিস।’

শীতল ভয়ে ভয়ে তাকাল রাগান্বিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা মায়ের দিকে এরপর শারাবাত চৌধুরীর দিকে। তবে কানে একই সুরে বাজতে থাকল কিছুক্ষণ আগের বলা শুদ্ধর কথা,

‘এবার সবার সামনে আমাকে গ্রহন করতে যদি
পিছিয়েও যাস তাহলে আমায় চিরতরে হারাবি।
ওয়াদা করে বলছি, সত্যিই হারাবি। কেঁদে মরে
গেলেও আমাকে পাবি না। যেন না পাস এজন্য
তোকে আমার বিয়েতে প্রধান সাক্ষী করে অন্য
মেয়েকে নিয়ে বাসরে ঢুকব আমি।’ একথা স্মরণ
করতেই মনে হলো কেউ যেন তার কলিজায় ভয়াল
থাবা বসাল। রক্তাক্ত করে দিলো বক্ষপাশ। তার
আক্ষিপট অশ্রু ছলকে গড়াতে লাগল। শুদ্ধর দিকে
একবার তাকাতে গিয়ে সায়নের দিকে নজর পড়ল।
চাহনিতে যেন বলছে, ‘ওহ ভাইয়া বাঁচাও!’ সায়ন
বোনের চাহনি বুঝে দুই কদম এগিয়ে এলো। মাথায়
হাত রেখে গুরুগম্ভীর সুরে জিজ্ঞাসা করল,- ‘শুদ্ধর
নামে কবুল পড়বি? কাজি ডাকব?’

শীতল মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ চুপ থেকে মৃদুভাবে
মাথা নাড়াল কেবল।

অর্থাৎ রাজি। তা দেখে সায়ন বোনের মুখ উপরে
তুলে সুস্পষ্টভাবে বলে বসল,

-‘ভালোবাসলে সর্ব সম্মুখে ভালোবাসা প্রকাশের সৎ
সাহস থাকতে হয়। যদি না থাকে সে ভালোবাসা

পাওয়ার যোগ্য নয়! এই আমি যেমন তোর বোনকে
ভালোবাসি। পুরো পৃথিবীর সামনে গর্ব করে বুক
ফুলিয়ে বলতে পারি ,আমি স্বর্ণকে ভালোবাসি। বিয়ে
ওকেই করব। সে হবে চৌধুরীদের বড় পুত্রবধূ।
আমার বিশ্বাস, হাত বাড়ালে আমার স্বর্ণও এগিয়ে
আসবে। প্রয়োজনে আমার বাড়ানো হাত ধরতে সে
এই বাড়ি ছেড়ে দেবে। তাহলে তুই আমাদের বোন
হয়ে ভালোবাসা প্রকাশে ভয় পাচ্ছিস কেন? একবার
শুনিয়ে দে, তুই হলি শোয়াইব শুদ্ধর হবু বউ!’

সায়নের এ কথা শুনে সকলে যেন আরেকবার
আকাশ থেকে পড়লেন।

শুদ্ধর সঙ্গে শীতলের কথা মানলেও সায়ন-স্বর্ণের কথা
মানতে পারলেন না কেউই। থমথমে মুখে তাকিয়ে
রইলেন সকলে। এটা সম্ভবই নয় কারণ

লোক সমাজে উনাদের চলতে-ফিরতে হয়। যখন
বাইরের সবাই জানবে তখন কিছুর বলার আগে
ভাববে বাড়িতে নিশ্চয়ই অঘটন ঘটেছে। নতুবা

এক ভাইয়ের ছেলের সঙ্গে আরেক ভাইয়ের দুই
মেয়ের বিয়ে বা দেবে কেন? দিলে একজনের দিক,
তাই বলে দু’জনের? এমন না যে চৌধুরীরা

খারাপ কিংবা ছেলে-মেয়েরা খারাপ যার জন্য বিয়ে আসে না। বিয়েতো অহরহ আসে, যদি আসে তাহলে বাড়িতে কেন আত্মীয়তা করতে হবে?মোদাকথা, ছেলে-মেয়েরা যদি এতই সাধু হয় তাহলে বাইরে আত্মীয়তা করতে সমস্যা কোথায়? নাকি মেয়ে দুটোর চরিত্রে দোষ আছে? যদিও

তারাই নিষ্পাপ হয় তাহলে কি ছেলে দুটোর মাঝে খাপলা আছে। নতুবা সচারাচর এমন তো দেখা যায় না। এসব প্রশ্নকে সাইডে রেখে এটা যদি বলা হয়, তারা নিজেরা পছন্দ করে বিয়ে করেছে। এটা কি গ্রহনযোগ্য?

তাও কিন্তু নয়। বরং হাসাহাসির কারণ পেয়ে বলবে আজকাল চৌধুরী নিবাসে পরিকল্পনা করে ভালোবাসবাসি চলে। এসব কথার কে জবাব দেবে? এদিকে স্বর্ণ চুপ করে তাকিয়ে আছে সায়নের মুখপানে। দেখছে একজন অধৈর্য্য প্রেমিক পুরুষকে। দেখছে তার প্রতি অগাধ বিশ্বাস বুকে নিয়ে আধা পাগলকে। যাকে এতদিন বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাখলেই আজ সে

অঘটনটা ঘটিয়েই ফেলেছে। আচ্ছা, সে কী আন্দাজ
করতে পারছে তার কথায় এখন সব সম্পর্কের বাঁধন
নড়বড়ে যেতে পারে। শুদ্ধ-শীতলের
পূর্ণতার মাঝে অপূর্ণতার শত্রু দেওয়াল হয়ে ওঠার
কারণও হতে পারে। এদিকে সায়নের কথা শেষ
হতেই সিমিন দু পা পিছিয়ে গেলেন। অশ্রুসিদ্ধ চোখে
তাকিয়ে রইলেন মেয়েদের দিকে। তারা জানে আজ
তারা তাদের মাকে গো হারান হারিয়ে দিয়েছে?
এটাকে শুধু হারিয়ে দেওয়াই বলে না বলে একেবারে
শিরদাঁড়া ভেঙে দেওয়া। গোপনে থাকা আতঙ্ক
অবশেষে সত্যি হয়েই গেল? উনাকে পেছাতে দেখে
স্বর্ণ এগোতেই উনি হাত উঠিয়ে বারণ করলেন। আর
কিছু বলারও নেই, শোনারও নেই, মেয়েরাও এখন
অনেক বড় হয়ে গেছে, নিজেদের পথ নিজেরাই বেছে
নিতেও শিখেছে। এবার তাহলে ছুটি নেওয়ার পালা।
যদিও ছুটি বলে না এটাকে বলে চুপ করে পালিয়ে
যাওয়া। উনি কিছুক্ষণ থম মেরে লালবর্ণ চোখে
তাকালেন শাহাদত চৌধুরী দিকে। তারপর আঁচলে
চোখ, মুছে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে বললেন,

-‘এতদিন তোমার সঙ্গে যেতে রাজি হই নি। এই সংসার ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবতে পারি নি। আজ যেতে চাচ্ছি। সঙ্গে নেওয়া সম্ভব হলে নিও নয়তো একেবারে তিন তালাক দিয়ে আমাকে মুক্ত করে দিও। যদি তাও না পারো তবে আমার দাফনের জন্য তৈরি থেকো।’

সিমিনের কথা শুনে শাহাদত চৌধুরী কথার খেই হারিয়ে ফেললেন। শুধু অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন সহধর্মিণীর দিকে। এ যেন অচেনা কেউ। এতগুলো বছরে উনি জেনে এসেছে সিমিনের কাছে উনি পুরো পৃথিবী।

আর মেয়েরা হলো পৃথিবীকে ঘিরে রাখা অনাবিল সুখ। আজকে পৃথিবী আর সুখ দুটোকেই সিমিন অনায়াসে বিসর্জন দিয়ে দিচ্ছে? দাফন করা, তালাক দেওয়ার কথা বলতে একবারও বুক কাঁপল না? মনে পড়লো না সামনে দাঁড়ানো মানুষটা সহ্য করতে পারবে কী না? এদিকে শুদ্ধ, সায়ন, আর দরজায় দাড়ানো রুবাব যেন বাকহারা। তারা কল্পনাও করতে পারে নি তাদের নরম সরম ছোটো আঁমু একথা বলতে পারে। কিন্তু এই ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে

দেখে এবার সায়ন এগিয়ে এলো। শিনা উঁচু করে
সরাসরি সিমিনকে বলল,

-‘এতটাই অযোগ্য আমরা?’

সিমিন জবাব দিলো না মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে
তাকিয়ে রইল। সায়নও তখনো গো ধরে দাঁড়িয়ে
পুনরায় জিজ্ঞাসা করল,-‘যতক্ষণ না আমাদের অপরাধ
চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে পারবে ততক্ষণ বাড়ি
ছাড়ার কথা মুখে এনো না। কেন মানবে না, কী
অপরাধ ণ

আমাদের স্পষ্ট করে জানাও।’

সিমিন চলে যেতে নিলে এবার স্বয়ং সিঁতারা চৌধুরী
সিমিনের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। ছোটো জায়ের মুখের
দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললেন,

-‘তোমার স্বামীর সঙ্গে তুমি যেতেই পারিস কিন্তু আমার
ছেলেদের অপরাধ জানিয়ে যা। কেন অদৃশ্য আঙুল
তুলছিস আমার ছেলেদের দিকে? ঠিক কোন কারণে
মানতে পারবি না? আমার তো মানতে সমস্যা নেই।
তাহলে তোমার কিসের সমস্যা?’

-‘আমার সমস্যা একটাই আমি খারাপ মা। আমার
শিক্ষা খারাপ। যদি শিক্ষা ভালো হতো তাহলে

একসাথে দু'জনই বিপথে যেতো না। আমাকে সকলের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ করতে কাঁটার পথ খুলে দিতো না।’

-‘আমার ছেলেরা তোর পথের কাঁটা? বিপথ? কি বোঝাতে চাচ্ছিস তুই?

এতদিন তো তোরা আমার সন্তান বলে কিছু ছিল না, তবে আজ কেন? নাকি এতদিন ছল করেছিস?’

-‘যা ভাববে তাই। আজ থেকে ধরা নাও আমি মরে গেছি। তবে তোমাকে

স্বার্থপর দুটোর দায়িত্ব দিয়ে গেলাম যা ইচ্ছে করার কোরো। যে মেয়েরা মায়ের কথা ভাবে না আমিও আর তাদের কথা ভাবব না।’একথা বলে সিমিন জাকে সরিয়ে চলে যেতে নিলে শীতল মায়ের আঁচল টেনে ধরল। মাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল,

-‘যেও না আম্মু। আমরা তোমাকে ছাড়া থাকতে পারব না।’

-‘তাহলে দু’দিনের ভালোবাসা পায়ে পিষে চলে আমার সঙ্গে।’

একথা শুনে শীতল থমকে গেল। ঠোঁট ভেঙে কেঁদে
ফোঁপাতে ফোপাঁতে বলল,

-‘মেনে নাও না আম্মু আমরা চারজনে অনে..ক....।’

শীতল কথা শেষ করতে পারল না তার আগে সিমিন
স্বজোরে দুই থাপ্পড় মেরে বসলেন শীতলের গালে।
এবার শুদ্ধ যেন রাগের মাত্রা হারাল। সে চোখ বন্ধ
করে তেড়ে যেতে নিলে আঁটকে ফেলল রুবাব। তবুও
থামল না সে কঠিনসুরে বলল,

-‘যখন তখন গায়ে হাত তুলে কি বোঝাও মেয়ে
তোমার একারই আছে? আর কারো মেয়ে নেই? আর
কেউ মেয়েকে শাষণ করে না? অহেতুক

কথা আসছেই বা কেন? আমাদের মানতে সমস্যা
থাকলে বলতে বাঁধা কিসের?’-‘ওহ এখন কি আমি
আমার মেয়েকেও শাষণ করতে পারব না? শাষণ
করতে গেলে তোদের পারমিশন নিতে হবে?’

-‘শাষনেরও লিমিট থাকে। কথা হচ্ছে সবার সাথে
ওর গায়ে হাত তুললে কেন? মেইন কালপ্রিট হচ্ছে
আমি আমাকে মারতে? ওকে কেন মারলে?

কেন বার বার, কারণে-অকারণে ওর গায়ে হাত
তোলে তুমি? কি সমস্যা তোমার! আর কতবার বারণ

করব তোমাকে যে ওর গায়ে হাত তুলবে না। আমি সহ্য করতে পারি না!’

-‘আমি লিমিট বুঝি না বোঝার যোগ্যতাও আমার নেই। আমি সরে যাচ্ছি এবার থেকে যার যা ভালো লাগে করুক।’

শুদ্ধ রুবাবের থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে সিমিনের মুখোমুখি দাঁড়াল। বুক উঁচিয়ে শীতল চাহিনীতে তাকিয়ে থমথম সুরে বলল,-‘তুমি মেইন টপিকে না এসে বার বার পিছলে যাচ্ছে যা বলার সরাসরি বলো। আমি শুনতে চাই তোমার সমস্যার কথা। বলো, কোন দিক থেকে আমরা অযোগ্য? কি নেই আমাদের? আমরা বাউডুলে? নেশাখোর?

মেয়েবাজ? নাকি বেকার, কোনটা? নাকি আগে থেকে কাউকে জামাতা হিসেবে খুঁজে রেখেছো? বলো কোনটা? আচ্ছা, তারা আমাদের থেকেও হাই লেভেলের? নিশ্চয়তা নিয়েছো তোমার মেয়ে তাদের কাছেই ভালো থাকবে?’

শুদ্ধর কথা যেন সিমিনের গায়ে জ্বালা বাড়িয়ে দিলো।
উনি দাঁতে দাঁত চেপে অগ্নিদৃষ্টি ছুঁড়ে বললেন,
-‘সেই কৌফিয়ত আমি কাউকে দেবো না।’

-‘কেন দেবে না? না দিলে কিসের এত বিরোধিতা? ওকে মানলাম যাও দিও না কৌফিয়ত, তাহলে মেয়ে দাও। দু’দিকেই যদি মুঠো এঁটে রাখো তাহলে তো হবে না। হয় বলো কেন মানবে না আর নয়তো মেনে নাও।

উপযুক্ত কারণ ছাড়া আমাদের দিকে আঙুল তুললে আমরাই বা কেন মানবো?’

-‘আমার সমস্যা তোমরা চৌধুরী বাড়ির ছেলে। আমার সমস্যা তোমরা সিঁতারী চৌধুরীর ছেলে আর প্রধান সমস্যার কথা যদি বলি তাহলে বলব যে বাড়ির বউ আমি সে বাড়ির বউ হবে না আমার মেয়েরা। যদি হয় তো আমি থাকব না সে বাড়িতে।’-‘কেন থাকবে না? তুমি করবে তোমার স্বামীর সংসার, তোমার মেয়েরা করবে ওদের স্বামীর সংসার তাহলে সমস্যাটা কোথায়? কেন অযৌক্তিক কারণে এত কথা, এত তর্ক?’

সিমিন আর একথা কথাও বলল না পাশ কাটিয়ে রুমে চলে গেল। উনার

যাওয়া দেখে শাহাদত চৌধুরীও গেলেন সহধর্মিণীকে বোঝাতে। আজকে সিমিন যেন বোঝার অবস্থায় নেই

উনি আধাঘন্টার মধ্যে লাগেজ টানতে টানতে বেরিয়ে
এলেন। শাহাদত চৌধুরী কথাও মানতে নারাজ।
সিঁতারা, সিরাতও পারলেন না উনাকে বোঝাতে ফলে
ব্যর্থ হয়ে কাঁদতে লাগলেন। শারায়াত চৌধুরী শুধু
নীরবে তাকিয়ে দেখতে থাকলেন সোনার সংসার
ভেঙে যাওয়ার দৃশ্য! সিমিন কিসব ভেবে যেন পুনরায়
ফিরে এসে উনার সামনে দাঁড়ালেন। হাতজোড় করে
কাঁদতে কাঁদতে বলল,

-‘আমাকে ক্ষমা করে দেবেনভাইয়া। কারো কোনো
দোষ নেই কারো প্রতি আমার কোনো অভিযোগও
নেই। ফলের ঝুঁড়িতে যখন একটা আম পঁচে যায়
তখন বাকি আম ভালো রাখতে পঁচা আমটাকে সরিয়ে
ফেলতে হয়। আমি সেই পঁচা আম তাই নিজে থেকে
সরে যাচ্ছি। সবাইকে নিয়ে ভালো থাকবেন,
আসছি।’ একথা বলে উনি দাঁড়ালেন না গটগট করে
বেরিয়ে গেলেন। শীতল এক ছুটে মায়ের কাছে পা
আঁকড়ে ধরে বসে পড়ল। সিমিন আজকে পাথর বনে
গিয়ে শীতলের থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো।
শাহাদত চৌধুরীও বেরিয়ে এলেন বেশ দেখে মনে
হচ্ছে উনিও চলে যাচ্ছেন। ভাইয়ের দিকে তাকানো

সাহস হলো না দেখে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে
গেলেন। বাবা মাকে যেতে দেখে স্বর্ণ এবার শীতলকে
উঠিয়ে দরজার দিকে এগোতেই
সায়ন পথ আঁটকে দাঁড়াল। স্বর্ণের চোখে চোখ রেখে
বলল,

-‘এক পাও কোথাও যাবি না।’

স্বর্ণ সায়নের থেকেও দ্বিগুন তেজ নিয়ে বলল,-
‘যাব।’

-‘বারণ করেছি আমি!’

-‘শুনতে বাধ্য নই আমি। আমাদের বাবা-মা যেখানে
আমরাও সেখানেই। ভালোবাসি মানে এই যে বাবা-
মায়ের সঙ্গ ত্যাগ করব? যদি তাই করতে হয়ে
তাহলে দরকার নেই এই ভালোবাসার।’

কথাখানা যেন সায়নের পুরো মস্তিষ্ক এলোমেলো করে
দিলো। তার স্বর্ণ তাকে ছেড়ে চলে যাবে? একথা মুখ
ফুটে বলছেও? এত বড় স্পৃধা ওর?

সায়ন রাগে দিকশূন্য হয়ে স্বর্ণের গলা চেপে ধরে
দেওয়ালের সাথে চেপে ধরল। তারপর চিৎকার করে
বলল,

-‘এ্যাঁই বেইমানের বাচ্চা কি বললি আবার বল, বল, বল? আমায় রেখে

কোথায় যাবি? কোথায় যাবি তুই!’

প্রচন্ড ব্যথায় স্বর্নের গালের হাঁড় যেন ভেঙে এলো।
রুবাব, সাফওয়ান চৌধুরী দ্রুত গিয়ে কোনোমতে
তাকে সরালেন। ছাড়া পেতেই স্বর্ণ আর কোনোদিকে
না তাকিয়ে বোনের হাত ধরে বেরিয়ে যেতেই শীতল
খপ করে শুদ্ধর পাঞ্জাবি আঁকড়ে ধরল। হাউমাউ করে
কাঁদকে থাকল করুন সুরে। শুদ্ধ লালবর্ণ চোখে শুধু
তাকিয়ে দেখল শীতলের কান্নারত মুখ। স্বর্ণ বোনের
হাত ছেড়ে টানতেই সায়ন আবার তেড়ে যেতেই গেল
স্বর্ণর দিকে। এবার শুদ্ধ সায়নকে আঁটকে ধরে
বলল,-‘যেতে দাও।’

একথা শুনতেই সায়ন অবাক চোখে তাকাল শুদ্ধর
দিকে আর শুদ্ধ ঘাড় ঘুরিয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়েই
রইল স্বর্ণের শীতলকে টেনে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্যের
দিকে। বোনরা চলে যাচ্ছে দেখে সাম্য, সৃজনও
কাঁদতে কাঁদতে ছুটল ওদের পিছু পিছু। সিরাত,
সাফওয়ান, রুবাব, শখও দৌড়ে গেল তাদের
ফেরাতে। শাহাদত চৌধুরী কেবলই গাড়ি স্টার্ট

করেছেন। হুইল ঘুরাতেই দেখে স্বর্ণ আর শীতলও
কাঁদতে বেরিয়ে আসছে বাড়ি থেকে।

হাত থেমে গেল উনার সেই সঙ্গে উনার বুকটা যেন
ভেঙে খান খান হয়ে গেল। হুইলে মাথা ঠেকিয়ে
দু'চোখ বন্ধ করতেই চোখের তারায় ভাসতে থাকল
বড় ভাইয়ের মুখ। যার ছায়ায় এতদিন চৌধুরী
নিবাসের প্রতিটা সদস্য ছিল সুরক্ষিত। বাবা-মা মারা
যাওয়ার পরে যেই ভাইয়ের স্নেহে বাঁচার শক্তি খুঁজে
পেয়েছিলেন, আজ সেই ভাইয়ের বুকে যন্ত্রণার ছুরি
বসিয়ে চলে যাচ্ছেন স্বার্থপরের মতো। এদিকে
সহধর্মিণীকেও ছাড়তে পারবেন না কারণ পৃথিবীর
বুকে উনি ছাড়া আর কেউ নেই সিমিনের।

যারা আছে তারা সুসময়ের মাছি। এদিন বাড়িতে
এমন ঘটনা ঘটে নি যার কারণে সাম্য, সৃজন ভয়ে
কুঁকড়ে গেছে। তবে যখন বুঝল তাদের বোনরা ছেড়ে
যাচ্ছে তখন যেন তাদের হাঁশ ফিরল। হাউমাউ করে
কেঁদে সিমিনের আঁচল ধরে বলতে লাগল,-‘ওহ
ছোটো মা, যেও না, তুমি গেলে আমাদের কে টিফিন
বানিয়ে দেবে? আম্মুর মারের হাত থেকে কে বাঁচাবে?
আমরা কার হাতের রান্না খাব?’

একথা শুনে সিমিন গাড়ি থেকে নেমে বাচ্চা দুটোকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন। তাদের ছোটো ছোটো মুখ চুমুতে ভরে ধরে সিরাতের বললেন,

-‘মেরো না একটু বুঝিয়ে বোলো।’

সিরাত একটা কথাও বলল না একরাশ অভিমান নিয়ে তাকিয়ে রইলেন ছোটো জায়ের দিকে। তবে না বলেও থাকতে পারলেন না তাই বললেই ফেললেন,-‘বড় ছেলে দুটোকে একেবারে ভেঙে চুরে ছোটো ছেলে দুটোকে আর ভালোবাসা না দেখালেও চলবে ছোটো। আজ প্রমাণ করে দিলি রক্তের সম্পর্ক ছাড়া কোনো সম্পর্ক আপন হয় না। এই যে আমরা তোর আপন হতে পারি নি।’

একথা শুনে সিমিন শুধু হাসল। তারপর রুবাবের মাথায় হাত বুলিয়ে

মলিন হেসে গাড়িতে উঠতে গেলে রুবাব উনার হাতটা আঁকড়ে ধরল। তারপর হাতের উল্টো পিঠ কপালে ঠেকিয়ে কান্না ভেজা বলল,-‘একটু ভালোবাসা পাই বলেই মাকে ছেড়ে তোমাদের এখানে পড়ে থাকি। দেশে আর আছিই বা ক’দিন? আমরা

তো তোমারই ছেলে তাই না? আমাদের ভুলগুলো নাহয় এবারের মতো মাফ করে দিয়ে কোলে টেনে নাও।’

-‘খুব ভালো থাকিস আব্বা। আমার দোয়া সব সময় সঙ্গে থাকবে।’একথা বলে সবার দিকে একবার তাকিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন। স্বর্ণ, শীতলও ততক্ষণে উঠে বসেছে। শীতল এখনো দুহাতে মুখখানা ঢেকে হাউমাউ করে কাঁদছে। তার বুক ফেঁটে যেন চৌচির হয়ে যাচ্ছে। শুদ্ধকে ছাড়া থাকবে কিভাবে সে? তার বিশুদ্ধ পুরুষটাকে না দেখে বাঁচবেই বা কিভাবে? আজকাল তাকে ছাড়া দমটা যেন আঁটকে আসে।

এদিকে সব বাঁধন ছেড়ে যেতে যখন হবে শাহাদত চৌধুরী দেরি করলেন না। নিজেই ড্রাইভিং সিটে বসে গাড়ি স্টার্ট করলেন। ধীরে ধীরে গাড়িটাও চলতে চলতে মূল ফটক পেরিয়ে বেরিয়ে গেল। সেই সঙ্গে খান খান হয়ে গেল তিলে তিলে গড়া চৌধুরী নিবাসের সুখে মোড়া সুখসম্রাজ্য। ইদ মানে আনন্দ। আর মুসলিম পরিবারে এই দিনটিকে নিয়ে থাকে কত

কল্পনা-জল্পনা। সালামি দেওয়া-নেওয়া, খাওয়া-দাওয়া,
ঘুরাঘুরি এসব নিয়ে থাকে নানান পরিকল্পনা।
প্রতিবছর চৌধুরী নিবাসে ইদের সকাল শুরু হয়
চিৎকার-চেষ্টামেচি দিয়ে। এরপর সারাদিন চলে নানান
খুনসুটি দুষ্টুমি। যতই কাজ থাকুক শেষ বিকেলে
ভাই-বোনরা মিলে ঘুরতে যায়। যেতে যেতে মজা
করে। স্মৃতি কুড়ায়। সেসব স্মৃতিচারণ করে কোনো
এক উদাস গ্রহরে। ভেবেছিল রোজার শুরুটা দুঘর্টনা
দিয়ে হলেও ইদটা বোধহয় ভালোই কাটবে। এজন্য
প্রতিটা সদস্য নিজেরাও সচেতন থাকত

যেন কোনো বিপদ না হয়। কিন্তু কপালের ফের
ইদের সকালে আচমকা ঝড়ে তছনছ হয়ে গেল সব।
ভেঙে গেল টুকরো টুকরো রঙিন কিছু স্বপ্ন। নড়বড়ে
হয়ে গেল সবার সঙ্গে সবার দৃঢ় বন্ধনের ভীত। কেউ
জানেন না এ সমস্যার আদৌও সমাধান হবে কী না!
আদৌও ভাঙা সম্পর্ক কখনো জোড়া লাগবে কী না!
এদিকে শাহাদত চৌধুরীর গাড়ি বেরিয়ে যেতেই
শারায়াত চৌধুরী দরজা থেকে ফিরে এলেন। শেষ
আশাটুকু নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন ভাইদের ফিরে
আসার। ভাঙা মন নিয়ে শতশত বার সৃষ্টিকর্তার

কাছে চাইছিলেন অন্তিম মুহূর্তে যেন কোনো মিরাক্কেল
ঘটে তাদের যাওয়া যেন আঁটকে যায়। কত বার
তাকালেন শুদ্ধ,সায়নের দিকে তারা যেন আঁটকায়।
নিজেদের ভুল শুধরে নিয়ে পরিবার বাঁচায় কিন্তু তারা
যেন পাথর। দু'জনের কেউ কথা বলল না। সায়ন
এখনো স্থির হয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকলেও
শুদ্ধ গটগট করে নিজের রুমে চলে গেল। এক মুহূর্ত
দাঁড়ানোর প্রয়োজনবোধ করল না সে। অথচ যত্নে
গড়া পরিবার ভাঙার কষ্ট উনি সইতে পারছেন না।
পারছেন না শুদ্ধর মতো বুকে পাথর তুলে দিয়ে রুমে
চলে যেতে। দুই চোখের পানিতে রাস্তা দেখা
মুশকিল। চোখদুটো এত অবাধ্য হবে থেকে হলো?
উনি এক কদমও এগোতে পারলেন না ধপ করে
বসে পড়লেন।পাশের সোফার হাতলে এক হাত
ঠেকিয়ে মুখ লুকালেন নিজের বাহুতে। এরপর
শক্তপোক্ত মানুষটাও ভুলে গেল সময়, কাল-ক্ষণ।
বুকের ভেতর আজ এতটাই পুড়ছে সবকিছু ভুলে
বাহুতে মুখ লুকিয়ে শব্দ করে কেঁদে উঠলেন
শারায়াত চৌধুরী। আহা, কি বেদনাময় কান্নার সুর!

কত যত্নগা মিশে রয়েছে সেই কান্নায়। স্বামীকে
জীবনে প্রথম এভাবে কাঁদতে দেখে
সিঁতারা দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে নীরবে অশ্রু ঝরাতে
লাগলেন। উনার এ কান্নায় শব্দ নেই, বর্ণ নেই, গন্ধ
নেই, আছে বিষাদেভেজা কষ্ট। আর কিছু কষ্টে
পোড়ানো নীরব আত্ননাদ। উনি বউ হয়ে আসার পর
মানুষটা তার হাতে হাত রেখে বলেছিলেন, ‘আমি
তোমাকে একটা বাগান দিলাম। সেই বাগানে কিছু
সুগন্ধি ফুলের চারা দিলাম। এবার যত্ন নিয়ে ফুল
ফুটানোর দায়িত্ব তোমার। আজ থেকে বাগানের
মালকিন শুধু তুমি।’ বাসরঘরে এ মানুষটাই চৌধুরী
নিবাস নামে একটা বাড়ি দিয়েছিল। দিয়েছিল জীবন্ত
কিছু ফুল। বৃদ্ধ শাশুড়ী মারা যাওয়ার আগে ওয়াদা
আদায় করে নিলেন যেন এই সংসার বুকে আগলে
রাখেন। কিন্তু হলো না, পারলেন না তিনি। সিমিন
কেন একাজ করল তাও জানেন না তিনি। জাকে
ছোটো বোনের মতো দেখে এসেছে সেই বোনরূপী
জা উনার দিকে আঙুল তুলে সংসার ভেঙে চলে
গেল। অন্তত জানিয়ে গেলেও দোষটা শুধরানো যেতো
কিন্তু জানিয়ে গেল না। ছেলে-মেয়েরা তাদের পছন্দ

মতো সঙ্গী পছন্দ করে নিয়েছে এখানে উনাদের তো হাত নেই। মোদাকথা, ছেলে-মেয়েরা যদি একে অপরকে সাথে ভালো থাকে তাহলে আপত্তির কি আছে? সংসার করবে তারা, তারাই যদি ভালো থাকে তাহলে এত কথা আসছে কেন?বাকি রইল সমাজের কথা। সমাজের লোকরা কোন ব্যাপারে কথা বলে না? কোনো ফর্সা মায়ের কালো বাচ্চা হলেও গপিস করে আবার কালো মায়ের বাচ্চা ফর্সা হলেও গপিসের শেষ থাকে না। আকার ইঙ্গিতে কিন্তু মেয়েটার দিকে অদৃশ্য কলঙ্কও ছুঁড়ে মারে। বাচ্চাটাকে নিয়েও হাজারটা কথা সৃষ্টি করে। যেখানে নিষ্পাপ নাদান বাচ্চাকেও ছাড় দেয় না সেখানে তাদের নিয়ে পড়ে থাকলে হবে? বরং সমাজ সমাজ করে নাচলেই বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে যাবে। এসব ভেবে উনি কাতর চোখে তাকালেন এখনো কান্নারত স্বামীর দিকে।বুক ভরা কষ্ট নিয়ে আল্লাহর কাছে বারবার দোয়া করলেন যেন এই মানুষটাকে ধৈর্য্য দেন। এ বিপদ যেন দ্রুত কেটে যায়।

ওদিকে শারায়াত চৌধুরী তখনো অস্পষ্ট স্বরে বলেই চলেছেন,-‘মা, মগো, আমি পারি নি তোমার যত্নে গড়া

সংসার ধরে রাখতে। আমি ব্যর্থ মা..গো। আমার কলিজার ভাই..আমার বাচ্চাগুলো..আজ আমাকে ছেড়ে দূরে চলে গেছে, মাগো। আমার শীতল....আমার আ..স্মাজান...! ‘

শীতলকে উনি বরাবরই খুব বেশি ভালোবাসে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। এর ঝাপসা কারণও হতে পারে শীতলের মুখটা উনার মায়ের মুখের মতো। সাফওয়ান চৌধুরী চোখ মুছতে মুছতে বাইরে থেকে এসে ভাইকে

এভাবে কাঁদতে দেখে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে নিজেও কেঁদে ফেললেন। খুব ছোটবেলায় উনারা তিনভাই মারামারি করলেও বুঝতে শেখার পর আর মারামারি করেন নি। তিনভাই তিনভাইয়ের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এত বড় সংসার সামলে রেখেছেন। আজকের মতো এই ঘটনা এর আগে হয় নি। ছোটো ভাই টা যে বুকভরা কষ্ট নিয়ে বাড়ি ছেড়েছে একথা ভাবলেও উনাদের দম আঁটকে আসছে।

বাবা-চাচার কান্নার শব্দেও সায়নের নড়চড় নেই। সে চোয়াল শক্ত করে এখনো স্থির হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। তার কাছে অবিশ্বাস্য লাগছে স্বর্ণ তাকে রেখে

চলে গেছে তাও ভালোবাসা প্রকাশের অভিযোগ ছুঁড়ে।
এ কী মানা যায়! এই বেইমানকে জান দিয়ে এতদিন
ভালোবেসেছিল? সে তো ভাবত শীতল মারের ভয়ে
শুদ্ধকে অস্বীকার করলেও আর তার স্বর্ণ উঁচু গলায়
তাদের কথা সবাইকে জানাবে। কিন্তু ঘটল কি?
শীতলটা ওর ভালোবাসার কথা জানিয়ে দিলো ঠিকই
কিন্তু স্বর্ণ তাকে ছেড়ে চলে গেল। এই কাজটা করতে
তার বুক কাঁপল না? আচ্ছা স্বর্ণ কি সিমিনকে
বোঝাতে পারত না? নাকি স্বর্ণ তাকে ভালোইবাসেনি?
বাসলে এভাবে ছেড়ে যেতে পারত? নাকি ছেড়ে
যাওয়া যায়? সে কী জানে না বাড়িতে ফিরে না তার
কাছে না গেলে একদন্ড স্থির হতে পারে না। তার
শরীরের ঘ্রাণ নেশাগ্রস্তের মতো না টানলে উন্মাদ হয়ে
যায়? তাহলে.....তাহলে কীভাবে গেল? শীতলটাও
চলে গেল? একবারও ভাবল না শুদ্ধর কথা? এই
ভাইটার কথা? বেইমানের সাথে সাথে শীতলটাও
বেইমানির খাতাতে নাম লেখাল? পারল লেখাতে?
আপন ভাবনায় মশগুল থাকা সায়নের ভাবনার ছেদ
ছটল গালে তীব্র ব্যথা অনুভব করে। সে লালবর্ণ
আগুন চোখে তাকিয়ে গালি দেওয়ার আগে শারায়াত

চৌধুরীকে দেখে সামলে নিলো। তখন শারীফাত চৌধুরী চিৎকার করে বললেন,-‘তোমার মতো জানোয়ার ছেলের দরকার নেই আমার। যদি চাস আমি এ বাড়িতে থাকি তাহলে বাড়ির চৌকাঠে পা রাখবি না তুমি। বেহায়ার মতো যদি ফিরেও আসিস তাহলে আমার খাঁটিয়া কাঁধে তোলার জন্য প্রস্তুত থাকিস।’

বাবার কথা শুনে সায়েন ঢোক গিলল। বাপটাও তার কষ্ট বুঝল না? বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা সোজাসাপ্টা বললেই হতো এত কঠিন কথার দরকার ছিল? আহা! বুকে জায়গা দেওয়া আপনজন! সবগুলো আজ যেন বুকটাই জখম করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। সায়েন কথা বাড়াল না কিছু বলতে গিয়ে বুঝল কণ্ঠস্বর বাক্য সাজাতে ব্যর্থ। তাই সম্মতীসূচক মাথা নাড়িয়ে পা বাড়াতেই সিঁতারা, সিরাত তাকে জাপটে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। শখও হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। ভাঙ্গা আয়নায় পাথরের টুকরোর আঘাতে সংসারটাও যেন আরেকবার দ্বিখন্ডিত হলো।

তখন সাফওয়ান এগিয়ে এসে চৌধুরী বলতে লাগলেন,-‘যাস না বাপ? তোরা সবাই চলে গেলে

আমরা কি নিয়ে থাকব? বাবার কথায় কষ্ট নিস না
আব্বা, মন থেকে বলছে না ভাই।’

সায়ন মেজো চাচার দিকে তাকিয়ে কেবল হাসল।
জোরপূর্বক হাসি যাকে বলে। তখন শারায়াত চৌধুরী
পুনরায় বললেন,

-‘আমি রেগে বলছি না ভেবেই বলছি। চলে যাক, ও।
আমার চোখের সামনে দেখতে চাই না, ওকে।’

একথা বলে উনি চোখ মুছতে মুছতে দুকদম
এগোতেই সায়ন ঢোক গিলে চোঁচিয়ে বলল,

-‘আমার সবটুকু আয়ু তোমার হয়ে হলেও তুমি
দীর্ঘজীবী হও। হাজার হাজার বছর ছায়া হয়ে থাকো
এই বাড়ির প্রধান অভিভাবক হয়ে। আমি আর আসব
না তোমার বাড়িতে। পা মাড়াব না বাড়ির দামি চৌ-
কাঠে। শুধু রিকুয়েষ্ট মরা টরার কথা বোলো না।
খারাপ ছেলে হলেও তোমার মরার কথা সহ্য করতে
পারি না, এই বুকটাতে কষ্টের জ্যাম বাঁধে কী না!
একথা বলে মাকে বুক থেকে সরিয়ে দুই মায়ের
কপালের মাঝখানে চুমু ঐঁকে বাহুতে চোখ মুছতে
মুছতে বেরিয়ে গেল। মা,ভাই-বোনদের কান্নার শব্দ
কানে পৌঁছালেও পেছন ফিরে তাকাল না। তাকিয়ে

আর কি হবে এ বাড়িতে থাকার মেয়াদ যে ফুরিয়ে গেছে।

শুদ্ধ নিজের রুমে বিছানায় চোখের উপর হাত রেখে আড়াআড়িভাবে শুয়ে আছে। পরনে এখনো সকালের সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি। বুকটাতে লেগে আছে শীতলকে জড়িয়ে ধরার নরম অনুভূতি। এইমাত্রই সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সায়নকে চলে যেতে দেখেও আঁটকাল না সে। কেন আঁটকাবে? কার বাড়িতে ঝামেলা হয় না? বসে সমাধান করা যায় না? বাড়ি ছেড়ে গেলেই কি সমস্যা সমাধান হয়ে যায়? যাবে যখন যাক। তাছাড়া ভালোই

হয়েছে গিয়ে নয়তো স্বর্ণকে ছাড়া সায়ন বাড়িতে থাকতে পারত না। সে একপ্রকার পানি ছাড়া মাছের মতো ছটফটিয়ে মরত। ভাইকে খুব ভালো করে চিনে সে। মোদাকথা, যে যে স্বেচ্ছায় বাড়ি ছেড়েছে সব কটাকে সে

বাড়ির অভাব বুঝিয়েই ছাড়বে। যাতে পরবর্তীতে সামান্য ব্যাপারে বাড়ি ছাড়ার কথা স্মরনেও না আনে। বিরক্ত হয়ে এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার চোখের পাতায় ভেসে উঠল শীতলের কান্নারত নিষ্পাপ মুখ।

করণ সেই দৃষ্টি। বে'য়া'দ'বটা গেল তো গেল কাঁদতে কাঁদতে বুকে জ্বালা ধরিয়ে গেল। এত কান্নার কি আছে? সে কি মরে গেছে? কোথায় ভরসা রাখবে তা না ভ্যাঁ ভ্যাঁ করতে করতে গেল। আর সিমিনকে আপাতত কিছু বলবে না সে। বাংলা সিনেমা দেখে দেখে নিজেকেও রিনা খানের চরিত্রে নিয়ে তাকে বোধহয় দিতে চাচ্ছে ঘাড়ত্যাড়া জামাইয়ের চরিত্র। যদিও তাতেও সমস্যা নেই। মানব না, মেয়ে দেবো না, এই বাড়িতে থাকব না, বললেই হবে? এতই সোজা! প্রথমে ব্যাঙাচি ভালোবাসা বুঝত না। কত কী করে যাও একটু বুঝল এখন নাকি মেয়ের মায়ের সমস্যা..এত জ্বালা সহ্য হয়!

সিমিনকে যে আঁটকাতে পারত না তা কিন্তু নয় বরং ইচ্ছে করে আঁটকায় নি। কারণ রাগের মাথায় বেশি কিছু বললে ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিত। এসব ভাবনার মাঝে তার মস্তিষ্ক আচানক আরেকটা কথা টোঁকা দিতেই

সে 'ওহ শিট' বলে উঠে বসল। তাড়াহুড়ো করে নামতে গেলে তার ফোনে রিংটোন বেজে উঠল। পকেট থেকে ফোন বের করে রিসিভ করে শুনল

অপর পাশের মানুষটার কথা। অতঃপর তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে ধপ করে বিছানায় বসে পড়ল। ভাই-বোনকে কথা দিয়েছিল দ্রুতই BMW গাড়ি কিনে ঘুরতে নিয়ে যাবে। সেই হিসেবে ভেবেছিল নতুন গাড়ি নিয়ে আজ বিকেলে বের হবে। বের হওয়ার আগ মুহূর্তে গাড়ি দেখিয়ে সবাইকে খুব করে চমকে দেবে। কিন্তু গাড়ি তো ঠিকই পার্কিংলটে চলে এসেছে কিন্তু তারা কই! শাহাদত চৌধুরীর চলন্ত গাড়িতে চলছে নিশ্চুপ নীরাবতা। কারো মুখে কোনো কথা নেই। শীতলের কান্না থামলেও নীরবে অশ্রু ঝরা থামে নি। সে চুপ করে একদৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে আছে। বোনকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে স্বর্ণ শীতলের কাঁধে হাত রাখলে শীতল হাতটা ঝাড়া মেরে সরিয়ে দিলো। আরেকটু সরে গেল জানালার দিকে। বোনের এই কাণ্ডে কেবল হাসল স্বর্ণ। তারপর পুনরায় বোনকে নিজের দিকে টানতে টানতে বলল,
-‘আয় আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমা নয়তো শরীর খারাপ করবে।’
-‘করুক। মরে যাই আমি। তোরা তো তাই চাস!’

-‘কেউ কারো জন্য মরে না। কথা না বাড়িয়ে এবার
আয়।’-‘তোরা পাষণ হয়ে গেছিস আপু। তোদের
বিবেক মরে গেছে। আজকে তোদের জন্য বড়
আব্বুর বুকে পাড়া দিয়ে আসতে হয়েছে। বড়
আ..বু.. কে কতটা যত্না দিয়ে এলি ভেবেছিস
একবার? আমরা আসায় কতটা কষ্ট পেল মানুষটা?
এতদিন আগলে রাখার এই প্রতিদান দিলি তোরা?’

শীতলের কথা শুনে ড্রাইভ করা শাহাদতের বুকে
বিঁধলেও একবাক্যেও উচ্চারণ করল না। তবে সিমিন
সিটে হেলান দিয়ে বললেন,-‘আসতে বলেছে কে?
দরদ উতলে পড়লে চলে গেলেই হয়।’

মায়ের কথা শুনে শীতল মায়ের দিকে তাকাতেই
অঝরে কয়েকফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। অতিরিক্ত
কান্না করায় মাথা টনটন করছে। দুচোখ যেন মরিচ
ডলে দেওয়ার মতো জ্বলছে। এমনিতে পিরিয়ডের
প্রথম দিন অবস্থা খুব খারাপ থাকে। তার উপরে এক
কাপড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। তবে আজকে
শারীরিক যত্নটা চেয়েও মানসিক যত্নটা অনেক বেশি।
এতটাই বেশি অসহ্য ব্যথাও ফিকে লাগছে। তবে সে
থামল না এক

পেট চেপে ধরে অঝরে কাঁদতে কাঁদতে মাকে বলল,-‘এত পাষণ্ড হইয়ো না আম্মু? বিবেককে নিচু স্তরে নামিও না। তোমার এই রূপ আমি সহ্য করতে পারছি না।’

-‘সহ্য করতে বলছে কে? যা, চলে যা। সঙ্গী জুটিয়েছিস মাকে নাহলেও এখন চলবে।’

-‘তুমি আসলেই স্বার্থপর মহিলা। খুব, খুব, খুব বেশিই স্বার্থপর তুমি!’ একথা বলে শীতল দুই হাতে মুখ ঢেকে পুনরায় কাঁদতে লাগল। মানতেই পারছে না এসব। যে বাড়ি ছেড়ে একরাত বাইরে থাকার পারমিশন পায় নি সেই বাড়িতেই নাকি ফিরবে না। প্রতি বছর ইদে সকালে উঠে মেহেদী রাঙা হাত দেখায় শারাফাত চৌধুরীকে। শারাফাত চৌধুরী তার দুই হাত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে মেহেদীর রং পরীক্ষা করেন। তারপর পকেট থেকে টাকা বের করে শীতলের হাতে গুঁজে দেয়। একথা কেউ জানে না এটা তাদের মধ্যে গোপন সিক্রেট! এরপর একটুপর সবার সাথে আরেকবার সালামি দেন। ডাবল সালামির একভাগ রেখে বাকিটার থেকে এ বাড়ির ছোটো সদস্যদের সালামি দেয় যতই হোক বড় বোন সে। আজ সকালে

বড় আব্বু কাছে যেতে পারে নি গালে ‘আমার বউ’
লেখাটার জন্য। পরে যাবে ভেবেছিল তখন নামাজের
সময় হয়ে গিয়েছিল। এরপর ভেবেছিল নামাজের পর
যাবে ততক্ষণে পিরিয়ডের ব্যথায় কাতরাতে
কাতরাতে শুয়ে পড়েছিল। এরপর আর যাওয়ায় হলো
না বড় আব্বুকে ছেড়ে চলে আসতে হলো। বড় আম্মুর
হাতে মজার মজার রান্নাও কপালে জুটল না। এসব
ভাবতে ভাবতে তার কান্নার গতি বাড়ল। কাঁদতে
কাঁদতে জানালায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে গেল। বোনকে
ঘুমাতে দেখে স্বর্ণ শীতলের মাথাটা তার কোলের
উপর টেনে নিলো। হাত বাড়িয়ে পানি নিয়ে রুমাল
ভিজিয়ে মুখ মুছিয়ে দিলো। ঘুমন্ত শীতল বিরক্ত হয়ে
রুমাল সরিয়ে দিয়ে পুনরায় ঘুমে ডুবে গেল। বোন
বিরক্ত হচ্ছে দেখে স্বর্ণও সিটের মাথা হেলিয়ে
শীতলের চুলে হাত ডুবিয়ে বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ
করল। জোর করে আনায় খুব কেঁদেছে পাগলিটা
এবার নাহয় একটু ঘুমাক

বেলা গড়াতে গড়াতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো।
বিকেলের পর এখন সন্ধ্যা অথচ সকালের পর কেউ
কিছু টি মুখে তোলে নি। যা ঘটে গেছে এতে

খাওয়ার কথা স্মরণে নেই কারো, থাকার কথাও না।
চিন্তায় ডুবে থাকা শাহাদত চৌধুরীর কথাটা স্মরণ
হতেই দেখে নিলেন তিনজনকে। তারপর আর একটু
এগিয়ে একটা রেস্টুরেন্টের সামনে গাড়ি থামালেন।
মেয়েদেরকে বললেন চোখ, মুখে পানি দিয়ে আসতে।
বাবার ডাক শুনে শীতলের ঘুম ভাঙল। বোনের
কোলে শুয়ে আছে দেখে মুখ গোমড়া করে উঠে
বসল। সেই সঙ্গে অনুভব করল তার ন্যাপকিন
ড্যামেজ হয়ে গেছে।

ইমিডিয়েট চেঞ্জ করা দরকার। পরনের জামাতে দাগ
লেগে গেছে নাকি কে জানে। একথা ভেবে তার
মুখটা চুপসে গেল। সাহায্যের জন্য করুণ চোখে
তাকাল বোনের দিকে। স্বর্ণ প্রথমে না বুঝলেও পরে
তার ইশারায় বুঝল। তবে বিচলিত না হয়ে শাহাদত
চৌধুরীকে বলল,

-‘বাবা তুমি খাবার পার্সেল করে আনো গাড়িতে বসে
খাব। আর আমাকে কিছু টাকা দাও ফার্মেসি থেকে
মাথা ব্যথার মেডিসিন কিনে আনি। প্রচণ্ড মাথা ব্যথা
করছে আমার।’-‘আমি নাহয় এনে দিচ্ছি? ব্যথা কি
খুব বেশি?’

-‘হুম, সমস্যা নেই পারব আমি, তুমি যাও খাবার নিয়ে এসো।’

একথা শুনে শাহাদত চৌধুরী গাড়ি থেকে নেমে দেখলেন রাস্তার ওপাশে ফার্মেসির দোকান। তাই স্বর্ণকে টাকা দিয়ে গেলেন খাবার আনতে। এই রেস্টুরেন্টে কয়েকবার এসেছিলেন খাবারের মানও বেশ ভালো। তবে যা কিনবেন সেই খাবার গলা দিয়ে নামবে তো?

বাবাকে যেতে দেখে স্বর্ণ গাড়ি থেকে নেমে দ্রুত গেল প্রয়োজনীয় সেই জিনিসটি আনতে। তারপর মায়ের হ্যান্ডব্যাগ চেয়ে নিয়ে ব্যাগের ভেতর সেটা ঢুকিয়ে বোনকে নামতে বলে পেছনে দাঁড়িয়ে দেখল চিন্তার কোনো কারণ নেই, তাই হাত ধরে এগোলো ওয়াশরুমের দিকে। শাহাদত চৌধুরী

খাবার নিয়ে ঘুরতেই মেয়েদের সঙ্গে দেখা হলো। ওদের চোখে মুখে পানি দিয়ে আসতে বলে তিনি এগোলেন গাড়ির কাছে। স্বর্ণ শীতলকে ব্যাগটা ধরিয়ে দিয়ে যেতে ইশারা করে নিজে পাশের ওয়াশরুম গিয়ে চোখ বন্ধ করে কয়েক পর এক পানির ঝাপ্টা দিতে থাকল চোখে, মুখে। তবে ভুল

করেও ওয়াশরুমের আয়নার দিকে তাকাল না।
বেইমানের তকমা লাগা মুখ নিজেরও দেখতে ইচ্ছে
করছে না, অবশ্য সত্য মানতেও সমস্যা নেই।

তারপর সে বের হয়ে সামনেই দাঁড়িয়ে রইল। শীতল
বের হলে তার হাতে অন্য একটা প্যাকেট দেখে সেটা
নিতে গেলে শীতল পিছিয়ে গেল। মুখ গোমরা
অন্যদিকে তাকিয়ে মিনমিন করে বলল,-‘ডাস্টবিনে
ফেলে আসছি তুমি দাঁড়াও।’

-‘আমাকে দে।’

-‘না। আমি পারব।’

-‘ছোটো বেলায় বহুবার তোর ন্যাপি চেঞ্জ করেছি
এখনো আমার কাছে ছোটোই আছিস।’

স্বর্ণ কথা শুনল না প্যাকেটটা হাতে নিয়ে শীতলকে
ব্যাক সাইডে দাঁড়াতে বলে নিজে চলে গেল বাইরের
দিকে। শীতল বোনের কথা শুনে ওইদিকে

তাকিয়ে দেখে ওদিকে নিরিবিলি কেউ যাচ্ছে না
তেমন, তাই ধীর পায়ে

এগিয়ে গেল। চারপাশটা দেখল নজর বুলিয়ে।
জায়গায়টা ভীষণ সুন্দর, ছবি তোলার জন্য দারুণ
স্পেস আছে। এদিক ওদিকে তাকাতে তাকাতে

আর একটু সামনে এতোতে একটা বড় দেওয়াল
নজরে এলো। সেদিকে একবার তাকিয়ে চোখ সরিয়ে
পরক্ষণে পুনরায় দৃষ্টি ছুঁড়ে চমকে উঠল। বিস্ময় নিয়ে
তাকিয়ে যখন বুঝল সত্যি তখন দৌড়ে গেল প্রিয়
মানুষটার কাছে। সমুদ্রের ঢেউ যেমন পাথরের বুকে
আছড়ে পড়ে ঠিক সেভাবে সে আছড়ে পড়ল শুদ্ধর
বুকে। শুদ্ধ একপা পিছিয়ে শীতলসহ সামলে নিলো
নিজেকে আর একটু হলে দু'জনে বারি খেতো
দেওয়ালে। অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে প্রিয় মানুষটাকে পেয়ে
শীতল শুদ্ধর বুকে মুখ লুকিয়ে বুকের শার্ট খামছে
ধরে শব্দ করে কাঁদতে লাগল। কান্নার চোটে যা বলল
কিছু স্পষ্ট হলো না। তবে শুদ্ধকে আঁকড়ে ধরে
চোখের পানি বুক ভেজাতে লাগল। আর শুদ্ধ বুক
তোলপাড় করা বড় নিয়ে নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।
মুখে কথা নেই তার। তবে তার মন বলছে, সময়টা
যদি এখনে এভাবে থমকে যেতো? কিংবা এই
অবস্থায় যদি মারা কেমন হতো? ভালো হতো, ভীষণ
ভালো। বুকের মালকিনকে বুকে নিয়ে মরার মতো
সুখী মানুষ পৃথিবীতে আছে নাকি? থাকলেও সংখ্যায়
হাতে গোনা। ইশ! এমন সুখী যদি সেও হতো! কি

অদ্ভুত, বুকের ভেতর হৃদপিণ্ডটা যে হারে লাফাচ্ছে
আজকে ধরা টরা খাইয়ে দেবে নাকি, হুম? যেটা সে
চায় না, কখনোই চায় না। চোখ দু'টোও অযথা এত
জ্বলছে। কি সব ছলনাময়ী কারবার, চোখ তার অথচ
জ্বলছে অন্য কারো কথা ভেবে। মনে মনে এসব
ভেবে সে থমকে দাঁড়িয়ে রইল। বেশ কিছুক্ষণ পর
শীতল কাঁদতে কাঁদতে বলল,

-‘সবকিছু আবার আগের মতো করে দেন না শুদ্ধ
ভাই, প্লিজ! আমি আমাদের সুখী পরিবারটাকে চাই।
সবাইকে নিয়ে ভালো থাকতে চাই।’

শুদ্ধ নিশ্চুপ। তাকে চুপ দেখে শীতল মাথা তুলে
তাকিয়ে দেখল শুদ্ধর চোখজোড়া লাল হয়ে আছে।
সে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে একটু উঁচু হয়ে দুই
হাতে শুদ্ধর গাল ধরে বিচলিত কণ্ঠে বলল,-‘কি
হয়েছে? চোখ লাল কেন? কোথায় কষ্ট হচ্ছে দেখি?’

-(...)

-‘কথা বলছেন না কেন? কি করেছি আমি? সবার
সামনে তো বলেছিই আমি আপনার বউ হবো। আমি
আপনাকে ভালোবাসি। আর কীভাবে বলব? কিভাবে
বোঝাব? আজকে আমাদের কথা জানালাম আজই কী

না বাড়ি ছাড়তে হলো! তবে কি আমরা এক হবো না?’

এইটুকু বলে শীতল শুদ্ধর বুকে কপাল ঠেঁকাল। তারপর অঝরে কাঁদতে কাঁদতে অসহায় কণ্ঠে বলল,
-‘আপনাকে ছাড়া আমি কিভাবে থাকব, শুদ্ধ ভাই? কারণে অকারণে আপনাকে না জ্বালালে আমার ভালো লাগে না, সময়ই কাটে না। এই যে এত এত সমস্যার সমাধান কোথায় পাব আমি হুম, কোথায়? কেন সবাই মিলে আমাকে মারতে উঠে পড়ে লেগেছেন? আমার ভালো থাকার আয়ু কি শেষ? এজন্যই কি সবাই মিলে এত কষ্ট দিচ্ছেন? সব কষ্ট আমি হাসি মুখে নেবে। কিন্তু আপনাকে ছাড়া থাকতে পারব না, কিছুতেই পারব না, মরে যাব আমি, সত্যিই মরে যাব।’ একথা শুনে শীতল ব্যাকুল হয়ে কাঁদল। আজ সারাদিন কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে চোখ-মুখের বেহাল দশা। আর কাঁদতে পারছে না শরীর থরথর করে কাঁপছে। তবে তার এই কথাগুলোই যথেষ্ট ছিল শুদ্ধকে ভেঙে চুরে খান খান করার জন্য। নিজের অজান্তে বোকা শীতল তার বুকেই তীরটা মেরেছে। লেগেছেও যেন পার্ফেক্ট নিশানায়। এতক্ষণ শুধু শীতল

জড়িয়ে ধরলেও শুদ্ধ ছেড়ে দিয়েছিল। শুধু দেখছিল
তার ব্যাঙাটির পাগলামি। তাকে নিয়ে করা
ভালোবাসার পাগলামি। তবে ওর করুণ সুরে বলা
এই

কথাগুলো আর অসহায় কান্নায় শুদ্ধকে আরো একবার
ভাঙল। নিজের তৈরী করা খোলস ছেড়ে শুদ্ধর
অজান্তেই চোখ থেকে একফোঁটা অশ্রু ঝরে গেল।
আর গিয়ে পড়ল কান্নারত শীতলের কপালে। শীতল
কান্না ভুলে তড়িৎ মাথা তুলতে গেলে শুদ্ধ তার
মাথাটা প্রশস্ত বুকে চেপে ধরল। কোনোভাবেই
শীতলকে সে মাথা তুলে তাকাতেই দিলো না। থাকুক
না নিজের একান্ত কষ্টগুলো নিজের বুকে। শত্রু
আবরণে ঠিকই নিজেকে সামলেছিল শেষ মুহূর্তে
অনর্থ ঘটাল একফোঁটা অশ্রু। তবে যেটাই হোক,
স্বীকার করা যাবে না নয়তো শীতলের ভাষায় বলতে
গেলে তার বিশুদ্ধ পুরুষের জাত যাবে। পৃথিবী সমান
কষ্টে বুক ভাঙলেও শুদ্ধরা কখনোই কাঁদতে পারে না।
কারণ বিশুদ্ধ পুরুষরা ঢাল হতে জন্মায়..বাবা-মা ঢাল,
ভাইয়ে ঢাল, প্রিয় মানুষকে নিরাপত্তার দেওয়া ঢাল।
তাদের এত সহজে ভেঙে পড়তে নেই। বুকভরা কষ্টে

জর্জরিত হতে নেই তাই শুদ্ধ দ্রুত চোখ মুছে
নিজেকে সামলে নেওয়ার অপ্রাণ চেষ্টা চালান আর
সফলও হলো। কিন্তু আজ বোকা শীতলটা ঠিকই বুঝে
নিলো তার চালাকি। তাকে ছেড়ে থাকার কষ্টে শুদ্ধও
বুক ভেঙে চুরে খানখান হয়ে যাচ্ছে। এতে তার কান্না
দ্বিগুন বাড়ল। কষ্টে চৌচির হতে থাকল বুক। কাঁটা
মুরগির মতো ছটফট করতে লাগল সে। বার বার
দেখল চাইল তার একান্ত পুরুষের চোখের ভাষা,
কিন্তু ঘাড়ত্যাড়া শুদ্ধ দেখতে দিলো না। বরং খুব শক্ত
করে তাকে বাহুডোর আগলে রাখল। কয়েক মিনিট
সেভাবে থেকেই এবার শুদ্ধ মুখ খুলল,

-‘খেয়েছিস কিছু?’

-‘না।’

-‘পেইন কিলার খেলে পেট ব্যথা কমে যাবে। কিছু
খাবি, চল।’

এবার হাতের বাঁধন টিলে হলে শীতল মুখ তুলে
তাকাল। তাকিয়ে রইল

সামনে দাঁড়ানো পুরুষটার দিকে। এই অবস্থাতেও
সাদা শার্ট আর কালো জিন্সে কি যে চমৎকার

দেখাচ্ছে। সে এবার ওড়নায় নাক মুছে ফোঁপাতে
ফোপাতে জিজ্ঞাসা করল,

-‘আপনি কিভাবে জানলেন আমার পেট ব্যথা করছে?’

-‘শশ্মানের আত্মারা কানে কানে বলে গেছে।’ এই
মুহূর্তে শুদ্ধর বাঁকা কথা শুনে সে ভ্রুঁ কুটি করে
তাকাল। আশেপাশে স্বর্ণকে না দেখে খুঁজছে দেখে
শুদ্ধ বলল,

-‘ও সামলে নেবে ভয় নেই। ‘

-‘আপু জানে আপনি এসেছেন? সায়েন ভাইয়া কই,
আসে নি?’

-‘তুই আর তোর ভাইয়া জন্মেছিস বার বার আমাদের
ভালোবাসার দিকে আঙুল তুলতে। আর আমরা
জন্মেছি তোদের গোরবমার্কী বুদ্ধি ট্যাকেল দিতে। ‘

-‘মন ভালো নেই বকবেন না তো।’

-‘ কেন, মনের আবার কি হলো?’

-‘আপনাকে নিয়ে ভয় হচ্ছে খুব।’

-‘কিসের ভয়?’

-‘হারানো ভয়। শুনেছি চোখের আড়াল হলে নাকি
মনের আড়াল হতে দেরি লাগে না।’

-‘তুলে আছাড় দেবো আজাইরা কথাবার্তা বলার সাধ মিটিয়ে দেবো। আসছে সিনেমার হিরোইন হতে। চল হাঁট কিছু খেয়ে ওষুধ খেতে হবে।’

-‘বা’ল খাবে। খাব না ওষুধ। এতকিছু ঘটে গেল এখনো নাকি ধমকাতে হবে। এজন্যই প্রেম করতে চাইনি আপনার সাথে।’-‘এই বেয়াদব এই প্রেম করলি কখন? প্রেম করার আগেই তো তোর হিটলার মা সব ঘেঁটে ঘ করে দিলো।’

-‘বেশ করেছে। আপনাকে দিয়ে প্রেমের প ও হবে না।’

-‘হবে কি না, সেটা সময় আসুক, দেখে নিস।’

একথা বলে সে একটা ফোন এগিয়ে দিলো শীতলের দিকে। বারবার সাবধানও করল কিছুদিন লুকিয়ে রাখার জন্য। এটা দিয়েই আপাতত যোগাযোগ করবে। এই ফোন হারালে আর কথা বলাও হবে না শুদ্ধর সাথে। একথা শুনে শীতল যক্ষের ধনের মতো ফোনটা আঁকড়ে ধরল।

এদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে যেতে হবে কিন্তু বিদায়ের ঘন্টা বড়ই যন্ত্রনার। কিন্তু কেউ মুখে বলতে পারছিল না। নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে শুদ্ধ টুকটাক কথা

বললেও শীতল ফোন হাতে নিয়ে অশ্রুসিদ্ধ চোখে
তাকিয়ে রইল। তখন শুদ্ধ বাঁ পকেটে হাত ঢুকিয়ে
কিছু বকুল ফুল এগিয়ে দিলো।

তাজা বকুল ফুল। মিষ্টি সুগন্ধও আছে। পৃথিবীতে এত
এত ফুলের মাঝে শুদ্ধর পছন্দ বকুল ফুল। শীতল
হাত বাড়িয়ে নিলে স্বর্ণ সেখানে হাজির হলো।
আপাতত আর কথা বাড়াল না দু'জন। তবে শীতল
যখন জানল শুদ্ধও পেছনের গাড়িতে তাদের সাথে
চট্টগ্রাম যাচ্ছে তখন অশ্রুসিদ্ধ চোখে তাকিয়েও মুচকি
হাসল। নয়তো বিদায় দিতে কলিজা এফোড় ওফোড়
হয়ে যাচ্ছিল। শুদ্ধ চট্টগ্রামে যাচ্ছে শুনে শীতলের মুখ
হাসি ফুটল। অশ্রুসিদ্ধ দুচোখে বোনের দিকে একবার
তাকিয়ে হাতের উল্টো পিঠে চোখ মুছল। নাকের সর্দি
ওড়নায় মুছে মুখ কাঁচুমাচু করে আর দুই মিনিট সময়
চেয়ে নিলো।

স্বর্ণ বুঝল তার পাগলি বোনটার মনের কথা। বুঝল,
একবুক যন্ত্রণা নিয়ে স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ানো ভাইয়ের
কথা। যে বাড়ির মেয়েদের আপন নানা মামাদের
বাড়িতেও থাকার পারমিশন দিতো না। আজ
এতকিছুর পরও সেই আবার ছুটে এসেছে শুধু

নিরাপত্তার কথা ভেবে। জানি করে যাবে চট্টগ্রামে
বারণ করেও যে কাজ হবে না সেটাও জানা কথা।
তবে একটা কথা না বললেই নয় সে অমূল্য রত্ন
দেখে নি তবে তার ভাইদের দেখেছে। যারা চৌধুরী
নিবাসের গর্ব, দর্প! সে আর দাঁড়াল না ধীর পায়ে হেঁটে
এসে গাড়ির কাছটায় গিয়ে দাঁড়াল।

বুঝ হওয়ার পর থেকে সে কারো সামনে কাঁদতে
পারে না। কাঁদতে গেলে

ভীষণ বোকা বোকা লাগে। মনে হয় কান্না হচ্ছে
একান্ত আপন ও গোপন জিনিস। তাহলে কেঁদে
অন্যকে দেখানোর কি আছে? অন্যরা কষ্টের ভাগ
নেবে? নাকি কষ্ট মুছে দিতে পারবে? পারলে নাহয়
গলাগলি করে একটু কাঁদতে পারত। বুকচাপা ব্যথাটা
উগড়াতে পারত। এদিকে স্বর্ণের সাথে

শীতলকে না দেখে সিমিন আশেপাশে তাকিয়ে খুঁজল।
তবে মেয়েকে না দেখতে পেয়ে ভার কণ্ঠে
বলল,-‘বোনকে নিয়ে এসে গাড়িতে বসো।’

-‘ওর শরীর খারাপ একটু বসে বিশ্রাম করছে করুক।
তোমরা খেতে শুরু করো।’

-‘শুধু শুধু কথা বাড়িও না স্বর্ণ!’

-‘আমিও এটাই বোঝাতে চাচ্ছি কথা বাড়িও না খেতে শুরু করো।’

একথা বলে মায়ের থেকে কিছুটা দূরে সরে দাঁড়াল। তারপর নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখে গেল রাস্তার পড়ে থাকা কৃষ্ণচূড়া ফুলের দিকে। একের পর এক গাড়ি এসে মারিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ফুলগুলোকে। গাড়ির চাকাতে দলিত হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে ফুলের আকার-আকৃতি, রূপ, রং, সৌন্দর্য। বোন যেতেই শীতল মায়াভরা চোখে তাকাল শুদ্ধর দিকে। মানুষটা এত লম্বা সহজে নাগাল পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে তার কুচকুচে কালো চুলগুলো খামছে ধরে ঝাঁকিয়ে দিতে। কিন্তু এ দুনিয়ায় থাকতেও খুব ইচ্ছে করে। অথচ একাজ করলে বাঁচার সম্ভাবনা ৫%। কারণ বিশুদ্ধ পুরুষ চুলে কাউকে হাত দিতে দেয় না, দেওয়া পছন্দও করে না। শীতল কিছু একটা ভেবে মনের সব ভয়, দ্বিধা ও জড়তাকে পেছনে ফেলে চট করে শুদ্ধর পায়ের পাতার উপর উঠে দাঁড়াল। শুদ্ধ ভ্রুঁ কুঁচকালে শীতল

শুদ্ধৰ শাৰ্টেৰ কলারেৰ কাছে নাক ডুবিযে নিঃশ্বাস
টেনে নিলো। এই তো সেই ঘাণ! পৰিচিত ঘাণ! এ
ঘাণ হারানো ভয়েই পাগল পাগল লাগছিল।

কাঁদছিল অসহায় সূৰে। সে দুই হাতে শাৰ্টেৰ কপাল
চেপে ধৰে বুভুক্ষণ মতো একেৰ পৰ এক নিঃশ্বাস
টানতে টানতে চট কৰে মাথা তুলে বলল,-‘শুদ্ধ ভাই
চলেন আমৰা পালিয়ে যাই?’

-‘পালাব?’

-‘হুম।’

-‘তা কোন সুখে পালাব?’

-‘ভালোবাসাৰ সুখে। ভালো থাকাৰ সুখে।’

-‘তাৰপৰ? পাঁচবছৰ পৰ ছানা নিয়ে ফিৰব, তাই
তো?’

-‘হুম।’

-‘আজ কেবল ভালোবাসাৰ কথা বাড়িতে জানালাম।
বাড়িৰ লোকজন মানল না আবার বোঝাব। প্রয়োজনে
না মানা অবধি অপেক্ষা কৰব তাই বলে পালিয়ে বিয়ে
কৰে, বাসৰ সেৱে, বছৰ না ঘূৰতেই বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে
ফেৰাৰ কথা ভেবে ফেলবি? তোকে বলেছিলাম

ভালোবাসা শিখতে আর তুই ভালোবাসা শেখাল ছলে
লাজ-লজ্জা গিলে খেয়েছিস?’

শীতল ঘাড় নাড়াল বোঝাতে চাইল এই লোক বুঝল
আরেক। তাই সে বলল,-‘এছাড়া কি আর উপায়
আছে, আপনিই বলুন?’

-‘মাথামোটা মাথায় উপায়ও খুঁজেছিস?’

-‘ মজা একদমই ভালো লাগছে না শুদ্ধ ভাই।
আপনাকে ছাড়া থাকতে পারব না, একদন্ড থাকতে
চাইছিও না, কেন বুঝছেন না? চলেন না এই মুহূর্তে
আমরা পালিয়ে যাই? তারপর আমরা একটা সংসার
সাজাই?’

একথা শুনে শুদ্ধ চুপ তাকিয়ে আছে তার শীতলের
দিকে। ব্যাঙাটি কি একদিনেই বড় হয়ে গেল নাকি?
কিসব বলছে এসব? বড়দের মতো এত বড় বড়
কথা বলতে কে বলেছে তাকে? আর কি বলল,
সংসার করবে? সংসারের মানে বোঝে সে? ডিম
ভাজতে গিয়ে ডিমের যে হাল বানায়, নিজের রুম
গুছিয়েছে কখনো? তাতে আবার সে নাকি করবে
সংসার..!

শুদ্ধকে চুপ থাকতে দেখে শীতল পুনরায় ফোঁপাতে
ফোপাতে বলল,-‘আপনি কি আমার কষ্টটা চোখে
দেখছেন না শুদ্ধ ভাই?’

-‘না।’

-‘কেন? কেন দেখছেন না?’

-‘তোর বাবা-মা কি আমার কষ্ট দেখছে যে আমি
তোর কষ্ট দেখব?’

-‘আপনার কিসের কষ্ট?’

-‘বুঝবি না।’

-‘এজন্যই বলছি এরা এদের ইগো নিয়ে থাকুক
আমরা আমাদের পথ বেছে নেয়।’

-‘তোর এই ছোট মাথায় এতকিছু ভাবতে কে
বলেছে, আমি আছি না?’

-‘ঠিক আছে ভাবব না। তবে বেশিদিন দূর থাকতেও
পারব না এই বলে দিলাম। ঠিক এক সপ্তাহের মধ্যে
যেন আমার সামনে দেখি।’-‘এবার যা।’

-‘ঠিক এক সপ্তাহ।’

-‘হুম।’

-‘বাড়িতে গিয়ে সবাইকে বলবেন আমি তাড়াতাড়ি
চলে আসব।’

-‘আচ্ছা বলব।’

-‘যাব?’

-‘হুম।’

-‘মন টা..টানছে না।’

-‘সিমিন চৌধুরী খুঁজতে চলে আসবে তখন আমাকে কথা শুনতে হবে।’

-‘যা..যাচ্ছি তো। দূরে গেলে কাছে আসতে বলেন আর কাছে গেলে দূরে সরতে বলেন। আপনি এবং আপনার ভালোবাসা খুবই খারাপ শুদ্ধ ভাই, খুব খারাপ। ‘

-‘যা।’ মুখে যাচ্ছি বললেও শীতল একচুল নড়লও না, না পায়ের উপর থেকে নামল। ওর অবস্থা বুঝে শুদ্ধ নিজেই শীতলকে নিজের থেকে সরালো। কি ভেবে একটু ঝুঁকে দুগালে হাত রেখে মুখটা কিঞ্চিৎ তুলল। পুরো মুখে চোখ বুলাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। খুব মন দিয়ে দেখল শীতলের ছোট কপাল, ডাগর ডাগর ফোলা চোখ, বোচা নাক, ফোলা গাল আর সর্বনাশা চিকন ঠোঁটজোড়ার মৃদু কম্পন। আচ্ছা, বোকারাণী কখনো কি জানবে তাকে ঘায়েল করার অস্ত্র তার কাছে লুকায়িত আছে। প্রেমিক পুরুষকে মারতে বুলেট

প্রয়োজন হয় না প্রিয় নারীর কম্পিত ঠোঁটের কম্পনই
যথেষ্ট তার সবকিছু এলোমেলো করে দিতে। শীতল
নিজেও শুদ্ধর চাহনি বুঝে কিছু বলল না। সেও
দেখতে চাইল শুদ্ধ কী করে কিন্তু তাকে হতাশ করে
দিয়ে

শুদ্ধ তাকে ছেড়ে দিয়ে চোখের ইশারায় যাওয়ার কথা
বলল। শীতল শুধু

ঘাড় কাত করে গুঁটি গুঁটি পায়ে গাড়ির কাছে এগিয়ে
গেল। শুদ্ধ ভুলেও

চোখ তুলে তাকাল না সেখানে দাঁড়িয়ে মেঝের দিকে
শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সেভাবে কয়েক মিনিট
পেরুলে হঠাৎ দেওয়ালের ওপাশ থেকে ইঁদুরের মতো
মাথা বের করে শীতল বলল,

-‘কি হলো আসছেন না কেন? আপনি না বললেন
যাবেন আমাদের সাথে? আমাকে ভুলভাল বুঝানোর
পায়তারা তাই না? আপনি না গেলে আমিও কিন্তু যাব
না।’এখনো সে যায় নি দেখে শুদ্ধ ওকে মারতে
এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছু খুঁজল। তার অবস্থা বুঝে
শীতল এবার এক দৌড়ে গাড়ির কাছে। এরপর
পেছনের গাড়ির খেয়াল করে স্বর্নের হাতে পেটপুরে

খেলো। জানালার দিকে চেপে বসে উঁকি মেরে
দেখতে লাগল শুদ্ধর গাড়ি আসছে কী না। আসছে
দেখে আকাশের চাঁদের সঙ্গে মনের চাঁদটাকে নিয়ে
কত কথা বলল। একা একা হাসল। তারপর একটা
সময় ঘুমিয়ে গেল নিশ্চিত্তমনে। স্বর্ণ বোনকে কোলে
টেনে নিয়ে মেসেজ করার সাথে সাথে শুদ্ধর গাড়িটা
থেমে গেল। তারপর কিছুক্ষণ স্থির থেকে গাড়ি
ঘুরিয়ে পথ ধরল চৌধুরী বাড়ির উদ্দেশ্যে। অথচ শুদ্ধ
যাচ্ছে ভেবে কত নিশ্চিত্তে না ঘুমাল বোকা
শীতলরাণী। সকালে যখন শুদ্ধকে দেখতে পাবে না
তখন কি হবে? তার কান্না কে থামাবে? কে তাকে
বাহুডোরে আগলে নেবে? -‘আয়, আয়, চাঁদ মামা টিপ
দিয়ে যা।

আমার সায়ন, শুদ্ধর চাঁদ কপালে টিপে দিয়ে যা। ‘
-‘আমি টিপ নিবো না ছোটো আম্মু। চাঁদকে বলো
আমার জন্য বউ এনে দিতো।’

-‘বউ কি করবি বাপ?’

-‘ একসাথে খেলবো। ঘুরবো। মারবো। বকবো।
কাঁদলে হাসাব। হাসলে মেরে কাঁদাব।’

সাত বছরের ফোঁকলা সায়নের কথা শুনে সিমিন
হতবাক। উনি কথার খেই হারিয়ে চোখ বড় বড় করে
তাকিয়ে রইলেন সায়নের দিকে। পাজি ছেলে বলে
কি? নিজে এখনো বিছানায় হিসু করে বিছানা ভেজায়
অথচ

বলে কি না বউ এনে দাও। সিমিনের মুখ দেখে
সায়ন কিছুক্ষণ উনার মুখের দিকে তাকিয়ে ফিক
করে হেসে দিলো। পোকাতে খাওয়া ফোঁকলা দাঁতে
সে কি হাসি। উনি এবার উনার আরেক উরুর উপর
শোয়া আরেক পাজির দিকে তাকালেন। তিনি আরাম
করে শুয়ে পাজেল ঘুরাচ্ছে। তার বয়স সবে সাড়ে
চার বছর হলেও সায়নের থেকে শুদ্ধ একটু ঠান্ডা।
তবে সায়ন, শুদ্ধ ভীষন আদুরে বাচ্চা। ফর্সা, গলুমলু,
সব পোশাকে খুব সুন্দর মানিয়ে যায়। কথায় কথায়
ছোট ছোট ইংলিশ বলে। সায়ন তখন কথায় কথায়
একটা ইংলিশ শব্দ বেশিই বলত। সেটা হলো,
'জাস্টফস্টিং।' এই ইংলিশ শব্দ নাকি সে শারায়াত
চৌধুরীকে বলতে শুনেছিল। উনি নাকি ফোনে কাকে
বলেছিলেন, 'ইউ ডিসকাস্টিং' সেটা পাশে শুনে সে
বানিয়ে দিয়েছে জাস্টফস্টিং। তখন রেগে গেলে বলত

‘ইউ জাস্টফস্টিং।’ একথা শুনে হাসি পেলেও হাসা যাবে না কারণে তাতে বড়মহারাজ আরো রেগে যেতো। আর শুদ্ধর যা পছন্দ নয় সেটা কখনোই করতো না। বরং জোর করলে চোখ, মুখ কুঁচকে শাহাদত আঙুল নাড়িয়ে বলত, ‘ইই নো, নো।’ এদের কথা আর কাজে না হেসেও পারা যায় না। একদিন রাতের কথা,

তখন রাত বাঁজে আড়াইটা অথচ পাজি দুটোর চোখে ঘুম নেই। যত রাত বাড়ছে তাদের চোখ যেন ফুটছে। তারা খেলবে। খেলনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার। ওদিকে সিঁতারা চৌধুরী অসুস্থ বিধায় পাশের রুমে উনি শুয়ে ছিলেন। আর এই পাজি দুটো উনার কাছে এসে উনার কোল দখল করে নিয়েছে। আবদার গল্প শুনবে। এদিকে সারাদিন কাজকর্ম করে উনারও চোখে ঘুম যেন ঢেলে পড়ছে। কিন্তু এ দুটোর তো ঘুমানোর নাম নেই তাই সায়নের পিঠে আঙু করে থাবা বসিয়ে বললেন,-‘এ্যাই পাজি ঘুমাবি কখন? রাত ক’টা বাজে?’

-‘ঘুম আসছে না তো গল্প বলো।’

-‘ঘুমা বাপ। যত গল্প জানতাম সব শুনিয়েছি তো। ‘

-‘বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলো।’

ভাইয়ের কথা শুনে শুদ্ধ তখন শাহাদত আঙুল নাড়িয়ে বলল,

-‘নো, নো, নো বানিয়ে না ওইতা বলো।’

-‘কোনটা?’

-‘লাজকন্যাকে ড্রাগন এসে তুলে নিয়ে যায় ওইতা।’

-‘একই গল্প আর কত শুনবি?’

-‘মেলাদিন শুনব তুমি বলো।’

-‘ মেলাবার শোনাতে আমি কি পার?’

-‘আমলা যতদিন বাঁচব তোমাকে এত এত ভালুপাশবো।’ শুদ্ধর কথা শুনে উনার কলিজাখানা যেন জুড়িয়ে গিয়েছিল। ততক্ষণে দুটো পাজি উনার কোল দখল করে গল্প শোনার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে। তাই উনিও বিছানার হেডবোর্ডে হেলান দিয়ে খোলা জানালার দিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। আকাশে ঝলমল করছে চাঁদ। চাঁদের এত আলো এর আগে দেখেন নি উনি। কোন মাসের চাঁদ তাও মনে করতে পারছিলেন না। উনি চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করলেন,

-‘একদেশে ছিল এক রাজা। রাজার ছিল দুই পুত্র।
তারা একজন ছিল চন্দ্র আরেকজন সূর্য। তাদের
দেখাশোনার জন্য এক রাজকন্যাকে তুলে আনা
হয়েছিল। রাজকন্যা ছিল ভীষণ সুন্দরী তবে কোনো
কাজ করতে পারত না। সারাদিন কাঁদত...। খেতে
দিলেও খেতে পারত না কারণ ওর গলায় এক
ধরনের কাঁটা বিঁধে থাকত। এই কাঁটা জন্মগতভাবে
এবং এর সমাধান কেউ জানত না। একদিন
রাজকন্যার স্বপ্নে একটা ড্রাগন এসে জানাল, চন্দ্র আর
সূর্যের রক্ত পান করলে সে মুক্ত হবে। একথা শুনে
সে তাই করতে নিজেকে প্রস্তুত করল...!’এভাবে গল্প
বলতে বলতে খেয়াল করলেন পাজি দুটো ঘুমিয়ে
পড়েছে।

ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে কপালে চুমু খেলেন।
সেদিনের মতো আজও আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ।
মধ্যরাত। উনিও উপস্থিত। শুধু এ কোলে জুড়ে সেই
সায়ন, শুদ্ধের মাথাটা। নেই পছন্দের গল্প শোনার
মিষ্টি আবদার।

সেসব মনে করে সিমিন হাসলেন আর হাসতে
হাসতে চোখ দিয়ে অঝরে অশ্রু ঝরে গেল টেরই

পেলেন না।গাড়ির চলছে মাঝারি গতিতে। শাহাদত চৌধুরী, সিমিন পাশাপাশি বসে থাকলেও কথা নেই কারো মুখে। শাহাদত চৌধুরী অভিজ্ঞ হাতে গাড়ির হুইল ঘুরতে ব্যস্ত আর সিমিন তাকিয়ে রইল পূর্নিমার চাঁদের দিকে। কাল থেকে একা সংসার গুছাতে হবে। দিন শুরু হবে সেনা হাউজে। ধরা বাঁধা নিয়মে নিজেকে অভ্যস্ত করতে হবে।বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা পার্টি অফিসে এসেছে সাইন। আজম তখন দলের ছেলেপুলেদের সাথে নিয়ে হইহই করে ক্যারাম খেলছিল। বাজি ধরেছে আজকে যে হারবে সেই কাচ্চি খাওয়াবে। তাদের দুই দলের মধ্যে চলছে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। খেলার মাঝে সাইনকে আসতে দেখে আজম গলা ছেড়ে ডাকল। সাইন থমথমে মুখে একবার তাকিয়ে মাথা ব্যথার কথা ইশারায় জানিয়ে অফিসরুমে রুমে ঢুকে গেল। ভাইয়ের মাথা ব্যথা করছে যেহেতু ঘুমালে ঠিক হয়ে যাবে ভেবে আজমও আর কথা বাড়াল না।তাছাড়া সাইন যখন ডাকতে বারণ করে তখন জোর খাটিয়ে ডাকলে ভীষণ রেগে যায়। তখন চমৎকার চমৎকার গালি কপালে জোটে। যেসব গালি আবার দিনের বেলা বললে পাপ হয়।

তাও আবার বড় বড় পাপ!এরচেয়ে ক্ষ্যাপা পাগল
আপাতত ঘুমাক একটুপরে নাহয় ডেকে দেওয়া
যাবে। একথা ভেবে তারা হইহই করে খেলাটা শেষ
করল। আজমের দল বাজিতে জিতে গিয়ে বিপক্ষ
দলকে খুব করে পঁচালো। এরপর দলবেঁধে কাচ্চি
কিনে এনে সকলে একসাথে খেতে বসল। সবার
হাতে খাবারের প্লেট। কাচ্চির ঘ্রাণে ম-ম করছে
চারদিক। আজম খেতে বসে হঠাৎ মনে পড়ল সায়ন
রুম থেকে এখনো বের হয় নি। এত সময় রুম
বন্দিও থাকে না কখনো। তাহলে কি শরীর কি বেশি
খারাপ করছে? মেডিসিন আনতে হবে? একথা ভেবে
সে খাওয়া ছেড়ে উঠে দরজা বন্ধ দেখে ডাকল,
-‘ভাই? ও ভাই? আহেন আমগো লগে খাবেন।’বেশ
কয়েকবার ডাকার পরও সায়নের জবাব পেল না।
ততক্ষণে সবাই খাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার
কাছেও চলে এসেছে। ডাকছে একে একে। এত
ডাকাডাকি শুনে সায়ন কপালের উপর থেকে হাত না
সরিয়ে বিরক্ত হয়ে দরজার দিকে তাকাল। ভেজা
চোখজোড়া না মুছে মলিন স্বরে জবাব দিলো,

-‘তোরা খা।’

মিনমিনে সুরে জবাব পেয়ে আজম পুনরায় বলল,

-‘আহেন না ভাই হগ্নলে মিলে একলগে খাই?’

-‘ঘুমাব একটু, দুই ঘন্টা পর ডেকে দিস।’

-‘এবা করেন ক্যান? কত খাওন-দাওন আনছি আসেন একলগে খাই?’

-‘মা’দা’রচো’দ যাবি এখান থেকে? বলছি ঘুমাব তাও খাওন খাওন কইরা ফ্যাল পাড়তাছোস? আর একটা বাড়তি কথা কইলে জিন্দা কবর দিমু শা’লা। আসছে ভালোবাসা দেখাতে..তোদের ভালোবাসায় সায়েন মুতে না আর। লাগব না কারো ভালোবাসা.....যেশালায় ভালোবাসা দেখাইতে আসবি তারেই কুপামু।’-‘ভাই..!’

-‘আজম্য মাথা মুথা ঠিক নাই যা কইতাছি।’

-‘ওষুধ আইন্না দিমু?’

-‘যাবি তুই!’

-‘রাইগেন না ভাই। বাহিরে আহেন, ভুল করলে আম্রে দুই’ঘা মারেন তাও

কন কি হইছে আফনার?’

-‘কিছু হয় নাই। তবে আমারে উঠতে হইলে আমার হাতে খুন হবি তুই।’

কোনো কারণে সায়ন মাত্রারিঙ রেগে আছে বুঝে
আজম কথা বাড়াল না। নয়তো সত্যি সত্যি মাইর
নিশ্চিত তাই শুধু বিড়ালসুরে বলল,-‘আচ্ছা ভাই
আপনে তাইলে ঘুমান। কিছু লাগলে আমারে ডাইকেন
আমি এইহানেই আছি।’

একথা বলে ছেলেপুলেকে শব্দ করতে বারণ করে
অন্যদিকে বসল। যত খুশি নিয়ে খেতে বসেছিল তত
খুশি আর রইল না কারো। কিন্তু সায়নের সমস্যার
কথা সে নিজে থেকে না বললে জানারও উপায় নাই
কোনো। এসব ভেবে সে প্রথম লোকমা মুখে পুরতে
যাবে তখনই ফোনে রিংটোন বেজে উঠল। অসময়ে
কল আসায় বিরক্ত হয়ে ডিসপ্লেতে তাকাতেই ভ্রুঁ
কুঁচকে গেল। এই নাম্বার থেকে অযথা কল আসে
না। আর যখনই আসে তখনই বুঝতে হবে ঘটনা
সিরিয়াস। তাই সে সতর্ক হয়ে চট করে উঠে দাঁড়িয়ে
একটু সাইডে সরে গেল। তারপর দ্রুত কল রিসিভ
করে বলল,-‘হ্যালো শুদ্ধ ভাই!’

-‘ভাইয়া কোথায়, আজম?’

-‘অফিসরুম থিকা বাইর হয় নি তয় কি লইয়া জানি
খুব রাইগ্লা আছে।’

-‘বের হলেও একা ছেড়ো না।’

-‘কোনো সমস্যা ভাই?’

-‘একটু, তবে যতটুকু বললাম মনে রেখো। চোখ, কান খোলা রেখো আর হ্যাঁ আবারও বলছি, ভাইয়াকে একা ছেড়ো না।’

-‘জ্বি ভাই। কিন্তু আপনি কুথায় গাড়ির শব্দ শুনতাহি?’

-‘আছি আশেপাশেই। আপাতত ভাইয়ার দিকে খেয়াল রেখো, রাখছি।’ একথা বলে শুদ্ধ কল কেটে দিলো। আজম ভ্রঁজোড়া কুঁচকে আরেকবার তাকাল বন্ধ অফিসরুমের দিকে। তখন তাদের দলের এক ছেলে দৌড়ে এসে জানাল চৌধুরী নিবাসে ঘটে যাওয়া ঘটনা। শীতলরাও চলে গেছে

সাথে শারফাত চৌধুরী সায়নকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। একথা

শুনে আজম হতবাক হয়ে মাটির দিতে তাকিয়ে রইল। পরক্ষণেই চোখ বেয়ে অশ্রু গড়াতে লাগল তার। তার দেখা সবচেয়ে সুন্দর পরিবারটিও এভাবে ভেঙে গেল? এবার কি হবে? আর স্বর্ণ ভাইকে ছেড়ে চলে গেল?

ভাই মানবে কিভাবে? মানার চেয়েও বড়কথা বাঁচবে
কিভাবে? কেউ না জানুক সে তো জানে স্বর্গের জন্য
তাদের ভাই কতটা পাগল। ঠিক কতটা ভালোবাসে
স্বর্গ আপাকে! আজম আর ভাবতে পারল না তবে এই
ঘটনা জানাজানি করতে বারণ করল। এবং আপাতত
ভিড় করতে মানা করে নিজেও বন্ধ রুমের দরজার
কাছে দুই পা ছড়িয়ে বসে পড়ল। দেওয়ালে
মাথা ঠেকিয়ে বিরবির করে বলল,-‘সব সুন্দর
জিনিসের স্থায়ীত্বকাল এত অল্প সময় দাও কেন গো
মাবুদ?

আমারে সুন্দর পরিবার দাও নাই মাইন্না নিসি। কিন্তু
চোখে দেখার মতো সুন্দর একটা পরিবার দিসিলা
তাও কাইড়া নিলা? আমার শাহরিয়ার ভাইয়ের ধৈর্য্য
দাও খোদা। মানুষটা উপরে শক্ত হইলেও ভেতরে যে
নরম মাটি। পরিবারটাকে উনি বুক দিয়ে আগলে
রাখত। সেই পরিবার ভাইঙ্গা গেছে, ভাইয়ে না জানি
কত কষ্ট পাইতাছে আর আমি কী না কাচ্চি নিয়া
এতক্ষণ পইড়া আছিলাম।’

একথা ভেবে সে দুইহাতে মুখ ঢেকে অঝরে কাঁদতে
লাগল। তার চোখের পানি দুই হাতের ফাঁক গলে

পড়তে লাগল। এভাবে অনেকক্ষণ আজম সেখানেই বসে রইল। রাত বাড়ছে দেখে দলের অনেক ছেলেপুলেরা বাড়ি চলে গেল। কেউ থাকতে চাইলে আজম ওদের বারণ করে দিলো।

এভাবে ঘন্টা তিনেক পার হওয়ার পর সায়ন বেরিয়ে এলো। কঠিন মুখে আজমের দিকে তাকিয়ে বলল,-‘কাঁদছিস কেন? কে মরেছে তোর?’

-‘ভা...ই, এতকিছু ঘইটা গেছে আমি তহন কিছু বুঝি নাই ভাই।’

-‘এখন বুঝেছিস?’

-‘জ্বি ভাই।’

-‘বুঝে কার বা’ল ছিঁড়লি?’

একথা শুনে আজম মাথা নিচু করে নিলো। তার দু’চোখ তখনো ভেজা। ওকে কাঁদতে দেখে সায়ন কেবল হাসল। তারপর আজমের কাঁধজড়িয়ে ধরে সামনে হাঁটতে হাঁটতে বলল,-‘পুরুষ মানুষের এত সহজে হারলে চলে না রে পাগলা। আমাদের বুকটা তৈরি কষ্ট লুফে নেওয়ার জন্যই। পুরুষ হয়ে জন্মেছি, একবার বাপে কষ্ট দিবে, মায়ে কষ্ট দিবে, ভাই-বোনরাও আঘাত পাচ্ছি নাকি খোঁচা মেরে দেখবে,

যাকে ভালোবাসি তাকে বাদ রাখাও যাবে না বুঝলি
এতে পাপ হবে, পাপ!’

এভাবে হাসতে হাসতে সায়েন অনেক কথা বলল।
বাঁচাল আজম চোখের পানি লুকাতে লুকাতে শুধু শুনে
গেল। অতঃপর তারা হাঁটতে হাঁটতে এক সময়
অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কোথায় যে গেল আর খুঁজে
পাওয়া গেল না। ইরানের রাজধানী তেহরান, সকাল
১০:৩০ মি.

নগ্ন শরীরের কোমরের কাছটায় পাতলা একটি
তোয়ালে রেখে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে ইয়াসির।
লম্বা হাত দুটো দু’দিকে মেলে রাখা। তার মাথা ও
দুপায়ের কাছে দাঁড়িয়ে চারজন লাস্যময়ী তরুণী।
চারজনই বিদেশী।

গায়ের রং ধবধবে ফর্সা। মাথাভর্তি সোনালি চুল।
পরনে কালো রঙের দুটো টুকরো ছোটো পোশাক।
যদিও স্থান, কাল, দেশভেদে এই পোশাক এখানে
স্বাভাবিক। তরুণীদের উভয়ের হাতে বডি ম্যাসাজ
ওয়েল। তারা

নিজ নিজ ভঙ্গিমায় ইয়াসিরের সারা শরীর ম্যাসাজ
করছে। কখনো বা দুষ্ট হেসে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দিচ্ছে

ইয়াসিরের শরীরের একেক অংশ। এতে শক্ত পুরুষালি শরীরে নরম হাতের ছোঁয়ায় ইয়াসিরের যে শুধু ভালো লাগায় কাজ করছে তা নয়। বরং তার দেহ খানাও একটু একটু জেগে উঠছে। চাচ্ছে নারীদেহের সংস্পর্শ। কিন্তু শরীর চাইলেও তার মনটা পড়ে আছে অন্যকিছুতে। তার শরীরের চাওয়া সুন্দরী নারীদেহ হলেও তার মন অন্য গান গাইছে। সে আচমকা বন্ধ চোখ খুলে হাতের কাছে থাকা তরুণীকে হ্যাঁচকা টানে কাছে আনল। তারপর উল্টো গড়নে নিজের বুকের নিচে পিষে ফেলে একটা কালো ওড়না রাখল মেয়েটার মুখের উপর। চোখ দুটো খোলা রেখে কপাল আর নাক ঢেকে দিয়ে ভালো করে দেখল। না মিলছে না, এই চোখ দুটোও নয়। যেই চোখ সেদিন রাতে সে দেখেছিল সেই চোখদুটো ছিল একেবারেই অন্যরকম। অদ্ভুত রকমের সুন্দর ছিল। চোখের ভাষা ছিল ধ্বংস করে দেওয়ার মতো। এমনি এমনি সেই চোখের মালিককের নাম দেয় নি __অগ্নিকন্যা। এই তরুণীর চোখের সাথে মিলছে না দেখে ইয়াসির খুব বিরক্ত হলো। সে

মেয়েটিকে ধাক্কা মেরে নিজের থেকে সরিয়ে তোয়ালে কোমরে পেঁচিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার জিম করা পেটানো দেহে তেল চপচপ করছে। এখনই শাওয়ার নেওয়া প্রয়োজন ভেবে শিষ বাজাতে বাজাতেই এগোল সুইমিং পুলের দিকে। সুইমিং পুলের নীল জল টলমল করছে। মাথার উপরে মস্ত বড় আকাশের ছবি ভাসলে স্বচ্ছ জলে। সে একলাফে দিতে জল ছিঁটকে পড়ল আশেপাশে। পরপর বেশ কয়েকটা ডুব দিয়ে মাথা নাড়তেই চুলের পানি ছিঁটকে পড়ল আশেপাশে। দম বন্ধ করে পানিতে নিজেকে ডুবিয়ে রাখল মিনিটের কাঁটা ধরে, রোজকার চর্চা থাকায় খুব একটা কষ্ট হলো না। তবে সে প্রচণ্ড অস্থির অন্য কারণে, আগে তার শরীরে ক্ষুধা জাগলে মেয়ের নিয়ে গুয়ে পড়তো আর এখন শরীর জাগলে মেয়ে আনে ঠিকই তবে যখনই কাছে যায় কিংবা পার্টনারের চোখে চোখ পড়ে তখনই কিছু একটা মনে পড়ে মুডটাই চলে যায়। যা অতি মাত্রায় অসহ্য। কয়েকদিন যাবৎ এসব ঘটছে তার সাথে, মানে হয় এসবের? কে সেই কন্যা? কেনই বা খোঁজ মিলছে না তার? সামান্য দৃষ্টির বান ছুঁড়ে তার মনের সুখ কেড়ে নেওয়ার মানে

হয়? গুরুর দিকে মেয়েটাকে খোঁজার জন্য এতটা আগ্রহ

দেখায় নি। তবে আজকাল মনে হচ্ছে মাফিয়াগিরি ছেড়ে সেই মেয়েটার সন্ধানেই বের হতে হবে। এসব ভাবতে ভাবতে সাঁতার কাটতে লাগল সে। ঠোঁটে ফিচেল হাসি। মনে দুষ্ট ভাবনা। মেয়েটা যদি বেঁচে থাকে মুখোমুখি হবেই সে। আর যখন তাকে পাবে একদন্ড শান্তি দেবে না, না শারীরিক ভাবে আর না মানসিকভাবে। তাকে এত প্যারা দেওয়ার শোধ হারে হারে তুলবে।

ইয়াসির যখন এসব ভাবনায় মশগুল তখন তার সহকারী বুরাক দৌড়ে এলো সুইমিংপুলের কাছে। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ঝরঝরে ইংলিশ বলল,-‘ স্যার, এম্ফুণি আমাদের বাংলাদেশে ফেরা উচিত।’

সহকারী বুরাকের কথা শুনে ইয়াসির ঘাড় ঘুরিয়ে একবার তাকিয়ে পুনরায় সাঁতার কাটাতে লাগল। বুরাক নিজেও বুঝল ইয়াসির সিরিয়াস ভাবে নিচ্ছে না তার কথা। তাই পুনরায় আমতা আমতা করে বলল,

-‘শোয়াইব শুদ্ধর ভাই শাহরিয়ার সায়ন আমাদের ডেরায় কাল হামলা করেছিল। মুখোশ পরে হামলা চালানোয় প্রথমে কেউই চিনতে পারে নি পরে জানা গেছে সে সায়ন ছিল।’

ইয়াসিরের হাত-পা ততক্ষণে থেমে গেছে। সে তীরে এসে ভেজা চুল ব্যাক ব্রাশ করতে করতে শীতল কণ্ঠে বলল,

-‘হঠাৎ আমাকে সুড়সুড়ি দিলো কেন শালায়?’

-‘যতটুকু জেনেছি তাতে মনে হচ্ছে চৌধুরী নিবাসে দুটো সিসি ক্যামেরা লাগিয়েছিলেন সেটার কথা জেনে গেছে। বড় কথা হলো ক্যামেরা সবার প্রথমে নজরে পড়েছিল ওই বাড়ির ছোটো গিনির। অবাক করা ব্যাপার,

উনি একথা কাউকে না জানিয়ে দুই মেয়ে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।

তারা যাচ্ছে সেনা হাউজে। ‘-‘ও আই সি...এবার দেখি ফিরতেই হবে। এই নাটকীর পোলাপান নিয়ে আর পারা গেল না। এরা দুভাই আমার পেছনে সুড়সুড়ির না দিলে শান্তি পায় না বোধহয়। চৌধুরীদের ছোটো কন্যা কে যে মধু দিয়ে কত শখ করে খেতে চাইলাম।

আবার আমার মুখের খাবার কেড়ে নিলো জাওরা
পোলাপান। এবার ফুলটাকে সেনা হাউজ থেকে
তোলা রিস্কি হয়ে যাবে।’

-‘কেন স্যার?’

-‘কারণ সেনা হাউজের প্রতিটা গেটে বন্দুক হাতে
তোমার বাপরা দাঁড়িয়ে থাকে। তোমার বাপদের
টপকে মেয়ে তোলা কি এত সোজা ভেবেছো?’

-‘সরি স্যার।’

-‘যাই হোক, জেট রেডি করো লাঞ্চ সেরে বের
হবো।’

-‘জি স্যার।’ একথা বলে বুরাক দ্রুতপায়ে প্রস্থান
করল। ইয়াসির জুসের গ্লাসে চোঁট ছোঁয়াতে গিয়েও
হঠাৎ থেমে গেল। হাতের কাছে ওর আরেকটা
শুকনো তোয়ালের নিচে থাকা পিস্তলটা নিয়ে শ্যুট
করল বডি ম্যাসেজের করা এক তরুনীর দিকে।
নিঁখুত নিশানায় তরুনীর কপাল ফুটো হয়ে বুলেট
গিয়ে লাগল পাশের দেওয়ালে। টুং করে শব্দ করে
সেটা ছিঁটকে পড়ল আশেপাশে। মেয়েটা সাথে সাথে
মেঝেতে ধপ করে পড়ল আর তখনই তার ছিঁটকে
পড়ল একটি ক্যামেরা। যেটা দিয়ে এতক্ষণ

ইয়াসিরের গতি বিধি রেকর্ড হচ্ছিল। এবং সেটা বাংলাদেশের কেউ নিঁখুতভাবে দেখছিল
এবং নোট করছিল। কিন্তু ধরা পড়ে সাইলেন্সার
লাগানো পিস্তলের মাত্র একটা বুলেট মেয়েটির প্রাণ
কেড়ে নিলো। মেয়েটি খোলা চোখে অদূরে দাঁড়ানো
ইয়াসিরের দিকে তাকিয়ে থাকা অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস
ত্যাগ করল। এদিকে, মেয়েটিকে ধরা পড়তে দেখে
শুদ্ধ বাংলাদেশে বসে শান্ত চোখে তাকিয়ে শুধু দেখে
গেল। পরেরদিন সকাল সাড়ে আটটা। শীতল থম
মেরে বসে আছে তার রুমের সঙ্গে লাগলো
বেলকনিতে। চোখজোড়া অশ্রুতে টইটম্বর। নীবর
কান্নায়

গালজোড়া ভিজে আছে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ
মুছতে না মুছতে পরক্ষণেই গাল ভিজে একাকার।
হেঁচকিও উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। গতকাল রাতে গাড়িতে
খাওয়ার পর কী মরণ ঘুম দিয়েছিল একবারও সজাগ
হয় নি। সারারাত বেহুঁশের মতো পড়ে পড়ে
ঘুমিয়েছে। সকালে সেনা হাউজে প্রবেশের পর নাকি
শুদ্ধ পুনরায় ফিরে গেছে। ইশ, মানুষটা সারারাত কষ্ট
করে এলো অথচ একবার হাসিমুখে বিদায় জানাতেও

পারল না। আবার কবে দেখা পাবে ঠিক নেই। তারা কবে ফিরবে তাও জানে না। এতদিন সে কিভাবে থাকবে মানুষটাকে না দেখে? ফোনে দেখে কি মনে ভরে? না ছুঁয়ে পারে? এভাবে নি থাকা যায়? এমন তো না যে চুপিচুপি করে দেখা করতে আসতে পারবে। এসব ভেবে তার কান্না দ্বিগুন বাড়ল। স্বর্ণ ফ্রেশ হয়ে কান্নারত বোনের কাছে এসে বলল,-‘ফ্রেশ হয়ে খাবি চল।’

শীতল বোনের কথা শুনে অশ্রু টলটল করা চোখে তাকিয়ে বলল,

-‘শুদ্ধ ভাই কি যাওয়ার সময় আমাকে ডেকেছিল?’

-‘না, আমিই ডাকতে বারণ করেছিলাম।’

-‘কেন বারণ করেছিলি? এখন আমার কষ্ট হচ্ছে না? তোকে বলেছিলাম এত পন্ডিতি করতে? না জানি কত কষ্ট পেয়ে ফিরে গেছে মানুষটা।’-‘বুঝদার মানুষ কষ্ট পাবে কেন শুধু শুধু?’

কথাটা শীতলের পছন্দ হলো না। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল,

-‘বাবা-মায়ের ভালো মেয়ের অভিনয় তো ভালোই করলি আপু। মেয়ে হিসেবে তুই সর্বেসবা হলেও প্রেমিকা হিসেবে খুব জঘন্য তা কি জানিস?’

-‘জানি।’

-‘তোর কষ্ট হচ্ছে না সায়েন ভাইয়ের জন্য?’

-‘না।’-‘তুই আসল পাষণ। তুই জানিস ভাইয়া তোকে ছাড়া থাকতে পারে না তবুও কেন এত কষ্ট দিলি ভাইয়াকে? ভাইয়া কত বড় মুখ করে বলল তুই ভাইয়ার হাত কখনো ছাড়বি না। অথচ তুই কী না সবার আগে ভাইয়ার হাত ছেড়ে দিলি? বাবা-মায়ের ভালো মেয়ে হওয়ার লোভ সামলাতে পারলি না?’

স্বর্ণ বোনের কথা শুনে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ বলল,

-‘ধর, এখন খবর পেলি তোর শুদ্ধকে কেউ গুলি করেছে কিংবা রাস্তায় পিষে দিয়েছে। কেমন লাগবে তোর?’

-‘আপু! শীতল এত জোরে চিৎকার করে আপু বলেছে যেন তার গলার রং ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম। সে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্বর্ণের দিকে। সামান্য কথাতে বোনকে এভাবে রেগে যেতে দেখে স্বর্ণ শুধু

হাসল। তারপর চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই
শীতল বজ্রকঠিন স্বরে বলল,

-‘সামনে পরিস্থিতি কেমন হবে জানি না। তবে আমি
শীতল ওয়াদা করে বলছি, শুদ্ধ ভাই যদি কখনো
আমার দিকে হাত বাড়িয়ে ডাকে আমি তাকে ফিরিয়ে
দেবো না। আমার কাছে একদিকে তোরা,
আরেকদিকে আমার শুদ্ধ ভাই। আমি তোর মতো
করে আমার প্রিয় পুরুষের বুকে ছুরি চালিয়ে ভালো
মেয়ে হতে পারব না। বাবা-মায়ের ভালো মেয়ে হতে
গিয়ে তার ভালোবাসার দিকে আঙুল উঠাতে পারব
না। আর এই মুহূর্তে যা উচ্চারণ করলি ভুলেও আর
করিস না আপু, তাহলে আমি ভুলে যাব তুই আমার
আপন বড় বোন। যে মানুষটা বর্তমানে আমার
মোনাজাতে স্থায়ীভাবে জায়গা দখল করেছে তার
মৃত্যুর কথা কল্পনা করতেও পারি না আমি।’-‘মৃত্যুর
কথা বললেই কেউ মরে যায় না বোন।’

-‘না মরুক তবুও তুই বলবি না। আমার শুদ্ধ ভাই,
আমার সায়ন ভাইকে নিয়ে তুই কোনো কথা বলবি
না। তোর থেকে আমি আর একটা কথাও শুনতে চাই
না। তুই সেলফিশ, তুই খারাপ, খুব খারাপ।’

একথা বলে শীতল কাঁদতে কাঁদতে রুমে চলে গেল।
বোনের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে স্বর্ণ কেবল হাসল।
বাবা আর্মিতে কর্মরত হলেও কখনো সেনানিবাসে
আসে নি তারা। ফোনে যতটুকু দেখেছে সেইটুকু তবে
আজ স্বচক্ষে ভেতরের পরিবেশ দেখে মনপ্রাণ যেন
জুড়িয়ে যাচ্ছে। চারপাশটা ছিমছাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।
এখানে নারিকেল গাছের সংখ্যা একটু বেশি মনে
হচ্ছে। স্বর্নের এসব জায়গা খুব বেশি পছন্দ। সে
একা একা দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ আশেপাশে দেখে
আকাশের দিকে তাকাল। তারপর আকাশের বুকে
উড়ে যাওয়া একটা পাখির দিকে তাকিয়ে বিরবির
করে বলল,-‘পৃথিবীতে হাজারটা মিথ্যা কথার মাঝে
একটা মিথ্যা হলো ‘তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।’
আসলে কেউ কারো জন্য মরে না, মরণ এতটাও
সোজা না। তুমিও ভাবতে তোমার স্বর্ণকোমলকে ছাড়া
বাঁচবে না, শ্বাস
আঁটকে মারা যাবে। কিছুদিন যাক দেখবে তুমি
আমাকে ছাড়াই থাকতে
অভ্যস্ত হয়ে গেছো। ভালো থেকো প্রিয়, আমাকে
ছাড়াই ভালো থাকতে শেখো।’

একথা বলে স্বর্ণ স্থান ত্যাগ করল। তারপর শীতলকে
এত ডেকেও রুমের দরজা খুলাতে পারল না আর না
মেয়েটা সারাদিনে মুখে কিচ্ছুটি দিলো। শাহাদত
চৌধুরীও ব্যর্থ হয়ে মলিন মুখে চলে গেলেন। এখানে
যদি স্বয়ং শারায়ত চৌধুরী হতেন তাহলে মেয়েটাকে
দু'বার ডাকতে হতো না। শুধু শারায়ত চৌধুরী যদি
দরজায় কড়া নেড়ে বলতেন, 'মা, আমার শীতল
আম্মা কই? খাব তো, এসো মা।' ব্যস তাতেই কাজ
হয়ে যেতো আর হবে নাই বা কেন? বাবাকে কাছে
না পেয়ে শারায়ত চৌধুরীর আঙুল ধরেই
হাঁটতে শিখেছে, উনার হাতে খেয়েছে, উনার বুকেই
কত রাত ঘুমিয়েছে। মায়া, টান, জিনিসগুলো অদ্ভুত
রকমের। যখন সবাই ব্যর্থ হলো তখনই শাহাদত
চৌধুরীর কাছে কল এলো। বড় ভাইয়ের নাম্বার দেখে
শাহাদত চৌধুরীর বুক কেঁপে উঠল। তবুও কল
রিসিভ করতেই ভেসে উঠল বড় ভাইয়ের মুখ। তবে
উনি ভাইয়ের মুখের দিকে তাকানোর সাহস পেলেন
না তাই চোরের মতো মুখ কাচুমাচু করতে লাগলেন।
শারায়ত চৌধুরী যেন বুঝলেন ভাইয়ের অবস্থা তাই
বললেন,

-‘আমার শীতল আম্মা কই? দূরে গিয়ে বড় আব্বুকে
ভুলে গেলে চলবে? এই বুড়ো মানুষটার কথা কেউ না
ভাবলে কাদের নিয়ে বাঁচব আমি,হুম? ‘শাহাদত
চৌধুরী ভেজা স্বরে আর জবাব দিতে পারলেন না।
পাশে থাকা সোফায় ধপ করে বসে পড়লেন তাই স্বর্ণ
এসে বাবার হাত থেকে ফোনটা নিলো। নিজে কথা
বলল। তারপর শীতলের রুমের দরজায় কড়া নেড়ে
বলল,-‘বোন, বড় আব্বু কথা বলবে। দরজা খোল।’
একথা বলতে দেরি দরজা খুলে ফোন কেড়ে নিতে
দেরি হয় নি। এরপর

সে ঠোঁট ভেঙে শব্দ করে কেঁদে তোতাপাখির মতো
বলতে থাকল,

-‘বড় আ...আব্বু! বড় আব্বু..আমাকে নিয়ে যাও।’
শীতলকে এভাবে কাঁদতে দেখে শারায়াত চৌধুরী
ক্যামেরা ঘুরিয়ে দিলেন অন্যদিকে। তারপর দ্রুত
চোখ মুছে ক্যামেরা ঠিক করে আদুরে সুরে বলতে
লাগলেন,

-‘আম্মা! আমার আম্মাজান, কাঁদে না মা। খেয়েছো
মা? মুখটা শুকনো লাগছে কেন?’

-‘বড় আব্বু আমাকে নিয়ে যাও। আমি এখানে থাকব না। আমি বাড়ি যাব।’

-‘খুব তাড়াতাড়ি আমি গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসব, মা। তোমাকে ছাড়া আমাদের বাড়ি অচল। কাঁদে না মা। তুমি কাঁদলে আমরা কি ভালো থাকব বলো?’

একথা বলতেই সিন্ধু সিন্ধু ফোন কেড়ে নিলেন। আঁচলে চোখ মুছে জোরে জোরে কাউকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলেন,-‘আমি কালই শুদ্ধকে পাঠাব তোরা দুবোনই চলে আসবি। আর কে বাড়ি ফিরল না ফিরল এত দেখার সময় নাই। চলে আয়, আমি নিজে তোদের বিয়ে দেবো। দেখি কোন আর্মি আর আর্মির বউ বাঁধা দিতে আসে। দেশে কি আর আইন নাই? নাকি আমরা আইন বুঝি না? বাড়ির মেয়ে দুটোকে নিয়ে গিয়ে লায়েক সাজছে তারা, লায়েক! মেয়ে ওদের একারই আমরা যেন বানের জলে ভেসে গেছি? আমাদের কোল ফাঁকা করবি তো আগে কেন নিয়ে মেয়ে দুটোকে দূরে নিয়ে যাস নি? কেন হিসেব করে বাড়ির সন্তানদেরকে ভালোবাসতে বলিস নি? পেলেপুষে বড় করলাম আমরা এখন আমাদের বুক ফাঁকা করে দিয়ে তারা ভালো বাবা-মা সাজছে, ভালো

বাবা-মা।'সারারাত গোপনে কাজ সেরে সকালবেলা ফিরেছে আজম আর সাইন।প্ল্যান সাকসেস হওয়ার আনন্দে একটু আধটু নেশাও করেছে তারা। তবে হাঁটাচলা ভালো করে না খেয়াল করলে সেটা বোঝার উপায় নেই। এখন তাদের প্ল্যান সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমাতে তারপর সন্ধ্যায় উঠে ইয়াসিরের ডেরায় আরেকবার হামলা চালাবে। গতরাতে যে ক্ষতি করেছে এতক্ষণে জায়গা মতো খবর টবর চলে গেছে নিশ্চয়ই। এখন তেহরানে বসে বসে ইয়াসিক মনের দুঃখে একবার কপাল চাপড়াক আরেকবার নাহয় পেছন চাপড়াক।এসব নিয়েই কথা বলতে বলতে অফিসে ঢুকে দেখে স্পেশাল চেয়ারে রাজকীয় ভঙ্গিমায় শুদ্ধ বসে আছে। তার পরনে গতদিনের সাদা শার্ট ও কালো প্যান্ট। শীতলদের রেখে এখানেই এসেছে বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু কেন এসেছে? সে আসতে বলেছে? তার কি কেউ আছে এ পৃথিবীতে? নেই, নেই তো, থাকলে কী আর কেউ বাড়ি থেকে তাড়াতে পারত? তারা জানে না সে বাড়ি ছেড়ে থাকতে পারে না? আদৌ কখনো থেকেছে? মায়ের হাতের খাবার না খেলে ওর পেট ভরে না।

সারা দুনিয়া খেয়ে নিলেও মায়ের হাতের ডাল-ভাত
না খেলে মনে হয় পৃথিবী ক্ষুধার রাজ্য। এক রাত
কেটে গেল তার ভাই-বোনরা কই? কানের কাছে
তারা কিচিরমিচির করছে না কেন? নানান আবদার
নিয়ে ছুটে আসছে নাই বা কেন? শীতলটাও তো
একবার ফোন করল না, বোনের ছায়ায় থেকে ওই
বেয়াদবটাও আরো বেয়াদব হয়ে গেছে। শীতলের
কথা মনে হতেই সায়ন শুদ্ধের মুখের দিকে
তাকানোর আর সাহস পেল না। এক পাষণ, নিষ্ঠুর
মানবীর জন্য শুদ্ধ-শীতলের বিয়ে আঁটকে গেল।
তাদের কথা না বললে হয়তো শুদ্ধ-শীতলের বিয়ের
আঁটকানোর ক্ষমতা কারোই থাকত না। সে আঁটকাতে
দিতো না কিন্তু ভেবেছিল চারবোনের বিয়েটা যদি
একসাথে হয় তাহলে মন্দ কি! তারও ইচ্ছে করে না
গোপনে প্রেম চালিয়ে যেতে সে তো স্বর্ণকে আগে
থেকেই বলতো বিয়ের কথা। বরং স্বর্ণই তাকে
বারবার আঁটকেছে। এটা ওটা বলে বুঝিয়েছে নয়তো
তাদের কথায় সবাই আগে জানত। কিন্তু যার জন্য
জানাল সেই সবার আগে হাত ছেড়ে নিজের পথ
বেছে নিলো। মধ্যস্থান থেকে শুদ্ধর শীতলকে দূরত্বের

দহনে নতুন করে পড়তে হলো। বর্তমানে তার ভাই-বোনের কষ্ট কারণ সে একথা ভাবলেও অপরাধবোধে বুক পাঁজর ভেঙে আসছে। যাদের সম্পর্কের সূচনা নিজে করেছিল সময়ের ব্যবধানে সেই এখন হয়েছে তাদের দূরত্বে থাকার মূল কারণ। এটা কি কষ্ট নয়? মনে মনে একথা ভেবে সে একনজর ভাইকে দেখেই মুখ ঘুরিয়ে নিলো। শুদ্ধ দেখল। বুঝল, ভাইয়ের মনের কথা। কেন জানি তার ঠোঁটের কোণে এক টুকরো হাসিও ফুটে উঠল। তারপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে শুদ্ধ বলল,- ‘বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না তাই এখানে এলাম।’

ততক্ষণে সায়ন হাত-পা ছড়িয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়েছে। মাথাটা টলছে। শরীরটা যেন ভার ছেড়ে দিতে পারলে বাঁচে। তার দেখে দেখে আজমও তার পায়ের কাছে শুয়ে পড়ল। তখন শুদ্ধর কথার জবাবে সায়ন বলল,

-‘সবাই চিন্তা করবে।’

-‘করবে না বলো করছে।’

-‘তাহলে যা।’

-‘ শুধু আমার জন্য চিন্তা করছে আমি কিন্তু একবারও বলি নি।’

শুদ্ধর প্যাঁচ খাটানো কথায় সায়েন ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল
ভাইয়ের দিকে।

ঠোঁটের কোণে মলিন হাসি ফুটিয়ে বলল,-‘আমি যাব
না। ‘

-‘যেতে কখন বললাম? তোমাদের যখন যা ইচ্ছে
করতে পারো আমি কাউকে বারণও করব না,
থামতেও বলব না।’

-‘তাহলে বাড়ি যাচ্ছিস না কেন?’

একথা শুনে শুদ্ধ চেয়ারে মাথা হেলিয়ে ঘূর্ণায়মান
সিলিংয়ের দিকে তাকাল। তারপর বেশ কিছুক্ষণ
থেমে ধীরে ধীরে বলল,

-‘সাহসে কুলাচ্ছে না। ‘

-‘আমি তো জানতাম আমার থেকেও আমার ভাই
সাহসী।’

-‘ হুম তাতো বটেই! তবে আজ এটাও জেনে রাখো
তোমার ভাই একটা অপ্ৰিয় মুখের কাছে ভিত্তু। এক
আদুরে স্নিগ্ধ মুখের খিলখিল করা হাসির কাছে

কুপোকাত। এক চঞ্চলা হরিণীর অভিমানী দৃষ্টির কাছে পরাজিত।

ঘুরে ফিরে শুধু ওই একটা জায়গায় আঁটকে যাই। আর তাকে হারানোর ভয়েই নীরব যন্ত্রণায় প্রতিনিয়ত কুঁকড়ে থাকি।’এইটুকু বলে শুদ্ধ থামল। পরপর শুকনো ঢোক গিলে পুনরায় বলল,

-‘আর রইল বাড়ি ফেরার কথা, আসলে বাড়িতে ফিরতে ইচ্ছে করছে না কারণ বাড়ি গেলে আজ আর কেউ দরজায় দাঁড়িয়ে ইঁদুরের মতো মাথা বের করে উঁকি মেরে বলবে না, ‘তা শুদ্ধ ভাই, রাজ্য জয় করে ফিরলেন বুঝি?’ নতুবা তার বড় আব্বুকে নালিশ করার ভয় দেখাবে না। পরক্ষণেই মিষ্টি করে হেসে নালিশ থেকে বাঁচার জন্য ঘুষ চেয়েও বসবে না। খেতে বসলে হুড়মুড় করে পাশের চেয়ারটা দখল করবে না। টেবিলভর্তি খাবার থাকলেও তার দৃষ্টি আমার প্লেটের দিক থেকে সরে না। তাকে বাড়ি সুদ্ধ সবাই যত যা কিছু তুলে দিক তার নজর শুধুই তার শুদ্ধ ভাইয়ের প্লেটের দিকে। থাকুক সেখানে এক টুকরো আধখাওয়া মাংস তবুও তার সেটাই লাগবে। কিন্তু আজ থেকে কেউ আমার ভাগের খাবারে ভাগ

বসাৰে না। যখন আমাৰ খাবাৰে হামলা কৰতে
সাকসেস হতো তখন মনেৰ আনন্দে সে পা নাচাত।
আচমকা আমাৰ পায়ৈৰ সাথে বানি খেলে মুখ কাঁচুমাচু
কৰে বলত, ‘ ইয়ে শুদ্ধ ভাই টেবিলেৰ নিচে অনেক
মশা। ‘ আমি বাডি না থাকলে কেউ মনেৰ ৰাগ
মিটাতে আমাৰ ৰুমটাও এলোমেলো কৰবে না।

আমাৰ শখৈৰ পাৰফিউম মেখে ঘূৰঘূৰ কৰবে না। টি-
শাৰ্ট নিয়ে পালাবে না। ফোন লুকিয়ে ৰাখবে না।
মাৰেৰ ভয়ে গাছে উঠতে ভয় কৰবে না। স্টাডি
টেবিলে বসে আমাৰ নেটে যাতা একটা ছবি এঁকে
নিচে লিখবে না, ‘চৌধুৰী পুত্ৰ শোয়াইব শুদ্ধ।’ এত
না, না, এৰ মাঝে কী একটু ভালো থাকা যায়? নাকি
স্বস্তি নিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়া যায়?’

এইটুকু বলে শুদ্ধ থেমে গেলে সায়েন একদৃষ্টিতে
শুদ্ধৰ ক্লান্ত মুখেৰ দিকে তাকিয়ে ৰইল। কী বলবে?
কি বলে বুঝা দেবে? আচ্ছা একবাৰ কি উঠে শুদ্ধৰ
পাজোড়া ধৰে মাফ চাইবে? তাৰ ভুল সিধান্তেৰ জনাই
তো এখন

ভাই কষ্ট পাছে। তাতে ছোটো ভাইটাইৰ বুকেৰ ভাঙ্গন
কি কমবে? থামবে ওই বুকেৰ ঝড়? শত চেষ্টা কৰেও

সায়ন একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারল না।
আজকাল কি যখন তখন কথা বলার শক্তিও হারিয়ে
ফেলছে সে? কই আগে তো এমন হতো না। তবে কী
নতুন রোগে ধরেছে তাকে? এদিকে দুভাইয়ের অবস্থা
দেখে নীরবে ঝরঝরিয়া কেঁদে যাচ্ছে বেচারী
আজম। সে মানতে পারছে না এদের অবস্থা।
ভালোবাসা দুটো মানুষকে ভেঙে চুরে শেষ করে
দিচ্ছে। ভালোবাসার এত শক্তি? এত দহন? কোন
বালের টানে মানুষ শুধু শুধু আরেক জনকে
ভালোবাসতে যায়? কি বা আছে ওই বালের
ভালোবাসায়? বেশ কিছুক্ষণ নীরবতার কেটে গেল।
কেউ টু শব্দটুকুও করল না তবে শুদ্ধ হঠাৎ উঠে
দাঁড়িয়ে সায়নকে বলল,

-‘ভাইয়া চলো।’

ভেজা কণ্ঠে সায়ন জবাব দিলো,-‘আমি যাব না ভাই,
তুই ফিরে যা।’

-‘ফ্ল্যাট নিয়েছি তুমি আর আজম আজ থেকে
সেখানেই থাকবে। রাত বিরেতে এখানে থাকাকাটা রিস্কি
হয়ে যাবে। তাছাড়া আম্মুরা যখন তখন এখানে
আসতে পারবে না। ফ্ল্যাটে থাকলে তারাও আসতে

পারবে। সাম্য সৃজন কি তোমাকে না জ্বালিয়ে
বাড়িতেই বসে থাকবে? রাস্তা পার করে এখানে
আসতে আবার এক্সিডেন্ট ঘটাবে। মূল কথা হলো,
তোমার বোন আমার কথা বলার শক্তিটুকুও কেড়ে
নিয়ে গেছে। আমি এই মুহূর্তে দুটো
কথা বলার শক্তিও পাচ্ছি না। আমি আপাতত নতুন
ফ্ল্যাটে যাচ্ছি তুমিও চলে এসো। আর হ্যাঁ, গতকাল
থেকে না খাওয়া ক্ষুধাও লেগেছে, আসার সময় খাবার
নিয়ে এসো, খেয়ে নাহয় না হওয়া বউকে নিয়ে শোক
পালন করব।’

ছটফটে গলায় একথা বলে বিল্ডিংয়ের নাম, ফ্ল্যাট নং,
বলে একটা চাবি ছুঁড়ে দিয়েই শুদ্ধ বেরিয়ে এলো। সে
জানে তার ক্ষুধার কথা শুনলে তার ভাই না এসে
থাকতেই পারবে না। শুদ্ধ দ্রুত পায়ে রাস্তা পার হয়ে
পকেট থেকে ফোন বের করে দেখল শীতলের
কোনো কল বা মেসেজ এসেছে কী না। হ্যাঁ যা
ভেবেছিল তাই, মোট তেরোটা কল, সাতটা মেসেজ
এসে জমে হয়েছে। ফোন সাইলেন্ট করেছিল মনেই
ছিল না হঠাৎ মনে হতেই বেরিয়ে এসেছে। এবং তার
ভাবনা সঠিক দেখে মুখে এবার হাসি ফুটল, বিশেষ

করে ডিসপ্লের উপরে ভাসতে থাকা মেসেজটি দেখে,
'কেউ কি আমাকে একটুও মিস করছে না? কথা
বলছে না কেন তার ব্যাঙাটির সাথে?'

এদিকে শুদ্ধ বেরিয়ে যেতে সায়নও হুড়মুড় করে উঠে
বসল। বাঁ পায়ের কাছে শুয়ে থাকা আজমকে লাথি
মেরে উঠিয়ে বলল,-'এ্যাই শালা শুনলি না আমার
ভাইয়ের ক্ষুধা পেয়েছে? চল, খাবার নিয়ে যেতে হবে।
আর আমি শোকে মরছি কেন? এক শাশুড়ির মেয়ে
রিজেস্ট্র করেছে তাতে কী? কত শাশুড়ির মেয়ে আছে
না? সায়ন কি ফেলনা রে? ফেলন না।'

একথা বলে পার্টির অফিসের দরজায় তালা ঝুলিয়ে
বের হতেই দেখল রাস্তার ওপারে শুদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে।
ফোনে কারো সাথে কথা বলছে।

সে এগিয়ে গিয়ে আচমকা রাস্তার মধ্যেই শুদ্ধকে
জড়িয়ে ধরল। শুদ্ধ ভ্রুঁ কুঁচকে কল কেটে
বলল,-'আমি স্বর্ণ না;শুদ্ধ!'

ভাইয়ের কথা শুনে সায়ন ফিক করে হেসে ফেলল।
তারপর ভাইকে ছেড়ে দিয়ে বলল,
-'তোর বোন নেই তাতে কী তোকে দিয়ে কাজ
চালাব।'

ভাইয়ের কথা শুনে শুদ্ধ এমনভাবে নাক মুখ কুঁচকে
দুপা পিছিয়ে গেল যে সায়ন আর আজম হো হো করে
হেসে উঠল। তারপর তিনজনই গেল নতুন ফ্ল্যাটের
দিকে। যাওয়ার পথে কিনল পছন্দই খাবার। তাদের
হাসি মুখে দেখে চায়ের দোকানের ভেতরে বসে থাকা
সাফওয়ান চৌধুরী শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলেন। আর
মনে মনে দোয়া করলেন পৃথিবী উল্টে যাক ভাইয়ে
ভাইয়ে সম্পর্ক টিকে থাক। সকালের দিকে শারাবাত
চৌধুরীর সাথে কথা বলে শীতলের মন একটু ভালো
হয়েছে। কান্নাকাটি থেমেছে। হঠাৎ তার আরেকজনের
কথা মনে হতেই খোঁজ করে জানতে পারল, তার
রুবাব ভাইয়া সকালে চলে গেছে শতরূপা চৌধুরীর
কাছে। এই বাড়িতে নাকি তার দমটা আঁটকে
আসছে।

বাকিরা কত করে বারণ করল কিন্তু কারো কথা
শোনে নি ছেলেটা, শুধু ভেজা কঠে চোখ মুছতে
মুছতে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বলেছে, 'এতদিন এখানে
পড়ে ছিলাম ছোটো ভাই-বোনদের জন্য তারাই যখন
নেই তাহলে থেকে আর কি হবে? তারা যেদিন
আবার ফিরবে, আবার এই বাড়িতে চাঁদের হাঁট

বসাবে আমিও সেদিন ফিরব।’একথা শুনে শীতল আরেকচোট কেঁদে রুবাবের সাথে কথা বলল। কেঁদে কেঁদে বলল চটুগ্রামে চলে যেতে। রুবাব শুধু মলিন হাসল কেবল, তবে ভুলেও সায়নকে যে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে একথা শীতলকে সে জানাল না। শুধু সে নয় চৌধুরী বাড়ির কেউই জানায় নি। কারণ এতেও পাগল মেয়েটা নিজেকে দোষী ভাববে। বোনকে খুব কাঁদতে দেখে রুবাব বলল তার ছুটি শেষে দিকে যাওয়ার আগে অবশ্যই সে দেখা করে যাবে।

একথা শুনে শীতলকে মানিয়ে আকার ইঙ্গিতে জানাল সায়ান নাকি খুব বেশি কষ্ট পেয়েছে তার সাথে যেন একটু কথা বলে। সায়ন, রুবাব, সাম্য সৃজন, শখ, স্বর্ণ এরা কেউ শীতলের কাছে কম না,সব ক’টা ভাইবোনকে জান দিয়ে ভালোবাসে সে। আরেক ভাই কষ্ট পাচ্ছে শুনে শীতল তখনই ফোন দিলো সায়নকে। বেশ কয়েকবার কলটা বেজে বেজে কেটে গেল।শীতল ভাবল শাহাদত চৌধুরী নাম্বার দেখে সায়ন কল রিসিভ করছে না।

হয়তো রেগে আছে। এখন থাক একটুপরে নাহয় তার ফোন থেকে কথা বলবে। মনে মনে একথা ভেবে সে থমথমে মুখেই শাওয়ার নিয়ে খাবার খেলো। তখনো কেঁদে কেঁটে চোখ, মুখের যা তা অবস্থা। সিমিন চৌধুরী ভ্রুঁজোড়া কুঁচকে এতক্ষণ বসে বসে মেয়ের রং ঢং দেখে গেলেন। কিছু বলতে গেলে শাহাদত চৌধুরী আর স্বর্ণ বার বার আঁটকে দিচ্ছে। নয়তো বেয়াদবটাকে চড়িয়ে ঢং ছুটিয়ে দিতেন। এমন ভাব করছে যেন তাকে বাড়ি থেকে তুলে এনে আঁটকে রাখা হয়েছে। এতই যখন বাড়ির লোকের প্রতি দরদ আসতে গেলি কেন? আসলি তো এতসব ঢং দেখানোর মানে কি? বিয়ের পর এতগুলো দিন ওই বাড়িটাকে আপন বাড়ি, ওই বাড়ির মানুষগুলোকে বুকে জায়গা দিয়ে আগলে এসেছেন, এখন তাদের ছেড়ে আসতে উনার যখন কোনো সমস্যা হচ্ছে না, তাহলে দু'দিনের ছানাপোনা হয়ে তাদের এত বাঁধা কিসের? পৃথিবীতে এসেছিস'ই বা কদিন হলো? সংসারের মায়া বুঝিস? বুঝিস নিষ্ঠুর এ পৃথিবীর পার-প্যাঁচ? বুঝিস না! জানিস না মেয়ের মায়েদের জ্বালা। জানলে আজকের পরিস্থিতি বদলে যেতো। এমন

ধরনের নানান কথায় উনার রাগ চড়ে গেল। এখন এখানে বসে থাকলে কাকে কী বলে বসবেন জানেন না তাই উঠে রুমের দিকে গেলেন। তখন বড় জায়ের বলা সব কথাগুলো শুনেছেন। কিন্তু সব কথা জবাব নেই, পরিস্থিতি মোতাবেক থাকলেও দিতে নেই, কারণ জবাবের আরেক নাম সঠিক সময়। সারা দিন কেটে এখন বিকেল। গোধূলি মুহূর্ত। রুম থেকে বেরিয়ে শীতল বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছে সেনা হাউজের চারপাশ। জায়গাটা ভীষণ সুন্দর। তবুও মন খারাপ থাকায় কিছু ভালো লাগছে না। মন খারাপের কারণ সকালে শুদ্ধর সঙ্গে দেখা করে বিদায় নিতে পারে নি। ফোন করলে শুদ্ধরিসিভ করে নি, না মেসেজের রিপ্লাই করেছে। পাষণ পুরুষটাকে নিয়ে হয়েছে যত জ্বালা। বাড়িতে থাকতেই পাত্তা দিতো না এখন এতদূর চলে এসেছে। শীতল হাঁটতে হাঁটতে একটু এগিয়ে গেল। দেরি করে গোসল করায় চুলগুলোও এখনো ভেজা তাই লম্বা চুলগুলো ছেড়ে রাখা। ছাড়া চুল মৃদুভাবে উড়ছে বিকেলের ম্লিন বাতাসে। পরনে সাদা ও কালো মিশেলের নতুন থ্রি-পিচ। ওড়নাটা যেন অবাধ্য। হঠাৎ

তার নজরে এলো সিঁড়ি বাঁধা পুকুরের দিকে। পুকুরে ফুটে আছে অনেক লাল শাপলা। সে লাল শাপলা কাছ দেখে নি তবে একবার স্ব-পরিবারে পিকনিকে গিয়ে সেখানকার বড় একটা পুকুরে লাল শাপলা দেখেছিল। তুলে গেলে বড় মা বলেছিল, লাল শাপলা তুলতে নেই এই ফুলের গোড়ায় নাকি বিষধর সাপ থাকে। সাপের কথা শুনে সেদিন আর তুলে নি। শীতল কি ভেবে গালে হাত দিয়ে পুকুরের মাঝ সিঁড়িতে বসল। মিনিট না পেরুতেই সেখানে স্বর্ণও উপস্থিত হলো। কেবল শাওয়ার নিতে ঢুকেছে এই সুযোগে বাইরে বেরিয়ে এসেছে শীতল। বোনকে না দেখে খুঁজতে খুঁজতে সেও ছুটে এসেছে। পাশে বসেছে নিঃশব্দে। তার উপস্থিতি টের পেয়ে শীতল একবার তাকিয়ে দৃষ্টি ঘুরিয়ে তাকাল পুকুরের টলটল জলের দিকে। চোখে ভাসছে কত কথা, কত স্মৃতি। আজ ইদের পরদিন, সব ঠিক থাকলে বাড়িতে কত কত মজা হতো। নয়তো চৌধুরীদের তিন গিন্নির এক গিন্নির বাপের বাড়িতে স্ব-পরিবারে দাওয়াত খেতে যেতো।

যখন এসব ভাবনায় মশগুল তখন সেখানে আর্মির
ড্রেস পরা এক যুবক এসে দাঁড়াল। পেছন দাঁড়িয়ে
গলা খাঁকারি দিয়ে উপস্থিতি জানান দিয়ে হাসিমুখে
বলল,-‘ম্যাম, আমি জুবায়ের। স্যার আমাকে দায়িত্ব
দিয়েছেন আপনাদেরকে ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার জন্য,
তা কোথায় যেতে চান বলুন?’

একথা বলে জবাবের আশায় পাশে বসা স্বর্নের দিকে
তাকাল। চোখে মুখে মুগ্ধতা। শাহাদত স্যারের মেয়ে
আছে জানত, তবে পুতুলের মতো দেখতে তা জানা
ছিল না। বলা বাহুল্য, মিসেস শাহাদতও ভীষণ সুন্দরী
তা বলার অপেক্ষা রাখে না। জুবায়ের বয়স ভেদে
বুঝল স্বর্ণ বড় আর শীতল ছোটো। কিন্তু এখানে কে
স্বর্ণ আর কে শীতল বুঝে উঠতে পারল না। কারণ
স্যারের থেকে শুধু নাম দুটো শুনেছে সে। এদিকে
জুবায়েরের

দৃষ্টি খেয়াল করে শীতল তার আপাদমস্তক পরখ করে
ভ্রুঁ কুঁচকাল। মনে মনে মুখ বাঁকাল। তারপর
বলল,-‘আমার বোন বোবা কথা বলতে পারে না যা
বলার আমাকে বলুন।’

বোবা শুনে জুবায়েরের মুখে বিস্ময় খেলে গেল।

আফসোসও হলো এত সুন্দর মেয়েটা কী না বোবা!

তবে হবু কেউ হতে যাচ্ছে ভেবে হাসিমুখেই বলল,

-‘সরি ম্যম আমি আসলে জানতাম না।’

-‘ইটস ওকে।’

-‘তা কোথায় যেতে চান বলুন?’

-‘আশেপাশে সমুদ্র আছে? যেখানে পা ডুবিয়ে বসে থাকা যাবে।’

-‘পতেঙ্গা আছে।’

-‘ভিড় কেমন?’-‘সমুদ্র পাড়ে তো ভিড় থাকে তারউপরে আজ আবার ইদের পরেরদিন।

সাধারণ জনতা সেদিকেই হুমকি খেয়ে পড়বে। তবে আপনারা চাইলে আপনাদের আশপাশে ভিড় কম রাখার চেষ্টাটুকু করতে পারি।’

-‘ওহ। যদি যাই, আপনি কি এই ড্রেসআপে আমাদের নিয়ে বের হবেন?’

-‘জ্বি না ম্যম। অফিশিয়াল কাজ ব্যতীত ইউনিফর্ম পরে আমাদের যেখানে সেখানে যাওয়ার নিয়ম নেই। কাজেই সিভিল ড্রেস আপে বের হতে হবে।’

-‘তাহলে ঠিক আছে নয়তো আমি নিয়ে ঘুরছি ভেবে
অনেকেই তাকাবে, এজন্যই বললাম আর কি!

-‘জি বুঝেছি।’ শীতল একবার বোনের দিকে তাকিয়ে
জানাল একটুপরেই রেডি হয়ে আসছে তারা। দুপুরের
দিকে মা-বাবা গিয়ে চলার মতো টুকটাক শপিং করে
এনেছে, আরো করতে হবে। তারপর জুবারে রেডি
থাকতে বলে চলে গেল। তখন স্বর্ণ বোনের দিকে
তাকিয়ে ভ্রু কুঁচকে বলল,

-‘আমাকে বোবা বললি কেন? আমি কবে বোবা
হলাম?’

স্বর্নের কথা শুনে শীতল উঠে দাঁড়িয়ে হাত ঝাড়ল
তারপর ভাব নিয়ে বলল,

-‘সায়ন ভাইয়ার আদেশ ভুলেও যেন তোমার
আশপাশে কাউকে ঘেঁষতে না দেই। ভাইয়ার আদেশ
অনুযায়ী আজ থেকে তুমি বোবা।’-‘সে বলবে আর
আমাকে মানতে হবে?’

-‘হবে।’

-‘কেন হবে?’

-‘কারণ আমার ভাই তোমাকে ভালোবাসে। পাগলের
মতো ভালোবাসে।’

-‘থাক ভাইকে নিয়ে আর উকালতি করতে হবে না।

এখন বল, ওর সাথে তোর কথা হয়েছে?’

-‘হয়েছে।’

-‘আমার নামে অভিযোগ করেছে?’

-‘না। শুধু বলেছে তোমার আশেপাশে যেন কেউ না ঘেঁষতে পারে। যদি ঘেঁষে তাহলে শুদ্ধ ভাইকে অন্য কারো সাথে বিয়ে দেবে। অর্থাৎ ভাসুরের দেওয়া দায়িত্ব ঠিকঠাক পালন করতেই হবে, নয়তো আমার ‘ওগো’ হাত ছাড়া হয়ে যাবে।’

বোনের কথা শুনে না চাইতেও স্বর্ণ হেসে ফেলল। তারপর দুইবোন গল্পে গল্পে রেডি হতেই শাহাদত চৌধুরী বলল,

-‘যাচ্ছে মা, যাও। জুবারের দায়িত্ববান ছেলে আশা করছি সমস্যা হবে না। আর যা লাগবে জুবারেরকে বলবে, কেমন? আর হ্যাঁ, বলতেই ভুলে গেছি সে কিন্তু নিজেও মেজর। আশা করি তাকে সন্মান করবে, সন্মান দিয়ে কথা বলবে।’জুবারের মেজর শুনে শীতল অবাক হয়ে বোনের দিকে তাকাল। স্বর্ণের মধ্যে কোনো ভাবান্তরই দেখা দিলো না কারণ তখন তার ইউনিফর্মে সে র্যাংক ব্যাজ দেখেছিল। তারপর

জুবায়ের ডেকে পাঠালে তারা দুইবোন পাকিং লটে
গেল। নামি দামীর গাড়িতে হেলান দিয়ে সিভিল
গেটআপে

তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল জুবায়ের। তাদের দেখে
নিজেই হাসিমুখে গাড়ির দরজা খুলে দিলো। বলা
বাহুল্য, আর্মি কাট করা চুলের ছেলেটা যথেষ্ট সুদর্শন।
মিষ্টকে। তবে কথা বলছে, মজা করছে মেপে বুঝে।
বের হওয়ার আগমুহূর্তে শুদ্ধর একটা মেসেজ পেয়েই
শীতলের মনটা ভালো হয়ে গেছে। বেড়াতে যাওয়ার
কথা শুনে শুদ্ধকেও জানিয়েছে। জবাবে তার
ঘাড়ত্যাড়া পুরুষ বলেছে, ‘হিজাব পরে ভদ্র বেশে বের
হবেন। আর যার তার সাথে কিলকিল করা থেকে
বিরত থাকবেন। একটা অভিযোগ যদি কানে আসে,
পিঠের চ্যালাকাঠের বারি একটাও কম পড়বে না বলে
দিলাম।’

আগে শুদ্ধ যখন এই ধরনের কথা বলত খুব রাগ
করত, মনে মনে গালি দিতো। কিন্তু এখন বুঝে
এসবের আড়ালেও ভালোবাসা লুকিয়ে আছে। ভদ্রতার
খাতিরে টুকটাক কথা বলছে জুবায়েরের সাথে।
তাদেরকে এটা ওটা দেখাচ্ছে, চিনাচ্ছে। মজার

ব্যাপার হচ্ছে, স্বর্ণ কথা বলতে পারে তা জুবারের
জানে। এবং এটাও জানে এদের দুইবোনের একজন
চঞ্চল তো আরেকজন খুবই শান্ত। সেই হিসেবে
দু'জনের কথা কথা হচ্ছে। এদিকে
জুবারের এর আদেশ পেয়ে কয়েকজন আর্মি সৈনিক
সিভিলে পতেঙ্গায় উপস্থিত হয়ে জায়গা বেছে নিয়ে
খুব সুন্দর করে সাজিয়েছে। সমুদ্রে পা
পা ভেড়ানো যাবে এবং স্পেশালভাবে স্বাগত
জানানোর ব্যবস্থা করেছে। যেখানে ভিড়ভাটা থাকবে
না, হইহউগোল থাকবে না। এদিকে এটা ওটা দেখতে
দেখতে যেতে যেতেই মাগরিবের আজান হয়ে গেল।
জ্যামে বাঁধা পেল। তারপর ধীরে ধীরে যখন পৌঁছাল
তখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা। রাত হয়ে গেলে সমুদ্র
দেখতে পারবে না ভেবে শীতল মুখটা ভোঁতা করে
বোনের দিকে তাকাল। এইদিকে স্বর্ণ গাড়িতে উঠেই
কড়া দৃষ্টিতে খেয়াল রাখছে জুবারের এর প্রতি।
এরমধ্যে খাপলা কিছু দেখলেই গুঁজে রাখা ছুরি
বসাতে দ্বিধা করবে না। কাছের মানুষগুলো ভালো
সবাই। সবাই খুব বিশ্বস্ত তবুও অন্ধবিশ্বাস কাউকেই
নয়। সে বরাবরই একটু কঠিন ধাঁচের। তিক্ত কাজ,

তিক্ত কথাগুলো আগে করে/ভাবে বলে অপছন্দের
তালিকা দখল করেছে। বাবার পরিচিত এই লোকটা
;তাদের নয়! আর বাবা-মাও যে বিশেষ কারণে
তাদেরকে একসাথে পাঠিয়েছে এটা বুঝতে তার কষ্ট
করতে হয় নি। বরং বুঝে ফেলে তাচ্ছিল্যের হাসি
হেসেছে। গাড়ি থামলে তারা একে একে সবাই নামল।
একটু পথ হেঁটে সামনে এগোতেই দমকা বাতাসে
শরীর জুড়িয়ে দিলো। উড়ছে লাগল পরনের ড্রেস।
আকাশটা আজ গম্ভীর হয়ে আছে। চাঁদ নেই, তারা
নেই, জোৎস্না নেই, কেমন যেন
থমথমে হয়ে আছে আকাশের অবস্থা। লাইটের
ঝলকানিতে দেখা যাচ্ছে
সমুদ্রের কোলঘেঁষে সিমেন্টের ব্লক রাখা। শীতল
ব্লকের উপর বসে পা ভেজাতে ভেজাতে আশপাশে
তাকাল। আকাশের অবস্থা দেখে তেমন লোকজন
নেই বোধহয়। তবে তার কেন জানি ভালো লাগছে
আর এই ভালো লাগাটা দ্বিগুন হতো যখন পাশে তার
বিশুদ্ধ পুরুষটাকে পেতো।
আবার শুদ্ধকে মনে পড়ায় সে মনে মনে
বলল,-‘শুনছো হে সমুদ্র, আজকে আমি একা পা

ভেজালাম খুব তাড়াতাড়ি আমার বিশুদ্ধ পুরুষকেও
নিয়ে আসব। তোমার সঙ্গে তার পরিচয় করে দেবো।
প্রথম খ্যাচখ্যাচ করলেও পরে দেখবে আমার পুরুষটা
খুব উদার মনের। সে একজন পাহাড় লাভার হলেও
সমুদ্রকেও অনীহা করবে না।

বরং তোমাকেও সাদরে গ্রহণ করবে তখন আমরা
দু'জন দু'জনার হাতে হাত রেখে একসাথে সমুদ্রে পা
ভেজাব।’

অতঃপর সেখানে অনেকক্ষণ সময় কাটাল তারা।
ঘুরে দেখল। পতেঙ্গার দোকানগুলো থেকে কেনাকাটা
করে গাড়িতে উঠতেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির
মধ্যেই জুবায়ের গাড়ি টানছে কাছে কারণ শাহাদত
চৌধুরী কলের পর কল দিয়ে যাচ্ছেন। চলেও এসেছে
প্রায় আর কিছুদূর গেলে পৌঁছে যাবে। কিন্তু মেঘের
গর্জন শুনে অন্তর-আত্মা কেঁপে উঠল। এবং এত
জোরে জোরে মেঘ ডাকছে শীতল ভয়ে বোনকে
আঁকড়ে ধরে বসে আছে। চোখ মুখে ভয়ের ছাপ।
অগত্যা বাধ্য হয়ে এবার জুবায়ের বলল,-‘সামনের
একটা রেস্টুরেন্টে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি? রাতও তো

অনেক হয়েছে ডিনারটা সেরে ফেলি। ততক্ষণে বৃষ্টি
কমে যাবে, ইনশাআল্লাহ। ‘

অবস্থা দেখে সম্মতি দিতেই একটা পাঁচ তারকা
রেস্টুরেন্টে তাদের গাড়ি এসে থামল, ভিজ়েপুরে তারা
রেস্টুরেন্টে প্রবেশ। তিনজনে বসল কর্নারে থাকা
একটি টেবিলে। স্বর্ণ ওড়না দিয়ে বোনের মাথা, মুখ,
গা মুছে দিলে

জুবারের নিজেও রুমাল দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে শুধু
দেখে গেল। মনে মনে বেশ করে হাসলও। তারপর
খাবার অর্ডার করলে খাবারও আসল খুব তাড়াতাড়ি।
খেতে খেতে শীতল এদিক ওদিকে তাকাতে গিয়ে
তার

সামনের একটা টেবিলে নজর গেল। সেখানে একটা
ছেলে বসে আছে এবং একাই রাজকীয় ভোজ নিয়ে
বসেছে। তবে একটা খাবারেও স্পর্শ করেছে কী না
সন্দেহ। শীতল তাকে দেখতে দেখতে ছেলেটা হঠাৎ
চোখ তুলে তার দিকে তাকাল তাতেই চার চোখের
চোখাচোখিও হয়ে গেল। এবং তার চোখ দেখে শীতল
আচমকা ভীষম খেলো। কাশতে কাশতেই

দেখেই গেল সামনে বসা ছেলেটাকে। আচ্ছা নীল চোখ দেখল নাকি? কি আশ্চর্য, বাংলাদেশেও নীল চোখের মানুষ আছে? কই কখনো দেখে নি তো তবে অদ্ভুত সুন্দর ছেলেটার চোখজোড়া। উম, ছেলেটা কি বিদেশি নাকি বাঙালি? চেহারা দেখে অবশ্য মনে হচ্ছে বাঙালি আর বিদেশীর মিশেলে তৈরি। পৃথিবী গোল। গোলাকার এই পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষের বসবাস।

ভিন্ন তাদের অভিমত এবং একেক জন একেক গুনে অধিকারী। তাদের মধ্যে বিশেষ এক গুনের অধিকারী আজম। বিশেষ বলার কারণ বিশেষ একটি গুন। আর সেই গুনটি হলো, তার সকল চিন্তা-ভাবনার সূচনা হয় ওয়াশরুমে গেলে। সকল চিন্তার সুফলও মিলে আবার ওই ওয়াশরুমেই।

কেন এমন হয় সে জানে না তবে খেয়াল করেছে নরম গদিতে বসে চিন্তা করে যেসব সমাধান খুঁজে পায় না, অকারণে ওয়াশরুমের কমোডে বসে চিন্তা করলে দ্রুত সমাধান পেয়ে যায়। এজন্য সে ভাবে এটা তার মনের ভেতরে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত একটি গুন। যে গুনের কথা কাউকে বলে নি। বললে নজর

লাগতে পারে এবং গুনের প্রভাব ধীরে ধীরে কমতে পারে।

যেটা সে কখনো চায় না এরচেয়ে গোপন জিনিস গোপনেই থাকুক। তবে শাহরিয়ার ভাইকে কিছু না বললে তার খুব অস্থির অস্থির লাগে। বুকটা কেমন আনচান করে। সে ভেবেছে যেদিন ভাইয়ের মন ভালো থাকবে সে কথাটা ভাইকে বলবে। আবদার করবে দুঃচিন্তা করার জন্য হলেও তাকে যেন একটা স্পেশাল ওয়াশরুম বানিয়ে দেয়। যেখানে টিভি, এসি, বেড

সবকিছুর ব্যবস্থা থাকবে। আর সে যখনই চিন্তায় পড়বে সেখানে শুয়ে বসে ভাববে আর ভাবলেই সকল সমস্যার সমাধান হাতের মুঠোয় পেয়ে যাবে। সমাধান পেয়ে ভাই ভীষণ খুশি হবে, ভাইয়ের খুশিতে সেও খুশি। এসব ভেবে সে মনে মনে হাসল। কিন্তু হাসিটা ঠিকঠাকভাবে ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠার আগেই মাড়িতে ব্যথা পেল। গতকাল থেকে মাড়ির ব্যথায় অবস্থা তার অবস্থা খারাপ। এই লজ্জার কথা আর কাকে বলবে সে? ভাবলে তো নিজেরই হাসই পায়। কারণ এ বয়সে এসে তার নতুন করে দাঁত উঠছে।

এই দাঁতের নাম আবার আক্কেল দাঁত। কোন
বেআক্কল এই দাঁতের না আক্কেল রেখেছে তার
জানতে ইচ্ছে করছে। সে বেআক্কল
লোকটা কি বেঁচে আছে? যদি থাকে তাহলে সেই
লোকের কাছে গিয়েই জিজ্ঞাসা করবে, ‘বে-আক্কল
একটা জিনিসরে কুন বিবেকে আক্কেল নাম দিলেন
কাকা? দিলেন, দিলেন, ভাইব্বা নামডা দিতে
ফারলেন না? আর ফারলেন না তো এই আকামের
দায়িত্ব আফনারে নিতে কইছে কেডায়?’কিন্তু সেই
লোককে কি খুঁজে পাবে? তার ব্যথাটা আগে কমুক
তারপর সেই লোককেই খুঁজতে বের হবে সে। মনে
মনে এসব ভেবে সে আশপাশ তাকিয়ে কোথায় কি
আছে খুঁটিয়ে দেখল। বড় সড় ঝকঝকে-তকতকে
ওয়াশরুম। আসলে মানুষের এত এত টাকা থাকলে
যা হয় নয়তো কে আবার হাগার জায়গায় এত টাকা
খরচ করে? যতই টাকা খরচ করুক ফেলে যায় তো
ওই দুর্গন্ধযুক্ত মাল-মশলা। ভাগ্যিস, শাহরিয়ার
ভাইয়ের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিল নয়তো
এত দামি ওয়াশরুমে হাগার শখ অপূর্ণই থেকে
যেতো। অবশ্য এজন্য ভাইকে একদিন ট্রিট দিলে

মন্দ হয় না। ভাই জিজ্ঞাসা করলে বলবে, ‘হাগার ট্রিট।’ আর এই বিশেষ ট্রিট এর আগে কেউ কাউকে দিয়েছে কী না জানে না, তবে সে দিবে। বাংলা ইতিহাসে এই ট্রিট দিয়েই ইতিহাসের পাতায় নিজের নাম লেখাবে। পরের প্রজন্ম আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইবে, ‘এই অদ্ভুত ট্রিটের আবিষ্কারক কে? তখন অভিভাবকরা গর্ব করে বলবে, ‘আমাদের গর্বিত দেশের গর্বিত এক সন্তান, আজম আলী সৈকত।’ এদিকে ঘড়ির কাঁটা যে টিকটক করে এগিয়েই চলেছে সেদিকে কোনো হুঁশ নেই তার। সে এখনো ভাবনায় মশগুল। অথচ তার অনুপস্থিতিতে কেউ যে নিজের প্ল্যান সাকসেস করতে উঠে পড়ে লেগেছে সেটা হয়তো ক্ষুণাক্ষরেও টের পাচ্ছে না বেচারী। মোদাকথা, সায়ন যদি জানে তাহলে তার কী করবে কে জানে। কারণ সায়ন কিছুক্ষণ আগে এক পাঁচ তারকা রেস্টুরেন্টে খেতে পাঠিয়েছে তাকে। আদেশ অনুযায়ী এসে চেয়ার বসে খাবার অর্ডার করার পর পরই অনুভব করল এখনই ওয়াশরুমে যাওয়া প্রয়োজন। খাবার আসতে দেরি দেখে সে ওয়াশরুমে এসেছিল ব্যক্তিগত কাজ সারতে।

আপাতত ইচ্ছে ছিল না ভাবনার জগতে বিচরণ করতে। কিন্তু অভ্যাসবশত ভাবনার জগতে ডুবে গেল। একের পর এক ভাবনা তার মস্তিষ্কে ঘুরতে লাগল। ব্যক্তিগত কাজ সারতে বসে হঠাৎ তার স্মরণ হলো এ মুহূর্তে ওয়াশরুমে আসা ঠিক হয় নি। এলেও এতক্ষণ বসে সময় কাটানোর মানেই হয় কারণ সায়েন তাকে কড়া আদেশ করেছে ছায়াসঙ্গী হয়ে থাকতে। কিন্তু সেটা না করে সে ওয়াশরুম এসে বসে আছে। একথা স্মরণ করে সে দ্রুত কাজ সারতে গিয়ে দেখল পানি নেই। যাহ্, এবার কি হবে? তাড়াহুড়োর সময় আজাইরা ভুল কাজগুলো হয় কেন কে জানে। সে কার থেকে যেন শুনেছিল বাইরের অনেক দেশেরই ওয়াশরুমে পানি

থাকে না। তখন টিস্যুই একমাত্র ভরসা..! এইটা কোনো কথা? এজন্যই পাঁচ তারকা-ফারকা রেস্টুরেন্ট ভালো লাগে না তার। যত বড় নামি-দামি জায়গা সেখানেই নিত্য নতুন ঝামেলা। এরচেয়ে সাধারণ ল্যান্টিনগুলোই ভালো, বদনা ভরে নিয়ে যাওয়া যায়। কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া অবধি সেই পানি যক্ষের ধনের মতো আগলে চোখের সামনে রাখা যায়। কিন্তু শহরে

তো ল্যান্টিন বললেও মানুষজন হাসে। অথচ এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচার আর কোনো উপায় আছে? শহর যতই এগিয়ে থাকুক কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্রামই ভালো। এখন সে কার কাছে পানি চাইবে? কাকে বলে এ বিপদের

কথা? গ্রাম হলে তো এতক্ষণে চৌঁচিয়ে বলা যেতো, ‘এ্যাই কল পাড়ে কে আছিস এক বদনি পানি দিয়া যা।’ কিন্তু এখানে তো সে উপায়ও নাই। হ্যাঁ টিস্যু আছে কিন্তু এই কাজটা করে নি কখনো। জীবনে ভাবে নি একাজ করা লাগবে! সে আরেকবার চেক করে দেখল পানি এসেছে কী না। না, আসে নি। কতক্ষণ এভাবে বসে থাকবে? এই মুহূর্তে কাকে গালি দিবে বুঝে উঠতে পারল না আজম। তবে তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন বোধহয় হঠাৎ পানি এলো। সে খুশিতে ডগমগ হয়ে কাজ সেরে বের হতে গিয়ে দেখল বাইরে থেকে ওয়াশরুমের দরজা লক করা। এ কাজ কে করল? কার লুকোচুরি খেলার ইচ্ছে জাগল? সে কতক্ষণ দরজার হাতল ধরে টানাটানি করেও কোনো সমাধান আনতে পারল না। বাধ্য হয়ে দরজা খাবা দিয়ে

ডাকল কিন্তু কেউ সাড়া দিলো না, খুললও না। খাবার
অর্ডার দিয়ে ওয়াশরুমে

এসেছে তাও প্রায় আধাঘন্টা হয়ে গেছে। একথা
স্মরন হাতেই তার বুক ধরফড় করতে লাগল। দ্রুত
পকেট থেকে ফোন বের করে একের পর এক কল
করতে থাকল সায়নকে। কিন্তু সায়নের কোনো খোঁজ
নাই। সে

পুনরায় কমোডের ঢাকনায় নামিয়ে চেপে বসল।
তারপর ফোনেটা নিয়ে

দ্রুত গতিতে টাইপ করে সায়নকে ঘটনা জানাল।
কিন্তু সায়ন মেসেজ সিন করছে না। কলও ধরছে না।
কিছুক্ষণ আগেই তো কথা হলো এই সময়টুকুর মধ্যে
কোথাও গেল? গেল, গেল, ফোনটা কোথায় রেখেছে?
এখন কি হবে? এখান থেকে কিভাবে বের হবে?
এাথা ভাবতে ভাবতে তার কালঘাম ছুটে গেল। সে
দরদর করে ঘামতে ঘামতে সেখানেই মাথা ঘুরে পড়ে
গেল। শীতল খেতে খেতে এদিক ওদিকে তাকাতে
তাকাতে তার নজর বিঁধল সামনের একটা টেবিলে।
সেখানে একটা ছেলে বসে আছে এবং একাই
রাজকীয় ভোজ নিয়ে বসেছে। তবে একটা খাবারও

স্পর্শ করেছে কী না সন্দেহ। শীতল তাকে দেখতে
দেখতেই ছেলেটাও হঠাৎ মুখ উঁচিয়ে চোখ তুলে
তাকাল। আচমকা চার চোখের চোখাচোখিও হয়ে
গেল। এবং তার চোখ দেখে শীতল আচমকা ভীষম
খেলো। কাশতে কাশতে আরেকবার
দেখল সামনে বসা সুদর্শন ছেলেটাকে। আচ্ছা, নীল
চোখ দেখল নাকি? কি আশ্চর্য, বাংলাদেশেও নীল
চোখের মানুষ আছে? কই কখনো দেখে নি তো! তবে
অদ্ভুত রকমের সুন্দর ছেলেটার চোখজোড়া। উম,
ছেলেটা কি বিদেশি নাকি বাঙালি? চেহারা দেখে
অবশ্য মনে হচ্ছে বাঙালি আর বিদেশীর মিশেলে
তৈরি। তাকে তাকাতে দেখে ছেলেটা কী মনে করে
যেন শীতলদের টেবিলের কাছে এলো। কাছে এগিয়ে
আসায় শীতলও সিঁওর হলো ছেলেটার চোখজোড়া
সত্যি সত্যি নীল। তবে সন্দেহ থেকে গেলে লেন্স
লাগানো নাকি আসল তা নিয়ে। নিজের ভাবনা ছেড়ে
শীতল এবার ভ্রুঁ কুঁচকে একবার বোনের দিকে
তাকাল তো একবার জুবারের এর দিকে। তারাও
প্রশ্নবোধক চাহনিত্তে তাকিয়ে আছে সামনে দাঁড়ানো
ছেলেটার দিকে। তখন ছেলেটা হ্যান্ডশেক করতে

জুবায়ের এর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাসিহাসি মুখে বলল,-‘হ্যালো, আ’ম ইয়াসির খান!’

তার হাত বাড়ানো দেখে জুবায়ের উঠে দাঁড়িয়ে নিজেও ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে ছোট করে উত্তর করল,
-‘জুবায়ের।’

-‘ক্যান আই জয়েন ইউ গায়েস!’

একথা শুনে জুবায়ের একবার স্বর্নের দিকে তাকাল। স্বর্ণ মাথা নিচু করে খেতে ব্যস্ত। সে মূলত বুঝতে চাচ্ছে, মানুষটা স্বর্ণ কিংবা শীতলের চেনা কি না। তবে স্বর্ণ, শীতলের মুখ দেখে মনে হচ্ছে না তারা চেনে না। আর তার খুঁতখুঁতে মন অচেনা কাউকে সঙ্গে নিতে মন সায় দিচ্ছে না। তবে তার মুখ দেখে ইয়াসির যেন বুঝল মনের ভাবনা। সে মলিন হেসে বলল,

-‘আজ আমার মায়ের জন্মদিন। কাউকে নিয়ে যে জন্মদিন পালন করব সেই আপনজনও আমার নেই। আমি একজন টুরিস্ট। কিছুদিনের জন্য এসেছি মাত্র। তাই বলছিলাম কী যে.....!’

সে কথা শেষ করে শীতলের দিকে তাকিয়ে মলিন হাসল। শীতলের খুব মায়া লাগল। জুবায়ের কিংবা

স্বর্নের আশায় না থেকে সে বলল,-‘সমস্যা নেই
ভাইয়া আসুন আমরা একসাথে ডিনার সারি।’

-‘সত্যি?’

-‘সত্যি।’

শীতলের কথায় ইয়াসির ওয়েটারকে ডেকে তার
অর্ডারকৃত খাবারগুলো শীতলদের টেবিলে দিতে
বলল। এত বারণ করেও শুনল না। স্বর্ণ এখনো
একবারও চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে নি। তখনই
স্বর্ণের ফোনের সাইনের নাম্বার থেকে কল এলো।
এতে স্বর্ণ একটু অবাকই হলো। তবে কল কেটে
যাওয়ার আগে কল রিসিভ করতেই সাইন বলল,

-‘এখনো কি রেস্টুরেন্টেই আছিস?’

-‘হুম। তুমি কি..?’

-‘আজম ওয়াশরুমে আঁটকে গেছে গিয়ে দেখ।’

-‘মানে?’

-‘গিয়ে দেখ, হারামজাদা বেঁচে আছে নাকি পটল
তুলেছে!’

-‘আজম ভাই চটুগ্রামে?’

-‘হুম, তোরা যেই রেস্টুরেন্টে আছিস সেখানকার
ওয়াশরুমে।’

একথা শুনে স্বর্ণ কল কেটে উঠে দাঁড়িয়ে জুবারের কে
বলল,

-‘আমি না ফেরা অবধি এক পাও নড়বেন না। আশা
করি, স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না আমরা এখন
আপনার দায়িত্বে।’ হঠাৎ কঠিনসুরে বলা কঠিন কথায়
জুবারের প্রচণ্ড অবাক হলো। তবে অবাকের ভাবটুকু
বুঝতে না দিয়ে বলল,

-‘আপনি কোথায় যাচ্ছেন?’

-‘ওয়াশরুমে।’

একথা বলে আর দাঁড়াল না দ্রুতপায়ে স্থান ত্যাগ
করল। তার যাওয়ার দিকে একবার তাকিয়ে ইয়াসির
মলিন সুরে বলল,

-‘আমার উপস্থিতি আপুটা বোধহয় পছন্দ করছে না।
আমি নাহয় উঠে...!’

একথা শুনে শীতল হড়বড় করে বলল,

-‘না, না আপনি ভুল বুঝছেন। আসলে আমার আপু
কম কথা বলে তাই আর কি।’

-‘ওহ। তবে আপুটা রাগী হলেও আপুর ছোটো বোন
খুব মিশুকো দেখি।’

-‘ হুম। ভাইয়া একটা কথা বলি?’

-‘চোখ নিয়ে বুঝি?’ শীতল এবার বিষয় নিয়ে তাকাতেই ইয়াসির হো হো করে হেসে উঠল। শীতল আরেকদফা অবাক হলো ইয়াসিরের গেজ দাঁত দেখে। মনে মনে একটু আফসোস হলো তার বিশুদ্ধ পুরুষটা এভাবে হাসে না কেন ভেবে।

তবে এই পুরুষটার হাসি দেখে মনে হচ্ছে খুব ভালো একজন মানুষ সে। যে প্রাণখোলাভাবে হাসতে পারে তার মনে কি নোংরা থাকতে পারে?

একথা ভেবে সে নিজেই হেসে আগ্রহ নিয়ে বলল,
-‘তারমানে আপনার চোখ কি সত্যি সত্যি নীল?’

-‘হুম।’

-‘খুবই সুন্দর। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে পুরোপুরি বাঙালি না তবুও এত ভালো বাংলা বলতে পারছেন কিভাবে?’

-‘আসলে বাংলাদেশে জন্ম হলেও বড় হয়েছি সুইডেনে। বাবা বাঙালি ছিল বিধায় বাংলার প্রতি আগ্রহ জন্মেছিল। তারপর একটু একটু করে শেখা। এখানে মাঝে মাঝে আসি কাজের ক্ষেত্রে, ওহ বলাই তো হলো না আমি পেশায় সাইন্টিস্ট।’-‘বলেন কি? আমার ভাইয়াও তো নামকরা সাইন্টিস্ট!’

-‘তাই নাকি?’

-‘তা আপনার ভাইয়ের নামটা কি জানতে পারি?’

-‘অবশ্যই! ভাইয়ার নাম শোয়াইব শুদ্ধ। ‘

-‘শুদ্ধ? উম, শুদ্ধ, শুদ্ধ, না এই নামে কাউকে চিনি বলে তো মনে করতে পারছি না। তবে কর্ম যখন এক চিনে নিতে আর কতক্ষণ?’

-‘হুম।’তাদের এসব আলাপ জুবায়ের এর কেন জানি পছন্দ হচ্ছে না। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরখ করছে সামনে বসা সুদর্শন পুরুষটাকে। তখন কিছু মনে না হলেও এখন কেন জানি খটকা লাগছে। তাকে ঘনঘন তাকাতে দেখেও ইয়াসির পাত্তা দিলো না নিজে হাতে শীতলের প্লেটে এটা ওটা তুলে দিতে দিতে গল্পে ডুবে রইল। এদিকে স্বর্ণ আসছে না দেখে কিছু বলতে গেলে ফোনে রিংটোন বেজে উঠল। জরুরি কল দেখে উঠে দাঁড়িয়ে একটু দূরে গেল কথা বলতে। তবে তার দৃষ্টি রইল শীতল আর ইয়াসিরের দিকেই। তাকে যেতে দেখে ইয়াসির এবার মুগ্ধ নয়নে তাকাল আপনমনে মাথা নিচু খেতে থাকা শীতলের দিকে। ছবিতে যেমন দেখেছিল তার থেকেও সুন্দরী এই

মেয়ে। এমন একটা জলজ্যান্ত পুতুল নিজের কাছে থাকলে মন্দ হয় না। তবে পুতুলটাকে নিতে যে কাঠখড় পোড়াতে তার তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবুও কষ্ট করে যদি এমন একটা প্রাপ্তি পাওয়া যায় তাহলে সেই কষ্ট করতে প্রস্তুত। এখন কথা হচ্ছে, আজই তুলবে নাকি পুতুলটাকে? একথা ভাবতে ভাবতে ঘাড় ঘুরিয়ে সে তাকাল অদূরের টেবিলে থাকা তার লোকদের দিকে। সামান্য একটা ইশারায় মুহূর্তেই বিদ্যুৎ চলে গেল। ঘুটঘুটে অন্ধকারে ছেড়ে গেল চারিপাশ। যারা খেতে এসেছিল তারা বিরক্তসূচক শব্দ করে নানান কথাবার্তা বলতে লাগল। এদিকে তখনো আকাশ ফাটিয়ে মেঘ গর্জন করছে। বৃষ্টির তীব্রতা যেন দ্বিগুন বেড়েছে। অন্ধকারে ভীতু শীতল হাতের চামচ রেখে ইয়াসিরের উদ্দেশ্যে বলল বলল,-‘ভাইয়া আছেন? ফোন থাকলে লাইন অন করেন প্লিজ। এত অন্ধকার আমার একদমই ভালো লাগে না।’

-‘কেন নয় সোনা?’

-‘ক কি..!’

একথা বলতে না বলতেই শীতল তার কাঁধের কাছর
নরম কিছু স্পর্শ পেলো। এরপরই সূচ ফুটানোর
মতো কিছু অনুভব হতেই সে নড়েচড়ে উঠতেই
ইয়াসির শক্ত করে তার মুখ চেপে ধরল। শীতল
গোঙানোরও সময় পেল না তার আগেই নাকে রুমাল
চেপে ধরতেই সে সেন্স হারালো। ততক্ষণে ইয়াসিরের
লোকরা বিদ্যুৎ যাওয়ার সাথে সাথে জুবারেকেও
সেন্সলেন্স করে ফেলেছে। খেতে আসা অন্যান্য
লোকরা যারা ফোনের

লাইট অন করতে গেছে তাদের ফোন কেড়ে নেওয়া
হয়েছে। খানিকক্ষণ পরেই বিদ্যুৎ এলে ততক্ষণে
কালো পোশাকধারী লোকজনে ভরে গেছে রেস্টুরেন্ট।
এরা কারা? কেন এসেছে? এই নিয়ে সবার মাঝে
আতঙ্কের

সৃষ্টি হয়েছে। তবে লোকগুলো কাউকেই কিছু বলল
না হঠাৎ এসে হঠাৎ করে চলেও গেল। তবে কেউ
খেয়াল করল না এতগুলো লোকের মাঝে একটি
মেয়েকে সেন্সলেন্স করে তুলে নিয়েছে। সেই মেয়েটা
আর কেউ নয় চৌধুরী নিবাসের সবচেয়ে চঞ্চল প্রাণ।
চৌধুরীদের চোখের মণি। আর শোয়াইব শুদ্ধর_____

প্রাণভোমরা ইয়াসির শীতলকে কোলে নিয়ে গাড়িতে
উঠে বসতেই সেখানে পরপর দুটো আর্মির গাড়ির
এসে থামল। ধপধপ করে শব্দ তুলে একে একে
নেমে দ্রুত ছুটল রেস্টুরেন্টের ভেতরে। আর্মির গাড়ি
দেখে পোশাকধারী

লোকগুলো ততক্ষণে ভাগ ভাগ হয়ে আড়ালে চলে
গেছে। ওরা আর্মিদের উপর খেয়াল রেখে ইয়াসিরকে
বলল গাড়ির টান দিতে। কারণ জুবায়ের খেতে বসেই
ইয়াসিরকে সন্দেহ করেছিল। এবং নিঁখুতভাবেই সে
কাউকে ইনফর্ম করাই আর্মিরা এখন এখানে এসে
হাজির। বেচারা জুবায়ের সব চেষ্টা করলেন শেষ
রক্ষা করতে পারল না শীতলকে। ইয়াসির ওর গাড়ির
ড্রাইভারকে গাড়ি টান দিতে বলে শীতলকে নিয়ে
পেছনের সিটে আরাম করে বসল। ইশ! মেয়েটা এত
সফট কেন? কোলে তুলে মনে হচ্ছে মাখন। উঁরর
উপর থাকা অবচেতন শীতলের আপাদমস্তক পরখ
করে ইয়াসির হাসল। পুরাই পুতুল একটা। দেখে মনে
হচ্ছে সে সদ্য যৌবনে পা রেখেছে, অর্থাৎ মেয়েটাকে
বন্দিনী করে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতে পারবে।
যদিও ওর ভাইগুলো একটু ঝামেলা করতে পারে

ওসব সামলে নেওয়া যাবে। একথা ভাবতে ভাবতে ইয়াসিক শীতলকে বুকের সাথে চেপে ধরে নাক ডুবাবো গলায়। জোরে শ্বাস টেনে পরপর একইভাবে শ্বাস টানতে লাগল।

কি যেন মিষ্টি একটা সুগন্ধ মেয়েটার গায়ে। সে এবার শীতলের ঠোঁটটা আঙুল দিয়ে স্লাইড করে বলল,

-‘আরো কিছু দিন মায়ের কোলে থাকার সময় দিতাম তোমাকে সোনা। আমি ভেবেছিলাম, আমার মতো জানোয়ারের কাছে আরো কদিন পর এসো। কারণ মানুষ যেমন ফুল ভালোবাসে আমি তেমনভাবে নারীরদেহ পছন্দ করি। কোনো মেয়ের শরীর পেলে আমার মাথা টাথা ঠিক থাকে না। এজন্য ভেবেছিলাম সদ্য যৌবন না পরিপূর্ণ যৌবনবতী হলে আমার কাছে আনতে। কেন জানো? কারণ এখন তুমি এবং তোমার সুন্দর এই শরীরটা বড্ড নাজুক। বড্ড তুলতুলে। ধরতেও ভয় লাগছে না জানি কত ব্যথা ট্যাথা পাও। ভয় নেই আমি তোমাকে খুব যত্ন করব। খুব খুব আদরে রাখব। সেক্স ফিরে একদম জেদাজেদি করবে না, ওকে? ভদ্র মেয়ে হয়ে থাকবে। এভাবে তুলেছি বলে খবরদার কান্নাকাটি করার

চিন্তাও করবে না। কেন করবে বলো তো? আমি কিন্তু
ইচ্ছে করে এসব করেছি নাকি? মোটেও না। বরং
তোমার ভাইরাই আমাকে এসব করতে বাধ্য করেছে।
জানো গতদিন আমার কোটি কোটি টাকার মাল
পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। সায়ন যা করেছে
করেছে। কিন্তু শুদ্ধ যা শুরু করেছে এরপর তোমাকে
ছাড়ি কিভাবে বলো, পাখি? শুধু শুদ্ধকে জব্দ করতে
আমি আমার অগ্নিকন্যাকে চিনেও চিনলাম না। হাতের
কাছে পেয়েও ছুঁলাম না। ভাবতে পারছো তোমার
প্রতি কতটা আসক্তি আমি? এইটুকু বলে থামল।
তারপর শীতলের শুকনো ঠোঁটে চুমু ঝঁকে বলল,
-‘এ্যাঁই পাখি চোখ খুলো? কবুল বলতে হবে তো
নাকি; নাকি বিয়ে টিয়ে ছাড়াই আমার মহলের রানী
হবে?’ এদিকে কিছুক্ষণের মধ্যে শীতলের কিডন্যাপের
কথা শুদ্ধর কানে পৌঁছে গেল। ল্যাব থেকে ফিরে
ফ্রেশ হয়ে এসে কেবল খেতে বসেছে সে। প্রচণ্ড
ক্ষুধা লাগলেও খাওয়া হলো না তার। গলা দিয়ে
কিছুই নামবে না। তাকে এভাবে উঠতে দেখে সিঁতারা
বার বার জিজ্ঞাসা করলেও কিছু বলল না।

বেসিনে দ্রুত হাত ধুয়ে উঠতেই জরুরি কলটা এলো তার ফোনে। বাড়ির কাউকে আপাতত কিছু না বলে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল দো'তলার দিকে।

ফোনের ওপর পাশের ব্যক্তি কিছু বলছে আর শুদ্ধ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে চুপ করে শুনছে। কিছুক্ষণ পর কল কাটতেই শাহাদত চৌধুরীর কল ঢুকল তার ফোনে। এ মুহূর্তে কল ধরার ইচ্ছে না থাকলেও কলটা রিসিভ করতেই শাহাদত চৌধুরী ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললেন,

-‘শুদ্ধ? আব্বা শীতলকে..!’

-‘(....)’ শুদ্ধ কথা বলছে না তবে হাত মুঠো করে থমথমে মুখে তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে। শুদ্ধকে কথা বলতে না দেখে শাহাদত চৌধুরী পুনরায় বললেন,

-‘কি করব এখন? গাড়ির নং কিংবা ফোন নং কিছুই তো জানি না। আমি চট্টগ্রাম থেকে বের হওয়ার সব পথ বন্ধ করে দিয়েছি।’

-‘(.....)’

-‘আমার মাথা কাজ করছে বাবা। কি করব বুঝতেছি না।’

-‘এখান থেকে কেক অর্ডার করে দিচ্ছি মেয়ে
কিডন্যাপ হওয়ার খুশিতে
সেলিব্রেট করেন। এছাড়া আপাতত কিছু করার আছে
বলে মনে হচ্ছে না।’

এই পরিস্থিতিতে এমন ধরনের কথা শুনে হতভম্ব
হয়ে গেলেন শাহাদত চৌধুরী। কপালের ঘামটুকু মুছে
তিনি নিজেকে ধাতস্থ করে বললেন,-‘এখন কি রাগ
দেখানোর সময় বাবা?’

-‘সময় না? ওহ, তাহলে আপনিই বরং ঠিক করে
দেন কখন রাগ দেখাব।’

-‘বাবা রে, আমার মেয়েটাকে পাচ্ছি না।’

-‘কেন পাচ্ছেন না? রক্ষা করতে পারবেনই না যখন
তখন নিয়ে গেলেন কেন? আমি বলেছিলাম নিয়ে
যেতে?’

শুদ্ধর শান্ত কণ্ঠে ধারালো কথা শুনে শাহাদত চৌধুরী
কথার খেঁ হারিয়ে ফেললেন। বুঝলেন এই ছেলেকে
আপাতত থামানো যাবে না। ছেলেটা প্রচণ্ড রেগে
আছে তাকে ঘাটালে আরো বেঁকে বসতে পারে।
তাকে শান্ত করতে হবে শীতলের কথা দিয়ে। তাই
তিনি কিছু একটা ভেবে বললেন,

-‘ভুল করেছি। এবার কিছু একটা কর বাবা? আমি কথা দিচ্ছি শীতলকে পেলে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আগে তোদের বিয়ে সম্পূর্ণ করব।’

একথা শুনে শুদ্ধর সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তবে বেশ কিছুক্ষণ পর গম্ভীর একটা কণ্ঠ ভেসে এলো,-‘তাই যেন হয়!’

এরপরই কল কেটে যেই অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতে বের হয়ে সায়নের পার্টি অফিসে গেল। গিয়ে দেখে সায়ন ফোন কানে ধরে গালাগাল করছে কাউকে। গালির ধরণ আর কথা শুনে বুঝল আজমকে। তাকে দেখেও সায়ন থামল না সমানে বলে গেল,

-‘ওই মা’দা’র’চো:দ তোরে আমি রেস্টুরেন্টের ওয়েলকাম ড্রিংকস গেলার জন্য পাঠিয়েছিলাম? তোরে বলছিলাম না, সতর্ক থাকতে? বলছিলাম, যে আমাদের পদে পদে বিপদ ভুলেও কাউকে বিশ্বাস না করতে।এতবার বলার পরও তুই একই ভুল কেন করলি? শহরের চাকচিক্য দেখে মাথা ঠিক ছিল না? তোরে পাঠিয়েছিলাম ওসব শাউয়া দেখতে? ওই খানকির পোলা ওই! এখন তোর কোন বাপে আমার বোনকে এনে দিবে? আমার বোনের যদি কিছু হয়

তাহলে তোর পেছন দিয়ে ওয়েলকাম ডিংকস না
টুকিয়েছি তো আমার নামও সায়ন না। আমিও দেখব
কত টা লোড কত পারিস হা'রা'মজা'দা।'

একথা বলে সায়ন কল কেটে ভাইয়ের কাঁধে হাত
রেখে শান্ত সুরে বলল,-'ভাইয়া আছি না? একটু সময়
দে দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।'

-‘তা তো হতেই হবে। তবে এবার ওই বাস্টার্ডটাকে
উচিত শিক্ষা দিয়েই ছাড়ব। যদি না পারি আমার
নামে কুকুর পুষো।’

একথা বলে শুদ্ধ সায়নকে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়ল।
তবে কোথায় গেল সায়ন জানে না। ভাই যে প্রচণ্ড
ক্ষেপেছে বুঝতে বাকি নেই তার। মায়াও লাগল
ইয়াসিরের জন্য। ও বেচারি জানে তো ঠিক কার
কলিজায় থাকা বসিয়েছে? জানে না বোধহয়। জানলে
কি এমন দুঃসাহস দেখাতো? সে কিছু একটা ভাবল
তারপর শুদ্ধকে বলল,

-‘আচ্ছা ভাই ইয়াসিরকে পেলে কি করবি? আমি কিন্তু
আগেই শালাকে ধরে পটাপট চুমু খাব। শালার
কলিজা আছে নয়তো দ্বিতীয়বার একাজ করে,

বল?’-‘যা করার কোনো শুধু ওর আহত ডেডবডি
আমাকে দিও।’

-‘কি করবি?’

-‘ওকে পেলে কয়েকটা ইঁদুরের আয়ু বেড়ে যাবে।’

-‘ওকে ডান।’

একথা বলে সায়ন কল দিলো রুবাবকে। কয়েকবার
কল বেজে বেজেই কেটে গেল। রুবাবের থেকে কিছু
তথ্য পেয়ে সায়ন আজকেই আজমকে পাঠিয়েছিল
শীতল স্বর্নের খেয়াল রাখতে। ক্যাম্পে তারা সুরক্ষিত
হলেও বাইরে একদমই না। আজমের কাজ ছিল
যেভাবেই হোক তাদের সেফটি দেওয়া। এবং স্বর্ণ
শীতলের বাইরে যাওয়ার কথাটা মেসেজে জুবায়েরই
রুবাবকে জানিয়েছিল। জুবায়ের হচ্ছে রুবাবের
ক্লাসমেট। অনাকাঙ্ক্ষিত

ভাবে রুবাবের সাথে চট্টগ্রামের শপিং শপে দেখা হয়
জুবায়ের এর। এবং

জানতে পারে অনেক ঘটনা। এরপর জুবায়ের, রুবাব,
সায়ন, শুদ্ধ মিলে প্ল্যান করে। কিন্তু সে প্ল্যানে জল
ঢেলে তার আগে শীতলকে নিয়ে উধাও ইয়াসির।

শীতল নিঁখোজ হওয়ার পর থেকে সিমিন পাথর হয়ে
বসে আছে। কাকে

দোষ দিবেন, নিজেকে নাকি নিজের ভাগ্যকে? মেয়েটা
কিডন্যাপ শুনে সিঁতারা ফোন করে যাচ্ছে তাই কথা
শুনাল, বাদ যায় নি মেজো জাও।

তার পাশে বসে শাহাদত চৌধুরী শুদ্ধর সাথে কথা
বলেছেন। উনি শুদ্ধর সব কথায় শুনেছেন। সুক্ষ
একটা তাচ্ছিল্য ছিল শুদ্ধ কথার মাঝে। সত্যি তো
রক্ষা করতে পারবে না তো নিয়ে গেল কেন? কিন্তু
ছেলেটাকে উনি বোঝাবে কীভাবে এখানে আসার
কারণ মোটেও একটা নয়। বরং এমন কিছু কারণ
আছে যেগুলো উনি বুকের ভেতরে চাপা রেখেছেন।
সেসব বুকচাপা ঘটনা উনার বুকটাকে ক্ষত বিক্ষত
করে প্রতিনিয়ত। মনে মনে একথা ভাবতে ভাবতে
উনার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে গেল। মাথার মধ্যে
ঘুরপাক খেতে লাগল কয়েকমাস আগের ঘটনা..
দিনটা ছিল শারায়াত চৌধুরীর মায়ের প্রয়াত
বার্ষিকী..-‘ওই দ্যাখ, সাদা পাঞ্জাবি পিন্ডা আছে ওইডা
সিঁতারার ছুডু পোলা। নাম শুয়াইব শুদ্ধু। নামকরা
বিজ্ঞানী। পিপারে আবার ছবি টবিও বাইর হয়।

মস্ত মস্ত জিনিস তৈয়ার করে। পোলাডা দেখতে
কেমন রাজা রাজা ভাব তাই না? হেরা কিন্তু দু'ভাই।
বড়ডার নাম সায়ন। হে আবার রাজনীতির নেতা।
পড়ালেহাতেও ভালো আছিল। আমাগো রিতার জুড়ি
এই সায়ন। রিতা তো কেলাসে ফেইল করত পরে
গফুর ব্যাডার লগে পালাইয়া গেল।

এহন মিসে ভাত রাইক্কা খায়। হেই ছেঁড়ি বহুত সুন্দর
আছিল তয় নিজের পায়ে কুড়াল নিজেই মারছে।
কপালপুরী শুদ্ধ সায়নের মুতুন পোলারে চোখে
দেখতে পায় নি? না, সে গেল ল্যাংটা বাবার লগে।
উর বররে দিখা মুনে হয় কাছে ডাইক্কা দুখানা থাপ্পড়
দিয়া ভিটামিনের ওষুধ কিনন্না দেই।

তয় যিডাই কইস আমাগো সিঁতারার দুইডা পোলা
দেখতে যেরাম সুন্দর তেমনি তাগো বিবোহারও।
এরাম যদি একখান নাতজামাই পাইতাম..!”বাড়িভর্তি
অনেক মেহমান বিধায় সাবধানে কথাগুলো বললেন
ষাটোর্ধ বয়সী জয়নব বেগম। উনার বয়সী আরো
কয়েকজন সঙ্গে আছেন। উনি

আশেপাশে তাকিয়ে হাতে থাকা তুতপিক দিয়ে মাড়ির
দাঁতগুলো খুঁচিয়ে নিলেন। দাঁতের ফাঁকে সুপারি ঢুকে

গেলে খুব ব্যথা করে তাই যখনই পান খান হাতে
একটা তুতপিক রাখেন। উনি দাঁত খুঁচিয়ে শাহাদত
আঙুলের

ডগায় থাকা চুন জিহবায় নিয়ে পুনরায় বললেন,
-‘কদিন আগে আমার বড় নাতনি রুকাইয়ার লিগা
সমন্ব পাঠাইছিলাম। যেকোনো একজনের লগে বিয়ে
দেওনের লিগা। ছাওয়াল দুইডার কেউ রাজি হয়
নাই। কত ট্যাকা যৌতুক নিবো, যত যাই নিক দিমু,
মুই এডিও কইছিলাম। সিঁতারাকেও কত কইরা
বুঝাইছিলাম। পরে শুনি পোলারা

নাকি এহন বিয়াই করব না। তাগো নাকি বিয়ার
বয়স হয় নাই। মানে কি কমু? আইজ-কাইলকার
পোলাগোর কথা শুইন্না হাসিও আহে আবার দুঃখুও
লাগে। অথচ এদের বয়সে আজমেরীর বাপ চার
ছাওয়ালের বাপ

হইয়া গেছিস।’জয়নব বেগমের কথা শুনে
মহিলামহলের হাসির রোল পড়ল। তবে এটা শোকের
বাড়ি দেখে সকলে কোনোমতে হাসি সামলে নিলেন।
ফিসফিস করে অন্যদেরও সাবধান করে দিলেন। তখন
কারিমুননেছা নামে আরেক

মহিলা আঙুলের ইশারা করে কাউকে দেখিয়ে
বললেন,

-‘ওইটা কেডা? শাহাদতের ছুডু মাইয়া না?
মাইয়াডারে ছুডু দেকছিলাম এহন দেখি মেলা বড়
হইয়া গেছে। তা বিয়া সাদি দিবে না? মাইয়া ডাঙ্গর
হইলে আর ঘরে রাখতে নাই।’

একথা শুনে রাবেয়া বানু শাড়ির আঁচল থেকে তৈরি
করা পান মুখেগুঁজে বসলেন,

-‘আমি কুন্তু অনেকক্ষণ থিকা দেকতাছি মিয়াঁডা
সিতারার ছুডু পোলার পিছন পিছন ঘুরতাছে।
পোলাডা চোখ রাঙানি দিলেও সরতেছে না। কী
বেশরম মিয়া।’উনার কথায় এবার বৃদ্ধাদের দৃষ্টি গিয়ে
পড়ল অদূরে দাঁড়ানো শুদ্ধ আর শীতলের দিকে।
তারা কিছু একটা নিয়ে ঝগড়া করছিল তখনও।
তাদের দেখে জয়নব বেগম মুখ বাঁকিয়ে বললেন,

-‘যুগ যা খারাপ খোঁজ নিয়া দেখো তাগো মধ্যেও
ইটিশ-পিটিশ চলতাছে। শাহাদতের বউডারও কি
কোনো আক্কেল জ্ঞান নাই? এই বড় মিঁয়াডারে
চাচাতো ভাইয়ের লগে এত মাখামাখি করতে দেয়
ক্যান? আমরা মানুষ হই নাই? আমরা আমাগো

চাচাতো ভাই, মামাতো, ফুপাতো ভাই দেকলে মুখ
লুকাইয়া পালাইতাম। এহনও তাই করি। আর
এখনকার ছালপালে পারে না কোলে মদ্যে ডুইক্কা
যাইতে, ছিঃ! ছিঃ ছিঃ!

উনি একথা বলে পাশ ফিরতেই দেখে সিমিন দাঁড়িয়ে
আছে। তার হাতে শরবতের ট্রে। উনাকে দেখে
জয়নব বেগম একটু ঘাবড়ে গেলেও প্রকাশ করলেন
না। সিমিন উনার কথা শুনে এমন প্রতিক্রিয়া দিলো
যেন কিছুই শোনে নি। বাড়িভর্তি মেহমান। এখন
কথা বাড়লে ব্যাপারটা অন্যরকম হবে। তাই উনি
বিনয়ীভাবে সবার হাতে শরবতের গ্লাস হাতে তুলে
দিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই রাবেয়া বানু হঠাৎ
উনাকে আঁটকে দিলেন।

তারপর ফিসফিস করে বললেন,-‘শাহাদত কি আছে
নাই বউ?’

-‘এসেছে খালাম্মা।’

-‘তা স্বামী রাইখা এইহানে থাকো ক্যান বাপু?
আমগো শাহাদত কি মেলা বুইড়া হইয়া গ্যাছে? তার
কি কিছু লাগে না? তুমরা বউ মানুষ স্বামীর সব

ভালো-মুন্দ খেয়াল রাখবা না? হেই যতই আর্মি হোক,
ব্যাডা মানুষ তো।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বাইরে পইড়া থাকে
যদি ভুল পথে পাও বাড়াই তহন কি করবা? সতীনের
ঘর করার ইচ্ছা হইছে নি?’

উনার কথা শুনে সিমিনের ইচ্ছে করল মুখের উপর
কিছু একটা বলতে। কিন্তু শশুরবাড়ির লোক এবং বড়
জায়ের বাবার বাড়ির মানুষ দেখে চুপ করে রইলেন।
কিন্তু উনার চুপ থাকা বৃদ্ধাদের বোধহয় সহ্য হলো
না। তাই নরম ভেবে আরেকটু চটকাতে
বললেন,-‘আর হইছো তো দুই মাইয়ার মা। তা আর
পোলাপান কী নিবা না?’

-‘না, আল্লাহ আমার মেয়ে দুইডার আয়ু বাড়িয়ে দিক
তারা ভালো থাক।’

-‘শুনো বউ, স্বামীরে হাতে রাখতে চাইলে স্বামীর লগে
যাও গা। মাইয়াও বড় হইছে। গায়ে গতরে ডাঙ্গর
হইছে। পারলে বিয়া দিয়া দাও। শুধু মনে রাইখো,
তুমার জায়ের দুইডা জুয়ান পোলা আছে। জুয়ান
পোলাপান আগুন আর ঘিয়ে লাহান, এদের একলগে
রাখা ঠিক না। কখন কি হয় বলা যায় না। যুগ

খারাপ। এহন আবার ঢং কইরা বইলো না ভাই-বোন
হেরা। শুনো মায়ের প্যাটের নাহলে ভাই-বোন হয়
না।’

একথা বলে উনি থামতেই কারিমুননেছা এবার
আরেকটা কথার তীর ছুঁড়লেন,-‘শুনো আগে থিকা
সাবধান হও বউ। আর যদি মুনে মুনে ভাইবা থাকো
সিঁতারার পোলাগোরে জামাই বানাবা তাহলে আর
কি। তয় তুমার বড় মাইয়া একটু আকটু ভদ্রোর
হইলেও ছুডু মাইয়াডা পুরাই উড়নচণ্ডী। এই মাইয়ার
থিকা সিঁতারা হের পোলাগোর লিগা আরো ভালো
বউমা পাইব।

বাইতে ভালো পোলা আছে দিইখা তুমার কি হেগোরে
জামাই বানানোর পায়তারা করছো নি বউ? না করলে
তুমার ছুডু মাইয়ারে সামলাও। ওই

ছেঁড়ি দেখি সিঁতারার পোলার পেছন ছাড়ে না।
এইরকম বেশরম মাইয়া

আছে দেহি নাই বাপু।’সিমিন হতভম্ব হয়ে শুধু
তাকিয়ে রইলেন বৃদ্ধাদের দিকে। তবে কেন জানি
গলা দিয়ে টু শব্দ করতে পারলেন না তিনি। মাথা
নিচু করে চলে যেতে যেতে আরেকটা কথা উনার

কানে গেল। জয়নব আর কারিমুননেছা এত কথা
বলল দেখে রাবেয়া বানু ফোঁড়ন কেঁটে বললেন,
-‘ হেরা যা মুন যায় করুক আমরা কথা না বাড়াই।
ওই বউডারে সাবধান করার কথা আছিল, তুমরা
করলা। এহন শুনলে ভালো না শুনলে রেডি থাকুক
আরেক কেছা ঘটানোর। মাগি পাইড়া রাখছে এখন
জায়ের দুই পোলার পেছনে লেলিয়ে দিক। পর
মায়েও সকালে গোসল দিয়া বাইর হইয়া রান্নাঘরে
যাইব। আবার তার ছেঁড়িরাও ফরজ গোসল দিয়া
একই রান্নাঘরে ঢুকব। মা ও ছেঁড়িরা মিলা ভেজা
চুলে সংসারের কাজ সারব। ছিঃ! ছিঃ! মিইল্লা নিও
এই কাহিনিই ঘটবে নে।’একথা শুনে সিমিনের পা
চলছিল না। খুব ইচ্ছে করছিল হাউমাউ করে
কাঁদতে। মেয়ের মায়েদের এত দোষ কেন? এত কথা
শুনতে হয় কেন?

পরপর দুই মেয়ে হওয়ার কারণে অনেক কথায়
শুনতে হয়। এজন্য উনি

কখনো মেয়ে দুটোকে প্রশয় দেন না। স্বর্ণ বুঝদার
তাকে কিছু বলতে হয় না কিন্তু শীতলটা কোনো কথা
শোনে না। মেয়েটা বুঝতে চায় না আগের মতো

ছোটো নেই। আগের মতো ভাইয়া ভাইয়া করে সায়ন
শুদ্ধর কাছে যাওয়া মানায় না। সে এখন গায়ে গতরে
বড় হয়েছে। সময় এসেছে কিছু সম্পর্কে দূরত্ব
টানার। কয়েকমাস আগে চৌধুরী নিবাসে উনার
শাশুড়ির মৃত্যুবার্ষিকীর দিনের এই ঘটনাখানায়
সিমিনের মনের গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। বৃদ্ধাদের
কটু কথা শুনে ভেতরটা জখম হয়েছিল তীব্রভাবে।
সেদিন থেকেই উনি নিজের কাছে শপথ করেছিলেন
যাই হোক, বৃদ্ধাদের নোংরা কথাগুলো সত্যি হতে
দিবেন না। হ্যাঁ উনি যে, শুদ্ধ আর সায়নকে ভীষণ
ভালোবাসে একথাও অস্বীকার করতে পারবেন না।
তবে জামাতা হিসেবে গ্রহণও করবেন না। তাহলে
সমাজকে জিতিয়ে দেওয়া হবে। সব কটু কথার জয়
হবে। এছাড়াও উনি জেনে গেছেন উনার মেয়ে দুটো
হবে ছেলে দুটোর প্রাণনাশের কারণ। তাদের
চারজনের ভালোবাসার বন্ধনই ভাঙবে শারায়ত ও
শাহাদত চৌধুরী পবিত্র বন্ধন। বেশ বড় সড় আবছা
অন্ধকার রুমের বেড়ে শুয়ে আছে শীতল। পিটপিট
করে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে নিজের অবস্থান।
কিন্তু রুমটা অচেনা

লাগছে তার কাছে। এটা কোথায়? কার বাড়ি? কার
রুম? আর স্বর্ণ আপু কোথায়? সে এখানে শুয়ে আছে
কেন? মাথায় আঘাত পেয়ে স্মৃতিশক্তি হারিয়ে
ফেলেছিল নাকি? তা নাহলে ঘুম থেকে উঠে কিছু
চিনতে পারছে না কেন? আর্মি হাউজের রুম হলে
চিনত, চৌধুরীর নিবাসের রুমগুলো তার চেনা,
হসপিটালের রুম এমন হয় না, তবে? এসব ভেবে
সে ভালো করে দেখল পুরো রুমটা। আবছা আলোয়
দেখা যাচ্ছে দেওয়াল ঘড়ির কাঁটা, এখন বাজে
আড়াইটা। কিন্তু দুপুর নাকি রাত? রাত দিনের তফাৎ
বুঝতে সে জানালায় তাকিয়ে দেখল রাত। বাইরে সব
ঘুটঘুটে অন্ধকার।

এত অন্ধকার কেন? সে কি জঙ্গলের আশেপাশে
নাকি? বাবা, মা কই? তারা আসছে না কেন? আর
শুদ্ধ ভাই যদি জানে কার না কার বিছানায় শুয়ে পড়ে
পড়ে ঘুমাচ্ছিল সে, তাহলে মেরে কঙ্কাল করে রোদের
শুকাতে দেবে। কিন্তু তার আগে তাকে জানতে হবে
এটা কোথায়, কার বাড়ি?

এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে
তাড়াতাড়ি চোখজোড়া বন্ধ করে নিলো। তারপর

অবচেতনের মতো কাঠ হয়ে পড়ে রইল। আগে বুঝতে হবে নিজের অবস্থান বোকামি করা যাবে না। আগেরবার যখন কিডন্যাপ হয়েছিল তখন বোকামি করায় মার খেয়েছিল। এখন সেসব করা যাবে না। আচ্ছা এবারও কি কিডন্যাপ হলো নাকি? কার এত সময় যে অযথা ঘুরে ফিরে তাকেই কিডন্যাপ করতে আসে? তার জীবনে কি কাজকাম নাই? সে কি চোখে ঠুলি পরে থাকে আর কাউকে চোখে দেখে না? জীবনটা আজকাল সিনেমার মতো হয়ে যাচ্ছে। হিরোইন, ইরোইন ফিল পাচ্ছে, এসব ভাবতে ভাবতে কান খাড়া করে মাত্রই রুমে প্রবেশ করা মানুষটার উপস্থিতি বোঝার চেষ্টা করল। কিন্তু কারো পদধ্বনি বা উপস্থিতি টের না পেয়ে চোখ এদিক-ওদিক তাকাতেই আচমকা একটা ভারী পুরুষালি কণ্ঠস্বর কানে বিঁধল,-‘বাবুই, ঘুম ভেঙেছে তোমার?’

অন্ধকার বেলকনি থেকে আদুরে কণ্ঠে ভেসে আসা কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল শীতল। কে ওখানে? কে কথা বলল? কণ্ঠস্বর চেনা লাগছে কেন?

অচেনা একটা ভয়ে থরথর করে কাঁপার কথা থাকলেও শীতল ভয় দূর চিন্তিতও হলো না। বরং ধীরে সুস্থে উঠে বসল। কণ্ঠস্বরের মালিক উঠে এসে রুমের লাইট অন করতেই ঝকঝকে আলোয় ভরে গেল পুরো রুম। এতক্ষণ অন্ধকারে থাকায় হঠাৎ চোখে আলোর পড়ায় সে চোখ কুঁচকে পিটপিট করে তাকাল। দেখল রেস্টুরেন্টে পরিচয় হওয়া নীল চোখের মালিক দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। কিন্তু এই লোক এখানে কেন? সে ভ্রুঁ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল, -‘আমি এখানে কেন? আপনি কি আমাকে কিডন্যাপ করেছেন?’

শীতলের কথা শুনে ইয়াসির যেন আকাশ থেকে পড়ল। সে অবাক চোখে চেয়ে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলল,-‘তাওবা, তাওবা, কি বলো এসব? তোমার মতো বাচ্চা একটা মেয়েকে কিডন্যাপ করব? আর..আর আমাকে দেখে কিডন্যাপার মনে হয়?’

-‘করেন নি তো আমি এখানে কেন? আমার আপু কোথায়?’

-‘আয় হায় তোমার দেখি কিছুই মনে নেই!’

ইয়াসির কথা শুনে শীতল এবার আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল,

-‘কি মনে নেই? কিসের কথা বলছেন?’

-‘তোমার আপু যাওয়ার পর জুবায়েরও কথা বলতে চলে গেল। তখন তো সেখানে একদল ডাকাত এসেছিল। কি একটা স্প্রে করায় হুটহাট করে সবাই অজ্ঞান হয়ে গেল। অবচেতন মানুষের ফোন কেড়ে নিলো। আমার ফোনও তো নিয়ে গেছে শালারা। আমার জ্ঞান ফেরার পর দেখি তুমি আমার পাশে পড়ে আছো। তবে তোমার বোন বা মেজরকে পাই নি তাই তোমাকে আমার বাসায় এনেছি। কারণ আমি তো তোমার বাসার ঠিকানা জানি না।’ একথা বলে ইয়াসির গোঁ বেচারী মুখ করে তাকিয়ে রইল শীতলের মুখের দিকে। এদিকে শীতল ভাবছে, একটা মানুষ আর যাই হোক গটগট করে মিথ্যা বলবে না নিশ্চয়ই? কারণ মিথ্যা বললে তো মানুষ গলা কাঁপে বা তোঁতলায়। কিন্তু এই লোক তো নিষ্পাপ চাহনি নিয়ে কথাগুলো বলছে।

তাকে ভাবতে দেখে ইয়াসির মনে মনে হাসল।
নিজেকেই নিজে বাহবা দিলো। এভাবেই আপাতত
অবুজ পাখিটাকে বুঝ দিয়ে রাখবে হবে। যেন
কান্নাকাটি না করে তার সঙ্গে সময় কাটায়। শীতল
কিছু বলছে না দেখে ইয়াসির মাথা ঢুলকে কিছু
একটা মনে করার ভাণ করে বলল,-‘ওহ হো তোমার
নামটাই তো ভুলে গিয়েছি। বাবুই বোধহয়..., রাইট?’
-‘না, শীতল।’

-‘কিন্তু বাবুই নামটা তোমার সঙ্গে খুব যায়, জানো?
আচ্ছা শীতল আমি যদি তোমাকে বাবুই ডাকি তুমি
কি মাইন্ড করবা?’

-‘করব।’

-‘কেন?’

-‘কারণ এসব নামে ডাকলে শুদ্ধ ভাই চ্যালাকাঠ দিয়ে
ধুনাবে।’

-‘ধুনাবে মানে? বুঝলাম না ঠিক তোমার কথাটা?’

-‘ধুনাবে মানে, মারাকে বুঝাচ্ছি আর কি।’

-‘ওহ, কিন্তু কাকে মারবে?’

-‘আমাদের দু’জনকেই। মার তো খান নি জানেন না
চ্যালাকাঠের মার কত মজা।’

-‘শুদ্ধ তোমাকে মারে? কেন মারে?’

-‘আপনার বাড়িতে খাবার টাবার নেই? গেস্ট এনেছেন অথচ খেতে দিচ্ছেন না, এটা তো ঠিক না।’

-‘ওহ তাই তো! সরি সরি বাবুই গল্পে গল্পে ভুলে গেছি, এখন বলো তো

কি খাবে?’-‘উম, আমার এখন নুডলস খেতে ইচ্ছে করছে।’

-‘ওকে চলো দু’জন মিলে রান্না করি।’

একথা বলে ইয়াসির শীতলকে নিয়ে রান্নাঘরে গেল।

ভুলেও রান্নাঘরে না আসা ছেলেটা রান্নাঘরে এসেছে ঠিকই কিন্তু রান্নার র ও জানে না। সে এমন ভাব করছে যেন রান্নায় বেশ পটু। শীতল ইয়াসিরের পাশে দাঁড়িয়ে আশেপাশে দেখছে। বাড়িটা নীরব। বাড়িতে আর কেউ নেই নাকি? সে এবার একটু সচেতন হলো তবে ঘাবড়ে না গিয়ে বলল,

-‘সমশের ভাইয়া আপনার বাড়িটা কোথায়? না মানে বাবাকে ফোন করলে এসে নিয়ে যেতো।’

ইয়াসিরের হাত থেমে গেল। তার নাম সমশের কবে হলো? বলে কি এই মেয়ে? নাকি ওর নামটা ভুলে যাওয়ার ভাণ করেছে বলে শোধ নিচ্ছে?

তাই হবে! একথা ভেবে সে কোনোমতে হাসি আঁটকে
বলল,-‘আমার নাম ইয়াসির খান! মানুষ জবাই করে
আমার নামের আকিকা করেছি আমি।’

-‘কিহ? কি বললেন? কি জবাই করে?’

-‘ বড় বড় দুটো গরু জবাই করে।’

-‘প্রথমে কি বললেন?’

-‘এই কথায় তো বললাম কেন তুমি কি শুনেছো?’

-‘শুনেছি মানুষ জবাই করে আকিকা করেছেন? কিন্তু
মানুষ জবাই করে মানুষের আকিকা হয় নাকি? হয়
না তো! বাদ দেন আমিই বোধহয় ভুল শুনেছি।’

একথা শুনে ইয়াসির ফিচেল হাসল তারপর বিরবির
করে উত্তর দিলো,

-‘মানুষের আকিকা মানুষ দিয়ে না হলেও
জানোয়ারের আকিকা মানুষ দিয়ে হয় বাবুইপাখি।
তবে বলতেই হয়, তোমাকে যতটা বোকা ভেবেছি
তুমি ততটা বোকা নও। খাবারের নাম করে রুমের
বাইরে এসে দেখলে বুঝি বাড়িতে আর কেউ আছে
কী না? কারো সাহায্য নিতে পারবে কী না?
পালানোর জন্য কোনো পথ খোলা আছে কী না?
বাবুইপাখি, যত চালাকি করো না বের হতে পারবে না

সোনা। তুমি কল্পনা করতে পারবে না আমরা এখন কোথায় আছি।’এদিকে শীতল নিজের মতো বকবক করেই যাচ্ছে। ইয়াসির ইউটিউব দেখে নুডলস রান্নার ট্রাই করছে কিন্তু তার কাজের আনাড়ি ভাব দেখে শীতল যা বোঝার বুঝে গেল। এতেও সে আগ বাড়িয়ে কিছু বললই না।

বরং আবার জিজ্ঞাসা করল,

-‘বললেন না, আপনার বাড়ির লোকেশনটা কোথায়? আর একটা ফোন দিন না বাবাকে কল করি? নাহলে বাবা চিন্তা করবে তো নাকি?’-‘ আচ্ছা বাবুই নুডলসে কি ঝাল কম দেবো নাকি বেশি দেবো?’

-‘বেশি।’

-‘কতটা বেশি?’

-‘যতটা দিলে কেঁদে ফেলব।’

-‘কেন, কাঁদতে ইচ্ছে করছে বুঝি?’

-‘না। তবে আমি ঝাল বেশি খাই।’

-‘ওহ আচ্ছা।’

-‘বাড়িতে আর কেউ থাকে না? ভূতের বাড়ির মতো এত সুনশান কেন?’

-‘পৃথিবীতেই আমার কেউ নেই সেখানে বাড়িভর্তি মানুষ কোথায় পাব?’

-‘বিয়ে? বিয়ে টিয়ে করেন নি..আপনার বউ নেই?’

-‘হা হা হা, না নেই, তবে হবে শীঘ্রই হবে।’

-‘আমাকে দাওয়াত দিবেন কিন্তু আমি উপহার নিয়ে বিয়ে খেতে আসব।’

-‘ভুম ভুম তা তো অবশ্যই। কিন্তু কি উপহার দেবে?’-‘একদিনের ইঁদুরের বাচ্চা। সাইন্টিস্টদের কাছে ইঁদুর অনেক ইমপোর্টেন্ট জিনিস। কেন, ইঁদুর দিলে খুশি হবেন না?’

-‘না। ওসব ইঁদুর টিঁদুর আমার লাগবে না তুমি বরং ওসব তোমার শুদ্ধ ভাইকে দিও। তুমি শুধু, আমার বিয়ের ক্ষণে হাসিমুখে থেকো ওটাই হবে আমার জন্য বিশাল পাওয়া।’

-‘আচ্ছা। ভীষণ ক্ষুধা লেগেছে আর কতক্ষণ, হয় নি রান্না? খেয়ে তো বাড়ি যেতে হবে। ইয়ে মানে ওয়াশরুমে যাব, আচ্ছা ওয়াশরুমটা যেন কোন দিকে?’

-‘যেই রুমে ছিলে ওই রুমেই ওয়াশরুম আছে, যেতে পারবে?’

-‘হুম।’একথা বলে শীতল রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে ওই
রুমে গিয়ে ওয়াশরুমে ঢুকল। ইয়াসির হাতের
ওয়াচের দিকে তাকিয়ে দেখল রুমে খোঁজাখুজি না
করে শীতল সত্যিই ওয়াশরুমে ঢুকেছে। সেটা দেখে
ইয়াসির নুডলস টেস্ট করে হ্যাঁ বোধক মাথা নাড়িয়ে
বলল, ‘নট ব্যাড..উম চলে। বাবুই পাখি হয়ে গেছে
তোমার নুডলস, খাবে এসো।’ এইটুকু বলে সে দুষ্ট
হেসে নিচুস্বরে বলল, ‘প্রথমে তুমি আমার হাতের
নুডলস খাবে এরপর আমি তোমায় খাব..ওকথে?
ইয়াহ্ ওকথে!’

একথা বলে একটা বাটিতে নুডলস ঢেলে শিষ
বাজাতে বাজাতে রুমের দিকে পা বাড়াল। এদিকে
ওয়াশরুমের দরজায় পিঠ ঠেঁকিয়ে শীতল থরথর করে
কাঁপছে। কারণ সে বুঝে ফেলেছে সে আবার বাজে
কারো চক্রে পড়েছে। কারণ ইয়াসির যখন সূচ
ফুটিয়েছিল সে স্বপ্নানে ছিল। সে অনুভব করে কাজটা
সেই করেছিল, পরের ঘটনা মনে না থাকলেও
এইটুকু তার স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, সে
এখান থেকে বের হবে কীভাবে? এটার লোকেশন
তো জানে না আর কিভাবে কি করবে? শুদ্ধ! শুদ্ধ

ভাই আসছে না কেন? তার কানে কি নিঁখোজের
খবর গিয়ে পৌঁছায় নি? শুদ্ধর কথা মনে হতেই সে
হাতের অনামিকা আঙুলে থাকা

রিং এর উপর চুমু খেলো। চট্টগ্রামের আসার রাতে
শুদ্ধ খুব গোপনে তাকে রিংটা পড়িয়ে দিয়েছিল। স্বর্ণ
তার হাতের রিংটা দেখে বলেছিল,-‘পৃথিবীর যেই
প্রান্তেই যাস রিং টা ভুলেও খুলবি না। যদি খুলিস,
তোর

বিপদে তোর শুদ্ধ তোর কাছে কখনোই পৌঁছাতে
পারবে না। যদি শুদ্ধ ভাইয়ের সঙ্গে চাস তাহলে যত
যাই কিছু ঘটে যাক রিং যেন আঙুল থেকে না সরে।
মনে থাকবে, আমার কথা?’

জবাবে সে মাথা নাড়িয়েছিল। এমনিতেও সে খুলত
না কারণ এটা তার বিশুদ্ধ পুরুষের দেওয়া বিশেষ
উপহার। সে এবার ঠোঁট কাঁপিয়ে রিং এর উপর চুমু
খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে লাগল। তারপর মনে মনে
বলল,

-‘আসুন না শুদ্ধ ভাই? একটু তাড়াতাড়ি আসুন, ভয়
লাগছে তো।’

হঠাৎ রুম থেকে ইয়াসিরের কথা ভেসে আসায় সে
জলদি হাত মুখ দেখে বের হলো। শুদ্ধ না পৌঁছানো
অবধি তার অভিনয় চালিয়ে যেতে হবে। শীতল
কিপন্যাপ হওয়ায় চৌধুরী বাড়িতে পড়েছে শোকের
ছায়া। এবার সিঁতারা নিজের রাগ সামলাতে পারলেন
না। কল দিয়ে যাচ্ছে তাই বলে

অপমান করলেন সিমিনকে। কারণ সাম্য সৃজনের
এক্সিডেন্টের পরপর শুদ্ধ, সায়ন, রুবাব বাড়ির
সবাইকে বারবার বুঝিয়েছিল তাদের পেছনে গোপন
শত্রু লেগেছে, সাবধান হতে। যে যেখানেই যাক চোখ
কান খোলা রাখতে। তবুও সিমিন বারং শোনে নি
রাগ দেখিয়ে মেয়ে দুটোকে নিয়ে চলে গেল। সে না
গেলে আজকের এ দিনটি দেখতে হতে না। এখন
যদি মন্দ কিছু ঘটে তাহলে নিজের মেয়ে বলে
সিমিনই কী কষ্ট পাবেন নাকি বুকে, কোলে করে মানুষ
করায় মেয়েটার জন্য উনাদেরও সমান কষ্টে বুক
ঝাঁঝরা হবে? জন্ম দিয়েছে বলে কী মেয়ে দুটোর জন্য
উনার মনেই মায়া আছে, আর কারো নেই? এখন
যদি কোনো অঘটন ঘটেও সিমিন পারবে নিজেকে
ক্ষমা করতে? যে ছেলের সাথে মেয়েদের বিয়ে

দিবে না বলে এত কান্ড করল, শীতলকে খুঁজতে
সবার আগে এরাই প্রাণপনে দৌড়ে বেরিয়েছে।
আজকে বাড়িতে মাছের ডিম রান্না হয়েছে। শীতলের
পছন্দ মাছের ডিম। রান্না করতে দেখলে একটা বাটি
হাতে পাশে দাঁড়িয়ে থাকত। তোতাপাখির মতো করে
বলতো, ‘হলো, বড় মা? দাও না একটু লবণ দেখি?
বেশি ভালো করে রান্না করতে হবে না সবাই খেলে
নিলে, আমার ভাগে কম পড়বে।’ সেসব মনে করে
মাছের ডিম দেখে চোখের পানি ভর ধরছিল না বলে
রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উনি কাঁদছিলেন। সেটাই
আচমকা চোখে পড়ল শুদ্ধর। বুঝল মায়ের মনের
কথা। তাই সে মায়ের কান্না থামাতে ছোটো করে
বলল, ‘ক্ষুধা লেগেছে খেতে দাও তো আম্মু।’ ছেলের
ক্ষুধা লেগেছে তড়িঘড়ি করে খাবার বেড়ে দিলেন।
ছেলে

মলিন মুখে তার পাশের চেয়ারে একবকর তাকিয়ে
খেতে বসেই শুনল দুঃসংবাদটা। মুখের কাছে ভাত
নিয়েও খবর শুনে ভাতের প্লেট সরিয়ে স উঠে চলে
গেছে। অথচ সারাদিন পর, বাড়ি এসে মাত্রই খেতে
বসেছিল ছেলেটা। খবর শুনে ছেলে পেটের ক্ষুধাকে

গুরুত্ব দিলো না মনের ক্ষুধা মিটানোর মানুষটার জন্য
উতলা হয়ে উঠল। আর মা হয়ে উনার কানে ভাসতে
থাকল ‘ক্ষুধা লেগেছে..খেতে দাও তো আম্মু।’ মায়ের
অবুজ মনে তখন থেকে পিনের মতো শীতলের জন্য
যেমন কাঁদছে। তেমনি ছেলের জন্য কলিজায় ফুটছে
‘আহা! আমার ছেলেটার পেটে ক্ষুধা!’ আমার
ছেলেটা খায় নি।’মোদাকথা, শুদ্ধ, সায়ন খারাপ! তারা
সিঁতারার ছেলে, ওদের সাথে কী মেয়েদের বিয়ে
দেওয়া যায়? যায় না তো! যায় না যখন তখন
মেয়েকে খুঁজতে তাদের লাগছে কেন? সেদিন তো
ছেলে দুটোর মলিন মুখ দেখে

মায়া করেন নি। তাহলে আজ কেন তাদের লাগছে?
শুধু তাই’ই নয় সিমিন আরো জরুরি কথা গোপন
করেছেন। যেটা কেউ স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে
পারছেন না। সিমিন বাড়িতে থাকাকালীন ডয়িংরুমের
ঝুল ঝাড়তে গিয়ে ক্যামেরা পেয়েছিলেন এবং সেটার
কথা গোপন করেছেন। কিন্তু ক্যামেরা এলো কিভাবে?
কে লাগাল ক্যামেরা? এসব নাহয় পরের কথা উনি
গোপন করল কেন? কি ভেবেই বা গোপন করলেন?
এর উত্তরও দিতে পারলেন না সিমিন। তখন

সিরাতের মনে পড়ল বেশ কিছুদিন আগে ওয়াইফাই-
এর সমস্যা দেখা দিয়েছিল? তখন বাড়িতে কিছু
লোক এসে ঠিক করে দিয়েগিয়েছিল ওয়াইফাই, তারা
কী লাগিয়েছিল নাকি ক্যামেরা? ভিডিও কলে থাকা
সিমিন এবারও নিশ্চুপ। সিমিনের নামে এত অভিযোগ
হচ্ছে শুনে মুখে হাত দিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল শখ।
ড্রয়িংরুমে উপস্থিত থাকা সকলে তার দিকে তাকালে
শখ ঠোঁট ভেঙে অসহায় সুরে কেঁদে উঠল। কাঁদতে
কাঁদতে বলল,

-‘ ছোটো মা আর চুপ করে থেকো না এবার অন্তত
মুখ খোলো। তোমাকে এত কথা শুনতে দেখতে পারছি
না আমি। অনেক হলো এবার সত্যিটা বলো
সবাইকে।’

একথা বলে সে সবার দিকে তাকিয়ে বলল,

-‘বাবা-মা ড্রয়িংরুমে ক্যামেরা লাগিয়েছে আহনাফ।

শুধু ড্রয়িংরুমেই না

আমাদের তিনবোনের ওয়াশরুমে ক্যামেরা লাগানো।

এবং.. এবং তিন বোনের..তিনবোনের..গোসলের

ভিডিও আহনাফের কাছে আছে।’ ওয়াশরুম থেকে

বেরিয়ে ইয়াসিরকে কোথাও না দেখে তাকে

আশপাশে খুঁজল শীতল। কিন্তু না দেখে ডাকল
দু'একবার। কিছুক্ষণ বসে অপেক্ষা করেও তাকে না
দেখে উঠে ড্রয়িংরুমে এলো। পুরো বাড়িতে লাইন
অন থাকায় সে ঘুরে ঘুরে দেখল। বিলাশ বহুল
সজ্জায় সজ্জিত পুরো বাড়ি।

তবে এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার ধৈর্য নেই শীতলের।
বুক ভয়ে নিয়ে এত খুঁটিয়ে কিছু দেখাও যায় না। সে
আরেকবার পেছনে তাকিয়ে ইয়াসিরের উপস্থিতি না
পেয়ে ধীর পায়ে দরজার কাছে এগিয়ে গেল। দরজা
টানতে

বুঝল লক করা। লক ধরতেই পিকপিক করে
পার্সওয়াড চাইল। সে তো পার্সওয়াড জানে না তাই
অহেতুক আর টিপাটিপিও করল না। করলে দেখা
যাবে শব্দ করে উঠবে। শুদ্ধর রুমের দরজা যেমন
বৈদ্যুতিক শখ দেয়। কিন্তু এখান থেকে বের হবে
কিভাবে? শীতল দরদর করে ঘামছে। হাতের উল্টো
পিঠ দিয়ে ঘাম মুছে এক পা পেছাতেই কারো বুকে
ধাক্কা খেলো। তখন তার পেছন থেকে কেউ ফিসফিস
করে বলল,

- ‘ হেই বাবুই পাখি পালাচ্ছ বুঝি?ব্যস্ত রাস্তার বুক চিঁড়ে শাঁ শাঁ শব্দে কুঁচকুঁচে কালো রঙ্গের একটা গাড়ি চলেছে দ্রুতগতিতে। একের পর এক চলন্ত গাড়িকে ওভারটেক করছে গাড়িটি। যেন ভীষণ তাড়া সবাইকে টপকে এগিয়ে যাওয়ার। যাবে যাক, তবে এভাবে কেন? এক্সিডেন্টের ভয় ডর নেই নাকি গাড়ির মালিকের?তাছাড়া সিগনাল ভঙ্গ করার দায়ে ট্রাফিক কেস ঠুকে দিলে? রাস্তাপথে এসবও তো মাথায় রাখতে হয় নাকি? বলা বাহুল্য, নিজের জানের কথা স্মরণ করবে না? করলে অবশ্য এভাবে মৃত্যু হাতে নিয়ে গাড়ি টানত না।

মোদাকথা, এসব কথা ভাবার একদমই সময় নেই এ গাড়ির মালিকের। কারণ সে আছে আপন ভাবনায়! আপন চিন্তায়। তার লক্ষ্য তাকে প্রাণ পণে ছুটতে হবে। পৌঁছাতে হবে নিজের গন্তব্যে। এভাবে চলতে চলতেই

গাড়িটা হাইওয়ে পেরিয়ে কিছুদূর গিয়ে থামল ‘ জননী’ নামের পেট্রোল পাম্পের সামনে। গাড়ির জানালা বন্ধ। জানালাতেও কালো কাঁচ বিধায় দেখা যাচ্ছে না ভেতরের কোনোকিছু। গাড়িতে পেট্রোল

ভরতে সাহায্য করা ছেলেটা জানালার কাঁচে দু'টোকা
দিলেও সাড়াশব্দ করল না কেউ। অগত্যা বিরবির
করতে করতে চলে গেল ছেলেটি। খঁকিয়ে উঠে বলে
গেল পেট্রোল না নিলে জায়গা ফাঁকা করতে। নয়তো
দেখা যাবে ভিড় লেগে যাবে। ছেলেটার কথা শুনে
গাড়ির হর্ণ বাজল দু'বার। এরপরপরই সেই গাড়িটির
পাশে আরেকটি কালো গাড়ি এসে দাঁড়াল। গাড়ির
নাম্বার, কালার, ডিজাইন একইরকম। বোঝার উপায়
নেই আলাদা করার। গাড়ি

একই ডিজাইন হতে পারে কিন্তু নাম্বার? ব্যাপারটা
অদ্ভুত না? তবে কেউ সেটা খেয়াল করল না। পাম্পে
এলেও কেউ পেট্রোল নিলো না নিচেও নামল না।
বরং কিছুক্ষণ পর সেভাবে থেকে একইসাথে সামনে
রাস্তায় উঠে পাশাপাশি পথ চলতে শুরু করল।
তাদের একসাথে দেখে এবার পেছনে থাকা একটি
গাড়িতে বসা বিশু নামের ছেলেটি খঁকিয়ে উঠল।
ছুঁড়ল বাংলা গালি। কারণ তারা সাবধনতা অবলম্বন
করে শুদ্ধকে ফলো করছিল এতক্ষণ ধরে। এখন
গাড়ি একইরকম বিধায় গুলিয়ে ফেলেছে। তবুও
থামাল না, গাড়ি দুটোকে আগের মতো ফলো করতে

লাগল। হঠাৎ আরেকটা গাড়ি আসায় কেমন খটকা
লাগল তাদের। এমন তো হওয়ার কথা না তাই
ছেলেটি ফোন দিলো তার মালিককে। মালিক ফোন
ধরল না, ধরল তার সহকারী। তখন বিশু নামের
ছেলেটি বলল,

-‘ছ্যার, একখান ঝামেলা বাইধ্য গ্যাছে। সব ঠিকঠাকই
আছিল কুন্তু হঠাৎ

আরেকখান গাড়ি হান্দায় পড়ছে। এহন বুঝতেছি না
কুনডা শুদ্ধ, কুনডা আরেকটা কেডায় জানি।’

-‘দুটোকেই ফলো করো।’

-‘করতাছি স্যার। আমগো সামনে দুইডা গাড়িই ফুল
স্পিডে যাইতাছে।’

-‘যেদিকে যাচ্ছে তোমরাও যাও। শুদ্ধর গাড়ি কখন,
কোথায় যাচ্ছে, সব আপডেট জানাবে আমাকে।’

-‘জ্বে ছ্যার।’-‘সায়নকেও ফলো করতে বলেছিলাম
লোক লাগিয়েছো?’

-‘হ ছ্যার, চাপ নিয়েন না, হেরা দুই ভাইই আমাগো
নজরবন্দি।’

-‘চাপ এমনি এমনি নিচ্ছি না যার কাজ করছো তার
নাম মনে রেখো। সে কাউকে তার কাজে লাগানোর

আগে সেই ব্যক্তির কলিজা নিজের কাছে জিম্মি রাখে। যাতে বেইমানি করলেই কেটে টুকরো টুকরো করতে পারে। আর সে ব্যক্তি অন্য কেউ না, ইয়াসির খান!’

-‘মুনে আছে ছ্যার।’

-‘গুড। আবারও বলছি, শুদ্ধ চট্টগ্রামের রাস্তা ধরলে সাথে সাথেই ইনফর্ম করবে। ওকে দক্ষিণের চা-বাগানের আশেপাশের আসতে দেওয়া যাবে না।’

-‘জ্বে ছ্যার।’ একথা বলে ছেলেটি কল কেটে তাকাল সামনের গাড়ি দুটোর দিকে। হ্যাঁ, সমানতালে এখনো ছুটে চলেছে গাড়ি দুটো। তারাও কোনোদিকে আর না তাকিয়ে ছুঁটল পিছু পিছু। হঠাৎ গাড়ি দুটো দু’দিকের পথ ধরল। এবার ছেলেগুলো ঘাবড়ে গেল কারণ তারা কেউ জানে না শুদ্ধ কোন গাড়িতে আছে। জানলে গুলিয়ে ফেলেছে একই রঙের গাড়ি ও নাম্বার হওয়ায়।

জানে না বিধায় কোন গাড়ির পেছনে ছুটবে বুঝে উঠতে পারল না। তারা

উপায় না পেয়ে পুনরায় ইয়াসিরের নাম্বারে কল দিলো। কিন্তু কেউ কল রিসিভ করল না। কয়েকবার

কল দিতে দিতে কলটা বেজে বেজে কেটে গেল।
অতঃপর নিজেরা আলোচনা করে ডানদিকের পথ
ধরা গাড়িটার পেছনে গেল। কিন্তু নজরে পড়ল না
দেখে গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে সামনে
এগোতেই দেখে গাড়ি দুটো ঠিক পূর্বের মতো
পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। এবার তাদের মাথা
এলোমেলো হওয়ার অবস্থা। মানে কি এসবের? দুই
রাস্তায় গিয়েও আবার একসাথে হলো কিভাবে?
চৌধুরীর পুত্ররা মাইন্ড গেম খেলছে বুঝতে বাকি
রইল না তাদের। চলন্ত গাড়িতে বসেই অকথ্য ভাষায়
গালি দিতে দিতে ছুটতে লাগল গাড়ির দুটোর
পেছনে।

এদিকে তিনটে গাড়ি যখন শাঁ শাঁ করে চলে গেল
শুদ্ধ তখন ধীরে ধীরে
বেরিয়ে এলো রাস্তার পাশে ঘুটঘুটে অন্ধকারে ভরা
জঙ্গল থেকে। রাস্তায় উঠে তাকাল ডানে-বামে।
আশেপাশে কারো চিহ্ন নেই। নির্জন চারিপাশ। সে
এক পা দু'পা করে এগোতেই ঠিক তার সামনে এসে
ব্রেক কষল সাদা রঙের চারচাকার একটি গাড়ি।
সেকেন্ডের মধ্যে খুলে গেল গাড়ির অপর পাশের

দরজা। শুদ্ধ আর কোনোদিকে না তাকিয়ে গাড়িতে
উঠে বসতেই গাড়িটা বিপরীত পথ ধরে ছুঁটতে শুরু
করল। গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসা

অর্ক একবার তাকাল শুদ্ধর মুখের দিকে। শুদ্ধ সিটে
হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে অনড় হয়ে বসে আছে।
তাকে দেখে বোঝার উপায় নেই তার ভেতরকাল
হালচাল। সে মাঝেমধ্যে ভেবে পায় না একটা ছেলে
এতটা

অনুভূতিহীন কিভাবে হতে পারে? সেও তো
ছেলে..কিন্তু মাঝেমধ্যে সেও হাল ছেড়ে দেয়।
সৌভাগ্যগুনে ক'টা বন্ধু পেয়েছে কষ্ট পেলেই
ভেতরকার হাহাকার উগলে দেয় তাদের সামনে।
অথচ শুদ্ধ এমনই! তার পরিবর্তন নেই। স্বভাব আগে
যেমন ছিল এখনো একই রকম। আচ্ছা শুদ্ধ কখনোই
কী তার স্বভাবের বাইরে বের হতে পারবে না?
কখনোই কি ভালো লাগা, মন্দলাগা মুখ ফুটে কাউকে
বলতে পারবে না? শীতল নিঁখোজ, এখন কি শুদ্ধর
উচিত না পাগলের মতো করা? অথবা একটু কাঁদা?
চুপিচুপি তো কাঁদতে পারে। কিন্তু কাঁদছে না। কাঁদছে
না নাকি কাঁদতে পারছে না সে?এই না পারাটা কি

তার জীবনের ব্যর্থতা নয়? বন্ধুর মনের অবস্থা বুঝেও
মনে হলো এখন কথা বলা উচিত। কথা বললে কিংবা
মনোযোগ সরালে মানুষ বিপদের মাঝেও সমাধান
দ্রুত খুঁজতে পারে। এজন্য সে বলল,

-‘জিপিএস অন দেখাচ্ছে না?’

বন্ধুর কথা শুনে শুদ্ধ একবার তাকিয়ে থমথমে মুখে
ছোট করে জবাব দিলো,

-‘হুম।’

-‘কোথায় দেখাচ্ছে?’

-‘চট্টগ্রামের চা-বাগানের আশেপাশে।’

-‘শীতল কি জানে ওর রিং-এ জিপিএস সিস্টেম
করা?’

-‘না।’

-‘তুই দিয়েছিস রিংটা এজন্য তোর ব্যাঙাচি আঙুল
থেকেই খুলবে না, মিলিয়ে নিস? রিং না খুললে খুঁজে
পেতেও সময় লাগবে না।’ শুদ্ধ আর কোনো কথার
জবাব দিলো না সিটে গা এলিয়ে দিয়ে তাকিয়ে রইল
আকাশপানে। আকাশের বুকে তারা আছে, চাঁদ
আছে। আকাশের

কত গর্ব, কত সুখী, তাই না? তার তো চাঁদও নেই,
তারাও নেই, যে আছে সে আপাতত নিঁখোজ। আচ্ছা,
শীতল কি তাকে ডাকছে, খুঁজছে? আগে ভয় পেলে
তো কেঁদে কেঁটে একাকার করত। এখনও কি খুব
ভয় পাচ্ছে?

রাতে ভূত টুতের ভয় দেখালে আদুরে বিড়াল ছানার
মতো ভয়ার্ত চোখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে গা ঘেঁষে
দাঁড়াত। যদিও এখন সাহসটা বেড়েছে, এখন ভয়
দেখালে সোজা তার বুকে এসে হামলা করে। বুকে
মুখ লুকিয়ে উল্টে তাকেই বলে, ‘ভূত টুত আবার কি?
ভূতনীর ভূত থাকলে আমারও একটা বিশুদ্ধ পুরুষ
আছে। আর খাব খাব লুক নিয়ে তাকাবেন না, ভয়
পাচ্ছি না মোটেও। আর আমরা না লুকোচুরি প্রেম
করছি? প্রেম করলে গফকে কেউ মারে? বকে? শুধু
শুধু এত ধমকায়? জানেন তো শুদ্ধ ভাই, আপনি
হচ্ছেন পৃথিবীর সবচেয়ে বে-রসিক প্রেমিক।’

এ কথাটা অবশ্য মানে। কারণ সে অনান্য দায়িত্বের
বোঝা নিঁখুতভাবে

পালন করলেও কখনো বোধহয় প্রেমিক হতে পারবে
না। কারণ প্রেমিক হতে গেলে সময় অসময়ে গফের

প্রশংসা করতে হয়। ভালোবাসি বলতে হয়
একাধিকবার। অন্যায় হলেও ন্যায় বলে গফের মন
রক্ষা করতে হয়। এসব তার দ্বারা হবে না। সবচেয়ে
বড় কথা, সে কখনো কারো মন রক্ষা করে চলতে
পারে না। মনে এক কথা চেপে রেখে মুখে অন্য
কথার বুলি আওড়াতে পারে না। এতসব না, না,
ভিড়ে অন্যসব করতে পারবে। এই যেমন, শুধু তার
ব্যাঙাচির চিরসঙ্গী হতে পারবে! অঘোষিতভাবে তার
বুকজমিন তার নামে খোদাই করতে পারবে। বুকে
করে আগলে রাখতে পারবে। ঠিকঠাকভাবে লুকোচুরি
প্রেম করতে না পারলেও সবার সামনে
ব্যবহার দিয়ে বোঝাতে পারবে, কে তার কি হয়।
ঢাকঢোল পিটিয়ে সে
আয়োজন করে ভালোবাসা প্রকাশ করতে না
পারলেও..আড়ালে গিয়ে শখের নারীর ঠিক কপালে
আদর ঐঁকে দিতে পারবে। খুব করে পারবে
শাষণ করে পরে তার টুকরো টুকরো আবদার
মেটাতে। বিরক্তির সাথে
মাঝে মাঝে চোখের কাজল, চুড়ি, আলতা কিনতে
এনে দিতে পারবে। এগুলোতে হবে না? এগুলো কি

ভালোবাসার অংশ না? তার ব্যাঙাচি কি এসবে খুশি হয়ে সুখী থাকতে পারবে না? সুখী হতে আর কী কী লাগে? টাকা? টাকা দিয়ে একমুঠো সুখ, ভালোবাসা, বিশ্বাস কেনা যায়? গেলে, কোন বাজারে যায়? প্রয়োজনে ব্যাঙাচির জন্য সে সেই বাজারেরই সুখ কিনতে যাবে। যত টাকা লাগে লাগুক অসীম সুখ এনে ব্যাঙাচির পায়ে অর্পন করে বলবে, ‘চল ব্যাঙাচি ভালো-থাকা ভাগাভাগি করি? আমার সবটুকু সুখ তোর আর তোর সবটুকু দুঃখ আমার। তুই সুখে ভাসবি আর আমি বুকে দুঃখ নিয়েও তোর হাসিতে তাল মেলাব। তোর সঙ্গের সঙ্গীর হবো। বিনিময়ে আমার থাকিস। আর তোর মনে একটুখানি ঠাঁই দিস।’ আচ্ছা এসব কি আদৌও বলতে পারবে? সময় কি সেই সুযোগ দিবে?

এসব ভাবতে ভাবতেই শুদ্ধর মনে হলো বুকের ভেতরে চিনচিনে ব্যথাটা সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে যাচ্ছে। উফ! অসহনীয়, অবর্ণনীয় এই ব্যথা। সময় যেন কাটছে না। সে কখন পৌঁছাবে সেখানে? কখন দেখবে সুস্থ অবস্থায় তার ব্যাঙাচিকে? সে সুস্থ থাকবে তো? খারাপ কিছু ঘটনার আগে সে সেখানে

পৌঁছাতে পারবে তো? তার বোকাফুলটাকে কলঙ্কের
কলিমা থেকে মুক্ত করতে পারবে তো? যদিও না
পারে? সময় যে এখন উল্টো পথে হাঁটছে,
বারবার কী ভাগ্য তার সঙ্গে দেবে? কয়েক মিনিটের
মধ্যেই তাদের গাড়ি থেকে কয়েকহাত দূরে ফাঁকা
স্থানে

একটা প্রাইভেট জেট এসে থামল। জেটে হাসান
বসা। এটা হাসানোরই আপন চাচার জেট, যখন
প্রয়োজন হয় কাজে লাগায়। আর এখন বন্ধুর বিপদে
এগিয়ে আসবে না তা কি হয় নাকি? হাসান শুদ্ধকে
দ্রুত আসতে বললে শুদ্ধ অর্কের দিকে তাকালে অর্ক
তাকে জড়িয়ে ধরল। হাসি মুখে কাঁধ চাপড়ে যেতে
ইশারা করলে শুদ্ধ আর দাঁড়াল না বীরের মতো হেঁটে
জেটে উঠে বসল। জেটের দরজা বন্ধ হওয়ার সাথে
সাথেই ঘুরে উড়তে লাগল আকাশ পথে। অর্ক
সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল ‘শুদ্ধ, ভাই আমার,
তোকে আমি বিজয়ীর বেশে দেখে অভ্যস্ত। এবারও
প্রাপ্তি নিয়ে হাসি-মুখে ফিরে আসিস ভাই। ইয়া
আল্লাহ, আমার কলিজার বন্ধু সহায় হইয়ো। অবুজ

মেয়েটাকে সন্মান নিয়ে ফেরার তৌফিক দান
কোরো।’

একথা বলে জেট চোখের আড়াল হতেই সেও
গাড়িতে উঠে রওনা হলো চৌধুরী বাড়ির দিকে।

সেখানে তার কিছু কাজ আছে।-’ ছোটো মা আর চুপ
করে থেকো না এবার অন্তত মুখ খোলো।তোমাকে
এত এত কথা শুনতে দেখতে পারছি না আমি।
অনেক তো হলো এবার সত্যিটা বলো সবাইকে।’

একথা বলে সে হেঁচকি তুলে কাঁদতে কাঁদতে আবার
বলল,

-’বাবা-মা ড্রয়িংরুমে ক্যামেরা লাগিয়েছে আহনাফ।

শুধু ড্রয়িংরুমেই না

আমাদের তিনবোনের ওয়াশরুমেও ক্যামেরা লাগানো।

এবং.. এবং তিন বোনের..তিনবোনের..গোসলের
ভিডিও আহনাফের কাছে আ..ছে।’

একথা বলে শখ লজ্জায় মুখ ঢেকে শব্দ করে কেঁদেই
ফেলল। উপস্থিতি সকলে তখনো হতবাক চোখে
তাকিয়ে আছে শখের দিকে।একথায় যেন

বিনামেঘে বজ্রপাত হলো চৌধুরী নিবাসের ড্রয়িংরুমে।

সুন্ধ হলো সবাই।

মেয়ের কথা শুনে বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলতে পারলেন না। বলা বাহুল্য, বলার মতো ভাষা খুঁজে পেলেন না। কিছুক্ষণ পর সিঁতারা সিমিনের উদ্দেশ্য বলল,-‘ভিডিও নিয়ে আহনাফ তোকে হুমকি দিয়েছে? এজন্য বাড়ি ছেড়েছিস তাহলে?’

বড় বোন প্রচণ্ড রেগে শাষণ করলে ছোট বোনরা যেমন মাথা নত করে থাকে, ঠিক তেমনভাবে সিমিনও মাথা নত করে আছে সিঁতারার সামনে। সিঁতারার প্রশ্নে উনি উত্তর দিতে পারল না কেবল না সূচক মাথা নাড়াল।

উনাকে না বলতে দেখে সিঁতারার রাগ বাড়ল। উনি ঠান্ডা মাথায় আবার বললেন,

-‘যা ঘটার ঘটেছেই! তোর চুপ থাকায় বা বাড়ি ছাড়ায় কিছুই থেমে থাকে নি। থামাতেও পারিস নি। মেয়ের ভিডিও দেখে হুমকি দিয়েছে? এ ভয়েই পালালি ছোটো? এজন্য আমার সংসারের ভিড়টা নড়বড়ে করে দিলি?’

আমাকে বললেই বা কি হতো? এ তুই আমাকে বড় বোন ভাবিস? এখন যদি শীতলের গায়ে বদনাম লাগে তখন কি করবি তুই? চুপ থেকেও কি পারলি

মেয়েটাকে বাঁচাতে? কেন তুই বারবার নিজের করা
ভুলে আমার শুদ্ধটাকে পোড়াচ্ছিস তুই? আমার
ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে তোর কি মায়া হয় না
রে? এখন যে আমার তিনটা মেয়ের গায়েই কলঙ্ক
লেপ্টে গেল। এবার কি করব? এমন বোকামি কেন
করলি রে ছোটো? আমার মেয়েরা জানলে কিভাবে
তাদের বুঝ দেবো? কিভাবে তাদের সামলাব? জায়ের
কথায় সিমিন স্থবির হয়ে বসে রইল। লজ্জায় ঘূনায়
মরে যেতে ইচ্ছে করছে তার। তাকে এবারও চুপ
থাকতে দেখে শখ বুঝল ছোটো মা জীবনেও একথা
মুখে আনতে পারবে না। তাই লাজ লজ্জার মাথা
খেয়ে সে বলল,

-‘আম্মু, সবার আড়ালে যা যা ঘটেছে সেসব সবার
সামনে মুখে আনার মতো না।’

-‘তোরা কি সোজা কথা বলতে পারিস না? কি
হয়েছে, কি ঘটেছে সেটাই তো জানতে চাচ্ছি। কথা
কি গলা দিয়ে বের হচ্ছে না তাদের? আর কী কী
জানার বাকি আছে আমাদের? কথা যখন উঠেছেই
সবটাই বলবি তোরা।’

মায়ের বকুনি শুনে শখ কুঁকড়ে গেল। বুঝল আজকে মুখ খুলতেই হবে তাই সে বাবার দিকে একবার তাকিয়ে ছোটো মার দিকে তাকাল। তখন সিমিন হঠাৎ কল কেটে দিলো। উনাকে কল কাটতে দেখে সিতারার খুব ইচ্ছে করল ছোটো বোনের মতো ছোটো জায়ের গালে দু'খাপ্পড় লাগিয়ে দিতে। ছোটো মাকে কল কাটতে দেখে শখ কাছে ব্যাপারটা যেন সহজ হলো। সে খুতনী গলার সাথে মিশিয়ে বলল,-‘আসলে ভাইয়াদের জামাতা হিসেবে মেনে না নেওয়াটা ছোটো মায়ের কাছে অজুহাত ছিল মাত্র। ভাইয়াদের বুক আগলে মানুষ করেছে ছোটো মা। সন্তানের মতো ভালোবেসেছে। সেই সন্তানদের দিকে আঙুল তুলতে উনার বুকটাও ফেটে যাচ্ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি এমন যে পালিয়ে বাঁচার জন্য ভাইয়াদের কষ্ট দিতে হয়েছে।’

এইটুকু বলে থামল শখ। তারপর ঢোক গিলে পুনরায় বলল,

-‘আহনাফের কাছে ভিডিও আছে একথা আহনাফ ছোটো মাকে নিজে জানিয়েছে। কারণ আহনাফের প্ল্যান ছিল আমাকে টোপ হিসেবে বিয়ে করে চৌধুরী

বাড়ির জামাই হওয়া। তারপর সমাজের চোখে ভালো হয়ে

শীতলের দিকে বদনজর দেওয়া।’একথা বলে শখ আবার থামল। কথাগুলো বলতে বলতে হাঁপিয়ে গেছে সে। সিরাত শখকে ধরে সোফায় বসাল। মাথায় হাত বুলিয়ে দ্রুত আগে পানি এনে খাওয়াল। শখের কথাগুলো এলোমেলো লাগছে। কেমন যেন

অদ্ভুত শোনাচ্ছে সবার কাছে। আহনাফ ভিডিও করল, সেসব সিমিনকে জানিয়ে ব্ল্যাকমেইল করল, সিমিন বাংলা সিনেমার মতো সেসব কাউকে না জানিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। গেল তো গেল, ছেলে দুটোকে দিকে আঙুল তুলে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বেরিয়ে গেল। সিমিনের সাথে জায়ের ভালো সম্পর্ক, সে কি কোনোভাবে ব্যাপারটা সিতারাকে জানাতে পারত না? কাউকে জানাল না মানা গেল, নিজের স্বামীকে? শাহাদতকে অন্তত জানাতে পারত। ড্রয়িংরুমে নাহয় ক্যামেরা ছিল বাকি রুমগুলোও উড়ে গেছে? শখের অর্ধেক কথা শুনে আগেই কেউ কোনো মন্তব্য করলেন না।

তবে সিরাত এবার শখের পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলল,-‘মা, একটু খোলাখুলি করে পুরো ঘটনাটা বল আমাদের? এই সামান্য কারণে ছোটো এত বড় সিদ্ধান্ত নিলো? নাকি আরো কিছু আছে? সবটা বল সোনা।’

-‘মেজো মা, ছোটো মা মূলত বাবার সামনে থেকে পালাতেই অজুহাতটা দেখিয়ে চৌধুরী বাড়ি ছেড়েছে। কারণ ছোটো মা বাবাকে বড় ভাইয়ের আসনে বসিয়েছে। সেভাবেই সম্মানও করে। কিন্তু একদিকে আহনাফের

ভিডিও আরেকদিকে Ai দিয়ে বাবা আর ছোটো মাকে নিয়ে নোংরা পিক

বানিয়েছে আবু সিদ্দিক। মূলত সায়ন ভাইয়ার দল ছাড়ার রাগ চৌধুরীর বাড়ির সম্মান ধূলোয় মিশিয়ে দিয়ে প্রতিশোধটা নিতে চেয়েছিল। ছোটো মা এসব সহ্য করতে না পেরে ভাইয়াদের জানাতে চাইলে ওরা বলেছিল, ওয়াশরুমের ভিডিও আর বাবা আর ছোটো মায়ের নোংরা ছবি ভাইরাল করে দেবে। আমাদের পাঁচ ভাইদের কলিজা ছিঁড়ে কুকুরকে খাওয়াবে। ছোটো চাচ্চুকে মিথ্যা অপবাদে চাকরিচ্যুত করাবে।

এক কথায় চৌধুরী নিবাসের সন্মান ধূলোয়
মেশাবে।'এবারও সকলে হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে
রইলেন শখের দিকে। কি বলছে এই মেয়ে? এর
মাথা ঠিক আছে? অন্য সব মানা যায় কিন্তু বড়
ভাসুরের সাথে সিমিনের নোংরা ছবি..এটা ধৈর্যের
বাইরে চলে গেল না? এজন্য তাহলে ছোটো বাড়ি
ছেড়েছে? ছোটো বোন তুল্য ভাইয়ের বউয়ের সঙ্গে
এসব শুনে শারাবাত চৌধুরী প্রথমবারের মতো মাথা
নত করে নিলেন।

প্রথমবারে মতো মনে হলো উনার মরে যাওয়ায়
উচিত। এখনই বোধহয় মৃত্যুটাকে বরণ করার সঠিক
সময়। মৃত্যুর আলিঙ্গনই পারবে উনাকে অপমান
থেকে বাঁচাতে।এদিকে গাড়ি দুটো চলতি পথে হঠাৎ
থেমে গেছে। না সামনে এগোচ্ছে না পেছনে যাচ্ছে।
একদমই স্থির। গাড়ির ভেতরে লাইট অফ থাকায়
বোঝা যাচ্ছে না ভেতরে কে বা কারা আছে। এখানে
থামল কেন বোঝা যাচ্ছে না। পেছনে থাকা গাড়িটাও
ফলো করতে করতে এসে থেমেছে তাদের থেকে
কিছুটা দূরে। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার হলেও
চাঁদের আলোয় সবটা পরিষ্কার। কানে বিঁধছে বিঁঝি

পোকার চিঁ চিঁ ডাক। এসব কিছুকে ছাপিয়ে হঠাৎ
গাড়ির ভেতর থেকে লাউডস্পিকারে গান বেজে উঠল,
“Kab Too Aayega Itna Bata De
Mujhko Bula Le Ya Apna Pata De
Tere Liye Baithee Hu Palke Bichhake
Aana Hai Toh Aaja Mujhe Le Ja Udake
Challa Challa Challa Challa, Challa Challa
Challa
Aana Hai Toh Aaja Mujhe Le Ja Udake
Mahee Mahee Mahee Mainu Challa Pawan
De
Khich Meree Photo Te Batwe Jala De
Mahee Mahee Mahee Mainu Challa Pawan
De.”এর পরপর দুটো গাড়ি থেকে দুটো ছেলে নেমে
গানের সাথে তালে তাল মিলিয়ে উড়াধুরা নাচতে শুরু
করল। কোনোদিকে তাকানোর নামগন্ধও নেই
তাদের, একমানে নাচতেই আছে। কেন নাচছে? কি
কারণে নাচছে কে জানে!এদিকে তাদের নাচ দেখে
পেছনের গাড়িতে থাকা ছেলেগুলো

হতবাক। তাদের মধ্যে রুবেল নামের ছেলেটাকে
গুঁতিয়ে আরেকজন

বলল,

-‘কি রে ভাই হেরা নাচে ক্যান? ওগোরে না বুইন
কিডন্যাপ হইছে?’

-‘বুইন টুইন রাখ শালা। ওরা কেরা আগে এডি
দ্যাখ?’

-‘ভাই, এডি তো সায়ন।’

-‘সায়ন? হেরে না তোফাজ্জল নজরে রাখছে তয় হেই
এইহানে ক্যা?’

-‘কে জানি? আপনে যেহানে আমিও তো সেকানেই
তাইলে আমি জানমু কেমনে?’

একথা শুনে আরেকজন আঁতকে উঠে বলল,-‘ভাই?
এইহানে তো সায়ন আর রুবাব তাইলে শুদ্ধ কই?
বস না কইছে শুদ্ধকে নজরে রাখতে? আমরা এতক্ষণ
এগোরে নজরে রাখছিলাম?’

এবার গাড়িতে থাকা প্রত্যেকের হুঁশ ফিরল। তারা
গাড়ি থেকে দ্রুত নেমে কাছে গিয়ে দেখল সত্যি সত্যি
সায়ন আর রুবাব। এদিকে দুজনে সমান তালে

নাচতেই আছে। এতগুলো ছেলে দেখে সায়ন নাচতে নাচতে বলল,

-‘এ্যাঁই কে রে তোরা? ডাকাত টাকাত নাকি? আমার আবার ডাকাতির সাথে নাচার খুবববব শখ। যাক আজ তাহলে শখটা পূরণ হয়েই যাবে।’

-‘ভাই আপনেনে নাচতেছেন ক্যান?’-‘আরে ভাই আর বলিস না, হঠাৎ করে কোমরের রগ চড়াৎ করে উঠল। তারপর আর সোজা হতেও পারছি না চিৎ-কাতও হতে পারছি না। কিহ্ মুসিবত ভাব তো? পরে আমার ভাই বলল নাচানাচি করলে নাকি ঠিক হয়ে যাবে, তাই নাচতেছি। একা একা নাচতে কি আর ভালো লাগে? তাই ছোটো ভাইটাকে সঙ্গে নিয়ে নাচতেছি..তোরা যখন এসে গেছিস তোরাও জয়েন কর। প্যারা নাই, এমনি এমনি নাচাব না আগে নেচে নি তারপর একসাথে গাঁজা টানব নে।’

সায়নের কথা শুনে ছেলে গুলো চোখ মুখ কুঁচকে পিছিয়ে গেল। তারপর দৌড়ে গাড়িতে উঠে চলে গেল শুদ্ধকে খুঁজতে। কারণ শুরু যদি চটুগ্রাম পৌঁছেও যায় তাহলে তাদেরও বেঁচে থাকার মেয়াদ শেষ। কারণ ইয়াসির পইপই করে বলে দিয়েছিল কড়া নজরদারি

করতে। কিন্তু কোন ফাঁকে শুদ্ধ বেরিয়ে গেছে বুঝে
উঠতেই পারল না তারা। সায়ন আর রুবাবকে দেখে
এখন স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। তাদের হেলেদুলে
নাচা দেখে মনে হচ্ছে নেশা করেছে। এখন এই
নেশাখোরদের সঙ্গে মাতলামি করে সময় কাটানোর
মানেই হয় না। অথচ তারা যদি আর একবার ঘুরে
তাকাতোও তাহলে দেখতে পেতো, কিভাবে সায়ন
আর রুবাব ক্ষীণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাদের
দিকে। ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই
সায়নের ফোনে কল এলো। দ্রুত কলটা রিসিভ
করতেই শুনতে পেলো সিঁতারার কান্নাস্বর। শখের
বলা কথা সায়নকে জানালেন সিঁতারা। সব শুনে
সায়ন বলল,

-‘থাক, মরা মানুষের নামে ক্ষোভ পুষে রেখো না
আম্মু, বাদ দাও এসব।’ ছেলের কথা শুনে সিঁতারা
প্রচণ্ড অবাক হলেন। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলল,

-‘মরা মানুষ মানে? কার কথা বলছি বুঝিস নি বাবা?
আমি আহনাফ..... ওই আহনাফের কথা বলছি।’

-‘আমিও।’

-‘আহনাফ মারা গেছে? কবে?’

-‘ওই যেদিন ওর যমদূত ওর পাপকর্ম সম্পর্কে
জেনেছে।’-‘ হেই বাবুই পাখি পালাচ্ছ বুঝি?’

কণ্ঠে দরদ মিশিয়ে ভীষণ আদুরে সুরে কথাটা বলল
ইয়াসির। তবে হঠাৎ এত কাছে ইয়াসিরকে দেখে
শীতলের শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠল।

অজানা আতঙ্কে ঘামতে লাগল। এদিকে গলাটাও
শুকিয়ে কাঠ। আতঙ্ক, ভয়ে বুকটা ধুকপুক করছে
ঠিকই কিন্তু তার মস্তিষ্ক পুরো সজাগ। তাকে বারবার
সংকেত পাঠাচ্ছে; স্বাভাবিক থাকতে হবে, চৌধুর
বাড়ির কেউ না পৌঁছানো অবধি নিজেকে সেইভ
করতেই হবে। নিজের সন্মান নিজে

রক্ষা করতে হবে। তার বিশুদ্ধ পুরুষের জন্য হলেও
সেইভ থাকতে হবে। তার কিছু হলে বিশুদ্ধ পুরুষটা
কষ্ট পাবে। আর বেঁচে থাকতে সে কখনো তার
কষ্টের কারণ হবে না। মেয়েটা সে বয়সে ছোটো হতে
পারে। দুনিয়া সম্পর্কে জ্ঞান কমতে থাকে পারে,
বোকা হতে পারে কিন্তু মনে এ কদিনে শুদ্ধর প্রতি
ভালোবাসা জমিয়েছে সেটা একদম খাঁটি। এই
ভালোবাসায় না আছে খাঁত ;আর না আছে
বিন্দুপরিমাণ স্বার্থ। আর সেই পুরুষটাকে

কষ্ট দেবে? দিয়ে নিজে ভালো থাকতে পারবে? ভালো
থাকাটুকুও পরের

হিসাব, সে কী বাঁচতে পারবে? পারবে না, পারবে না,
কখনো না কখনো যদি সে নিজে শুদ্ধর কষ্টের কারণ
হয়ে যায় নিজের অস্বস্তি মুছে ফেলবে পৃথিবী থেকে।

সে আজকাল তাকে ছাড়া কিছু ভাবতেও পারে না।

মাত্রই কদিন হলো সম্পর্কে জড়িয়েছে অথচ এখন

মনে হয় তাকে ছাড়া বাঁচায় অসম্ভব। তবে পরিস্থিতি

তো সব সময় একরকম থাকে না। ক্ষেত্রবিশেষ

পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। সহজ-

সরল, বোকা-সোকা,থাকাও ভালো কেনোনা বেশি

বুঝতে গেলে ঝামেলা। কিন্তু এতটা বোকা হওয়া

যাবে না যে অন্যের চাইলে সহজে ক্ষতি করতে

পারে। সে চৌধুরী বাড়ির মেয়ে। আর চৌধুরী বাড়ি

তার জন্য নিরাপদ স্থান হলেও বাড়ির বাইরে পদে

পদে বিপদ। সারা পথ কাঁটায় ভরা। এখন তাকে

কাঁটা দেখে পথ চলতে হবে..ঠিক ততক্ষণ চলতে হবে

যতক্ষণ না তার প্রিয় পুরুষটা তার কাছে এসে

পৌঁছায়। সে জানে শুদ্ধ আসবেই। পৃথিবীর যে

প্রান্তেই ইয়াসির তাকে লুকিয়ে রাখুক সেভাবেই হোক

শুদ্ধ সেখানে পৌঁছাবেই। শুধু শুদ্ধই নয় তার বাকি
ভাইরাও তাকে পাগলের খুঁজতে বের করবেই।
এটাই তার বিশ্বাস! তবে না পৌঁছানো অবধি নিজের
সন্মান নিজে রক্ষা করার দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু
একজন কিডন্যাপারের কাছে থেকে সে নিজেকে
কতক্ষণ সেইভ করতে পারবে? বা করা যায়? অচেনা
অদেখা মানুষটার সঙ্গে ভদ্রতার খাতিরে দুটো কথা
বলা যায়, সাহায্য করা যায়, কিন্তু বিশ্বাস? একবাড়িতে,
এতরাতে বিশ্বাসের ব্যাপারটা বোকামি হয়ে যায় না?
বলা বাহুল্য, সবচেয়ে মন্দ ঘটনাও যদি ঘটে যায় কিছু
করতে পারবে না সে। ফাঁকা বাড়িতে কেউ বাঁচাতেও
আসবে না। শুধুমাত্র তার অসহায়ত্বের সাক্ষী থাকবে
প্রানহীন জড়বস্তুগুলো। আবার নিজে নিজে একটা
কিছু করবে এটাও রিস্কি হয়ে যাবে। লোকটা যদি
তার অভিনয় ধরে ফেলে? রাগের বশে যদি....! আর
একজন সুঠাম দেহের পুরুষের শক্তির সাথে পেরে
উঠবে না। কখনোই না! বরং গায়ের শক্তি দেখাতে
গেলে হার নিশ্চিত। তাছাড়া লোকটা প্রচুর চালাক।
এতটাই চালাক এসে অবধি তার প্রতিটা কদমে
নজরবন্দী করছে। এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন ভেতরের

কথাগুলো পড়ে ফেলবে। এভাবে নজরবন্দি করলে
কিভাবে পালাবে সে? সে যে এখানে আছে শুদ্ধর
কাছে অন্তত একটা কু পাঠাতে হবে। আগেরবার
জানানোয় প্রাণে বেঁচেছিল। কিন্তু এবার? এবার
কেউই তার বর্তমান অবস্থার কথা জানে না! এমনকি
সে এখন কোথায় আছে নিজেও বলতে পারবে না।
রেস্টুরেন্টে স্বর্ণ ওয়াশরুমে গিয়েছিল এরপর বোনের
কি হলো? তাকে না পেয়ে নিশ্চয়ই পাগলের মতো
খুঁজে চলেছে। তার থেকে খবর পেয়ে বাবা-ভাইয়েরা
হন হয়ে খুঁজছে। বিশুদ্ধ পুরুষটার কানে ওর
নিঁখোজের কথা পৌঁছেছে তো? সে কি খুব বেশি
রেগে গেছে? বকছে খুব? বকলে বকুক, মারুক, যা
ইচ্ছে করুক তবুও নিতে আসুক। তার এখন খুব ভয়
লাগছে। অজানা ভয়ে অন্তর আত্মা শুকিয়ে মরুভূমি
হয়ে গেছে। এইটুকু সময়ে এসব নানান কথা ভাবতে
ভাবতে শীতল ঘেমে ওঠা হাতের তালু শক্ত করে
মুঠো করে ধরল। তারপর নিঃশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়ল।
নিজেকে সামলানোর আশ্রয় চেষ্টা চালাল। এরপর
টোক গিলে

মুখে হাসি এঁটে ধীরে ধীরে পেছনে ঘুরতেই দেখে
ইয়াসির কাছাকাছিই দাঁড়িয়ে আছে। ঈগল দৃষ্টিতে
তাকিয়ে আছে তার দিকে। চোখ, মুখে বেশ থমথমে
ভাব! তাকে এভাবে তাকাতে দেখে শীতল মাথা নিচু
করে খুতনী গলার সাথে ঠেকিয়ে নিলো। তারপর
আচমকা ঠোট ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে
বলল,-‘আমাকে রেখে কোথায় গিয়েছিলেন? এত বড়
বাড়িতে একা থাকা যায় নাকি? তাও এ রাতের
বেলা?’

ইয়াসির এখনো ঠান্ডা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার
অন্তর্ভেদী চাহনী যেন

মনের কথা পড়ে ফেলতে সক্ষম। তাকে এভাবে
তাকাতে দেখে শীতল ঢোক গিলে পুনরায় মিনমিন
করে বলল,

-‘একা বাড়িতে থাকার অভ্যাস নেই আমার।
অন্ধকারে প্যানিক এ্যাটাক হয়। নাক, মুখ দিয়ে রক্ত
বের হয়ে সেন্স হারিয়ে ফেলি। আমার বাড়ির মানুষের
কাছে আমাকে পৌঁছে না দেওয়া অবধি একা ফেলে
যাবেন না প্লিজ।’

একথা বলে শীতল হেঁচকি তুলে কেঁদে ফেলল।
আসলে কান্নাটা এতক্ষণ চাপিয়ে রাখলেও এবার আর
সম্ভব হলো না। অভিনয় ভালো জানে সে। কিন্তু তার
থেকেও বড় অভিনেতা তারই সামনে দাঁড়িয়ে, নতুবা
কিডন্যাপ করে এনে মনভোলা গল্প শোনায়ে? তাকে
অঝরে কাঁদতে দেখে ইয়াসির

এগিয়ে আসতেই শীতল দু'পা পেছনে পিছিয়ে গেল।
তাতে ইয়াসিরের রাগ হলো। ইচ্ছে করল একটা
থাপ্পড় বসিয়ে দিতে। কিন্তু এটা করলে এই মেয়েকে
এখানে রাখা মুশকিল হয়ে যাবে। তাই থমথমে সুরে
সে বলল,

-‘তোমার কেন মনে হলো আমি কোথাও গিয়েছিলাম?
তারমানে আমাকে সারা বাড়ি খুঁজেছো?’

-‘হুম।’

-‘পাও নি?’

-‘না।’

-‘কোথায়, কোথায় খুঁজেছো?’

-‘বেডরুম, ওয়াশরুম, রান্নাঘর আর ড্রয়িংরুম।’

-‘কিন্তু আমার কেন জানি মনে হচ্ছে তুমি আমাকে
নয় খুঁজেছো তোমার পালানোর পথ।’

-‘পালানোর পথ? কি আশ্চর্য, পালাব কেন?
এতরাতে পালিয়ে কোথায় যাব? তাছাড়া আপনি কী
আমাকে কিডন্যাপ করেছেন যে এ মাঝরাতে
পালাব?’-‘মিথ্যা কি রেগুলার বলো নাকি মাঝে
মাঝে?’

-‘সুযোগ বুঝে।’

-‘ভেরি গুড, আমিও।’

ইয়াসির একথা বলতেই শীতল ইয়াসিরের হাতে
স্বজোরে চিমটি কাটল। এত জোরে চিমটি দিয়েছে
জায়গাটা সাথে সাথে লাল হয়ে গেছে। তাকে হঠাৎ
চিমটি দিতে দেখে ভ্রঁ কুঁচকালে শীতল আমতা
আমতা করে বলল,

-‘আপনার সঙ্গে আমার কত মিল তাই চিমটিটা
দিলাম। লেগেছে খুব? আচ্ছা সরি।’

-‘পাকনামি সাইডে রেখে এবার খাবে চলো।’

-‘আপনার ফোনটা দিন বাবাকে কল করে আসতে
বলি। বাবা আসতে আসতে আমার খাওয়া-দাওয়া
হয়ে যাবে।’

-‘আমার কাছে কোনো ফোন নেই। বললাম না,
ডাকাতরা নিয়ে গেছে।’

-‘ওহ তাই তো। তা আশেপাশে দোকান-পাট নেই?
কল করা যাবে না?’

-‘না। এখন মধ্যরাত। আশেপাশের দোকানপাট বন্ধ।
কাল সকালে আমি নিজে তোমাকে বাসায় দিয়ে
আসব। এখন এসো খাবে, খেয়ে ঘুমাবে।’-‘কোথায়
ঘুমাব?’

-‘আমার বেডরুমে।’

-‘কিন্তু শুদ্ধ ভাই ছাড়া অন্যকারো বেডরুমে আমার
ঘুম আসে না যে?’

-‘তুমি শুদ্ধর রুমে ঘুমাতে? একসাথে, একবেডে?’

-‘না, একসাথে না তো। আসলে, শুদ্ধ ভাইয়ের
রুমটা খুব সুন্দর। যখন শুদ্ধ ভাই বাড়ি থাকে না
তখন আমি ওই রুমে ঘুমাই। কি যে শান্তি লাগে।’

-‘ও আই সি। তাহলে অন্য কারো বেডরুমে যখন
তোমার ঘুম আসেই না তাহলে এক কাজ করো,
আমার কোলে বসে বুকে মাথা রেখে ঘুমিও, ওকে?’

-‘কেন? আমি কী আপনার বেবি নাকি যে আমাকে
কোলে বুকে জাপটে ধরে ঘুম পাড়াবেন? তাছাড়া
আমার এত হ্যান্ডসার্ম বাবা চাই না, মানুষ মন্দ কথা
বলবে।’ একথা শুনে ইয়াসির চোয়াল শক্ত করে

তাকিয়ে রইল। ননসেন্স মেয়েটা বলে কি? আর
বেবিকেই পুরুষ মানুষ বুকে জড়িয়ে ঘুম পাড়ায়?
বউকে পাড়ায় না? নিজের মুখে স্বীকার করছে সে
হ্যান্ডসাম আবার বলে কী না সে নাকি হ্যান্ডসাম বাবা
চাই না! উদাহরণ দেওয়ার জন্য পৃথিবীতে আর
কোনো ডাক ছিল না? শেষে কী না বাবা!
মোদাকথা, তার নিজের কাছে নিজের ধৈর্যশক্তি দেখে
অবাক হচ্ছে। কবে এত ধৈর্য হলো তার? কবেই বা
মেয়ে মানুষের প্যানপ্যানানি শুনেও নিজেকে শান্ত
রাখা শিখল। আজ

শীতলের জায়গায় অন্যকেউ থাকলে হাল বেহাল
করত এতক্ষণে। কিন্তু
কেন জানি এই মেয়েটার খুব কাছে ঘেঁষতে পারছে
না। জোরজবরদস্তি করতে মন সায় দিচ্ছে না।
পুতুলের মতো আদুরে মুখটার দিকে তাকালে
অন্যরকম কিছু অনুভব করছে। হাত নাড়িয়ে তার
অনবরত কথা বলা, খিলখিল করে হাসা, দুষ্টুমি দেখে
বুকের ভেতরটা শীতলতায় শীতল হয়ে যাচ্ছে।
এতদিন কত নারী, কত দেহের স্বাদ নিয়েছে,
ধারণারও বাইরে। তাদের প্রতি কখনো মায়া হয় নি,

কাউকে এতটা আদুরে লাগে নি, বরং আগে সুন্দরী
মেয়ে পেলে দৈহিক কামনার দোহায় দিয়ে যন্ত্রণায়
কাতর করে তুলেছে। তার সংস্পর্শে যখন যেই
এসেছে শারীরিক যন্ত্রণায় সেই কুঁকড়ে উঠেছে। ভয়
পেয়েছে। বাঁচার জন্য কত আকুতি মিনুতি করেছে।
এমনকি চৌধুরী বাড়ির মেজো কন্যা স্বর্ণ অর্থাৎ
অগ্নিকন্যার ব্যাপারটাও এখন বড্ড ফিঁকে লাগছে।
সামনাসামনি দেখেও নজর যাচ্ছিল শীতলের দিকে।
অনুধাবণ করছে তার কাছে শীতলের ব্যাপারটা
সম্পূর্ণ আলাদা।

গতকালই বুঝেছে অগ্নিকন্যা তার কাছে কেবলমাত্রই
মোহ। আর মোহের পেছনে দৌড়ে সময় নষ্ট করার
মানেই না। এতদিন মোহকেই মায়া ভেবে
একই জপ জপে গেছে, কিন্তু আর না। সে বুঝে গেছে
তার অবুঝ মনের কথা, অনুভূতির কথা, উপলব্ধির
কথা। কিন্তু সে তো ভালোবাসার রুলস জানে না।
কোন নিয়মে ভালোবাসতে হয় তাও জানে না। শুধু
জানে এই

পিচ্চি মেয়েটার সঙ্গে তার ভালোই লাগছে। তার বোকা
বোকা কথায় খুব হাসতে ইচ্ছে করছে, পালাতে গিয়ে

ধরা খেয়ে যখন কেঁদে ফেলল তখন কী যে মিষ্টি লাগছিল দেখতে। ইচ্ছে করছিল গাল দুটো টেনে দিয়ে জোর করে হলেও চুমু খেতে। কিন্তু সেসব করতে গেলে ভয় পেয়ে ঘাবড়ে যেতে পারে তাই সে থমথমে মুখে তাকিয়ে দেখছিল। কিন্তু তাকে তাকাতে দেখে

শীতল ভাবল সে আবার রেগে গেছে। তাই বলল,-‘নুড়ুলস খাওয়ার মুড চলে গেছে। এখন খাব না কিছু। আমাকে একটু ঠান্ডা পানি দেন।’

-‘আমার মা, বোন, বউ কেউ নেই। আমি জানি না কোনো মেয়ের সাথে কীভাবে মিষ্টি মিষ্টি করে কথা বলতে হয়। না খেতে চাইলে কীভাবে হাতে তুলে খাওয়াতে হয়। কীভাবে তাদের মন ভালো করতে। মেয়িলি ব্যাপার বুঝতে আগ্রহী ছিলাম না কখনো। সেসব আমার পেশার সঙ্গে যায়ও না।

শুরু থেকেই তোমাকে যথেষ্ট ভদ্রতা দেখাচ্ছি। নিজেও ভদ্র হয়ে আছি।

তবে জানো তো বাবুই, ভদ্রতাকে সাইডে রাখলে আমি খুব রুড পারসন।

এতটাই রুড যে তুমি নিতে পারবে না। তাই বলছি,
কথা বাড়িও না খাবে এসো।'একথা বলে ইয়াসির
শীতলকে টেনে ডায়নিং টেবিলে নিয়ে গেল। মজার
ব্যাপার হচ্ছে, এত ডিশের মধ্যে নুডলস নেই। টেবিল
ভর্তি সব ইটালিয়ান খাবার। শীতল ড্যাব ড্যাব করে
তাকিয়ে প্লেট নিজের দিকে টেনে নিলো। বুকের
ভেতরটা ধুকপুক ধুকপুক করছে। আল্লাহ জানে,
খাবার কোনো কিছু মেশানো টেশানো আছে কী না।
এবার খাবে না বললে যদি রেগে যায়? বা কোনো
সন্দেহ করে? সে ভয়ে ভয়ে মুখে খাবার দিয়ে
চিবানোর আগে ইয়াসির বেশ নরম সুরে বলল,
-‘বাবুই? আমি মনের কথা চেপে রাখতে পারি না।
এতক্ষণ মনের সঙ্গে যুদ্ধ করলাম ঠিকই বাট পারলাম
না। আসলে তোমাকে আমার ভীষণ ভালো লেগেছে।
ভালোলাগার ধরণ বিয়ে করে বউ করার মতো। প্লিজ
আমার কাছে থেকে যাও।' -‘আমারও আপনাকে ভীষণ
ভালো লেগেছে। বিশেষ করে ওই নীল চোখ দুটো।
আমি সিঙ্গেল হলে ক্রাশ খেতাম। আপনি না বললেও
ওই চোখের মায়ায় পড়ে আপনার গলায় বুলে

পড়তাম। কিছুদিন আগে এলে কিছু করা যেতো কিন্তু এখন তো আর সম্ভব না।’

–‘কেন সম্ভব না?’

–‘কারণ আমি বর্তমানে এক পুরুষে আসক্ত। আমার একটা বিশুদ্ধ পুরুষ আছে। তাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি। আমার পুরো পৃথিবী একদিকে আর আমার ব্যক্তিগত পুরুষ আরেকদিকে। আমি ছোটো মানুষ ভেবে ভাববেন না তাকে ছোটো করেই ভালোবাসি। মোটেও তা নয়, তাকে আমার পুরোটা দিয়েই ভালোবাসি। নিঁখোজ হয়ে এই যে আমি এখানে,

আমার বিশুদ্ধ পুরুষের মনের অবস্থা আমি দূরে থেকেও অনুভব করতে পারছি। আমি এটাও জানি সে পাগলের মতো আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সে আবার অন্য ধাঁচের পুরুষ কী না, যদি জানে আপনার সঙ্গে অহেতুক বকবক করেছি তাতেও রেগে যাবে। আর যদি জানে ক্রাশ খেয়েছি তবে

আমাকে জ্যান্ত কবর দিবে।’–‘ভুলে যাও তাকে। আমি তোমাকে নতুন করে ভালোবাসতে শেখাব।’

-‘ না, আপনি বরং অন্য মেয়ে বেছে নিন ঘটকালি নাহয় আমিই করব।’

একথা শুনে ইয়াসির ঠান্ডা দৃষ্টি ছুঁড়ল শীতলের দিকে। শীতল নির্বিকার ভাবে মুখে খাবার দিয়ে ধীরে ধীরে চিবাতে লাগল। তখন ইয়াসির আবার বলল,

-‘ আমার হয়ে থেকে যাও এক পৃথিবীর সুখ এনে দেবো তোমার কাছে।’

-‘সুখে না থাকলে সুখে থাকার লোভ করতাম। কিন্তু আমি তো সুখী। কে নেই আমার? কি নেই? আমার সব আছে, সবাই আছে, তাহলে আপনার কাছে কেন থাকব?’

-‘ তাহলে প্রমাণ হয়ে গেল পালাচ্ছিলে তুমি। কিন্তু কেন?’

-‘কারণ আমি বুঝে গেছি আপনি আমাকে কিডন্যাপ করে এনেছেন।’

-‘কিডন্যাপ করলেও কী মেরেছি নাকি বকেছি? কিছুই তো করি নি। খুব

আদরে রাখতে চাচ্ছি ভালো লাগছে না, না?’ শীতল চোখ তুলে তাকাল না। এতক্ষণ অভিনয় করতে করতে নিজেরও অসহ্য লাগছে। ইচ্ছে করছে কাঁটা

চামচটা এই হতচ্ছাড়ার চোখে ঢুকিয়ে দিতো।
টেনশনে তার শ্বাস আঁটকে আসছে আর এই লোক
কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করেই যাচ্ছে। তবে সে
রাগ দেখাল না। হাসল না। এমনকি ভয়ও পেল না।
তবে নিজেকে যথেষ্ট শান্ত রেখে হাসি মুখে পাল্টা প্রশ্ন
ছুঁড়ল,

-‘আমার বোন কোথায়? অগ্নিকন্যা ডাকেন আমার
বোনকে অথচ আজ কিডন্যাপ করলেন আমাকে, কিন্তু
কেন?’

ইয়াসির এবার অবাক হলো। প্লেটে নাড়াচাড়া করতে
থাকা চামচ থেমে গেল। সে ভ্রুঁ কুঁচকে বলল,

-‘তুমি জানলে কিভাবে?’ শীতল জবাবের আশেপাশে
না গিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। চোখে মুখে
দুষ্টুমির ঢেউ। এই মুহূর্তেও ইয়াসির চেয়ারে হেলান
দিয়ে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল। নিশ্চুপ হয়ে কতক্ষণ
দেখল চঞ্চলাবতীর মিষ্টি চঞ্চলতা। এরপর নিজেও
ফিচেল হেসে বলল,

-‘প্রয়োজনে শুদ্ধকে মেরে দেবো তবুও তোমাকে আমি
ছাড়ছি না বাবুই পাখি। একদমই ছাড়ছি না!’

একথা শুনে শীতলের হাসির বেগ যেন দ্বিগুন বাড়াল।

সে হাসতে হাসতে

জবাব দিলো,-‘ আমি ততক্ষণ পর্যন্ত বোকা যতক্ষণ
আমার আপনজনরা সুস্থ থাকে।

নয়তো আমিও কিন্তু চৌধুরীদেরই রক্ত!ওহ হ্যাঁ কি
যেন বললেন, আমার বিশুদ্ধ পুরুষকে মারবেন? মারা
তো দূর, তার দিকে শুধু হাত বাড়িয়েই দেখুন না,
হাতটা হাতের জায়গায় রাখি কী না!-‘প্রয়োজনে
শুদ্ধকে মেরে দেবো তবুও তোমাকে আমি ছাড়ছি না
বাবুই পাখি। একদমই ছাড়ছি না!’

একথা শুনে শীতলের হাসির বেগ যেন দ্বিগুন বাড়াল।

সে হাসতে হাসতে

জবাব দিলো,

-‘আমি ততক্ষণ পর্যন্ত বোকা যতক্ষণ আমার
আপনজনরা সুস্থ, নয়তো আমি কিন্তু চৌধুরীদেরই
রক্ত! কি যেন বললেন, আমার বিশুদ্ধ পুরুষকে
মারবেন? মারা তো দূর, শুধু হাত বাড়িয়ে দেখুন
হাতটা হাতের জায়গায় রাখি কী না!’-‘বয়স কত
তোমার? সিক্সটিন, সেভেনটিন অর এইটটিন?’

-‘বয়স যতই হোক ফিডার খাওয়ার বয়স অন্তত
পেরিয়ে এসেছি।’

-‘আমার তোতাপাখি এত কথা বলে জানতাম না
তো?’

-‘প্যারা নিয়েন না ফিরে যাওয়ার আগে আরো অনেক
কিছু জানবেন।’

-‘ফিরতে দিলে তো।’

-‘আমি ফিরবোই! বাবা-মায়ের চিন্তা আমি করি না
কারণ আমার বোন

সব সামলে নেবে। কিন্তু ওই যে একজন মুড়ি পুরুষ
আছে না? তার জন্য হলেও আমাকে ফিরতে
হবে।’-‘জানো আমার একটা বন্ধু ছিল। তাকে আমি
খুব বিশ্বাস করতাম। খুব ভালোবাসতাম। সেও
আমাকে ভীষণ ভালোবাসত। একদিন করল কী;
আমাকে ডেকে হুমকি দিলো তাকে আমার ব্যবসার
শেয়ার দিতে হবে। নয়তো সে নাকি সব ফাঁস করে
দেবে। আমিও রাজি হয়ে তাকে বাসায় ডাকলাম।
দু’জন ব্রান্ডের ওয়াইন পান করে ঘুমিয়ে গেলাম।
তারপর কী হলো জানো বাবুই? সকালবেলা আমি ঘুম
থেকে উঠলাম ঠিকই কিন্তু সে আর উঠলই না। কত

করে ডাকলাম আমার ডাক শুনলোই না। প্রশান্তির ঘুম ঘুমাচ্ছে ভেবে আমিও বিরক্ত না করে চলে গেলাম সুদূর নিউইয়র্ক। এক সপ্তাহ পর ফিরে দেখি সে তার বাড়ি চলে গেছে। টানা চারদিন নাকি মরার মতো ঘুমিয়েছে। ঘুমানোই স্বাভাবিক ওয়াইনের সাথে সেদিন কড়া ডোজের ঘুমের মেডিসিন মিশিয়েছিলাম কী না! হয়তো সেও বুঝেছিল।

এরপর খবর এলো আমার গোপন কিছু ডিলের কথা পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছে। বন্ধুরা দুষ্টামি করবে স্বাভাবিক তাই না? দুষ্টামি ভেবে মাফ করে দিলাম। এরপর দেখি আবার আমার কাজে বাঁধা হচ্ছে সে, পরে ভুলিয়ে ভালিয়ে আমার ডেরায় আনলাম। কত সুন্দর করে বোঝালাম এসব না করতে। কিন্তু সে আমার কথা শুনলোই না। পরে যত্ন করে তাকে বালির

মধ্যে গলা অবধি বালিতে পুঁতে শিরোচ্ছেদ করলাম। চমৎকার হয়েছিল ওর শিরোচ্ছেদ করা। শিরোচ্ছেদ কি বুঝো তো বাবুই?’-‘হুম।’

-‘বলো তো কি?’

-‘মাথা কেটে ফেলা।’

-‘আরে বাহ্, তুমি তো দেখি খুব ইন্টেলিজেন্ট গার্ল।’

-‘কিন্তু এই ঘটনা আমাকে কেন শোনালেন? আমরা তো কেউ আপনার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ায় নি। বরং আপনিই শুরু থেকে আমাদের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। চৌধুরী বাড়ির অশান্তির কারণ হয়েছেন। তাহলে আমাদের উচিত না আপনার নিয়ম অনুযায়ী আপনাকেও বালিতে পুঁতে শিরোচ্ছেদ করা?’

-‘ভদ্র মেয়েরা এভাবে কথা বলে না বাবুই এবার কিন্তু রাগ হচ্ছে আমার।’

-‘রাগ হচ্ছে? ওমা কেন? আচ্ছা রাগ কমানোর মলম আবিষ্কার হয়েছে?’

হয় নি, তাই না? আপনি নাকি সায়েন্টিস্ট একটা আবিষ্কার করে ফেলুন না, সমশের ভাই? সাধারণ জনগণের অনেক উপকার হবে কিন্তু। ধরেন, কেউ রেগে গেল ফট করে তার বাড়ির লোক রাগের মলম তার কপালে লাগিয়ে দিলো, ব্যস রাগ চলে গেল। কি দারুণ ব্যাপার তাই না?’-‘আমি কোনো সায়েন্টিস্ট না বাবুই আমি মাফিয়া। মাফিয়া কাকে বলে জানো?’

-‘জানি তো। এটাও জানি আপনি স্মাগলিং, অস্ত্র ব্যবসা, মানি লন্ডারিং এর কাজ করেন। বাংলাদেশে

আপনার কয়েকটা সিক্রেট ডেনও আছে। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, সেসব জায়গার একটা জায়গায় আমরা এখন আছি।’

-‘ওহ লাভলি! ব্রাভো বাবুই, ব্রাভো! আর কি জানো আমার ব্যাপারে?’

-‘আর? আর..আর ওহ হ্যাঁ মনে পড়েছে আপনার প্রিয় খাবার নারীদেহ।

সুন্দরী নারী খুব যত্ন করে খান আপনি। দোয়া করি, আপনার সঙ্গী যেন ঠিক আপনার মতোই হয়। সেও যেন হাজার জনের বিছানা ঘুরে এসে আপনার সঙ্গের সঙ্গী হতে পারে।’ইয়াসির হাসল। তবে হাসতে হাসতে শক্ত হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে এমন একটা থাপ্পড় দিলো শীতলের ঠোঁটের সাথে দাঁত লেগে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এলো। আচমকা আক্রমণে প্রতিরোধ করার সময়টুকুও পেল না শীতল। তবে নোনতা ভাব অনুভব করে বুঝল ঠোঁট কেটেছে, জিহবাটাও কেটেছে। সে কাটা ঠোঁট চেপে ধরে হাসল। আবার প্রমাণ হলো পৃথিবীতে হাজার হাজার সুদর্শন পুরুষ থাকলেও শুদ্ধর মতো কেউই হতে পারবে না। কেউ তার অহেতুক বকবক শুনবে না।

রাগও দেখবে না। অভিমানও বুঝবে না। যেমন ইয়াসির তাকে এখানে আনার পর থেকেই কত আদুরে সুরে কথা বলে যাচ্ছিল। ডাকের কী বাহার! বা..বাবুই! কিন্তু একপর্যায়ে হাল ছেড়ে তো ঠিকই তাকে রক্তাক্ত করল। এক নিমিষেই আদর শেষ।

তবে তাকে দুর্বল ভেবে কাজটা করলেও শীতলও যে চৌধুরীদের জাত এটা ভুললে চলবে না। সে ওড়নায় দিয়ে রক্ত মুছে বলল,-‘ মারলেন কেন?’

-‘ইচ্ছে হলো তাই।’

-‘ইচ্ছে হলে মারতে হবে? আমি আমার বাবার হালাল কামাই খেয়ে বড় হয়েছি আপনার মতো মাফিয়ার হারাম টাকা নয়। তাহলে আপনি কেন রক্তাক্ত করলেন?’

একথা বলে শীতল তড়িৎ কাঁটা চামচ তুলে ইয়াসির হাতে গেঁথে দেওয়ার আগে ইয়াসির খপ করে হাতটা ধরে নিলো। বিদ্যুৎ গতিতে ওর পুরুষালি শক্তপোক্ত শরীর দিয়ে শীতলকে পেছনে থেকে জড়িয়ে ধরল। শীতলের আর ক্ষমতা নেই নিজেকে ছুঁটানোর। এখন নড়তেও অক্ষম সে। তার এই হাল দেখে ইয়াসির শব্দ করে হেসে উঠল। এইটুকু একটা বাচ্চা সে কি না

তাকে আক্রমণ করতে আসছে, ভাবা যায়! ব্যাপারটা তার কাছে মজাই লাগল। তারপর সে একহাতের মুঠোয় শীতলেন দুহাত চেপে আরেকটা হাত দিয়ে শীতলের মুখের সামনে আসা চুলগুলো সরাল। লম্বা বিনুনিটা নেড়ে চেড়ে দেখল। এরপর বিনুনির আগা ধরে সেটা সাপের মতো করে টেনে এনে শীতলের গালে ঠেকিয়ে মুখ বলল, ‘ফুঁস!’ একাজ করে নিজে হো হো করে হেসে শীতলের মসূন কাঁধে খোঁচা খোঁচা দাঁড়িওয়ালা খুতনি ঠেকাল। এই পিচ্চির রাগও আছে? সে তো আলাভোলা ভেবেছিল। তবে মানতেই হয় এই মেয়েও চালাক, প্রচুর চালাক। সে আসলে বোকা সেজে থাকে। একথা ভেবে সে শীতলের রক্তাক্ত ঠোঁটে দৃষ্টি ফেলে বলল, -‘কোথায় লেগেছে, দেখি?’ শীতল নিজেকে ছাড়ানোর বৃথা চেষ্টা করে রাগে হিসহিসিয়ে জবাব দিলো,

-‘ছাড়ুন। অসভ্যের মতো জড়াজড়ি না করে দূরে সরে ভদ্রভাবে কথা বলুন। অসহ্য লাগছে কিন্তু আমার। ছাড়তে বলেছি!’

-‘অসভ্য মানুষ অসভ্যতামি করবে এটাই তো স্বাভাবিক, তাই না?’

শীতল জবাব দিলো না ঘৃণার দৃষ্টি ছুঁড়ে অন্যদিকে
তাকাল। রাগে শরীর রি রি করছে তার। এত সুদর্শন
হয়ে কী লাভ যদি পারসোনালিটি ফিরো লেভেল পার
করে! তখন ইয়াসির তার রক্তাক্ত ফোলা ঠোঁটে এক
দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল,-‘রাগ করলে সোনা?
আচ্ছা সরি আর মারব না। বাড়ি যাবে? চলো দিয়ে
আসি?’

একথা শুনে শীতলের ছটফটানি থেমে গেল, সে
এবার অবিশ্বাস্য চোখে তাকাল। ইয়াসিরের হাসি-হাসি
মুখ দেখে বোঝার চেষ্টা করল সত্যি নাকি মজা।
তাকে এভাবে তাকাতে দেখে ইয়াসির এবার নিষ্পাপ
মুখে বলল,

-‘আমি ভ্যাম্পায়ার নই তবুও রক্তের তৃষ্ণা পাচ্ছে, কি
করে বলো তো?’

-‘এখন কি আমার হাত কেটে আপনাকে রক্ত
গেলাতে বলছেন?’

-‘উহুম, সেসব কিছু করতে হবে না। শুধু একটা কাজ
করবে তাহলেই বাড়ি যেতে পারবে, করবে?’

-‘হেয়ালি না করে বলুন নয়তো ছাড়ুন। আপনার
পারফিউমের গন্ধে গা গুলাচ্ছে আমার।’

-‘আমি একপ্রকার জানোয়ার হলেও আমার রুচি
সর্বদা হাই লেভেলের স্নো হোয়াইট। আমার পোশাক
থেকে শুরু করে সব ব্রান্ডের। আর আমি
জানি আমার পারফিউমের সুগন্ধে তোমার পাগল
পাগল লাগছে তাই একথা বলছো।’-‘পাগল-পাগল না
ছাঁই। আপনার পারফিউমের থেকে শুদ্ধ ভাইয়েরটা
আরো বেশি জোশ। একদম খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে
করে। আসছে,,’আমার সবকিছু ব্যান্ডের।’

শেষের কথাটা তাচ্ছিল্য করে টেনে বলতেই ইয়াসির
হাতের বাঁধন এতটা শক্ত করল যে শীতল ছটফটিয়ে
উঠল। তবুও ইয়াসির ছাড়ল না। যখন কেঁদে ফেলল
তখন ঠান্ডা সুরে বলল,

-‘কেউ আমাকে ছোটো করতে চাইলে আমি তাকে
জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে ফেলি। যেন পরবর্তীতে একাজ
করার সুযোগ না পায়। কিন্তু তুমি এসে অবধি
বারবার এটাই করছো। আমার কিন্তু পছন্দ হচ্ছে না
বাবুই পাখি। একদমই পছন্দ হচ্ছে না। আমাকে
রাগিও না, রাগের ফল আমার জন্য তৃপ্তিদায়ক হলেও
তোমার জন্য হবে না।’

শীতল এবার আর টু শব্দও করল না। কারণ সে ইয়াসিরের কথার মানে বুঝেছে। তাকে চুপ হতে দেখে ইয়াসির বলল,-‘ যাবে বাড়ি? গেলে বিনিময়ে শুধু একটা কাজ করে দেখাও।’

শীতল মুখে জবাব দিলো না তবে চোখ তুলে তাকাল। তখন ইয়াসির আরেকটু গা ঘেঁষে কানে কানে ফিসফিস করে বলল,

-‘বিনাবাঁধায় তোমার ঠোঁটের স্বাদ নিতে দাও। প্রমিস, ছেড়ে দেবো।’

একথা বলতে না বলতেই ইয়াসিরের হাতের ঘড়িটা পিক পিক শব্দ করে উঠল। সে ভ্রুঁ কুঁচকে আশেপাশে তাকিয়ে কাউকে না পেয়ে সন্দেহের দৃষ্টি ছুঁড়ল শীতলের দিকে। ইয়াসির শীতলকে চেপে ধরলে শব্দটা যেন আরো জোরালো হচ্ছে। সে শীতলকে ছেড়ে দু’পা পিছিয়ে আপাদমস্তক নজর বুলিয়ে বলল,

-‘তোমার কাছে কি লুকিয়ে রেখেছ বের করো বলছি। বাবুই রাগিও না আমাকে, তোমাকে বারবার আঘাত করতে খারাপ লাগবে আমার।’

শীতল তার কথা বুঝলেও গোঁ বেচারা মুখ করে
তাকিয়ে রইল। তারপর নিজে নিজের দিকে তাকিয়ে
বলল,

-‘খালি হাত-পা নিয়ে আপনিই তো আমাকে তুলে
নিয়ে এসেছেন। আমি আবার কি লুকিয়ে রাখব? যাই
হোক, আপনি কি আমার চোর বলতে
চাচ্ছেন?’ ইয়াসির শীতলের কথার ফাঁদে পা দিলো না
বরং ভূতগ্রস্তের মতো তার হাতটা টেনে শরীর চেক
করতে লাগল। শীতল বাঁধা দিতে গেলেও শুনল না।
একপর্যায়ে ইয়াসির কামিজে হাত দিতে গেলে হাতের
ঘড়িটা আবার শব্দ করতে লাগল। ইয়াসির এবার
তাকিয়ে দেখল হাতের রিং যতবার তার ঘড়িতে
লাগছে ততবারই তার ঘড়িটা শব্দ করতে উঠেছে।
সে রিং খুলতে গেলে শীতল কিছুতেই খুলতে দেবে
না। এবার কেঁদে ফেলল সে। কত আকুতি-মিনুতি
করল তবুও ইয়াসির ছাড়ল না। রিং খুলে চেক করে
দেখে তার সন্দেহই সঠিক। রিং এ Gps কানেক্টে
করা। তারমানে এখানে থাকা ঠিক হবে না। ধারণা
মতে, এতক্ষণ কেউ তাদের লোকেশন ট্র্যাক করে
ফেলেছে। সে এবার রাগের বশে শীতলকে আরেকটা

থাপ্পড় মেরে হিসহিসিয়ে বলল,-‘কি ভেবেছিলি আমাকে ফাঁকি দিবি? পরে দেখছি তোকে আগে এখান থেকে বের হই।’

একথা বলে শীতলের হাত ধরে টানতে টানতে তাকে বাইরে নিয়ে গেল।

যেতে যেতে এতক্ষণ লুকানো ফোনটা বের করে তার সহকারীকে বলল নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার জন্য। গাড়ি করে ইয়াসির এবার শীতলকে নিয়ে গেল আরেকটা ডেরায়। সেখান থেকে পাড়ি দেবে দেশের বাইরে।

এদিকে চারদিকে ফজরের আজান দিচ্ছে। শুদ্ধ আর হাসান জেট থেকে নেমে হেঁটে যাচ্ছিল চা বাগানের দিকে। চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে পুরনো চা বাগান আছে। লোকেশন আপাতত সেদিকেই শো করছে। হঠাৎ ট্রাক করা লোকশন আর শো ই করছে না। রিং যেখানে থাকবে লোকেশনটাও সেখানেই স্থির। কিন্তু গোল চিহ্নের লাল দাগ দেখা যাচ্ছে না। অর্থাৎ রিং এর জিপিএস কেউ ডিসকানেক্ট করে দিয়েছে। ফোনের দিকে তাকিয়েই

হাঁটতে হাঁটতে শুদ্ধ এবার থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তার হার্টবিট যেন থমকে গেছে। শীতল জান থাকতে কখনোই রিং খুলবে না। তাহলে কি ধরা পড়ে গেল? নাকি ইয়াসির ধরে ধরেছে? তা নাহলে লোকেশন শো করছে না কেন? শুদ্ধকে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে যেতে দেখে হাসান ওর কাঁধে হাত রেখে বলল,-‘ কি রে চল?’

শুদ্ধ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হাতে থাকা ফোনের দিকে। তবে কি সব শেষ? তার মুখ দেখে হাসানের ভ্রুঁজোড়া কুঁচকে গেল। সে শুদ্ধর নজর অনুসরণ করে ফোনে উঁকি মারতেই দেখে লোকেশন শো করছে না। সে হতবাক হয়ে কিছু বলার আগে শুদ্ধ আকাশের দিকে তাকাল। চারদিকে তখনো ঘুটঘুটে গাঢ় অন্ধকার। দূরে কোনোমসজিদ থেকে আজান ভেসে আসছে। শুদ্ধর জানে না আজ তার কি হলো! বুকের ভেতরটা এ করছে কেন। মনটাই বা কু-ডাকছে কেন। চোখ বন্ধ করলেই শীতলের ব্যথাতুর, কান্নারত মুখখানা চোখের পাতায় ভাসছে কেন। সে শুকনো ঢোক গিলে পুনরায় আশপাশে তাকাল। তারপর জোরে জোরে শ্বাস টেনে বুকের বাঁ পাশে হাত

রাখল। এখন অবধি কোনো পরিস্থিতি তাকে কারু
করে পারে নি। সে সর্বদা শান্ত, নিশ্চল। কিন্তু এখন
কেন জানি অজানা একটা ভয়ে মনটা বড্ডব্যাকুল
হয়ে উঠেছে। সে কিছু ভেবে আকাশের দিকে
তাকাল।

তারপর থেমে থেমে শুধু এইটুকু উচ্চারণ করল,-‘ইয়া
আল্লাহ্, হয় ওকে সহি সালামতে পাইয়ে দাও নয়তো
আমার মৃত্যুও এখানেই লিখে রেখো।’

একথা শুনে হাসান ছলছল চোখে তাকাল শুদ্ধর দিকে
তারপর শুদ্ধর কাঁধে হাত রেখে বলল,
-‘কিছু হবে না বন্ধু, আল্লাহ্ ভরসা।’

শুদ্ধ নিশ্চুপ। পরপর ক’বার ঢোক গিলে পুনরায়
তাকাল ফোনের দিকে।

না, কোনোভাবেই কাজ হচ্ছে না। ওদিকে অর্ক,
কামরান নজর রাখছিল

ল্যাবে বসেই। কিন্তু লোকেশন শো না করায় তারাও
অনবরত ফোনকল দিতে থাকল শুদ্ধকে। তারা সঙ্গে
না এলেও বুঝেছে এখন শুদ্ধের মনের অবস্থা। কিন্তু
শুদ্ধ কল রিসিভ করল না দেখে ওরা কল করল
হাসানকে। হাসান কল রিসিভ করে জানাল সত্যি

সত্যি লোকেশন ট্রেস করা যাচ্ছে না। একথা শুনে
সবার চিন্তা বেড়ে গেল। হঠাৎ শুদ্ধ ভোরের আকাশের
দিকে তাকিয়ে মুখের কাছে হাত রেখে উচ্চশব্দে
ডেকে উঠল,' হেল্প মি

এঞ্জেলিকা! প্লিজ হেল্প!' পরপর তিনবার ডাকতেই
হঠাৎই “কুঁ....কুঁকুঁ...” স্বরে সাড়া দিলো সাদা ধবধবে
একটা পায়রা। পুরো শরীরই সাদা। এক কথায়
চমৎকার তার রূপ! শুদ্ধর ডাক শুনেই চিলের মতো
দূর আকাশ থেকে তাকে নিচে নেমে আসতে দেখা
গেল। নিজের মালিক ডাকমাত্রই

সাড়া দিতে পেরে সে খুশিতে পাখা ঝাপটাতে-
ঝাপটাতে একের পর এক
ডিগবাজি মারতে মারতে উড়ে এলে বসল শুদ্ধর
বাড়িয়ে দেওয়া হাতের উপর। তারপর অনবরত
ডাকতে থাকল, “কুঁ... কুঁকুঁ...”।

শুদ্ধ তার মাথায় হাত বুলালে সে তালুতে মাথা
রাখল। অর্থাৎ তার আরো আদর চায়। কিন্তু এখন
হাতে একদমই সময় নেই। তাই শুদ্ধ তার মাথায় চুমু
এঁকে ফোন থেকে শীতলের সুস্পষ্ট ছবি দেখাতেই
এঞ্জেলিকা হঠাৎ

ফুডুং করে উড়ে চলে গেল। উড়তে উড়তে একবার
পেছনে ঘুরে তাকাল

শুদ্ধর দিকে। তারপর ডান দুটো ঝাপটে ধীরে ধীরে
আরো উপরে উড়তে লাগল। একটুপরেই শুদ্ধর
ফোনে পরপর নোটিফিকেশন আসতেই বুঝল

এঞ্জেলিকার কাছে থাকা ড্রোনে সব দেখা যাচ্ছে।
ফজরের আজান পরও

অন্ধকার থাকায় আকাশ থেকে নিচের তেমন কিছু
স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

শুদ্ধ হাসানের দিকে তাকাতেই হাসান সম্মতি সূচক
মাথা নাড়িয়ে হাসল কেবল। কারণ এঞ্জেলিকা থাকলে
শুদ্ধ ঠিক পাবে শীতলের খোঁজ। আর

মালিকের মতোই জেদি এঞ্জেলিকা শীতলের খোঁজ না
নিয়ে ফিরবে না। নোটিফিকেশন যখন আসছেই
দাঁড়ানোর সময় নেই তাই তারাও দৌড়ে গিয়ে
গাড়িতে উঠে বসল। জেট থেকে নেমেই স্যান্ডি গাড়ির
ব্যবস্থা করে দিয়েছিল তাদের। ততক্ষণে সকালের
নরম আলো ফুটতে শুরু করেছে।

এঞ্জেলিকার ড্রোনে দেখা যাচ্ছে সে কোনদিকে যাচ্ছে।
যেতে যেতে দেখা গেল পুরনো এক বিল্ডিংয়ের
উপরেই চক্রাকারে ঘুরছে। শুদ্ধ জুম করে
দেখল কেউ একজন কাউকে কোলে করে নিয়ে
যাচ্ছে ওই বিল্ডিংয়ের

ভেতর। এঞ্জেলিকাও দূর আকাশ থেকে মাটির দিকে
ধীরে ধীরে নামছে। তারমানে সে নিশ্চয়ই শীতলকে
দেখেছে!_ 'ভালো হচ্ছে না কিন্তু ছাড়ুন বলছি, ছাড়ুন।'
_ 'এত সহজে না।'

একথা বলে শীতলের হাত ধরে টানতে টানতে
ইয়াসির বাইরে বেরিয়ে এলো। সকালের ঠান্ডা
বাতাসে শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। মাথার উপর স্বচ্ছ
সুনীল আকাশ। দু'একটা কাক হেঁড়ে গলায় ডাকতে
ডাকতে উড়ে যাচ্ছে নিজের গন্তব্যে। এখান থেকে
কয়েক মিনিট হাঁটলে দেখা মিলবে একটি নদী। শান্ত
নদী ছোটো ছোটো স্রোতে বয়ে নিয়ে চলেছে নিজস্ব
নিয়মে। সম্ভবত এটা মেঘনা নদীরই শাখা। তবে
জায়গাটা একেবারেই সুনশান। এখান থেকে লোকালয়
আরো অনেক দূরে। ইয়াসির শীতলের হাত ধরে

টেনে নিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। এবং
শীতলের হাতটা ছেড়ে দিয়ে পেছনে ঘুরে মুচকি
হাসল। ছাড়তে দেখে শীতল এবার বিস্ময় নিয়ে
তাকালে ইয়াসির বলল,

-‘আচ্ছা আমি ভিতুর মতো পালাচ্ছি কেন? ভয় পায়
নাকি ওই শুদ্ধকে?’

মোটোও না! তাহলে শুধু শুধু পালানোর মানেটা কি?
উফ! বুঝলে বাবুই

তোমার বোকা হওয়ার রোগটা বোধহয় আমার উপরে
ভর করেছে। তা নাহলে আমি ইয়াসির খান এমন
করার তো কথা না।’-‘শুদ্ধ ভাই? কই শুদ্ধ ভাই?’

ব্যাকুল সুরে কথাটা বলে শীতল এদিক-ওদিক
তাকাল। খুঁজতে লাগল অনেক আশা নিয়ে।
কান্নাভেজা কণ্ঠে ডাকতেই লাগল করুন সুরে। ওর
এই ব্যাকুলতা সহ্য হলো না ইয়াসিরের। সে
শীতলকে নিয়ে ফিরে যেতে

যেতে বলল,

-‘চলো ভেতরে গিয়ে অপেক্ষা করি? দেখি কখন
আসে তোমার শুদ্ধ ভাই? আর আমিও রেডি হই
তাকে স্পেশালভাবে স্বাগত জানানোর জন্য।’

ইয়াসিরকে পাল্টি খেতে দেখে শীতল বাকহারা হয়ে
তাকিয়ে রইল শুধু।

ভয়ংকর কোনো পরিকল্পনা করছে সেটাও বুঝতে
বাকি রইল না। ভয়ে দুরূদুর বুকে আল্লাহকে ডাকতে
লাগল সে। এতক্ষণ গাড়ি নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে
ইয়াসিরকে বের হতে না দেখে সেখানে বুরাকও
উপস্থিত হলো। জলদি বের হওয়ার তাগাদা দিলো।
কিন্তু ইয়াসির গোঁ ধরে রইলসে কোথাও যাবে না।
লুকোচুরি খেলা নয় এবার যা হবে সামনাসামনি।

এমন পরিস্থিতিতে ইয়াসিরের কথা শুনে বুরাক এক
কোণে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল। টেনশনে দরদর
করে ঘামছে সে। খুব ভালো করে বুঝতে পারছে তার
জীবনের অন্তিম মুহূর্ত চলে এসেছে। পালাতে গেলে
ইয়াসির তাকে গুঁট করবে; না পালালে শুদ্ধর হাতে
মরতে হবে। মনে মনে এসব ভেবে কাঁঠ হয়ে দাঁড়িয়ে
সাইকো ইয়াসিরের কান্ডখানায় দেখতে লাগল।

এদিকে ইয়াসির শীতলকে সোফায় বসিয়ে খাবার
এনে মুখোমুখি বসল।

টেনশনে চুপসে যাওয়া শীতলের দিকে খাবার এগিয়ে দিয়ে খেতে ইশারা করল। কিন্তু শীতল মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকালে পুনরায় বলল,-‘খাও।’

-‘গলা দিয়ে নামবে না।’

-‘পানি দিয়ে গিলো, তবুও খাও।’

-‘বলছি তো খাব না।’

-‘খাবে,,খেতে হবেই।’

একপর্যায়ে ইয়াসিরের জোরাজুরিতে বাধ্য হয়ে শীতল মুখে খাবার নিল, তারপর কান্নাভেজা সুরে বলল,

-‘ছেড়ে দিন না আমাদের? কি ক্ষতি করেছি আমরা? কেন আমাদের পেছনে পড়েছেন আপনি?’

-‘আমার ব্যাপারে এতকিছু জানলে কিভাবে?’

-‘(.....)’-‘কিছু জিজ্ঞাসা করছি? মুখ খোলো বাবুই। আমি তোমাকে ব্যাড টাচ করতে চাই না। আমার কাছে অহেতুক জেদ করে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনো না।’

শীতল বুঝল মুখ না খুলে উপায় নেই তাই বলল,

-‘স্বর্ণ আপু আপনার ব্যাপারে অনেক কিছু জানে। সেগুলো নোট করে ফাইলে রেখেছিল। ফাইলটা একবার ধরতে গেলে আপু বারণ করেছিল। বারণ

করা কাজ করতে ভালো লাগে আমার। কি এমন আছে যে ধরতে বারণ করল সেটা দেখতেই চুপিচুপি ফাইলটা নিয়ে পড়েছি। আর সায়ন ভাইয়া একদিন রেগে আপনাকে গালি দিচ্ছিল আপুকে ‘অগ্নিকন্যা’ নামে ডাকায়। সেটা শুনেছি। সেই ফাইলে আপনার আবছা ছবিও ছিল সেটা দেখে রেস্টুরেন্টে প্রথমে চিনতে পারি নি তবে পরে চিনতে পেরে আপুর ভয়ে আর কিছু বলি নি। কারণ আপু তখন মারাত্মক রেগেছিল।’-‘তারমানে তোমার বোন আমাকে চিনতে পেরেছিল সেদিন?’

-‘হুম। পাবলিক প্লেসে সিনক্রিয়েট করবে না ভেবেই মূলত চুপ ছিল।’

-‘ আচ্ছা বাবুই, এখন যদি শুদ্ধ আসে চলে যাবে আমাকে ফেলে?’

-‘হুম।’

-‘ খারাপ লাগবে না?’

-‘না, কারণ আপনি আমাকে মেরেছেন। যারা আমাকে মারে, বকে তারা আমার শত্রু। শত্রুর কাছে থাকার ইচ্ছে নেই আমার।’

-‘আমি আদরও করতে পারি। করে দেখাই?’

- ‘ (...)’-‘ধরো শুদ্ধ এখানে এলো এসে তোমার সামনে দাঁড়াল। দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। আমি শুঁট ফুঁট কিছুই করলাম না তাও মারা গেল। তখন পথ ক্লিয়ার তবুও তুমি আমার হবে না, বাবুই? একটু ভেবে বলো তো?

কেন জানি তোমার সাথে জোরাজুরি করতে ইচ্ছে করে না আমার। যদি করত তাহলে বসে থাকার অবস্থাতেই রাখতাম না তোমায়। জীবনে এই প্রথম কোনো মেয়ের সঙ্গে ভালো করে কথা বলার চেষ্টা করছি। তোমার জেদের কারণে তবুও মার খেলে। জেদ করে বড় বড় বুলি না আওড়ালে মার টা খেতে না পাখি।’

একথা বলে ইয়াসির প্রায়ই জোর করে ইয়াসির শীতলকে খাওয়াল। খুব কাঁদল তবুও একপ্রকার খাইয়েই ছাড়ল। খাওয়ানোর পর ফিচেল হেসে বলল, -‘আপন জনের মৃত্যুতে কাঁদার জন্য হলেও শরীরে এনার্জি থাকা জরুরি। একটু খেলে এবার দেখবে মন ভরে কাঁদতে পারবে।’একথা বলে ইয়াসির হাত ধুয়ে এসে বুরাককে বলল কী কী করতে হবে। সেই অনুযায়ী বুরাক কাজ করতে লাগল। এদিকে

এঞ্জেলিকার দেখানো মানুষটা ভুল ছিল। একজন
যুবক তার গর্ভবতী বউকে কোলে করে নিয়ে
যাচ্ছিল হাসপাতালের দিকে। দূর থেকে এঞ্জেলিকা
সেই কাজিত মানুষ ভেবেছিল। কিন্তু যখন দেখল ভুল
তখন আবার উড়তে লাগল। সংকেত পেয়ে হন্ন হয়ে
খুঁজতে লাগল ডানা ঝাপটিয়ে ঝাপটিয়ে।

এদিকে চলন্ত গাড়িতে বসা শুদ্ধর ফোনে তখন
আচমকা লোকেশন শো করল। অবাক হলেও আর
অপেক্ষা করার সময় নেই। তখন ইয়াসিরের সিক্রেট
ডোনে কাছেই ছিল তারা। এবার গাড়ির স্পিড
বাড়িয়ে খুব দ্রুত

সেখানে পৌঁছাল। বাকি বন্ধুদের এ্যালার্ট করল
হাসান। শুদ্ধ গাড়ি থেকে নেমে এগোতে এগোতে
কোমরে গুঁজে রাখা পিস্তলটা হাতে নিতে ভুলল না।
এটাতে সাইলেন্সার লাগানো এবং তার নিজের নামে
লাইলেন্স করা।

তার ক্ষিপ্ত হাঁটার গতি আর থমথমে মুখ দেখে রাগের
মাত্রা বুঝতে কষ্ট হলো না হাসানের। কিছু বললে যে
হিতে বিপরীতও হবে তাও খুব ভালো করেই জানে
সে। তবুও শুদ্ধর হাতটা টেনে ধরে থামাল। তারপর

আমতা আমতা করে বলল,-‘ভাই থাম। এত হাইপার হোস না, আমাদের মাথায় রাখতে হবে শীতল এখনো ওদের কাছে। একটা ভুল শীতলের বিপদ বাড়বে বৈ কমবে না।’

-‘(....)’

-‘ যা করার সাবধানে করতে হবে আমাদের। মনে রাখতে হবে তীরে এসে তরী ডুবানো যাবে না।’

শুদ্ধ থমথমে মুখে চোয়াল শক্ত করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঢুকল বাড়িটার ভেতরে। কারো পায়ের পদধ্বনি শুনে ইয়াসির মুচকি হাসল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল হাত-মুখ বেঁধে মেঝেতে ফেলা রাখা শীতলের দিকে। শুদ্ধ পৌঁছে গেছে তার লোকরাও তাকে জানিয়েছে। তবুও ওর চোখে মুখে আতঙ্কের লেশ মাত্র নেই। শুধু একবার বুরাকের দিকে তাকালে বুরাক হ্যাঁ বোধক মাথা নাড়াল। অর্থাৎ তার আদেশ মোতাবেক কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

ঠিক তখনই সেখানে শুদ্ধ উপস্থিত হলো। গেট পেরিয়ে গটগটিয়ে ঢুকল। শীতল এক বুক আশা নিয়ে এতক্ষণ দরজার দিকেই তাকিয়ে ছিল। তার বিশুদ্ধ পুরুষকে দেখে কান্নার বাঁধ ভাঙল। ইচ্ছে করল

দৌড়ে গিয়ে বুকে লুকিয়ে পড়তে। কিন্তু সেটা সম্ভব হলো না তাই অশ্রুভেজা চোখেতাকিয়ে রইল শুদ্ধর দিকে। হাত-মুখ বাঁধা শীতলকে মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে শুদ্ধর বুকে যেন ঢস নামল। সে এগোতেই শীতল বারবার মাথা নাড়াতে লাগল। গোঁ গোঁ শব্দ করে কাছে যেতে বারণ করল। হঠাৎ এমন করাতে

শুদ্ধ কিছু একটা আন্দাজ করে শান্ত চাহনিতে তাকাল ইয়াসিরের দিকে। টিগার চেপে পিস্তল তাক করতেই ইয়াসিরই বলল,-‘কিরে থামলি কেন? বুকে পাঁটা থাকলে প্রাণ নিয়ে ফিরে যা।’

-‘ফিরব তো অবশ্যই তবে তোর হিসাব বরাবর করি।’

শুদ্ধ রক্তচক্ষু নিয়ে তাকালে ইয়াসির দুই হাতে হাততালি দিয়ে হঠাৎ হো হো হাসল। শুদ্ধকে উস্কে দিতে আরো কিছু বলল। শুদ্ধ পুনরায় এগোতে গেলে শীতলের ছটফটানি বেড়ে গেল। অঝর ধারায় কাঁদতে কাঁদতে সে অনবরত মাথা নাড়াতে লাগল। শুদ্ধ শুনল না বরং শীতলের কাছে যেতে

এগোতেই হাসান খেয়াল করল শুদ্ধর পায়ের কাছে
কারেন্টের তার পড়ে আছে। বিনাকারণে তার ফেলে
রাখবে কেন? এমন না যে কোনো কাজ চলছে। তার
সন্দেহ হলে একটু এগিয়ে দেখল সত্যি সত্যি ওটা
কারেন্টের

তার। হতে পারে এটা ইয়াসিরের আরেকটা চাল।
হতে পারে তার দিয়েই

কোনো ফাঁদ পেতেছে। হাসানের ধারণা তখন সত্যি
প্রমাণ হলো বুরাকের দিকে তাকিয়ে। ওই ছেলেটাও
তাকিয়ে আছে শুদ্ধর পায়ের দিকে, শুদ্ধ কখন তারে
পা পাড়িয়ে যাবে আর কারেন্টের শক খাবে। এমন
শক যে বাপ ডাকারও সময় পাবে না। অতঃপর
শীতলের চোখের সামনে মরবে শীতলের বিশুদ্ধ
পুরুষ। শীতল নিঁখোজের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই
সিমিনকে নিয়ে স্বর্ণ ফিরে এলো চৌধুরী নিবাসে।
বাড়িতে তখনো থমথম ভাব। কিন্তু সিমিনকে দেখে
যে

সিঁতারা, সিরাত রাগ বাক করার কথা তেমন কিছুই
করলেন না। সিমিন বাড়ি ফিরে বড় জায়ের সামনে
মাথা নিচু করে দাঁড়াতেই সিঁতারা মুখটা অন্যদিকে

ঘুরিয়ে শুধু থমথমে সুরে বললেন,-‘কেউ যেন আমার সাথে কথা না বলে। যদি কথা বলতেই হয় তাহলে সে যেন ওয়াদা করে যে, যেসব কাজ করেছে সেই কাজ আর কখনো করার স্পর্ধা দেখাবে না। চৌধুরীর নিবাসের চৌকাঠ পেরিয়ে কোথাও যাবে না।

যদি যাওয়ার চিন্তা থাকে তাহলে এখনই আবার চলে যাক। আমরা তো পর। পরকে কি আর পেটের কথা বলা যায়? যায় না তো! এজন্যই পেটে কথা রেখে বিপদ নিজের ঘাড়ের টেনে নিয়েছে। তাই আবার গর্ব করে বলে আমি নাকি কারো বড় বোন। আমাকে বড় বোনের মতো সন্মান করে। এ হচ্ছে সন্মানের নমুনা! কোথায় ছেলের মা হয়ে আমি মুড দেখাব তা না, সেই উল্টো আমাকে মুড দেখিয়ে ড্যাং ড্যাং করে বেরিয়ে গেল।’ বড় জায়ের কথা শুনে সিমিন হুঁ হুঁ করে কেঁদে ফেললেন। অনুশোচনায় যে বিশ্রীভাবে দগ্ধ হচ্ছেন একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ওদিকে শুদ্ধর

সঙ্গেও যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। শাহাদত চৌধুরী আর জুবায়ের চেষ্টা চালিয়ে ছুটেছে ওদের উদ্ধার করতে। যে শীতলকে কিডন্যাপ করেছে সে নাকি

ডেঞ্জারাস মানুষ। কি যে হবে বুঝে উঠতে পারছেন না কেউ। এসব মিলিয়ে পুরো চৌধুরী নিবাসে চলছে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। এমনিতে সব এলোমেলো তার উপরের জায়ের অভিমানী কথাবার্তা শুনে সিমিন যেন দাঁড়িয়ে থাকার শক্তিটুকুও পেলেন না। না চাইতেও বসে পড়তেই জলদি সিঁতারা আগলে নিলেন উনাকে। কাঁদতে কাঁদতে দু'জা জড়িয়ে ধরলেন। কাঁনার মাতম পড়লেও এ বিপদের মাঝে পূর্বের কথা উঠালেন না কেউ।

আর না কারো প্রতি কেউ রাগ পুষিয়ে রাখলেন। শখ ছলছল চোখে শুধু দেখে গেল তিনমায়ের অভিমান ভাঙার পর্ব। সে মনে মনে দোয়া করতে লাগল আবার যেন চৌধুরী নিবাসে সুখ ফিরে আসে। আবার যেন সুখের হাঁট বসে। আবার যেন সব ভাই-বোনরা খুনশুটি আড্ডায় মেতে উঠতে পারে। তাদের প্রতি ঘনিয়ে আসা সকল বিপদ দূর হোক। সমস্ত অশান্তি কপূরের মতো উড়ে যাক।

মাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে স্বর্ণ ছুটেছে সায়নের পার্টি অফিসে। কিন্তু সায়ন সেখানে নেই। অফিসের দরজায় তালা ঝুলানো। রুবাব, সায়ন কোথায় জানে না কেউ।

বাংলা প্রচলিত কথায় আছে,বিপদ যখন আসে
চারদিক থেকেই আসে। স্বর্ণ আজমকে নিয়ে সায়নের
খোঁজ করতেই জানা গেল,শুদ্ধর গোপন ল্যাবের সন্ধান
পেয়েছে ইগরের লোক। তবে কোনোভাবেই ভেতরে
দুকতে পারছে না। বার বার ভুল পাস দেওয়াতে
সেটা লক হয়ে গেছে। সারারাত ধরে আশ্রাণ চেষ্টা
করছে লক ভাঙার। কিন্তু সেটা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু
কোনোভাবে যদি ওরা ভিতরে ঢুকতে পারে তাহলে
শুদ্ধর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল ইগর বিনাবাধায় হাতিয়ে
নেবে। যেখানে লাখ নয় হাজার কোটি টাকা চলে
আসবে হাতের মুঠোয়। ইগর যে এটার উদ্দেশ্যে
আবার দেশে ফিরেছে বুঝতে বাকি নেই। তাছাড়া
ঐশ্বর্যও আছে যে ওই ল্যাবে। ইগর যে পরিমানের
রেগে আছে ঐশ্বর্য হাতের কাছে পেলে শ্বাস আঁটকে
মেরে ফেলবে। কিন্তু থামাতে হবে,,যেকোনো মূল্যে
থামাতে হবে।

এখবর শুনে স্বর্ণ লাগাতার ফোন দিতে থাকল
সায়নকে। কিন্তু সায়ন বা রুবাব কেউ কল ধরছে না।
একনাগাড়ে কল দিতে দিতে একপর্যায়ে কল রিসিভ

করল সায়ন। বলল,-‘এদিকে আসা লাগবে না, বাড়ি
যা। আমার ভাইয়ের সম্পদ রক্ষা করার
জন্য আমিই যথেষ্ট।’

-‘রুবাব ভাই কোথায়?’

-‘রুবাব, শুদ্ধর বাকি ফ্রেন্ডরা সবাই এখানেই আছে।’

-‘থেকে করছে টা কি?’

-‘তোর বাপের বাসর সাজাচ্ছে।’

-(.....)’

একথা শুনে স্বর্ণ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। এ ছেলে আদৌ
শুধরাবে না বোধহয়।

আর তার উপরে রেগে কত কথা শুনাবে এটাও
অজানা নেই। এজন্য সে কথা না বাড়িয়ে
বলল,-‘ওখানে হাঙামা করে মানুষ জানিও না কাজেই
সাবধান।’

-‘ আমি তো গু খাওয়া গরু বুঝি না কিছু, ফোন রাখ।
,

একথা বলে সায়ন গজগজ করতে করতে কল কেটে
দিলো। স্বর্ণ কান থেকে ফোন সরিয়ে মৃদু হাসল। এই
রাগ ভাঙাতে যে কত কী সহ্য করতে হবে! তবে
শারায়াত চৌধুরী সায়নকে বাড়ি থেকে বের করেছে

একথাটা বাড়িতে এসে জানল সে। কষ্টও পেলেও কাউকে কিছু বলে নি। পাগলটা বাড়ির বাইরে থাকতে পারে না খুব ভালো করে জানে না। বাড়ির খাবার না খেলে অস্থির অস্থির করে। হোক ডাল-ভাত তবুও তার বাড়ি খাবারই চায়। সে যাওয়ার পর কিছু কী খেয়েছে? নাকি ওভাবেই ছুঁটে বেড়াচ্ছে? মনে মনে এসব ভেবে বাড়ির দিকে হাঁটা ধরল স্বর্ণ। আজম পেছন পেছন গিয়ে স্বর্ণকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েই ছুঁটল সায়নের কাছে। কারণ সায়ন তাকে কল করে পইপই করে বলেছে স্বর্ণ যেন কোনোভাবেই এদিকে না আসে। এসেও কাজের কাজ কিছু হবে না কারণ শুদ্ধর যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গেছে। ইগর হাতভর্তি করে লুটে নিয়েছে শুদ্ধর সব পরিশ্রমের ফল।

আরেকটা দুঃখজনক ব্যাপার, ঠিক সময় পৌঁছালেও কেউ ঐশ্বর্যকে সুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করতে পারে নি।

ঐশ্বর্যের শরীরে একপাশ ঝলসে গেছে

এসিড জাতীয় কিছুতে। বেচারি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল ভাইতুল্য শুদ্ধর

এক একটা আবিষ্কার রক্ষা করতে। কিন্তু সেটা সম্ভব হয় নি বরং গুরুতর আহত হয়ে আইসিউতে মৃত্যুর

সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। কিছু হবে বলা যাচ্ছে না। তার অবস্থা যেমন তেমন এখন রুবাবকে সামলানোই কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছেলেটা পাগলের মতো হাউমাউ করে কাঁদছে। ভালোবাসার পীড়া যে এত যন্ত্রণাদায়ক আগে জানা ছিল না। এদিকে চৌধুরী নিবাসে যা অবস্থা এখন এসব কথা কাকে বলবে? বরং শুনলে সব আরো ভেঙে পড়বে। আরেকদিকে শুদ্ধ কি করছে, পেয়েছে কী না, সেসব ভাবলে ওর মাথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। কোনদিকে যাবে? শুরুতেই শুদ্ধকে একা ছাড়তে চায় নি সে। কিন্তু শুদ্ধ বারণ শোনে নি তাকে বাড়ির দিকে নজর রাখতে বলে একাই বেরিয়ে পড়েছে। তবে এখন স্বর্ণকে বলামাত্রই চলে আসত ঠিকই কিন্তু বাড়ির মানুষকে সামলানোর জন্য কাউকে দরকার। এজন্যই সে ঘটনা গোপন রাখল। কিন্তু সব ঘটনা কি চাইলে গোপন রাখা যায়? যায় না। বরং কিছু ঘটনা বাতাসের আগে ছুটতে শুরু করে। সায়নের ভাবনাকে চুরচুর করে সেটাই ঘটল চৌধুরী নিবাসে। ভোরের ফুটতেই শারায়াত চৌধুরীর কাছে খবর

চলে এলো। উনার পরিচিত এক বিজনেস ম্যান
সায়নকে ভোর থেকেই
হসপিটালে ছুটাছুটি করতে দেখে এই খবরটা উনাকে
জানালেন। হতবাক

হয়ে শুনে উনি ভেবেই বসলেন শীতলের কিছু একটা
হয়ে গেছে। যদি না হয় তাহলে রুবাব এভাবে
কাঁদবে কেন? বোনরা তো ভাইয়াদের কলিজা।

উনাকে এভাবে থম মেরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে
সিঁতারা জায়নামাজটা গুছিয়ে উঠিয়ে রাখলেন।
তারপর জিজ্ঞাসা করলেন,- ‘কি হয়েছে? কোনো খবর
পেলে?’

- ‘হসপিটালের যেতে হবে সিঁতারা দ্রুত চলো।’

- ‘হসপিটালে? কেন?’

- ‘আমাদের শীতলটা বোধহয় ভালো নেই, চলো, কথা
বাড়িয়ে সময় নষ্ট করো না। মেজো বউ, ছোটো
বউকে ডাকো দ্রুত।’

একথা বলে উনি গাড়ির চাবি নিয়ে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে
গেলেন। সিঁতারা হাক ছেড়ে বাকিদের ডাকতে
ডাকতে কেঁদেই ফেললেন। উনার কান্নার আওয়াজে

বাকিরা ছুটে এসে উপস্থিত হলো ড্রয়িংরুমে। সারারাত জেগে

থাকা ছোটোরা কিছুক্ষণ আগে শুয়েছিল। শুয়ে থাকতে থাকতে চোখটা কেবল বুজে এসেছিল। হঠাৎ কান্নার শব্দে ছুটে এসে বিষয় নিয়ে দেখল বড় মা কাঁদছে। সিতারা, সিমিন নামাজ-কোরআন পড়ে হিজাব খোলার সময় পান নি। উনারা ছুটে এসে দাঁড়াতেই শারায়াত চৌধুরী তাড়া দিলো গাড়িতে গিয়ে বসতে। শখকে বললেন সাম্য- সৃজনের খেয়াল রাখতে। শীতলের কিছু হয়েছে ভেবে কাউকেই বাড়িতে রাখা গেল না। বাড়িতে থাকার কথা বলতেই তারা হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল সকলে। অগত্যা

উনাদের সবাইকে নিয়ে ছুটলেন হসপিটালের উদ্দেশ্যে। সিক্রেট ডোন, চট্টগ্রাম।

শুদ্ধ শীতলের দিকে যেতে গিয়েও থামল দেখে ইয়াসির তাকে উস্কাতে লাগল। এমন এমন কথা বলল যে শুদ্ধর রাগের পারদ বাড়ল। ইয়াসির যদিও এটাই চাইছিল। কারণ উস্কাতেই শুদ্ধ হয় তাকে মারতে আসবে নয়তো শীতলকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যাবে। যেটাই করুক তারে পা দিলেই

বিনাবাক্যে পথের কাঁটা দূর হয়ে যাবে। এজন্যই তো
পালানোর মতো বোকামি করল না সে। ঠান্ডা মাথায়
যদি পথের কাঁটা সরানো যায়

তাহলে শুধু শুধু এনার্জি লস করার মানেই হয় না।
একথা ভেবে ইয়াসির উঠে দাঁড়িয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি
হেসে বলল,

-‘কি চৌধুরী ভয় পাচ্ছিস নাকি?’

-‘কাকে? তোর মতো ভেড়াকে?’

-‘আমি ভেড়া?’

-‘সম্বোধন পছন্দ হলো না? গাধা কিংবা গর্তে
লুকানো ইঁদুর বললে খুশি হতি?’- তা এই ইঁদুরের
গর্ত থেকে জীবিত বেঁচে দেখা দেখি? যদি পারিস
মেনে নেবো চৌধুরীদের রক্তে দম আছে আর যদি না
পারিস তাহলে আজকে তোরই সামনে তোরই
শীতলের ভার্জিনিটি পরীক্ষা করব।’

একথা ইয়াসিরের বলতে দেরি কিন্তু শুদ্ধর এক লাফে
তার ক্রস করতে সময় লাগে নি। চোখের পলকেই
সে ইয়াসিরের বুক বরাবর লাথি বসিয়ে দিয়েছে।
শক্ত পোক্ত এক লাথিতে ইয়াসির কয়েক পা
পিছিয়েও গেছে।

শুদ্ধ তাকে সময় দিলো না বরং হিংস্র সিংহের ন্যায়
তেড়ে গিয়ে যে মুখে শীতলকে নিয়ে নোংরা কথা
বলেছে, সেই মুখটাই পিস্তলের গোড়া দিয়ে খেতলে
দিতে থাকল। সেকেন্ডের মধ্যেই লাল রক্তে রক্তারক্তি
হয়ে গেল।

শুদ্ধর শক্ত হাতের প্যাঁচে ইয়াসির এমনভাবে আঁটকে
পড়ল যে নিজেকে ছাড়াতে হাঁসফাঁশ করতে লাগল
ইয়াসির। শুদ্ধর শরীরেও যেন অসুরের শক্তি ভর
করেছে। সে বেশ কায়দা করে পিস্তলের হাতা দিয়ে
বুক বরাবর

বারি মারতেই ইয়াসির মেঝেতে ছিঁটকে পড়ল। এক
গড়ন দিয়ে শীতলের

কাছে গিয়ে কাশতে কাশতে রক্তমাখা থুতু ছুঁড়ে
ইয়াসির তাকাল শুদ্ধর দিকে। হাতের উল্টো পিঠে
ঠোঁটর রক্ত মুছে আচমকা ঠোঁট ছুঁইয়ে দিলো শীতলের
কপালে। এ দৃশ্য যেন শুদ্ধকে উন্মাদ করে দিলো।
ভেতরে থাকা আরেক সত্তা যেন আজ মুহূর্তেই
বেরিয়ে এলো। সে ক্ষিপ্ত গতিতে এগিয়ে গিয়ে
কপালে পিস্তলের নল ঠেকিয়ে হিসহিসিয়ে
বলল,-‘কালিমা পড়।’

ইয়াসির হাসল। রক্তমাখা দাঁতে বিশ্রী সেই হাসি।
তবে কালিমা পড়া তো দূরে সে ঘাড় ঘুরিয়ে শীতলের
দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর থেমে থেমে বলল,
-‘তোমার বোন আমার মোহ আর তুমি আমার রন্ধে
পৌঁছানো আসক্তি।

কসম করে বলছি, তোমার প্রতি আমার অনুভূতি
অন্যরকম। বাবুই,তুমি তোমার শুদ্ধ ভাইকে ফিরে
যেতে বলো। থেকে যাও আমার কাছে। আমি শুধরে
নেবো নিজেকে। তুমি যেমন বলবে আমি সেভাবে
নিজেকে চেঞ্জ করব। বিনিময়ে তুমি আমার হয়ে
যাও,,আমার কাছে থেকে যাও,প্লিজ।’

একথা বলে একটু থেকে পুনরায় থুথু ফেলে বলল,-‘
আজ যদি মারা যাই তাহলে বেঁচে গেলা আর কোনো
ভাবে যদি আমি প্রাণ বেঁচে যাই তাহলে তুমি-আমি
আমরা আবার মুখোমুখি হবো। এবার ঘুটকো ঝামেলা
আমাদের মাঝে আসার সুযোগ পাবে না, মিলিয়ে
নিও।’

একথা বলে শুদ্ধর বন্দুকের নলে চুমু খেতেই শুদ্ধও
ট্রিগার চাপার আগে

হুড়মুড় করে একদল ছেলে উপস্থিত হলো। এসেই
শুদ্ধকে এলোপাতাড়ি মারতে শুরু করল। শীতল কাটা
মুরগির মতো ছটফট করলে ইয়াসির শীতলের বাঁধন
খুলে দিয়ে বলল,

-‘এভাবে কাঁদে না পাখি। ও মরে যাচ্ছে, যাক। আমি
তো আছি। আমি ভালোবাসব তোমার।’

কোনো কথা শোনার অবস্থায় নেই শীতল। গগন
বিদারী চিৎকার করে তার একটা কথায় বলে যাচ্ছে
বারবার,

-‘আপনারা থামুন না! মারছেন কেন ওকে? শুদ্ধ
ভা..ই?’ একথা বলে শীতল ইয়াসিরকে ধাক্কা মেরে
শুদ্ধর কাছে ছুটে গেলেও শুদ্ধকে ছুঁতেও পারল না।
তার আগেই ইয়াসির তাকে ধরে বাহুডোরে আগলে
নিলো। শীতলের ভেজা চোখ মুছে দিয়ে বেশ আদুরে
সুরে কথা কান্না থামাতে বলল। ততক্ষণে হাসান আর
শুদ্ধর মারতে মারতে শুইয়ে ফেলেছে ছেলেগুলো।
হঠাৎই সেখানে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটতেই সকলে
ছিঁটকে দূরে গেল। একের পর এক বিস্ফোরণ হতেই
ইয়াসির দ্রুত সকালকে বেরিয়ে যেতে বলে নিজেও
শীতলকে কাঁধে তুলে নিলো। কিন্তু কয়েক পা

এগোতেই শুদ্ধ এক পা বাড়াতেই ইয়াসির হোঁচট
খেয়ে তাল হারিয়ে পড়তে পড়তেই বেঁচে গেল। শুদ্ধ
অপেক্ষা না করে ইয়াসিরের বাঁ পায়ে শুঁট করে দিল।
ইয়াসিরের ব্যথাতুর কণ্ঠে শুনে একটু দূরে এগোনো
ছেলেগুলো ফিরে আসার আগেই তার কপালে পিস্তল
ধরল শুদ্ধ। হাসান নিজেও উঠে দাঁড়িয়েছে। ইয়াসির
আঁটকে গেছে দেখে বুরাক ছেলেদের মাঝে দাঁড়িয়ে
নিজেকে আড়াল করে শুট করল শুদ্ধর বুক বরাবর।
শুরু থেকেই হাসান খেয়াল করছিল বুরাককে। এখন
তার হাতে পিস্তল দেখে চিৎকার করতেই ঘাড় ঘুরিয়ে
তাকাল শীতল। তার টার্গেট বুঝে হাসান আর শীতল
দুজনেই তড়িৎ শুদ্ধকে এক ধাক্কা দিয়ে সরাল ঠিকই।
কিন্তু গুলি বিঁধল শীতলের বাহুতে। এবং নিজেকে
সামলে না নিতেই ভুলক্রমে পা দিলো বসল
কারেন্টের তারে। সেকেন্ডের মধ্যেই কারেন্ট শকে
শরীর কেঁপে উঠল শীতলের শরীর। শুদ্ধ তার দিকে
যেতে গেলে হাসান শুদ্ধকে সরিয়ে দিলো। চিৎকার
করে বলল শীতলকে এখন না ধরতে। কিন্তু শুদ্ধ
শুনলে তো? সে আবার ছুটে যেতে গেলে হাসান
শুদ্ধকে পেছনে থেকে শক্ত ধরে কাঁদতে কাঁদতে

বলল,-‘থাম ভাই, থাম। ওকে ধরিস না তুইও মরে যাবি। সুইচ খোঁজ।’

শুদ্ধর নিজেকে ছাড়াতে ছাড়াতেই সবাইকে অবাক করে দিয়ে ইয়াসির খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে সুইচ অফ করে দিলো। শীতল ধপ করে পড়ল মেঝেতে। হাসান কোনোভাবেই শুদ্ধকে ধরে রাখতে পারছে না। চিৎকার করে শুদ্ধ তাকে ছাড়তে বলছে। একপর্যায়ে শুদ্ধ হাসানকে ধাক্কা মেরেই দৌড়ে গেল শীতলের কাছে। মাথাটা তুলে নিলো নিজের কোলে। গাল চাপড়ে ডাকতে থাকল করুন সূরে। কিন্তু ততক্ষণে শীতলের চোখ বুঝে গেছে। শক্ত মেঝেতে আছড়ে পড়ে কপালে সবুজ কালশিটে পড়ে গেছে।

সে আবার ডাকল,

-‘এ্যাই..এ্যাই উঠ না,,শীতল,,এ্যাই শীতল? আমি ডাকছি তো নাকি!’

-‘(.....)’

-‘খবরদার বলছি অঙ্গান হওয়ার ভান করবি না। খুব মারব কিন্তু। ‘

একথা বলে হঠাৎ খেয়াল করল শীতল শ্বাস নিচ্ছে না। দু হাত দিয়ে বুকে চাপ দিলেও কাজ হলো না। এবার মাউট-টু মাউট রেসপিরেশন করল।

আবার ডাকল,-‘শী...তল.. এ্যাই শীতল,..দেখ না আমি এসেছি। চোখ খোল। তাকা আমার দিকে,,তাকা। আমার ‘আমিটাকে’ কেড়ে নিয়ে এখন আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পায়তারা করছিস তুই? কেন, আমাকে জ্বালানোর শখ মিটে গেছে? এত তাড়াতাড়ি? তুই না বলেছিলি আমার বউ হবি? আমার সঙ্গে তোর স্বপ্নের দেশ নরওয়েতে যাবি। আমার হাত ধরে গোলাপি রঙা আকাশ দেখবি। আমি এসেছি তো, তাকা, প্লিজ একবার তো তাকা!

ভেজা কণ্ঠে একথা বলে শুদ্ধ থামল। জোরে জোরে ক’বার শ্বাস নিয়ে এই প্রথমবার স্বেচ্ছায় শীতলের কপালে খুব যত্ন করে আদর ঐঁকে দিলো। এটা করতে গিয়ে তার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল অবচেতন শীতলের গালে। কত যত্নে হাত বুলাল গলগল করে রক্ত বের হওয়া শীতলের বাহুতে। কাঁপা কাঁপা হাতে সে সেখানে রুমাল বাঁধল। তারপর শীতলকে কোলে তুলে

বিরবির করে বলল,-‘তোমার মৃত শরীরের ভার বহন করার শক্তি কী আমার আছে বল? নেই তো। একদমই নেই। খবরদার মরার পায়তারা করবি না। যদি করিসও, তবে জেনে রাখ তোমার কবরের পাশের কবরটা হবে তোমার বিশুদ্ধ পুরুষের।’

একথা বলে টালমাটাল পায়ে শীতলকে নিয়ে সে বেরিয়ে এলো। হাসান

নিজেও বেরিয়ে এলো শুদ্ধর পেছন পেছন। এঞ্জেলিকা উড়ে এসে বসল শুদ্ধর কাঁধে। শব্দ করে ডাকতে লাগল শীতলকে। তার ডাকে সাড়া না দিলে উড়ে গিয়ে বসল শীতলের পেটের উপর। হাতে দুটো ঠোঁকর দিয়ে

বোঝাল তাকে একটু আদর করতে। কিন্তু শীতল কি আর সেই অবস্থায় আছে? অতঃপর তারা গাড়িতে ছুটল আশেপাশের হাসপিটালে। বিপদের দিনে নাকি বিপদ না এলে বিপদ মানায় না। ছোটো খাটো হাসপিটালের যা সন্ধান পেয়েছিল সেখানে নাকি ডাক্তার থাকে না। এখনো নেই। নার্স গুলো যেন ভিআইপি কোনো পারসন। তাদের কিছু বললে গুরুত্ব

তো দিলোই না মুখ বাঁকিয়ে ফোন টিপায় মনোযোগ দিলো। অন্যসময় হলে

এদের সাইজ করে তবেই শুদ্ধর বের হতো। কিন্তু হাতে সময় নেই দেখে হাসান জেট হসপিটালের মাঠে আনার ব্যবস্থা করল। জেটের চালাকও আশেপাশে থাকায় দ্রুত চলে এলে তারা উড়াল দিলো ঢাকার পথে ধরে। এইটুকু সময়ে শুদ্ধ শীতলকে এমন ভাবে তার বাহুডোরে আগলে রাখল যেন ছাড়লে সে হারিয়ে যাবে। অতঃপর তারা ঢাকায় নিজস্ব হসপিটালে

পৌঁছাতেই ডাক্তার নার্সরা ছুঁটে এলো। স্টেচারে শীতলকে শুঁইয়ে ছুঁটে গেল ওটিকরুমে। বন্ধ ওটির রুমে দরজার দিকে একবার তাকিয়ে তাকাল নিজের রক্তার হাতের দিকে। তারপর বিরবির করে বলল,-‘আমাকে ছেড়ে যাওয়ার পায়তারা করবি না। ভুলেও না। আমি কিন্তু এসব ফাজলামি মোটেও বরদাস্ত করব না। কেননা, আমার এই জীবন ভাজা ভাজা করার জন্য হলেও তোকে প্রয়োজন। আমার অশান্ত বুকটা শান্ত করতে তোর কুৎসিত মুখের হাসিটুকু প্রয়োজন। যদি এর বিপরীত কিছুও ঘটে, তবে আমি আমার জীবনের মায়া করব না। একটুও করব না।

বিশ্বাস না হলে ফাঁকি দিয়ে মিলিয়ে নিস তোর
অনুপস্থিতিতে শুদ্ধর

কোনো অস্তিত্ব পৃথিবীতে থাকে কী না! আমি রাখি কী
না। আমি মুখে বলেছি ভালোবাসি না, বাসবোও না,
তবে ছেড়ে থাকার কথা একবারও বলি নি। বলবোই
বা কিভাবে...ছেড়ে থাকতে পারলে তো!’-‘শু..শুদ্ধ!
আব্বা আমার!’

দো’তলার ওটি রুমের সামনে দাঁড়ানো শুদ্ধ কারো
বিস্ময়ভরা কণ্ঠস্বর শুনে পেছন ফিরে তাকাল। তার
থেকে দুহাত দূরে সিরাত সাম্য-সৃজনের হাত ধরে
চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে হতবাক চাহনি।
শুদ্ধ এখানে কেন? কখন এসেছে? একা কেন?
এসেছেই যখন তাদেরকে জানাল না কেন? একথা
চিন্তা করে উনি দ্রুত শুদ্ধর দিকে এগিয়ে গেলেন।
পুনরায় জিজ্ঞাসা করার আগেই হাসান এসে কিছু
বলতেই শুদ্ধ উনাকে দাঁড়াতে বলে দ্রুতপায়ে কোথায়
যেন চলে গেল। উনি এবার আশেপাশে তাকালে
একজন নার্স বলল,-‘উনার পেশেন্ট তো..!’

বাকি কথা বলার আগে উনারও ডাক পড়তেই উনিও
ছুঁটে চলে গেলেন। সিরাত হতবাক হয়ে তাকিয়ে

রইল শুধু। উনারা খবর পেয়ে সকালবেলা হাসপিটালে
ছুঁটে এসে ঐশ্বর্যের ঘটনা জেনেছে। সায়ন রাত থেকে
ঐশ্বর্য

নামের মেয়েটার জন্য ছুটাছুটি করছিল তাও জানা
গেছে। আর মেয়েটা কে, রুবাব যে মেয়েটার প্রতি
কত দুর্বলতা সেই ঘটনাও স্পষ্ট। কাউকেই বাড়তি
করে বলার প্রয়োজন পড়ে নি। ছেলের বিপদের খবর
শুনে রাগ ভুলে কিছুক্ষণ আগে শতরূপা চৌধুরীও
ছুঁটে এসেছেন। এসেই ছেলেকে

বুকে জাপটে ধরে বলেছেন,-‘সবকিছুর মালিক
আল্লাহ। ধৈর্য্য ধরো বাবা,,,ধৈর্য্যের ফল সুমিষ্ট হয়।’

রুবাব মায়ের হাত আঁকড়ে ধরে কোনো কথায় বলতে
পারো নি অঝরে কেঁদেছে শুধু। তারপর সবাই মিলে
ছেলেটাকে কত বোঝালেন। উনারা এতক্ষণ
তিনতলার ওয়েটিং রুমে বসে ছিলেন। মেয়েটার
একটা ভালো সংবাদ পাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে
বসে ছিলেন। কিন্তু ঐশ্বর্যকে নিয়ে ডাক্তার
কোনোরকম আশার সংবাদ দিতে পারে নি। বাঁচবে
নাকি মরবে তাও বলে নি। শুধু এইটুকুই জানিয়েছে
তার শরীরের চামড়া এমনভাবে ঝলসেছে সেটা

পূর্বের মতো কখনোই হবে না। একথা শুনে রুবাব মলিন হেসে জবাব দিয়েছে,-‘চেহারা নিয়ে চিন্তা নেই সে বাঁচবে তো? পারলে তাকে বাঁচান।’

একথা শুনে ডাক্তার কিছুক্ষণ ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস চেপে স্থান ত্যাগ করেছেন। উনারা এসেছিলেন খুব সকালের দিকে এখন বাজে বেলা বারোটা। এত বেলা হয়েছে অথচ কারো গলা দিয়ে পানিটুকু অবধি নামে নি। সবাই শুকনো মুখে ভালো একটা সংবাদের আশায়।

এদিকে সবার কান্নাকাটি মন খারাপ দেখে সাম্য সৃজনও কাউকে কিছু বলার সাহস করতে পারে নি। সায়নও নেই, তারা হাসপিটালে এসে তাকে দেখতে পায় নি। এতক্ষণ না খেয়ে থেকে সৃজন সাম্যকে খোঁচা মেরে দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সাম্য তাকালে মিনমিন করে মায়া মায়া স্বরে বলল,-‘ভাইয়া আমার না পেট ব্যথা করছে। বোধহয় ক্ষুধা লেগেছে। কিছু মিছা খেলে বোধহয় ভালো লাগত।’

ভাইয়ের কথা শুনে সাম্য চমকে পাশ ফিরে তাকাল। সচরাচর সৃজন তাকে ভাইয়া সম্বোধনে ডাকে না। কারণ তারা জমজ। তবে সৃজন যখন বিপদে পড়ে

কিংবা কোনো ব্যাপারে সমাধান খুঁজে পায় না তখন ডাকে পরিবর্তন আনে। সাম্যকে বড় ভাইয়ের আসনে বসিয়ে দিয়ে মনের কথা শেয়ার করে সমাধান চায়। তবে ভাইয়ের ক্ষুধা লাগার কথা শুনে সাম্য সবার দিকে তাকাল। এবার কি হবে? ভাই খেতে চাচ্ছে খাবার কোথায় পাবে? একটুদূরেই ফিল্টারে পানি খাওয়ার ব্যবস্থা দেখে একগ্লাস পানি এনে ভাইকে দিলো। কিন্তু পানি খেয়ে ক্ষুধা যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

গা গুলাতে লাগল। একথা সাম্যকে জানালে সাম্য করুণা চোখে ভাইয়ের দিকে তাকাল। মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো। সে তো টাকা নিয়ে আসে নি। কিছু টাকা থাকলে দৌড়ে গিয়ে কিছু মিছু এনে ভাইটাকে দেওয়া যেতো।

স্বর্ণ, শখ আপুকেও আশেপাশে দেখছে না। রুবাব ভাইয়ার মন খারাপ। কার কাছে টাকা চাইবে? একথা ভাবতে ভাবতে বড়দের দিকে তাকাতেই দেখে তার তিন মা তাদের দিকেই তাকিয়ে আছে। দূর থেকে বুঝে গেছে ঘটনা। সন্তান যতই বড় হোক, মুখে কিছু না বলুক কিন্তু মুখ দেখে মনের কথা বোঝার ক্ষমতা

শুধু মায়েদেরই আছে। উনাদেরকে তাকাতো দেখে
ওরা দু'জন একটু লজ্জা পেল। নাকের ডগা থেকে
চশমা ঠেলে ঠিকঠাক

করে নড়েচড়ে বসল। তখন সিতারা উনার পার্স
থেকে টাকা বের করে সিরাতের হাতে গুঁজে দিয়ে
বললেন,

-‘তোরাও কী আক্কেল জ্ঞান হবে না মেজো? বাচ্চা
দুটো না খেয়ে আছেসেটাও খেয়াল করিস নি তুই?
একজন খেতে বসে সেই যে উঠে গেল আর খোঁজ
নেই। বাড়ির লোক চিন্তা করছে একটা ফোন করে
জানাবে তাও করছে না। আরেকজনকে হাসপিটালে
এসেও দেখতে পেলাম না। রুবারটাকে কি বলব
বুঝতে পারছি না। সব কটা একসাথে আমার জান
ভাজা ভাজা করতে উঠে পড়ে লেগেছে।’

কান্নাভেজা কণ্ঠে একথা বলতে বলতেই উনার গাল
গড়িয়ে অশ্রু নামল।

জায়ের কথা শুনে সিরাত মুখ কাঁচুমাচু করলেন। মনে
ঠিকই আছে কিন্তু এই পরিস্থিতিতে কি করবেন বুঝে
উঠতে পারছিলেন না। পার্সও আনেন নি। এ অবস্থায়
টাকা চাইতে নিজের বিবেকে বাঁধছিল। তবে টাকা

পেয়ে বসে না থেকে সাম্য-সৃজনকে নিয়ে ক্যান্টিনের
দিকে চলে গেলেন। বাচ্চা দুটোকে পেট পুরে
খাওয়ালেন। শুকনো কিছু খাবার কিনে দিলেন। দুটো
স্যালাইন কিনে ইন্টেক পানি বোতলের ক্যাপ খুলে
গুলিয়ে নিয়ে ফিরে এলেন। এটুকু সময়ের মধ্যেই
লিফ্টের কি সমস্যা হয়েছে কে জানে। তাই ভিড়
এড়িয়ে দোতলার সিঁড়ি পেরিয়ে তিন তলার সিঁড়িতে
পা দিতেই পা

থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। পরিচয় কাউকে দেখলেন
ভেবে এগিয়ে দেখেন পেছনে ঘুরে একটা ছেলে
দাঁড়িয়ে আছে। অবাকও হলেন তাকে দেখে। তারপর
বিস্ময় ঠেলে ডেকেই ফেললেন শুদ্ধকে। পেছনে
ঘুরতেই সিরাত এগিয়ে এসে কিছু বলার আগেই তো
চলে গেল ছেলেটা। একটু পর শুদ্ধ ফিরে এলে উনি
শুদ্ধর মুখে বুকে হাত বুলিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে
লাগলেন,-‘আব্বা,,আব্বা রে কি হয়েছে তোর?
কিভাবে এত ব্যথা পেলি? র..রক্ত কেন তোর গায়ে?
শীতল..আমার শীতলটা কোথায়? কোথায় রেখেছিস
মেয়েটাকে?’

শুদ্ধ ব্যাকুল স্বরে মেজো মাকে কথা বলতে দেখে হাত ধরে থামাল। এই টুকু কথা বলতে বলতেই হাঁপিয়ে গেছেন। রীতিমতো শ্বাসকষ্টও শুরু হয়ে গেছে। শুদ্ধ উনাকে ধরে পেতে রাখা চেয়ারে বসাল। উনার হাতে থাকা পানির বোতল থেকে পানি নিয়ে উনাকেই খাওয়াল। তারপর স্বাভাবিক হলে শুদ্ধ জানতে চাইল উনি এখানে কেন? সিরাত যতটুকু জানে সেটাই শুদ্ধকে জানাল। বাড়ির লোক জানে না শুদ্ধর গোপন ল্যাব সম্পর্কে তাই

লুটপাট হওয়ার ঘটনাও অজানা। রুবাবের পছন্দের মানুষ এইটুকু জানে উনারা। কিন্তু শুদ্ধ ঠিকই দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নিলো। সে কয়েকবার ঢোক গিলে বন্ধ ওটির দিকেই নিবার্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। অসহনীয় যন্ত্রণায় জর্জরিত হওয়া বুকটায় যেন নতুন করে কয়েক টন পাথর এসে জমা হলো। চোখের তারায় ভাসল রুবাব আর ঐশ্বর্যের মুখ। এরিইমধ্যে সাম্য সৃজন কখন তিন তলায় ছুটে গেছে খেয়াল করে নি তারা। দুজনই দৌড়ে গিয়ে বাড়ির সবাইকে ডেকে এনেছে। শুদ্ধ হাসপিটালে শুনে সবাই এসে তাকে ঘিরে ধরল। সিতারা কাঁদতে কাঁদতে শাড়ির আঁচল

দিয়ে যত্ন করে ছেলের মুখ মুছিয়ে দিলেন। কপালে চুমু খেলেন। শুদ্ধর গায়ে রক্ত আর ছোটো ছোটো আঘাতের চিহ্ন দেখে সকলের নেত্রজোড়া ভিজে উঠল। ছেলেটা কত ব্যথা নিয়ে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সিমিন একটু দূরে চোখে আঁচল চেপে ধরে নীরবে কেঁদে যাচ্ছেন। শুদ্ধ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেও কিছু বলল না। তখন ওটির দরজা খুলে ডাক্তার হনুদন্ত হয়ে ও বেরিয়ে এলেন। গলা খাঁকারি দিয়ে শুদ্ধকে বললেন,- ‘মি. শোয়াইব সরি টু সে পেশেন্টের কিটিক্যাল কন্ডিশন। কোনোভাবেই হার্টবিট স্বাভাবিক হচ্ছে না। গুলি, কারেন্টের শক একসাথে হওয়ায় তার অবস্থা ক্রমাগত খারাপের দিকেই যাচ্ছে। বুলেট বের করা হয়েছে। তবে গুলির কারণে শরীর দুর্বল ও রক্তক্ষরণে জন্য অক্সিজেন সরবরাহ কমে যাচ্ছে, বিশেষ করে কারেন্টের শকে ওর অবস্থা আরো শোচনীয় হচ্ছে। ‘

এইটুকু বলে ডাক্তার থামলেন। তারপর না চাইলেও অপ্রিয় কথা বলেই ফেললেন,- ‘আস..আসলে যা অবস্থা যখন তখন তার হৃদযন্ত্র থামকে যেতে পারে, প্রস্তুত থেকো ইয়াং ম্যান।’

একথা বলে ডাক্তার নার্সের দিকে তাকালে নার্স কাগজ কলম এগিয়ে দিলেন। শুদ্ধ সেটা হাতে নিয়ে দেখে বন্ড সই দিতে হবে। শুদ্ধ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল ডাক্তারের দিকে। মানে কি!কিসব আবোলতাবোল বকতে শুরু করেছে এই ডাক্তার? ওদিকে ডাক্তারের কথা শুনে সকলে কাঁদতে শুরু করেছে। সিমিন দৌড়ে এসে কিছু একটা বলতে চাইলেন কিন্তু উনি একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারলেন না। হাউমাউ করে কেঁদে গেলেন।

শুদ্ধ কম্পিত হাতে কাগজটার দিকেই তাকিয়ে রইল। তার দায়িত্ব কাঁধে নিতে পারল না, কাবিননামায় তার নামের পাশে ওর নাম জুড়াতে পারল না অথচ তার জন্য নাকি বন্ডে সাইন করতে হবে। এই দিনটাও দেখতে হলো? ব্যাঙাচি তাকে এই পর্যায়ে এনে দাঁড় করাল! এতবার করে বলল ছেড়ে যাওয়ার আয়োজন না করতে সে সেটাই করেছে। কোনো মানে হয় এসবের? কোথায় সাইন? আসছে না কেন? আদরের বোনকে সে কিছু বলছে না কেন? তাকে কি আবার চ্যালাকাঠ হাতে নিতে হবে? অন্যদিন নাহয় তার প্রতিটা কথায় ধাপে ধাপে অবাধ্য হয়, তাই বলে

আজও হবে? হতেই হবে? নিজের কথা শেষ করে ডাক্তার দাঁড়ালেন না নার্সকে সাইন নিতে বলে ওটিতে ঢুকে গেলেন। শুদ্ধ অনড় হয়ে এখনো তাকিয়ে আছে কাগজটার দিকে। ছাত্র জীবন কিংবা পেশাগত দিক থেকে এ অবধি সে অসংখ্যবার কাগজে সিগনেচার করেছে। নামি-দামি কাগজ সাইন করায় আঁটকে যাওয়া কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। তবে কখনো এমন লাগে নি। বুকের ভেতর এভাবে দুমড়ে মুচড়ে প্রলয়ঙ্কারী ঝড় ওঠে নি। অথচ আজ হাতই চলছে না। কাগজটা মনে হচ্ছে কয়েক টন ভারী। ধরে রাখাতে মনে হচ্ছে শরীরের সবটুকু শক্তি চুষে নিচ্ছে। কয়েক হাত দূরে দাঁড়ানো শারায়ফাত চৌধুরী ছেলের মনের অবস্থা বুঝে এগিয়ে এলেন। কাঁধে হাত রাখলে শুদ্ধ বাবার দিকে তাকাল। বাবাকে দেখে শুদ্ধর খুব ইচ্ছে করল ছোটোবেলার মতো করে অভিযোগ করতে। কিন্তু এখন তো সেসব সাজে? সে যদি বলে ভঙ্গুর মানুষটা আরো ভেঙে পড়বে। তবে সে কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছে বাবার ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে। জ্বলবেই তো শীতল তো উনার কলিজা। দাদীর মতো টকটকে গায়ে রং আর কিছুটা মুখের আদল পাওয়াতে

ভালোবাসাটা যেন আরেকদফা বেশি। ভালোবাসার
জের ধরে অভিযোগ করলেও যে খাটবে না তা খুব
ভালো করেই জানে সে। এদিকে ছেলের মুখ দেখে
শারায়াত চৌধুরীর

কিছু বলার ভাষা পেলেন না। অগত্যা উনি কাগজটা
নিজের হাতে নিয়ে দিক বেদিক না তাকিয়েই
সিগনেচার করে দিলেন। নার্স সেটা নিয়ে স্থান ত্যাগ
করলেন। এদিকে এই ঝামেলার মধ্যে তিনতলা থেকে
খবর এলো ঐশ্বর্যের আরো খারাপ অবস্থা। অসহ্য
জ্বালাপোড়ায় কাঁটা মুরগির মতো ছটফট করছে
বেচারি। কখনো মাকে ডাকছে,, কখনো
বাবাকে,, কখনো বা আল্লাহকে।

আগুনে পোড়া কিংবা এসিডে ঝলসে যাওয়া মানুষের
যে কত কষ্ট সেটা নিজের চোখে না দেখলে বোঝা
যায় না। এদিকে ঐশ্বর্য কাঁদছে আরেক দিকে তার
কান্না দেখে রুবাব কাঁদছে। ওদের কান্না দেখে
শতরূপা বিপদ কাটার দোয়া পড়েই যাচ্ছেন। দোয়া
পড়তে পড়তে উনার চোখে দিয়েও ঝরছে অশ্রুধারা।
এতদিন মেয়েটার বাবার জন্য মেয়েটা বিয়েতে রাজি
হতো না। অন্যদিকে রুবাবও জেদ ধরে তাকে ছাড়া

অন্য কাউকে বিয়ে করবে না বলে রাজি হতো না
দেখে খুব বকাঝকা করতেন। কথা বলাও অফ করে
দিয়েছিলেন। কিন্তু কখনো ছেলে মেয়ে দুটোকে
বদদোয়া দেন নি। অমঙ্গল কামনা করে নি। তবুও
তারা এত কষ্ট পাচ্ছে,,এত কষ্ট চোখে দেখা যায়?
এতিম মেয়েটার সাথে এমন কিছু কি হওয়ায় লাগত?
ঐশ্বর্যের কথা শুনে শুদ্ধ আর দাঁড়াল না। শারায়াত
চৌধুরীকে এখানেই থাকতে বলে দ্রুতপায়ে গেল
তিনতলায়। নিজেই ডাক্তারের সাথে কথা বলল।
সরাসরি জানতে চাইল বেস্ট চিৎকার এখানে সম্ভব
কী না। যদি হয় তাহলে রাখবে নয়তো ইমার্জেন্সি
দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেবে। বসে থাকার সময়
কারো হাতে নাই। অতঃপর ডাক্তারের সাথে ফাইনাল
কথা বলে শুদ্ধ বাইরে এলো। রুবাব দুইহাতে মুখ
ঢেকে চুপ করে বসে আছে।

তার হাতে কবজি গড়িয়ে অশ্রুফোঁটা গড়িয়ে যাচ্ছে।
রুবাব ব্যাকুল হয়ে কেঁদেছিল ওর বাবা মারা
যাওয়ায়। তারপর তাকে এভাবে কাঁদতে দেখে নি
কেউ। শুদ্ধ, সায়ন কখনোই কোনো ভাই-বোনের
কান্না সহ্য পারে না। কেউ কাঁদলে ইচ্ছে করে যত

কষ্টই হোক সব আবদার পূরণ করে হাসি ফোটাতে।
কিন্তু এ মুহূর্তে রুবাবের হাসি ফোটাতে অক্ষম সে।
ওর হাসির কারণ যে বেড়ে গুয়ে ছটফট করছে। শুদ্ধ
ইচ্ছে করে ঐশ্বর্যকে দেখতে গেল না। কারণ এই
অবস্থা তার কাছে যাওয়াও ঠিক হবে না। তবে দূরে
থেকে দেখতে গিয়ে ঐশ্বর্যের চোখে চোখ পড়ে গেল।
ঐশ্বর্য রুবাবকেই খুঁজছিল কিন্তু শুদ্ধকে থেকে ঠোঁট
ভেঙে কেঁদে ফেলল। দুই হাত জোড় করে ক্ষমা চাইল
কারণ সে শুদ্ধর এতদিনের পরিশ্রম রক্ষা করতে
পারে নি। পারে নি শুদ্ধর ল্যাবটা আমানত হিসেবে
পেয়ে সেই আমানত রক্ষা করতে। তাকে কাঁদতে
দেখে শুদ্ধ ঠোঁটে হাসি আঁটল। ঠোঁটের কাছটায় দুই
আঙুলের সাহায্য হাসতে ইশারা করল। কাঁদতে বারণ
করল। ধৈর্য্য ধরতে বলল। ইশারায় বোঝাল আবার
নতুন করে তৈরি করবে। ঐশ্বর্য বুঝল সবই তবে তার
কান্নার বেগ বাড়ল। তাকে ব্যাকুল সুরে কাঁদতে দেখে
শুদ্ধ পুনরায় বোঝাল, সে সর্বদা আছে তার পাশে।
ভাইয়ের মতো এতদিন খেয়াল রেখেছে প্রাণ থাকা
অবধি সেভাবেই দেখবে। সে যেন না কাঁদে। ল্যাবের
জন্য না কষ্ট পায়। তার সুস্থ হতে হবে,, রুবাবের

মুখের হাসি ফোটাতে হলেও তাকে কষ্ট সামলে
উঠতে হবে। শুদ্ধ যতটুকু পারে বোঝাল ঐশ্বর্যকে।
মজার ব্যাপার হচ্ছে, তাদের ল্যাবে একজন বোবা
ছেলে কাজ করতো। ট্যালেন্ট থাকলে প্রতিবন্ধকতা
কোনো ব্যাপার না। ছেলেটা তার কাজ দিয়ে সেটাই
দেখিয়েছিল। মিশুক প্রকৃতির ছেলেটা সবার সাথে
মিশতে চাইত,...কিন্তু কেউ তার কথা বুঝত না দেখে
এড়িয়ে যেতো। কিছু বলতে গেলে বিরক্ত হতো। পরে
শুদ্ধরা তার সঙ্গে ইশারায় কথা বলাটা রপ্ত করে
ফেলেছে। আজকে সেটা কাজে লাগল। অতঃপর
শুদ্ধ ঐশ্বর্যের থেকে বিদায় নিয়ে সরে গিয়ে রুবাবের
কাছে গেল। আশ্তে করে কাঁধে হাত রাখতেই রুবাব
অশ্রুভেজা লালবর্ণ চোখে তাকাল। এই সময় শুদ্ধকে
দেখে রুবাব ঢোক গিলে উঠে দাঁড়াল। তারপর কি
ভেবে চট করে শুদ্ধকে জড়িয়ে ধরল। তারপর
কাঁদতে কাঁদতে বলল,-‘মাফ করে দে ভাই আমরা
তোরা আমানত রক্ষা করতে পারিনি। আমার ঐ..ঐশ্বর্য
ভালো নেই ভাই। ওকেও মাফ করে দে।’
শুদ্ধ থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে। সে রুবাবের কষ্টটা
ফিল করতে পারছে। একই পথের কিনারায় দাঁড়িয়ে

আছে দুজন। কিন্তু যা হয়েছে সেটা ধরে বসে
থাকারও সময় নেই। বরং এক একটা মুহূর্ত এখন
অনেক দামী। সে রুবাবকে বুক থেকে সরিয়ে বলল,
-‘ঐশ্বর্যকে নিয়ে চলে যা।’

রুবাব ভেজা চোখে তাকাল শুদ্ধর দিকে। এই অবস্থায়
কোথায় যাবে?

কিছুই বুঝতে পারল না সে। ভাইয়ের মনোভাব বুঝে
শুদ্ধ ছোট করে উত্তর দিলো,

-‘দুই ঘন্টার মধ্যে দেশ ছাড়বি তোরা, প্রস্তুত হো।’

একথা বলে শুদ্ধ তাকাল শতরূপা চৌধুরী দিকে।
তারপর উনার সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে উনার হাত
দুটো ধরে বিনয়ী সুরে বলল,-‘ছেলের বিপদে যদি মা
পাশে না থাকে তাহলে কে থাকবে বলো তো? এতিম
মেয়েটার পৃথিবীতে কেউ নেই। তুমি তো মা,,তোমার
শক্তিশালী দোয়ায় মেয়েটা বেঁচে ফিরতেও পারে।
ফুপী,, তুমিও যাও ওদের সাথে।’

শতরূপা চৌধুরী মলিন হেসে শুদ্ধর মাথায় হাত
বুলিয়ে দিলেন। কপালে চুমু ঐঁকে দিলেন। দূরে
থাকলেও বাড়ির সব ঘটনা উনার কানে পৌঁছায়।

সবই জানেন তিনি। শীতলের মরণদশায় শত্রুপোক্ত
ছেলেটার হাল দেখে কেন জানি খুব করে জিজ্ঞাসা
করতে ইচ্ছে করল,

-‘এতদিন এত ভালোবাসা কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলি
আব্বা? একদিনে এ কি হাল তোর? নিজের বুকে
লাভা জমিয়ে ছোট ভাইয়ের বুকের ব্যথা কমাতে ছুঁতে
এসেছিস? তার পাশে ছায়া হয়ে দাঁড়াচ্ছিস? অসুস্থ
মেয়েটা

যে ক্ষণে ক্ষণে বাঁচার হাল ছেড়ে দিচ্ছে দূরে দাঁড়িয়েও
এভাবে মনোবল বাড়াচ্ছিস? এক শরীরে কত রূপ
দেখাবি বাবা? এত ধৈর্যশক্তি কোথায় পেলি? ছোট
শুদ্ধটা এত বুঝদারই বা কবে হলো? সিতারা চৌধুরী
সত্যিই রত্নগর্ভা রে।’

এ পরিস্থিতিতে এসব কথা বড্ড বেমানান তাই কথা
বাড়ালেন না। শুদ্ধর ফোনে কল এলে সে কল রিসিভ
করতেই অর্ক বলল,-‘আব্বু-আম্মু বর্তমানে বিডিতে
আছে। সিঙ্গাপুরের বাসাটা ফাঁকা পড়ে আছে। আম্মুর
শখের বাড়ি, ছাদ-বাগান ভাড়াটিয়ারা যদি নষ্ট করে
দেয় তাই ভাড়া দিয়ে আসে নি। টেক কেয়ারের জন্য
শুধু দুজনকে রেখেছে।

ফুপি মা ওখানে গিয়ে আমাদের বাড়িতে থাকবে। তুই
উনাদের পাঠিয়ে দে। আলাদা করে হোটেল
ফোটেলের ঝামেলায় যেতে হবে না। তাছাড়া
হসপিটাল আমাদের বাসার কাছে তা তো জানিসই।’

-‘তবুও..।’

-‘কাহিনি করিস না যা বলছি শোন। আমি যেভাবেই
হোক চাবি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর রুবাবকে বল আমরা
সবাই আছি ভেঙে পড়লে হবে না। ও ভেঙে পড়লে
ঐশ্বর্য হাল ছেড়ে দেবে।’-‘হুম।’

-‘শীতল?’

-‘ভালো নেই,, দ..দোয়া করিস।’

একথা বলে শুদ্ধ কল কেটে রুবাবের কাঁধে একবার
হাত রেখে দোতলায় চলে গেল। গিয়ে দেখে সায়ন
ভুলস্থুল বাঁধিয়ে ফেলেছে। তাকেও থামিয়ে শান্ত
করল। তারপর ইমার্জেন্সিভাবে ঐশ্বর্যকে দেশের
বাইরে পাঠানোর বন্দবস্ত করে ফেলল। সব ঠিকঠাক
করতে করতে ঘন্টা দুই পার হয়ে গেল। অতঃপর
রুবাব সবার দোয়া নিয়ে পাড়ি জমাল দেশের বাইরে।

—‘বাবা? বা...বাবা? ঠিক আছো তুমি? হসপিটালের
আসতে পারবে? কষ্ট করে হলেও এসো না

বাবা....প্লিজ! তোমাকে যে আমার ভীষণ দরকার
বাবা।’

ফোনকলে শুদ্ধর ভেজাকণ্ঠ শুনে শারফাত চৌধুরী
শোয়া থেকে হুড়মুড় করে উঠে বসলেন। কাঁচা ঘুম
ভাঙায় চোখে ঝাপসা দেখছেন। নিজেরও শরীরটা
ভালো না। হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। এখন রাত
আড়াইটা। রাত এগারোটার দিকে স্বপরিবারে সবাই
বাড়ি ফিরেছিলেন তাও শুদ্ধর কথায়। তখন শীতল
একটু ভালো ছিল। তাহলে কি আবার খারাপ হয়ে
গেছে? শুদ্ধ কাঁদছে কেন এভাবে? অকারণে কাঁদার
ছেলে তো শুদ্ধ না। বিপদে না পড়লে দুই ছেলের কেউ
কখনো এভাবে ডাকে না। শারফাত চৌধুরী যেভাবে
ছিলেন সেভাবেই গাড়ির চাবি নিয়ে নামতেই পা
সড়কে গেল। আসবাবপত্রে ব্যথা পেলেন। সেই
ব্যথাকে তোয়াক্কা না করে রুমের বাইরে আসতেই
দেখে এখনো কেউ কেউ জেগে আছে। উনাতে
এভাবে আসতে দেখে সিঁতারা, সিরাত, সিমিন,
সাফওয়ান চৌধুরী কিছু বলার আগেই উনি বললেন
হসপিটালে যাচ্ছে। একথা শুনে সকলে তড়িৎ উঠে
দাঁড়াল। এতরাতে যাচ্ছে মানে আবারও কিছু ঘটেছে।

শায়াফাত চৌধুরী মানা করলেও কেউই শুনলেন না
বরং শখ স্বর্ণকে ঘুমন্ত সাম্য সৃজনের দিকে খেয়াল
রাখতে বলে হসপিটালের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলেন।
গেটে থাকা দারোয়ানকে আদেশ করে গেলে চোখ
কান খেলা রাখতে। শুদ্ধকে কেবিনের বাইরে না দেখে
সকলে ধীরে ধীরে কেবিনে ঢুকতেই হতবাক হয়ে
গেলেন। কারণ কেবিনে শুধু শুদ্ধ 'ই না মাফিয়া কিং
ইয়াসির খানও উপস্থিত! কথা হচ্ছে, সে এখানে
কেন? প্রচলিত কথায় বলে বিপদের বন্ধু নাকি প্রকৃত
বন্ধু। প্রকৃত বন্ধুর গায়ে অবশ্য সেই 'প্রকৃত' ট্যাগ
লেখা থাকে না। থাকে তার কর্মে। তার বিবেকে।
তার ব্যবহারে ও বন্ধুর প্রতি তার ভালোবাসার ধরনে।
প্রতিটা মানুষের জীবনে পালাক্রমে দুটো কালের
নিয়ম নির্ধারিত থাকে; সুখকাল কখনো বা দুঃখকাল।
সময় নির্ধারিত করে দেয় সেই কালের হিসাব। জীবন
সেই কালের উপর ভর দিয়ে ধীরে ধীরে বয়ে যায়
নিজ নিয়মে, নিজ গতিতে। বর্তমানে শুদ্ধর সময়টা
বোধহয় দুঃখকালের কবলে। নতুবা একসাথে এত
খারাপ সময় তার জীবনে কখনো আসে নি। কখনো
এত দিশেহারা বোধ করে নি। এতটা অস্থির হতে

দেখে নি। আর তার খারাপ সময়টাতে তার বন্ধুরা
অদৃশ্যভাবে আগলে রাখতে উঠে পড়ে লেগেছে। তারা
যখনই শুনেছে শুদ্ধর ল্যাবে হামলা হয়েছে তখন
থেকে ফুঁসে উঠেছে। এমনিতে তাদের একসাথে দেখে
মনে হয়, এরা তো হাসি-আড্ডাতে সময় কাটায়, এরা
কাজ করে কখন? এদের মধ্যে সিরিয়াসনেস নেই
এরা কিভাবে কী আবিষ্কার করবে? তারা একসাথে
থাকলে তাদের খুনশুঁটি দেখলে মনেও হয় না তারা
সায়েন্টিস্টের মতো পেশাতে সংযুক্ত। কিন্তু এ
পরিস্থিতিতে

তারা ফ্রেন্ডলি খোলস সাইডে রেখেছে। প্রত্যেকজন
কঠিন রূপে নিজের অবস্থান, ক্ষমতা দেখাতে ব্যস্ত।
যেসব ক্ষমতা থাকা পরেও তারা কখনো শো অফ
করে তারা আজ তারাই প্রত্যেকে সেই ক্ষমতা কাজে
লাগাচ্ছে। কেননা শুদ্ধর তীলে তীলে গড়া পরিশ্রম প্রাণ
থাকতে এই দেশের বাইরে যেতে দেবে না। দেবে না
মানে;কোনোভাবেই না। আর এজন্য সর্বপ্রথম ইগরের
দেশের বাইরে যেতে না পারার সব ব্যবস্থা করেছে।
ল্যাব থেকে বেরিয়ে যে রাস্তা ধরে ইগরের লোক
গেছে ফুটেশ কালেক্ট করে তাদের ধরেছে। কারণ

তাদেরকে ধরলে জানা যাবে তাদের লিডারের অবস্থান।

গতকাল রাত থেকে অর্ক, স্যান্ডি, কামরান আর তাদের সাথে রয়েছে শুদ্ধর আরেক ছায়া সাইন। যার কাছে পৃথিবী উল্টো যাক তার পরিবার, তার ভাই-বোনরা ভালো থাক। যখনই তার কানে পৌঁছেছে শুদ্ধর এতবড় ক্ষতির কথা তখন থেকে সে যেন ক্ষাপা ষাঁড়। মুখের ভাষা লাগামছাড়া। রাগ আকাশচুম্বী। ইগরকে গুঁতিয়ে সমস্ত ফর্মুলা না হাতানো অবধি সেও থামবে না। তবে শীতলের কথা শুনে ছুঁটে গিয়ে একবার দেখে পুনরায় ফিরে এসেছে। হাসানকে শুদ্ধর কাছে থাকতে বলে অর্ক, স্যান্ডি, সাইন, কামরান এই চারমূর্তি গোপনে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। শুদ্ধর ল্যাভে থাকা প্রতিটা জিনিস তারা সরিয়ে ফেলেছে। ইগর শুধু বেশি বাজেটের ফর্মুলা হাতিয়েছে আরো আছে যেগুলোর খবর সে জানে না। শুদ্ধর বিপদে সেও জানে এবং আবার ফিরে আসতে পারে। বাঙালি কিংবা অবাঙালি রক্তে মাংসে গড়া মানুষ তো মনে লোভ থাকবেই। আর এই লোভ কারো বিপদ মানা দূর বরং আরো বিপদে ফেলে তার সার্থ হাসিলে উঠে

পড়ে লাগবে। যেটা ইয়াসিরকে কাজে লাগিয়ে ইগর করতে চাচ্ছে। শীতলকে কিডন্যাপ

শুদ্ধর উদ্ধার করা এসব এক একটা প্ল্যানের অংশ। যাতে শুদ্ধ শীতলের দিকে ব্যস্ত থাকে আর এ সুযোগে ইগর তার ফর্মুলা হাতিয়ে সরে পড়তে পারে। এ অবধি তাদের দুটো প্ল্যানই সাকসেস এখন দেশের বাইরে যেতে

পারলে শুদ্ধরও আর কিছুই করার থাকবে না। কিন্তু শুদ্ধ তো একা নয়! শুদ্ধ যেমন কারো বিপদে নিজের সর্বোচ্চ দিয়ে পাশে থাকে তেমনি তার বন্ধুরাও। তারাও দেখিয়ে দেবে শুদ্ধ একা নয়; তার বন্ধুরা ছিল, আছে, দেহে প্রাণ থাকলে ভবিষ্যতেও থাকবে। এদিকে তারা যে এসবই করছে শুদ্ধ জানে না। কারণ সকাল থেকে শুদ্ধ হসপিটালের একদিকটা সামাল দিচ্ছে। শীতলের বর্তমান অবস্থা তাকে দিশেহারা করে তুলেছে। ঐশ্বর্যের চিকিৎসা নিয়ে আপাতত চিন্তা নেই কারণ তাকে বেস্ট চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। এখন ঐশ্বর্যের যদি জীবনআয়ু থাকে, তার চার আঙুলের কপালে যদি সুখ থাকে, রুবারের ভালোবাসায় যদি জোর থাকে তাহলে তারা ফিরবে;

ফিরতে তাদের হবেই। সকাল পেরিয়ে দুপুর আর
দুপুর পেরিয়ে হলো সন্ধ্যা। পরিবারের সকলে
এখনো সেভাবেই বসে আছে। কারো দেহে যেন প্রাণ
নেই। চোখের কোল ভেজা। অসহায় মুখ। শীতলকে
ওটি থেকে বের করে আইসিইউতে রাখা হয়েছে।
পেশেন্টের অবস্থা যখন গুরুতর হয়ে যায় তখনই
সেখানে রাখা

হয়। শীতলের ক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে। মাগরিবের
আজানের পরপর হাসান এসে শুদ্ধর পাশে দাঁড়াল।
তারও কপালে ব্যাণ্ডেজ। মুখজুড়ে বড় ছোট আঘাতের
চিহ্ন। সে শুদ্ধকে এখনো আগের বেশে দেখে দীর্ঘ
শ্বাস ছাড়ল। হাতে থাকা শপিং ব্যাগটা এগিয়ে দিয়ে
বলল,- ‘ফ্রেশ হয়ে আয়।’

শুদ্ধ আইসিইউ এর সামনে থাকা চেয়ারে বসেছিল।
তাকে জোর করেও কেউ কিছু খাওয়াতে পারে নি
আর না বাড়িতে পাঠাতে পেরেছে। শুদ্ধ উঠছে না
দেখে হাসান জোর করে দাঁড়িয়ে করিয়ে ধরে ঠেলে
ফ্রেশ হতে পাঠাল। হাসান চেষ্টা করে বলল একেবারে
শাওয়ার নিতে তাহলে শরীরটা হালকা লাগবে। শুদ্ধ
হ্যাঁ না কিছুই বলল না শুধু হাসানকে এখান থেকে

নড়তে বারণ করে ফ্রেশ হতে গেল। সে যেতেই হাসান শখ, স্বর্ণ, সাম্য, সৃজনকে ডেকে কিছু যুক্তি পরামর্শ করে যে যেভাবে ছিল সেভাবেই বসে পড়ল। শুদ্ধ যত দ্রুত সম্ভব শাওয়ার নিয়ে ফ্রেশ হয়ে ফিরে এলো। এসে বসতেই সাম্য সৃজন গিয়ে শুদ্ধর গা ঘেঁষে বসল। শুদ্ধ তাকাতেই সৃজন মলিন মুখে মাথা নিচু নিলো। তাদের শুকনো মুখ দেখে শুদ্ধ বলল,-‘কিছু খেয়েছিস?’ তারা দু’জনই না বোধক মাথা নাড়াল। তারপর মিনমিন করে বলল,
-‘না, তুমি খাইয়ে দাও।’
-‘আজকে নিজে হাতে খা ভাই বাড়ি গিয়ে আমি খাইয়ে দেবো,,প্লিজ।’
সাম্য সৃজন দু’জন দুজনের দিকে তাকিয়ে সম্মতি সূচক মাথা নাড়িয়ে খাবার খেতে চলে গেল। হাসান শুদ্ধর সাথে কথা বলছিল তখন হঠাৎ তারা এসে দু’পাশে দাঁড়িয়ে ছোটো ছোটো খাবারের লোকমা বানিয়ে
শুদ্ধর মুখের সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে। শুদ্ধ মলিন হেসে ওদের বলল,

-‘আমি পরে খাব তোরা খা।’

তখন সাম্য জবাব দিলো,-‘বড় মা বলে কেউ খাবারের লোকমা এগিয়ে দিলে ফিরিয়ে দিতে নেই তাহলে ভাত রাগ করে। তারপর মরে গেলে সেই ভাত ভেমরুল হয়ে হুল ফুটিয়ে দেয়।’

সাম্য কথা শেষ করতেই সৃজন তার লোকমা আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে বলল,

-‘শীতল আপুই কি শুধু তোমাকে ভালোবাসে? আমরাও তো বাসি। খাও না ভাইয়া,,একটু খাও।তুমি না খেলে শীতল আপু সুস্থ হয়ে যখন জানতে পারবে তোমাকে খাওয়াতে পারি নি তখন আমাদেরকে খুব রাগ করবে।’

শুদ্ধ চুপ করে আছে দেখে সিঁতারা এগিয়ে এলেন। ছেলের মাথার, বুকে, পিঠে হাত বুলিয়ে কান্নারত স্বরে খেতে বললেন। শুদ্ধ লালবর্ণ চোখে চুপ করে বসে মাথা নিচু করে বসে আছে। এদের কিভাবে বোঝাবে ভাতের লোকমা তার গলা দিয়ে নামবে না। কিন্তু সাম্য সৃজন আবারও আদুরে সুরে বলল,-‘ভাইয়া একটু খাও।’

একথা বলে সৃজন ফট করে বলল,

-‘সাম্য হাত ধোঁয় নি আমি হাত ধুঁয়েছি আমারটা
খাও ।’

একথা শুনে সাম্য প্রতিবাদ করে বলল,

-‘ মিথ্যে বলছি সৃজন আমিও হাত ধুঁয়েছি ভাইয়া
আমারটা খাবে ।’

একথা বলে সে ছোটো ছোটো শুদ্ধর গাল ধরে কি যে
মিষ্টি করে বলল,

-‘ওহ ভাইয়া খাও ।’

শুদ্ধ আপ্রাণ চেষ্টা করছে নিজেকে সামলানোর। বড়
হয়ে সে কবে কারো সামনে কেঁদেছে মনে পড়ে না।

কিন্তু আজ মনে হচ্ছে নিজেকে সামলাতে পারবে না।

আর এ দুটোকে এখন ফিরিয়ে দিলে নিজেরাও খাবে
না বরং কেঁদে ভাসাবে। সে কিছুক্ষণ চুপ থেকে

বলল,-‘ আমাকে না জ্বালালে তোরা কেউ শান্তি পাস

না তাই না? একজন তো আমার ঘুম হারাম করে

আরামের ঘুম ঘুমাচ্ছে। আমার প্লেটের খাবার না

খেলে নাকি তার পেট’ই ভরে না। তাকেও ডাক,,এসে

আমার খাবারে ভাগ বসাক। তাকে এটাও বলিস সে

ভাগ না বসালে আমার গলা দিয়েও কিছু নামতে চায়

না।’

একথা বলে থেমে সে পুনরায় বলল,

-‘এখন তোদের পাজিটা বোন নেই এজন্য তোরা এসে জ্বালাছিস? কেউ শান্তি দিবি না আমাকে, তাই না? এত জ্বালালে চলে যাব আর ফিরব না বলে দিলাম।’ শুদ্ধর কান্নাভেজা কণ্ঠস্বর শুনে পুনরায় সকলের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে গেল। ছেলেটার যে বুকটা ফেটে যাচ্ছে বুঝতে বাকি নেই কারো। শুদ্ধ থামতেই শখ ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল,

-‘কোথায় যাবে শুনি? আমরাও তোমার পেছন পেছন ঠিক চলে যাব।’

একথা শুনে শুদ্ধ এবার শখের দিকে তাকাল। শখের কান্নারত লাল হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকাতেই চোখ পড়ল স্বর্ণের দিকে। স্বর্ণ ছলছল চোখে তাকিয়ে আছে। সে সবার মতো মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। চৌধুরী নিবাসে ভাই-বোনদের মধ্যে মুখচোরা স্বভাবের হচ্ছে শুদ্ধ আর স্বর্ণ। শুদ্ধ চারজনের দিকে তাকিয়ে দেখে চারজনই প্লেট হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সে এবার সাম্যের হাতের খাবারটা মুখে নিলো। চিবানোর আগে

চোখ থেকে ঝরঝর করে অশ্রু ঝরে গেল। সৃজন সেই অশ্রু হাতে ছোটো হাতে মুছে দিয়ে তার লোকমা বাড়িয়ে দিলো। সেটা শুদ্ধ মুখে নিতেই শখ এগিয়ে এলো। ভাইয়ের দিকে লোকমা বাড়িয়ে দিয়ে বলল,-‘শীতলকে কৌফিয়ত দিবে হবে তো না কি? আমি কিন্তু মিথ্যা বলতে পারব না।’

হাসান অদূরে দাঁড়িয়ে ছলছল চোখে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে আছে। বেচারি শুদ্ধ না পারছে ভাত গিলতে না পারলে ভালোবাসা মেশানো ভাত উগলে দিতে। সে পানির বোতল এগিয়ে দিলে শুদ্ধ পানি দিয়ে ভাত গিলল শুধু। তারপর নিলো শখের বাড়িয়ে দেওয়া লোকমা। স্বর্ণ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে তার হাতেও ভাতের লোকমা। তবে সবার মতো সে এগিয়ে আসে নি দেখে শুদ্ধই বলল,-‘সবাই যে যেমন পারছে অত্যাচার করছে তুই বাদ যাবি কেন,,আয়।’

স্বর্ণ এগিয়ে এসে সেও ভাইয়ের মুখে ভাত তুলে দিলো। বাকিদের মতো সে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে পারে না। যদি পারত তাহলে ছোটো বোনটার জন্য সে প্রাণভরে কাঁদত। সে এগিয়ে শুদ্ধর মুখে লোকমা দিলো তবে কিছু বলতে চাইলেও বলতে পারল না।

শুদ্ধ অনেক কষ্ট খাবার গিলে ওদের খেতে বলল।
কেও ঠিকঠাক খেতে পারল না তবে দু'একবার মুখে
দিয়ে রেখে দিলো। এরপর চার ভাই-বোন শুদ্ধর পাশ
ঘেঁষে কাঁধে মাথা রেখে বসল। চুপ করে পাঁচ ভাই-
বোন তাকিয়ে আছে আইসিইউ রুমের দরজার দিকে।
অপেক্ষা করছে কখন শীতল উঠে দৌড়ে এসে বলবে,
'হসপিটালে মানুষ থাকে নাকি? তোমরা আমাকে
ওখানে রেখে এখানে কী শলা-পরামর্শ করছো? যা
করেছো বেশ করেছো আবার প্রথম থেকে শুরু
করো।' কিন্তু আফসোস সে আসবে না। উঠে আসার
ক্ষমতায় তার নেই। সেভাবে বসে থেকে অনেকক্ষণ
কেটে গেল। সারাদিন যেমন তেমন গেলেও
সাম্য,,সৃজন শুদ্ধর হাত আঁকড়ে ধরে তাড়াতাড়ি
ঘুমিয়ে গেছে। শুদ্ধ দু'হাত বাড়িয়ে দুপাশ থেকে বুকে
আগলে রাখল খুব যত্ন সহকারে।

সেখানে যাওয়া-আসা করতে থাকা নার্স ডাক্তাররাও
মুগ্ধ হলেন তাদের ভাই-বোনদের এমন ভালোবাসা
দেখে। বেশ কিছুক্ষণ পর নার্স জানাল শীতলের
হার্টবিট স্বাভাবিক হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে খুব
তাড়াতাড়ি তার জ্ঞান ফিরবে। সত্যি সত্যিই তার জ্ঞান

ফিরল। ছটফট করে খুঁজল লাগল শুদ্ধকে। বাড়ির সবাই একে একে দেখা করে গেল। তবে শীতলের চোখ খুঁজে চলেছে তার বিশুদ্ধ পুরুষকেই। যেই তার সাথে দেখা করতে গেছে তাকে জিজ্ঞাসা করেছে শুদ্ধর কথা। শুদ্ধ শুনল ঠিকই তবে গেল না। সে যাচ্ছে না দেখে হাসান বলল,-‘যাচ্ছিস না কেন?’

-‘এতক্ষণ আমাকে টেনশনে আধমরা করে এখন ডাকলেই আমায় যেতে হবে? যাব না।’

একথা শুনে হাসান এবার হেসেই ফেলল। এদিকে রাত অনেক বেড়েছে।

হসপিটালেও ভিড় বেড়েছে। ওটি কিংবা আইসিইউর সামনে এতজনকে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যরা এই নিয়ে ঝামেলা করছে। পরে বাধ্য হয়েই ম্যানেজার শুদ্ধকে একথা জানাল। শুদ্ধ শুনে শারায়াত চৌধুরীকে বলল সবাইকে নিয়ে চলে যেতে। হাসান থাকবে, সাইন থাকবে কোনো সমস্যা হবে না। সাইনের কথা উঠতেই শারায়াত চৌধুরী বললেন,-‘তা সে কোথায়? কি এমন রাজকার্য করে বেড়াচ্ছে যে বিপদের দিনেও ভাইয়ের কাছে এসে বসার সময় পাচ্ছে না। তাকে

ডাকো। ডেকে বলো যেখানেই থাকুক এম্মুণি যেন উপস্থিত হয়।’

উনার কথা শুনে স্বর্ণ জানাল রাস্তায় আছে চলে আসবে। যদিও মোটেও তা নয়। আসলে কথা বললেই কথা বাড়বে তাই একথা বলে থামাল সে।

তারপর শীতলকে আইসিইউ রুমথেকে ভিআইপি কেবিনে নেওয়া হলো। আরেকদফা সবার সাথে দেখা হলো শীতলের। শুদ্ধ আবার তাড়া দিতেই উনারা যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেও সিমিন চুপ করে বসে রইল শীতলের হাত ধরে। সবার যাওয়ার কথা শুনে শীতলের হাসিটুকু মুছে গেল। শক্ত করে মায়ের হাত আঁকড়ে ধরল। বড় মার দিকেও করুণ চোখে তাকাল। অনেক কষ্টে বড় আব্বুকে অনুরোধ করল তাকেও নিয়ে যেতে। এখানে একা থাকতে পারবে না হসপিটালে থাকতে ভালো লাগে না তার। এসব অবান্তর কথায় সময় যাচ্ছে দেখে শুদ্ধ কেবিনে এলো। শীতলের দিকে না তাকিয়ে সবাই আরেকবার তাড়াও দিলো। শীতল বুঝল শুদ্ধ থাকবে। তাই সে কথা কোনো কথা বাড়াল না বরং সবার যাওয়ার

পরপরই শুদ্ধর বুকে হামলে পড়ার অপেক্ষায় রইল।
বাকিরা একে একে গেলেও সিমিন
এখনো স্থির হয়ে বসে আছেন। মায়ের মন যেতে
সায় দিচ্ছে না। উনাকে বসে থাকতে দেখে তখন শুদ্ধ
অন্যদিকে তাকিয়ে বলল,- ‘শরীর খারাপ করলে মাকে
সামলাব নাকি মেয়েকে? এরচেয়ে বাড়িতে যাওয়া
উচিত।’

একথা শুনে সিমিন ফোলা চোখ তুলে তাকালে শুদ্ধ
পুনরায় বলল,

-‘আমাকে বিশ্বাস করতে না পারলে থাকতে পারেন।
আলটার অল, আমি পরের ছেলে আপনার তো আর
কেউ না। হতেও পারি নি কখনো।’

সিমিন আর কিছুই বলতে পারলেন না আঁচলে চোখ
মুছতে মুছতে সবার সাথে বেরিয়ে গেলেন। শুদ্ধ
একবার শীতলের তাকিয়ে নিজেও বেরিয়ে গেল।
তারপরে নার্স এলো স্যালাইন বদলে সেই স্যালাইনেই
ইনজেকশন পুশ করে টুকটাক কথা বলল। শীতল
জবাব দিলো না শুধু শুনেই গেল। কথার বলার মাঝে
পূর্বের মেডিসিনের প্রভাবে চোখে আবার ঘুম নেমে
এলো। শারায়াত চৌধুরীদের বাড়ি পাঠিয়ে কেবল

কেবিনে প্রবেশ করল শুদ্ধ। সারাটা দিন সবাইকে
চিন্তায় ফেলে আবারও শান্তির ঘুম ঘুমাচ্ছে
বেয়াদবটা। তার জন্য কয়েক মিনিট একটু অপেক্ষা
করাও গেল না। এ আবার নাকি খুব ভালোবাসে
তাকে। মনে মনে এসব ভেবে সে কেবিনের দরজা
আঁটকে এগিয়ে গেল শীতলের দিকে। বসল শীতলের
শিয়রে। তারপর শীতলের গালে একহাত রেখে
তাকিয়েই রইল একদৃষ্টিতে। ইশ! আদুরে মুখটা
শুকিয়ে আছে। চোখের নিচের বিষণ্ণতার ছাপা। সে
একটু এগিয়ে যত্ন করে আদর ঐঁকে দিলো শীতলের
কপালের ঠিক মাঝখানে। ব্যাঙাচি আজ তাকে দুর্বল
করে দিয়েছে। এতদিনের গড়া শক্ত খোলসটা
নড়বড়ে করে দিয়েছে। সে কপালে কপাল ঠেকাতেই
বেহায়া অশ্রু ঝরে পড়ল শীতলের বন্ধ চোখের
পাতায়। কেঁপে উঠল শীতল, তবে সে চোখ খুলে
তাকাল না। অন্যসময় হলে হয়তো খুব লজ্জা পেতো
নতুবা খুশিতে লাফিয়ে উঠত। পরিস্থিতি এমন যে
মেডিসিনের প্রভাবে এখন চোখ খুলে তাকাচ্ছে না।
তার এই নিশ্চুপতা সহ্য হচ্ছে না শুদ্ধর, তাই বিরবির
করে বলল,

-‘ নীরাবতাকে অস্ত্র করে আমার ভালো থাকার
অধিকারটুকু কেড়ে নিস না ব্যাঙাচি। বিশ্বাস কর,
আমার পুরো পৃথিবী থমকে গেছে। ফিরে আয়,
আগের মতো চঞ্চলতা নিয়ে জেগে উঠ। ‘ভালোবাসি’
বলে একবার বুকে লাফিয়ে পড়। নিভিয়ে দে উত্তপ্ত
আগুনের ন্যায় জ্বলতে থাকা অসহ্যকর যন্ত্রণা।’ এইটুকু
বলতেই কেবিনের দরজায় নক পড়তেই শুদ্ধ থেমে
গেল। পেছন ফিরে চোখ মুছে দরজা খুলে দেখল নার্স
দাঁড়িয়ে আছে। সে ভ্রুঁ কুঁচকে তাকাতেই নার্স জানাল
তাকে এম্ফুগি ডাক্তাররুমে ডাকছে। জরুরি কথা
বলবেন। শুদ্ধ পেছন ফিরে একবার শীতলকে দেখে
কেবিনের দরজাটা চাপিয়ে দিয়ে নার্সকে বলল
এখানেই থাকতে। সে না আসা অবধি যেন কোথায়
না যায়। নার্স সম্মতি জানাতেই শুদ্ধ চলে গেল
চারতলায়। যে ডাক্তার শীতলকে দেখছে উনি এখন
আছেন চারতলায়। সে লিফ্টে ঢুকে যেতেই খোঁড়াতে
খোঁড়াতে ইয়াসির প্রবেশ করল কেবিনে। শীতলের
মুখ পানে তাকিয়ে দিকশূন্য হয়ে রাগে হিসহিসিয়ে
করতে করতে চেপে ধরল শীতলের গলা অন্য হাতে
চেপে ধরল নাক। আচমকা শ্বাস নিতে না পেরে

ছটফটিয়ে উঠল শীতল। চোখ খুলে ইয়াসিরকে দেখে
তার চোখের কোণ বেয়ে জল গড়াতে লাগল। তাকে
কাঁদতে দেখে ইয়াসিরের হাতটাও থেমে গেল। সে
শীতলের মুখটা আগলে ধরে আচমকা সারা মুখে
একের পর এক চুমু ঐঁকে ব্যাকুল সুরে কাঁদতে
কাঁদতে লাগল। শীতল হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।
কোনো পুরুষ এভাবেও কাঁদতে পারে? আর কাঁদছেই
বা কেন? এত অল্পদিনেও কাউকে এতটা ভালোবাসা
যায়? বাসা কি সম্ভব?মাফিয়ারা নাকি নির্দয়, নিষ্ঠুর
তাদের পাষাণ মনে কি ভালোবাসা জন্মে?

তাকে এভাবে তাকাতে দেখে ইয়াসির শীতলের
ক্যানেলা লাগানো হাতটা

আলতো করে ধরল। তারপর সেই হাতে নিজের
কপাল ঠেঁকিয়ে কান্নার স্বরে বলল,

-‘ এ্যাই বাবুই এত পাষাণ কেন তুই? তখন বুক
কাঁপল না গুলির সামনে

দাঁড়িয়ে যেতে? এত সাহস কোথায় পেলি, হুম? কেন
পাগলের মতো ওই শুদ্ধকে ভালোবাসিস ? ওর জন্য
মরতেও দ্বিধা করিস না? কই,,আমাকে তো কেউ
এভাবে ভালোবাসে না? কেন রে আমাকে কী

ভালোবাসা যায় না? কেন যায় না? আমার তো এ
পৃথিবীতে কেউ নেই, কেউ না। আমার জন্য কেউ
গুলির সামনেও দাঁড়ায় না। আমাকে বাঁচাতে পাগলের
মতো কাঁদেও না। ওই, ওই শুদ্ধর তো সবাই আছে।
মা আছে, বাবা আছে, বাড়ি ভর্তি সবার ভালোবাসা
পায় সে। না খেয়ে থাকলে ভাই-বোনরা কৌশলে
খাওয়ায় তাকে। কই আমিও তো সারাদিন ধরে না
খেয়ে আছি কেউ তো ছোটো ছোটো হাতে আমার
মুখের সামনে শুকনো রুটিও ধরল না। কেউ কেঁদে
কেঁদে আদুরে সুরে বলল না, 'ভাইয়া খাও।' শোন বাবুই
শুদ্ধর জন্য সবাই আছে, সব আছে। এতজনের মধ্যে
তুই যদি না থাকিস ওর কিছুই হবে না। বাবুই,, পাখি
আমার, ওকে ভুলে যা, করুণ করে হলেও আমাকে
ভালোবাস,, একটু,, সামান্য একটু। আমার ভীষণ
হিংসে হচ্ছে শুদ্ধকে। মেরে ফেলতে ইচ্ছে করছে। ও
তোকে হাসপিটালে নিয়ে এলো বলে সেটা ভালোবাসা
হয়ে গেল? দেখ না,,,,, দেখ,, আমিও গাভর্তি জ্বর নিয়ে
তোর কাছে ছুটে এসেছি। গুলি আমার পায়েও
লেগেছে ইচ্ছে করে নি সেটা বের করার। শুধু তোকে
দেখতে সেই সকাল থেকে চাতক পাখির মতো

অপেক্ষা করেছি। একা একা ছটফট করছি তোর কষ্ট
দেখে। আমার টা কি ভালোবাসা না? ভালোবাসা
কোনটা,,,,,কাকে বলে ভালোবাসা, হ্যাঁ? বল, বল না
কিভাবে ভালোবাসতে হয়? তুই আমাকে শিখিয়ে দে
নাহয়, আমি সেভাবেই সেই নিয়মেই ভালোবাসব
তোকে। প্রমিস, সেই নিয়মের অবাধ্য হবো না, একটু
না, একফোঁটাও না।’-‘এ্যাঁই যে আমাদের লাভগুরু
শোয়াইব শুদ্ধ ওইদিকে কই যাস?’

লিফট থেকে বেরিয়ে কয়েক ধাপ এগোতেই হাসানের
গলা শুনে দাঁড়িয়ে গেল শুদ্ধ। হাসান এগিয়ে এসে
হাসতে হাসতে শুদ্ধর কাঁধ চাপড়ে বলল,

-‘সোনা বাঁধানো কপাল রে তোর ভাই নয়তো কেমনে
কী! আমি দৃশ্যটুকু জাস্ট ভুলতে পারছি না। এই
তোর ব্যাঙাচি! যাক অবশেষে আল্লাহর

দরবারে লাখ লাখ শুকরিয়া যে এখন সব ঠিকঠাক।’
শুদ্ধ আপাতত সকালের সেসব ঘটনার ধার না ঘেঁষে
ভ্রুঁ কুঁচকে বলল,-‘তোকে রেস্ট করতে পাঠিয়েছি তুই
এখানে কি করছিস?’

-‘ঘুম আসছে না তাই পায়চারি করছিলাম। আমার
কথা রাখ। আগে বল

তুই এখানে কেন? তোকে না প্রেম করতে স্পেস দিয়ে এলাম?’

-‘ডাক্তার ডেকেছে।’

-‘ডাক্তার? কোন ডাক্তার?’

-‘আলতাফ খন্দকার।’

-‘হঠাৎ?’

-‘জানি না। কি বলবে শুনতেই তো যাচ্ছিলাম।’-‘তুই সিওর? না মানে আমি কিন্তু পাকিং লটে আলতাফ স্যারকে অনেক আগে বেরিয়ে যেতে দেখেছি। কথাও হয়েছে আমার সাথে। আমি যতদূর জানি উনার ভাবি সুইসাইড করেছে আজ রাতে উনি হসপিটালে থাকতে পারবে না। এজন্য মুজাহিদ স্যারকে দায়িত্ব দিয়ে উনি ছুটেছেন ফেনির পথে।’

একথা শুনে হাঁটতে থাকা শুদ্ধর পা আচমকায় থেমে গেল। তড়িৎ ঘাড় ঘুরিয়ে হাসানের দিকে তাকাতেই চোখাচোখি হলো। অতঃপর কিছু বুঝে দুই বন্ধু দৌড়ানো শুরু করল। তাদের মস্তিষ্কে ক্যাচ করেছে খারাপ কিছুই ইঙ্গিত। লিফটের আশা না করে সিঁড়ি দিয়েই নামতে লাগল দ্রুত গতিতে। কেবিনের কাছে

এসে দেখে রেখে যাওয়া নার্স আশপাশের কোথাও নেই।

কেবিনের দরজা টানতে গিয়ে দেখে ভেতর থেকে বন্ধ। শীতল তো তখন ঘুমাচ্ছিল তাহলে কে লক করল? ভেতর থেকে গোঙানির শব্দ আসছে। পুরুষালি কণ্ঠস্বরও শোনা যাচ্ছে। হাসান শুদ্ধর দিকে তাকিয়ে আতঙ্কিত

গলায় বলল,-‘ভাই...ইয়াসির ভেতরে নাকি? ও কিভাবে? ওর গলায় তো মনে হচ্ছে। ‘

শুদ্ধ জবাব দিলো না বরং লাথি দিতে লাগল কেবিনের দরজায়। হাসান নিজেও লাথি কষাল দরজায়। পরপর লাথি দিতেই খুলে গেল দরজাটা।

তারা কেবিনে ঢুকে দেখে ইয়াসির শক্ত হাতে চেপে ধরে আছে শীতলের গলা। আর উন্মাদের মতো সমানে চোঁচিয়ে বলেই যাচ্ছে,

-‘কেন ভালোবাসবি না আমায়, হ্যাঁ? কেন বাসবি না? শুদ্ধর জন্য? ওকে,

তাহলে তোরও বাঁচার দরকার নেই। মরে যা তুই, প্রয়োজনে তোর কবরে রোজ কাঁচা ফুল দেবো নয়তো

তোর দেহকে মমি বানিয়ে আমাকে কাছে রেখে দেবো।’

একথা বলে ইয়াসির হাতের বাঁধন আরো শক্ত করল। নিঃশ্বাস নিতে না পেয়ে শীতল কাটা মুরগির মতো ছটফটিয়েই যাচ্ছে। চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে আসছে। শুদ্ধ ক্ষীণ গতিতে ইয়াসিরের শার্টের কলার ধরে তার দিকে ঘুরাল। তারপর কোনোদিকে না তাকিয়ে একের পর এক ঘুষি দিতেই থাকল। হাতের কাছে না পেয়ে প্যান্টের বেল্ট খুলে মারতে লাগল উন্মাদের মতো করে। ইয়াসির অনেক চেষ্টা করেও পারল না শুদ্ধর সঙ্গে। মার খেতে খেতেই তার নাজেহাল অবস্থা হলো। তবুও সে সমানে বলেই চলেছে, ‘মুক্তি চাস না? মুক্তি? পারি না।’ একথা শুনে শুদ্ধের শরীরে যেন

কেউ আগুন ধরিয়ে দিলো। সে বেল্টটা ছুঁড়ে ফেলে চেয়ার তুলে মারতে গেলে হাসান চিৎকার করে শুদ্ধকে ডেকে উঠল। শীতল হাঁপরের মতো নিঃশ্বাস নিচ্ছে। চিৎকার শুনে শুদ্ধ চেয়ার ফেলেই ছুঁটে গেলে শীতলের কাছে। শীতলকে বুকে আগলে গিয়ে বলতে

লাগল,-‘শী..শীতল! ভয় নেই। এইতো

আমি,,তাকা,,কোথায় কষ্ট হচ্ছে? বল বল আমাকে?’

শীতল ধীরে ধীরে চোখ বুঝে ফেলছে দেখে শুদ্ধ
পাগলের মতো করতে লাগল। বুকের সাথে চেপে
ধরে কত কী বলতে লাগল। গাল চাপড়ে ধরে
ডাকতে লাগল। অবস্থা বেগতিক দেখে হাসান
চিৎকার করে ডাক্তারদের ডাকল। কিন্তু এদিকে কেউ
নেই বিধায় কেউ এলো না। অগত্যা সে দৌড়ে
ইমার্জেন্সি বিভাগ থেকে ডাক্তার ডাকতে গেল।
ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে শীতলের হাতের ক্যানোলা টা
ছিঁটকে কোথায় পড়েছে কে জানে জানে।

ক্যানোলা লাগানো হাতে দিয়ে গলগল করে রক্ত বের
হচ্ছে। গুলি লাগা হাতের ব্যাণ্ডেজে লাল রক্ত ভেসে
উঠেছে। শীতল চোখ বড় বড় করে হাঁ করে নিঃশ্বাস
নিচ্ছে। শীতল হঠাৎ শুদ্ধর হাতটা আঁকড়ে ধরল।
হাঁপাতে হাঁপাতে অনেক কষ্টে উচ্চারণ করল,-‘ কষ্ট
হচ্ছে। শ্বা..শ্ব..নিঃশ্বাস নিতে পাচ্ছি না।’

একথা বলতে বলতে নার্স ডাক্তারও ছুটে এলো।
পেশেন্টের অবস্থা দেখে অক্সিজেন মাস্ক লাগিয়ে
দিলো। শীতল হাঁপড়ের মতো শ্বাস নিতে লাগল

একের পর এক। হার্টবিট দ্রুত গতিতে ছুঁটছে। তার চোখের কোণা বেয়ে ঝরছে অশ্রুবিन्दু। বেশ কিছুক্ষণ পর শীতলের নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হলো।

সে অক্সিজেন মাস্কটা সরাতে গেলে শুদ্ধ বারণ করলে শীতল সেভাবেই

কিছু বলল তবে অস্পষ্ট হলো। বোঝা গেল না। কিন্তু সে কিছু বলার জন্য উতলা দেখে ডাক্তার নিজে বললেন কি বলতে চায় শুনতে। একথা শুনে শীতল মাস্ক সরাল ঠিকই তবে কিছু বলতে পারল না। বলতে গেলে তার

শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যাচ্ছে। শুদ্ধ নিবার্ক! সে যেন বাকশক্তিও হারিয়েছে।

নিশ্চুপ হয়ে তাকিয়েই আছে শীতলের মুখপানে। ডাক্তার যদি শীতলকে রেখে শুদ্ধর হার্টবিট চেক করতো তাহলে তাকেও বোধহয় পেশেন্ট বলে চিকিৎসার পরামর্শ দিতেন। তার এই নীরাবতা শীতলের সহ্য হলো না সে ফের হাঁপাতে হাঁপাতে বলল,-‘আমাকে বাড়ি নিয়ে চলুন নয়তো বাড়ির ডাকুন সবাইকে। নয়তো..!’

সে আর পুরো কথা বলতে পারল না তবে উঠে
বসতে চাইল। তার হাত থেকে রক্ত ঝরছে দেখে নার্স
রক্ত পরিষ্কার করছিল। শীতল হাত ছুটিয়ে নিয়ে শুদ্ধর
বুকে আছড়ে পড়ে বলতে লাগল,

-‘আমার কাউকে দরকার নেই। কারো ভালোবাসার
দরকার নেই। আমার আমার শুধু আপনাকেই চাই
মানে শুধুই আপনাকে।’-‘আমি তো শুধু তোর,
তোরই। থাম না,, প্লিজ দোহায় লাগে একটু শান্ত
হো।’

এতক্ষণ ডাক্তার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল ওদেরকেই।
মেয়েটা আঁকড়ে ধরে আছে ছেলেটাকে। বুঝতে বাকি
রইল মূল ঘটনা। তবে পেশেন্টের কনডিশন দেখে
উনি বলতে বাধ্য হলেন,

-‘ইয়াং ম্যান যা চাচ্ছে সম্ভব হলে রাজি হয়ে যাও।
ওর শারীরিক মানসিক দুটোই বাজে ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত
হচ্ছে। গুলির আঘাত কারেন্টের শকের পর ও যে
বেঁচে আছে এটাই তো শুকরিয়া। যতটুকু বুঝছি ওর
হার্টেও সমস্যা করছে। যার কারণে বারবার নিঃশ্বাস
নিতেও কষ্ট হচ্ছে! ওকে স্বাভাবিক করো নয়তো যা
লক্ষণ দেখছি হার্ট অ্যাটাক করতে পারে যখন

তখন।'একথা বলে উনি শীতলকে শান্ত হতে বললেন। কিন্তু শীতল শান্ত হওয়া দূর শুদ্ধর বুকে মাথা ঠেকিয়ে জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগল। পুনরায় অক্সিজেন মাত্র তার মুখে ঢুকিয়ে দিলো শুদ্ধ। সরাতে গেলে জোর ধরে ধরে মাথাটা বুকের সাথে চেপে ধরে থাকল। ওদিকে নড়লেই গুলি লাগা হাত ব্যথায় টনটন করছে। সে অপষ্ট সুরে বিরবির করতে আছে। থামছে না দেখে শুদ্ধ আদুরে সুরে বলল, - 'আমি তোঁর। প্রমাণ চাস, হ্যাঁ? সকালটা হোক সকালেই বিয়ে করব।'

শীতল শুদ্ধর বুকে মাথা ঠেকিয়ে অনবরত মাথা নাড়াল। অর্থাৎ এখনই বিয়ে করবে। তাকে থামানো যাচ্ছে না দেখে ডাক্তার শুদ্ধকে কিছু বলে নার্সকে নিয়ে চলে গেলেন। শীতল রক্তমাখা হাতে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। তার কান্নার চোটে চোখের পানিতে শুদ্ধর বুকটাও ভিজে গেল।

তখন শীতল অস্পষ্ট সুরে হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগল,- 'আমি আপনার বউ হবো শুদ্ধ ভাই। এখনই হবো,,এই মুহূর্তেই হবো। হয় আপনি আমায় এখনই বিয়ে করবেন নয়তো আমাকে মেরে ফেলবেন।

আপনি ছাড়া অন্য কারো অযাচিত স্পর্শ আমার শরীরে এসে লেগেছে।

আমি সহ্য করতে পারছি না। আমি মানতে পারছি না। আপনার পবিত্র ছোঁয়ায় হয় আমাকে পবিত্র করুন নয়তো আজই আমার কবর খোঁড়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন।'তাকে ব্যাকুল সুরে কাঁদতে দেখে শুদ্ধ কিছু বলার ভাষা পেল না। তারও চোখজোড়া ছলছল করে উঠল। অসহায় লাগছে খুব। সে নিজে মেরে শীতলকে কাঁদালে তখন কষ্ট লাগে না। ইচ্ছে করে আরো মেরে, বকে ব্যাঙাটিকে কাঁদাতে। কিন্তু সে ব্যাতীত কারো আঘাতে যখন শীতল কাঁদে ইচ্ছে করে পুরো পৃথিবীর ধ্বংস করে দিতে। সে এতদিন খুব করে চাইত

শীতল ভালোবাসা বুঝুক। সবার সামনে তাকে চাইতে শিখুক। একদিন সে শীতলকে বলেছিল একথা। আজ পরিস্থিতি এমন যে শীতলই ব্যাকুল হয়ে তাকে চাইছে,,তার ব্যাঙাটি তাকে চাইছে। আর কিছু ভাবার সময় নিলো না শুদ্ধ। শীতলের মাথাটা বুকে আগলে নিয়ে পকেট থেকে ফোন বের করল। কয়েকবার ঢোক গিলে নিজেকে সামলাল। প্রথমবার কল রিসিভ

হতেই সে বলল, _'বাবা? বা...বাবা? ঠিক আছে তুমি?
হসপিটালের আসতে পারবে? কষ্ট করে হলেও এসো
না বাবা....প্লিজ! তোমাকে যে আমার ভীষণ দরকার
বাবা।'

-'কি হয়েছে শুদ্ধ? গলা এমন লাগছে কেন? শীতল
মা ঠিক আছে?'

-'এসো বাবা,, তাড়াতাড়ি এসো প্লিজ।'

ফোনকলে শুদ্ধর ভেজাকণ্ড শুনে শারফাত চৌধুরী
শোয়া থেকে হুড়মুড় করে উঠে বসলেন। কাঁচা ঘুম
ভাঙায় চোখে ঝাপসা দেখছেন। নিজেরও শরীরটা
ভালো না। হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। এখন রাত
আড়াইটা। রাত এগারোটার দিকে স্বপরিবারে সবাই
বাড়ি ফিরেছিলেন তাও শুদ্ধর কথায়। তখন শীতল
একটু ভালো ছিল। তাহলে কি আবার খারাপ হয়ে
গেছে? শুদ্ধ কাঁদছে কেন এভাবে? অকারণে কাঁদার
ছেলে তো শুদ্ধ না। বিপদে না পড়লে দুই ছেলের কেউ
কখনো এভাবে ডাকে না। শারফাত চৌধুরী যেভাবে
ছিলেন সেভাবেই গাড়ির চাবি নিয়ে নামতেই পা
সড়কে গেল। আসবাবপত্রে ব্যথা পেলেন। ব্যথা গিলে
কল কেটে রুমের বাইরে আসতেই দেখে কেউ কেউ

জেগে আছে। উনাকে এভাবে আসতে দেখে সিঁতারা,
সিরাত, সিমিন, সাফওয়ান চৌধুরী কিছু বলার আগেই
উনি বললেন হসপিটালে যাচ্ছে। একথা শুনে উনারাও
তড়িৎ উঠে দাঁড়াল। এতরাতে যাচ্ছে মানে আবারও
কিছু ঘটেছে? শারায়াত চৌধুরী মানা করলেও কেউই
শুনলেন না বরং শখ স্বর্ণকে ঘুমন্ত সাম্য সৃজনের
দিকে খেয়াল রাখতে বলে হসপিটালের উদ্দেশ্যে
বেরিয়ে গেলেন। গেটে থাকা দারোয়ানকে আদেশ
করে গেলেন চোখ,কান খেলা রাখতে। ওদিকে শুদ্ধ
সায়নকেও আসতে বলল একইভাবে। ভাইয়ের ডাক
শুনে সায়নসহ তার সব বন্ধুরা হাজির হলো
হসপিটালে। হাসান বেরিয়ে গেছে কাজি ডাকতে।
বেরিয়েছে ঠিকই কিন্তু এতরাতে কাজি পাবে কোথায়?
অগত্যা অর্কদের জানাতেই তারা গেল কাজি অফিসের
সামনে। সাইনবোর্ড থাকা ফোননং টুকে কল দিতে
থাকল অনবরত। কাজি অফিসের বিল্ডিংয়েই
থাকতেন কাজি। সবাই মিলে গিয়ে একপ্রকার
চ্যাংদোলা করে তুলে গাড়িতে নিয়ে বসাল। বেচারী
কাজি ভয় টু শব্দ করতে পারলেন না। কারণ
ছেলেগুলো

ভদ্রবেশের হলেও সবকটার মুখ দেখে মনে হচ্ছে
এরা হাসতে জানে না। ভুলভাল কিছু বললেই
ভবলীলা সাঙ্গ করে দেবে। অগত্যা উনি চুপ করে
মনে মনে দোয়া পড়তে শুরু করলেন। এদিকে
ইয়াসির উঠে বসে তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে।
শীতলের বলা প্রতিটা কথায় তার কানে ঢুকেছে। তার
ছোঁয়া এত জঘন্য? শুধু ছুঁয়েছে বলেই সে এভাবে
বলতে পারল? সে তো ছোটো থেকে দেখে বড়
হয়েছে চুমু খাওয়ার ব্যাপারটা খুব কমন। নারী-
পুরুষের দৈহিক ব্যাপারটাও খুব নরমাল। যেখানে সে
শীতলকে দু'বার চুমু খেয়েছে নোংরা স্পর্শ করে নি।
তাও এত ঘৃণা!

এদিকে শারাকাত চৌধুরীরা পৌঁছে শুদ্ধকে কেবিনের
বাইরে না দেখে সকলে কেবিনে ঢুকতেই হতবাক
হয়ে গেলেন। কারণ কেবিনে শুধু শুদ্ধ শীতল না
মাফিয়া কিং ইয়াসির খানও উপস্থিত রয়েছে! রক্তাক্ত
অবস্থায় এখনো সেভাবে বসে আছে। তাকে রাখার
কারণও আছে যদিও। বিশেষ করে শুদ্ধ চাচ্ছে তার
সামনে ওদের বিয়ে সম্পূর্ণ করতে। শীতলের বেহাল

দশা আর ইয়াসিরকে দেখে বড়দের ঘটনা বুঝতেও
দেঁরি হলো না। তবে শুদ্ধর থমথমে মুখ দেখে কেউ
কিছুই বললেন না। নীরবেই মেনে নিলেন। শারীফাত
চৌধুরী নিজেই শাহাদত চৌধুরী কল করে ঘটনাটা
জানালেন।

ভিডিও কলে উনিও উপস্থিত থাকলেন। তখন কাজি
নিয়ে অর্করা এলো।

শীতল মাথায় ওড়না দিয়ে বালিশে হেলান দিয়ে
আধশোয়া হয়ে আছে। শুদ্ধ তার পাশে বসা। বাকিরা
কেবিনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়াল। কাজিকে
আদেশ করতেই উনি লেখালেখি সেরে বিয়ের
পড়ানোও শুরু করলেন। প্রথমে শীতলকে কবুল
বলতে বললে খুব একটা সময় নিলো না শীতল,
এ কয়েকদিনে হাঁপিয়ে গেছে সে। সে এবার
স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে চায়। শুদ্ধর সহধর্মিণীর পরিচয়ে
নিজেকে পরিচিত করতে চায়। তাছাড়া সে বুঝে
গেছে বিয়ে ছাড়া ইয়াসির সহজে তার পেছন ছাড়বে
না। তাদেরকে ভালো থাকতেও দেবে না। মনে মনে
একথা ভেবে সে মনকে শান্ত করে

অঝরে কাঁদতে কাঁদতে শুদ্ধর নামে কবুল পড়ল।

শুদ্ধকে কবুল বলতে

বলায় ইয়াসির ফুঁসে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে হাতের

কাছে থাকা ফ্লাওয়ার ভাস ছুঁড়ে মারল শুদ্ধর দিকে।

সেটা গিয়ে নিঁখুত ভাবে লাগলও শুদ্ধর কপালে,, সঙ্গে

সঙ্গে শুদ্ধর ঙ্গ কেঁটে রক্ত গড়াতে লাগল। অর্ক,

সায়নরা

হুংকার ছুঁড়ে তাকে মারতে গেলে শুদ্ধ ওদের থামিয়ে

দিলো। কেউ তার দিকে এগোতে গেলে শুদ্ধই সরিয়ে

দিলো তার কাছে থেকে। তারপর সে ইয়াসিরের

দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে শীতলের চোখে

চোখ রাখল। সু-স্পষ্টসুরে তিনবার কবুল বলল।

তাকে কবুল বলতে ইয়াসির হঠাৎ চিৎকার করে বলে

উঠল,-‘তুমি আজও আমার পাশে দাঁড়ালে না বাবা!

আজও না! অথচ তুমিই আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে

শীতলকে আমার হাতে তুলে দিবে। শুধু তোমার

কথার ভিত্তিতে আমি বাংলাদেশে ফিরেছিলাম। দিনের

পর দিন পড়েওছিলাম তোমার কথা বিশ্বাস করে।

তুমি আজও আমায় ঠকালে।

সব জেনেবুঝে আমাকে কষ্টের সাগরে ডুবালে। তুমি থাকতে আজ আমি আবারও হেরে গেলাম। ওরা আমাকে আবার হারিয়ে দিলো। তুমি প্রমিস রাখতে পারো না বাবা। ইউ আর লায়্যার বাবা..ইউ আর লায়্যার,,আই জাস্ট হেট ইউ বাবা! আই জাস্ট হেট ইউ!ইয়াসিরের চিৎকার করে বলা কথাগুলো শুনে সকলে হতবাক। উপস্থিত সকলে একে অপরকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। ইয়াসির কাকে বাবা বলছে? কে তার বাবা? এখানে বাইরের কেউ নেই, তাহলে? এদিকে তার কথা শুনে হতভম্ব চোখে তাকিয়ে আছেন শারায়াত চৌধুরী। আপাতত বাকহারা তিনি।-‘তুমি আজও আমার পাশে দাঁড়ালে না বাবা! আজও না! অথচ তুমিই আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে শীতলকে আমার হাতে তুলে দিবে। শুধু তোমার কথার ভিত্তিতে আমি বাংলাদেশে ফিরেছিলাম। দিনের পর দিন পড়েওছিলাম তোমার কথা বিশ্বাস করে। তুমি আজও আমায় ঠকালে।

সব জেনেবুঝে আমাকে কষ্টের সাগরে ডুবালে। তুমি থাকতে আজ আমি আবারও হেরে গেলাম। ওরা আমাকে আবার হারিয়ে দিলো। তুমি প্রমিস রাখতে

পারো না বাবা। ইউ আর লায়্যার বাবা..ইউ আর লায়্যার,,,আই জাস্ট হেট ইউ বাবা! আই জাস্ট হেট ইউ!

ইয়াসিরের চিৎকার করে বলা কথাগুলো শুনে সকলে হতবাক। উপস্থিত সকলে একে অপরকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। ইয়াসির কাকে বাবা বলছে? কে তার বাবা? এখানে বাইরের কেউ নেই, তাহলে? এদিকে তার কথা শুনে হতভম্ব চোখে তাকিয়ে আছেন শারাফাত চৌধুরী। আপাতত বাকহারা তিনি। উনাকে এভাবে তাকাতে দেখে ইয়াসির পুনরায় ডাকল,-‘পুনরায় নিজের রক্তকে জিতিয়ে দিলে? একবার কি আমাকে জিতাতে পারতে না? চৌধুরীদের রক্ত নই বলে এত অবহেলা? আমার মম বেঁচে থাকলে একাজ করতে পারতে?’

একথা শুনে শারাফাত চৌধুরী চোখ বন্ধ করে নিলেন। এ ডাকটা শোনার জন্য একটা সময় অনেক অপেক্ষা করতেন। কতবার ছেলেটাকে কাছে ডেকেছেন বাবা ডাকা শোনার জন্য। একটু আদর করার জন্য। কিন্তু এই

ছেলে উনাকে দেখতে পারত না। উনার উপস্থিতিও
সে সহ্য করতে পারত না। যদিও এর বিশেষ কারণ
রয়েছে। ইলিয়ানা মানে ইয়াসিরের আপন মায়ের
সঙ্গে একদা এক সময় সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন তিনি।
তখন তিনি সবে নিজের ব্যবসা দাঁড় করিয়েছেন।
কাজের সূত্রে নানান দেশে যেতে। সেবার ব্যবসায়ী
কাজে সুইডেনে গিয়ে পরিচয় হয়েছিল ইলিয়ানা খান
নামের এক অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী বিদেশীনির
সাথে। সে বিদেশী ছিল মুসলিম এবং খান বংশের
মেয়ে। তার মামাবাড়ি বাংলাদেশে হলেও আগ্রহ
করেও বাংলাদেশে আসে নি কখনো। ইলিয়ানা
পেশায় বিজনেস উইমেন। তার স্মার্টনেস, কথার
ভঙ্গি, চাল-চলন, বুদ্ধিমত্তা নজরে পড়ার মতো।
ইয়াসিরের মতো সেও ছিল নীল চোখের অধিকারী।
এই চোখের মোহে তিনিও পড়েছিলেন। যদিও তখন
তিনি টগবগে সুদর্শন এক যুবক। এটিটিউড ছিল
শুদ্ধর মতো নজরে পড়ার মতো। তবে তিনি শুদ্ধর
মতো এত রুড কখনো ছিলেন না। জেদী ছিলেন না।
রাগের দিক থেকেও শুদ্ধ এগিয়ে। তো ইলিয়ানার
সঙ্গে একেক প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করতে করতেই

মেয়েটা কখন যেন উনার মনে জায়গা করে নিয়েছিল। ভালোলাগা এক পর্যায়ে ভালোবাসার রূপ নেয়। অনেক ভেবে উনি একথাটা ইলিয়ানাকে জানানোর পর জানা যায়, ইলিয়ানা ডিভোর্সি। এক ছেলের মা সে। তার ছেলের নাম ইয়াসির খান। ছেলের বয়স বারো কী তেরো। একথা জানার পরও উনার কোনো আপত্তি ছিল না। কারণ উনি জীবনে সৎ জীবনসঙ্গী চেয়েছিলেন। যার মাঝে নিজের ভালোব থাকা খুঁজে নিতে পারবেন। সব পরিস্থিতিতে যে উনাকে শক্তি, সাহস জোগাতে পারবে। কিন্তু সব জেনে

ইলিয়ানা নিজেই তার প্রস্তাব নাকচ করে। ফিরিয়ে দেন উনাকে। তবুও উনি হাল না ছেড়ে বোঝাতে থাকে ইলিয়ানাকে। এমনকি দেশে ফিরেও সরাসরি নিজের বাবা-মাকে জানান। সব জেনে উনারা অমত করেন। কারণ উনারা কিছুতেই একজন ডিভোর্সি মেয়েকে পুত্রবধূ করবেন না। এই নিয়ে নিবাসে অনেক দ্বন্দ্ব হয়। উনিও অফিস যাওয়া বন্ধ করে দেন। নিজেকে রুমবন্দী করে ফেলেন। পরে একদিন ভাবেন ইলিয়ানা কাছেই চলে যাবে আর দেশে

ফিরবেন না। কিন্তু রেডি হয়ে হন্ন হয়ে খুঁজেও উনি
উনার পাসপোর্ট ভিসা খুঁজে পান না। পার্সপোস উনার
মা লুকিয়ে রাখায় উনি দেশের বাইরে যেতেও
পারছিলেন না। তবে ইলিয়ানার সঙ্গে উনার
যোগাযোগ হতো। মাঝে মাঝে একটু আধটু কথা
হতো। এভাবে কিছুদিন

যাওয়ার পর, হঠাৎ উনার মা পাসপোর্ট ও ভিসা
স্বেচ্ছায় ফিরিয়ে দেয়।

নিজের মুখে বলেন ইলিয়ানার কাছে চলে যেতে।
একথা শুনে উনি এক আকাশ সমান খুশি বুকে নিয়ে
ইলিয়ানার কাছে সুইডেনে যান। তবে যে ইলিয়ানাকে
লাস্টবার দেখেছিলেন সেই ইলিয়ানা যেন কোথায়
হারিয়ে গেছে। যে চোখের সামনে আছে সে ছিল
ক্যান্সারের পেশেন্ট মাত্র। যার জীবন আয়ু তখন নিভু
নিভু পর্যায়। দেহের অবস্থাও ছিল বড়ই নাজুক।
সেদিন উনি ইলিয়ানার হাত ধরে ছোটো বাচ্চাদের
মতো হাউমাউ করে কেঁদেছিল। আর ইলিয়ানা ছলছল
চোখে তাকিয়ে হেসেছিল। কেন যে হেসেছিল কে
জানে। হবে হয়তো তাকে ফাঁকি দিয়ে চলে যাওয়ার

ধান্দা সফল হচ্ছে দেখে। সেদিন ইলিয়ানার অবস্থা
দেখে বুঝেছিলেন, উনাদের
যোগাযোগ হলেও ইলিয়ানা কখনো ভিডিও কলে কথা
বলতো না। উনি জোর করলে বলতো দেখতে নাকি
কষ্ট বাড়বে। বেঁচে থাকা কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে। একথা
শুনে উনিও কিছুই বলতেন না শুধু ছুটে যাওয়ার জন্য
দিন গুনতেন। এলেনও ঠিকই তবে স্বপ্নগুলো তখন
মলিন। তবে যাওয়ার পর উনি ইলিয়ানার সঙ্গেই
থাকতেন। কারণ ইলিয়ানা চেয়েছিল উনার শেষ
মুহূর্তে যেন উনিই পাশে থাকেন। কিন্তু এটা ইয়াসির
পছন্দ করত না। সে উনাকে দেখতেই পারত না।
দেখতে না পারার কারণ ইলিয়ানার মা কেন জানি
উনার নামে ইয়াসিরকে ভুলভাল বোঝাত। সেসব
শুনে ইয়াসিরও প্রচণ্ড রেগে থাকত। সুযোগ পেলে
উনাকে এটা ওটা দিয়ে আঘাত করত। তবুও উনি
কিছু মনে করতে না বরং তাকে আদর করে কাছে
ডাকতেন। এভাবে দিন যেতে যেতে ইলিয়ানার অবস্থা
খারায় হয়ে গেল। হাসপিটালে এডমিট করলে
ডাক্তাররা হাল ছেড়ে দিলেন। মারা যাওয়ার আগের
দিন রাতে, ইলিয়ানা হঠাৎ আবদার করল উনাকে

বিয়ে করার জন্য। উনিও রাজি হয়ে গেলেন। রুগ্ন
প্ৰেয়শীৰ কথা ৰাখতে বিয়েটাও হলো উনাদেৰ। সেদিন
ইলিয়ানা ইয়াসিৰকে কাছে ডেকে খুব করে বোঝাল
যে, ‘আজ থেকে শাৰাফাত তোমাৰ বাবা। মাই সান,
আমাৰ জানবাচ্ছা, আমি মাৰা গেলে বাবা তোমাকে
ভালোবাসবে, বুকে আগলে ৰাখবে। তুমি বাবাকে
কখনো কষ্ট দিও না। যদি কখনো দেখো তোমাৰ
জন্য তোমাৰ বাবা কষ্ট পাচ্ছে তাহলে বাবাৰ কষ্ট
কমানোৰ চেষ্টা কৰব। নিজে কষ্ট পেলেও তা বুঝতে
দেবে না, বাবাৰ সুখের সংসারে কাঁটা হবে না।’
একথা বলার পর সেদিন ইয়াসিৰ বলেছিল, ‘উনাকে
আমি বাবা মানি না মম। বাবাৰা হয় সেলফিশ।
আমাৰ এক বাবা আমাকে ছুঁড়ে ফেলেছে। সমাজেৰ
চোখে তোমাকে ডিভোর্সি বানিয়েছে। হয়তো আমাৰ
জন্য তুমি বিয়েটা কৰলে যাতে আমি অভিভাবক
পায়। কিন্তু আমাৰ মনে হচ্ছে উনিও একদিন আমাৰ
কষ্টেৰ কাৰণ হবে। উনিও একদিন আমাকে হাৰ্ট
কৰবে। আমি ততদিন উনাকে বাবা ডাকব না সেদিন
আমাৰ কথা মিলে যাবে। আমি সত্যি সত্যি হাৰ্ট হবো

সেদিন উনাকে বাবা বলে ডাকব। তুমি থাকো বা না থাকো ওই মানুষটাকে কথাটা মিলিয়ে নিতে বোলো।’

ছেলের কথা শুনে রুগ্ন ইলিয়ানা সেদিন শারাবাতের হাতে ধরে অসহায় সুরে কেঁদেছিল। ইয়াসিরকে দেখে রাখার জন্য কত অনুরোধ করেছিল। বিয়ে করে নতুন সংসার করার জন্য অনুমতি দিয়েছিল। এরপর সপ্তাহ খানিক পর উনি মারা যান। উনার হাত আঁকড়ে ধরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ইলিয়ানা। ইয়াসির প্রাণহীন চোখে দেখতে থাকে মায়ের শেষ যাত্রা। এরপর ইলিয়ানা মারা যাওয়ার পর শারাবাত চৌধুরী ইয়াসিরকে দেশে আনতে চেয়েছিল। নিজের ছেলের কাছে নিজের শিক্ষায় বড় করতেও চেয়েছিলেন। কিন্তু ইলিয়ানার মা আসতে দেয় নি। কোনোভাবেই রাজি করানো সম্ভব হয় নি। বরং তিনি ইয়াসিরকে উস্কে দিয়েছিল যাতে উনি কোনো যোগাযোগ রাখার চেষ্টা না করে। মায়ের সাথে সম্পর্ক ছিল মা নেই সম্পর্কও শেষ। এরপর বাধ্য হয়েই উনি একাই দেশে ফিরে আসেন কিন্তু ইয়াসির বোঝান যেন যোগাযোগ রাখে। কিন্তু সে তা করে নি। ইচ্ছে করে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। ইলিয়ানার মা ইয়াসিরকে নিয়ে লাপাত্তা

হয়ে যায়। পরে শারাকাত হন্ন হয়ে খুঁজে
কোনোভাবেই তাদের হৃদিস পান না। যারা চেনা
পরিচিত ছিল তারাও কিছু বলতে পারে না। এভাবে
হঠাৎ ইয়াসির ইচ্ছে করে হারিয়ে যায় উনার কাছে
থেকে। এদিকে তখন ছেলের অবস্থা দেখে শারাকাত
চৌধুরীর বাবা- মা পাত্রী খুঁজতে শুরু করেন।
পরিকল্পনা ছিল বিয়ে দিয়ে ছেলেকে ঘরমুখী করে
ফেলবেন। কিন্তু শারাকাত চৌধুরী মেয়ে দেখতে গেলে
বলে দিতেন উনি বিবাহিত। উনার একটা ছেলে আছে
এবং প্রথম স্ত্রী মারা গেছে। একথা শুনে বিয়ে ভেঙে
যেতো। একথা রটেও গিয়েছিল যে শারাকাত চৌধুরী
বিধুর(বউ মরা)। কিন্তু কে সেই বউ ছিল কেউ
জানতে পারে নি বিধায় শারাকাত চৌধুরীর বাবা
একটু চালাকি করে রটিয়েছিলেন; ছেলে বিয়ে করতে
চায় না তাই মিথ্যা বলে। বউ বাচ্চা দেখতে না পেয়ে
সবাই সেটা বিশ্বাসও করেছিল। এরপর বছর খানিক
পর সিঁতারার সঙ্গে বিয়ে হয়। সিঁতারাকেও উনি
নিজেই পছন্দ করে বিয়ে করেন। সেসব দিন অনেক
আগেই অতীতের নামে দলিল হয়েছে। কিন্তু
আজকের পরিস্থিতি সেটা না চাইতে অনেক কথা

মনে করিয়ে দিচ্ছে। পূর্বের স্মৃতিকথা স্মরণ করে উনি
এবার তাকালেন সিঁতারার দিকে। নিশ্চুপ হয়ে
সিঁতারাও তাকিয়েই আছেন স্বামীর মুখের দিকে। মুখ
দেখে বোঝার উপায় নেই ভেতরকার ঝড়। তবে
ইয়াসিরের কথা শুনে উনি এক পা দু পা করে
এগিয়ে এলেন। মন দিয়ে দেখলেন ইয়াসিরের মুখের
গড়ন। ইলিয়ানার মুখের সাথে বেশ মিল আছে। উনি
এবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন,
-‘ তোমার আবদার মেটানো সম্ভব নয় ইয়াসির।
যাকে চাও সে কিছুক্ষণ আগে চৌধুরী বাড়িরই পুত্রবধূ
হয়েছে। ওর দিকে চোখ তুলে তাকানোও তোমার
জন্য হারাম। এখন কী চাও তুমি? শারায়াত চৌধুরীর
ছেলের স্বকৃতি নাকি অন্যকিছু?’-‘ স্বকৃতি ছাড়াও বেঁচে
আছি! সম্পত্তি কি আমার কম আছে? আপনার স্বামীর
থেকে জীবনে প্রথমবার যেটা চেয়েছি সেটা দিতে
পারে নি। উনি বুঝিয়ে দিয়েছেন আমি পর। মুখে
যতই ছেলে, ছেলে করে দরদ দেখাক।

দিনশেষে আমি পর! সারাজীবন পরই থাকব।
এজন্যই তো আশা ভরসা দেখিয়ে আপন ছেলেকে
জিতিয়ে দিয়েছে। প্রাপ্তি তুলে দিয়েছে নিজের ছেলের

হাতে। অথচ ক'মাস আগে যখন অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে আমাদের যোগাযোগ হলো, আমাকে বলেছিলেন মাফিয়াগিরি, মেয়েবাজি ছাড়ি তবে আমাকে চৌধুরী বাড়ির সবচেয়ে সুন্দর ফুলটা দেবে। সেই আশাতে আমিও ভেবেছিলাম ফুলটা আমার..! স্বর্ণের দোহায় দিয়ে সব কমিয়ে দিয়েছিলাম। আর স্বর্ণ ছিল তো অজুহাত মাত্র চৌধুরীর আরেক পুত্রকে খেলানোর মাধ্যম। অনেস্টলি বলছি, শুরু থেকেই শীতলকে,, শীতলের প্রতি দূর্বল ছিলাম আমি। নয়তো প্রথমবার কিডন্যাপের সময়ই তাকে শেষ করে দিতাম।’

অনেকক্ষণ ধরে ইয়াসিরের আবোল-তাবোল কথা শুনে সাইন এবার ফুঁসে উঠল। এসব আবালতামি কথাবার্তা সহ্য হচ্ছে না তার। সে বাবার দিকে একবার তাকিয়ে সরাসরি প্রশ্ন ছুঁড়ল,-‘ও কি বলছে? তুমি ওর বাবা?’

শারাবাত চৌধুরী অস্বস্তিতেও পড়লেন না। মুখ কাঁচুমাচুও করলেন না। বরং সকলের সামনে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন,

-‘হ্যাঁ, আমি ওর বাবা। ও হচ্ছে এক বিশেষ মানুষের দেওয়া আমানত।’

শুদ্ধ, সায়ন বাক হারিয়ে হতভম্ব চোখে তাকিয়ে
রইল। এই ঘটনা জানত না তারা। শুধু জানত তাদের
বাবা কাউকে খুব ভালোবাসত। সে অসুখে মারা
গেছে। কিন্তু না, তাদের বাবারও অতীত ছিল? সে
ঘরে সন্তান তবে ইয়াসির খান? শুদ্ধ নিবাক থাকলেও
কেন জানি সায়ন সেটা মানতেই পারল না। সে
চোঁচিয়ে উঠে বলল,

-‘মশকরা মারাও আমাদের সাথে? এতবছর পর
আরেকটা ছেলে উদয় হলো কোথা থেকে? মানে বুড়ো
বয়সে ভীমরতি? আর করলেই আমরা মানব কেন?
কে না কে তাকে নাকি...!’সায়ন ওর কথা শেষ করার
আগে সিঁতারা ছেলের গালে আচমকা থাপ্পড় বসিয়ে
দিলেন। আরেকদফা চমকে উঠল সবাই। কারণ
চৌধুরী নিবাসে কেউ কোনো সন্তানের গায়ে এভাবে
হাত তোলে না। সিমিন মাঝে মাঝে শীতলকে
মারলেও সিঁতারা কখনো এমন করেন না। আজ
উনিই মারল দেখে সিরাত এগিয়ে এসে সিঁতারাকে
সরাতে গেল। কিন্তু সিঁতারা নড়ল না বরং আঙুল
তুলে সায়নকে কড়া কণ্ঠে জবাব দিলো,

-‘খবরদার ওই মানুষটার সঙ্গে উঁচু কঠে কথা বলবি না। শুনতে পেলি? ভুলেও আঙুল তুলবি না। নয়তো আমার চেয়ে খারাপ কেউ হবে না।’সায়ন মাথা নিঁচু করে নিলো। সায়নের মাথা নিঁচু দেখে স্বর্ণ এসে দাঁড়াল তার পাশে। মুখে কিছু না বললেও অপলক তাকিয়ে রইল সায়নের মুখের দিকে। সিতারা বলে সামনের মানুষটা বেঁচে গেল নয়তো অন্যকেউ হলে সেও পাল্টা আঘাত করতে দু’বার ভাবত না। তখন শুদ্ধ এগিয়ে এলো। সরাসরি প্রশ্ন ছুঁড়ল সিতারার দিকে,

-‘ আমরা কেউ উঁচু কঠে কথা বলব না? আঙুল তুলব না? প্রশ্নও করব না? তাহলে যেটা হচ্ছে হতে দেবো? কিন্তু সেটা মানা আমাদের পক্ষেও সম্ভব না। তাহলে এখন আমাদের ত্যজ্য করবে? যাকে গর্ব করে ছেলের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে এতদিন কেন দিলো না? এতদিন কী তোমাদের বিবেকবোধ জাগ্রত ছিল না? উনার সো কন্ড ছেলেই বা কেন এতদিন আমাদের চোখের ঘুম হারাম করেছে? কুকুর মতো দৌড় করিয়েছে তার পেছনে? কেন বার বার আমাদের

পরিবার ভাঙার চেষ্টা করেছে? এসব প্রশ্নের উত্তর কে দিবে তাহলে?’-‘শুদ্ধ থাম! ‘

-‘ মেরে ধমকে সায়নকে থামাতে পারলেও শুদ্ধকে থামাতে পারবে না তা তুমিও জানো আর আমিও। আর যেখানে শীতলের কথা উঠেছে সেখানে থামার প্রশ্নই আসে না। চেষ্টা করে দেখো থামাতে পারো কী না। তাছাড়া কে কার প্রাক্তন, কে কার ছেলে, এই হিসাব বাড়িতে গিয়ে করো। রংয়ের আলাপ করতে কাউকে ডাকি নি। এটা একটা পেশেন্টের কেবিন কারো পুরনো হিসাব কষাকষির আদালত নয়।’শুদ্ধ কথা গুলো বলল ঠিকই তবে তার দৃষ্টি ছিল বাবার দিকে। শারায়াত চৌধুরী দুই ছেলের অভিমানী মুখ দেখে মৃদু হাসলেন। ইয়াসির শুধু বাবা বলায় ছোটোদের মতো অভিমান করছে নাকি তারা? এখনো কি বলবে নাকি ‘তুমি শুধু আমাদের বাবা আর কারো বাবা না।’ আর কদিন পরে যারা নিজেরাই বাবা হবে তাদের কাছে এমন অভিমান কি মানায়? তবে পরিস্থিতি বিবেচনা করে উনি ইয়াসিরকে কিছু বলার আগেই ইয়াসির শীতলের দিকে এগিয়ে গেল। শীতলের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলল।

পুরো কেবিনে ঝড় বয়ে যাচ্ছে আর বাবুই পাখিটা ঘুমাচ্ছে। কী সুন্দর লাগছে দেখতে। পৃথিবী উল্টে যাক তার কাছে ঘুমটাই যেন আগে।

নয়তো এই পরিস্থিতিতে কোনো সুস্থ মানুষ ঘুমাতে পারে? ঘুম ধরা দেয়? কিছুক্ষণ আগেই শুদ্ধর নামে কবুল পড়ে তাকে অর্ধমৃত করে শান্তির ঘুম ঘুমাচ্ছে পাজিটা। মনে মনে একথা ভেবে সে শীতলের ঘুমন্ত মুখটা ছুঁতে গেলে শুদ্ধ খপ করে তার হাতটা ধরে ফেলল। বাঁধা পেয়ে ইয়াসিরের হাসি বিলীন হয়ে গেল। শুদ্ধর রাগে থমথম করা মুখের দিকে তাকিয়ে সে

কথা বাড়াল না। শীতলের মুখে দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মাথা নিচু করে যাওয়ার জন্য দরজার কাছে যেতেই শারাফাত চৌধুরী বললেন,-‘বাড়ি চলো। আমাদের কথা এখনো শেষ হয় নি।’

-‘রুচি নেই।’

-‘ইয়াসির কথা শোনো।’

-‘শারাফাত চৌধুরী আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কখনো ছিল না। আর যা ছিল আজকে তা পুরোপুরি

শেষ। তবে বেঁচে থাকলে আপনার লাশ কাঁধে নিতে
আমি আবার আসব।’

একথা শুনে সায়ন চোয়াল শক্ত করে তাকাল
ইয়াসিরের দিকে। বাবাকে নিজে দুটো কথা বললেও
কেউ হাজিবাজি বললে মানতে পারে না সে।

আজও পারল না তাই থমথমে সুরে বলল,
-‘লাস্ট বার বলছি মুখ সামলে কথা বল।’

-‘বলব না।’ অনেকক্ষণ ধরে ইয়াসিরের
আবোলতাবোল কথা শুনলেও এবার আর ধৈর্য্য
রাখতে পারল না সায়ন। তেড়েফুঁড়ে ছুটে গিয়ে
মারতে ঘুষি তুলল।

গালিও দিয়ে বসল অভ্যাসবশত। ইয়াসির তখন খপ
করে সায়নের হাত

ধরে কয়েক পা এগিয়ে এলো। সায়নের চোখে চোখ
রেখে সে মুখোমুখি দাঁড়াল। তারপর সায়নের শার্টের
কলার ঠিকঠাক করে দুই কাঁধ চাপড়ে বলল,

-‘খান রা জানোয়ার হলেও চৌধুরীদের মতো রক্তে
বিষ নিয়ে ঘোরে না। এতদিন পরিবার-পরিজন ছাড়া
একাই বাঁচতে পেরেছি বাকি জীবনও পারব। আর

তুই এত লাফালাফি করিস না। তোকে এসব সাজে না।’-‘কি সাজে না সাজে তুই ঠিক করে দিবি?’

-‘প্রয়োজনে তাই দেবো।’

এইটুকু বলে সে থামল। তারপর নিচু স্বরে সায়নের কানে কানে বলল,

-‘তোদের কিছু না থেকেও তোরা পূর্ণ আর আমার সব থেকেও আমি শূন্য। আসি তাহলে।’

একথা বলে যেতে গেলে সায়ন তাকে যেতে বাঁধা দিয়ে বুকের কাছটার কলার খাবলে ধরল। অগ্নিমূর্তি হয়ে আগুন ঝরা কণ্ঠে বলল,

-‘কি বললি ঝেড়ে কাশ।’

-‘সহ্য করতে পারবি না। আমি না পেয়ে পেয়ে আমার মাইন্ডে সেট হয়ে গেছে যে আমি কপালপোড়া। আমার মতো তুই সহ্য করতে পারবি না। এরচেয়ে বেশি লাফাস না বেশি লাফালে এর ফল ংভালো আসবে না। আগাছা হয়ে আছিস চুপচাপ তাই থাক।’

কথার মোড় অন্যদিকে ঘুরে যাচ্ছে দেখে সাফওয়ান চৌধুরী দ্রুত এগিয়ে এলেন। তাদের দুজনকে দুদিকে রেখে তিনি মাঝখানে দাঁড়ালেন। ওদের চুপ করতে

বললেন। কিন্তু সায়ন থামলে তো? সে সাফওয়ান চৌধুরীকে সরিয়ে পুনরায় ইয়াসিরের মুখোমুখি দাঁড়াল। শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল,-‘কে আগাছা?’

-‘তুই।’

-‘গাঁজা কি খেয়ে এসেছিলি নাকি গিয়ে খাবি? এত পিনিক পাস কোথা থেকে?’

একথা শুনে ইয়াসির না চাইতেও হেসে ফেলল। হাসির রোগে ধরল নাকি তাকে? আজ এত হাসি পাচ্ছে কেন তার? সায়নের মুখ দেখে হাসি যেন বেড়ে গেল তার। তাই হাসতে হাসতে বলল,

-‘শাহরিয়ার চৌধুরী তুমিও আমার মতোই পরগাছা। তোমার শরীরেও চৌধুরীদের একফোঁটা রক্ত নেই তাই তোমারও বাড়তি চোপা সাজে না।’এই একটা কথায় কেবিনের সবাইকে পুনরায় স্তব্ধ করে দিলো। সিতারা চৌধুরী আগত ঝড় সামাল দিতে সায়নের পাশে দাঁড়ালেন। তবে কিছুই বলার সাহস হলো না নিরুপায় হয়ে ডুঁকরে কেঁদে উঠলেন। অশ্রুচোখে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলেন চোখের চোখের দিকে তাকানোর সাহস হলো না। ইয়াসির আর দাঁড়াল না বরং শেষবার শীতলের দিকে তাকিয়ে

বেরিয়ে গেল। নিজের বুকে আগুন জ্বলছে দেখে বাকিদের বুকেও লাভা ঢেলে দিয়েছে। তাছাড়া সত্যের পাহাড় যখন ধসে গেছে তখন সব সত্যই বেরিয়ে আসুক। বারে আঘাত পাওয়া চাইতে একবারে আঘাত পাওয়া ভালো নয় কি! ইয়াসির কথাটা বলে ধীরে ধীরে প্রস্থান করল। শরীর জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।

পায়ের ব্যথার সাথে মনের ব্যথাও যেন আন্দোলন করতে শুরু করেছে।

তাছাড়া এখানে থাকার মেয়াদ ফুরিয়েছে। ফুরিয়েছে সম্পর্কের দোহায় দেওয়ার কারণ-বারণ। এমনিতেই পাওয়া না পাওয়ার হিসাবে বরাবরই তার প্রাপ্তি শূন্যের খাতায়। আজও তাই। বলা বাহুল্য কেউ যখন একের পর এক প্রাপ্তি পায় তখন শেষবারেও প্রাপ্তির আশায় রাখে। কিন্তু তার ক্ষেত্রে আবার উল্টো কিছু ঘটে। কেননা জন্মের পর থেকে তার জীবনে বিয়োগের উপস্থিতি একটু বেশিই বলা চলে। এই যেমন প্রথমে জন্মদাতা

পিতাকে হারাল। মাও ডিভোর্সি হলো। প্রতিনিয়ম নেইবারদের কটু কথার আঘাত, ফ্রেন্ডদের কথার খোঁচা, মাকেও তো কাজের জন্য কাছে পাওয়া হতো

না। উনি বিজনেস উইমেন কাজই উনার সব।
উনাকে দোষ দিয়েও লাভ নেই কারণ উনার কারণেই
তাদের জীবন ভালোভাবে চলত। ভালো খাওয়া, পড়া
সবই হতো। এরপর নতুন বাবার আগমন ঘটল।
দিনের পর

দিন মায়ের সঙ্গে উনাকে দেখে মন বিষিয়ে উঠত।
যত ভাবত ততো যেন ক্ষীণ হয়ে উঠত উনার প্রতি।
অসহ্য লাগত। একপর্যায়ে উনার উপস্থিতি অসহ্যের
মাত্রা ছড়াল। ইচ্ছে করে বল ছুঁড়ে আঘাতও করেছিল
বহুবার। তবুও মানুষটা কিছুই বলতেন না মাথায় হাত
বুলিয়ে হাসতেন। শান্ত হতে বলতেন। হাজিবাজি
বোঝাতে চাইতেন। মায়ের কথা ভেবে উনাকে বাবা
নয় বরং ফ্রেন্ড হিসেবে গ্রহণ করতে বলতেন। আর
এটা ওর কাছে ছিল আরো বিরক্তিকর ব্যাপার-
স্যাপার। এমনও হয়েছে কথায় কথায় আঘাত করার
পরও বারবার সখ্যতা গড়তে চেয়েছেন। সেই বরং
এড়িয়ে গেছে। কারণ তার কাছে সখ্যতা মানে
পিছুটান। ওসব পিছুটানের মায়া রাখতে চাইলে
সায়নের আগে ওর ঠাই হতো চৌধুরী নিবাসে।
শারফাত চৌধুরীর

বড় পুত্র হিসেবে বড় হতো। চৌধুরীদের রক্ত না হয়েও বড় হতো তাদের শিক্ষায়। আপন রক্তের দেওয়া শেষ পদবিও বদলে যেতো এক নিমিষে। ইয়াসির খান থেকে হয়ে যেতো ইয়াসির চৌধুরী। চৌধুরীদের নাম আবার শ, স দিয়ে হয়। হয়তো তার নামটাও স,শ দিয়েই রাখা হতো। ইয়াসিরের নাম মুছে যেতো জীবন থেকে অথচ তার মা ইয়াসির নাম শখ করে নাকি রেখেছিল। ইয়াসির নামের অর্থ সৌভাগ্যবান। ইলিয়ানা চেয়েছিল উনার একমাত্র ছেলে সৌভাগ্যবান পুরুষ হোক। ভালোবাসায় ভালো থাকুক।

কিন্তু দুঃভাগ্যবশত ওর জীবনের ধারা নামের ধারে কাছেও যায় নি। বরং সর্বদা উল্টোটাই ঘটেছে। এ নিয়ে ভাবতে গেলেও তার ভীষণ হাসি পায়।

এবং হাজার কথার এক কথা, শুরু থেকে শারায়ফাত চৌধুরীকে সে বাবা হিসেবে মানতে পারত না। তার মা মারা যাওয়ার আগে তাকে শারায়ফাত চৌধুরীর কাছে আমানত হিসেবে রাখা তাকে আরো বেশি কষ্টকর ছিল।

কারণ সে পুরুষ তার মাকে বিয়ে করল কিন্তু সংসার করতেই পারল না।

তার কাছে তাকে আমানত হিসেবে রাখতে চাওয়াটা কি ঠিক ছিল? আর শারায়ত চৌধুরী মুমূর্ষু সহধর্মিণীর কথা রাখতে হয়তো রাজি হয়েছিল। কিন্তু কারো দয়ায় বাঁচতে চায় নি সে এজন্যই মূলত লুকিয়ে বেড়াতো। সব যোগাযোগও বন্ধ করে দিয়েছিল। তবুও কিভাবে যেন শারায়ত চৌধুরী ঠিকই তাকে খুঁজে বের করত। কাজের নামে বাইরের দেশে গিয়ে তার সঙ্গেই দেখা করতে যেতো। কিন্তু সে দেখা করত না তবুও ভদ্রলোক হাল ছাড়তেন না। আর উনার এ কাজে তার রাগের মাত্রা আরো বাড়ত। ইচ্ছে করত মানুষটাকে মেরে ফেলে ঝামেলামুক্ত হতে। পরে এমনভাবে গা ঢাকা দিলো যে বছরের বছর শারায়ত চৌধুরী কোনো খোঁজই পেল নি। ততদিনে স্বেচ্ছায় মাফিয়া জগতে পা দিয়েছে। প্রাণের মায়া কোনো

কালেই ছিল না তার। আর গ্রাণী (নানী) মারা যাওয়ার পর পিছুটান ছিল না। ইচ্ছে মতো লাইফ লিড করত। সেই ইচ্ছেটাকে প্রাধান্য দিতে গিয়েই আজ মাফিয়া

কিং নামে পরিচিত। আগে কেউ মাফিয়া কিং বললে
গর্ব হতো। ভীষণ খুশি লাগত। সেই খুশিতে
সহিংসতা আরো বাড়াত। পাপের রাজ্যে সুখ পেত।
তবে আজ কেন জানি এই নামের ওজন অনেক বেশি
ভার লাগছে। চৌধুরীদের মতো ভালো মানুষদের
আশেপাশে ছিল বলে এই পরিবর্তন নাকি? এজন্য সে
ভালো মানুষদের দেখতে পারে না। এরা নিজেদের
ভালো গুনের আলো অন্যের মাঝে ছড়াতে চায়। এটা
করা কি উচিত? মোটেও না! কারণ সবাই ভালো হলে
পাপী কমে যাবে আর পাপ

কমে গেলে বেঁচে থাকাটাও পানসে মনে হবে।
ইয়াসির মুখ কুঁচকে নানান কথা ভাবতে ভাবতে
হসপিটাল থেকে বের হতেই দেখে তার গাড়িটা সেই
সকালে রেখে যাওয়া জায়গাতেই আছে। তবে গাড়ির
দরজা খুলে বুরাক বসে আছে। তাকে দেখামাত্রই
একপ্রকার ছুটে এলো বুরাক। অস্থিরকণ্ঠে কীসব
বলল। ইয়াসিরের আপাদমস্তক দেখে মলিন মুখে
তাকিয়ে রইল ইয়াসিরের দিকে। শীতলকে গুলি
করেছিল বিধায় তার মুখ বরাবর এক ঘৃষি মেরেছিল

ইয়াসির। এজন্য তার ঠোঁট কেঁটে ফুলে এখনো লাল
হয়ে আছে। ইয়াসির তাকে দেখে বলল,
-‘আমি মেরেছি বলে কি আমাকেই মেডিসিন লাগিয়ে
দিতে হবে?’

-‘না মানে স্যার টেনশনে ভুলে গেছি। সমস্যা
নেই।’ ইয়াসির কথা বাড়াল না গাড়িতে বসে ইশারা
করা মাত্রই ড্রাইভার গাড়ি

স্টার্ট করল। বুরাক মুখ কাঁচুমাচু করে পানির বোতল
এগিয়ে দিলে সেও নিলো। থেমে থেমে পানি পান
করল। পানি খাওয়ার একটুপর তার চোখ জোড়া
আপনাআপনিই ভার হয়ে আসতে লাগল। কষ্ট করেও
চোখ টেনে

খুলে রাখতে পারছে না। অগত্যা সিটে হেলান দিয়ে
চোখ বুজতেই গলার কাছে সূচ ফুটানোর মতো ব্যথা
অনুভব করল। এরপরই কর্ণকুহরে কেউ যেন
ফিসফিসিয়ে বলল ,

-‘আ’ম সরি, স্যার, এক্সট্রিমলি সরি।’ এদিকে
ইয়াসিরের কথা শুনে সায়েন শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে
রইল সিঁতারার দিকে। মায়ের কান্নায় আজ বলে
দিচ্ছে অনেককিছু। তার বুকের ভেতর জ্বলছে ভীষণ।

কষ্টরা হুল ফুটানোর মতো ফুটছে বুক পাজরে তবুও
সে

কথা বাড়াল না। তাছাড়া শীতলের অবস্থার কথাও
ভাবা উচিত। বেচারি শুদ্ধও না পারছে কিছু বলতে না
পারছে আপাতত টপিক চেঞ্জ করতে।

সে শুধু বারবার শীতলের ঘুমন্ত মুখের দিকে
তাকাচ্ছে। পাজি শীতলটা মেডিসিনের প্রভাবে এ
পরিস্থিতিতে বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। সে শুদ্ধকে জেদ
করে বিয়ে করার পরপরই যেন তার পৃথিবী সুখে
ভরে গেছে। আর কিছু লাগবে না তার। সে সুখী।
আর সেই সুখ নৃত্য করতে করতে তার চোখে ঘুম
হয়ে ধরা দিয়েছে। মেয়েটা অনেক ধকল সহ্য করেছে
এখন ঘুমাচ্ছে, ঘুমাক। হিসাবের খাতাটা পরেও খোলা
যাবে। একথা ভেবে সে কান্নারত মায়ের দিকে
তাকিয়ে শুধু মলিন হাসল। সিঁতারি ছেলের হাতে
পাগলের মতো চুমু খেল। তবে মুখে কিছু বলতে
পারল না। সায়নও আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা না করে পা
বাড়াতে যাবে তখনই গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর কণ্ঠকুহরে
এসে পৌঁছাল। থমকে দাঁড়িয়ে গেল সেও। শারায়াত
চৌধুরী তখন গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,-‘ ছোট বাচ্চা যখন

ছিল একটু একটু করে বড় করেছি। এ বুকে আগলে
রেখেছি। আঙুল ধরে হাঁটতে শিখিয়েছে। যখন যা
প্রয়োজন নিজে সেটা

এনে দিয়েছি। ভুল করলে যেমন শাসন করেছি তেমন
ভালোবাসতেও কমতি রাখি নি। দুই কানে যখন
শুনেছি কাউকে পছন্দ করে তখন বাবা হয়ে ছেলের
বিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও আমি পালন করব। এখন কে
কার

থেকে কী শুনে আমাকে বাবা ভাবল কী ভাবল না তা
দেখার সময় নেই। এতদিন কাউকে আমার ছেলে
বলে পরিচয় দিয়েছি মরার আগ অবধি সেই পরিচয়ই
বহন করতে হবে তাকে। এটাই আমার আদেশ! আর
কেউ যদি আমার শাসনকে অবহেলা ভেবে থাকে
তাহলে বলব ভুল সে। আমি শারায়ত চৌধুরী জেনে
বুঝে কখনো অন্যায় করি নি, কারো হক মারি নি,
আমি আমার ছেলেদেরও আমার শিক্ষায় দিয়েছি।
আমার নীতিতে তাদের বড় করেছি। সিঁতার তাকে
বলে দাও রং ঢং না করে যেন সোজা বাড়িতে যায়।
আমাদের সাথেই যেন যায়।’

এইটুকু বলে তিনি থামলেন। তারপর শুদ্ধর দিকে
একবার তাকিয়ে চোখ

ফিরিয়ে পুনরায় বললেন,-‘শীতল সুস্থ হলেই দুই
জোড়ার বিয়ের অনুষ্ঠান সেরে ফেলব। এরমধ্যে
কেউ যদি ভেবেও থাকে বাড়ি ছাড়বে, পরিবার
ছাড়বে, এতিমের রোল প্লে করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে
তাহলে সে যেন আমার বুকের উপর পাড়া দিয়ে যায়।
আমিও দেখি তার কত বড় স্পর্ধা! আমার আদেশ
অমান্য করার সাহস আদৌ তার বুকে জন্মেছে কী না!
মেডিসিনের ইফেক্টে তো

শীতল ঘুমাচ্ছে বাকিটা শুদ্ধই সামলাতে পারবে।
গাড়িতে ওয়েট করছি, এসো তোমরা।’

একথা বলে শারাবাত চৌধুরী চলে গেল। সায়ন
তখন সিঁতার চৌধুরীর দিকে ছলছল চোখে তাকিয়ে
কম্পিত কণ্ঠে বলল,-‘শুনলে তোমার স্বামীর কথা,
শুনলে? উনার বুকে পাড়া দিয়ে চলে যেতে বলল
অথচ উনিও খুব ভালো করে জানে যেতে পারব না।
নিজেই বাড়ি থেকে বের করে দিলো আবার নিজেই
ডাকছে। যাব না আমি, আমার কি আত্মসন্মানবোধ
নেই নাকি?’

একথা বলতে দেরি কিন্তু দরজার কাছ থেকে

শায়াফাত চৌধুরীর বলতে দেরি হলো না,

-‘কেউ বাবা হোক। ওর মতোই লাফাঙ্গা ছেলে তারও হোক। তখন বাবার আসনে দাঁড়ালে বুঝবে বাবাদের যন্ত্রণা। দেরি হচ্ছে এবার আসা হোক।’

বাকিরা তাদের কথা শুনে চোখভর্তি জল নিয়েও হাসছে। এ ঘটনা নতুন নয় তারা বাবা-ছেলে এভাবেই ঝগড়া করে। তাদের ঝগড়ার ধরন এমন।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে সবাই ভেবেছিল সায়ন হয়তো ভেঙে পড়বে। খুব কষ্ট পেয়ে পাগলের মতো আচরণ করবে। কিন্তু সেসবের কিছুই হলো না বরং শায়াফাত চৌধুরীর সাথে তালে তাল মিলিয়ে ধরা গলায় বলল,-‘পরে যাব।’

-‘আমি এন্ফুণি যেতে বলেছি।’

এবার সায়নও জেদ দেখিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে জবাব দিলো,

-‘যাব না মানে যাবই না। কেন আমাকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছিল?’

-‘বললেই যেতে হবে কেন?’

-‘আমি কি ছোটো আছি নাকি যে ভুল করলেই বের করে দিতে হবে? কেউ কী জানে না আমি বাড়ি ছাড়া থাকতে পারি না। কারো মনে রাখা উচিত ছিল আমিও এখন বড় হয়েছি, আমারও আত্মসন্মানবোধ জাগ্রত হয়েছে।’

-‘যে ছেলে বাপের কাছে শর্ট প্যান্ট ধার চাইতে আসে সেই ছেলেকে বড় লাগে কোনদিক দিয়ে? সে কী ভুলে গেছে মাস খানিক আগেও ধরেবেঁধে চুল দাঁড়ি কাটিয়ে এনেছি। নাকি একথা ভুলে গেছে, দামড়া ছেলে হয়েও জ্বর কাতরাচ্ছিল দেখে কোলে করে হসপিটালে নিয়েছি। ভাত খেয়ে যে পর্দায় হাত মুছে চোরের মতো উঁকিঝুঁকি মারে তাকেও এখন বড় হয়েছে বলে মান্য করতে হবে? হ্যাঁ খুব বড় হয়েছে এজন্যই তো আমায় এখনো এটা-ওটা নিয়ে গাল-মন্দ করা লাগে। একথা শুনে সায়ন মুখ ভোঁতা করে তাকিয়ে রইল দরজা দিকে। সবার সামনে একথা বলা কি উচিত হলো? এরপর আর কিছু বলল না সায়ন সিঁতারার কাঁধ জড়িয়ে গম্ভীর মুখে বেরিয়ে এলো কেবিন থেকে। তাকে

আসতে দেখে শাৰাফাত চৌধুৰী গটগট কৰে হেঁটে
গেলেন পাকিং লটে।

বাকিৰাও শুদ্ধৰ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে গিয়ে
বসল। স্বৰ্ণকে এখানে দেখে শাৰাফাত চৌধুৰী ভ্ৰুঁ
কুঁচকালেও কিছু বললেন না। নয়তো পাগল আবারও
ক্ষেপতে পারে। উনারা গেলে শুদ্ধকে একটু বিশ্রাম
নিতে বলে

অৰুঁৰাও কাজিকে পৌঁছে দেওয়ার নাম কৰে বেরিয়ে
এলো। হঠাৎ দ্রুত পায়ে সায়েন পুনৰায় কেবিনে
দুকল। শুদ্ধ তখনো দরজার দিকে তাকিয়ে ছিল।
কেন জানি মন বলছিল সায়েন আসবে তার ভাবনা
প্রমাণিত কৰে সত্যি সায়েন এলো। জড়িয়ে ধরল
ভাইকে। তারপর ফিসফিস কৰে বলল,-‘ভাগ্যিস
মেজৰ সাহেব আমাদেৰ আগেই জানিয়েছিল নয়তো
আজকে

নিজেকে সামলানো কঠিন হয়ে যেতো। মানুষ বলে
শত্ৰু খাৰাপ। আসলে শত্ৰুৱা না থাকলে কঠিন সত্য
সহজে জানা যায় না। তাছাড়া জানা সত্য

তিতা হলেও গ্রহন কৰতে কষ্ট কমই লাগে। আমি
ঠিক আছি ভাই। এবাৰ

রেস্ট কর। বোন দিয়েছে যত্নের কমতি যেন না হয়।’
একথা বলে সায়ন শুদ্ধকে ছাড়তে গেলে শুদ্ধ শক্ত
করে জড়িয়ে ধরল ভাইকে। কিছুক্ষণ কেউ কোনে
কথায় বলল না। তবে দু’জনেরই ছলছল চোখ। এ
কঠিন সত্যি শুদ্ধ সায়ন জেনেছিল তিন থেকে চার
বছর আগে।

সেদিন তাদের সঙ্গে ছিলেন শাহাদত চৌধুরী। ছুটিতে
এসে শুদ্ধ সায়নকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন একটা
কাজে। সেদিন হঠাৎ পরিচিত এক মানুষের সাথে
দেখা হয়েছিল। সেই ব্যক্তিকে দেখামাত্রই শাহাদত
চৌধুরী এড়িয়ে যেতে গেলে ওই মানুষটা উনার পথ
আঁটকে দাঁড়ান। হলুদ দাঁত বের করে

হাসতে হাসতে সায়নকে দেখে বলে ফেলে,-‘শারাফাত
ভাইয়ের পালক ছেলে না এইটা?সিতারা ভাবিরই তো
আপন ভাইয়ের ছেলে ছিল বোধহয়। সম্পর্কে ভাবি
তো হচ্ছে এর আপন ফুপি। এর ভরণপোষণের
দায়িত্ব নেওয়ার শর্তে বিয়ে করেছিল সিতারা ভাবি।

ছেলে কিন্তু ওর আপন বাপের মুখের আদল পেয়েছে।
এর বাপও ভালো মানুষ ছিল। ওরা ছিল শিকদার
বংশের।’

ব্যস, এই একটা কথায় ছিল তিঙ্কু কথা জানার
সূত্রপাত। হঠাৎ নিজের পরিচয় নিয়ে যখন এমন কথা
শুনেছিল তখন সায়ন যেন উন্মান কোনো পাগল।
শাহাদত চৌধুরী সেদিন অনেক কষ্টেই সায়নকে
সামলেছিলেন। উনি কান্নারত সায়নের হাত ধরে
নিজেও অঝরে কাঁদতে কাঁদতে ওয়াদা করিয়েছিলেন,
সায়ন এই কথা জানে কখনো যেন কারো কাছেই
প্রকাশ না করে। যদি করে সবচেয়ে কষ্ট পাবে
সিঁতারা চৌধুরী। এবং এও বলেন সিঁতারা চৌধুরী
সায়নের আপন না তবে আপন ফুপি। আর ফুপি
হয়েও তিনি মায়ের কাজ করেছে। জন্ম না দিয়েও
নিজের সন্তানের মতো করে ভাইয়ের আমানত বুকে
আগলে বহুকষ্টে বড় করেছেন। সায়ন শারাবাত
চৌধুরীর রক্ত নাহলেও সিঁতারার মায়ের বংশের ছেলে
সায়ন। সিঁতারার বংশের রক্ত সায়নের গায়ে। সে
এতিম নয়। কুড়িয়ে আনা পালক সন্তান নয়। সে
শুদ্ধর ভাই। সত্যিই ভাই। ধরতে গেলে মামাতো ভাই
কিন্তু তাদের সম্পর্ক এমন যে মামাতো বলে কিছু
ধার ধারে নি ওরা। তাদের একটাই কথা, সায়ন,
শুদ্ধ, শখ এরা সিঁতারার তিন ছেলে-মেয়ে, শুদ্ধ-

শখের বড় ভাই সায়ন। আর এটাই হচ্ছে সায়নের একমাত্র পরিচয়। আজ আবারও সেসব ঘেঁটে কষ্ট লাগলেও সায়ন মেনে নিয়েছে হাসিমুখে। কারণ এতিম নয় তার ফুপিমা হচ্ছে তার মা। শুদ্ধর নীরাবতা বুঝে সায়ন মুচকি হাসল। তখন শুদ্ধ বলল,-‘ আগেও বলেছি আজও বলছি তুমি আমার ভাই। কার রক্ত, কোন বংশ সেসব বাদ।’

সায়ন হাসল। তারপর শুদ্ধকে ছেড়ে দিয়ে চটাস করে শুদ্ধর গালে চুমু দিতেই শুদ্ধ নাক মুখ কুঁচকে নিলো। তা দেখে সায়ন হো হো করে হাসতে লাগল। শুদ্ধ এটা মোটেও পছন্দ না দেখে সায়ন আরো বেশি করে করে।

একটু রাগিয়ে দেয়। তবে আজ শুদ্ধ রাগ দেখাল না মৃদু হাসল। এরপর

বলল,

-‘বাড়ি গিয়ে তোমাদের দুজনের অভিমানও গুঁড়ো গুঁড়ো করবে। বিপদ এসেছিল কেটেও গেছে, আলহামদুলিল্লাহ। রুবাবও হাসি মুখে ফিরবে, ইনশাআল্লাহ। এখন যাও সবাই ওয়েট করছে।’

একথা শুনে সায়ন হঠাৎ শুদ্ধকে পাশের বেডের দিকে ইশারা করে ভ্রুঁ নাচিয়ে বলল,-‘একসাথে করে দিবো নাকি? উহুম, উহুম কিছুটা সুবিধা হতে পারে।’

-‘দিবো নাকি আবার কি কথা, ধর।’

ভাইয়ের কথা শুনে সায়ন পুনরায় ফিক করে হেসে ফেলল। এরপর দুই

ভাই মিলে দুটো বেড টেনে একসাথে করল। এরপর সায়ন মিটমিটিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল। সে যেতেই শুদ্ধ কেবিনের দরজা লক করে ওয়াশরুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে গেল। হাত-মুখ মুছে শীতলের স্যালাইন, এই হাত, ওই চেক করে সব ঠিকঠাক দেখে একটু উঁকে ঝুঁকে শীতলের সারা মুখে চুমু ঝুঁকে বিরবির করে বলল,

-‘ ‘শুদ্ধ ভাই আমি আপনার বউ হবো’ বলে হেদিয়ে মরছিল। বিয়ে করল বউও হলো, তারপর ঘুমিয়েও গেল? এখন বাসর টা কি আমি বালিশের সাথে সারব?’

একথা বলে বকতে বকতে পাশে শুয়ে পড়ল। ব্যাঙাচিটার সারা শরীরে ব্যথা নয়তো একটু জড়িয়ে ধরা যেতো। ধরলে হয়তো তার বুকটা শান্ত হতো।

কিন্তু কী আর করার মেনে নিতেই হবে ভেবে শুদ্ধ
চোখ বন্ধ করে নিলো। শারায়াত চৌধুরীরা বাড়ি
পৌঁছে যে যার রুমে চলে গেছে। সকলে ক্লান্ত বিধায়
কেউ কোনো কথা বাড়ায় নি। সায়েনও শাওয়ার নিয়ে
বের হতেই কেউ তার বুকে স্বজোরে ধাক্কা মারল।
আচমকা ধাক্কায় বিছানায় বসে পড়েছে সে। আরেক
ধাক্কা মারতেই সায়েন সামনের মানুষটার হাত ধরে
নিলো। থমথমে মুখে বলল,

-‘কেউ যেন আমাকে না ছোঁয়।’

-‘ছুঁলে কি হবে?’

-‘ফোসকা পড়বে।’

-‘তবুও ছুঁবো।’

-‘বারণ করছি বারণ শোনা হোক।’ একথা শুনে স্বর্ণ
নিজের হাত ছাড়িয়ে চলে যেতে নিলেই সায়েন খপ
করে তার চুলের মুঠি চেপে ধরল। সে এবার নিজেই
স্বর্ণকে ছুঁড়ে দিলো নরম বিছানার মাঝখানে। এগিয়ে
এলো ধীরে-ধীরে। চোয়াল শক্ত করে আরো কাছে
আসতেই স্বর্ণ খাবলে ধরল সায়েনের পরনের শুভ্র
তোয়ালের গিটু। ঠোঁটে দুট্টু হাসি এঁটে হুমকিস্বরূপ
বলল,

-‘ছাড়বে নাকি টান দেবো?’

সায়ন স্বর্ণের কথা পাত্তায় দিলো না বরং চোখে চোখ রেখে ওষ্ঠজোড়া দখলে নিলো। প্রথমে ধীরে তারপর তার সমস্ত রাগটুকু যেন উগলে দিতে থাকল স্বর্ণের ঠোঁটের ভাঁজে। শক্ত কামড়ে রক্তাক্ত করে তবে ক্ষান্ত হলো সে। এরপর নিজেও হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করল,-‘গেলিই যখন ফিরলি কেন?’

স্বর্ণের নিচের ঠোঁট কেটে জ্বলছে খুব। তবে তার উন্মাদ প্রেমিক পুরুষের রাগ কমানোর জন্য এটুকু সহ্য করা যায়। কাটা ঠোঁট নাড়িয়ে সে জবাব দিলো এবার,

-‘ভালো থাকতে এবং রাখতে।’

সায়ন বলল,

—‘যার মনে ভালোবাসার ছিঁটেফোঁটাও নেই তার কাছে ভালো থাকার কারণ খোঁজা বোকামি হয়ে যায় না?’

-‘কে বলল আমার মনে ভালোবাসা নেই?’-‘আমি বলছি। ভালোবাসলে অন্তত ফেলে যেতে পারতি না।’

-‘ভালোবাসি বলেই ভালোবাসার মানুষদের কাছে রেখে গেছি; ছেড়ে যাই নি। আর যাবই না কোথায়?’

আমার শেষ গন্তব্য তো আপনিই শাহরিয়ার চৌধুরী।
‘পরেরদিন সকালবেলা,
নতুন এক দিনের সূচনা। বেলা কতই বা হবে এ
সাতটা কি সাড়ে সাতটা! অন্য দিন ভোরের আজানের
পরপরই চৌধুরী নিবাসে একে একে সবাই উঠে
পড়েন। দৈনন্দিন কাজ শুরু করেন। রান্নাঘরে
ছোটোপুটি লেগে যায়।

কিন্তু আজ নীরাবতায় ছেয়ে আছে চৌধুরী নিবাস।
ভোরের দিকে বাড়ি ফেরায় কেউ উঠতে পারে নি।
তবে একজন মানুষ ঘুমানো তো দূর স্থির হয়ে বসতে
অবধি পারেন নি। বুকের ভেতরটা আফসোসে দুঁমড়ে
মুঁচড়ে যাচ্ছে উনার। নামাজে বসে অঝরে কেঁদেছেন।
বুকটা যেন তীব্র যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে সময়ের সঙ্গে
পাল্লা দিয়ে। দীর্ঘদিন চেপে রাখা আফসোস

নতুন করে ক্ষত দগদগে করে তুলেছে। আর উনার
আফসোসের আরেক নাম ইয়াসির। হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই
উনার আফসোসের নাম ইয়াসির। আগে তার জন্য
যতটা না আফসোস হতো আজকে তার থেকেও বেশি
হচ্ছে। বাবা তো দূর নিজেকে ব্যর্থ একজন মানুষ বলে
মনে হচ্ছে। ছেলে আজ উনাকে বাবা বলে ডেকেছে

তাও প্রথমবার। তাও কেন বলেছে? কারণ উনিই তার কষ্টের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। শুদ্ধ-শীতল কবুল বলার মুহূর্তে অসহায় চোখে বার বার তাকাচ্ছিল ছেলেটা। ছোট বাচ্চাদের মতো ঠোঁট কাঁপিয়ে কান্না আঁটকানোর চেষ্টা করছিল। তার চোখ যেন চিৎকার করে অভিযোগ করে বলছিল, ‘ওদের থামাও বাবা! থামাও!’ কিন্তু সেটা আর সম্ভব ছিল না। ইয়াসির যেমন জেদি তার থেকেও শুদ্ধ একরোখা। সেই মুহূর্তে যদি পুনরায় বাঁধা সৃষ্টি করতো তাহলে ইয়াসিরের জীবনআয়ু সেখানেই শেষ করত। বলা বাহুল্য, উনি ছোটো ছেলের তীক্ষ্ণ রাগকে ভীষণ ভয় পান। কেননা ছেলের রাগের মাত্রা উনি দেখেছে। আর যেখানে অসুস্থ শীতল চাচ্ছিল সেখানে কিছু করার ছিল। আরেকটা কথা না বললেই নয়; সায়ন উনার রক্ত নয় তবে সায়নের ক্ষমতা নেই উনাকে উচ্চবাক্য করার। স্পর্ধা নেই উনার মুখের উপর না বলার। সবার সামনে ছোটো করার। এজন্যই এতকিছুর পরও সায়নকে ধমকে ধামকে হলেও

বাড়ি ফেরাতে পেরেছেন। কঠিন সত্য জেনেও বুঝদার
সায়ন ভেঙ্গে পড়ে উনাকেও ভেঙে ফেলে নি। ছেড়ে
গিয়ে বুকের উপর পাথর তুলে দেয় নি। বলতে লজ্জা
নেই সায়নের মতো করে আজ ইচ্ছে করছিল
ইয়াসিরকেও থামাতে। সেও তো উনারই ছেলে।
ইলিয়ানার দেওয়া শেষ আমানত। মন চাচ্ছিল, মান-
অভিমান, ঠিক-বেঠিকের হিসাব ভুলে যেতে। উনার
ছেলে বলে সারা পৃথিবীর কাছে পরিচয় করাতে।
আফসোসে ভরা বুকে পাপী ছেলেকে বুক আগলে
নিতে কষ্ট হতো না। একটুও হতো না! কিন্তু উনি
জানেন ইয়াসির উনার ডাক শুনত না। লাগামছড়া,
বাঁধনহারা ছেলেটা

শুনলে আগেই শুনতো উনার কথা। কিন্তু সে শোনে
নি। বারবার পিছলে গেছে। মোদাকথা, যে বাঁধনে
বাঁধা পড়তে চায় না তাকে কিভাবে বেঁধে রাখবেন?
শেষ চেষ্টা হিসেবে স্বার্থপরের মতো ভেবেওছিলেন
শীতলের

তার বিয়ে দিয়ে কাছে রেখে দিতে। তাকে ভালো
পথে আনার সর্বশেষ সুযোগটুকু কাজে লাগাতে। এই
ভেবে বলেছিলেন, পাপাচার কমাতে সে চৌধুরী

নিবাসের সবচেয়ে সুন্দর ফুলটা দিবেন। কারণ উনার
মনে মতো শীতলের চঞ্চলতায় পারবে দুষ্ট
রাজকুমারের পাথর মনে ফুল ফোটাতে। তার পাপের
পথ আগলে ভালোর দিকে ফিরিয়ে আনতে। শীতলের
মধ্যে এই আশ্চর্য জাদুকরী ক্ষমতা আছে। কিন্তু কে
জানত শুদ্ধ-শীতল একে অপরকে পছন্দ করে। সেই
পছন্দ পছন্দের মাঝে সীমাবদ্ধ নেই সকলের দৃষ্টির
আড়ালে দিনকে দিন সেটা ভালোবাসার রূপ নিয়েছে।
একথা তো উনি জানতেনও না। জানলে অবশ্যই
ভুলেও ইয়াসিরকে কথা দিতো না। এখন এমন একটা
অবস্থা উনি আজকের পর থেকে শুদ্ধর চোখে চোখ
রেখেও তাকাতে পারবেন না। ছেলেটা হয়তো উনাকে
জঘন্য বাবা বলে মনে মনে ঘোষণা করেছে। করাটা
স্বাভাবিক যদিও। আজ বলতেই হয়,
এতদিন নিজের নৈতিকতা, কর্তব্যপরায়ণতা, নিষ্ঠাচার
নিয়ে গর্ব ছিল উনার। কিন্তু আজ একনিমিষেই শেষ।
অন্যেরা কি বলবে পরের হিসাব,
এখন নিজের মনই চিৎকার করে বলছে, ‘তুমি বাবা
হিসেবে খুব খারাপ

শাৰাফাত চৌধুৰী, খুব খাপ। তুমি না পাৰলে ইয়াসিরকে সঠিক পথে আনতে, না পাৰলে ছেলেটোৰ মুখে হাসি ফোটাতে। শেষ মুহূৰ্তে যা চেষ্টা কৰলে সেটাও আৰেক ছেলৈৰ হাসি কেড়ে নেওয়া ঘণিত কাজও কৰতে যাচ্ছিল। আৰ সায়েন? তাকে তো তুমি শাষণে ৰেখেছে সবসময়। ভীষণ শখ কৰে ছেলেটা ৰাজনীতি কৰতে চেয়েছিল। সেটোতেও তোমাৰ বাঁধা। তুমি বাবা হওয়ার যোগ্য না শাৰাফাত, বাবাৰা অন্তত এইৰকম আচৰণ কৰে না।’

নিজৰ মনৰ কথা শুনে শাৰাফাত চৌধুৰী মলিন হাসলেন। না চাইতেও চোখৰ পানি ঝৰঝৰ কৰে ঝৰে গেল। ক্লান্ত শৰীৰে এলিয়ে দিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ৰইলেন ঘূৰ্ণায়মান সিলিংয়েৰ দিকে। এৰপৰ মনে মনে বিৰবির কৰলেন,

-‘আমাৰ আল্লাহ জানে আমি আমাৰ সায়েনকে কখনো আলাদা চোখে দেখি নি। কখনো বাকি দুই সন্তানৰ সাথে তুলনা কৰি নি। তুলনা কৰবই বা কেন, ও তো আমাৰ ছেলে। আমাৰ আৰেক সন্তান! হ্যাঁ ওৰ ৰাজনীতি কৰা পছন্দ না একথা ধুবসত্য। শখৰ বশে কিছু কৰতে হলে অন্যকিছু কৰক, ৰাজনীতি

কেন? রাজনীতি শখের বশে করা জিনিসও না। আর কে চায় সন্তানের রক্ত দেখতে? ক’দিন পরপর আহত হয়ে বাড়িতে ফেরে এসব দেখতে কার ভালো লাগে? আমি মানি আমি খুবখারাপ বাবা কিন্তু খারাপ বাবাদের মনে ভয় হয়,, সন্তান হারানোর ভয়। ছেলের লাশ কাঁধে নেওয়ার ভয়। সেক্ষেত্রে আমি খারাপ বাবা খারাপই থাকব।’

একথা ভাবতে ভাবতে উনার চোখের কোণ বেয়ে জল গড়াতে লাগল।

একফোঁটা,, দুফোঁটা করতে বালিশ ভিজতে থাকল। উনার পাশে ঘুমানো সিন্তারার অজানায় রয়ে গেল প্রিয় স্বামীর বুকচাপা কিছু কষ্টের কারণ।

যেগুলো দগ্ধ করছে উনার বুক পাঁজর!বেলা বাড়ার সাথে সাথে চৌধুরী নিবাসের সদস্যরা জেগে উঠল। সকলে আগে শীতলের খোঁজ নিতে শুদ্ধকে লাগাতার কল দিতেই থাকল। কিন্তু কল রিসিভ হচ্ছে না। আবার কিছু হলো না তো? সবার মুখে চিন্তা ছাপ। সিমিন অস্থির হয়ে কল দিতে দিতে কলটা কেটে যাবে সেই মুহূর্তে কল রিসিভ হলো। উনি চিন্তিত

সুরে হ্যালো বলার আগে শীতলের কণ্ঠ শোনা গেল,-‘হ্যা..হ্যালো আম্মু!’

-‘শীত..ল? কেমন আছিস মা? শরীর ঠিক আছে? শুদ্ধ কই? কল ধরছে না কেন ছেলেটা?’

-‘আম্মু, শুদ্ধ ভাই ঘুমাচ্ছে। ক্লান্ত লাগছে দেখে ডাকি নি পাশ থেকে ফোন নিয়ে আমি রিসিভ করেছি।’

-‘ওহ। তুই ঠিক আছিস?’

-‘হুম।’

-‘নার্স এসেছিল? আর স্যালাইন দিয়েছে? সাবধান ক্যানোলাতে রক্ত উঠে যায় না যেন।’

-‘উঠবে না। আসবে না তোমরা?’

-‘এইতো সকালের নাস্তা বানিয়েই যাব আমি।’

-‘তাড়াহুড়ো কোরো না ধীরে-সুস্থে এসো আমি ঠিক আছি।’

-‘ঠিক আছে।’

শীতলের কথা শুনে সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। ওদিকে একজন নার্স কেবিনের দরজায় নক করামাত্রই শীতল নিচু স্বরে জানতে চাইল কে এসেছে। নার্স বলল,-‘ম্যাম আপনার স্যালাইন শেষের পথে ওটা খুলে দিতে হবে।’

একথা শুনে শীতল একবার তাকাল ঘুমন্ত শুদ্ধর
দিকে। উপুড় হয়ে কি সুন্দর করে ঘুমাচ্ছে তার
বিশুদ্ধ পুরুষ। মূলত তার ঘুমটা ভাঙতে চাচ্ছে না
বলেই কত কষ্ট করে ফোনটা কাছে টেনে কল রিসিভ
করল। এজন্য গুলি লাগা হাতেও ব্যথা পেয়েছে।
এদিকে আবার এই নার্স এসে হাজির।

এদিকে স্যালাইনও শেষের দিকে খুলতে হবে দেখে
সে নিচু স্বরে বলল,

-‘শব্দ না করে নিঃশব্দে আসুন।’একথা শুনে নার্স
নিঃশব্দে কেবিনে প্রবেশ করল। দুটো বেড একসাথে
দেখে বিষ্ময় নিয়ে তাকাল ঘুমন্ত পুরুষটার দিকে।
বলা বাহুল্য পুরুষটা দেখতে বেশ। তাকে ওভাবে
তাকাতে দেখে শীতল ফিসফিস করে বলল,

-‘ওটা আমার স্বামী! ঘুমাচ্ছে ঘুমাক শব্দ করবেন না,
প্লিজ। আসলে ওর মাথায় একটু সমস্যা আছে।
বলতেও লজ্জা লাগছে, আসলে হয়েছে কী আমার
শশুর বাড়ির বংশগত রোগ এটা। সব সময় রাগে না
তবে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটালে মেজাজ চড়ে যায়।
তখন যাকে সামনে পায় তাকে ধরে কামড়ে দেয়।’

একথা শুনে অল্প বয়সী নার্স মেয়েটা আরেকদফা
অবাক হয়ে তাকাল শুদ্ধর দিকে। এমন সুদর্শন
পুরুষের মাথায় সমস্যা? দেখে বোঝাও যায় না।
আহারে সবই কপাল,,রোগ তো আর বলে কয়ে আসে
না। রোগের কাছে সবাইকে কারু হতেই হয়। এসব
ভেবে শীতলের স্যালাইন দেওয়া হাত মুক্ত করল।
নিঃশব্দে ক্যানোলার মাধ্যমে দুটো মেডিসিন ধীরে
ধীরে ইনজেক্ট করল। শীতল ব্যাথায় চোখ মুখ কুঁচকে
নিলো। কি মেডিসিন কে জানে, রগে যাচ্ছে তো
জ্বালাপোড়া করতে করতে। তবুও সে কোনো শব্দ
করল না। ডাক্তার নাকি মুখে খাওয়ার অনুমতি
দিয়েছে স্যালাইনটা বন্ধ আপাতত। একথা বলে
ক্যানোলার মুখবন্ধ করে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

উনি যেতেই শুদ্ধ চোখ খুলে শীতলের দিকে তাকিয়ে
রইল। শীতল ওর তাকানো দেখে মিষ্টি করে হাসল।
বলল,-‘গুড মনিং শোয়াইব শুদ্ধ। বিয়ের প্রথম
সকালে অনেক অনেক ফুলের শুভেচ্ছা রইল। ‘

শুদ্ধ কিছুই বলল না সেভাবেই তাকিয়ে রইল। আবার
তাকে জ্বালানোর কাজে লেগে পড়েছে। কি যেন
বলল? সে নাকি পাগল যাকে তাকে ধরে কামড়ে

দেয়। ব্যাঙাটির ঘরে ব্যাঙাটি আর ভালো হবে না।

শীতল ভাবল

এক্ষুণিই ধমকে উঠবে কিন্তু শুদ্ধ সেটা করল না। বরং
গড়ন দিয়ে চলে এলো শীতলের খুব কাছে।

বিনাবাক্যে শীতলের গলায় ডুবিয়ে বলল,

-‘জ্বালাতে খুব ভালো লাগে তাই না?’

হতভম্ব শীতল কোনো কথা বলতে পারল না। লজ্জায়
পেল বটে। তবে

কিছু একটা উচিত ভেবে বিরবির করে বলল,-‘খুব।’

-‘আমি জ্বালালে সহ্য করতে পারবি?’

-‘ক্ষুধা লেগেছে। কিছু খাব।’

একথা শুনে শুদ্ধ চট করে মুখ সরিয়ে উঠে দাঁড়াল।
এদিক ওদিক দেখে ফোন খুঁজে কল করল কাউকে।
নাস্তা আনতে বলে নিজেও উঠে পড়ল।

মিনিট পাঁচেক পর হাসান নাস্তা নিয়ে আসলে দুজন
মিলে বেড আরেক অবস্থানে রাখল। হাসান সারারাত
হসপিটালে ছিল এখন ফিরবে বিধায় বিদায় নিয়ে
বেরিয়ে গেল। শুদ্ধ শীতলকে যতটুকু পারল ফ্রেশ
হতে হেল্প করল। তারপর নিজেও খেলো শীতলকেও
খাইয়ে দিলো। এর কিছুক্ষণ পর সিমিন, সিতারক,

স্বর্ণ আর সায়ন এলো। শুদ্ধ ভাইয়ের সাথে ইশারা করে বেরিয়ে গেল। পরক্ষণে ফিরে এসে শীতলকে বলল,

-‘ একটা কাজে যাচ্ছি ফিরতে লেট হবে।’ একথা বলে সে বেরিয়ে গেল। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, সেসব কিছুই বলল না। সারাদিন কোনো খোঁজও পাওয়া গেল না। ফিরল একেবারে মধ্যরাতে তখন শীতল ঘুমাচ্ছিল। বিকেলের দিকে সাফওয়ান চৌধুরী এলে সিমিন আর সিতারাকে উনার সাথেই বাড়ি পাঠিয়ে দিলো সায়ন। সে আর স্বর্ণ হাসপিটালে থাকল। শুদ্ধ ফিরলে তারা দু’জন বাইকে করে নিজের মতো সময় কাটিয়ে বাড়ি ফিরল। এভাবে দেখতে দেখতে প্রায় চারদিন পর শীতলকে রিলিজ দেওয়া হলো। ভালোই ভালোই শীতলও মুক্ত পাখির ন্যায় এক আকাশ সমান খুশি নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। তবে মেডিসিন চলছিল চলবে।

প্রচলিত কথায় আছে সময় হচ্ছে বহমান স্রোত। যা চলে নিজস্ব গতিতে। সেই সময়ের অংক কষতে কষতে পেরিয়ে গেল একটামাস। একটু দুর্বল

হয়েছে একের পর এক ধেড়ে আসা ঝড়। মলিন
হয়েছে হারানোর কিছু ব্যথা। কিছু সত্য উন্মোচিত
হয়েও বন্ধন হয়েছে আরো দৃঢ়। বলা বাহুল্য,এই
একমাসে পূর্বের মতো চাঙা হয়ে উঠেছে চৌধুরী
নিবাস। মুছে গেছে হতাশার গ্লানি। স্মৃতির পাতায়
যত্নে-অযত্নে বন্দী হয়েছে কিছু মিষ্টি মুহূর্ত ও কিছু
তিক্ত অভিজ্ঞতা। এখন চৌধুরী নিবাসও খুনশুটিতে
মুখোরিত।

রুটিন মারফিক সবাইকেই ব্যস্ত হতে হয়েছে দৈনন্দিন
কাজে। তবে শীতল বাড়ি ফেরা পর শুদ্ধকে বাড়িতে
খুব কম সময় পেয়েছে। সে কখন আসে কখন যায়
বলা মুশকিল। তার কিসের এত ব্যস্ততা কে জানে!
সারাদিন কোথায় যায় কি করে তাও বলে না। খুব
জোর করলে মলিন হেসে বলে ‘দোয়া কর যা
হারিয়েছি সব যেন ফিরে পায়। আমার কষ্টের ফল
যেন আমারই কাছে ফিরে আসে।’তার কঠিন কঠিন
কথার মানে কিছু বোঝে না সে। তাকে ডাব ডাব
করে তাকিয়ে থাকতে দেখে শুদ্ধ হাসে। আসলে
ল্যাগে চুরি হওয়ার কথা সে কাউকে জানায় নি। কি
দরকার শুধু শুধু দুঃচিন্তা করবে। চিন্তা করে তো

লাভের লাভ কিছুই হবে না। মোদাকথা, চুরি হওয়া
সেই ল্যাব বন্ধ করে দিয়েছে। চোর যখন একবার
গেরোস্টের বাড়িতে চুরি করার সুযোগ পায় তখন সে
বারবার ফিরে আসে। নিজে না আসলেও অন্যকে
পাঠায় কাজ

উসূল করতে। আর এই সুযোগ কাউকে দেওয়া যাবে
না। এরপর সে ওই ল্যাব কী করেছে সায়েন আর
তার ফ্রেডরা ছাড়া কেউ জানে না। আজও সারাদিন
পেরিয়ে রাতে ফিরল শুদ্ধ। সবার সাথে ডিনার
সারল। শীতল অভিমানী চোখে কয়েকবার তাকালেও
কিছু বলল নি শুদ্ধ। আর তাদের বিয়ে হওয়ার পরও
একরুমে থাকা না থাকা নিয়ে কেউ কিছু বলেও নি।
ওদের মর্জির উপরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কেন
জানি শুদ্ধও শীতলকে তার রুমে থাকার আহ্বান
জানায় নি। অগত্যা পূর্বে যেমন ছিল এখনো তেমন
চলছে। তবে কয়েকদিনে শীতলের মতো বড্ড
অভিমান জমেছে। কেন জানি মনে হচ্ছে শুদ্ধ তাকে
ইগনোর করছে। নয়তো এত কিসের কাজ তার?
একটু সময় দিলে কি হয়? আগের কথা এখানকার
কথা কি এক নাকি? এখন মনে রাখা উচিত না তার

ঘরেও একটা বউ আছে। বউ তাকে ভীষণ মিস করে। সঙ্গ চায়। জ্বালাতে চায়। অহেতুক বকবক করে কান-মাথা ঝালাপালা করে দিতে চায়। তা না খালি কাজ আর কাজ! এসব নানান কথা ভেবে রাতে খেয়ে শীতল মলিন মুখে উপরে যাচ্ছিল।

তখন সিঁতারা তাকে দাঁড় করিয়ে বলল,

-‘শীতল, উপরে যাচ্ছিস মা?’

-‘হুম, কিছু বলবে বড় মা?’

-‘খেতে বসে দেখলাম শুদ্ধ বার বার কপালে হাত দিচ্ছে। ছেলেটার মাথা ব্যথা করছে বোধহয়। কফি করে দিচ্ছি ওর রুমে পৌঁছে দিস তো মা।’

-‘দাও।’ একথা বলে সে পাশে এসে সিঁতারার পাশে দাঁড়াল। সিঁতারা আড়চোখে

শীতলকে একবার দেখে গলা খাঁকারি দিয়ে বলল,

-‘কাজের চাপ বেড়েছে তাই সময় দিতে পারছে না। কষ্ট পাস না মা।’

একথা শুনে শীতল ধরা গলায় অন্যদিকে তাকিয়ে বলল,

-‘কিন্তু কষ্ট হচ্ছে বড় মা। তোমার ছেলে ইচ্ছে করে আমাকে ইগনোর করছে।’

-‘কেন করছে জিজ্ঞাসা করেছিস?’

-‘না।’

-‘গিয়ে জিজ্ঞাসা কর।’

একথা বলে সিঁতারা শীতলের হাতে কফির ধরিয়ে
দিলে শীতল যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই সিঁতারা
তাকে ধরে থামিয়ে দিলো। গলা খাঁকারি দিয়ে
আমতা আমতা করে বলল,

-‘আগে তো শাড়ি টাড়ি পরতি এখন পরিস না কেন?
শাড়ি পরলে তোকে কিন্তু ভালোই লাগে।’

-‘কফি ঠান্ডা হয়ে গেলে খ্যাচ খ্যাচ করবে দিয়ে
আসি।’

-‘যা।’একথা বলে শীতল মুখ ভোঁতা করে চলে গেল।
সিঁতারা স্বর্ণকে ইশারায় কাছে ডেকে কিছু বলে তাকে
দ্রুত উপরে পাঠিয়ে দিলো। স্বর্ণ দ্রুতপায়ে গিয়ে
শীতলের হাত থেকে কফির মগটা নিয়ে তাকে রুমে
যেতে বলল। শীতল ধরা গলায় বলল,

-‘আমি দিয়ে আসি না আপু? প্লিজ আমাকে দাও।’

-‘তুই আমার রুমে যা আমি আসছি।’

একথা বলে স্বর্ণ শুদ্ধকে কফি দিয়ে শীতলকে লাল ও
কালো মিশেলের

জর্জেট শাড়ি পরিয়ে সাজিয়ে দিলো। লম্বা চুলগুলো
ছেড়ে দিলো। টানা টানা চোখে কাজল দিয়ে দিলো।
হাতে দিলো একগোছা লাল ও কালো মিশেলের চুড়ি।
কপালে ছোট সাদা পাথরের টিপ। তারপর বোনকে
ধরে শুদ্ধর রুমের সামনে দাঁড় করিয়ে দরজা নক
করে দ্রুতপায়ে সরে পড়ল। শীতল এতক্ষণ হতভম্ব
হয়ে তাকিয়ে দেখছিল বোনের কাহিনি। যখন সে
বুঝল ততক্ষণে শুদ্ধর দরজা খুলে ভ্রুঁ কুঁচকে তাকিয়ে
আছে। এত রাতে

তার সাজগোছ দেখেও কিছু বলল না বরং দরজা
থেকে সরে দাঁড়াল। শীতল ধীর পায়ে রুমে ঢুকলে
দরজা আঁটকে তাকিয়ে ই রইল শীতলের দিকে।
এগিয়ে এসে দাঁড়াল শীতলের মুখোমুখি। সে কিছু
বলছে দেখে শীতলই আমতা আমতা করে বলল,
-‘এভাবে তাকিয়ে আছেন কেন শুদ্ধ ভাই? আমার
মুখে কি কিছু লেগে আছে? দেখি সরুন যেতে দিন
আমায়।’

কম্পিত সুরে বলা শীতলের কথাটা শুনল শুদ্ধ। তবে
তার মধ্যে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। বরং সে
হিমশীতল চাহনিতে পকেটে হাত গুঁজে এগিয়ে এলো

দেওয়ালের সাথে সিটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা শীতলের
দিকে হাত রাখল শীতলের কান বরাবর যেন
কোনোভাবে পালাতে না পারে।

তার মতিগতি বুঝে শীতলের গাল দুটো লালবর্ণ ধারণ
করল। জীবনে

কম সিনেমা তো আর দেখে নি। তবে কিছু একটা
আন্দাজ করে তার

গলা শুকিয়ে এলো। হাতের তালু ঘামতে থাকল। এর
আগে সেই শুদ্ধকে জড়িয়ে ধরেছে, কানের নিচে চুমু
খেয়ে ভালোবাসার আবদার জুড়েছে, ঘুমন্ত শুদ্ধর বুকে
মাথা রেখেছে, বুকে নাক ডুবিয়ে তার শরীরের ঘ্রাণও
নিয়েছে। কিন্তু শুদ্ধ কখনোই তাকে অযাচিত স্পর্শ
করে নি। যা করেছে সীমাবদ্ধতা রেখে। এবং তাতে
তার নোংরা কিংবা গা ঘিনঘিনে অনুভূতি অনুভব হয়
নি কখনো। আজকে হঠাৎ তার এমন রূপ দেখে
যারপরনাই বিস্মিত শীতল। যেতেও দিচ্ছে না আবার
কিছু বলছেও না দেখে পুনরায় বলল,-‘রুমে যাব।’

-‘কেন?’

-‘ঘুমাব।’

-‘তাহলে এলি কেন আমি কি ডেকেছি?’

-‘ভুল করেছি আর আসব না।’

একথা বলে যেতে গেলে শুদ্ধ ওর পথ আঁটকে
দাঁড়াল। পাশ কাটিয়ে যেতে গেলে পুনরায় পথ
আঁটকাল। বেশ কয়েকবার একই কাজ করাতে
শীতল অধৈর্য্য হয়ে বলল,

-‘শুধু শুধু দাঁড় করিয়ে রেখেছেন কেন? সরুন না,
যেতে দিন প্লিজ।’

-‘ শুধু শুধু না তো।’

-‘তবে?’শুদ্ধ ফিচেল হাসল। তার চঞ্চল অভিলাষী
তার নিষিদ্ধ অভিলাষ বুঝেও না বোঝার ভান করছে
দেখে মজা পেল। লজ্জায় রাঙা গালদুটো থেকে দৃষ্টি
সরিয়ে সে ঠোঁটের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থমথমে
সুরে বলল,

-‘প্রতিশোধ নিতে।’

-‘কিসের প্রতিশোধ?’

-‘সময় সময়ে আমাকে জড়িয়ে ধরার প্রতিশোধ,
কানের নিচে চুমু খাওয়ার প্রতিশোধ, বুকে মুখ
ডুবানোর প্রতিশোধ। মোদাকথা আমার সঙ্গে যখন যা
করেছিস আমিও এখন সেসবের প্রতিশোধ নিবো,
প্রস্তুত হোন ওয়াইফি ?’

বিশুদ্ধ পুরুষের মুখে এমন অশুদ্ধ কথা শুনে শীতল হতবাক হয়ে গেল। মুখ কাচুমাচু করে পালানোর পথ খুঁজল। গাঁইগুঁই করে ছেড়ে দেওয়ার বাহানা দেখাল। শুদ্ধ থমথমে মুখে তার সব তাল বাহানা দেখল, বুঝল।

এরপর আচমকা শীতলের দুই গাল চেপে ধরে ঠোঁট ঠোঁট বসিয়ে কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে ছেড়ে দিলো। শীতল কোনো প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগেই পুনরায় শক্ত করে তার ঠোঁটে, গালে, গলায় চুমু খেয়ে বলল,-‘তোকে এভাবে কখনো আদর করেছি?’

শুদ্ধর থমথমে কণ্ঠস্বর আর ঘটে যাওয়ার ঘটনা বেচায় শকড়। সেই অবস্থায় শুদ্ধ ধমকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেও কিছু বলতে পারল না। তখন শুদ্ধ তাকে তৃতীয়বারের মতো একইভাবে চুমু ঝঁকে ছেড়ে দিয়ে বলল,

-‘এভাবে কখনো আদর করি নি আর করবোও না। আমার এত লোভও নেই। তবে ভদ্র আছি থাকতে দে নয়তো অনুষ্ঠানের অপেক্ষা আর করা হবে না।’ড্যানিয়েল হ্যাডসন এবং তার স্ত্রী অলিভার হ্যাডসন কানাডার নামকরা সায়েন্টিস্ট। দিনের পর

দিন নিজেদের মেধা খাটিয়ে সাফল্য অর্জন করে
নামডাক কামিয়েছেন বিশ্বজুড়ে। উনাদের মেয়ে
এলিসা হ্যাডসন ছিলেন কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট বা
রোবোটিক্স গবেষক। স্বামী-স্ত্রী আর একমাত্র কন্যা
নিয়ে ছিল ছোট্ট একটি সুখের পরিবার। এলিসা
ছোট্ট থেকে বেশ মেধাবী। বাবা-মায়ের তৈরি করা
আবিষ্কার মানবকল্যাণে আৰ্শ্ববাদ হয়ে

কাজে লাগছে দেখে সেও ভাবত সায়েন্টিস্ট হবে।
নিত্য নতুন রোবোটিক্স

জিনিস আবিষ্কার করবে। এমন জিনিস আবিষ্কার
করবে যেটা মানুষের কাজে লাগে। বোরট যে কতটা
চমকপ্রদ হতে পারে সে দেখাবে। এরপর

নিজের মধ্যে অদম্য এক জেদ পুষে সে দীর্ঘদিন
নিজের শ্রম এবং মেধা কাজে লাগিয়ে সে একটি
রোবোটিক্স পিজন (পায়রা) আবিষ্কার করে। বর্তমান
যুগে বিজ্ঞান প্রযুক্তি যে এত উন্নতি তাদের কাজ
দেখে বোঝার উপায় নেই। সে একটু একটু করে
পায়রাটাকে মনের মতো করে গড়ে তোলে। তার
চালচলন, সৌন্দর্য, ডানা ঝাপটানো এসব কিছু নকল

কিন্তু সেটা দেখে বোঝার উপায় নেই। অথচ অবিশ্বাস্য
হলেও সত্য যে শতশত

জীবন্ত পায়রা মাঝে তাকে ছেড়ে দেওয়া হলে তখন
বোঝার সাধ্য থাকত না; কোনটা আসল আর কোনটা
রোবোটিক্স। তাকে আরো নিঁখুতভাবে

প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য এলিসা রাত-দিন এক করে
যথাসাধ্য চেষ্টা করে যেতো। যতদিন যেতো তার
মাথায় নান্দনিক কিছু ধারণা আসত। একে একে
পায়রার মাঝে Gps, সেন্সর, ক্যামেরা, মাইক্রো-
প্রসেসরসহ আরো নানান প্রযুক্তি এড করেছিল। কিন্তু
এলিসার কষ্টের আবিষ্কার নিঁখুতরূপে দেওয়ার আগেই
সেটা চুরি হয়ে যায়। কিভাবে যে চুরি হয় এত
আশ্চর্যের ব্যাপার। এবং কাজটা করে তার মামা।
এতদিনের এত শ্রম বৃথা যাওয়ায় এলিসা হতাশ হয়ে
ডিপ্রেশনে ভুগতে থাকে। ডিপ্রেশন থেকে মুক্তি পেতে
কিছুদিন কাজ থেকে বিরতি নেয় কিন্তু মনের শান্তি
কোথায় যেন হারিয়ে ফেলে। মাসের পর মাস কেটে
যায় কিন্তু কাজে ফিরতে পারে না। একটা সময়
নিজের উপরে অনীহা সৃষ্টি হয়। নিজেকে ব্যর্থ,

অপ্রয়োজনীয় কিছু মনে হতে থাকে, সুখের ভরা
পৃথিবীটা তার কাছে অসহ্য লাগে। ডিপ্রেশন
জটিল রোগ হয়ে বাসা থাকে তার মন ও মস্তিষ্কে।
ড্যানিয়ে অলিভার খুব চেষ্টা করেন মেয়েকে স্বাভাবিক
জীবনে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু তা সম্ভব হয় না বাবা-
মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে সুইসাইড করে এলিসা। ঘুন
যেমন কাঠকে কুরে কুরে খায় তেমনি ডিপ্রেশন
জলজ্যান্ত মানুষকে ধীরে ধীরে শেষ করে ফেলে।
হ্যাঁ, এলিসার জন্য উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলেও
সেটা কাজে লাগে নি। কারণ রোগ তখন ভালো হয়
যখন রোগী চায় সুস্থ হতে। মনোবল শক্তি বাড়ালে।
কিন্তু এলিসা প্রেমে ধোঁকা এবং আবিষ্কার হারিয়ে
নিজের মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল যার ফলে তার
পরিনতি এত করুণা হলো। এদিকে একমাত্র ভাগ্নীর
মারা যাওয়ায় ওর মামাও অনুতপ্ত হলো। ইগর নামের
এক সায়েন্টিস্টের কাছে বেচে দেওয়া পিজন আবার
ফিরিয়ে আনতে গেল। কিন্তু ইগর দেয় না বরং
টাকার লোভ দেখায়। না মানলে প্রাণে মারার হুমকি
দেয়। হতাশ হয়ে ফিরে আসে এলিসার মামা। পরে
ইগর পিজনটাকে খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে

থাকে। এবং এর কিছুদিন পর এই ঘটনার কথা
ড্যানিয়েলও জানতে পারেন। মেয়ের শেষ
আবিষ্কার নিজের কাছে রাখতে উনি সর্বোচ্চ চেষ্টা
করেন। প্রশাসন এবং আরো নানানভাবে ইগরের
থেকে সেটা নিজের আয়ত্তে নেন। মেয়ে মারা যাওয়ার
পর উনারা স্বামী-স্ত্রী ভাবেন অবসর গ্রহন করবেন।
যে কয়দিন আছেন বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করবেন।
সেভাবেই একের পর এক দেশ ঘুরে বেড়ান উনারা।
পরে পরিচিত এক সায়েন্টিস্টের আমন্ত্রণে তারা
বিডিতে আসেন। মান্য-গন্য, ব্যক্তিবর্গদের নিয়ে
একটা পার্টির আয়োজনও করা হয়। সেই পার্টিতেই
উনি পরিচয় হয় শুদ্ধর সাথে। শুদ্ধর শিক্ষক রেহমান
হক বিশেষ ভাবে শুদ্ধকে পরিচয় করিয়ে দেন
ড্যানিয়েল-এর সঙ্গে। খুব পছন্দ করেন শোয়াইব
নামের ছেলেটাকে। বিশেষ করে ছেলেটার কথা বলার
ধাঁচ, হাই-পারসোনালিটি, উপস্থিত বুদ্ধি দেখে তার
প্রতি আলাদা ভাবে নজর পড়ে। অলিভারও পছন্দ হয়
স্বল্প পরিচয়ে পরিচিত বাঙালি ছেলেটাকে। এর
কিছুদিন পর রেহমান হকের কাছে পুনরায় শুদ্ধর
সঙ্গে দেখা হয় উনাদের। তখন শুদ্ধ একটা কাজ

করছিল এবং যেটা করছিল ভুল করছিল। ড্যানিয়েল আর অলিভার অদূরে বসে দেখছিল ছেলেটার ধৈর্য্য। চাইলে শুরুতে উনারা ভুল সংশোধন করে দিতে পারতেন কিন্তু তা ইচ্ছে করে করেন নি। কারণ উনারা শুদ্ধর ধৈর্য্য দেখতে চেয়েছিলেন। যেটা এই পেশায় প্রধান হাতিয়ার। একের পর প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়েও শুদ্ধ যখন আটবারের বেলায় একই ভুল করতে যাচ্ছিল তখন উনারা নিজেই উঠে গিয়ে শুদ্ধর ভুল শুধরে দেয়। হাতে ধরে শিখিয়েও দেন সঠিক পন্থা।

এরপর থেকে কারণেঅকারণে শুদ্ধকে নিজেদের কাছে ডাকতে উনারা। ভালো-মন্দ পরামর্শ দিতেন, কাজের ব্যাপারে বেশ উৎসাহিত করতেন। একপর্যায়ে উনাদের সাথে বেশ ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বেশ কিছুদিন পর অলিভার অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রথমে ভেবেছিলেন ওয়েদার খাপ খাচ্ছে না তাই ফিরে গিয়েছিলেন আপন দেশে। সেখানে গিয়ে অসুস্থতা আরো বেড়ে যায় এবং হসপিটালে মৃত্যুবরণ করেন তিনি। বলা বাহুল্য, দীর্ঘদিন এক জটিল রোগে ভুগছিলেন তিনি। মাস ছয়েক পর, ড্যানিয়েল পুনরায়

বাংলাদেশে ফিরে আসে। রেহমান হককে জানান উনি শিক্ষক হয়ে যারা নতুন তাদের কাজ শেখাতে চান। আগে পিছে সবাইকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করতে হবে। তবে মরার আগে যদি নিজের শিক্ষা কাউকে বিলাতে পারে তাহলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে হবে। এতদিন অনেক কিছু করেছিলেন, অনেক টাকা কামিয়েছেন কিন্তু এ বয়সে এসে মনে হয়েছে সেসব বৃথা। অতঃপর শিক্ষকপদে নিয়োজিত থাকেন এবং কাজের বিনিময়ে তিনি রেহমান হকের থেকে কোনো অর্থ গ্রহন করতেন না। উল্টে নিজের অর্থ দান সদকার কাজে লাগাতেন। বলা বাহুল্য,যতকিছুই করুক উনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকত শুদ্ধর উপরে। হাতে ধরে যেমন কাজ শেখাতেন তেমনি ভুল করলে পানিশমেন্টও দিতেন। পানিশমেন্ট হতো অন্য ধরনের। উনি ভুল ফর্মুলা দিয়ে শুদ্ধকে টাক্স পূরণ করতে বলতেন। প্রথম প্রথম ভুল ফর্মুলা দিয়ে বারবার চেষ্টা করেও কিছুই করতে পারত না শুদ্ধ। পরে উনার এই চালাকি ধরে ফেলে তারপর নিজেও চালাকি করে সঠিক ফর্মুলা সঠিক ফর্মুলা খুঁজে বের করে। ড্যানিয়েল মনে মনে ভীষণ খুশি হয় শুদ্ধর প্রতি।

একাজটাও করতেন শুদ্ধ ধৈর্য্য আর বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করতে। একদিন আচমকা শুদ্ধকে নিজের ফ্ল্যাটে ডেকে নিজের পাশে বসায়। মায়া ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে এলিসার তৈরা করা সেই পায়রা শুদ্ধর হাতে তুলে দেন। খুলে বলে পুরো ঘটনা। শুদ্ধ ফিরিয়ে দিলে উনি জানান খুশি মনেই উপহারস্বরূপ দিচ্ছেন। তবে শর্ত একটাই এই পায়রা যেন ভালো কাজে ব্যবহার করা হয় এবং পায়রার কথা যেন গোপন থাকে। এরপর একদিন ড্যানিয়েলের কানাডিয়ান বন্ধু মারা যাওয়ার খবর শুনে উনিও কানাডা ফিরে বাংলাদেশে আর ফিরে আসেন নি। পরে উনার খোঁজ নিতে শুদ্ধ ও তার ফ্রেন্ডরা কানাডা গিয়ে জানতে পারে উনি খুন কারো হাতে খুন হয়েছেন। সেই কেউ টা হচ্ছে ইগর। ইগরের খোঁজ করতে গিয়ে পরিচয় হয় ঐশ্বর্যের সাথে। এরপর থেকে সেই পায়রা শুদ্ধর কাছে আছে। বরং এলিসার অসমাপ্ত কাজ সেই একটু একটু করে সম্পূর্ণ করে। এবং তার নাম রেখেছে, ‘এঞ্জেলিকা।’ তবে এঞ্জেলিকাকে কখনো একটা ছাড়া হয় না। তার সঙ্গী হিসেবে রাখা হয় জীবন্ত আরেকটা সাদা পায়রাকে। আর একের নাম এঞ্জেল আর

আরেকজনের নাম লিকা দুটোকে একসাথে নাম ধরে ডাকে, ‘ এঞ্জেলিকা’ যাতে কারো বিশেষ নজরে না পড়ে। শীতলকে খুঁজতেও এদের ব্যবহার করেছিল শুদ্ধ। শুদ্ধ যখন নাম ধরে ডেকেছিল তখন ফিরে এসে হাতে মাথা রেখে আদর চাচ্ছিল জীবন্ত কবুতর এঞ্জেল আর ড্রোনের মাধ্যমে উঁচু স্থান থেকে সব তথ্য পাঠাচ্ছিল লিকা অর্থাৎ এলিসার সেই রোবোটিকস পিজন। কথা হচ্ছে, সেদিনও দুটো পায়রাকে সঙ্গে এনে একসাথে ছাড়া হয়েছিল তবে এঞ্জেল ডাক শুনে ফিরে এলেও লিকা কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। এবংওরা ইয়াসিরের সিক্রেট ডোনে প্রবেশ করার আগে জেটে থাকা ওর বিশ্বস্ত লোকের কাছে রেখে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার আদেশ করেছিল। শুদ্ধ কথা শেষ করে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল শীতলের দিকে। শীতল কাঁধে মাথা রেখে এক বাহু জড়িয়ে ধরে রুমের সঙ্গে লাগোয়া ল্যাবের সিঙ্গেল বেডের উপর বসে আছে। শাড়ি পরিহিত চঞ্চল ব্যাঙাচি তাকে জ্বালাতেই যে উপস্থিত সেটা বুঝতে বাকি নেই। সেজেছোও একদম মনমতো করে। স্বেচ্ছায় যখন এসেছে তাকে আর যেতে দেয় নি বরং শীতলকে

এখানে এনেছে। ঘুরে দেখিয়েছেও পুরো ল্যাব।
শীতল বিষয় নিয়ে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে
দেখেছে ল্যাবটি। সাদা ইঁদুর দেখে কয়েকটা চেয়েছে।
শুদ্ধ কিছু বলে নি দুই পকেটে হাত গুঁজে শীতলের
কৌতূহলী মুখটা অপলক চোখে দেখে গেছে। শীতল
ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে একটা পায়রা দেখে হঠাৎ
জিজ্ঞাসা করে,

-‘এটা কি শুদ্ধ ভাই?’ তার এ প্রশ্নে শুদ্ধ ল্যাবের এক
সাইডে থাকা সিঙ্গেল বেডে বসলে শীতল পাশে এসে
বসে। পুনরায় জানতে চায়। তখন উক্ত ঘটনাটি
জানায় শুদ্ধ। সব শুনে শীতল কথা হারিয়ে চুপ হয়ে
যায়। তার কেন জানি ভীষণ কান্না পাচ্ছে। নিজেকে
এলিসার জায়গায় দাঁড় করালে কষ্টটা উপলব্ধি করতে
পারছে। সচরাচর সে কখনো যদি শখের বশে
কোনো কাজও করে খুশি মনে সবাইকে দেখিয়ে
বেড়ায়। বার বার জিজ্ঞাসা করে, ‘কেমন হয়েছে,
বলো, বলো?’ সামান্য কিছু রান্না করলে নাচতে
নাচতে সবাইকে খাওয়ার

তাগাদা দেয়। যতই লবণে পোড়া হোক বাবা-চাচু
কিংবা ভাইরা কখনো কিছু বলে না। বললে কষ্ট

পাবে। তখন সাহস করে রান্নাঘরেও আর যাবে না ভেবে। কিন্তু যখন নিজের রান্না নিজেই খেয়ে বুঝে খাওয়ার অযোগ্য তখন ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদে। মনে মনে একপ্রকার জেদ চাপে পরেরবার সে ভালো করবেই! এত ভালো করবে যে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে। তার মনে যদি রান্না নিয়ে এমন জেদ চাপে তাহলে এলিসার মনে কেন চাপল না? সে কেন পুনরায় নতুন করে চেষ্টা করল না? সে চাইলে অবশ্য পারত। তার পিজন চুরি হয়েছিল কিন্তু কেউ তো তার মেধা চুরি করতে পারেনি, তাহলে? আসলে একদিকে কষ্টের ফল আরেকদিকে ভালোবাসা নামক ছলনা। সব মিলিয়ে হাসি-খুশি মেধাবী মেয়েটাও হাল ছেড়ে দিলো। মৃত্যু নামক সত্যকে গ্রহন করে চিরতরে বিদায় নিয়ে নিলো। শীতল মনে মনে এলিসাকে নিয়ে নানান কথা ভাবল। ভাবল এলিসার বাবা-মাকে নিয়ে।

তারপর হঠাৎ বলে বসল,

-‘এলিসার বাবা-মা আপনাকে খুব পছন্দ করত তাই না?’

-‘হুম।’

-‘এলিসা বেঁচে থাকলে উনারা বিয়ের প্রস্তাব দিতো।
আচ্ছা আপনি কি তখন ওকে বিয়ে করতেন? বিয়ে
করলে আমার কি হতো শুদ্ধ ভাই?’

শুদ্ধ বিরক্ত মুখে তাকাল শীতলের দিকে। শীতল
জবাবের অপেক্ষায় না থেকে পুনরায় তাড়া দিয়ে
বলল,-‘ কি হলো বলুন? এখন কথা বলছেন না কেন
শুনি?’

-‘ হাজবেন্ডের মুখে অন্য কোনো মেধাবী মেয়ের কথা
শুনে খারাপ লাগা স্বাভাবিক মানলাম। বাট সেই
মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আগ বাড়িয়ে যা তা ভেবে
পায়ের সঙ্গে পা লাগিয়ে ঝগড়া করার পায়তারা করা
মোটোও সুস্থ মানুষের কাজ হতে পারে না।’

-‘তারমানে আমি অসুস্থ? ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে আমাকে
পাগল বললেন?’

-‘শুধু তুই না তোর চৌদ্দ গুষ্টি পাগল।’

-‘ঠিক আছে থাকতে হবে না পাগলের সাথে এন্ফুগি
চলে যাব আমি।’একথা বলে শীতল উঠতে গেলে শুদ্ধ
আচমকা আঁচল টেনে ধরে তাকে হেঁচকা টানে কাছে
এনে বেড়ে ফেলল। ঠোঁটে ফিচেল হাসি এঁটে শরীরের

সবটুকু ভর ছেড়ে দিলো শীতলের দেহের উপর।

শীতল হাঁশফাঁশ করলে শুদ্ধ বলল,

-‘কথা শেষ হয় নি আমার।’

-‘সব শুনব তো আগে সরুন না,,ওমা গো কত ভারি।

জলহস্তী একটা।’

শুদ্ধ সেকথা পাত্তা দিলো না। বরং মুখটা নামাতে
যাবে শীতল আচমকা

ঠোঁটের উপর হাত রেখে আরেক হাতে শুদ্ধর বুকে
ধাক্কা দিয়ে সরানোর বৃথা চেষ্টা করল। মুখটা কিঞ্চিৎ
অন্যদিকে ঘুরিয়ে লাজুক কণ্ঠে বলল,-‘এমন করলে
আর আসব না কিন্তু।’

একথা শুনে শুদ্ধ থেমে গেল। থমথমে মুখে সরে
গিয়ে উঠে বসে বলল,

-‘নিজের রুমে গিয়ে ঘুমা।’

-‘আপনি ঘুমাবেন না?’

-‘আমার সাথে তোর সাথ কি?’

শীতল বুঝল বিশুদ্ধ পুরুষটার অভিমান। গত
একমাসে খেয়াল করেছে কিছু নিয়ে শুদ্ধ তার উপর
বিরক্ত। তবে বিরক্তের কারণ খোলাসা করেও বলে

না। আজ সেটা জানতে হবে ভেবে নিজেও উঠে
বসল। শুদ্ধর মুখটা

নিজের দিকে ফিরিয়ে বলল,-‘কি করেছি আমি? রেগে
আছেন কেন আমার উপর?’

-‘(.....)’

-‘আম..আমি কি এসবে অভ্যস্ত বলুন? একটু তো
সময় দেওয়া উচিত।’

-‘(.....)’

-‘কি হয়েছে না বললে বুঝাব কিভাবে? আমার
জানামতে, আমি এই এক মাস কম দুষ্টমি করেছি।
আপনাকেও কম জ্বালিয়েছি। হ্যাঁ, রুমে এসেছি তবে
রুম এলোমেলো করে নি। কোনো কিছু চুরিও করি
নি; চুরি করব কেন যখন রুমের মালিকটাই এখন
আমার, তাই না?’

একথা শুনে শুদ্ধ তাকাল শীতলের দিকে তারপর মৃদু
হেসে বলল,

-‘রুমের মালিক এখন তোর বিধায় গুরুত্ব দিস না
তাই তো?’

শীতল হতবাক! এ আবার কেমন কথা? নিজে
কাজের বাহানায় বাড়িতে আসে না অথচ এখন তাকে

দোষ দিচ্ছে। তখন শুদ্ধ ঘুরে তার মুখোমুখি বসে বলল,-‘ বিগত একমাস ধরে সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে বের হই সারাদিন কাজে ডুবে থাকি। তোর মনে হয় না বের হওয়ার সময় আমাকে সুন্দর করে বিদায় জানানো উচিত? আমি নাস্তা সেরে ঠিকই রুমে আসি কিছুক্ষণ তোর জন্য অপেক্ষাও করি কিন্তু তুই আসিস না। আচ্ছা ধর, বের হয়ে ফিরলাম না। যদিও বা ফিরলাম দেহে প্রাণ থাকল না তখন আফসোস হবে না?’

শুদ্ধর কথা শুনে শীতলের বুক ধক করে উঠল। ছলছল চোখে তাকিয়ে ঢোক গিলল। তাকে আরেকদফা হতবাক করে দিয়ে শুদ্ধ বলল,-‘জীবনটা খুব ছোটো শীতল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, মনের ভেতর সুপ্ত আশা নিয়ে সংযম করে চলাটা মোটেও চারটে খানিক কথা না। আমরা জয়েন ফ্যামিলির ছেলে-মেয়ে হয়ে পাশাপাশি রুমে থেকেও সর্বদা নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে গেছি। নজর সামলে চলেছি। আমি সাধু পুরুষ নই আর না কখনো ছিলাম। তবে কঠোর সংযম ছিল বিয়ের আগে নিষিদ্ধ চাওয়ার প্রতি। কখনো চাই নি আমার স্পর্শ তোর

অস্বস্তির কারণ হোক। ইচ্ছে ছিল তোর মনে আমার প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে বাড়িতে জানাতে। কিন্তু কারো জীবনচক্র তো আর মর্জিমতো চলে না, তাই না? বিপদ এসেছিল কেটে গিয়ে যেভাবেই হোক আমাদের বিয়েটা হয়েছে। সম্পর্কের বদল ঘটেছে। এবার বোধহয় আমাদের মাঝে কিছু পরিবর্তন আনা দরকার।’

শীতল প্রথমে ভেবেছিল বাঁধা দেওয়াকে শুদ্ধ রাগ করেছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ঘটনা অন্যকিছু। তাই সে বলল,-‘ এত কঠিন কথা বুঝি না একটু সহজ করে বলুন না,,শুদ্ধ ভাই।’

আবারও ভাই! এই সম্বোধন শুনলে আজকাল শরীর জ্বলে যায়। ইচ্ছে করে চ্যালাকাঠ দিয়ে মেরে আধমরা করে রোদে ফেলে রাখতে। নিজেই নাচতে নাচতে বিয়ে করে আবার ভাই ডাকে, ভাই! ওর আটাশ জন্মের ভাই! সেও বুঝে পুরনো অভ্যাস পরিবর্তনে সময় লাগবে তবে শুনলেই তো মেজাজ বিগড়ে যায়। সেসব নিয়ে কিছু বলা দরকার ভেবে বলল,-‘ প্রথমত আমাকে ভাই ডাকবি না। আগের হিসাব বাদ। বিয়ে

করেছি এখন বউ হয়েছিস। কবুল বলার সঙ্গে সঙ্গে
তোর সঙ্গে আমার পূর্বের
সম্পর্ক শেষ। আগে তোর দিকে তাকালেও দৃষ্টি নত
করে হতো। মাথায় ঘুরত সঠিক সময়ের কথা। এখন
তুই আমার জন্য হালাল। এজন্য আমি চাই তুই
আমার প্রতিটা কাজ নিজে থেকে করিস। খেতে
দেওয়া থেকে শুরু করে কর্মস্থলে যাওয়ার আগ
মুহূর্তে হাসি-মুখে ভালোবেসে বিদায় জানাস। ক্লান্ত
দেহে বাড়ি ফিরে রুমে ঢুকেই যেন তোকে দেখি।
এছাড়াও আমি আর একটা রাতও একা আমার
বিছানায় ঘুমাতে চায় না। অসুস্থ ছিলাম এজন্য এতদিন
কিছু বলি নি কিন্তু এখন তুই মোটামুটি সুস্থ।’

-‘আপনার রুমে নাহয় এলাম কিন্তু অনুষ্ঠান?
অনুষ্ঠানের আগে ব্যাপারটা

খারাপ দেখায় না? না মানে আর মাত্র কয়েকদিনেরই
তো ব্যাপার।’-‘অনুষ্ঠানে কি এসে যায়? অনুষ্ঠান করে
বিয়ে করলে বিয়ে হাসপিটালে যেটা হলো সেটা কি
ছেলেখেলা? অনুষ্ঠান হোক বা না হোক আমাদের
বিয়ে নিয়ম মেনে অভিভাবককে সাক্ষী রেখে হয়েছে।
তবে তুই যদি চাস অনুষ্ঠানের আগে পার্মানেন্টলি

আমার রুমে না আসতে। তাহলে একটা কাজ করতে পারিস, সবাই ঘুমালে আমার রুমে আসতে পারিস আসতে হবে; কিভাবে আসবি তুই জানিস।’

একথা বলে শুদ্ধ একটু থামল। তারপর শীতলের ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে চেপে রাখা কথাটা অকপটে বলল,

-‘পরশুদিন রুবাবের কাছে যাচ্ছি। আমি যাওয়ার পরেরদিনই ঐশ্বর্যের সার্জারির ডেট ফিক্সড করা হয়েছে। ফিরতে ফিরতে কয়েক সপ্তাহের ব্যাপার। তবে যাওয়ার আগে আমি চাই আমাদের মাঝে কিছু একটা হোক! আর সেটা আজই; এই মুহূর্তে।’ শুদ্ধর অকপটে বলা কথার মানে বুঝতে কষ্ট হলো না। সে থতমত খেয়ে

লাজুক মুখে মাথা নত করে নিলো। বুকের ভেতর ধুকপুক করতে লাগল।

শুদ্ধ বুঝলেও মুখে তেমন কিছু না বলল না। কারণ কেন জানি তার পেট ফেটে হাসি আসছিল। কিন্তু এখন হাসলে হবে না তাই সে আচমকা হাত বাড়িয়ে শীতলের খোলা চুলের মুঠি শক্ত করে ধরল। ধীরে ধীরে মুখটা এগিয়ে এনে খুব কাছ থেকে দেখল তার

সহধর্মিণীকে। কপাল, দুচোখ, গাল, নাক, ঠোঁট আর
থুতনীর ভাঁজ দেখে শিরশির করে উঠল পুরুষালি
দেহ। দুই হাতের আঁজলা করে শীতলের মুখটা ধরে
আদর আঁকল পুরো মুখে। তারপর ঠোঁটে মিটিমিটি
হাসি এঁটে বলল,-‘ বিয়ে হয়ে গেছে অনুষ্ঠানে হলে
হোক নাহলে নাই। অনুষ্ঠানের অজুহাত বাদে আর
কোনো সমস্যা আছে? কি বোঝাতে চাচ্ছি বুঝতে
পারছিস?’

শীতল একরাশ লজ্জায় নতজানু হয়ে না বোধহয়
মাথা নাড়াল। অর্থাৎ আর কোনো সমস্যা নেই। তখন
শুদ্ধ ফিচেল হেসে এক ধাক্কায় বিছানায়
তাকে শুইয়ে দিলো। তড়িৎ নিজেও গেল শীতলের
খুব কাছাকাছি। বারি খেলো দু’জনের নিঃশ্বাস! চোখে
চোখ রাখতে গিয়েও শীতল হার মানতে
বাধ্য হলো। শুদ্ধর চাহনি আজ অন্যরকম। স্পর্শে
অবাধ্যতা। কঠে স্পষ্ট
মাদকতা। শুদ্ধ ততক্ষণে তার গলায় মুখ ডুবিয়ে
কয়েকটা চুমু আঁকল।

দু’একটা কামড়ও বসিয়েছে গলার নরম চামড়ায়।
হাতও অবাধ্যতা শুরু করেছে। শীতল মূঁচড়ে উঠল।

ছটফটিয়ে উঠল পুরুষালি দেহের নিচে থেকে ছাড়া
পাওয়ার আশায়। কিন্তু সেটা তো হলোই না বরং তার
দুহাত শুদ্ধ একহাতের মধ্যে নিয়ে হাল্কি স্বরে বলল,-
‘তাহলে চল সর্বনাশের চিপাগলি থেকে ঘুরে আসি?
আমার বউ থাকবে কী না সেটার হিসাব তোলা
আছে। আমার এন্টিনার সমস্যা কী না তাও তো
জানানো হয় নি, তাই না? আজ সব হিসাব একেবারে
চুকিয়ে দেই!’

একথা বলে নিজের গায়ের টি-শার্টটা ছুঁড়ে শীতলের
ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দিলো। শ্বাস নিতে না পারে
শীতলের ছটফটানি বেড়ে গেলে শুদ্ধ সেই মুহূর্তে
ছেড়ে বলল,

-‘এতদিন কারণে অকারণে তুই অবাধ্য হয়েছিস
আমি মেনে নিয়েছি।

আজ আমার দিন; আমার সময়। আর আমি চূড়ান্ত
লেভেলের অবাধ্য হবো! আবারও বলছি, অর্নথ ঘটে
যাক তবুও তুই বাঁধা দিবি না। দিলেও আমি শুনব
না।’ শীতল লজ্জায় চোখ-মুখ খিঁচে শুধু শুনে গেল
পাজি পুরুষটার কথা। ততক্ষণে তার বুকের উপর
থেকে সরে গেছে শাড়ির আঁচল। শাড়ির ঠাঁই হয়েছে

মেঝেতে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রপুরুষের খোলস
ছেড়ে উন্মাদ হয়ে উঠেছে শীতলের বিশুদ্ধ পুরুষ।
গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়েছে আদুরে ছোঁয়া। রাত
বাড়ছে। বাড়ছে সময়ের গতিও। বাইরে ঝামঝামিয়ে
ঝরছে অসময়ী বৃষ্টি। শোনা যাচ্ছে মেঘের গর্জন।
সঙ্গে বাঁধা বিপত্তি কাটিয়ে অবশেষে ল্যাভে মত্ত হয়েছে
দুটি দেহ।-‘স্যার..স্যার উঠুন! সকালে মেডিসিন
আছে। টাইম টু টাইম মেডিসিন নিতে হবে।’

-‘(....)’

-‘স্যার? স্যার রুমে আছেন? ঘুমাবেন আরেকটু?
ব্রেকফাস্ট কি তাহলে পরে আনতে বলব?’

-‘(....)’

-‘মেডিসিন না নিলে পায়ের ব্যথা আরো বাড়বে।
গতরাতে জ্বর টর আর এসেছিল? এখন কি একটু
বেটার ফিল করছেন? নাকি ডাক্তার মনিকে
ডাকব?’বন্ধ দরজায় নক করতে করতে কথাগুলো
বলছিল বুরাক। কিন্তু যাকে বলছে তার কোনো
সাড়াশব্দ নেই। সাড়াশব্দ না পেয়েও হাল ছাড়ল না
সে বরং পুনরায় নক করতে লাগল। কেন জানি
এবার সন্দেহ হলো তাই দরজার নব ঘুরাতেই দরজা

খুলে গেল। ভেতরে কাউকে না দেখে তড়িৎ বেডরুম,
ওয়াশরুম, বেলকনিতে খুঁজে পকেট থেকে ফোন বের
করতেই নজর বিঁধল সেন্টার টেবিলের উপরে কলম
দিয়ে চাপা দেওয়া কাগজের দিকে। সে জলদি
কাগজের ভাঁজ খুলতেই দেখল,-‘ দেশের বাইরে
যাচ্ছি। ক্ষতিপূরণের হিসাব বুঝিয়ে দিতে যেতে
হচ্ছে। খুঁজিস না আমায় পারি না। তোকেও চিরতরে
মুক্তি দিলাম নিজের মতো

করে কিয়ারাকে নিয়ে বাঁচ! শীতলকে আমি না
পেলেও তোকে তো তোর ভালোবাসার মানুষ
কিয়ারাকে পাইয়ে দিয়েছি। খুব ভালো রাখিস তাকে।
ভাতের অভাব দিলেও ভালোবাসার অভাব কখনো
দিস না তাকে। আর তোদের ভাতের অভাব যেন
নাহয় তাই চেক সাইন করে দিলাম যখন যা প্রয়োজন
ইচ্ছেমতো সংখ্যা বসিয়ে টাকা উঠিয়ে নিস। ভালো
থাকিস তোরা, চির বিদায়!

___পৃথিবীর পাপ ইয়াসির খান। বুরাক চিঠিটা পড়ে
তাকাল অবহেলায় পড়ে থাকা চেকের দিকে। হাতে
তুলে সাইন করা চেকটি উল্টে-পাল্টে দেখল। চেকের
প্রতিটা পাতায় শো করছে ইয়াসিরের সাইন। সেটা

দেখে সে চেকবুকটি টুকরো টুকরো করে ফুঁ দিয়ে
উড়িয়ে গটগট শব্দে বেরিয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে
নামতে ডন নামের কাউকে ডাকতে থাকল উচ্চস্বরে।
তার ডাক শুনে গনাদশেক ছেলেপুলে হাজির হতেই
সে চিৎকার করে বলল,

-‘স্যার বেরিয়েছে কখন? কেউ আমাকে ইনফর্ম করিস
নি কেন?’

তার চিৎকার শুনে ছেলেদের মধ্যে একজন মিনমিন
করে জবাব দিলো,

-‘ভাই আপনে ভাবির লগে ছিলেন দেইখা স্যার
ডাকতে দেয় নাই। আর

স্যার কইছে কাছে আশেপাশে কোথাও যাচ্ছে
তাড়াতাড়ি চইলা আসবে।’ছেলেটার কথা শুনে বুরাক
দাঁতে দাঁত চেপে কল দিতে থাকল ইয়াসিরের গাড়ির
ড্রাইভারকে। বুঝতে বাকি রইল না ইয়াসির সঙ্গে
লোক নিবে বলে এসব বলে বেরিয়েছে। এদিকে
একের পর এক কল দিলেও ড্রাইবারকল রিসিভ
করছে না। করবে কীভাবে? ড্রাইভার নিষিদ্ধ পল্লীর
এক মেয়েকে

জড়িয়ে ধরে আরামে ঘুমাচ্ছে। স্বপ্ন দেখে হাসছে মিটিমিটি। বাম কানের কাছে ভোঁ ভোঁ শব্দ শুনে মেয়েটির ঘুম ভেঙে যায়। বহুকষ্টে চোখ খুলে একবার ফোনের দিক তো আরেকবার তাকায় পাশে ঘুমানো চ্যাংরার দিকে। গতকাল রাতে খুব বেশি বেয়াদবি করেছে এই চ্যাংরা। আর মুখে কি গন্ধ! জীবনে এত কাস্টমারের সঙ্গে থেকে এর মতো খচ্চর কাস্টমার দেখে নি। বেশি কিছু বললে টাকা দিবে না আবার না বললেও সে শান্তি পাবে না। তাই মেয়েটি ফোন হাতে নিয়ে দেখে ফোনে কোনো লক নেই। তাই সে ফোন জেনারেল করে রাখল একদম তার কানের কাছে। এরপর মুখ টিপে হাসতে হাসতে চলে গেল ওয়াশরুমে। ওয়াশরুমের দরজা বন্ধ হতেই পুনরায় ফোনটা বেজে উঠল নিজস্ব স্বরে। ঘুমের ঘোরে কানের কাছে ফোনের রিংটোন শুনে হুড়মুড়িয়ে উঠে বসল ড্রাইভার। চোখ বড় বড় করে তাকাল ফোনের দিকে। এরপর দিশা না পেয়ে কলটা রিসিভ করে থড়থড় করে বলতে লাগলেন,-‘কে? আমি নাই! কিছু নাই! আমি কিছু করি নাই।’

-‘গিয়াস স্যার কোথায়?’

বুরাকের কণ্ঠস্বর শুনে গিয়াস নামের লোকটি কান থেকে ফোন সরিয়ে নাম্বার দেখল। বুরাকের ভেতর এখনো ধড়ফড় করছে। মাফিয়ার ড্রাইভার হয়ে পড়েছে মহামুশকিলে। সব সময় জান হাতে নিয়ে ঘুরা লাগে। যদিও

সে জানত না, এই ইয়াসির খান পাখি মারার মতো মানুষ মারে। এর মনে জানে রহম কম। ক্ষুণাক্ষরে যদি টের পেতো তাহলে কখনো এই চাকরির অফার লুফে নিতো না। অনেক বেশি স্যালারি দেখে আর কিছু ভাবে নি।

কিন্তু কদিন যেতেই নিজ চোখে কতশত মানুষকে মারতে দেখেছে। এখন চাকরি ছাড়ার কথা বললে তাকে মরতে হবে কেননা চাকরির প্রথম দিন ইয়াসির তাকে বলেছিল,-‘আমার গাড়ির ড্রাইভার হলে চোখে কম দেখবা কানে কম শুনবা। জান বন্দক রেখে কাজে লেগে পড়। জান বন্দক নিলাম যাতে দু’নাম্বারি করার আগে কলিজা কাঁপে।’

বুরাকের ধমকে তার ভাবনার ছেদ ঘটল। সে গলা খাঁকারি দিয়ে কিছু বলার আগে বুরাক বলল,

-‘এ্যাই শু;যোরের বাচ্চা কথা কানে যাচ্ছে না? কখন থেকে জিজ্ঞাসা করছি স্যারকে কোথায় ড্রপ করেছিস? মুখে বাল ঢুকিয়ে রেখেছিস জবাব দিচ্ছিস না কেন?’ গিয়াস এবার মিনমিন করে বলল,

-‘আমি তো স্যারকে ড্রপ করি নি। স্যার কিংবা আপনিও আমাকে বের হওয়ার কথা বলেন নি তাই,,।’

বুরাক আর কিছু শোনার অপেক্ষা করল না ফোন পকেটে ঢুকিয়ে হনহন করে ছেলে-পুলেদের নিয়ে বেরিয়ে গেল। এর পরপরই তিনটে গাড়ি বের হলো বাড়ির মেইন ফটক দিয়ে। আগে জানতে হবে ইয়াসির সত্যি সত্যিই দেশ ছেড়েছে কী না!কিয়ারা তখন জানালার ধাঁরে বসে মনমরা হয়ে তাকিয়ে দেখছিল ওদের চলে যাওয়া। খুব ইচ্ছে করছিল চিৎকার করে ডেকে বলতে ওকেও সঙ্গে নিতে। কিন্তু ওদের বললেও সঙ্গে নেবে না একথাও জানে সে। বরং মুখ ফুটে বললে আজকে আর খাবার জুটবে না। ওদের যেতে দেখে সে হাত বাড়িয়ে জানালার কাঁচ ছুঁয়ে দেখল। এই রুমের জানালা খোলা যায় না। জানটা বড্ড আনচান করে। মনে হয় কত বছর

বাইরের আলো-বাতাস গায়ে মাখে না। প্রাণ ভরে শ্বাস নেয় নি। কোনোমতে বেঁচে আছে। কারণ দেড়মাস ধরে এখানে বন্দি অবস্থায় পড়ে আছে সে। এবং বলা বাহুল্য, একপ্রকার বাধ্য হয়ে ইচ্ছের বিরুদ্ধেই বুরাক নামের লোকটিকে বিয়েও করতে হয়েছে। না চাইলেও সব স্বপ্ন জলাঞ্জলি দিয়ে তার নামে কবুল পড়তে হয়েছে। বাবা-মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। ছোটো বোনটাকে কতদিন দেখে না, ছুঁয়ে আদর করতে পারে না। মজার ব্যাপার হলো তার বাবা-মা তার কোনো খোঁজ করে নি। কারণ বাবা-মা ও পাড়া-প্রতিবেশি জানে সে খ্রিষ্টান ছেলের হাত ধরে পালিয়ে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহন করেছে।

মূলত একথায় রটানো হয়েছে তাদের পাড়ায়। রাগে দুঃখে বাবা-মা মৃত ঘোষণা করেছে তাকে। জানিয়ে দিয়েছে এমন মেয়ের মুখ দেখতে চান না তারা। অথচ মূল ঘটনা অন্যকিছু,,,চাঁদ রাতের দিন অর্থাৎ ইদের আগের দিন রাতে স্বর্ণের কাছে মেহেদী পরার জন্য সে শীতলদের বাসায় যাওয়ার জন্য বের হয়েছিল। কিন্তু মাঝপথে তাকে তুলে আনা হয়। কেন আনা হয় তখনো কিছু জানত না সে, পরে ইদের দুদিন পরে

বুরাক নামের লোকটি জোরপূর্বক বিয়ে করে তাকে।
বৈধ স্বামীর অধিকার আদায়ের দাবিতে প্রতিরাতে
তাকে ছুঁলে শরীর ঘিনঘিন করে তার। কতদিন পা
ধরে মাফ চাইলেও ছাড় দেয় না তাকে। এভাবে টানা
কয়েকরাত রাত্রিযাপন করার পর এখন আর বাঁধা
দেয় না। তবে খুব করে টের পায় তার জীবন থেকে
সুখপাখি বিদায় নিয়েছে। ভেতর ভেতর সে নিজেও
মারা গেছে। হয়তো আর কখনো শীতলের ফুপাতো
ভাই রুবায়েত এলে ঘনঘন যেতে পারবে না। লাজুক
হেসে উঁকিঝুঁকি মেরে তাকে দেখা হবে না। কিছু
বলতে গেলে কথা ভুঁতলে যাবে না। কখনো বলা হবে
না, ওই মানুষটাকে ভীষণ ভালো লাগে তার। এত
ভালো লাগে দিন-রাত ভুল তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে
করে। তাকে দেখে আরো অনেক বছর বাঁচতে ইচ্ছে
করত। মেরিনার পোশাকে শীতলের ফোনে সেদিন
প্রথমবার ছবি দেখেছিল; সেদিনই প্রেমের পথে
বিশ্রীভাবে পিছলে পড়েছিল। ফেইক আইডি দিয়ে
কতদিন কথা বলারও চেষ্টা করেছে। সারাদিন-রাত
তার আইডিতে ঘুরে ঘুরে সুন্দর সুন্দর ছবি,

ফানিগুলোগুলো পোস্ট দেখত। মানুষটা আকাশ
ভালোবাসে বোধহয় খালি আকাশের ছবি পোষ্ট করে।
এবং তার বিশেষ গুন সে ভীষণ ফানি, হাসাতে জানে!
মানুষ হাসানোর গুন সবার মধ্যে থাকে না যার থাকে
সে নিজে কেঁদে অন্যকে হাসানোর ক্ষমতা রাখে। তার
এ গুনটি তাকে আরো বেশি প্রভাবিত করেছিল। তবে
শীতলের সঙ্গে ওর ফ্রেন্ডশীপ নষ্ট হওয়ার ভয়ে মনের
কথা সাহস করে জানানো হয় নি। ইচ্ছে ছিল
এবারের ইদেই

যেভাবে হোক মনের কথা জানাবে। তাছাড়া মানুষটা
ছুটি কাটিয়ে গেলে সহজে আসতে চায় না। চাতক
পাখির মতো দিন গুনতে হয়। খুব করে ছটফট
করতে করতে দিন কাটাতে হয়। এসব ঠিকই ছিল
কিন্তু এরমধ্যে কি থেকে কী হয়ে গেল তারপর থেকে
এ বন্দি জীবন।কোন পাপে এমন শাস্তি পাচ্ছে এখনো
জানে না সে। তবে বুরাক নামের লোকটি প্রথমদিন
যখন তাকে ছুঁয়েছে সেদিনই সে মারা গেছে। শ্বাস
নিলেই কী বেঁচে থাকা হয়? হয় না, জীবন্ত লাশরা
নিঃশ্বাস নেয় তবে ভেতর ভেতরে মৃত লাশের মতো

শেষ হয়ে যায়। সেই নিয়মে সেও মারা গেছে। মারা গেছে তার মন।

মারা গেছে খুব যতনে মনকুঠুরিতে পালন করা প্রেমপায়রা। মারা গেছে

তার স্বপ্ন-শখ- ভালোবাসা। আর আশা নেই মানুষটাকে পাওয়ার, আর আশা নেই তার সামনে দাঁড়ানোর মতো মুখ। কিভাবেই বা থাকবে? সে এখন অন্যের বউ ; সতিত্বহারা এক মেয়ে। তার মতো মেয়ের কি সাজে ওইরকম সুন্দর মানুষটার সামনে দাঁড়ানো! শীতল সদ্য শাওয়ার নিয়ে ড্রেসিংটেবিলের সামনে দাঁড়াতেই শুদ্ধও ফ্রেশ হয়ে বের হলো। মাথা মুছতে মুছতে তাকাল এলোমেলোভাবে শাড়ি পরা শীতলের দিকে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে কোনোমতে গায়ে জড়িয়েছে শুধু।

তবে শাড়িটা কুচি করে নয় আটপৌরে স্টাইলে পরা। ফর্সা শরীরে চেরি কালার শাড়িটা যেন ফুটে উঠেছে। দেখা যাচ্ছে কোমরের কিছু অংশ।

শীতল নিশ্চুপ হয়ে ধীরে ধীরে মুছেছে ভেজা চুল। গলা, কাঁধ, গাল, ঠোঁটে ভালোবাসার চিহ্ন। গতরাত থেকে একরাশ লজ্জায় কুঁকড়ে আছে সে। না কথা

বলছে আর না পেরেছে শুদ্ধর দিকে চোখ তুলে একটু তাকাতে।

আর শুদ্ধ? এই মানুষটাকে ভাবত রসকষহীন মানব রোমান্টিকতার ‘র’ বোঝে না। তবে এটা তার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা গতরাতে টের পেয়েছে তা।

বলতে নয় বরং মান্য বাধ্য বিশুদ্ধ পুরুষ চরম লেভেলের অসম্ভ্য। এদিকে শুদ্ধ আনমনা শীতলের মনোভাব বুঝে ঠোঁট কামড়ে শুধু হাসল। হাতের তোয়ালে মেলে দিয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে থমথমে সুরে বলল,- ‘বললি না তো?’

শীতল না তাকিয়ে ছোট জিজ্ঞাসা করল,
-‘কি?’

-‘আমার বউ থাকবে তো এবার? না মানে এন্টিনা সচল কী না..!’

শীতল চোখ মুখ কুঁচকে লজ্জায় নতজানু হয়ে অন্যদিকে তাকাল। কান দিয়ে যেন গরম ধোঁয়া বের হচ্ছে। গাল দুটো লাজে রাঙা হয়ে উঠেছে।

এসব নিয়ে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বার বার লজ্জায় ফেলছে তাকে। মানে হয় এসবের? সে খুব করে টের পাচ্ছে এখনো মিটিমিটি হাসছে তার অবস্থা দেখে। এদিকে

সত্যি সত্যিই শুদ্ধ মিটিমিটি হাসতে হাসতে শাট
পরল।

তারপর চাবি নিয়ে ড্রয়ার খুলল। খুটখাট শব্দে কিছু
কাজ করে দাঁড়াল একদম শীতলের পেছনে শরীর
ঘেঁষে। শীতল তখনো সেভাবে দাঁড়িয়ে। শুদ্ধকে দেখে
শীতল একদম স্থির। সরতে গেলে শুদ্ধ শীতলের
ভেজা চুল পিঠ থেকে সরিয়ে খোঁচা খোঁচা দাড়ি
ওয়ালা থুতনি রাখল শীতলের মৃসণ কাঁধে। মুগ্ধ
চাহনিতে তাকাল আয়নার দিকে শীতলের চোখে চোখ
রেখে। শীতলের লজ্জা মাখা মুখের দিকে কিছুক্ষণ
অপলক তাকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর
শীতলের গলায় মোটা চওড়া লেটেষ্ট মডেলের স্বর্ণের
নেকলেস পরিয়ে দিতে দিতে বলল,

-‘চাঁদের গায়ের দাগ মোছার ক্ষমতা আমার নেই।
তবে আমার ব্যক্তিগত চাঁদের গায়ের দাগ আমি স্বর্ণ
দিয়ে ঢেকে দিলাম।’

একথা বলে শীতলকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল।
ধীরে ধীরে পেটের উপর থেকে শাড়ি সরিয়ে স্বর্ণের
কোমর বন্ধনী পরাতে পরাতে ফিসফিস করে বলল,-
‘সামান্য একটু দুর্বলতা।’

শীতল ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল শুদ্ধর দিকে। একটা
নেকলেসেই গলা ঢেকে গেছে। ঢেকে গেছে শুদ্ধর
দেওয়া আদরের চিহ্ন। এতটাও আশা করে নি সে।
এত সুন্দর একটা মুহূর্তে কেন জানি ভীষণ কান্না
পেল ওর। ছলছল চোখে তাকালে গড়গড় করে
কয়েকফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে গেল। তা দেখে

শুদ্ধর হেসে অশ্রু মুছে গয়নার বক্সের দিকে ইশারায়
স্বর্ণের কানের দুল, কপালের টিকলি, হাতের চুর, রিং
সব দেখাল। শীতল একবার তাকিয়ে পুনরায় তাকাল
শুদ্ধর দিকে। শুদ্ধর হাত বাড়িয়ে কপালের টিকলি
হাতে নিয়ে শীতলের ভেজা চুলের মাঝসিঁথিতে পরিয়ে
দিয়ে বলল,

-‘ শুনেছি বিশেষ রাতে নাকি ঘরের শত্রুকে বিশেষ
কিছু উপহার দিতে হয়। আমি তো উপহার দেওয়ার
আগেই শত্রুর গায়ে দাগ লেপ্টে দিয়েছি তাই সকাল
বেলা আপনার জন্য এই সামান্য উপহার চৌধুরী
কন্যা।’-‘এটা সামান্য?’

-‘তা নয় কি?’

শীতল মুচকি হাসল। তারপর বলল,

-‘আমারও আপনাকে কিছু দেওয়া উচিত। তবে কি দেবো বুঝতে পারছি না?’

-‘সত্যি দিবি?’

-‘হুম।’

-‘দিলে টাকায় কেনা জিনিস দিস না বরং মহামূল্যবান কিছু দে।’

-‘কি সেটা? কি চান আপনি? কোথায় পাব সেটা? কিভাবে দেবো বলুন?’

-‘শুধু কথা দে, আমি বেঁচে থাকাকালীন অন্য কারো স্পর্শ তোর শরীরে লাগতে দিবি না। প্রয়োজনে খুন করে হলেও নিজেকে বাঁচাবি, বাকিটা আমি সামলে নেবো।’

-‘কথা দিলাম তাই হবে।’ একথা শুনে শুদ্ধ একবার দেওয়াল ঘড়িতে সময় দেখে শীতলের দিকে তাকিয়ে বলল,

-‘নিচে যাবি? এন্ফুগি ডাকতে আসবে কেউ না কেউ।’

-‘না যাই প্লিজ!’

-‘হুম, আমি খাবার নিয়ে আসছি তুই এই রুমেই থাক।’

একথা বলে শুদ্ধ দরজার দিকে এগিয়ে কি যেন ভেবে
দাঁড়িয়ে গেল। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে বলল,
-‘একটা কথা বলতে ভুলে গেছি।’

জরুরি কথা ভেবে শীতল শুনতে মনোযোগী হলো।
কৌতুহলীস্বরে
জিজ্ঞাসা করল,

-‘কি কথা?’

শুদ্ধ এবার ঠোঁটে ফিচেল হাসি এঁটে বলল,
-‘গতরাতে ল্যাবের লাইট অন ছিল।’

শীতল এবার আরেকদফা লজ্জা পেলেও গুটিয়ে গেল
না। বরং হাতের কাছে থাকা কুশন ছুঁড়ে মারতেই
শুদ্ধ সেটা ক্যাচ ধরে বেড়ে ছুঁড়ে মারল।

তারপর এখানেই থাকার কথা বলে হাসতে হাসতে
বেরিয়ে গেল। তাকে যেতে দেখে শীতল মিটিমিটি
হেসে আয়নায় নিজের প্রতিবিশ্বের দিকে তাকিয়ে
বলল,-‘ দেখলে তো এবার, আমার বিশুদ্ধ পুরুষ
ভালোবাসতেও জানে।’

ঘড়িতে তখন সকাল আটটা। এ সময় চৌধুরী বাড়ির
সকল সদস্য একে

নাস্তার টেবিলে হাজির হয়। রোজকার মতো আজও হাজির হয়েছে। যে যার মতো চেয়ার দখল করে বসেছে। সিঁতারা, সিমিন, সিরাত ব্যস্ত হাতে সবাইকে নাস্তা পানি বেড়ে দিচ্ছে। খেতে খেতে সবাই টুকটাক কথাবার্তা বলছে। শীতলকে না দেখে শারাবাত চৌধুরী বললেন,

-‘সবাইকে দেখছি শীতল মা কোথায়? খাবে না?’

শীতল নেই সিঁতারা সবার আগে খেয়াল করলেও ইচ্ছে করে কিছু বলে নি। তবে কথা যখন উঠলই তখন কিছু একটা বলতে হবে। তাই বললেন,

-‘খেয়ে আবার ঘুমিয়েছে।’

-‘ঘুমিয়েছে? শরীর খারাপ করছে নাকি?’

এবার স্বর্ণ আড়চোখে শুদ্ধর দিকে একবার তাকিয়ে বলল,

-‘সারারাত আমার রুমেই ছিল সারারাত মুভি দেখে এখন ঘুমাচ্ছে।’

-‘উঠলে মনে করে খাইয়ে দিস মা।’

-‘হুম।’এ কথার ইতি ঘটলেও সায়নের মনে খটকা লাগল। সে ভ্রঁ জোড়া কুঁচকে অনেকক্ষণ ধরেই শুদ্ধর দিকে তাকিয়ে আছে। কেন জানি শুদ্ধকে আজ

অন্যরকম লাগছে। শাওয়ার নিয়েছে। ফেসটা একটু বেশিই গ্লো করছে।

এদিকে শীতলটাও ব্রেকফাস্ট করতে নামে নি সে নাকি আরো ঘুমাবে।

সায়ন পরোটা চিবাতে চিবাতে বোঝার চেষ্টা করছে মূল ঘটনা। কাহিনী

গড়বড় লাগছে। সায়ন তাকিয়ে আছে বুঝে শুদ্ধও একপলক তাকিয়ে নিজের খাওয়ায় আগ্রহী হলো। তবে বড় রা থাকায় কেউ কিছু বলল না।

এরপর নাস্তা সেরে শুদ্ধ আরেকটা প্লেটে নাস্তা সাজিয়ে উপরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই সায়ন শুদ্ধর পথ আঁটকে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণ নজরে শুদ্ধর আপাদমস্তক দেখতে গিয়ে দৃষ্টি বিঁধল কানের নিচে। কেমন কালচে হয়ে আছে দেখে আঁতকে উঠল। ঝড়ের গতিতে শুদ্ধর খুব কাছে গিয়ে ভালো করে আরেকবার দেখে আতনাদ করে উঠল,-‘একি, তুই ভাজা মাছটি উল্টে খেয়ে ফেলেছিস?’

সিরাত তখন এঁটো প্লেটগুলো রান্নাঘরের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তার কথা শুনে উনি দাঁড়িয়ে সরল মনে বললেন,

-‘মাছই তো রান্না করি নি খাবে কি করে? তুই খাবি মাছ? কোন মাছ খাবি বাপ?’

উনার কথা সায়ন এবার কাঁদো কাঁদো মুখ করে বলল,

-‘ ভাই আমাকে আবার পিছিয়ে দিয়েছে মেজো মা ।’

-‘ পিছিয়ে দিয়েছে? কিভাবে? শুদ্ধ তো নিচে নেমে কারো সাথে কথাও বলে নি। চুপচাপ ভদ্রহয়ে নাস্তা সেরে রুমে যাচ্ছে। ‘-‘মাছ খাওয়ার পর সব বিড়ালই ভদ্র হয়ে যায় মেজো মা। ও তুমি বুঝবে না এসব বড়দের ব্যাপার-স্যাপার।’

-‘ বিড়ালের পেট ভরা থাকে তাই বোধহয়। সমস্যা নেই, তুই বল কি মাছ খাবি? ফ্রিজে থাকলে তো হলোই নাহলে তোর চাচ্চুকে বাজারে পাঠাব।’

সায়ন অসহায় চাহনিতে তাকিয়ে রইল সিরাতে দিকে। এখন সে কি করে বোঝাবে এই মাছ সেই মাছ না। উনাদের কথার মাঝে শুদ্ধ আর দাঁড়াল না। তবে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতেই ঘাড় ঘুরিয়ে একবার তাকাল সায়নের দিকে। ঠোঁট মিটিমিটি হাসি। চোখ জোড়া যেন চিৎকার করছে বলছে, ‘হেরো, হেরো।’ ছোটো ভাইয়ের থেকে পাওয়া

খোঁচা সহ্য হলো না সায়নের। সে শারায়াত চৌধুরী
উদ্দেশ্যে প্রায় চেষ্টায়েই বলে উঠল,-‘বাবা আমার কি
বিয়ে হবে না!’

শারায়াত চৌধুরী নাস্তা সেরে অফিসে যাওয়ার জন্য
কেবল রুম থেকে

বের হচ্ছিলেন। সায়নের বলা কথা উনি ঠিকঠাক
ভাবে শুনতে পান নি, যেটা শুনছেন ভুল হতে পারে
ভেবে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন,

-‘কিছু বললে?’

-‘বি..বি..বিল, ওই পানির বিল দেওয়া কি হয়ে
গেছে?’

-‘গতপরশু তোমার চাচ্চু দিয়ে এসেছে।’

-‘ওহ।’

একথা বলে সায়ন যাওয়ার জন্য পা বাড়াবে তখন
শারায়াত চৌধুরী দরজার দিকে যেতে যেতে বললেন

-‘এত বয়স এখনো হয় নি যে কানে কম শুনব।

শুদ্ধ ফিরে এলেই বিয়ের আয়োজন শুরু হবে এত

উতলা হওয়ার কিছু নেই।’একথা বলে উনি চলে

গেলে সায়ন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকাল। সে ঠিক

বুঝে উঠতে পারল না হাসবে নাকি কাঁদবে? নাকি

লজ্জা টজ্জা কিছু পাবে? এসব ভাবতে ভাবতেই নজর
গেল স্বর্ণের দিকে। তার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে
হাসছিল শাঁকচুনিটা। তাকে হাসতে দেখে রাগ হলো
সায়নের। সে রাগী দৃষ্টিতে স্বর্ণের দিকে তাকিয়ে
বলল,

-‘খুব মজা লাগছে না? খুব হাসা হচ্ছে? আমার
সময়ও ঘনিয়ে আসছে।

আধমরা যদি না করেছি তো তুই সায়নের ডালিং না
পুরা বউ হবি বউ।’টানা একমাস ধৈর্য্য ধরে থাকতে
পারলেও আজকে রুবাব খুব অসহায় বোধ করছে।
পাগল পাগল লাগছে নিজেকে। বুকের ভেতর এত
জ্বলছে যে জ্বালাপোড়ার তীব্রতা অসহনীয় পর্যায়ে চলে
যাচ্ছে,সে আর না পেরে

মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে কেঁদে ফেলল। শতরূপা
চৌধুরীও পাথর হয়ে চুপ করে বসে আছেন।
মেয়েটাকে এত করে বোঝানোর পরও মেয়েটা একই
ভুল করল। আচ্ছা, সুইসাইড কি সব সমস্যার
সমাধান হতে পারে?যে ছেলেটা তার জন্য চাকরির
পরোয়া না করে দিনের পর এখানে পড়ে আছে।এত
ভালোবাসছে। আগলে রাখছে। প্রতি মুহূর্তে মনোবল

শক্তি বাড়াতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। যে চেহারা
দেখে মানুষ ভয়ে দুই পা পিছিয়ে যাবে সেই
চেহারাতে সে অনবরত চুমু খেতে দ্বিধা করে না।
সেই ছেলের কি এই প্রাপ্ত? এই তার ভালোবাসার
মূল্য?টানা একমাস ধৈর্য ধরে থাকতে পারলেও
আজকে রুবাব খুব অসহায় বোধ করছে। পাগল
পাগল লাগছে নিজেকে। বুকের ভেতর এত জ্বলছে
যে জ্বালাপোড়ার তীব্রতা অসহনীয় পর্যায়ে চলে
যাচ্ছে,সে আর না পেরে

মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে কেঁদে ফেলল। শতরূপা
চৌধুরীও পাথর হয়ে চুপ করে বসে আছেন।
মেয়েটাকে এত করে বোঝানোর পরও মেয়েটা একই
ভুল করল। আচ্ছা, সুইসাইড কি সব সমস্যার
সমাধান হতে পারে?যে ছেলেটা তার জন্য চাকরির
পরোয়া না করে দিনের পর এখানে পড়ে আছে।এত
ভালোবাসছে। আগলে রাখছে। প্রতি মুহূর্তে মনোবল
শক্তি বাড়াতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যে চেহারা
দেখে মানুষ ভয়ে দুই পা পিছিয়ে যাবে সেই
চেহারাতে সে অনবরত চুমু খেতে দ্বিধা করে না।
সেই ছেলের কি এই প্রাপ্ত? এই তার ভালোবাসার

মূল্য? ঐশ্বর্য কেন বিবেকের কথা শুনছে না? এতদিন
এই চিনলো রুবাবকে? রুবাব চাইলে কি ছাড়তে
পারত না? গতদিনগুলোতে কী কম অশান্তি করেছে
ঐশ্বর্যের সৎ বাবা?

উনি নিজেও রাগ করে ছেলের সঙ্গে কথা বলায় বন্ধ
করে দিয়েছিলেন!

তখন কি রুবাব অজুহাত দেখাতে পারত না? অবশ্যই
পারত কিন্তু করে নি। কারণ ছেলেটা ভালোবাসে আর
ভালোবেসে আগলে রাখতে জানে। তবুও কেন এত
পাগলামি? কেন বার বার সুইসাইড করতে চাচ্ছে
সে?

সিঙ্গাপুর আসার পর থেকে তিন তিনবার সুইসাইড
করতে চেয়েছে সে।

সুইসাইডই যদি করে তাহলে এখানে পড়ে থেকে
অযথা কার জন্য এত কষ্ট করছে? আগের দুইবারের
কথা নাহয় বাদ আজ সকালে সুইসাইড করার
ব্যাপারটা মানতে পারলেন না শতরূপা চৌধুরী। কেন
জানি খুব রাগ হলো। সচরাচর বাইরের কারো
সামনে রাগ দেখান না তিনি। তবে আজ মনে হলো
মেয়েটাকে কিছু বলা দরকার। তাই তিনি ছেলের

মাথা সরিয়ে উঠতে গেলে রুবাব উনার পা ধরে ফেলল। হাঁটুতে মাথা ঠেকিয়ে কান্না ভেজা কণ্ঠে বলল,-‘ প্লিজ ওকে কিছু বোলো না আম্মু। ওর মাথা ঠিক নেই। কি করতে চাচ্ছে,ও নিজেই জানে না। বোকাটা আমার ভালোর জন্যই আমার থেকে দূরে পালাতে চাচ্ছে। অথচ একবারও ভাবছে না তার মধ্যে আমার সব ভালো থাকা। ওর কিছু হলে আমি মরে যাব একেবারে শেষ হয়ে যাব।’

শতরূপা চৌধুরী শক্ত মুখে ছেলের দিকে তাকিয়ে আচমকা এক থাপ্পড় মেরে দিলে রুবাবের বা গালে। তারপর রুবাবের হাত ধরে টেনে কেবিনে প্রবেশ করলেন। ঐশ্বর্য তখন চোখ বুঝে শুয়েছিল। কারো আসার শব্দে চোখ খুলে উনাদের দেখে উঠে বসল। গায়ে ওড়না টেনে মুখের ঝলসে যাওয়া অংশটুকু ঢেকে ফেলল। আরো ছিল তবে সার্জারি করে অনেক অংশ স্বাভাবিক রূপে ফিরে এসেছে। তবে চোয়াল থেকে গলার শেষ অবধি কেমিক্যাল ঝলসানো। এখানেই একটু বেশি ক্ষতি হয়েছে। তবে ডাক্তার হাল ছাড়ে নি বরং উনারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন। শতরূপা চৌধুরী ঐশ্বর্যের সঙ্গে কখনো কড়া সুরে

কথা বলেন নি। কটুবাক্য কিংবা খোঁচা দেন নি। তবে
আজ রাগের মাত্রা এতটাই প্রখর যে আজ উনি
নিজের

সত্তা থেকে সরে গেলেন। কঠিন স্বরে প্রশ্ন ছুঁড়লেন,-
‘সুইসাইড করবে? মৃত্যু এত সহজ! মরার আগে
গ্যারান্টি দিয়ে যাও তোমার কারণে আমার বুক খালি
হবে না। যদি তোমার কারণে আমি সন্তানহারা হই
তাহলে তুমি আমার অভিশাপ থেকে একচুলও মারফ
পাবে না।’

ঐশ্বর্য নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে শুনে গেল উনার কথা।
শতরূপা চৌধুরী এতদিন রুবাবের সামনেও কখনো
কাঁদে নি। বোঝান নি উনার বুকের অদৃশ্য দহন।
তবে আজ পারলেন না কেঁদে ফেলেন। কাঁদতে
কাঁদতে বললেন,

-‘ ছেড়ে যাওয়ার কষ্ট তোরা বুঝিস? আমি বুঝি;
আমি। আমিও কাউকে ভালোবেসেছি। এতগুলো দিন
সংসার করেছি। একটা সন্তানের মা হয়ে বিধবা
হয়েছি। সে আমাকে রেখে একাই চলে গেছে। এত
ভালোবেসেছি তবুও সঙ্গে নেয় নি। সে নেয়নি বলে
কি আমি মরে গেছি? হ্যাঁ, ভেতরে ভেতরে ঠিকই

মরেছি তবে উপর উপর ঠিকই তো বেঁচে আছি। কেন
বেঁচে আছি? আমার সন্তানের জন্য। আমার রুবাবের
জন্য। আজ সেই রুবাব বলে কী না তোমাকে না
পেলে মরে যাবে। একজন চলে গিয়ে আমাকে
অর্ধেকটা শেষ করেই দিয়েছে এখন আরেকজন
যাওয়ার সুর তুলেছে।’

এইটুকু বলে শতরূপা থামলেন। জোরে জোরে শ্বাস
নিয়ে পুনরায় বললেন,-‘ভালোবাসা! ছেড়ে যাওয়া!
কষ্ট! বিচ্ছেদ এগুলো কী তোমরাই বুঝো? আমরা
বুঝি না? আমরা সেকেলে? নাকি ভালোবাসা শুধু
তোমাদের জন্যই তৈরি? রুবাবের সাথে আমিও ছুটে
এসেছি কেন এসেছি, বলতে পারো? কি ভাবো আমার
ছেলের প্রতি নজর রাখতে? তাকে যেন বশ করতে
না পারো খেয়াল রাখতে? তাহলে বলব মোটেও তা
নয়! তোমার ভাবনা উন্নত করা প্রয়োজন। সত্য কথা
সবসময়ই অপ্রিয়ই হয়। তবুও আমি সত্য কথা
অকপটে বলতে পছন্দ করি। এবং বলছি যে শুনতে
খুব খারাপ লাগছে তুমি এতিম! পৃথিবীতে তোমার
কেউ নেই। তোমার বিপদ যে একবার কেউ দেখে
যাবে সেই মানুষটাও তোমার নেই। অথচ আমরা

যখন তোমার জন্য লড়ে যাচ্ছি তখন তুমি সুইসাইড করার চিন্তা মাথায় গেঁথে রাখছ! কেন? বলো? সেই কারণ বলার সৎ সাহস আছে তোমার? নাকি সেই একই বুলি আওড়াবে, আমার ছেলে আবেগে ভাসছে। আফসোসে পুড়ে মরবে, হ্যান-ত্যান। তোমায় ছেড়ে দিলে আরো আগেই দিতো আর ছাড়ার অনেক রিজন ছিল। বাংলাদেশ থেকে আসার পর তোমার ছোট ছোট সার্জারি হয়েছে। সার্জারির জন্য নিয়ে যাওয়ার পর রুবারের কান্না দেখেছো? ছোটো বাচ্চারা প্রিয় মানুষ হারালে যেভাবে কাঁদে ও সেভাবে কাঁদে। আর আমি মা হয়ে সব দেখি সব সহ্য করি। আমাকে দেখেছো না, আমি একজন বিধবা নারী; আমি মা; আমার সন্তান জন্ম দিয়েছি। হাতে বুকে পালন করেছি। আমার এই জার্নি মোটেও সহজ ছিল না। ছেলেকে মানুষ করতে আমাকে কত সাফার করতে হয়েছে। অথচ সেই ছেলেটাকে বিয়ে করানোর জন্য এত চেষ্টা করেও পারি নি। কেন পারি নি কারণ সে তোমাকে ভালোবাসে, তোমাকে চায়। এরপর আমি তোমাদেরকে মেনে নিয়েছি অথচ তুমিই বেঁকে বসেছিলে। আমার আরেকটা ছেলের শুদ্ধর তৈরি করা

ফর্মুলা বাঁচাতে তোমার এই হাল। তুমি আমার ছেলের
হাসির কারণ। তোমার বিপদে আমি ছেড়ে দিতে পারি
না। তোমার প্রতি আমার দায়িত্ব আছে। মোদাকথা,
তোমার প্রতি আমার সফ্ট কর্ণার আছে আর সেইজন্য
আমি তোমার মা হতে এখানে এসেছি। অথচ তুমি
ভুল করেও আমায় মা বলে ডাকো নি। আজ কথা
বলো। সরাসরি বলো তোমার কী সমস্যা? সমস্যা যদি
তোমার রূপই হয় তাহলে আবারও বলছি তাতে আমি
কিংবা আমার ছেলের কোনো সমস্যা নেই। আর যদি
অন্য কোনো সমস্যা হয় তো সেটাও খুলে বলো।
দুদিন পরপর একজন সিরিয়াস হও তো আরেকজন
বেঁকে বসো। এভাবে কোনো সুস্থ সম্পর্ক হতে পারে
না।

যে বুঝ নেয় তাকে বোঝানো যায় কিন্তু তুমি বুঝেও
বুঝছো না ঐশ্বর্য। আমরা বোঝাতেই আছি তুমি
তোমার ভাবনা ধরে সুইসাইডের ধান্দায় থাকছো,
এভাবে কতদিন? কতবার? বার বার ভাগ্য সহায় হবে
না। মুখ খুলে বলো কেন সুইসাইড করতে চাচ্ছে?
কি সমস্যা তোমার? ‘

ঐশ্বর্য মাথা নিচু করে নীরবে কাঁদছে। রুবাবও পাথরের মতো স্থির হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। মায়ের একাকিত্ব নিয়ে এভাবে কখনোই ভাবে নি সে। হ্যাঁ মা অনেকদিন বলেছে চাকরি ছেড়ে চলে আসতে। এই চাকরির কারণে দেখা যাবে মায়ের জানায়া পড়াতে পারবে না। মায়ের কথা শুনে রুবাব রাগ দেখালেও কখনো সিরিয়াসভাবে ভাবে নি। ভীষণ শখ করে এই চাকরিতে জয়েন করেছিল সে। আজকে মায়ের কথা শুনে নিজেকে খুব ছোট লাগছে। আগে ভাবত সে ভালো আর যাই হোক সে মায়ের কাছে ভালো ছেলে। কিন্তু না সে মায়ের কাছে ভালো ছেলে হতে পারে নি। ভালো প্রেমিক হতে পারে নি। আচ্ছা এই আফসোসটুকু রাখবে কোথায়? এতদিন ভাবে নি বিধায় কিছু মনে হয়নি, আজকে থেকে বুকের গহীনে জমানো এই আফসোসটুকুই তার বুক পাঁজর ঝাঁঝরা করতে থাকবে। মৃত বাবার কাছে হাশরের ময়দানে জবাব দেবে কি? যে মা তাকে এত কষ্ট করে মানুষ করেছে ভালোবাসার মানুষকে পাওয়ার বাসনায় মায়ের কথায় গুরুত্ব দেয় নি সে। কখনো ভাবে নি শক্ত খোলসে আবৃত করা মা,তার

সঙ্গ চায়। সুন্দর কিছু মুহূর্ত চায়! মনে মনে এসব
ভেবে রুবাব লাল বর্ণ চোখে তাকাল ঐশ্বর্যের দিকে।
মায়ের সামনে সরাসরি প্রশ্ন ছুঁড়ল,-‘কি চাও ঐশ্বর্য?’
তিন শব্দের একটি বাক্য তবুও বলতে অনেক কষ্ট
হলো রুবাবের। বুকটা ভার হয়ে আছে। ঐশ্বর্য নীরবে
কাঁদলেও রুবাবের কথা শুনে শব্দ করে কেঁদে
ফেলল। তাকে কাঁদতে দেখেও রুবাব এগিয়ে এলো
না। পূর্বের মত

উতলা হয়ে কিছু জিজ্ঞাসাও করল না। তবে মলিন
মুখে তাকিয়ে দেখল ওর কান্না। ঐশ্বর্য অঝরে ঝরে
যাওয়া অশ্রুসিদ্ধ চোখে দিকে তাকিয়ে রুবাব বলল,-‘
আমার দেখা বেস্ট জুটি কে জানো? আমাদের শুদ্ধ-
শীতল। ওদের ভালোবাসা দেখেছো? ঝগড়া-মারামারি,
খুনশুঁটি, ভালোবাসা কোনো কিছুর কমতি নেই। শুদ্ধ
বুঝদার আর শীতল চঞ্চল, অবুজপণা, জেদী। শীতল
যত ভুলই করুক সেই ভুলের বিচার শুদ্ধ করে। যা
শাস্তি দেওয়ার সে দেয়। বাড়ির কেউ যদি মারে বা
বকে শুদ্ধ রেগে যায়। আবার শুদ্ধের পাশে বসলে বা
শুদ্ধর জিনিস বাইরের কেউ নিলে শীতলের মুখের
দিকে তাকানো যায় না। বাঁধা বিপত্তির পর শীতল

মাঝরাতে আবদার করেছে বিয়ে করবে শুদ্ধ
মাঝরাতেই বাড়ির সবাই হাজির করেছে। হাসপাতালে
বিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে গেছে। কারণ তার
হারানোর ভয় নেই।

তুমি মাঝে মাঝে শীতলের মতো অবুজ কেন হওনা
ঐশ্বর্য? কেনো কারনে অকারণে আবদার করো না?
কেনো জেদ করে বলো না বিয়ে করার কথা?তুমি
ম্যাচিউর, স্বর্ণ ম্যাচিউর, তোমরা আগে-পিছে শতশত
বার ভাবো।

এত ভাবতে বলে কে তোমাদের? তোমরা ম্যাচিউর
বলেই আমায় আর সাইন ভাইকে শুদ্ধ গোঁ হারান
হারিয়ে দিয়েছে। চোখে আঙুল দিয়ে বার বার দেখিয়ে
দিয়েছে ম্যাচিউর হলেই হয় না অধিকার খাটিয়ে
চাইতেও জানতে হয়। যেটা শীতল তোমাদের ছোটো
হয়েও খুব ভালো পারে। সে দুনিয়াদারী সম্পর্কে বুঝে
কম তবে তার ছোট পৃথিবীতে শুদ্ধ সবকিছুর আগে।’
রুবাব থামল। হাতের কনিষ্ঠ আঙুল দিয়ে চোখের
কোণা মুছে পুনরায় বলল,-‘আমি তোমাকে চাই
ঐশ্বর্য। এই এক্সিডেন্টের আগে যেভাবে চাইতাম। ঠিক
সেভাবেই চাই। তোমার ঝলসানো চেহারা নিয়ে

আমার আক্ষেপ নেই। অভিযোগ নেই। মন খারাপও হয় না। তবে তোমাকে কষ্ট পেতে দেখলে কষ্ট পাই। স্বাভাবিক হও! তুমি বুঝদার হয়ে কেন পাগলামি করছো ঐশ্বর্য? শীতল অসুস্থ হয়ে শুদ্ধকে ছিনিয়ে নিয়েছে। আর তুমি অসুস্থ হয়ে আমার থেকে পালাতে চাচ্ছে! আমি তুলনা করছি না তবে আজকে না বলেও পারছি না।’

এইটুকু বলে রুবাব শার্টের হাতায় চোখ মুছল। পকেট হাতড়ে ফোন বের করে সময় দেখে পানির গ্লাস আর ওষুধ এগিয়ে দিলো ঐশ্বর্যের দিকে।

ঐশ্বর্য ওষুধ নিলো না বরং রুবাবের হাতে কপাল ঠেকিয়ে কাঁদতে থাকল কান্না জড়িত সুরে বলতে লাগল,-‘মা সরি! আর করব না! আর হবে না। নিজেকে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়।

মাথায় ঘুরপাক খায় তুমি আমাকে দয়া দেখাচ্ছে।’

এইটুকু বলে ঐশ্বর্য মাথা তুলে এদিক ওদিক তাকালেও শতরূপা চৌধুরী কে দেখতে পেল না। বেড থেকে নামতে গেলে রুবাব তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল,

-‘শান্ত হও আমাকে ইশারা করে জানিয়ে বাইরে গেছে। বুঝেছে আমাদের প্রাইভেসি দেওয়া দরকার।’

-‘মাকে ডাকো রুবাব। সরি বলতে হবে মাকে।’

-‘সরিতে কিছু যায় না। তুমি যদি ভুলভাল সিদ্ধান্ত না নাও দেখবে সরিও বলতে হবে না।’

ঐশ্বর্য একবার তাকিয়ে চট করে রুবাবকে জড়িয়ে ধরল। এতশক্ত করে জড়িয়ে ধরল। রুবাব ঠোঁট কামড়ে ধরে কান্না আঁটকাতে চেয়েও পারল না। এই একটা মাস চেয়েও ঐশ্বর্যকে বুকে নিতে পারে নি। চেষ্টা করেছে তবে ঐশ্বর্য ছিঁটকে সরে সরে গেছে। অবশেষে বুকের মানুষটি বুকে ফিরে শান্তি মিলেছে। ঘড়িতে বিকাল সাড়ে চারটা। দুপুরে খেয়ে ভাতঘুম দিয়ে কেবল উঠেছে সায়ন। সিরাত আর সিঁতারা কিছু কাজে বাইরে যাবেন। সিমিন বাড়িতে থাকবেন। সায়ন নিচে নেমে উনাদের তাড়াহুড়ো করে বের হতে দেখে

জিজ্ঞাসা করল,

-‘কোথায় যাচ্ছে তোমরা?’

-‘একটু কাজ আছে বাইরে যাব। তুই কি এখনই বের হবি? সিমিন বিকেলের নাস্তা বানাচ্ছে খেয়ে বের হবি।’

-‘একা একা যাবে?’

-‘কই একা দুজন যাচ্ছি তো।’

-‘খুব বেশি পারসোনাল কাজ আমি গেলে কিছু হবে?’

-‘তুই গেলে তো ভালোই হবে।’

-‘একটু দাঁড়াও ড্রেস চেঞ্জ করে আসি।’ একথা বলে সায়ন রুমে গিয়ে ড্রেস বদলে স্বর্ণের রুমের একবার উঁকি মারল। স্বর্ণ পেছনে ঘুরে চলে বিনুনি করছে দেখে দৌড়ে গিয়ে আচমকা দুই গাল চেপে ধরে ঠোঁটে একটা শক্ত কামড় দিয়ে পুনরায় চুমু খেয়েই দৌড়। ঘটনা কি ঘটনা সেটা বুঝতে স্বর্ণ কয়েক সেকেন্ড লাগল। এদিকে সায়নের টিকিটকুও চিহ্ন নেই। স্বর্ণ পুনরায় বাকি বিনুনি গেঁথে রাবার পেন্সিলে নিলো। তারপর নিচে গিয়ে দেখল সায়ন ভদ্রবেশে মা-চাচীর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কে বলবে নিচে নামার সময় কি কাজটা করেছে সে। স্বর্ণ মাকে রান্নাঘরে দেখে সেদিকে গেল আর সায়ন মায়ের সাথে বেরিয়ে গেল। ভালো মুডে আসলেও উনাদের

কিসব কেনাকাটা আর দামাদামির বহর দেখে মনে হচ্ছে জীবনের দেখছে। উনাদের টিলেমি দেখে সায়ন বলল,-‘আম্মু এদিকে ঢুকলে কেন শপিং মল তো ওইদিকে?’

-‘এদিক থেকে কিছু জিনিস কিনে মলে যাব। এ্যাই সায়ন খবরদার বলছি তাড়া দিবি না। আমরা তোকে ডাকি নি বরং তুই নিজে থেকে এসেছিস।’

-‘এসেছি কি সাধে? বাবা চাচার শেষ বয়সে বউ হারিয়ে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে যেন কাঁদা না লাগে এজন্যই তো এলাম।’

ছেলের কথা শুনে সিঁতার ছেলের পিঠে একটা মেয়ে হেসে ফেললেন। তখন কোথা থেকে তিনজন মহিলা উপস্থিত হলো। মুহূর্তে জানা গেল, উনারা সিঁতার বাপের বাড়ির প্রতিবেশী। এরপর শুরু হলো মহিলাদের গল্প। কার মেয়ে পালিয়েছে, কার কে মারা গেছে, কার স্বামী কবে বিয়ে করেছে, কার বউ কোন কল মিস্ত্রির সাথে পালিয়েছে মিনিটের মধ্যেই এসব কাহিনি বলাও শেষ ; শোনাও শেষ। উনাদের গল্পের ধরণ দেখে সায়নের মনে হলো এ গল্প ইহজীবনে শেষ হওয়ার নয়। তাই সে ধীরে ধীরে ফোন স্কল করতে

করতে সরে দাড়াল। তবে উপলব্ধি করল সেই প্রতিবেশী মহিলার সঙ্গে থাকা উনার ছোট পুত্রবধূ তার আপাদমস্তক দেখছে। বারবার দেখছে। ব্যাপারটা তেমন আমলে না নিলে পরে বুঝল ছ্যাচড়া মেয়ের বদনজরে পড়ে গেছে। সে হাতে থুথু নিয়ে বুকের এদিক ওদিক মুছল। তারপর পালিয়ে বাঁচতে মাকে তাড়া দিলে ওই মহিলার পুত্রবধূ সিতারাকে বলল,- ‘মামনি আপনার ছেলের বিয়ে দিবেন না?’

সিতারা উত্তর দেওয়ার আগেই সায়ন মায়ের হাতটা বগলদাবা করে টানতে টানতে নিয়ে যেতে যেতে বলল,

- ‘উদ্দেশ্য বুঝে ভালো লাগল। দোয়া করি, আল্লাহ আপনার ভালো করুক আপনার স্বামীর বউ মরুক। ভালো থাকবেন, দূরে দূরে থাকবেন, ধন্যবাদ।’

এ কথা বলে সায়ন কোনোমতেই দাঁড়াতেই দিলো না। জোর করে টেনে ঠেলে শপিং মলে ঢুকল উনাদের নিয়ে। সময় চলমান স্রোত! চোখের পলকে কখন যে দিন পেরিয়ে যায় বোঝায় যায় না। নিত্যদিনের দৈনন্দিন কাজের চাপে দেখতে দেখতে কেটে গেছে আরো একটি সপ্তাহ। শুদ্ধ চলে গেছে

সিঙ্গাপুর। ঐশ্বর্যের অপারেশনটাও সে যাওয়ার পরপরই করা হয়েছে। তবে দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে গলার নিচ থেকে বুক অবধি ঝলসানো দাগটা পুরোপুরি ঠিক হয় নি, হবেও না। সে যতদিন বাঁচবে ততদিন এই দাগ তাকে বয়ে বেড়াতে হবে। মেনে নিতে

হবে তার নিয়তি, তার পরিস্থিতি। তবে মুখে এসিড/কেমিক্যাল জাতীয় কিছু পড়ে টুকরো টুকরো ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল সেটাও প্রায় ঠিক হয়েই এসেছে। ডাক্তাররা যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

শুদ্ধ আর রুবাব টাকার মায়া কখনো কেউ করে নি। যা বেস্ট তারা সেটা করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। এসব নানান ঝামেলার মধ্যে সিঙ্গাপুর কেটেছে

আরো তিন সপ্তাহ মানে শুদ্ধ যাওয়ার একমাস পেরিয়ে গেছে। সে মাত্র দুই সপ্তাহের কথা বলে আসলেও সব ঠিকঠাক করতে কেটেছে একমাস। তাছাড়া চিকিৎসা জিনিসটা তো আর দিনগুনে কিংবা মর্জিমতো হয় না।

তবে শুদ্ধ আসায় রুবাব যেন শক্তি পেয়েছে। সাহস পেয়েছে। একা একা

খুব বেশি কষ্ট হয়েছে তার। দুটো মেয়েকে নিয়ে ঠিকঠাক ঘুমাতে অবধি পারে নি। এরিমধ্যেই ঐশ্বর্যের পাগলামিতে আরো ঘুম-খাওয়া সব যেন উঠে গিয়েছিল। শুদ্ধ যখন প্রথমবার ঐশ্বর্যকে দেখতে হাসপিটালে আসে

তখন থমকে গিয়েছিল। ফুপি, রুবাব, ঐশ্বর্যের অবস্থা দেখে ভীষণ কষ্ট পেয়েছিল। রোগীর দেখভাল করা এত সোজা না। রোগী টানতে রোগীও হতে হয় সেটা রুবাবকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল। সেসব কাউকে বুঝাতে না দিয়ে স্নেহের সুরে ঐশ্বর্যকে বলেছিল,-‘আমার জন্য তোমার যে ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। তবে তোমার ভালোর জন্য যতটুকু করা যায় আমি করব।

সারাজীবন করব। আর অনুরোধ বলো কিংবা রিকুয়েষ্ট রুবাবকে আর পুড়িও না। তোমার সাথে সাথে সেও যথেষ্ট পুড়েছে। হ্যাঁ কোনো পুরুষই সাধু নয় আবার সব পুরুষের ভালোবাসা সমানও নয়।’

অল্প কয়েকটা কথায় ঐশ্বর্যের মনোবল শক্তি আরেকটু বেড়েছিল। গিল্টি ফিলও হচ্ছিল। সে শতরূপা ও রুবাবের কাছে মাফও চেয়েছে। তার এই গুনটা বেশ। ভুল করলে মাফ চাইতে দ্বিধা করে না। অকপটে স্পষ্টসূরে সেটা স্বীকার করে। এরপর আর কিছুদিন হাসপিটালে থেকে তারা এবার অর্কদের বাসায় উঠল। এতদিন পর বাসার পরিবেশে ঐশ্বর্যের মানসিক চাপ অনেকটাই কমে আসছিল। স্বাভাবিক হচ্ছিল। তবে আয়না দেখলে

ভেতর থেকে কান্না ঠেলে আসত। কিন্তু রুবাবের কাছে দেওয়া ওয়াদার কারণে কান্না সামলে নিতো। কষ্ট করে হলেও হাসত। অর্কদের বাসাতে সদস্য বলতে তারা চারজনই ছিল। বাকিরা আসে কাজ করে চলে যায়।

ওর রেগুলার চেকাপ, মেডিসিন, সেবাযন্ত্রের প্রতি নজর রাখছিল সবাই। যে যেভাবে পারছিল তাকে ভালো রাখার চেষ্টা করছিল। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল, গোটা চৌধুরী পরিবার। রোজ সন্ধ্যায় সবার সঙ্গে ভিডিও কলে কথা হয়। তবে ঐশ্বর্য লেপটপের সামনে যায় না ফোন কিংবা লেপটপের রশ্মির কাছে তার

যাওয়া বারণ। আড়ালে বসেও সবার সঙ্গে সখ্যতা গড়ে উঠেছে। যে সময় টুকু কথা হয় একেক জনের কথা আর কাজ দেখে না হেসে পারা যায় না। বিশেষ করে সব ভাই-বোনদের খুনশুটি দেখে মনটা ভরে যায়। এই যেমন আজই কথা বলতে বলতে সৃজন দুষ্ট হেসে শুদ্ধকে বলল,

-‘জানো ভাইয়া আজ কি হয়েছে?’ শুদ্ধ কফির মগে সিপ নিয়ে তাকাল লেপটপের দিকে। সবাইকে দেখা গেলেও শীতলকে দেখা যাচ্ছে না। তবে সে আশেপাশেই আছে সেটা খুব ভালো করে জানে। রাগ দেখাতে ইচ্ছে করে মেসেজ সিন করছে না, কল ধরছে না, ভিডিও কল দিলে সামনেও আসছে না। তাকে তাকাতে দেখে

সৃজন একবার ডানে তাকিয়ে ফিক করে হেসে বলল,
-‘স্কুল থেকে ফিরে দেখি শীতল আপু ড্রয়িংরুমে বসে বসে ফুসফুস করে কাঁদছে। এত কাঁদছে কাঁদতে কাঁদতে নাক দিয়ে পানি বের হচ্ছে সেটা সুড়ং করে ভেতরে টেনে নিচ্ছে আবার বের হচ্ছে আবার টেনে নিচ্ছে।’

-‘তা কাঁদছিল কেন?’-‘ কতবার করে জিজ্ঞাসা করলাম বললোই না তো। বলল না যখন আমি আর না জ্বালিয়ে খেতে বসলাম। খেয়ে না উঠতেই একটু পরে এসে বলে সৃজন রে শুদ্ধ ভাইকে কল দিয়ে জিজ্ঞাসা কর তো কবে ফিরবে। আমি যে শিখিয়ে দিয়েছি বলবি না খবরদার।’

সৃজনের এইটুকু বলতে দেরি পাশ থেকে তার পিঠে কিল বসাতে দেরি হলো না শীতলের। সে কোনোমতে নিজের দোষ সৃজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে রাগ দেখিয়ে বলল,

-‘মোটোও কাঁদছিলাম না আমি। আসলে তখন আমার চোখে কি যেন পড়েছিল। তাছাড়া যার তার জন্য কাঁদার সময় নেই আমার, হুহু।’তার কথা শুনে সকলে একে অপরকে দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসল। কারণ শুদ্ধর যাওয়ার পরপর শীতলের অস্থিরতা সবার নজরে পড়েছে।

এর আগেও শুদ্ধ বহুবার বাইরের দেশে গেছে দিনের পর দিন এ বাড়ির বাইরে থেকেছে। কিন্তু তার থাকা না থাকা নিয়ে শীতলের মাঝে কোনো

ব্রক্ষেপ ছিল না। তবে এবার বাড়ির অনেকের চোখে অনেককিছু চোখে পড়ছে। হতে পারে বিয়ের কারণে। সম্পর্কের বৈধতার কারণে। নিজের অনুভূতি বোঝার কারণে। ভালোবাসা উপলব্ধি করার কারণে। তবে যার জন্য এত অস্থিরতা দূরে থেকে ভীষণ মজা পাচ্ছে। সে মূলত চাচ্ছিলই তার উপস্থিতিতে শীতল যেন তাকে ভাবে। তাকে নিয়ে অস্থির থাকে, চিন্তা করে। বিশেষ করে এজন্যই সম্পর্কের গভীরতা একটু দ্রুত টেনেছে সে। সে জানত এমন কিছু হবে। এতদিন নিজের অনুভূতি গোপন রেখে একা একা অনেক তড়পেছে এখন সময় এসেছে সেসব উসূল করার।

শুদ্ধ ঠোঁটের কাছে হাত রেখে আপাতত হাসি আড়াল করল। ততক্ষণে কথাটা বলে শীতল চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছে। তখন সিরাত ফট করে বলে বসল,-‘তাই বলে কোথায় যাচ্ছিস তুই? এখানে আয় বস। আরে আমরাও বুঝি স্বামী দেশের বাইরে গেলে চোখে ঘনঘন কি যেন পড়ে। আমাদেরও কত পড়েছে।’

বাকিরা এতক্ষণ হাসি আঁটকে রাখলেও এবার কেউই হাসি আঁটকাতে পারল না। বড়-ছোট সবাই শব্দ করে হেসে ফেলল। শুদ্ধও ঠোঁটের কাছে হাত রেখে মুচকি হাসল। আর সবাইকে হাসতে দেখে শীতল রাগে দুঃখে

হনহন করে রুমের দিকে চলে গেল। সবাই ডাকল শুনলোই না। এভাবে লজ্জা দেওয়ার মানে হয়? একটু কেঁদেছে নাহয় তাই বলে সবাই এভাবে লজ্জা দেবে? তার কষ্ট কেউ বুঝে নাকি? শুদ্ধ যাওয়ার পর ঘুমাতে পারে না, বুকের উপর ঘুম পাড়িয়ে বদ অভ্যাস করে গেছে বিশুদ্ধ পুরুষ। আর নরম বালিশে ঘুম আসে না, আসবে কিভাবে? বালিশের গায়ে তো তার প্রিয় গন্ধটা নেই। খেতে পারে না, খেতে বসলে পাশের চেয়ারটার দিকে নজর যায়। তার রুমে এখন কম থাকে শুদ্ধর রুমেই বেশি থাকবে। তবে শুদ্ধর রুমটাও ভালো লাগে না কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে তাহলে কাঁদবে নাতো কি করবে? এভাবে থাকা যায় নাকি? সে চলে যেতেই রুবার দৃষ্টি সরিয়ে ঐশ্বর্যের দিকে তাকাল। তার দৃষ্টি যেন বলেছে, দেখো বলেছিলাম না ভালোবাসতে জানলে ভালোবাসা সুন্দর। আর

ভালোবাসা সুন্দর বলে এরা দুজনই ভেতর ভেতর
অস্থির, অশান্ত।

এবং দু'জন দুজনকে মিস করছে বলে কেউ দেশে
বসে তড়পাচ্ছে আর কেউ দেশের বাইরে বসে
আকাশপানে তাকিয়ে দিন গুনছে। ঐশ্বর্য দৃষ্টি ফিরিয়ে
একবার শুদ্ধর দিকে তাকাল। তারপর রুবাবের
দিকে। আসলে ভালোবাসতেই জানতে ভালোবাসা
সুন্দর। এরপর আর কিছুক্ষণ কথা বলে শুদ্ধ তার
লেপটপ নিয়ে রুমে চলে গেল। ঐশ্বর্যের এদের
সকলের বন্ডিং দেখে আজকাল লোভ হয় ;এমন
একটি সুখী পরিবারের লোভ। সে মনে মনে কিছু
ভেবে শতরূপা চৌধুরী কোলে মাথা রাখল। শতরূপা
তার চুলে বিলি কাটতে কাটতে চৌধুরী নিবাসের
সদস্যদের নিয়ে পুরনো গল্প তুলল। ঐশ্বর্য মন দিয়ে
শুনতে লাগল সেসব গল্প।এভাবে কেটে গেল আরো
কয়েকটাদিন। একদিন রাতের খাবারের পরে শুদ্ধ
জানাল, সে কিছুদিনের জন্য সুইডেন যাবে। সেখানে
কিছু কাজ সেরে একেবারে সবাই মিলে দেশে
ফিরবে। এই নিয়ে ডাক্তারের সঙ্গেও কথা হয়েছে
তার। শুদ্ধ কাজের মানুষ কাজ থাকতে পারে ভেবে

কেউ বাঁধা দিলো না। তবে ঐশ্বর্য মলিন হাসল কথাটা শুনে। কারণ শুদ্ধ যে ইগরের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছে বুঝতে বাকি নেই। কিছু বলারও নেই আর এসব নিয়ে। কি বলবে? শুদ্ধকে বারণ করা কিংবা কিছু বলার মুখ নেই তার। কারণ ইগর শুদ্ধর অনেক বড় ক্ষতি করেছে। যে ক্ষতি পূরণ সে কখনো দিতে পারব না। কেউ না জানুক সে তো জানে শুদ্ধর কত কষ্টের ফর্মুলা হাত ছাড়া হয়ে গেছে। শুধু শীতলের সুস্থতার কথা ভেবে এতদিন চুপ ছিল। তার অবস্থা দেখে কিছু বলতে পারছিল না। কিন্তু এখন আর তাকে থামানো যাবে না। ফর্মুলা ফেরত পাওয়া না পাওয়ার আশা রাখে না তবে ইগরকে একটা শিক্ষা না দিলেই নয়। তাছাড়া শুদ্ধর সঙ্গে কাজ

করে খুব ভালো করে বুঝেছে শোয়াইব শুদ্ধর অসংখ্য গুনের মধ্যে একটি বিশেষ গুন সে উপকারী অপকারী কাউকেই ভোলে না। এখন দুপুর একটা। ঘন কালো মেঘে ঢেকে আছে আকাশ। ঝমঝমিয়ে

বৃষ্টি নামতে পারে যখন-তখন। বাসা থেকে বের হওয়ার পর আবহাওয়া দেখে শখের মনে পড়ল সঙ্গে ছাতা নেই। মেজো মাকে দিয়েছিল তারপর ব্যাগে

টুকাতে ভুলে গেল। কথা হচ্ছে, বৃষ্টি নামার আগের
ভালোই ভালোই

বাড়ি পৌঁছাতে পারলেই বাঁচে। মনে মনে এসব ভেবে
সে দুটো ক্লাস করে

মেডিকেল কলেজ গেটের কাছে আসতেই হঠাৎ দেখা
হলো আহনাফের বোনের সাথে, সঙ্গে আহনাফের
বাবা-মা ছিল। তাকে দেখে উনারাও থম মেরে
দাঁড়িয়ে গেলেন। মলিন মুখ আরো মলিন হলো।
চোখাচোখি হলে শখ বিনয়ী স্বরে সালাম দিলে উনারা
সালামের জবাব দিলেন। টুকটাক কথা বলতে বলতে
কেঁদেই ফেললেন। আহনাফ বেঁচে থাকলে এতদিনে
শখ উনাদের বাড়ির একমাত্র পুত্রবধূ হতো। কিন্তু
সেসব কিছুই হলো না।

ছেলেটাকে কারা যেন তুলে নিয়ে গিয়ে মারতে মারতে
মেরেই ফেলেছে। এত পরিমান মেরেছে যে তাকে
চেনা মুশকিল হয়ে যাচ্ছিল। কে বা কারা যে উনাদের
এতবড় সর্বনাশ করেছে আল্লাহ জানে। তবে
আহনাফের কেস চলমান। পুলিশ নাকি এখনো খুঁজে
বেড়াচ্ছে অপরাধীকে কিন্তু কু পাচ্ছে না। তবে উনারা

আশাবাদী ছেলের খুনীদের একদিন খুঁজে বের করবেন।

এমন টুকটাক কথা হতে হতে মেঘ ডেকে উঠল। আকাশের অবস্থা দেখে উনারা চলে গেলেন হসপিটালের ভেতরে আর শখ এসে দাঁড়াল রাস্তার এপাশে। পাঁচ মিনিট দাঁড়ালে একটা রিকশা পেলে উঠে বসল। কাঁধের ব্যাগটা কোলের উপর নিয়ে চুপ করে বসে রইল। রিকশা চলতে লাগল নিজ গতিতে। আপনাআপনি আহনাফের মুখটা মনে পড়ল। খুব খারাপ

লাগে মানুষটার জন্য। কিন্তু কিছু করার নেই মাকাল ফলের মতো কিছু মানুষ আছে যারা দেখতেই সুন্দর, কোনো কাজের না। মনুষ্যবোধটুকু যার মধ্যে নেই তাকে অবশ্য মানুষ বলাও চলে না। আজ খুন হয়েছে বলে কষ্ট লাগছে। কিন্তু মানুষ ওদের সঙ্গে যা করেছে সেটা ক্ষমা করার মতো না। এসব ভাবতে ভাবতে দুঃভাগ্যবশত সেই রিকশা কিছদূর গিয়েই নষ্ট হয়ে গেল। রিকশা ওয়ালা মুখ কাঁচুমাচু করে জানালেন রিকশা ঠিক করাতে

নিয়ে যেতে হবে। কি আর করার শখ আশেপাশে
তাকিয়ে রিকশা থেকে নামল। এইটুকু আসার পথের
ভাড়া মিটিয়ে হাঁটা ধরল ফুটপাথের রাস্তা ধরে।
হাঁটতে অবশ্য মন্দ লাগছে না। সমস্যা হচ্ছে ছাতা
নেই বৃষ্টি নামলে আরেক বিপদ। একথা ভাবতে
ভাবতে ঝামঝামিয়ে বৃষ্টি নামল। বড় বড় বৃষ্টিরফোঁটা
আছেড়ে পড়ল পিচঢালা রাস্তায়। ভিজিয়ে দিলো
তাকেও। আশেপাশেও দোকান নেই যে দৌড়ে গিয়ে
গা বাঁচাবে। ততক্ষণে ভিজেও একশা অগত্যা হাঁটতে
হাঁটতে ভিজতে থাকল। তখনই একটা গাড়ি এসে
ব্রেক কষল তার পাশে। চমকে উঠে সরে দাঁড়াতেই
গাড়ির মালিক দ্রুত জানালা খুলে তাকাল। কৌতুহলী
কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল,

-‘আরে শখ না? ভিজছো কেন জ্বর আসবে তো?’

শখ এখন এখানে অর্ককে দেখে শখ সালাম দিলো।
ভাইয়ের বন্ধুদের সে যথেষ্ট সমীহ করে চলে। যতটুকু
কথা না বললে নয় ততটুকুই বলে নতুবা এড়িয়ে
চলে। শখ জবাব দেওয়ার আগে গাড়ির এ পাশের
জানালাটাও তুলে অর্কের মা বললেন,-‘মামনি ভিজছো
কেন?’

-‘রিকশা পাচ্ছিলাম না তাই..!’

-‘এসো এসো গাড়িতে উঠে বসো। এই বৃষ্টিতে ভিজলে জ্বরে পড়বে।’

-‘না আন্টি সমস্যা নাই আর একটু এগোলেই রিকশা পেয়ে যাব। তাছাড়া আমার ড্রেস ভিজে গেছে গাড়িতে আর না উঠি।’

-‘আরে কিছু হবে না উঠো তো তুমি।’

উনার একপ্রকার জোরাজোরিতে শখ পিছনের সিটে বসল। কথা বলতে বলতে চৌধুরী নিবাসের গেট দিয়ে ডুকল গাড়ি। শখ নামলে উনারা চলে গেলেন। শখ এত করে ভেতরে যেতে বলল শুনলেনই না।

আসলে উনারা

জরুরি কাজে বেরিয়েছিলেন বসলে আরো দেরি হবে আরেকদিন এসে ঘুরে যাবে বলে বিদায় নিলেন।-‘ভাই আপনার বিয়াতে আমারে নতুন পাঞ্জাবি কিইনা দিবেন।’

-‘বর তুই না আমি?’

-‘আপনে।’

-‘তাহলে তুই কোন দুঃখে নতুন পাঞ্জাবি পরবি?’

-‘আমার ভাইয়ের বিয়া আমি না পরলে কেডা পরবো কন?’

-‘শালা তুমি আমার বউ হারাইয়া দিসিলা মনে নাই? তোমারে দিবো নতুন পাঞ্জাবি? ওয়েলকাম ড্রিংকস খাবা না? চট্টগ্রামের কথা মনে নাই, হুম?’

পাঞ্জাবি না তোমারে তো ওয়েলকাম ড্রিংকস গেলাব পাখি, কাছে এসো দেখি।’

আজম মুখ কাঁচুমাচু করে দুপা পেছনে সরে দাঁড়াল। এই নিয়ে কতবার যে একই খোঁচা শুনল হিসাব নাই। পার্টি অফিসের রুমে বসে আজম আর সায়ন কথা বলছিল। তখন একটা ছেলে এসে বলল,

-‘ভাই আপনার বুনইন আইছে।’

সায়ন ভ্রুঁজোড়া কুঁচকে আজমকে বলল,

-‘বুইড়া বয়সে বোন কোথায় কুড়িয়ে পেলি?’

সায়নের কথা শুনে ছেলেটি ভুল শুধরে দিয়ে বলল,-‘আজমের না আপনার ছুডু বুনইন আইছে। রাস্তায় কানতে কানতে যাইতেছিল আমি দেইখা দাঁড় করাইছি।’

সায়ন এবার তড়াক করে উঠে বাইরে গেল। শীতল বাইরে দাঁড়িয়ে চোখ মুছে ঘনঘন। কাঁদতে কাঁদকে

চোখ মুখ লাল করে ফেলেছে। এইরে কী হলো
আবার? শুদ্ধ সারাদিনে তাকে কতশতবার ফোন
করে। তার ঘুরে ফিরে ওই একটায় কথা ‘ভাইয়া
চোখ-কান খোলা রেখো। আমি যতবার দেশের বাইরে
আসি ততবারই কিছু না কিছু ঘটে। শীতলের দিকে
নজর রেখো। ওকে একা ছেড়ো না। ‘ শুদ্ধর কথা
শুনে সে আজ সকালে নিজে শীতলকে কলেজে রেখে
রেখেছে। আনতেও যেতো কিন্তু শীতল আগেই চলে
এলো কেন? তার কলেজ তো ছুটি দিবে আরো
আধাঘন্টা পর। সে দ্রুত শীতলের কাছে যেতে
শীতলের চোখের পানি বাঁধ ভাঙল। ফুঁপিয়ে কেঁদে
উঠল। শুদ্ধর জন্য কাঁদছে দেখে সায়েন তার মাথায়
হাত রেখে আদুরে সুরে বলল,-‘শুদ্ধ সামনে সপ্তাহেই
চলে আসবে। কাঁদে না বোন। আইসক্রিম খাবি?’
শীতল না বোধক মাথা নাড়িয়ে হেঁচকি তুলতে তুলতে
বলল,

-‘কিয়ারাকে খুঁজে দাও ভাইয়া।’

-‘কোন কিয়ারা? কি হয়েছে তার?’

-‘আমার বান্ধবী।’

-‘রুবাব এলে ঘনঘন আসত ওই মেয়েটা?’

-‘হুম।’

-‘কি হয়েছে তার?’

-‘ওকে চাঁদরাত থেকে খুঁজে পাওনা যাচ্ছে না। আমি জানি ওর কারো সাথে সম্পর্ক নেই। সে পালিয়ে যায় নি। ও ওইরকম মেয়েই না। আমার মন বলছে সে বিপদে পড়েছে। তুমি কিছু একটা করো ভাইয়া।’

-‘সে নাহয় করলাম। কিন্তু তুই কাঁদছিস কেন? এ খবর তোর প্রতিদেবের কাছে পৌঁছালে আমাকে যে শূরে চড়াবে। থাম বোন, কাঁদে না, আচ্ছা দুদিন সময় দে আমি খুঁজে দেবো তোর বান্ধবীকে।’

এমন টুকটাক কথা বলতে বলতে সায়েন দোকান থেকে আইসক্রিম নিয়ে

শীতলের হাতে ধরিয়ে দিলো। আজমকে কাজ দিলো কিয়ারার বাড়ির খোঁজ নিতে। তারপর নানান কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেল বাড়ির দিকে। শুদ্ধ যাওয়ার আগে শীতলকে নিয়ে নিজে গিয়েছিল শীতলের কলেজে।

এতদিন ক্লাস না করায় কথা বলে এসেছিল। এখন রেগুলার তাকে ক্লাস করতে হয়। কিন্তু আগে কলেজে যেতে যতটুকু ইচ্ছে করত এখন তাও করে না।

কিয়ারাকে ছাড়া ভালো লাগে না। কিয়ারা কলেজে আসে না দেখে কিয়ারার খোঁজ করে জানতে পারে সে এক খ্রিষ্টান ছেলের সঙ্গে নাকি পালিয়েছে। ধর্মও চেঞ্জ করে ফেলেছে। একথা বিশ্বাস না করতে পারে নি সে তাই আজ তাড়াতাড়ি কলেজ ছুটি হওয়ায় একাই গিয়েছিল কিয়ারাদের বাসায়। এর আগেও গিয়েছিল তবে বাড়িতে কেউ ছিল না।

কিন্তু আজ কিয়ারার বাবা- মা কে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই উনারা

যা নয় তাই বলে অপমান করেছে। বাড়ির মেয়েরা পালালে বাড়ির লোক ভাবে বান্ধবীরাই যত নষ্টের গোঁড়া। বান্ধবীরাই ভদ্র মেয়েদের মাথা খায়। প্রেম টেম করার জন্য এরাই বখাটে, নেশাখোর ছেলেদের দিকে লেলিয়ে দেয়। কিন্তু এটা দেখে না সবসময় বান্ধবীদের দোষ থাকে না। বান্ধবীর মতো বান্ধবী হলে তারা কখনো ভুল কাজে প্রশ্রয় দেয় না। তাকে অযথা ভুল বুঝছে দেখে কিছু বলার সুযোগও দিলেন না উনারা নিজেদের কথা শেষ করে মুখের উপর দরজা আঁটকে দিয়েছে। এভাবে কখনোই কারো

কাছে অপমানিত হয় নি শীতল। তাই কাঁদতে কাঁদতে
এসেছে সারাপথ।

তবে মনের ভেতর কিছুটা অভিমানও জমে কিয়ারার
উপর। তাকে খুঁজে পেলে সব অভিমান উগলে দেবে।

বাজাও শিষ মারো তালি

নিঃশব্দে মুছে যাক গোপন কালি।

এসেছে রে, এসেছে চৌধুরী এসেছে__

হবে নাকি চুক্তি? দেবো নাকি উক্তি?

চোর-পুলিশ ভাই ভাই

চলো এসো হাত মিলাই? উৎফুল্ল স্বরে উক্ত কথাটি

বলতে বলতে ইগর এসে বসল শুদ্ধর সামনে। যদিও

সুস্পষ্টভাবে বাংলা কথা বলতে পারেন না তিনি।

ঐশ্বর্যের মায়ের বদৌলতে একটু আধটু শিখেছিল এই

যা! তবে এই একটু আধটু দিয়েই বাঙালিদের

খোঁচানোর কাজ ঠিকভাবে হয়ে যায়। বলা বাহুল্য,

নড়বড়ে উচ্চরণ দিয়ে সামনে ব্যক্তিকে অপমান

করতে এক্সপার্ট। এখন যেমন ভাবছেন শুদ্ধকে

খোঁচাবেন। কারণে অকারণে খুঁচিয়ে শুদ্ধ রেগে উনার

গায়ে হাত তুললে কোনো অঘটন সৃষ্টি করবে। বাইরের

দেশ থেকে এসে উনার গায়ে হাত তোলার অপরাধে

পুলিশের হাত তুলে দিলেও মন্দ হয় না। বাঙালি জাতি, বিদেশি জেলের ভাত কেমন জানে না। এই সুযোগে নাহয় জেল থেকে ঘুরে আসুক। মানুষের জীবনে সব রকমের অভিজ্ঞতা থাকা জরুরি। তাছাড়া কোথাও লেখা নেই সাইন্টিস্ট হলে জেলে যেতে পারবে না। উনার হাসি হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে আছে শুদ্ধ। বয়সটা থেমে না থাকলেও এখনো ইগরের শারীরিক গঠন যথেষ্ট স্ট্রং। পোশাক পরে রুচি সম্মত। তাকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে ইগর ওয়াইনের বোতল দেখিয়ে জানতে চাইল হোয়াইট নাকি রেড ওয়াইন নেবে। শুদ্ধ কোনো জবাব না দিলে নিজে থেকেই রেড ওয়াইনের গ্লাস এনে ধরল শুদ্ধর সামনে। শুদ্ধ এবারও ধরল না দেখে ইগর বলল,-‘রাগ করে না ইয়াং ম্যান।’

শুদ্ধ হাসল। ঠোঁটের কোণে হাসি এঁটে খোঁচা মেরে বলল,

-‘কেমন আছেন, স্যার.. উফ! বিগ মিসটেক চোর মহাশয়।’

মুখের উপর চোর বলায় ইগরের ভীষণ রাগ হলো। তবে রাগটুকু প্রকাশ না করে হাসি মুখে বলল,

-‘কী জন্য এসেছো?’

-‘ ভয় পাচ্ছেন বুঝি?’

-‘তুমি বাঘ নাকি ভাল্লুক যে ভয় পাব?’

-‘ আমি কী আপনার থেকে ভালো কে জানে?’

-‘ওটা আর পাবে না শোয়াইব।’

-‘ কে বলল?’

-‘আমি।’

-‘ আমার জিনিস হজম করার ক্ষমতা আপনার আছে?’কথা বলতে বলতে আশেপাশে তীক্ষ্ণ নজর বুলিয়ে দেখে নিলো নির্জন জায়গাটা। এখন মধ্যদুপুর। সুনশান এরিয়া। কাছে কোথাও একটা দ্বীপ আছে। এদিকটা পরিত্যক্ত এরিয়া বলা চলে। এজন্য আকাম কুমার সব

এই এরিয়ার মধ্যে হয়ে থাকে। তবে এই জায়গার কথা ঐশ্বর্য ছাড়া কেউ জানত না কারণ ঐশ্বর্যকে বেশিরভাগ সময় এখানেই আঁটকে রাখতেন।

ছোট একটা রুমে বন্দী রেখে কষ্ট দিতেন। শুদ্ধ সুইডেনে এসেছে দুদিন হলো। তিনদিনের দিন এসেছে ইগরের সাথে দেখা করতে। হতেও পারে এটাই শেষ দেখা। শুদ্ধ কিয়ৎকাল চুপ থেকে ঠান্ডা

চাহনি ছুঁড়ে ইংলিশে বলল,-‘ ফর্মুলা কাজে লাগাতে পারলেন না, পারার কথাও না, তাহলে শুধু শুধু চুরি করলেন কেন?’

-‘ কোটি টাকা পেলাম। তোমাকে হারাতে পারলাম। অপমানের শোধ নিতে পারলাম।’

-‘ আমাকে হারালেন? কিভাবে?’

-‘তুমি জিনিয়াস আমি মানি। এটাও জানি সামনে আরো চমকপ্রদ কাজ করবে। কথা হচ্ছে, টাকা অফার করেও যখন আমার হয়ে কাজ করলে না তখন রাগ হচ্ছিল। এই কারণে আমি ঐশ্বর্যকে পাঠিয়েছিলাম তোমার কাছে, যাতে তোমাদের মাঝে কিছু ঘটে। নারীর সৌন্দর্যের কাছে পুরুষ কাবু। আর ঐশ্বর্যের রূপ ছিল ওইরকমই। ওর মায়ের জন্য বারবার বেঁচে গেছে আমার হাত থেকে নয়তো ওর ভার্জিনিটি আমিই..!’-‘সে আমার ছোটো ভাইয়ের হবু বউ তাকে জড়িয়ে কোনো নোংরা কথা শুনতে ইচ্ছুক নই। কথা হচ্ছিল চুরি নিয়ে।’

-‘ সেটা নিয়েও কথা বাড়িয়ে লাভ নেই ফিরে যাও।’

-‘ স্কটল্যান্ডের সাইন্টিস্ট শেফার্ড ফ্লেমিং এর কাছে ফর্মুলা বিক্রি করতে চেয়েছিলেন। ফ্লেমিং সন্দেহ

করায় তাকে না দিয়ে ডিসুশ বিনের কাছে চার কোটি
তিপ্পান লক্ষ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করেছেন ।
ভেবেছিলেন আজ রাতে অন্যদেশে পাড়ি জমাবেন
যাতে আমার মুখোমুখি হতেও না হয় ।’

-‘এসব কথা তুমি জানলে কিভাবে? সে আমাকে কথা
দিয়েছিল ভুলেও তোমাকে জানাবে না ।’

-‘ কিন্তু জানিয়েছে তো । শুধু জানাই নি, আপনার
বিরুদ্ধে সাক্ষীও দেবে । ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে,
আমার জিনিস এখন আমার কাছে সুরক্ষিত । বিশ্বাস
হচ্ছে না?’ইগর থমথমে মুখে তাকিয়ে রইল শুদ্ধর
মুখের দিকে । কাট কাট চেহারার সুদর্শন পুরুষটা
আবারও তাকে ঘোল খাইয়ে ছাড়ল । সব কথা সে
জানে, এর মানে এতদিন সিঙ্গাপুর থাকলেও তার
নজর ছিল উনার গতিবিধির দিকে । অথচ উনি
ভেবেছিলেন একের পর এক বিপদে পড়ে চৌধুরী
পুত্র

এসব নিয়ে ভাবার সময় পাবেন না । আর যতদিনে
বিপদ কাটিয়ে উঠবে ততদিনে ধরা ছোঁয়ার বাইরে
চলে যাবেন । কিন্তু শেষ চালটা দিয়ে শুদ্ধই যে
চেকমেট দেবে সেটা কল্পনাও করেন নি । পুলিশের

গাড়ির হর্ণ কানে পৌঁছাতেই বুঝতে বাকি রইল না ঘটনা। সাইলেন্স করা পিস্তলটা নিজের কাছে না থাকায় উঠে দাঁড়াতেই কোথা একটা বুলেট এসে বিঁধল উনার বুকের বাঁ পাশে। চোখের পলকে লাল রক্তে ভিজে গেলে পরনের সবুজ টি-শার্ট। তখনই পুলিশের গাড়ি থেমে ধপধপ শব্দ তুলে একদল পুলিশ ভেতরে প্রবেশ করল। ইগর ততক্ষণে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে লুটিয়ে পড়েছে শুদ্ধর পায়ের কাছে। শুদ্ধ ব্যতীত এখানে আর কাউকে না দেখে পুলিশ ইগরের লাশের সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধকেও যেতে ইশারা করল। শুদ্ধ যেতে যেতে পাখিমধ্যে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে একবার তাকাল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল জঙ্গলের দিকে। কিন্তু কাউকে নজরে না পড়লে

চলে গেল পুলিশের সঙ্গে। পুলিশের গাড়ির শব্দ শোনা না গেলে ইয়াসির বের হয়ে এলো। হেসে হাততালি দিতে দিতে বিরবির করল,-‘তোমার বিশুদ্ধ পুরুষ সাধু নয় চডুইপাখি। সে নির্মমভাবে আহনাফকে মেরেছে। এমনভাবে মেরেছে চেনা মুশকিল। তার হাতে খুনের রক্ত লেগে আরো আগে থেকে লেগেছে।

কিন্তু প্রমাণের ভিত্তিতে কখনো তা সামনে আসে নি।
কিন্তু এবার ঘটা করে তোমার শুদ্ধর গায়ে খুনির ট্যাগ
লাগবে। আমি খারাপ, মাফিয়া বলে রিজেক্ট করেছিলে,
এবার? এবার কি করবে শীতলরাণী? এবার মানতে
পারবে খুনি স্বামীকে? ভালোবাসা ওইরকমই থাকবে
তো?’

একথা বলে ইয়াসির দুই পকেটে হাত গুঁজে শিষ
বাজাতে বাজাতে হাঁটা ধরল বিপরীত পথ ধরে।
এখানকার কাজ আপাতত শেষ। কিন্তু ইয়াসির
হয়তো এটা জানত না, শুদ্ধ এখানে এসেছিলই প্ল্যান
করে আর পুলিশরা

ছিল ফেইক। প্ল্যান ছিল ইগরকে থার্ড ডিগ্রি দিয়ে
আরো কিছু কথা বের করার, কিন্তু হলো না। হলোই
না যখন তখন আফসোস করে লাভ নেই। তাছাড়া
মানুষের জন্য কষ্ট পেলেও অমানুষের জন্য শোক
পালন করার প্রশ্নই আসে না। ইগরের ঘটনা জানার
জন্য রুবাব কল দিলো শুদ্ধকে। শুদ্ধ সেখানে একা
যাওয়ায় রুবাব, সায়েন চিন্তাতেই ছিল। তাদের চিন্তা
দ্বিগুন হলো যখন শুদ্ধ কল ধরছিল না। কয়েকবার

কল করার পর কল রিসিভ হলে ফোনের ডিসপ্লেতে
শুদ্ধর মুখটা ভেসে উঠল। সদ্য শাওয়ার
নিরে এসেছে শুদ্ধ। তাকে দেখে রুবাব বলল,

-‘কাজ হয়েছে?’

-‘হুম।’

-‘খোসা (লাশ)?’

-‘গায়েব।’

-‘আলহামদুলিল্লাহ। ‘রুবাব ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলায়
সায়ন ভ্রুঁজোড়া কুঁচকে তাকাল। বলল,

-‘ওই শালা তোর শশুর মারা গেছে ‘আলহামদুলিল্লাহ’
বলিস কোন হুঁশে? কান্না কর। দু’মিনিট মন খারাপ
করে থাক।’

-‘জাতের শশুর হলে কান্না করতাম কিন্তু ওইটা ছিল
অজাতের শশুর।

অবশেষে পথের কাঁটা সরলো ভেবে খুশি লাগছে।’

-‘তবুও মন খারাপ কর। এ্যাই শুদ্ধ তুইও কর।’

সায়নের কথা শুনে শুদ্ধ মাথা মুছতে মুছতে জবাব
দিলো,

-‘তোমরা শুরু করো আমি খেয়ে এসে শোকে জয়েন
হচ্ছি।’

-‘আচ্ছা।’এই নিয়ে কথা বলতে বলতে শুদ্ধ অন্য প্রসঙ্গে কথা উঠাল। তার কথায়

রুবাব আর সায়েন হো হো করে হেসে ফেলল।

এরপর প্রসঙ্গ এলো তিন ভাইয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান নিয়ে। বিয়ের কার্ড ছাপাতে দেওয়া হয়ে গেছে।

কার্ডটা নাকি ভীষণ সুন্দর। কার্ডের ডিজাইন সিলেক্ট করেছেন সিঁতারা।

শাহাদত চৌধুরী আগামী মাসে ছুটিতে আসবে তখনই শুভকাজ সম্পূর্ণ করা হবে। অথচ এখন থেকেই বাড়িতে বিয়ের তোড়জোড় লেগে গেছে।

বোনেরা কে কী করবে, কে কী পরবে, সেটার প্ল্যানও ডান। এমন আরো কিছু কিছু ব্যাপারে কথা বলতে বলতে তিনভাই খুব হাসল, মজা করল,এরপর কল কাটল। শুদ্ধ খেয়ে পুনরায় বের হলো। কারণ যাদের দিয়ে কাজটা করিয়েছে তাদেরও পাকাপোক্ত একটা ব্যবস্থা করে যেতে হবে। নয়তো এখান থেকে আবার ঝামেলার ডালপালা গজাবে। এই ভুল তো বারবার করা যাবে না।

অতঃপর আরো কিছু জরুরি কাজ সেরে পরদিন শুদ্ধ সিঙ্গাপুর ফিরল।রুবাব ঐশ্বর্যকে নিয়ে চেকআপ

করিয়ে আনল আরেকবার। ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে প্রয়োজনীয় সবকিছু গুছিয়ে রাখল। শতরূপা চৌধুরীকে নিয়ে টুকটাক শপিং সারল। বাড়িতে ছোটো ভাই বোনরা আছে। তাদের জন্য কিছু নিতে হবে। বাড়িতে পা দিলেই ধরবে কী এনেছে জানার জন্য।

অগত্যা টুকটাক কেনাকাটার কাজে শুদ্ধকে আর টানে নি কেউ। কারণ এখানে আসার পর থেকে বিশ্রাম পায় নি ছেলেটা। এসে খেয়ে ঘুমাচ্ছে। আগামীকাল তাদের ফ্লাইট একটানা বাইরে থেকে দেশের জন্য সবারই র মনটা আকুপাকু করছে। শারাবাত চৌধুরী জানিয়েছেন বাড়িতেই যেন উঠেন। ভাইয়ের মুখের উপর শতরূপা কিছু বলেন নি। দেখতে দেখতে সময় কাটতে লাগল নিজের মতো। ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে ঘুরতে রাতটাও পার হলো। পরেরদিন সকাল হলো, দুপুরটা পেরিয়ে বিকালে রেডি হয়ে সকলে নিজ দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। আগে প্রতি সপ্তাহে চারদিন করে একজন মহিলা আসত সাম্য, সৃজনকে পড়াতে। উনি একটা স্কুলের ইংলিশ টিচার। নাম সুলতানা। উনি নিজেও

পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষকতা করেন। বলা বাহুল্য,
ভালো পড়ানও। সাম্য, সৃজনের সাথে বর্তমানে
শীতলকে পড়াচ্ছেন, ইংলিশ সাবজেক্টটাই পড়ে
শীতল। শীতলকে পড়ার চক্রে ফেলে গেছে শুদ্ধ।
আগে বিকেলে কত সুন্দর ঘুরে বেড়াত, সাইকেল
চালাত, গাছে উঠে ফল পাকড় পেড়ে খেতো, আহা,
সেই দিনগুলো কত সুন্দর ছিল। আর এখন বিকেল
হলেই বই খাতা নিয়ে বসে পড়তে হয়। তবে আজ
অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও

ম্যাম আসছে না। তাই তিনজনে মিলে শুয়ে বসে চিৎ
কাত হয়ে গল্প করে সময় কাটান। আজকে পড়া নেই
তাই তিনজনে খুশিতে হইহই করে বের হলো।
অনেকদিন পর শীতল গাছে উঠে পেয়ারা, তেঁতুল,
আমড়া পেড়ে মাখামাখি করে খেলো। পুরো বাগানে
কিছুক্ষণ তার সাইকেল চালাতো। সন্ধ্যার আজানের
পর তার উসকোখুসকো চুল দেখে সিমিন বকতে শুরু
করল। শীতল মায়ের বকা শুনে ফুলোরাণী হয়ে মুখ
ফুলিয়ে তেল নিয়ে বসল সিঁতারার কাছে। চুলে তেল
দিতে একদমই ইচ্ছে করে না। কেমন মরা মরা
লাগে। সিঁতারা ড্রয়িংরুমে বসেই যত্ন করে শীতলের

লম্বা চুলে তেল দিয়ে দুপাশে দুটো বিনুনী করে
দিলো। তার দেখে স্বর্ণ বসল। শখ পড়ছিল তাকেও
ধরে চুল তেল দিয়ে চুল বেঁধে দিলেন সিঁতার।
এরপর

সন্ধ্যার নাস্তা সেরে শুদ্ধর রুমে গিয়ে বিছানায়
কিছুক্ষণ গড়াগড়ি খেল। নিজের ফোন চেক করে
দেখল শুদ্ধর মেসেজ এসেছে, ‘রুমে যেন পাই।’
মেসেজটা নিয়ে কিছুক্ষণ গবেষণা করে বুঝল মহারাজ
তারমানে বাড়ি ফিরছে। তবুও সিঁতার হওয়ার জন্য
ছুটতে ছুটতে গেল সিঁতারার কাছে।

কোনোমতে আকাশ সমান আনন্দটুকু কোনোমতে
গোপন করে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসা
করল, -‘বড় মা রুবাব ভাইয়ারা কি দেশে ফিরছে?’

-‘হ্যাঁ।’

-‘কবে?’

-‘আজ রাতের ফ্লাইটে।’

-‘সবাই আসছে।’

-‘হুম।’

-‘আচ্ছা।’ একথা বলে শীতল সিঁড়ি থেকে সরে নেচে
উঠল। ইস, এত খুশি লাগছে কেন? লজ্জাও লাগছে।

মহারাজ আসছেন তাহলে। তিন সপ্তাহের নামে
কতগুলোদিন সে বাড়িতে নেই। কতদিন ছুঁয়ে দেখে
নি। দেশের বাইরে গিয়ে যেন ভুলেই বসেছে তারও
একটা বউ আছে। বউটা তাকে খুব মিস করে। ঘুমের
ঘোরে বিছানা হাতড়ে না পেলে ফুপিয়ে কাঁদে। তার
বেলায় লবডঙ্কা অথচ নিজের বেলা ষোলোআনা বুঝে
নিতে ওস্তাদ। নয়তো কি

ফেরার আগে ঠিকই হুমকি দিয়ে রেখেছে, রুমে যেন
পাই। বললেই হবে নাকি? এসব নানান কথা ভাবতে
ভাবতে লাজুক হাসল। গালদুটো লাল হয়ে উঠল
একরাশ লজ্জায়। প্রবাসীর বউদের আনন্দটুকু আজ
উপলব্ধি করতে পারছে। এই আনন্দটুকু যেন ঈদের
সামিল। এসব ভেবে লাজুক হেসে দুই হাতে মুখ
ঢাকতে যাবে তখন দেখে স্বর্ণ রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে
আছে। তাকে দেখে হাসি চওড়া হলো শীতলের। দ্রুত
গিয়ে স্বর্ণকে বলল,-‘আপু রুবাব ভাইয়া আসছে।’
বোনের মুখ দেখে বহুকষ্টে হাসি আঁটকাল স্বর্ণ। জবাব
দিলো,

-‘হুম। সঙ্গে শুদ্ধ ভাইও।’

শীতল হঠাৎ মুখটা থমথমে করে অন্যদিকে তাকিয়ে
বলল,

-‘ কারো খোঁজ নিতে আমার বয়েই গেছে।’

একথা বলে শীতল নিজের রুমে ঢুকে গেল আর
তাকে যেতে দেখে স্বর্ণ হেসে ফেলল। যার আগমনে
তার চঞ্চলতা বেড়ে গেছে, লজ্জা পাচ্ছে, ঠোঁটে
মিটিমিটি হাসি ভেসে উঠেছে তার খোঁজ নিতে নাকি
বয়ে গেছে, ভাবা যায়!_‘আপনাকে আমি স্বামী হিসেবে
মানি না। ছুঁবেন না আমায়। আপনার ছোঁয়া লাগলে
গা গুলিয়ে আসে আমার। ঘৃণা হয়। আপনি আস্ত
একটা জানোয়ার।’

চিৎকার করে বলা কিয়ারার কথা শুনে বুরাকের মধ্যে
কোনো ভাবান্তর দেখা দিলো না। কনিষ্ঠ আঙুল দিয়ে
কান ঘুঁচিয়ে নিলো। হাতের জ্বলন্ত সিগারেটে কয়েকটা
টান মেরে অ্যাশট্রেই ঘঁষে নিলো। তারপর চট করে
উঠে গায়ের শার্ট খুলে ছুঁড়ে মারল রুমের এক কোণে,
প্যান্টের বেল্টটাও ছুঁড়ল আরেক দিকে। তার
মনোভাব বুঝে কিয়ারা পালাতে গেলে বুরাক তাকে
ধরে ফেলল। ফিচেল হেসে কানে কানে
বলল,-‘লুকোচুরি পরে খেলব ডালিং। আগে আদর

আদর খেলার পর্বটা শেষ করি? আমরা হলাম
ভিলেনের জাত; জোর করা, ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে
আমাদের ধর্ম। ভালো মানুষি আমাদের রক্তেও নেই।
আমার ছোঁয়াতে গা গুলালে বমি করো সমস্যা নাই।
সত্যি বলতে, তোমার বমির কারণ হতে পেরে আমার
বরং ভালোই লাগবে।’

-‘যেতে দিন না আমায়? কেন করছেন এমন?’

-‘ভালো লাগে তাই।’

-‘আমি তো আপনাকে চিনতামও না, তবে?’

-‘আমি চিনতাম। শীতলের কাছের মানুষের সন্ধান
করতে গিয়ে তোমায় পেয়েছি। কবুল যখন বলেছো
এভাবেই নিজেকে মানিয়ে নাও। পারলে কনসিভ
করো। বাবা ডাক শোনাও। নিজের সংসার সাজাও।
তবে মুক্তি পাবে না।’

একথা বলে কিয়ারাকে ধাক্কা দিয়ে বিছানায় ছুঁড়ে
পুরুষালি শক্ত দেহের ভার ছেড়ে দিলো বুরাক। ধীরে
ধীরে গাঢ় থেকে গাঢ়তরও হলো স্পর্শ। অসহায়
কিয়ারা শব্দ করে কাঁদতে লাগল। মনের মিল না
থাকলে বরের ছোঁয়াও বোধহয় বিষের মতো লাগে।
ঘৃণা হয়। বুরাক যখন তার পোশাক খুলতে ব্যস্ত

তখনও নিজেকে বাঁচাতে কিল, ঘুষি, খামচি, আঁচড়
কেটে নিজের বাঁচানোর আশ্রয় চেষ্টা চালান। করুণ
সুরে বারবার ডাকল তার প্রিয় বাবাকে, ডাকল
মমতাময়ী মাকে, অশ্রুভেজা চোখেও ভাসল মন
কুঠুরিতে লুকিয়ে রাখা প্রিয় পুরুষের মুখ।
দুঃভাগ্যবশত কেউ শুনল না বিধায় বাঁচাতেও এলো
না। প্রতিবারের মতো এবারও ছাড়া পেলো না সে।
মনের দখল না পেলেও জোরপূর্বক শরীরের দখল
ঠিকই আদায় করে নিলো। পুরুষত্বের জোর দেখিয়ে
নিজের কাজ সেরে পাশে শুয়ে পড়ল বুড়াক। ক্লান্ত
দেহে ঘুমিয়েও পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যেই। কিয়ারা
নীরবে চোখে জল ফেলতে ফেলতে কষতে লাগল
নিজের হিসাব। তবে আজ সে মানতে বাধ্য যারা
সুইসাইড করে তারা সত্যিই সাহসী। নয়তো
কিভাবে সুইসাইড করতে পারে তারা? সে তো পারে
না। সে তো ভীতু! কতবার মরতে গিয়েও পারে নি
অথচ এভাবে বন্দিনী জীবনে বাঁচতেও তার ভয়
আবার মরতেও। পরেরদিন সকালে মিষ্টি একটা
সকালের সূচনা হলো। রোজকার মতো চৌধুরীর

গিন্ধিরা রান্নাঘরে ব্যস্ত। শীতল সিমিনের রুমে এখনো ঘুমাচ্ছে।

গতরাতে খাবার খেয়ে মায়ের রুমে শুয়ে বাবার সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলেছিল। সেখানে শুয়েই ফোন টিপতে টিপতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘুম ভেঙেছে ফজরের আজানের অনেক পর। তখনই উঠে নিজের রুমে ফ্রেশ হয়ে একবার শুদ্ধর রুমে উঁকি মেরে দেখে শুদ্ধ রুমে নাই। বিছানা ফাঁকা। তারমানে হাঁটতে বেরিয়েছে তার দেখা পেতে নিচে থাকতে হবে।

ফাঁকা রুমে একা পেলে তাকে পানিশমেন্ট দিবেই দিবে। একথা ভেবে সে ধীরে সুস্থে নিচে নামল। বাগানে কিছুক্ষণ হাঁটল তবুও শুদ্ধ আসছে না দেখে রান্নাঘরে গেল। মা-চাচীদের ব্যস্তহাতে কাজ করে দেখে পুনরায় ডয়িংরুমের দিকে যেতেই শুদ্ধর মুখোমুখি হলো। চোখাচোখিও হলো।

শুদ্ধ রান্নাঘরে মা-চাচীদের দেখে পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে নিচু স্বরে বলল,-‘রুমে আসুন মিসেস শোয়াইব, এম্ফুণি!’

হঠাৎ তাকে ‘আপনি’ সম্বোধন করায় চোখ বড় বড় করে তাকাল শীতল।

এত সন্মান হজম হলো না তাই শুদ্ধর দেখাদেখি সেও ফিসফিস করে বলল,

-‘কেন?’

শুদ্ধ ফিচেল হেসে বলল,

-‘মিষ্টি খেতে।

একথা শুনে ঘটনা বুঝতে বাকি রইল না তার। তবে সকালবেলা শুদ্ধকে জ্বালানোর সুযোগ হাতছাড়া করল না সে। মুহূর্তেই শয়তানি বুদ্ধি খেলে গেল তার মাথায়। শুদ্ধর পেছন পেছন সিঁড়ি অবধি গিয়ে লাজুক মুখে বলল,

-‘স্বামী বলছিলাম যে, বিয়ে হয়েছে অনেকদিনই তো হলো বাপের বাড়ি যাওয়া হয় নি। মনটাও খুব একটা ভালো নেই। যদি পাঁচ কেজি কিনে দিতেন ঘুরে আসতাম।’-‘কদিন ধরে পিঠে মার পড়ে তাই না? রুমে চল মিষ্টি নিতে।’

-‘সাইন্টিস্টকে বিয়ে করেছি। তার এত এত টাকা। মিষ্টি ছাড়া বাপের বাড়ি গেলে কেমন দেখায় না? আপনি বরং মিষ্টিটা এখানেই দিয়ে দেন।’

তার শয়তানি মতিগতি বুঝে শুদ্ধ এবার প্রচণ্ড বিরক্ত
হলো। রাতে ফিরে শীতলকে রুমে না পেয়ে রেগে
আছে যদিও। এখন আবার সকাল সকাল জ্বালাতে
শুরু করেছে। তবে রান্নাঘরে মা চাটীদেরকে দেখে
কিছু বলতে পারছে না। তবুও ধমকে বলল,

-‘সকালবেলা পড়তে বসা যায় না? এখানে কি, যা
পড়তে বস।’

সিঁড়ির কাছে ওদের ঝগড়া করতে দেখে সিঁতারার
খেয়াল করলেন। তিনি সিদ্ধ ডিমের খোসা ছাড়াতে
ছাড়াতে বললেন,

-‘কি রে শুদ্ধ সকালবেলা ধমকাচ্ছিস কেন
মেয়েটাকে?’

পালানোর পথ পেয়ে শীতল সিঁতারার কাছে গিয়ে
মলিন মুখে বলল,

-‘বড় মা তোমার ছেলেকে মিষ্টি কিনে দিতে বলো।’

-‘সকালবেলা মিষ্টি কি করবি?’

-‘বাপের বাড়ি বেড়াতে যাব। নতুন নতুন বিয়ে
হয়েছে খালি হাতে যাওয়া যায় নাকি? মান-সন্মানের
একটা ব্যাপার না? ‘একথা শুনে সিমিন পরোটা
বেলতে বেলতে থেমে গেলেন। শুদ্ধর দিকে একবার

তাকিয়ে পুনরায় তাকালেন শীতলের দিকে। না
চাইতেও হেসে ফেললেন তিনি। উনাকে হাসতে দেখে
শুদ্ধ তাকালে চোখাচোখি হলো।

মুখে না বললেও উনার হাসির মানে শুদ্ধ ঠিকই
বুঝল,

-‘ বাঁধা দিয়েছিলাম বলে ভিলেন বানিয়েছিলে না?
বেশ হয়েছে। পাজি মেয়েকে করো বিয়ে, আরো
করো, আর সারাজীবন জ্বলতে থাকো।’ শুদ্ধ আর
দাঁড়ালোই না গটগট করে সিঁড়ি বেয়ে রুমের দিকে
হাঁটা ধরল।

তবে তার কানে ঠিকই পৌঁছাল মা-চাচীদের খিলখিল
হাসির শব্দ। সেও বোধহয় মুচকি হাসল। অতঃপর
শাওয়ার নিয়ে বের হতেই দেখে রুমের দুষ্ট মালকিন
এসে হাজির। হাতে কফির মগ। সে তোয়ালে মেলে
দিয়ে হাত বাড়িয়ে মগটা নিয়ে সেন্টার টেবিলের
উপর শব্দ করে রেখে দিলো। তারপর দুকদম এগিয়ে
বিনাবাক্যে শীতলকে বাহুডোরে জড়িয়ে নিলো।

কতদিন পর! মনে হচ্ছিল এক একটা দিন নয় বছর
কাটাচ্ছে। বুকটাও যেন খাঁ খাঁ করা শূন্য মরুভূমিতে
পরিণত হয়েছে। এইটুকু দেহের মেয়েটা

দেশের বাইরে গিয়েও তাকে শান্তি দেয় নি।
চারিদিকে সবই ছিল অথচ শান্তি ছিল না। কেমন
শূন্যতা ভাব। এখন যেমন শান্তিতে বুক ভরে গেছে
এই শান্তিটাই খুঁজে মরছিল। ভেতর ভেতর পাগলপ্রায়
হয়ে উঠেছিল এই

ছোঁয়াটুকু পাওয়ার জন্য। শীতলের কম্পিত হাতটাও
তখন উঠে এসেছে শুদ্ধর পিঠে। তখন হাতের
বাধনটা দ্বিগুন শক্ত করে বুকের সাথে পিষে ফেলার
পরিকল্পনা করল যেন বুকের মালিক। ব্যথা পেলেও
শীতল চুপ করে রইল। ঠোঁটে লাজুক হাসি। চোখে
একরাশ খুশি। এত ভালোলাগা, আনন্দ, কখনোই
লাগে নি বিশেষ করে এই মানুষটার আগমনে। আগে
বহুবার দেশের বাইরে গেছে এমনটা লাগে নি। তবে
কী বৈধ সম্পর্কের টান নাকি এটা? নাকি তীব্র
ভালোবাসার ফল? তাকে চুপ থাকতে দেখে সেভাবেই
দাঁড়িয়েই শুদ্ধ বলল,

-‘এভাবে চেপে ধরে মেরে ফেলি?’

-‘আপনার বুকে মাথা রেখে যদি মরতে পারি তবে
আমার মরণ সই।’-‘এভাবে চেপে ধরে মেরে ফেলি?’

-‘আপনার বুকে মাথা রেখে যদি মরতে পারি তবে আমার মরণ সই।’

-‘মুখস্থ করে এসেছিস?’

-‘কি?’

-‘প্রেমমাখানো রসালো উক্তি-যুক্তি।’

-‘ওসব আগে মুখস্থ করা লাগত এখন আর লাগে না।’

-‘কেন লাগে না?’ শীতল জবাব দিলো না তবে সেও হাতের বাঁধন শক্ত করল। শক্ত বাঁধনে

কিছু বোঝাতে চাইল। শুদ্ধর ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি।
বুকে শান্তি। মনে

অন্যরকম তৃপ্তি। এ হাসি যে প্রাপ্তির হাসি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যে মেয়েটা একদিন বোকামি করে ভালোবাসা শিখতে চেয়েছিল। তাকে ভালোবাসা চেনানোর আবদার করেছিল আজ সেই নিগূঢ় ভালোবাসায় আক্রান্ত রোগী। যে প্রতিশোধ নিতে তার দেহের রন্ধে-রন্ধে তীব্র প্রেমের জীবাণু ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল আজ তার দেহে একই প্রেমের জীবাণুর বসবাস। চঞ্চল, অধৈর্য্য মেয়েটা তাকে সহ্য করতে পারত না আজ সেই যেন তাকে চোখে হারায়। যে

চাইত না সে কখনো বাড়ি আসুক সময়ের জাদুবলে
আজ সেই তার অনুপস্থিতিতে কাঁদে। অপেক্ষা করে
সে কখন বাড়ি ফিরবে। কাছে টানবে। বুকে জড়াবে।
নরম স্পর্শে ছুঁয়ে দেবে। ছুঁয়ে দিলে আবার লজ্জায়
নুঁইয়ে পড়বে। কিছুদিন আগে বোকা বোকা কথা বলা
মেয়েটা তার জন্যই ইয়াসিরের মতো লোকের কাছে
বুদ্ধি খাঁটিয়ে নিজেকে সেভ করার চেষ্টা করেছিল।
বিপদে পড়ে ব্যাকুল সুরে বিশুদ্ধ পুরুষকেই মনে
প্রাণে পাশে চেয়েছিল। তার বুকে ঠাঁই চেয়েছিল।
বুকের ভেতর লুকিয়ে থাকতে চেয়েছিল। এমনকি
তাকে বাঁচাতে ভীতু মেয়েটা দুঃসাহসিক ভাবে নিজেও
গুলির সামনে দাঁড়িয়েছিল। আহত হয়েছিল।
হসপিটালের বেডে শুয়ে অন্যের পুরুষের স্পর্শ মুছতে
নিজে সম্পর্কের বৈধতা চেয়েছিল। তাও কেঁদে কেঁদে
ব্যাকুল সুরে জোর খাঁটিয়ে। অথচ এই মেয়েই রুবাব
আর সায়নের কথায় মিথ্যা ভালোবাসার দাবি নিয়ে
তার নামের কলঙ্ক মাখতে এসেছিল। কাঁপা কাঁপা
গলায় বলেছিল, ‘ শুদ্ধ ভাই, আমি যদি আপনার নামে
দু’একটা কলঙ্ক মাখি আপনি কী খুব রাগ
করবেন?’নিঃসন্দেহে চমৎকার আবদার! কিন্তু

ভালোবাসার কলঙ্ক মাথা কী এতই সহজ? সেদিন
ভীষণ রাগ হয়েছিল তবে সঠিক সময়ে তার ব্যাঙাচি
যে তাকে সবার সামনে চেয়েছে নিয়েছে, দখল করে
নিয়েছে জোর খাঁটিয়ে অধিকার দেখিয়ে। বুঝিয়ে
দিয়েছে সেও পারে। এখন যে তার বুকের বাঁ পাশে
মাথা রেখে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে। মুখখানা এমন
যে কিছুটা জানে না। অথচ বাইরের দেশে গিয়ে
একদন্ড শান্তি দেয় নি। বুকের মধ্যে গেঁড়ে বসে
খোঁচাতেই ছিল। কখন এভাবে বুকে টেনে পারবে এ
আশায়

ভেতর ভেতর অস্থির হয়ে যাচ্ছিল। এসব ভেবে শুদ্ধ
একবার তাকাল শীতলের দিকে। শীতল চোখজোড়া
বন্ধ করে কী ভাবছে কে জানে তবে মুখে অদ্ভুত এক
শান্তির ছাপ। ঠোঁটে খেলেছে মিষ্টি হাসি। তাকে
হাসতে দেখে শুদ্ধ তার মাথায় থুতনী ঠেকিয়ে আদুরে
সুরে বলল,-‘রাতে রুমে থাকতে বলেছিলাম না?’

-‘হুম।’

-‘তাহলে পেলাম না কেন?’

-‘ডিনার সেরে রুমে আসার সময় আম্মু ডেকেছিল।
গিয়ে দেখি আম্মু বাবার সঙ্গে ভিডিও কলে কথা

বলছে। আমিও বাবার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে শুয়ে
গেম খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জেগেছি
ফরজের আজানের অনেক পরে।’

-‘তখন আসা হলো না কেন?’

-‘এসেছিলাম, পাই নি ততক্ষণে জগিংয়ে বেরিয়ে
পড়েছিলেন।’

-‘পূর্ণের কাজ করেছেন। আমাকে জাগা রেখে
বেয়াদবের মতো ঠিকই ঘুমিয়েছিস কিন্তু আমার
একফোঁটাও ঘুম হয় নি। এখন চলুন আপনাকে নিয়ে
ঘুমাব।

একথা শুনে শীতল নিজেকে ছাড়িয়ে একলাফে দুপা
পিছিয়ে বলল,-‘নাস্তা তাহলে রুমে আনি? খেয়ে
ঘুমান। একটু পরেই আমরা বের হবো। আপনি
উঠতে উঠতে ফিরে আসব।’

-‘ফিরে আসব মানে? কোথায় যাবি?’

-‘পার্লারে। কদিন পরেই অনুষ্ঠান না? একটু ফেসিয়াল
করব, চুল কাটব, পেডিকিওর-মেনিকিউর করব।
ফেসিয়াল না করলে তো মেকাব বসবে না ঠিকঠাক
মতো।’

-‘গিয়েই দেখেন আমিও আপনার পিঠের উপর ইচ্ছে
মতো চ্যাকাঠি ভাঙ্গব। মেকাবই করতে দেবো না
আসছে আবার ফেসিয়াল টেসিয়ালের গীত
নিয়ে।’-‘মানে কি! তাহলে কি আমি সাজব না?’

-‘বিবাহিত মেয়ের এত সাজগোছ কিসের?’

একথা শুনে শীতল বেশ বিরক্ত হলো আগ-পিছ না
ভেবে বেশ গর্ব করে বলল,

-‘মোটোও আমি বিবাহিত না আমি পিওর সিঙ্গেল।’

-‘ওহ্ আচ্ছা! আমার ল্যাবে সিসি ক্যামেরা আছে
জানেন? একরাতের

কিছু মিছুর ফুটেজ আছে কী না আসুন দু’জন মিলে
একসাথে চেক করে দেখি।’

শীতলের মুখটা ফাঁটা বেলুনের মতো একেবারে চুপসে
গেল। একরাশ লজ্জা পেলো। তবে সেটা প্রকাশ না
করে খুটখাট করে এটা ওটা নাড়তে লাগল। ঘুরে
ঘুরে দেখতে লাগল হাতের কাছে থাকা জিনিসপত্র।

শীতল মুখ ভেংচি দিলো। বারণ শুনলে তো? সে বড়
মাকে পটিয়ে ঠিক ম্যানেজ করে ফেলেবে। তাই তর্কে
না গিয়ে জানালার পর্দা সরাতে সরাতে বলল,-‘আমার
কিছু মিছু চাই।’

শুদ্ধ গ্লাসে পানি ঢালতে ঢালতে তাকাল একবার।
অনুষ্ঠানের অজুহাতে আজ থেকে তার পকেট ফাঁকা
করার যত রকমের ধান্দাবাজি করা যায়, করবে এই
মেয়ে। কোনো জবাব না পেয়ে শীতল ড্রেসিংটেবিলের
উপরে থাকা টুকটাক জিনিসপত্র গুছাতে গুছাতে
বলল,

-‘ শুদ্ধ ভাই শুনুন না?’

মুখ দিয়ে কথাটা বলতে দেরি তড়িৎ শীতলকে ঘুরিয়ে
ঠোঁট আঁকড়ে ধরে কামড় বসাতে দেরি হলো না
শুদ্ধর। শক্ত এক কামড় বসিয়ে ছেড়ে দিয়ে বলল,

-‘ বুঝি নি কি বললি যেন? ভাই না কী যেন একটা?
এই ওয়েট ওয়েট কে তোর ভাই?’

শীতল হতভম্ব। ঠোঁটে তীব্র ব্যথা অনুভূত হতেই ঠোঁট
চেপে ধরে বিষ্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইল। চোখ ছলছল
করছে। ঠোঁটটা বুঝি কেঁটেই ফেলেছে

অসভ্য, পাজি পুরুষটা। শুদ্ধ এবার তাকে আরেকটু
কাছে টেনে কোমর জড়িয়ে ধরে কায়দা করে ভ্রুঁ
জোড়া নাচিয়ে বলল,-‘মিসেস এবার বলুন দেখি আমি
আপনার কে? এখনো ভাই হই? সেদিন বললাম না
ভাই না ডাকতে? আমাদের সম্পর্কের বদল ঘটেছে

আমার কদিনের অনুপস্থিতিতে ভুলে গিয়েছেন? কাছে আসুন দেখি আবার মনে করিয়ে দেই।’

একথা বলে তাকে কাছে টেনে বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে গলায় মুখ ডুবাবেই শীতল ছটফটিয়ে উঠল। শুদ্ধকে সরানোর বৃথা চেষ্টা করতে করতে সে আমতা আমতা করে বলল,

-‘ ইচ্ছে করে বলি না তো। পুরনো অভ্যাস মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়।’

শুদ্ধ সেভাবে থেকেই তার কাঁধে গলায় ঠোঁটের স্পর্শ দিয়ে জবাব দিলো,

-‘ চ্যাপকাঠের বারি খেলে আর মুখ ফসকাবে না। দেই বারি? দেখি কাজ করে কী না?’ শীতল জবাব দিলো না চোখ মুখ খিঁচে অনড় হয়ে রইল। খুব কাতুকুতু লাগছে। তাকে চুপ থাকতে দেখে শুদ্ধ মুখপানে তাকাল। এতক্ষণ কিছু না বুঝলেও এবার খেয়াল করল শীতলের স্বাস্থ্য বেড়েছে। ফোলা ফোলা গাল দুটো টসটস করছে। অসুস্থতায় অনেকটাই শুকিয়েছিল। এখন তো জীবন্ত পুতুলের মতো আদুরে লাগছে। নাকি এতদিন পর দেখছে বিধায় এত কিউট লাগছে? আচ্ছা ঠোঁটে নেশা মিশিয়েছে নাকি কম্পিত

ঠোঁট জোড়া এত টানছে কেন? একটু ছুঁয়ে দেখবে?
কিন্তু এই মেয়ের যা হাল মনে হচ্ছে আর একটু ছুঁলে
লজ্জায় নুঁইয়ে গলে পড়বে। আজ এই প্রথম শুদ্ধকে
মুগ্ধতা নিয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে শীতল হাত দিয়ে
তার চোখ দুটো ঢেকে ফেলল। এ দৃষ্টি ঘায়েল করা।
শুদ্ধ তার হাত সরিয়ে আবার তাকাল। তখন শীতল
মিষ্টি করে আবদার জুড়ে বসল,-‘ সারাদিন ঘুরব।
বাইরে খাব। ব্যস্ততার অজুহাত শুনব না। আজকের
দিনটা আমাকে দিতেই হবে।’

শীতলের আবদার শুনে শুদ্ধ কেমন করে যেন হাসল।
ভ্রাঁ বাঁকিয়ে বলল,

-‘ তবে আমারও একটা শর্ত আছে?’

-‘কি?’

-‘ আজকে দিনটা আমি তোর নামে লিখে দিচ্ছি তুইও
আজকের রাতটা আমার নামে লিখে দে? বুঝে শুনে
দিস কিন্তু! ‘

শুদ্ধর কথার মানে বুঝতে সময় লাগল না শীতলের।
গালে রক্তিম আভা আরো গাঢ় হলো। জোড়াজুড়ি
করে কোনোমতে শুদ্ধকে সরিয়ে রুমের বাইরে যেতে

যেতে বলল,-‘মোটোও না। নাস্তা করতে আসুন আটটা বেজে গেছে।’

একথা বলে শীতল একপ্রকার পালিয়ে বাঁচল। শুদ্ধ তাকে যেতে দিলেও তার দৃষ্টি শীতলের যাওয়ার দিকে নিবদ্ধ। ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি। পালিয়ে আর যাবে কোথায়? ঘুরে ফিরে গন্তব্য তো ওই একটায়_শোয়াইব শুদ্ধ।

এদিকে ঘড়ির কাঁটা টিকটিক করতে করতে আঁটের ঘরে নিশ্চল। একে একে সকলে হাজির হলেও রুবাব, ঐশ্বর্য এখনো অনুপস্থিত। শুদ্ধ নিচে নেমে চেয়ার টেনে বসল। রুবাব আর ঐশ্বর্য বাইরে গেছে শুদ্ধই জানাল।

তখন রান্নাঘর থেকে সিদ্ধ ডিমের বোল এনে শুদ্ধর পাশে বসল শীতল।

সিঁতারা সবাইকে খাবার বেড়ে দিলেন। সিঁতারা, সিমিন রান্নাঘরে পরোটা বেলে ভাজছিলেন দেখে শুদ্ধ বলল,

-‘আম্মু, ছোটো আম্মু এখানে এসো আমার কিছু বলার আছে।’তার কথা শুনে সবাই তাকাল। মনোযোগী হলো কী বলে শুনতে। সিঁতারা

সিমিন চুলা অফ করে এসে দাঁড়ালে শুদ্ধ তাকাল শখ,
স্বর্ণ ও শীতলের দিকে। বুঝতে বাকি রইল না ওদের
তিনবোনকে কিছু বলবেন। তাই ওরা
মনোযোগীশ্রোতা হলো। তখন শুদ্ধ বলল,
-‘জীবনে এমন কিছু সময় আসে পরিস্থিতি বুঝে
ভীষণ শখের জিনিসও ত্যাগ করা লাগে। সেই ত্যাগ
কখনো হয় নিজের জন্য কখনো বা পরের জন্য।
আমি জানি তোমরা বুঝদার। তবুও আমার মনে হলো
তোমাদের কিছু কথা বলা উচিত। কদিন পরে
বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান। আত্মীয়ের আনাগোনা শুরু
হবে কাল পরশুতে। তোমরা দুজন বাড়ির মেয়ে
থেকে বউ হবে। সম্পর্কের বদল ঘটবে। ধীরে ধীরে
দায়িত্ব বাড়বে। আর দায়িত্ব কাঁধে নিতে গেলে আগে
সু-বিবেচক হওয়া জরুরি।’একথা শুনে শারাফাত
চৌধুরী স্নেহের দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকালেন।
শুদ্ধও ওইটুকু বলে থামল। তারপর পুনরায় বলল,
-‘কিছুদিন আগে ঐশ্বর্যের সঙ্গে কী ঘটেছে কারো
অজানা নয়। মেয়েটা যে বেঁচে আছে এটাই আমাদের
কাছে বিশাল পাওয়া। তবে ডাক্তারের কথা অনুযায়ী
সে কোনোভাবেই আগামী তিনমাস মেকাব জাতীয়

কিছু ক্ষিণে ব্যবহার করতে পারবে না। এতে ক্ষিণের
নানান জটিলতা বাড়বে। ইনফেকশনও দেখা দিতে
পারে। বিয়ে হচ্ছে বলে এ রিস্ক নেওয়ায় যাবে না।
নেওয়ার প্রশ্নই আসে না কারণ সাজগোছের থেকে
একটি জীবনের মূল্য অনেক। মোদাকথা, বাড়ির তিন
ছেলের বিয়ে একসাথে। দুই বউ সাজবে আরেকজন
সাজবে না। অথচ সে পাশাপাশি বসে থাকবে। সব
রিচুয়াল একসাথে পালন করবে। তখন তার
সাদামাটা লুকের ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু দেখাবে।
রিলেটিভরা প্রশ্ন তুলতে পারে। ঐশ্বর্য যথেষ্ট
ম্যাচিউর। তবে তার মানসিক অবস্থা আগের মতো
স্ট্যাবল নেই। তো আমি চাই তোমরাও কোনোপ্রকার
মেকাব ছাড়া বউ সাজো। মেকাব ছাড়া কী বউ সাজা
যায় না? স্নিগ্ধ কোনো সাজে বিয়ে করা যায় না? বিয়ে
তো পবিত্র বন্ধন। মেকাব আর ভরি ভরি স্বর্ণ দিয়ে
সাজলেই বিয়ের পূর্ণতা পায় তা
কিন্তু নয়। আজকাল সবাই ট্রেন্ডে গা ভাসায়। আমরা
অন্যকিছু করি? অন্যকিছু ভাবি? সবার যা করবে
আমাদেরকে কেন সেটাই করতে হবে? মূলত এসব
নানান কথা ভেবেই রুবাব বিয়েতে রাজি হচ্ছিল না।

আবার বোনদেরও বলতে পারবে না বিশেষ একটি দিনে সাজগোছ না করতে। ঐশ্বর্যও মেয়ে। তারও হয়তো বিশেষ দিন নিয়ে কিছু ইচ্ছে ছিল। কিন্তু..!’শুদ্ধ থেমে যেতেই শতরূপা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন শুদ্ধর দিকে। চোখের পানিতে শুদ্ধর মুখটা বড্ড ঝাপসা দেখাল। বয়সে বড় না হলে উনি শুদ্ধর পা জড়িয়ে কেঁদে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। রুবাব যে এই নিয়ে চিন্তিত উনিও জানেন। উনার চোখের পানি খাবারের সাথে মিশে যাচ্ছিল। সেটা দেখে সিমিন ননদের কাঁধে হাত রাখতেই শতরূপা দ্রুত নিজেকে সামলে নিলেন। তখন স্বর্ণ বলল,-‘আমাদের কোনো সমস্যা নেই ভাইয়া। এমনিতেও আমরা কখনো ভারী মেকাব করি নি। ওসবে তেমন অভ্যস্তও নই। আমাদের শীতল সাজতে পছন্দ করে তবে সেটাও সাধারণভাবে লিমিট রেখে। ও তো ছোট মানুষ

পরিস্থিতি অনুযায়ী আশা করি সেও বুঝবে।’

শীতলও সম্মতিসূচক মাথা নাড়াল। হাসি মুখে বলল,

-‘আমারও কোনো সমস্যা নেই।’শুদ্ধ এবার সায়নের দিকে তাকাতেই সায়ন হেসে ফেলল। ধীরে ধীরে পরোটা চিবাতে চিবাতে বলল,

-‘ রুবাব যে আসলেই গাধা সেটা আমরা সবাই জানি। এই সামান্য একটা ব্যাপারে প্যারা খাওয়ার কিছু দেখছি না। তাছাড়া চৌধুরী বাড়ির মেয়েরা মায়েরা যে যার মতো সুন্দর একথা গর্ব করে বুক ফুলিয়ে বলতে পারি।

ঐশ্বর্যও তার নামের মতো সুন্দর একথা সত্য। এক্সিডেন্টে যে একেবারে তার সৌন্দর্য খুঁয়ে গেছে তাও নয়। তাই ওসব বালছাল না মাখলে আমার বউ-বোনদের কিছু আসবে যাবে না। তাছাড়া কেউ কেউ তো না সেজেই আমাদের অবস্থা যা তা করে ফেলেছে। ভাই তুইও আহত হয়ে ব্যান্ডেজ ট্যান্ডেজ নিয়ে হসপিটালে বিয়ের ফুল ফুটিয়ে ষোলো ষোলো বত্রিশকলা পূর্ণ করে ফেলেছিস। সাজগোছহীন রূপের যে এত পাওয়ার সেটা ওদের বিয়েতেই প্রমাণ পেয়েছিস।’শেষ কথাটা সে শুদ্ধর উদ্দেশ্যের বলে দাঁত বের করে হাসল। তার কথা শুনে স্বর্ণ টেবিলের নিচ দিয়ে চিমটি কাটলেও থামল না। বরং বলল,

-‘তাছাড়া বাসর ঘরে ঢুকে বউ আনবক্সিং করা আরেক প্যারা। সাজের ঝামেলা না থাকলেই বরং ভালো হবে। ‘

সায়নের লাগামছাড়া কথা শুনে সাফওয়ান চৌধুরী এবার গলা খাঁকারি দিলেন। বোঝালেন উনারা উপস্থিত আছেন। তবে উনার গলা খাঁকারির শব্দে সায়ন থামল না। ঘাড় ঘুরিয়ে উনার উদ্দেশ্য বলল,

-‘ উহুম উহুম করছো কেন? এমন ভাব করছে যেন তুমি বউ আনবক্সিং করো নি। তোমার জমজ ছানাপোনা উড়ে উড়ে এসেছে।’সাফওয়ান চৌধুরী বুঝলেন ভুল মানুষকে থামতে বলেছেন। যে একবার কাউকে বাঁশ দিতে শুরু করলেন স্টকে থাকা বাকি বাঁশ অন্যদের ঘাড়ে ঝুলিয়ে দেয়। তাদের কথা থামিয়ে এবার শারফাত চৌধুরী জানালেন,

উনি ১৪ই নভেম্বর বিয়ের ডেট ঠিক করেছেন। অর্থাৎ হাতে আছে মাত্র এগারোদিন। এই কদিনের মধ্যে সব আয়োজন করতে হবে। তিন ছেলের বিয়ে কোনো কিছু কমতি রাখা যাবে না। যাতে কমতি না থাকে এজন্য প্রত্যেক সদস্যকে কাজ ভাগ করে দিলেন। নাস্তার টেবিলে ভিডিও কলে কথা হলো শাহাদত

চৌধুরীর সঙ্গে, উনি বললেন সামনে সপ্তাহে ছুটিতে আসবেন। বিয়ের কার্ডও চলে এসেছে। আমন্ত্রণের কাজও শুরু হয়েছে।

শুদ্ধ নাস্তা সেরে রেডি হয়ে বের হতে গেলে শীতল ঠোঁট উল্টে তাকাল। তখন শুদ্ধ চোখের ইশারায় বোঝাল রাতের বাইকে করে ঘুরবে। একথা শুনে শীতল কিছু বলল না স্বর্ণের সাথে কি একটা দেখতে লাগল। শুদ্ধ

কিছু কার্ড নিয়ে বের হলো। সব ফ্রেন্ডদের একে একে কার্ড পৌঁছে দিয়ে গেল অর্কের বাসায়। অর্কের ফোন করে রিসিভ না করায় ভেতরে ঢুকতে হলো। তাকে দেখে অর্কের মা হাসি মুখে কথা বললেন। সবার খোঁজখবর নিলেন। অর্কের খোঁজ করলে জানালেন অর্ক ঘুমাচ্ছে উঠে নি এখনো।

কাজের মেয়ে একগাদা নাস্তা এনে রাখল সেন্টার টেবিলের উপর। অর্ক যেহেতু ঘুমাচ্ছে তাই তাকে ডাকতে নিষেধ করল শুদ্ধ। পরে কথা বলে নেবে বলে বিয়ের কার্ড দিয়ে ধরিয়ে দিয়ে উঠতে গেলে তাকে থামিয়ে দিলেন। স্নেহের সুরে বললেন,- ‘শুদ্ধ, তোমার সাথে কিছু কথা ছিল। আমি ভেবেছিলাম

তোমাকে কল করব। কিন্তু নাম্বার না থাকায় কল করতে পারছিলাম না তাছাড়া তুমিও দেশের বাইরে ছিলে।’

-‘কোনো সমস্যা আন্টি?’

-‘সমস্যা তো বটেই। আর প্রধান সমস্যা হলো তোমার বন্ধুকে নিয়ে।’

-‘কি হয়েছে ওর?’

-‘এতদিন বিয়ের জন্য রাজি হচ্ছিল না। বলত মেয়ে পছন্দ না। আমার

চেনাজানার মধ্যে একটা মেয়ে দেখেছি। সবমিলিয়ে দুটোকে মানাবেও বেশ। কিন্তু তোমার জন্য কথা এগোতে দিচ্ছে না।’-‘আমার জন্য? আমি ঠিক বুঝলাম না আন্টি।’

উনার এবার ছেলের বয়সীর শুদ্ধর হাতটা টেনে নিলেন। মমতাময়ী সুরে বললেন,

-‘আমি যে অর্কের স্টেপ মাদার তুমি তো জানো বাবা। তবে আমি কিন্তু নিজে হাতে ওকে মানুষ করেছি। আমার সঙ্গে ওর সম্পর্ক ফ্রেন্ডলি তাও জানো। কথা হচ্ছে, আমি ছেলের বিয়ে দিতে চাই। এজন্য তোমার হেল্প লাগবে। গতমাসে আমরা

সিঙ্গাপুর চলে যাব এর আগে বিয়েটা সারতে পারলে
আমার চেয়ে খুশি আর কেউ হবে না।’

শুদ্ধর মনে এবার খটকা লাগল। বিশেষ করে কথা
বলার ধরণে। কারণ

স্বর্ণ-সায়ন আর শীতল-শুদ্ধর বিয়ের কথা প্রায়ই
জানাজানিও হয়েছে।

আর অন্যের বাড়ির মেয়ে নিলে তাকে এভাবে বলার
কারণ দেখছে না।

তাকে বলছে মানে স্বর্ণ, শীতল বাদে শখ বাকি আছে।

আচ্ছা উনি কি কোনোভাবে শখের কথা বলতে
চাচ্ছেন? শুদ্ধর ভাবনা শেষ না হতেই

উনি বললেন,-‘শখের দায়িত্ব কী কোনোভাবে আমার
ছেলেকে দেওয়া যায় না, বাবা? তোমার বন্ধু কেমন
তুমি তো ভালো করেই জানো।’

শুদ্ধর জবাব দিলো না। অর্ক চোখ ডলতে ডলতে এসে
দাঁড়াতেই শুদ্ধর উঠে দাঁড়াল। অর্কের মায়ের উদ্দেশ্যে
বলল,

-‘ভেবে জানাব।’

একথা বলে অর্কের দিকে না তাকিয়ে শুদ্ধর পা
বাড়াতেই অর্ক হতবাক হয়ে বলল,

-‘আরে ভাই কি হয়েছে? রেগে আছিস কেন?’

শুদ্ধ এবার ঘুরে তাকিয়ে অকপটে বলে বসল,

-‘শখকে পছন্দ করিস? সোজাসাপটা কথা বল।’

-‘ শখ? এর মধ্যে শখ এলো কোথা থেকে?’-‘যদি সৎ সাহস থাকে তাহলে আজ সন্ধ্যার পর পরিবার নিয়ে আসিস। সেখানে বসেই ফাইনাল কথা হবে। আর যদি না আসিস তাহলে আমার বোনকে নিয়ে অযথা টানাহেঁচড়া করার দুঃসাহস দেখাস না। আসছি।’

একথা বলে শুদ্ধ বেরিয়ে গেল। তার কথার আগামাথা না বুঝে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল অর্ক। তবে মায়ের দিকে তাকিয়ে বুঝতে বাকি রইল না মূল ঘটনা। করুণ সুরে বলল,

-‘ আর কতবার বলব শখকে আমি যেভাবে কখনো দেখি নি। তোমার কসম, শখকে নিয়ে আমার মনে কোনো ফিলিংস নেই। তবুও কেন শুধু শুধু পাগল ফ্রেপালে, মম? এখন কি হবে বুঝতে পারছো তুমি?’-‘ আর কতবার বলব শখকে আমি যেভাবে কখনো দেখি নি। তোমার কসম, শখকে নিয়ে আমার মনে কোনো ফিলিংস নেই। তবুও কেন শুধু শুধু

পাগল ক্ষেপালে, মম? এখন কি হবে বুঝতে পারছো
তুমি? তাছাড়া

শুদ্ধই বা কি ভাবল?’

-‘ভুল কি করেছি? ঠিক ভুল যেটাই হোক আমরা
সন্ধ্যায় যাচ্ছি, ব্যাস!’

-‘তুমি বুঝতে পারছো না কেন আ..আম।’

-‘তোমার বুঝার তুমি বুঝ আমি শখকেই তোমার বউ
বানাব। ওর মতো কিউট একটা মেয়ে চোখের সামনে
থাকলে চোখেরও শান্তি। ‘-‘আমার টেনশন হাই করে
দিয়ে তুমি শান্তি খুঁজছো? শুদ্ধকে জানানোর আগে
আমাকে জানাতে পারতে? ধুর ভাল্লাগেনা, এখন শুদ্ধ
কে বোঝাব কি করে এসবের আগে-পিছে আমি
নেই।’

একথা বলে অর্ক দ্রুতপায়ে বের হলেও শুদ্ধর নাগাল
পেল না। দিশেহারা হয়ে ছুঁটল রুমের দিকে। চার্জে
দেওয়া ফোন হাতে তুলে কল করল তার বিপদের
সঙ্গীদের। কামরান কল রিসিভ করলে এড করল
হাসান, স্যান্ডি আর হাসানকে। কামরান তখন অর্কের
চুপসানো মুখে দেখে বলল,-‘কি রে মামা সকাল

সকাল খুব কষে গেছে? আসব নাকি পানের বোটা নিয়ে?’

কামরানের কথা শুনে বাকিরা হাসল। অন্যসময় হলে অর্কও ফাজিলামি করত কিন্তু এখন টেনশনে ঘামতে শুরু করেছে। রীতিমতো সব গুলিয়ে যাচ্ছে। শখকে নিয়ে তার মনে যদি সামান্যতরও ফিলিংস থাকত তাহলে

খুশিতে নাচত। কিন্তু সেরকম কিছুই না। বরং মেয়েটার বিয়ে ভাঙা নিয়ে যেমন খারাপ লেগেছিল তেমনি ভুল মানুষের হাত থেকে বেঁচে ফিরে খুব খুশি হয়েছিল। তাছাড়া শুদ্ধ বোনদের নিয়ে বরাবরই পজেসিভ। বোনকে নিয়ে কোনো ধরনের মজা পছন্দ করে না তাই তারাও এমনকিছু করত না। সেখানে তার মা তাকে না জানিয়ে শুদ্ধকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসে আছে। একপ্রকার লজ্জাও লাগছে। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, এখন যদি সে বিয়েতে না বলে তাহলে শুদ্ধ ভাববে সে শখকে নিয়ে মজা লুটেছে।

আবার যদি রাজি হয় তাহলে হয়তো ভাববে আগে থেকে শখকে পছন্দ করত। এখন দুদিকেই বিপদ! অর্ককে অন্যমনস্ত হয়ে পায়চারি করতে দেখে তখন

স্যাণ্ডি বলল,-‘কি হয়েছে বন্ধু? এত টেনস্ দেখাচ্ছে কেন?’

-‘ শুদ্ধ এসেছিল বিয়ের কার্ড দিতে।’

-‘তো?’

-‘তো আমি ঘুমোচ্ছিলাম। মম ওকে একা পেয়ে শখের জন্য বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। ‘

-‘শখ করে বিয়ের প্রস্তাব? শখ করে মানুষকে বাঘ পালতে দেখেছি, গাছ লাগাতে দেখেছি কিন্তু বিয়ের প্রস্তাব দিতে দেখি নি। বাহ্ ইউনিক ব্যাপার স্যাপার।’

-‘বাল, মজা নিস না তো। এখন কি করব বল?’

কামরানকে থামিয়ে এবার স্যাণ্ডি সিরিয়াস হয়ে বলল,

-‘কি হয়েছে ভাই ঝেড়ে কাশ দেখি।’-‘শুদ্ধর বোন শখ আছে না? মম ওর সাথে আমার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে তাও শুদ্ধর কাছে।’

একথা শুনে তিনজন একযোগে বলে উঠল,’ কিহ্! তারপর?’

-‘তারপর আর কি? শুদ্ধ আজ সন্ধ্যায় প্রস্তাব নিয়ে যেতে বলল। সেখানে ফাইনাল কথা বলবে। এখন আমি কি করে বোঝাব আমার মনে শখের জন্য

কোনো ফিলিংস নাই। এটা বলতে গেলে যদি রেগে যায়? ‘

এবার হাসান মুখ খুলল,-‘ এতে রাগার কি আছে? অবিবাহিত ছেলে-মেয়ের জন্য বিয়ের প্রস্তাব আসবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কথা হচ্ছে, আন্টি যখন চাচ্ছেন তাহলে তোর সমস্যা কি? এমন তো না তোর জীবনে স্পেশাল কেউ আছে। শখ যথেষ্ট ভালো সেটা তুই- আমি আমরা সবাই জানি। চৌধুরী বাড়ির মেয়ে নিয়ে কুটুক্তি করার প্রশ্নই আসে না। বড় কথা, পৃথিবীতে তুইও একমাত্র ছেলে না যে বন্ধুর বোনকে বিয়ে করতে যাচ্ছিস। এত হাইপার হোস না।’

হাসানের কথায় যুক্তি আছে দেখে অর্ক বলল,

-‘কিন্তু আমার সমস্যা শখ নয়;শুদ্ধ। আত্মীয়ের মধ্যে আত্মীয়তা করলে সম্পর্ক নষ্ট হয়। আর শুদ্ধর সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করার কথা ভাবতেও পারি না আমি।’

-‘যারা সম্পর্কের যত্ন নিতে জানে না তাদের সম্পর্ক নষ্ট হয়। আমাদের শুদ্ধ কেমন জানিস না তুই? আমার মতে রাজি হয়ে যা দিনশেষে ভালো একজন জীবনসঙ্গী পাবি।’-‘কিন্তু। ‘

-‘কোনো কিন্তু না রাজি হয়ে যা।’

-‘তোদের ছাড়া যাব না কিন্তু মার খেলে তোদেরকে নিয়ে খাব। সব কটা সন্ধ্যায় রেডি থাকবি, নো এক্সকিউজ।’

এভাবে বন্ধুদের সঙ্গে আরো টুকটাক কথা বলে অর্ক মায়ের কাছে গেল। মায়ের হাতের উপর হাত রেখে নিশ্চুপ হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে সুস্থ বলল,
-‘তুমি কি সিরিয়াস মম?’

-‘ইয়েস, মাই সন।’

-‘খুশি হবে?’

-‘ভীষণ!’-‘ভেবে বলো। আমি কিন্তু তোমাদের বউ-শাশুড়ির ঝগড়ার মধ্যে থাকব না। তোমরা কেউ আমাকে ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে জড়াতেও পারবে না।’

-‘জড়াব না।’

-‘তাহলে রেডি হও আজই রিং পরিয়ে আসবে। ফল, মিষ্টি, জামা-কাপড় যা যা লাগে সব নিতে হবে।’

ছেলের কথা শুনে অর্কের মা হেসে অর্কের চুলগুলো এলোমেলো করে দিলেন। ছেলে উনার কথা রাখায় খুশি হয়ে কপালে চুমু ঝঁকে দিলেন।

তারপর অর্ক রেডি হয়ে মাকে নিয়ে শপিং মলে গেল।

মা ও ছেলে মিলে

ঘুরে ঘুরে শপিং করল। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ শুদ্ধর সঙ্গে দেখা। শুদ্ধ তখন জুয়েলার্সের দোকান থেকে বের হচ্ছিল। হাতে কয়েকটা শপিং ব্যাগ। সে মূলত নতুন বউয়ের জন্য বানাতে দেওয়া গয়নাগুলোই নিতে এসেছিল।

শুদ্ধ রাগল না হাসিমুখে টুকটাক কথা বলল। তাকে স্বাভাবিক দেখে অর্ক যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। মায়ের দিকে একবার তাকালে অর্কের মা হাসি মুখে বললেন,-‘সন্ধ্যায় আসছি তাহলে।’

শুদ্ধ অর্কের দিকে তাকালে অর্ক এবার চোখ সরাল না। বরং হাসিমুখে সম্মতিসূচক মাথা নাড়াল। শুদ্ধ নিজেও হেসে তার বাঁ কাঁধে হাত রেখে ছোটো করে জবাব দিলো,

-‘আয়।’

তারপর বিদায় নিয়ে বের হতে গেলে অর্কের মাকে দোকানিকে বলতে শুনল,

-‘আমার ছেলের হবু বউয়ের জন্য রিং আর গলার চেইন দেখব। লেটেস্ট মডেলের কিছু দেখান।’

শুদ্ধ আর দাঁড়াল না নিজের কাজ সেরে বাড়ির পথে রওনা হলো। যেতে যেতে শারাদাত ও সাফওয়ান

চৌধুরীকেও বাসায় ফেরার কথা জানিয়ে নিজেও বাসায় ফিরল। শুদ্ধ বাড়ি গিয়ে সর্বপ্রথম শখকে ডাকল। ডাক শুনে শখের সাথে বাকিরাও এসে দাঁড়াল ড্রয়িংরুমে। তখন শুদ্ধ মায়ের হাতে আগে সমস্ত গয়না তুলে দিয়ে সায়নের দিকে তাকাল। বলল,-‘ সন্ধ্যায় অর্কের মা-বাবা শখ আর অর্কের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসবে।

অর্ককে তো সবাই চেনো আলাদা করে কিছু বলার নেই। আজ সকালে আমাকে জানিয়েছিল আমি বাসায় আসতে বলেছি। বড়রা সবাই মিলে সিধান্ত নিক। তাছাড়া এর আগে একটা এক্সিডেন্ট হয়েছিল সেটা নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। জীবন কারো জন্য থেমেও থাকে না বরং অল্পতে বেঁচে গেছি বলে লাখ লাখ শুকরিয়া।’

একথা বলে শুদ্ধ গলার স্বর খানিকটা নরম করে বোনকে ইশারা করে পাশে বসাল। তারপর বলল,
-‘এবার বল, তুই কি চাস? তুই হ্যাঁ বললে হ্যাঁ না বললে না। তোর বিয়ের জন্য আমাদের কোনো তাড়া নেই। আমাদের কাছে তোর সিধান্ত সবার আগে।’

শখ মিনমিন করে উত্তর দিলো,-‘তুমি আর সায়ন
ভাইয়া যা ভালো বুঝবে।’

-‘এটা কোনো কথা না। সংসার করবি তুই তোর যদি
মনে হয় অর্ক ছেলে হিসেবে পছন্দসই তাহলে কথা
এগোব নয়তো তারা এলে সুবিধা মতো কিছু একটা
বলে পাঠিয়ে দেবো।’

শখ এই ব্যাপারগুলোতে খুব লজ্জা পায়। নিজের
বিয়ের কথা মুখ ফুটে বলা যায়? তবুও সে বলল,
-‘তোমরা আমাকে সব সময় বেস্ট জিনিসটাই
দিয়েছো এবারও...।’

শুদ্ধ এবার মা-চাচীদের থেকেও মত জানতে চাইল।
উনারা মা উনাদের মত নেওয়া জরুরি। উনারা
একবাক্যে বলে দিলো অর্ককে ভীষণ পছন্দ।তার
বিশেষ গুন সে ভদ্র-সভ্য, শিক্ষিত, কর্মঠ ছেলে।
দেখতেও সুদর্শন।

সায়ন জানাল ছেলে হিসেবে ছেলেটা ভালো। সবদিক
দিয়ে শখের সঙ্গে যায়। এত এত কথার মধ্যে শীতল
হঠাৎ নক কাটতে কাটতে শুদ্ধর দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ল,
-‘সবার আগে আপনি আপনার মত জানান কারণ
বন্ধুটা কিন্তু আপনার। সে ভালো হলেও আপনার বন্ধু

নেশাখোর হলেও। তবে দুজনই যদি এক ঘাটের মাঝি হোন তাহলে আমরা মেয়ে দিবো কি না সেটা ভেবে দেখব।’

শুদ্ধ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল তার থেকে তিন হাত দূরত্বে সোফার হাতলে বসা শীতলের দিকে। শীতল ভেবেছিল ধমক দেবে কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে শুদ্ধ বলল,

-‘একসাথে চলি। একই পেশায় আছি। যথেষ্ট লয়্যাল। বন্ধু হিসেবে যেমন বেস্ট বোন জামাই হিসেবেও বেস্ট হবে, ইনশাআল্লাহ। ‘শীতল মজা করলেও শুদ্ধ তার কথাকে সন্মান করে সুন্দর ভাবে জবাব দিলো। কেননা মা-চাচীদের মতো সেও এখন চৌধুরী বাড়ির বউ। তার মত বা সিধান্তকে সন্মান জানাতে হবে। স্বামী যদি বউকে সন্মান না করে তাহলে অন্যরাও করবে না। শুদ্ধর মনোভাব বুঝে চৌধুরী গিন্নিরা একে অপরকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। খুশিও হলো। তারপর শুদ্ধ একবার শীতলের দিকে তাকিয়ে ফ্রেশ হতে চলে গেল। এ তাকানোর মানে বুঝে শীতলও সুযোগ বুঝে হাঁটা ধরল রুমের দিকে। একমাত্র বর বলে কথা তার ডাক কি অমান্য করা সাজে?এরপরের

সময়টা যেন দ্রুতই কেটে গেল। সন্ধ্যার পর
কামরান, স্যাভি, হাসান, অর্ক ও তার বাবা- মা
এলো। একেক জনের একেক কাহিনিতে হাসতে
হাসতে পেটে খিল ধরে গেল। মেয়ে দেখা নিয়ে
বাড়াবাড়ি কোনো

আয়োজন করা হয় নি। হঠাৎ বেড়াতে এলে যেমন
গল্প আড্ডা হয় ঠিক তেমন। এতে শখ কিছুটা হলেও
স্বস্তি পেলো। না চাইতেও অর্কের সাথে দু'একবার
চোখাচোখি হলো। দুই পরিবারের উপস্থিতিতে রিং
আর চেইন পড়ানো হলো। অর্কের মা খুব করে
ধরলেন শুদ্ধদের সঙ্গে শখ-অর্কের অনুষ্ঠানটাও সেরে
ফেলার জন্য। জোর গলায় বললেন, উনাদের কোনো
দাবী নেই। বরযাত্রী বিশ জনের বেশি আসবে না।
উনারা সামনের মাসে চলে যাবে তাই এই
তাড়াহুড়ো। তাছাড়া অর্ককে একা রেখে গেলে উনি
চিন্তায় থাকবে শখ থাকলে আর কোনো চিন্তায়
থাকবে না। অগত্যা দুই পরিবার মিলে রাজি হয়ে
গেল। উনাদের কথার মাঝে সবাই হইহই করে ছাদে
গেল। উদ্দেশ্যে হলো অর্ক আর শখকে সুযোগ করে
দেওয়া। তবে সবাই গেলে তো হবে না তাই দোতলা

অবধি গিয়ে বাকিরা ঢুকল শুদ্ধর রুমে। অর্কও ঢুকতে
গেণে শীতল তখন শখ হাত ধরে সিঁড়ির দিকে যেতে
যেতে বলল,-‘ভাইয়া আপনি আমার সাথে ছাদে আসুন
আজ আমাদের বাড়ির চাঁদ দেখাবেন। সবচেয়ে সুন্দর
চাঁদ। দেখলে মন প্রাণ সব জুড়িয়ে যাবে।’

অর্ক শীতলের কথার মানে বুঝে নিঃশব্দে হাসলে শখ
গাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অতঃপর তাদেরকে কথা
বলার সুযোগ করে দিতে ছাদে পাঠিয়ে

শীতল সিঁড়ি দিয়ে হ্রমুড় করে নামতে গিয়ে দেখল
মাঝ সিঁড়িতে শুদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে। যাক এসেছে
তাহলে। ভয়ে আর একটু হলে জ্ঞান হারাত।

শুদ্ধকে দেখে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে শুদ্ধর বুকে মাথা
রেখে জোরে জোরে হাঁপাতে লাগল। তার অবস্থা
দেখে শুদ্ধ আর কিছু বলল না কারণ সেই পাঠিয়েছিল
শখ- অর্ককে কথা বলার সুযোগ করে দিতে। তবে
সাহসের জাহাজ ব্যাঙাচির ভীতু রূপ দেখে খোঁচা
মারতে ভুলল না। অতঃপর সময়টা যেন তাড়াতাড়ি
কাটতে থাকল। হাতে গোটা দিন নাকি তাড়াতাড়ি
কাটে। তিন জোড়া বিয়ের জন্য যতটা না ব্যস্ততা ছিল
সেটা আরো দ্বিগুন হলো। তিন ভাই ও বাবা-চাচার

মিলে পূর্বের আয়োজনের পরিকল্পনা পরিবর্তন করল।
পুরো চৌধুরী নিবাস ডেকোরেশনের জন্য লোকবল
বাড়িয়ে দিলো। এতে কাজও এগোতে থাকল। বিয়ের
কার্ডও বিলানো শেষ। বাড়ির মেয়েদের বিয়ের
পোশাক নিয়ে বাড়তি ঝামেলায় পড়তে হলো না। শুদ্ধ
ফেমাস ডিজাইনার ডেকে মাপ অনুযায়ী সকলের
ড্রেসকোড সিলেক্ট করে ফেলল। মজার ব্যাপার হচ্ছে,
বরদের পছন্দের রং অনুযায়ী সিলেক্ট করা হয়েছে চার
বউয়ের লেহেঙ্গা। আর বউদের পছন্দকে প্রাধান্য
দিতে সিলেক্ট করা হয়েছে বরদের বিয়ের শেরওয়ানি।
আজ ১২ ই নভেম্বর। দেখতে দেখতে কেটে গেছে
মাঝখানে কয়েকটা দিন। আগামীকাল চার দম্পতির
গায়ে হলুদ আর তার পরেরদিন বিয়ে। আয়োজনের
কাজ প্রায় শেষ। চৌধুরী নিবাস সেজেছে অন্য রূপে।
কী সুন্দর দেখাচ্ছে বাড়িটি। আজ বিকাল থেকেই
আত্মীয়তা আসতে শুরু করবে। বিয়ের আয়োজন
দেখতে নিকট আত্মীয়রা এমনিতেই আসে।

অন্তরে বিষ রেখে কথায় মধু মিশিয়ে স্বর্ণ শীতলের
সৌভাগ্যের প্রশংসা করে। বাড়ির সকলে সব শুনে
তবে বাইরের কারো কথা পাত্তা দেয় না। এখন বাজে

বিকাল চারটা। ড্রয়িংরুমের সোফায় চার হাত-পা ছড়িয়ে টিভিতে সিরিয়াল দেখছে শীতল। পাকিস্তানি এ সিরিয়ালটা খুবই ভালো লাগে তার। বিশেষ করে সিরিয়ালের নায়কের গেঁজ দাঁতটা খুব বেশিই পছন্দ। হিরো যখন কথা বলে বা রোমান্স করে সেও মিটিমিটি হাসে। টিভিতে চুপ চুপ করে একবার দেখে আবার সেই পর্বটাই ফোনেও দেখে। টেনে টেনে রোমান্সটুকুই দেখে। এটা হচ্ছে গোপন তথ্য যদিও জানে না কেউ। এই যে এই সময় ড্রয়িংরুমে কেউ থাকে না দেখে সে সিরিয়ালটা দেখছিল। কিছুক্ষণ আগে ঘেমে নেয়ে এত এত কেনাকাটা করে যে শুদ্ধ বাসায় ফিরেছে দেখেছেও তবুও উঠে নি। শেষ করেই উঠবে ভেবে ঘাঁট হয়ে বসে আছে। তাকে টিভি দেখতে দেখে সিমিন শুদ্ধর খাবার গুছিয়ে রুমে চলে গেলেন। শখ দুপুরে খেয়ে এতক্ষণ নিজের রুমে বসে পড়ছিল। একটানা অনেকক্ষণ পড়ায় মাথা কেমন ঝিমঝিম করছিল বিধায় এসে বসল। এককাপ চা খেলে মন্দ হয় না ভেবে উঠতে গেলে সিরাত হুড়মুড় করে এসে একঝুড়ি ফল তাদের খেতে দিলো। অর্করা অনেক ফল মিষ্টি এনেছিল সেদিন, এখনো আছে।

এত ফল না খেলে তো নষ্ট হয়ে যাবে। শীতল কি ভেবে যেন শখকে আড়চোখে একবার দেখে টিভির দিকে তাকাল। তারপর টিভির রিমোট দাঁতে ঠুকতে ঠুকতে আফসোসের সুরে বলল,

-‘বুঝলে আপু তোমার ভাইকে বিয়ে করে লস খেয়ে গেলাম।’

শখ থোকা থেকে আঙুল ছিঁড়ে পানিভর্তে বোলে রাখতে রাখতে বলল,

-‘কেমন লস?’

-‘অন্য কাউকে বিয়ে করলে আমার একটা শখ পূরণ হতো। কিন্তু তোমার ভাইকে বিয়ে করে সেই শখটা জীবনেও পূরণ হবে না।’

-‘কি শখ শুনি? দরকার হলে আমি ভাইয়াকে বলব কষ্ট করে হলেও যেন তোর শখ পূরণ করে। তা বলতো শুনি কি শখ তোর?’ শীতল ফলের ঝুড়ি থেকে বড়সড় আঙুরের থেকে তুলে নিলো। মুখের উপর থোকাটা ঝুলিয়ে বলল,

-‘তোমার ভাই ভালো মানুষ হলে বাসর রাতে আমি এভাবে শুয়ে আঙুর খেতাম। আর ডিজে গান ছেড়ে

দিয়ে তোমার ভাইকে বলতাম নাচ শালা নাচ, নেচে
আমার মুড ঠিক কর।’

শীতলের কথা শেষ হতেই শখ বিষ্ময় নিয়ে তাকাল।
তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে আশেপাশে তাকিয়ে নিচু স্বরে
বলল,

-‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।’

তাকে হঠাৎ বিরবির করতে দেখে শীতল পা নাচাতে
নাচাতে বলল,

-‘পাগল হলে নাকি আপু? কেউ না মরতেই কিসব
বলছো? আগে মরতে তো দাও।’

শখ কিছু বলল না। একবার শীতলের দিকে তাকিয়ে
পুনরায় ডাইনিং টেবিলের দিকে তাকাল। তার দৃষ্টি
অনুসরণ করে শীতলও ডায়নিং টেবিলের দিকে
তাকাতেই দেখল শুদ্ধ খাবার খাচ্ছে। শান্ত ধীরে
গতিতে খাবার চিবাতে চিবাতে তার দিকে ঠান্ডা
দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তাদের

অবস্থা দেখে শখ আশ্তে করে কেটে পড়ল।

আশেপাশে কেউ নেই দেখে

শুদ্ধ বলল,-‘ওহ হ্যালো এদিকে আসুন।’

শীতল গেল। তাকে পাশে বসতে ইশারা করলে
বসল। মার খাওয়ার ভয়ে আগেভাবে সরি বলল। শুদ্ধ
জবাব না দিয়ে ভাতের লোকমা শীতলের মুখের
সামনে তুলে ধরল। শীতল বলল,

-‘খেয়েছি আমি।’

-‘আমি দেখি নি।’

-‘আপনি আজকাল বেশি বেশি করে খাইয়ে কেমন
কুমড়ো পটাশ করে ফেলছেন।’

-‘বেশ করছি। হাঁড়গিলে টাইপ স্লিম বউ লাগবে না
আমার, জড়িয়ে ধরে শান্তি নেই। আমার দরকার
গলুমলু বউ। এখন যেমন আছেন একদম
পারফেক্ট।’ বিশাল বহুল এক ফ্ল্যাটের বন্ধরুমে হাঁটু
ভেঙে ‘দ’ ‘ভঙ্গিতে বসে আছে ইয়াসির। এলোমেলো
পরনের বেশভূষা। তার সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে
নামী-দামি ব্রান্ডের ফাঁকা কাঁচের বোতল। রুমজুড়ে
ভ্যাপসা গন্ধ।

টিভি চলছে। টিভিতে ব্রেকিং নিউজে দেখা যাচ্ছে
পুলিশ তার ডেরায় হানা দিয়েছে। খুঁজে পাচ্ছে অবৈধ
টাকার পাহাড়, অস্ত্র, মাদকদ্রব্য সহ

কঙ্কালসাদৃশ্য মৃত/জীবিত মানুষের লাশ। এত কষ্টের
গড়া পাপের রাজ্য ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে দেখে তার কি
কষ্ট পাওয়া উচিত? যে টাকার জন্য নিজের বন্ধুকেও
এককালে শেষ করেছিল আজ সেসব অন্যদের
দখলে। সেও জীবনভর আত্মসাৎ করতে পারল না।
পারল না বললেও ভুল হবে বলা বাহুল্য করল না।
কারণ সে নিজে পুলিশকে খোঁজ দিয়েছে। একটা
সময় ভাবত, এ পৃথিবীতে টাকায় সব। টাকায়
মানুষের জীবনের সকল অপূর্ণতা পূরণ করে দেয়।
সুখ থাকা টাকায়। যার টাকা আছে সেই হচ্ছে রাজা।
নিজেকে রাজার হালে নিতে গিয়ে বিবেকের ধার ধরে
নি কখনো। পাপ পূর্বের হিসাব কষে নি। কেন
কষবে? টাকায় তার পকেট গরম যা মন চেয়েছে
করেছে। শরীরে টান পড়লে টাকা ছিঁটালে কত
মেয়ে। দেশ বিদেশ যখন যা নজরে এসেছে দখলে
রেখেছে। শুধু দখল করতে পারল না শীতলকে। ওই
ছোট পুঁচকে মেয়েটা তাকে গোঁ হারান হারিয়েছে।
কত জেদ ভাবা যায়? সে কেবল ছুঁয়েছে বলে তার
ছোঁয়া মুহুর্তে হাসপিটালেই শুদ্ধর নামে কবুল পড়েছে।
যাতে তার জীবনের কোথায় ইয়াসির নামের ছায়াটাও

না থাকে। সবাই তাকে বলে মাফিয়া, পাষণ, নিষ্ঠুর
তাহলে এ মেয়ে কি? সে তো বুলেট না ছুঁড়েও তাকে
রক্তাক্ত করে ফেলেছে। এমন ভাবে তাকে ভেঙেছে
শিরদাঁড়া তুলে উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতাটুকুও নেই।
এসব ভেবে সে সোফায় মাথা এড়িয়ে দিলো।
সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল।
একহাত বাড়িয়ে সেন্টার টেবিলের উপর থেকে ফ্রেম
হাতে তুলে নিলো। ফ্রেমটিতে দুটো ছবি রাখার কেস
রয়েছে। ডান পাশের কেসে তার মায়ের ছবি আর
আরেকটাতে শীতলের। নেশা করে চোখে ঝাপসা
দেখছে। অনেকদিন পর মায়ের ছবিতে হাত বুলিয়ে
থম মেরে রইল। মা মরার পর আর করে কেঁদে মনে
পড়ে না তবে শীতলের বিয়ের দিন কেঁদেছিল।
হাউমাউ করে অসহায় সুরে কেঁদেছিল। কাউকে
আঁকড়ে ধরে কাঁদার মানুষটা তার জীবনে কখনো
ছিল না। আজও নেই।

সে এবার শীতলের ছবির দিকে তাকাল। হাসল।
তারপর বিরবির করে বলল,-‘শখের পুরুষ খুন
করলেও মাফ, তাই না বাবুই? যত দোষ সব
আমাদের মতো হতভাগার। আমি মাফিয়া বলে

রিজেস্ট্র করলে অথচ শুদ্ধর খুন করার দৃশ্য দেখেও
তুমি নিশ্চুপ। ন্যায়-অন্যায়ের সাজা কি আমাদেরই
প্রাপ্য, হুম?’

একথা বলে ইয়াসির থেমে গেল। মনে পড়ল
শীতলের সঙ্গে তার পুনরায় কথা বলার মুহূর্তটুকু।
ইগরকে মারার ভিডিও শীতলকে পাঠিয়েছিল সে।

ভিডিওটা এমনভাবে করা যেন শুদ্ধই ইগরকে মেরেছে
কিন্তু শীতল দেখে কিয়ৎকাল চুপ ছিল। দেড় ঘন্টা
পর তাকে হতবাক করে দিয়ে মেসেজ করেছে, ‘মাঝে
মাঝে নিজের ভালোর জন্য দু’একটা জঞ্জাল সরানো
খুব দোষের কিছু না।’ একথা শুনে কে বলবে এভ
মেয়েটাই চৌধুরীদের ছোটো কন্যা? ওই মিষ্টি মুখের
মেয়েটা এত কঠিন কথাও বলতে পারে। কি অদ্ভুত!
বয়সে ছোটো মেয়েটা তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বার
বার বুঝিয়ে দিচ্ছে, ভালোবাসা মানে কখনো
অধিকার দেখিয়ে জিতে নেওয়া কখনো ভালোবাসার
তীব্র তাগিদে অনেককিছু জেনেও না জানা; না দেখা।
সে হাসল। বড্ড লোভ হলো পাজি মেয়েটা কেন যে
তাকে একফোঁটা ভালোবাসা ভিক্ষা দিলো না। না
দেওয়াতে আজকে নেশায় টাল হয়ে মায়ের কাছে

অভিযোগের পসরা খুলে বসল। মায়ের ছবিতে হাত
বুলিয়ে কান্নাভেজা সুরে বলল,
_ 'পৃথিবীতে পাপীদের কোনো মূল্য নেই, মম। সবাই
মুখেই বলে পাপীকে নয় পাপকে ঘৃণা করো। কিন্তু
প্রকৃতপক্ষে তারা পাপের থেকেও পাপীকে ঘৃণা করে।
যে পাপ দিনে ঘৃণা করে সেই পাপের টাকায় রাতে
ভাগাভাগি করে। ভাগে কম পড়লে খুনাখুনিও হয়ে
যায়। আমার দোষ আমি পাপী। পাপীর তকমা গায়ে
লেপ্টানোর কারণে আমার নাকি ভালোবাসতে নেই।
ভালোবাসার মানুষ চাইতে নেই। আমার জন্য
ভালোবাসা নিষিদ্ধ। চাওয়া-পাওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু
ভিলেনকে তো আর কেউ আগ বাড়িয়ে ভালোবাসা
না। পেতে চায় না। পূর্ণতার যুদ্ধ ঘোষণা করে
লড়াইতে নামে না। অথচ ভিলেনরাও হারাতে হারাতে
ক্লান্ত এটা কেউ দেখে না। বুঝে না, ভিলেনদের
জীবনে আচমকা মধুমাস আসতে পারে। আর আসাটা
কি অন্যায়, বলো? ভিলেনেরও তো মন থাকে। মন
বলে প্রিয় বলে কাউকে ডাকতে। পাশে রাখতে। বুকে
আগলে রাখতে। কিন্তু নিষ্ঠুর প্রিয়রাও ওই পাপের
দোহায় দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। মুখ ফেরানো প্রিয়কে

যখন নিজের কাছে রাখতে উঠে পড়ে লাগে তখন
আমাদের নাম রচিত হয় ভিলেন নামে। এ সমাজ;
সমাজের মানুষগুলো শুধু পারেই আঙুল তুলে তীরবিদ্ধ
করতে পারে। এতে রক্ত ঝরলো নাকি পুরনো
দগদগে ঘাঁ পুনরায় দগদগে হলো কেউ দেখে না;
কেউ না।’এটুকু বলে ইয়াসির থেমে গেল। চোখের
পাতা দুটো ভারি হয়ে বুজে আসছে। নেশার তালে
মায়ের কাছেও ঠিকঠাক ভাবে অভিযোগ করতে পারল
না। অথচ বুকের ভেতর অসহ্য ব্যথায় জর্জরিত। সে
সোফা থেকে মাথা তুলে উঠতে গিয়ে পা হড়কে নিচে
পড়ল। ব্যথাও পেল ভীষণ। তবে আর উঠার চেষ্টা
করল না হাত পা ছড়িয়ে মেঝেতেই শুয়ে রইল।
একটু পর বিরবির করে তার ভীষণ পছন্দের একটা
গানের লিরিক্স আওড়াল, “One day I’m gonna
fly away”

“One day when heaven calls my name”

“I lay down I close my eyes at night”

“I can see morning light”-‘আপু?’

-‘হুম।’

-‘এখন তো তুমি-আমি দুই জা। আমরা আমাদের মা-চাচীদের মতো মিলেমিশে থাকব, ঠিক আছে?’

-‘ঠিক আছে।’

-‘আপু?’

-‘হুম।’

-‘বিয়ের পর আমি যদি কোনো কাজ করি না তুমি কিন্তু রাগ করতে পারবা না?’

-‘করব না।’

-‘আপু?’

-‘হুম।’

-‘তুমি এমনই থেকেো কিন্তু।’

-‘হুম।’

-‘আর শুনো, সায়েন ভাইয়া তো আমার দুলাভাই হচ্ছে। প্রতি ইদে আমি কিন্তু তিনবার সালামি নেবো ভাইয়ার থেকে আর তুমি দিবা দুইবার?’

-‘আমি দুইবার কেন?’

-‘একবার বড় বোন হিসাবে দিবা আরেকবার বড় জা হিসেবে।’

-‘ঠিক আছে।’এরপর পুরো রুমজুড়ে নীরাবতা। স্বর্ণ কিছুক্ষণ উল্টো ঘুরে বসা চঞ্চল শীতলের অবয়ের

দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর দুই ভ্রু কুঁচকে
শীতলের মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে দেখল
পাগলিটা কেঁদে চোখ-মুখ লাল করে ফেলেছে।
এতক্ষণ মুখ ফিরিয়ে থাকায় বুঝতে পারে নি, তবে
তার ভেজা কণ্ঠস্বর শুনে বুঝেছে কিছু একটা হয়েছে।
বোনকে দেখে শীতল মাথা নিচু নিলো। না চাইতেও
ফুঁপিয়ে উঠল। দুচোখ দিয়ে অঝরে অশ্রু ঝরতে
লাগল। স্বর্ণ তখন শীতলের চোখ মুছে দিয়ে আদুরে
সুরে বলল,

-‘ভাইয়ার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?’

-‘না।’

-‘কেউ কিছু বলেছে?’

-‘না।’

-‘তবে?’

-‘আমার খুব কষ্ট হচ্ছে আপু। কেন জানি নিজেকে
অপরাধী মনে হচ্ছে।’

-‘কেন?’-‘ আমি আজকাল বড় আবুর সামনে যেতে
পারি না। আগের মতো মন খুলে ডাকতে পারি না।
আবদার করতে পারি না। চোখাচোখি হলে বুকটা
মুঁচড়ে উঠে। কেন জানি মনে হয় বড় আবু আমার

উপর রেগে আছে। উনার এক ছেলেকে খুশি করতে গিয়ে আরেক ছেলেকে কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু আমারই বা কি করার আছে, বল তো আপু? এই যে এত ঘটা করে বিয়ের আয়োজন হচ্ছে। কত মানুষ আসবে। কত মানুষ খাবে, আনন্দ করবে কিন্তু বড় আব্বু আরেক ছেলেকে ডাকতে পারবে না। ডাকলে সে যদি আসে আমরা মন থেকে খুশি হবো না। এই যে, খুশি হওয়া না হওয়া নিয়ে কোথাও না কোথাও আমি দায়ী।’-‘(....)’

-‘হসপিটাল থেকে ফেরার পর বড় আব্বুর সঙ্গে কথা হয় নি। বলা বাহুল্য আমি নিজেই পালিয়ে বেড়াই।’

-‘এটা তো ঠিক না।’

শীতল ফোঁপাতে লাগল। তা দেখে স্বর্ণ হাসল। তার বোনটা আসলেই খুব বোকা। নয়তো ভুলভাল ভেবে এভাবে কাঁদে? তাছাড়া শারায়ত চৌধুরী মোটেও রেগে নেই। নিজেই শীতলের খোঁজ রাখেন। সত্যি বলতে, উনিও বিব্রতবোধ করেন। তবে স্বর্ণ এসব কথা না তুলে শীতলের মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে চোখজোড়া মুছিয়ে দিলো। মাথা নাড়িয়ে ইশারায় কাঁদতে বারণ করে বলল,

-‘একটা মানুষ সবাইকে খুশি করতে পারে না। আর সবাইকে খুশি করতে চাওয়া একধরনের বোকামি। তুই শুদ্ধ ভাইকে ভালোবাসিস। তার জন্য লড়াই করে সম্পর্কে পূর্ণতা এনেছিস। বাকি সব ভুলে যা। শুধু ভাব যাকে চাস তাকে পেয়েছিস। আদায় করে নিয়েছিস। হিসাব মিলাতে হলে মিলা

যে, যার জন্য এসব সে তোকে ভালোবাসে কি না। তোকে আগলে রাখে কি না। যদি সেই মানুষটা ঠিক থাকে তাহলে বাকি সবকিছু ফিঁকে হোক। মাঝে মাঝে কিছু জিনিস দেখেও না দেখার ভাণ করতে হয়। এখন যদি তোর ভাবনা অনুযায়ী বড় আব্বুকে খুশিও করতে চাস তবে ইয়াসিরের কাছে যেতে হবে, যাবি? সে নাকি তোকে পছন্দ করে। বিয়ে করবে এবং মাফিয়াগিরি ছেড়ে দেবে। কিন্তু তুই থাকতে পারবি শুদ্ধ ভাইকে ছাড়া?

যদি যেতে চাস শুদ্ধ ভাই কিছু বলবে না তবে এ জীবনে তোর মুখদর্শন করবে না। না তুই কখনো তোর বিশুদ্ধ পুরুষের কাছ ঘেঁষতে পারবি। তা সইতে পারবি তো প্রিয় পুরুষের ঘৃণার দৃষ্টি নিয়ে বাঁচতে?’

বোনের কথা শুনে শীতল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে
রইল। একথা তো সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। তাই
ভেজা কণ্ঠে বলল,-‘শুদ্ধ ভাইকে ছাড়ার কথা ভাবতে
গেলে দম আঁটকে মারা যাব। তাকে ছেড়ে অন্য
কারো কাছে যাওয়ার কথা তো বহুদূর।’

-‘তাহলে যা হচ্ছে হতে দে। সবার ভালোর কথা
ভাবতে গেলে নিজের ভালো থাকতে পারবি না। অথচ
আমরা সবাই চাই তুই ভালো থাক। ‘

শীতল বোনের হাত আঁকড়ে ধরে মাথা নিচু করে
কিছু ভাবল। তারপর নিচু স্বরে বলল,

-‘নীল চোখওয়ালা আমাকে একটা ভিডিও পাঠিয়েছে।
ওখানে শুদ্ধ ভাই ঐশ্বর্য আপুর বাবাকে..।’

-‘কথা গোপন করতে শিখ বোন। সব কথা আওড়াতে
নেই। ভিডিওসহ চ্যাট ডিলিট করেছিস?’

-‘করেছি।’

-‘আর কেউ জানে?’

-‘না।’

-‘তুইও কিছু জানিস না, মনে থাকবে?’

-‘থাকবে।’

-‘কিন্তু...! ‘এটুকু বলতেই স্বর্ণ শীতলের মুখ চেপে ধরে
চোখ টিপ দিয়ে কিছু বলতে বারণ করল। তড়িৎ
হাতটা সরিয়ে দরজার দিকে তাকাল। কারো পায়ের
পদধ্বনি দরজার কাছে থেমে গেল। নক পড়ল
দরজায়। স্বর্ণ ওপাশের মানুষটাকে প্রবেশের অনুমতি
দিলে ধীর পায়ে ঐশ্বর্য রুমে প্রবেশ করল। হাসিমুখে
তাকিয়ে বলল,

-‘বিরক্ত করলাম?’

ঐশ্বর্যকে দেখে শীতল হাসল। এই মেয়েটার প্রতি
চিরকৃতজ্ঞ সে। তবে ঘটনা করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
করতে পারে না। তবে মানুষ হিসেবে ভীষণ পছন্দ
করে। তাকে দরজায় দেখে শীতল উঠে গিয়ে ঐশ্বর্যের
হাত টেনে বিছানায় বসিয়ে দিলো। নিজেও পাশে
বসে বলল,

-‘কী যে বলো না ভাবি। আমার রুমে আসতে
অনুমতি নিতে হবে নাকি?’

-‘হবে তো।’

-‘হবে না। বাইরের কেউ হলে কথা ছিল তুমি আমার
পরিবারের একজন।

আমার সুইট কিউট দুই নাম্বার ভাবি। তা বড় ভাবি
আপনি দাঁড়িয়ে কেন, বসুন না।'শেষের কথাটা স্বর্ণকে
বলে হেসে ফেলল শীতল। স্বর্ণ হাতে চিরুনি নিয়ে
শীতলের চুলের বিনুনি খুলে আঁচড়ে দিতে থাকল। দু
বোনের মিল দেখে

ঐশ্বর্য হাসল। শীতলের চোখ মুখ দেখে বুঝল কোনো
কারণে কেঁদেছে। তবে কেন কেঁদেছে প্রশ্ন করাটা
ঠিক হবে না তাই কিছু বলল না তবে স্বর্ণ বুঝল।
তাই নিজেই বলল,

-‘বয়সেই বড় হয়েছে বুদ্ধিতে না। শুদ্ধ ভাই সঙ্গে নেয়
নি তাই কেঁদে কেঁটে একাকার অবস্থা। বুঝতে হবে
তো এখন বাড়ির ছেলেরা কত ব্যস্ত। কত কাজ
তাদের।’

বোনের কথায় সায় দিতে শীতল মুখ ভেংচি দিলো।
ঠোঁট ফুঁলিয়ে বলল,

-‘বালের কাজ। সঙ্গে নিলে কি আর এমন হতো?’

ঐশ্বর্য মুখ টিপে হেসে শীতলের ফুলো ফুলো গাল
দুটো এবার টেনে দিয়ে বলল,

-‘আপনাকে নিয়ে যায় নি বলে আপনার মহারাজ
গিয়েও ফিরে এসেছে। আমাকে বলল, আপনাকে

ডেকে দিতে দ্রুত যান বাইকে বসে আছে।’-‘ফিরে এসেছে?’

-‘হুম।’

-‘কখন?’

-‘পাঁচ মিনিট হবে। যাও তাড়াতাড়ি নয়তো রেগে যাবে।’

একথা শুনে শীতল গরু খোঁজা করে ফোনটা খুঁজতে লাগল। বালিশের নিচে ফোন বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। এই রে ফোন দিয়েছিল বোধহয়। কখন থেকে বসে অপেক্ষা করছে কে জানে। শীতল কিছু বলার আগে বাইকের হর্ন শুনতে পেল। একের পর এক হর্ন বাজতেই আছে। তা দেখে পরনের ড্রেস বদলাতে ওয়াশরুমের দিকে ছুঁটল। তারপর মুখ মুখে কিছু দেওয়ার আগে আবার হর্ন বাজল। কোনোমতে চুলে খোঁপা করে হিজাব জড়িয়ে ওড়না নিয়ে নিচের দৌড়ে গেল। এতক্ষণ স্বর্ণ আর ঐশ্বর্য বসে বসে তার তাড়াহুড়ো দেখে হাসছিল। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক শুদ্ধ যদি ডাকে আর শীতল যদি সেই ডাক শুনতে পায় তাকে আঁটকে রাখা সম্ভব নয়।

যতই মারুক, বকুক, অভিমান করুক শুদ্ধ ডাকলে
শীতল যাবেই; যাবে।

এটা আজকের ঘটনা নয় আগে থেকে এমন। এদিকে
বাইকের হর্ন শুনে সিঁতারা বের হলেন। কিছু ফেলে
গেছে নাকি জানতে চাইলে, শুদ্ধ বলল,-‘পাফার
ফিশকে আসতে বলো। দেরি হচ্ছে যাচ্ছে। ‘

-‘পাফার ফিশ কে?’

ছেলের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে কিছু একটা বুঝে সিঁতারা
হেসে ফেললেন।

এই বাড়িতে এসব নামের অধিকারিনী তো একটাই।
তাই তিনি যেতে যেতে বললেন,

-‘ তোরা পারিসও বটে।’

তারপর উনি চেষ্টা করে শীতলকে ডাকতে লাগলেন।
শীতল রেডি হয়ে গুঁটি গুঁটি পায়ে বের হয়ে শুদ্ধর
কাছে গেল। তবে মুখটা গোমরা করে আছে।

শুদ্ধ তাকে দেখে বিরক্তির সুরে বলল,

-‘ একটু তাড়াতাড়ি আসা হয়ে গেল না? আমি
ভাবলাম নিমন্ত্রণপত্র না পাঠালে আজ আর নামবেনই
না।’

শীতল জবাব দিলো না বাইকের পেছনে উঠে বসল।
তবে শুদ্ধকে ধরল না। মাঝখানে কিছু জায়গা রেখে
বসেছে যেন গায়ে না ঠেকে। শুদ্ধ ঘাড় ঘুরিয়ে
একবার তাকিয়ে বলল,-‘ধর বস।’

-‘(.....)’

-‘বিয়ের আগে বউ মারতে চাচ্ছি না। যা বলছি
শোন।’

-‘(.....)’

-‘কালার ঘরের কালা কানে শুনিস না? ধাপ এক
কানের উপর লাগাব নাকি?’

তবুও শীতল জবাব দিলো না। ধরলও না। কাহিনি
বুঝে শুদ্ধও কথা না বাড়িয়ে চোখে ব্ল্যাক সানগ্লাস
পরে বাইক স্টার্ট করল। পরনে সাদা শার্ট ও কালো
প্যান্ট। গা থেকে ভুরভুর করে বের হচ্ছে চিনচেরা
পারফিউমের ঘ্রাণ। এই ঘ্রাণটা শীতলের খুব
পছন্দের। অন্যকিছু হলে চেটে চেটে খেতে ফেলত
এতদিনে। পরীক্ষাস্বরূপ একদিন টেস্ট করে বুঝেছে
পারফিউম তিতা স্বাদের হয়। শুদ্ধ বাইক ততক্ষণে
মূল ফটক পেরিয়ে বেরিয়ে গেল।

কাজ ফেলে কেউ বউ নিয়ে বের হয়? কিন্তু কথা
শুনলে তো? সঙ্গে নেয় নি বলেই তো মুখে কুলুপ
এঁটে বসে আছে। রাগ দেখাতে ধরেও বসে নি। এত
রাগ দেখার সময় নেই বাইকে যখন বসেছে তখন
তাকে ধরতে হবে। একথা ভেবে শুদ্ধ ইচ্ছে করে
ব্রেক কষলো। শীতল হুমড়ি খেয়ে পড়ল শুদ্ধর পিঠের
উপর। পিঠের সাথে নাকে বারি খেয়ে কিছু বলার
আগে শুদ্ধ খেঁকিয়ে বলল,-‘মাঝরাস্তায় হুমড়ি খেয়ে
সিডিউস করা হচ্ছে? তা বলি হারি যায় বাসায় কি
আপনার বাপ-ভাই নাই? ছিঃ! ছিঃ! এই ঘোর কলিযুগ
নয়তো এমন কেউ করে?’

শীতল হাবাকালার মতো নাক ধরে বিষ্ময় নিয়ে
তাকিয়ে রইল। পাগল টাগল হয়ে গেল নাকি এই
লোক? সে তো কিছু করে নি নিজেই ফাঁকা রাস্তায়
ব্রেক কষলো। আচমকা ব্রেক কষলে হুমড়ি খেয়ে তো
পড়বেই!

তার চালাকি বুঝে শীতল অন্যদিকে তাকাল। রাগে
ফুঁসতে লাগল। তবুও কথা বলল না দেখে শুদ্ধ
মিটিমিটি হাসলেও আর ঘাটল না। তবে একটা

দোকানের সামনে গিয়ে তিনটে কোণ আইসক্রিম
কিনে হাতে ধরিয়ে বলল,

-‘চুপ আছেন চুপই থাকেন। যদি কথা রাখেন ফেরার
পথে আরো তিনটা কিনে দিবো।’ শুদ্ধ বলল ঠিকই
কিন্তু হলো এর উল্টোটা। আইসক্রিম পেয়ে শীতলের
অভিমান চট করে গলে পানি। সে আইসক্রিম খেতে
খেতে শুরু করল রাজ্যের গল্প। শুদ্ধ মনে মনে
হাসল। যাক এবার মনে হচ্ছে সঙ্গে তার ব্যাঙাচি
আছে। তারপর তারা ফল কিনল, মিষ্টি কিনল,
মোক্ষম সুযোগ

বুঝে শীতল অনেকগুলো চকলেট নিলো। বাড়ির গাড়ি
নিয়ে সাফওয়ান

,সায়ন আর রুবাব অন্যকাজ বেরিয়েছে। কাজ শেষ
কিছুক্ষণের মধ্যেই রওনা হবে বিধায় তারা একটু
অপেক্ষা করল। গাড়িটা এলে সেগুলো চট করে
গাড়িতে তুলে দিয়ে তারা ছুঁটল অজানার উদ্দেশ্যে।
বিকেলের রোদ মরে গেছে। মাথার উপর স্বচ্ছ সুনীল
আকাশ। চলন্ত বাইকে বসে শীতল শুদ্ধর পিঠে
কপাল ঠেকিয়ে বসে আছে। মনে অনাবিল খুশির
রেশ। কেন

জানি চোঁচিয়ে নিজের খুশিটুকু সারা পৃথিবীকে জানাতে
ইচ্ছে করছে। এ খুশির রেশ ধরে ভালো লাগছে
বেসামাল বাতাস। শুদ্ধর বাইকে বসলে পূর্বে যা
করতো এখনো একটু একটু সেই মন কেমন করা
গন্ধ নিঃশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিচ্ছে। ঠোঁটে মিটিমিটি
হাসি। এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। মাগরিবের
আজানও হলো কিছুক্ষণ মধ্যেই। দিন পেরিয়ে রাত
নামছে।

নিগূঢ় আঁধার গ্রাস করতে চাচ্ছে দিনের শেষ
আলোটুকু। সিঁতারা ফোন করে জানালেন নতুন বউ
নিয়ে এভাবে ঘুরতে নেই। তারা যেন তাড়াতাড়ি
বাড়ি ফিরে। মায়ের কথা শুনে শুদ্ধ ফেরার কথা
জানিয়ে কলটা কাটল।

শীতলকে বলল,

-‘মন ভরেছে?’

-‘উহুম, আরো ঘুরব।’

-‘আরেকদিন।’

-‘না, আপনি সহজে বের হতে চান না।’

কথা বলতে বলতে ফিরতি পথের নির্জন এক স্থানে
বাইক থামাল শুদ্ধ।

জায়গাটা সুন্দর তবে নিরিবিলি। শীতল নেমে দাঁড়ালে
শুদ্ধ বাইক স্ট্যান্ড করল। তারপর আচমকা শীতলকে
বুকে জড়িয়ে নিলো। বিস্মিত শীতল
কিছু বলার আগে শুদ্ধ বলল,

-‘স্ট্যাচু! নড়লেই মার।’ শীতলের পেট ফেটে হাসি
পেলেও অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এই বিশুদ্ধ
পুরুষটা খুব চালাক। সে জানে, বাড়ি ফিরলে
শীতলকে আজ আর পাবে না। এজন্য এখনই এই
ব্যবস্থা। তবে শুদ্ধর অজানায় রয়ে গেল ব্যাঙাচি
এখন চালাক হয়ে গেছে। বুঝে গেছে কিছুটা। তাই
সেও আঁকড়ে ধরেছে প্রিয় পুরুষটাকে। নিঃশ্বাসের
সঙ্গে টেনে নিচ্ছে প্রিয় সুঘ্রাণ। বুকের মাথা রেখে
ডাকাতি করে লুফে নিচ্ছে মনের শান্তি। অথচ তার
বুকে চলমান

টালমাটাল অনুভূতি। কি আশ্চর্য, তারা বৈধ সম্পর্কে
আবদ্ধ তবুও একটু দূরে থাকার বিরহ সহ্যেও
নারাজ তারা। অথচ মুখে কেউ বলবে না এক জন
আরেকজনের জন্য কতটা কাতর। কতটা ব্যাকুল।
কতটা উন্মাদ।

তখন শুদ্ধ শীতলের কানে কানে ফিসফিস করে
বলল,

-‘রাতে রুমের দরজা খোলা থাকবে। ডাকতে যেন
না হয়।’

-‘মেজো আগেই বলে দিয়েছে আমাদের নাকি
তালাবদ্ধ করে রাখবে।’

-‘কেন?’-‘আমরা মেয়েরা হলাম সুস্বাদু মিষ্টি। আর
বাড়িতে নাকি পিঁপড়ের সংখ্যা বেশি। খোলা জায়গায়
রাখলে নাকি পিঁপড়ে খেতে ফেলতে পারে।’

একথা বলে শীতল ফিক করে হেসে ফেলল। শুদ্ধর
ঠোঁটের কোণেও মৃদু হাসি। সে আজলা ধরে শীতলের
মুখটা ধরে কিছুক্ষণ দেখল। তারপর বলল,

-‘তাহলে আমার ভাগের মিষ্টির স্বাদ কেমন একটু
টেস্ট করে দেখি?’

একথা শুনে শীতল তার বুকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দুপা
পিছিয়ে গেল। মিনমিনে সুরে বলল,

-‘দিন দিন বড্ড বেশি অসভ্য হয়ে যাচ্ছেন আগে তো
এমন ছিলেন না।’

-‘আগে তো মধু খাওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল না। টেস্ট
কেমন জানতাম না।’

এখন জানি তাই সুযোগ খুঁজি।'লাগামছাড়া জবাব
পেয়ে শীতল মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল। সামনে
একটা নদী। বাতাস বইছে। আকাশে জ্বলজ্বল করছে
সন্ধ্যাতারা। শীতল

দু'পা এগিয়ে নদীর ধারে দাঁড়াল। মন দিয়ে তারা
দেখতে দেখতে অনুভব করল কেউ তাকে পেছন
থেকে আলতো করে জড়িয়ে ধরেছে। পরক্ষণে
শক্ত করে গাল চেপে ধরে পরপর বেশ কয়েকটা চুমু
খেলো। ফোনের রিংটোন বেজে উঠলে শুদ্ধ কানে
ফোন চেপে বাইকের দিকে যেতে যেতে বলল,
-‘হ্যাঁ ছোটো মা বলো। তোমার মেয়ে যেতে চাচ্ছে না।
বলে কী না তার নাকি বাড়ি ফিরতে ভালো লাগছে
না। হ্যাঁ বোঝাচ্ছি শুনলে তো? এখন নদীর পাড়ে
দাঁড়িয়ে আছে।’

মায়ের কল বুঝে শীতল দৌড়ে এসে বাইকের পেছনে
বসল। দুপুরে বের হওয়ার সময় সিমিন বার বার
বারণ করেছিল দেরি না করতে। বাড়িতে অনেক
মেহমান মন্দ কথা বলবে এভাবে ঘুরে বেড়ালে। সে
দ্রুত ফেরার কথা দিয়েছিল কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে ভুলে
বসেছে। অতঃপর বাড়ি ফিরতে

ফিরতে অনেককিছু খেলো। ফুল কিনে দিলো। শুদ্ধর
এই গুনটা বেশ যে ঘুরতে বের হলে বলার আগে
পছন্দের খাবার কিনে দেয়। আজও হলো। বাড়ি
পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেজে গেছে আটটা। চার বউয়ের
হাতে মেহেদি পরানোর জন্য চারজন মেয়ে এসেছে।
চারজনকেই বাসন্তী রঙের নতুন
সুতি শাড়ি পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। গান বাজছে
ধুমধাড়াক্কা। একটুপরেই
সায়ন, শুদ্ধ, রুবাব আর অর্ককে উপস্থিত হওয়ার
কথা জানাল সিরাত।

বিয়ের আগে হঠাৎ তলব পেয়ে অর্ককে আসতেই
হলো। দেড় আধঘন্টা পর চারজন উপস্থিত হলে
সম্পর্কে ভাবি এমন কয়েকজন তাদের চার জনের
হাতে চারটে মেহেদির টিউব ধরিয়ে দিলো। বলল,
-‘নাও যার যার ফুলের হাতে স্ট্যাম্প ছেপে
দাও।’সায়ন মেহেদি চাপতেই পিচিক করে একদলা
মেহেদি বের হয়ে তার হাত মেখে গেল। সে হতবাক
হয়ে বলল,

-‘এই টিকটিকির গু দিয়ে নাম লিখব কিভাবে? হয় কলম দাও নয়তো আমার দাঁতই যথেষ্ট স্ট্যাম্প ছাপার জন্য।’

ভাবিদের দল অউহাসিতে ফেটে পড়ল। একজন সায়নের বাহুতে থাপ্পড় মেরে বলল,

-‘বাসর রাতে দাঁত কাজে লাগিও আপাতত মেহেদি দিয়ে লিখ দেবরজি।’

সায়ন যেহেতু বড় তাই সে আগে লিখতে বসল। হাতে মাখা মেহেদিটুকু আগে টিস্যু দিয়ে মুছল। হাত কাঁপছে। তার হাতের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সিরাত ফট করে বলে বসল,

-‘খাৎনার সময়ও এত কাঁপিস নি বাপ আজ কাঁপছিস কেন? বউকে এত ভয় পেলে চলবে? তুই আমার বীর পুত্র ফটাফট লিখে দে নাম’

সিরাতের কথা শুনে সায়ন কলার উঁচিয়ে সবার দিকে তাকাল। সিমিন কিছু নিয়ে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছে দেখে ফট করে বলে বসল,-‘ছোটো মা, জীবনে প্রথমবার বউয়ের হাতে নাম লিখতে চাচ্ছি দোয়া করো। তা পুত্রবধু পছন্দ হয়েছে তো? এদিকে এসো পরিচয় করিয়ে দেই?’

একথা শুনে সিমিন খতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।
কি বলবেন বুঝতে না পেরে ফট করে বলে বসলেন,
-‘যাও বাবা, কাজ সেরে বীরসন্তানের মতো ফিরে
এসো।’

একথা বলামাত্রই সকলের উচ্চশব্দে হেসে উঠল।
হাসতে হাসতে একেক জন মেঝোতে বসে পড়ল।
সিমিন গতিবিধি না পেয়ে ছুটলেন রান্নাঘরের দিকে।
এরপর কাঁপা হাতে স্বর্নের হাতে সায়ন নিজের নাম
লিখে দিলো। শুদ্ধ লিখতে গিয়ে থেমে গেল। চোখ
তুলে তাকিয়ে একবার তাকিয়ে ঘস ঘস করে কিছু
লিখে উঠে পড়ল। রুবাব বসল,,সেও লিখল। এরপর
অর্ক এসে বসতেই শখ দৃষ্টি নামিয়ে নিলো। শখ হাত
বাড়িয়ে দিলে অর্ক কাঁপা

হাতে ধরল শখের হাত। মজার ব্যাপার হচ্ছে
দুজনেরই হাত কাঁপছে। এই নিয়ে একদফা হাসাহাসি
হলো আর ক্যামেরাম্যান প্রতিটা মুহূর্তের ছবি
ক্যামেরাবন্দী করল।অতঃপর ড্রয়িংরুমে গান বাজনা,
হইচই, খানাপিনাসহ মহিলাদের নানান

আড্ডাবাজি চলতে থাকল। হাতে মেহেদি পরা হলে
সিরাত চারজনকেই নিজের হাতে খাইয়ে স্বর্নের রুমে

রেখে তালা আঁটকে দিলো। এই নিয়েও হাসাহাসি হলো কিছুক্ষণ। বউয়ের হাতে নাম লিখে বাড়ির ছেলেরা চলে গিয়েছিল বাইরে। ফিরল, রাত বারোটার পর। খাবার টেবিলে মা-চাচার কথার ইঙ্গিতে বুঝল আজকে আর বউয়ের দেখা পাবে না। তখন একেক জনের মুখ টা দেখার মতো হলো। বেচারী সায়ন স্বর্নের রুমের দরজার সামনে ঘুরঘুর করল। রুবাব জোরে কথা বলে শুনিয়ে শুনিয়ে রুম পার হলো, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। আর এই দুঃখে তিন ভাই ছাদে গিয়ে বসল। ছাদে বসে চৌধুরী নিবাস দেখতে বেশ লাগছে। তখন ফোনে কল এলো শুদ্ধর। কামরান, হাসান, স্যান্ডি এসেছে ব্যালেচর পার্টি করতে। সে নিচে গিয়ে তাদেরকে ছাদে আনলে ছাদের দরজা বন্ধ করে শুদ্ধ, হাসান, কামরান, সায়ন, রুবাব, স্যান্ডি বসার পর আজম বসল। অর্ক নেই দেখে সায়ন তার কথা জিজ্ঞাসা করলে কামরান বলল,-‘সে আসবে না। বউয়ের ভাইয়ের সামনে দুষ্ট পানি খাওয়ার সাহস নেই তার। এমনিতেও খায় না, খেলে বমি করে।’

সায়ন হাসল। তাকাল শুদ্ধর দিকে। বোঝার চেষ্টা
করল আসলেই সত্যি নাকি নতুন সম্পর্কের জন্য
এমন করল। শুদ্ধ জানাল, অর্ক বিয়ার খায় তবে
মাঝে মাঝে। একদিন জোর করে এক পেগ
গিলিয়েছিল তারপর বমি টমি করে একাকার অবস্থা।
অন্যকোনো নেশা নেই। তবে চুইংগাম চিবায় সব
সময়। একথা শুনে তখন সায়ন বলল,

-‘কেউ আমাদের এক ঠা’প দিতে আমরা তাকে চার
ঠা’প দিয়ে আসি।কেউ একটা টোকা দিলে আমরা মুখ
ফাটিয়ে শাসিয়ে আসি যেন বাড়ি অবধি বিচার না
আনে। আমরা সুযোগ পেলে এক পেগ না বোতল
ধরে গলায় ঢালি। আমরা দৃষ্টে আমাদের বোন জামাই
বেশি ভদ্র হয়ে গেছে।’

তার কথা শুনে সবাই একচোট হাসল। তখন হাসান
জানাল, অর্কের যে মা উনি অন্যরকম মহিলা। যেমন
ভালো তেমন রাগী। উনার ভালোবাসা পেয়ে অর্ক
নিজেকে ওইরকম ভাবে গড়ে তুলেছে যেন তাকে
নিয়ে তার বাবা-মায়ের মধ্যে কোনো সমস্যা সৃষ্টি না
হয়। এসব শুনে বেশ কিছুক্ষণ সবাই চুপ থাকল।
তখন শুদ্ধ বলল,

-‘অর্কের আপন মা নেই। সৎ মায়ের কাছে মানুষ হলেও মানুষের মতো মানুষ হয়েছে। আর ও বরাবরই সম্পর্কের বিচ্ছেদ ভয় পায়। যার মধ্যে এ ভয় থাকে সে প্রতিটা সম্পর্ক যত্নে রাখতে জানে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার বোন ভালো থাকবে। আমার বোনকে কষ্ট দেওয়ার আগে দশ বার ভাববে কারণ সে জানে আমার বোন কষ্ট পেলে আমিও কষ্ট পাব।’ স্যাভি আসার সময় চার বোতল ব্রান্ডের লাল পানি এনেছে। আজমও এনেছে। কামরান এনেছে বিয়ার। ছাদের দরজা বন্ধ করে যে যার মতো পছন্দ সেই জিনিস হাতে তুলে নিলো। শুদ্ধ একটা বিয়ারের বোতলে সিপ নিচ্ছিল তখন শারায়াত চৌধুরী তাকে কল করে দেখা করতে বললেন।

কোনো এক হিসাব মিলাতে পারছেন না সেটার জন্য। অগত্যা যেতেই হলো। ওদিকে শাহাদত চৌধুরী এসেছে উনার সঙ্গে কথা বলে দশ মিনিট পর শুদ্ধ ফিরে এলো। খোলা বিয়ারের বোতলে সিপ নিয়ে গিয়ে ভীষম খেলো। কাশতে কাশতে অবস্থা খারাপ তার। একটু পর বিয়ার ধীরেসুস্থে শেষ করল। শেষ

করে কয়েকবার মাথা ঝাঁকি দিতেই সায়ন বলল,-‘ভাই, কোনো সমস্যা?’

-‘মাথা ব্যথা করছে।’

-‘রুমে যা তাহলে।’

-‘সমস্যা নেই ঠিক আছি।’

কথাটা জোর দিয়ে বললেও শুদ্ধ একটু পর বুঝল তার খুব শরীর খারাপ

করছে। দরদর করে ঘামছেও। শার্টের তিনটে বোতাম খুলে পিঠের দিকে ঠেলে দিয়ে চুপ করে বসে রইল। বাকিরা তখনও কিসব নিয়ে হাসাহাসি করছিল। শুদ্ধ তখন কিছু উপলব্ধি করে কিছুটা খেঁকিয়ে উঠে বলল,

-‘আমার ক্যানে কে কি মিশিয়েছিস?’

তার ধমকানির শব্দে বাকিদের হাসি বন্ধ হয়ে গেল। হতবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তখন রুবাব বলল,

-‘আমরা আবার কি মেশাবো? কেন কি হয়েছে?’

-‘শরীর খারাপ করছে কেন হঠাৎ?’

-‘কেমন শরীর খারাপ? বউকে কাছে পেতে ইচ্ছে করছে বুঝি?’ শুদ্ধ উঠে দাঁড়াল। সে নন-অ্যালকোহলিক বিয়ার ছাড়া বাড়তি কিছুতে হাত

লাগায় নি বিধায় নেশা হওয়ার প্রশ্নই আসে না।
এরাই কিছু একটা মিশিয়েছে। তবে কথা না বাড়িয়ে
রুমের দিকে হাঁটা ধরল। তাকে যেতে দেখে বাকিরা
হো হো করে হেসে উঠল। তাদের হাসিতেই প্রমাণ
সর্বের মধ্যেই ভূত। বাড়ির অনেকে এখনো জেগে
আছে দেখে শুদ্ধ সোজা রুমে চলে গেল। ঠান্ডা
পানিতে শাওয়ার নিয়ে এসে বিছানায় শরীর এলিয়ে
দিয়ে নেত্রজোড়া বন্ধ করে নিলো। কিছু একটা ভেবে
পুনরায় চোখ খুলে হাসানকে ফোন করে বলল আজ
এখানেই থেকে যেতে।

রাত বাড়ছে। গিন্নিরা মেহমানদের ঘুমানো ব্যবস্থা
করে দিয়েছেন। এসব সামলে নিজেরাও যার যার
রুমে চলে গিয়েছেন। ঘড়ির কাঁটার টিকটিক
আওয়াজের সাথে চৌধুরী বাড়ি ধীরে ধীরে শান্ত
হতেই সায়ন চুপিচুপি ছাদ থেকে নামল। পকেট
থেকে চাবি বের করে স্বর্ণের রুমের তালা খুলে দরজা
নক করল। শখ আর ঐশ্বর্য ঘুমিয়েছে। শীতল স্বর্ণের
কাঁধে মাথা রেখে এতক্ষণ বেলকনিতে বসে গল্প
করছিল। দরজা নক হতেই স্বর্ণ বেরিয়ে এলে সায়ন
বলল,-‘শীতল ঘুমিয়েছে?’

-‘না, ওর ঘুম পাচ্ছে না তাই আমাকেও ঘুমাতে দিচ্ছে না। গল্প করছিলাম দুইবোন।’

-‘ওহ, শখ আর ঐশ্বর্য?’

-‘দশ মিনিট হলো ওরা ঘুমিয়েছে।’

-‘শুদ্ধর নাকি খুব শরীর খারাপ করছে। বাড়িভর্তি মেহমান বাবা-মাকে ডাকতে গেলে জানাজানি হলে আরেক ঝামেলা। শীতলকে শুদ্ধর রুমে পাঠিয়ে তুই আমার রুমে আয় তো, জরুরি কথা আছে।’ একথা বলে সায়ন থমথমে মুখে চলে গেল। স্বর্ণ গিয়ে শীতলকে কথাটা জানাতেই শীতল শাড়ি সামলে উঠে দাঁড়াল। হাতভর্তি মেহেদি শুকিয়ে গেছে। শীতল শুদ্ধর রুমে ঢুকলেও স্বর্ণ মিটিমিটি হেসে সায়নের রুমের দিকে তাকাল। তারপর রুমের দরজা ভালোভাবে আঁটকে শুয়ে পড়ল। সে বুঝে গেছে সায়নের চালাকি। এখন গেলে কি হতে পারে তাও জানে। এতদিন ধৈর্য ধরল আর তো মাত্র একটায় রাত। এদিকে সায়ন খুশিতে ডগমগ। স্বর্ণকে জাপটে ধরার জন্য হাতের তালু নিশপিশ করছে তার। কিন্তু যখন দশ মিনিট পেরিয়ে গেলেও স্বর্ণ এলো না তখন রুমের বাইরে এলো। দরজা ঠেলে বুঝল ভেতর

থেকে লক। সে রাগে গজগজ করতে করতে ছাদের
দিকে হাঁটা ধরল। যেতে যেতে স্বর্ণ এমন এমন
মেসেজ করলে স্বর্ণ রাগা তো দূর ঠোঁট কামড়ে ধরে
কোনোমতে হাসি আঁটকাল। শুদ্ধ যাওয়ার পর হাসান,
স্যাভি, কামরানও চলে গেল। অর্ককেও সময় দেওয়া
দরকার। ছাদে রইল রুবাব, সায়ন আর আজম।
অনেকটাই লাল পানি রয়ে গেছে এখনো। আজম ইচ্ছে
মতো গলায় ঢালল। সায়ন, রুবাব যতটুকু খাক
কনট্রোলে থাকলেও আজমের নেশা চড়ে গেছে। রাত
তখন তিনটা। সায়ন টলতে টলতে বোতলগুলো
জঙ্গলের দিকে ছুঁড়ে মারল। ফজরের আজানের আগে
আগে রুমে যেতে হবে নয়তো কে কখন দেখে
কাহিনি শুরু করে দেবে। সায়নের কথা শুনে রুবাব
ধরে উঠে দাঁড়ালেও আজম একেবারেই উঠতে পারল
না। সায়ন তাকে ধরে উঠালে আজম নেশার চোটে
চোখ বন্ধ করে হাত সামনে দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে
হাঁটছে।

সিঁড়ির কাছে গিয়ে সে আর নামবে না। সে নাকি
সিঁড়ির জায়গায় বাঁশ ঝাড় দেখছে। বাঁশঝাড়ে আবার
বাঁশের থেকে কালো কালো গরিলার সংখ্যা বেশি।

এখন কথা হচ্ছে, বাঁশঝাশ এলো কোথা থেকে?
এলো তো এলো কিন্তু এতসব গরিলার আমদানি
হলো কোথা থেকে? সায়ন তাকে ঠেলে নামাতে গেলে
আজম সায়নের দুই পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে
কেঁদে উঠল। বলল,-‘ভাই আমি বাঁশঝাড়ে যাইতাম
না। গরিলা গুলান কেমন কইরা জানি তাকাইতেছে।
আমি গরিলার চুমু নিতাম না ভাই। বাঁচান ভাই।’
সায়ন নিজেও কিছুটা টলছে। সে এবার নিজের
কোমরের টাউজার চেপে ধরে বিরক্তির সুরে বলল,
-‘হারামজাদা টাউজার ছাড়। বউয়ের আগে আমি
কাউকে দেখব না।’

একথা শুনে রুবাব গলা খাঁকারি দিয়ে বলল,
-‘তোমার কালো ছা/পা দেখতে আমাদের বয়েই
গেছে। যাও সরো যেতে দাও।’

কথাখানা সায়নের মোটেও পছন্দ হলো না। সে
থমথমে মুখে বলল,

-‘আমারটা কালো আর তোর টা বুঝি মেকাব করা?’

-‘ভাই তুমি খুব ন্যাস্টিমার্কী কথা বলো।’

-‘ওই তো উচিত কথা বলি যে।’

রুবাব মুখ কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইল। কি জবাব দেবে বুঝতে পারল না। তবে

আজম ভয়ে ভয়ে বলল,-‘ভাই, বাঁশবাগানে গরিলা আইলো কেমন?’

-‘আজম্য! পা ছাড় নয়তো তোদের বাপের বাঁশবাগানের বাঁশ তোর পেছনে দেবো, শালা। যত বলি গালি টালি দেবো আমার মুখ না ছুটালে হয় না।’

-‘রাইগেন না ভাই নতুন বররে রাগতে নাই।’

-‘ হ তুমি আমার প্যান্ট টানাটানি কইরা ল্যাং/টা করার ধান্দা করতেছে আর আমি আবাল সাইজ্জা চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকব। সর শালা, নয়তো এক উস্টা দিয়া প্রতিবন্দী বানায় দিমু।’

আজম নেশায় টাল। পা ছাড়লেই সিঁড়িতে গড়িয়ে পড়ে মরবে নিশ্চিত।

তাই সায়নের পা ছাড়লই না। অগত্যা সায়ন আজমের হাত আর রুবাব পা ধরে দোলাতে দোলাতে সিঁড়ি দিয়ে নামাতে থাকল। নামতে নামতে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল,

-‘শালা গদা ভারি কত রে? শালা আজ থেকে তোর খাওয়া বন্ধ। ‘

একথা বলে সে রুবাবকে বলল

-“দোল দোল দুলুনি’ ছড়া টা বল তো ভাই। ছড়া বলতে বলতে নামলে বোধহয় তাড়াতাড়ি নামতে পারব।’

রুবাব এবার মাথা চুলতে আমতা আমতা করে বলল,

-‘ভাই কবিতার সুর মনে আছে কবিতা মনে নাই।’

-‘ওহ, তাহলে আমি যা বলছি আমার সাথে তাল মিলা।’

-‘হ্যাঁ শুরু করো।

অতঃপর সায়ন গুনগুন করতে ছড়া বলতে

লাগল,দোল দোল দুলুনি

রাঙা মাথায় চিরুণী।

আজরাইল আসবে এখনই

আজম্যকে নিয়ে যাবে সখনই।আজ ১৩ ই নভেম্বর।

সকাল থেকে বিয়ে বাড়ি আরো জমে উঠেছে।

আত্মীয়দের ভিড়ে গমগম করছে পুরো বাড়ি। নানান

কথা, নানান উক্তি-যুক্তিসহ নতুন বর-বউদের নিয়ে

রীতিনীতি চলছে একের পর এক। একেকটা নিয়ম

পালন করতে কখনো হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছে

বাড়ির ছেলে-মেয়েরা।কখনো বিরক্তিতে চোখ মুখ
কুঁচকে ফেলছে। অযৌক্তিক রীতির বাহার দেখে
বাড়ির ছেলেগুলো আগেই জানিয়ে দিয়েছে তারা
এসবের ধাঁরে কাছেও নেই। এসবে যেন টানাটানি না
করে তাদের কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠরা মানলে তো? সরাসরি
জানিয়েছেন নিয়ম না মানলে বাসর রাতে বউ পাবে
না। পেলেও সকালে। একথা শুনে অবশ্য সায়ন আর
রুবাব তর্কা করেছে কিন্তু শুদ্ধ শুধু তাদের কথা শুনে
গেছে। এ ব্যাপারে নাকি তার কিছু বলারও নেই।
কারণ তার ভাষ্যমতে, তার ভাইরা আস্ত পাগল নতুবা
কেউ এসব নিয়েও তর্ক করে? বোকারা তর্কে জড়ায়।
সেধে সেধে বোকা হওয়ার মানে হয়? অন্যের কথা
বাদই থাকুক তার কথায় নাহয় ধরা যাক, এইতো সে
যেমন, গত রাতেও দ্বিতীয় দফা বাসর সেরেছে। কেউ
তা ধরতে পেরেছে? পারে নি। গতরাতে বাসর সেরে
আজকের দিন পেরিয়ে

আরেক রাতের অপেক্ষায় আছে। শুধু পারছে না,
দিনটাকে হাতে ঠেলে পার করতে। মানে বিয়ের আগে
বাসর করে আবার বাসরের অপেক্ষা, ভাবা যায়? না
ভাবারই কথা! এসব ভাবতে গেলে মাথায়

ক্রিমিনালি বুদ্ধি থাকা লাগে। রোমান্টিক হওয়া লাগে।
ইচ্ছে থাকা লাগে। যদিও গতরাতে তেমন প্ল্যান না
থাকলেও হয়ে গেছে। এজন্য অবশ্য শীতল দায়ি। সে
কেন গেল তার কাছে? সে কি ডেকেছিল?মোটোও না!
গেল তো গেল; কাছে টানলে সে অনুষ্ঠানের অজুহাত
দেখাচ্ছিল কেন? অজুহাত শুনেই তার মনের
কৌতুহল বেড়েছিল। মন মরিয়া হয়ে জানার জন্য
উঠে পড়ে লেগেছিল যে অনুষ্ঠানের আগে কিছু মিছু
হলে কি হয়? কি হবে? মূলত কি হয় জানার জন্য
রাতটাকে পরীক্ষাস্বরূপ ব্যবহার করছে। আর এর
ফলাফল কিন্তু এসেছে লেটারমার্কস্! ফিলিংস অসাম।
বিয়ে হয়েছে। বউ তার, আদরের ইচ্ছে তার বাকিসব
বানের জলে ভেসে যাক।সকালের নাস্তা সেরে গায়ে
হলুদের ডালা সাজাতে বসেছে একদল যুবক-যুবতী।
সাজানো হচ্ছে নানান রকম ফল, মিষ্টি, জামা-কাপড়
থেকে শুরু করে আরো নানান প্রসাধনী নিয়ে।
এগুলো নাকি যাবে অর্কের বাসায়। বোনের শশুরবাড়ি
বলে কথা কোনোকিছুর কমতি রাখে নি সায়ন, শুদ্ধ।
বরং এসব জিনিস তারা নিজেরা গিয়ে ঘুরে বেছে
বেস্ট জিনিসগুলোই কিনেছে। গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান

নিয়ে শারাদাত চৌধুরী অর্কের বাবা-মা পুনরায় আলোচনাও করেছেন। আজ মূলত সায়ন-স্বর্ণ, শুদ্ধ-শীতল, রুবাব-ঐশ্বর্য গায়ের হলুদের কথা থাকলেও হঠাৎ অর্ক-শখের বিয়ে ঠিক হলো। সেই হিসেবে, তাদেরও গায়ের হলুদের অনুষ্ঠান। স্বর্ণ ও শখ বাড়ি মেয়ে বিধায় অনুষ্ঠানটা বাড়িতেই হবে এবং আলাদা আলাদা জোড়া মিলিয়ে একসাথে বসে তাদের গায়ে হলুদ ছোঁয়ানো হবে। তিনটে কাপল জোড়া থাকলেও শখ একা হয়ে যাচ্ছে এবং ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না কারো। তাই আলোচনায় বসে ঠিক করা হয়েছে অর্কের গায়ের হলুদ চৌধুরী নিবাসেই হবে। শখের সাথে। শখের পাশে বসে। এই কথায় অর্কের বাবা-মা সম্মতি দিলে বাগানে ঠিক চারটে পদ্মফুল আকৃতির হলুদের স্টেজ করা হয়েছে। পদ্মফুলের মাঝে বসবে বর বউ। ভীষণ সুন্দর করে সাজানো। যার যার স্টেজে জুটির নামও লেখা রয়েছে। পরপর স্টেজ বিধায় সিরিয়াল অনুযায়ী একে একে গিয়ে হলুদ ছোঁয়াতে পারবে। একে তো চারটে বিয়ে একসাথে এবং এক একটা জিনিস ইউনিক ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটাই সকলের নজরে

পড়ছে। মুগ্ধ হচ্ছে। কেউ বা হিংসায় জ্বলে যাচ্ছে।
সকাল থেকে ডালা সাজিয়ে দুপুরের পর কাজ শেষ
হলো। বাকিরা দুপুরে খেয়ে অন্য কাজ করতে করতে
বিকেল হলো। এদিকে নতুন

চার বধূকে সাজানোর হুলস্থূল পড়ে গেছে। কারণ
আত্মীয়রা যখন থেকে শুনেছে নতুন বউরা পার্লামেন্টে
সাজবে না তখন থেকেই সকলে অবাক। গুজুরগুজুর
ফুসুরফুসুর চলছে। এত সুন্দর করে বাড়ি টা সাজানো
হয়েছে। এত রাজকীয় ভাবে অনুষ্ঠান। অথচ নতুন
বউরা নাকি সাজবে না। ব্যাপারটা কেমন হয়ে গেল
না? নতুন বর-বউরা সাজবে না অথচ বাকিরা সেজে
ঘুরে বেড়াবে। মানে যার বিয়ে তার কথা নেই পাড়া-
পড়শীর ঘুম নেই। সম্পর্কে ভাবি-বোন, খালা যখন
এসব নিয়ে যুক্তিতর্ক করছিল তখন হঠাৎ একজন
বলল,-‘এই তোরা চুপ শুদ্ধ ভাই আসছে। ‘

একথা শুনে সকলে নিশ্চুপ। শুদ্ধ তখন ফোনে কথা
বলতে বলতে কোনোদিকে না তাকিয়ে সিঁড়ি বেয়ে
উপরে চলে গেল। তার কথা বলার ভঙ্গি, হাঁটা,
এটিটিউড লেভেল দেখে কারো মনে কিছু ঘটে
গেলেও সকলে চুপ। কারণ ছেলেটা বিবাহিত। এবং

তার বউ যদি জানে তাহলে হুলস্থূল বাঁধিয়ে ফেলবে।

শুদ্ধ যাওয়ামাত্রই একদল

গিয়ে ধরল সিঁতারাকে। অনুমতি চাইল বউ
সাজানোর। কিন্তু শুধু

সিঁতারা না তিন জা কড়াভাবে বারণ করলেন। বাড়ির
ছেলে যখন চাচ্ছে না তখন এসব হবে না। সাজ
মানে ভারি মেকাব না। সাজের ধারণ থাকে। মুখভর্তি
মেকাব করাকেই সাজ বলে না। কড়া জবাব পেয়ে
কেউ আর কিছু বলার সাহস করল না। তবে সেখানে
থাকল না কেউ আর না কোনোকিছুতে হাত দিলো।
এতে অবশ্য কাজকর্ম পড়ে রইল না। কারণ প্রতিটা
কাজের জন্যই লোক নিয়োগ রয়েছে তাই কেউ
পিড়াপিড়িও করল না। তবে এসব নিয়ে ড্রয়িংরুমে
যখন নানান কথা হচ্ছিল তখন ঐশ্বর্য ওখান থেকে
সরে গেছে। অশ্রুসিদ্ধ

ঝাপসা চোখে নিজের বরাদ্দকৃত রুমে গিয়ে শুয়ে
পড়েছে। নীরবে কাঁদছে। কান্নার শব্দ যেন বাইরে না
যায় তাই মুখটা চেপে ধরেছে। সে সবার কথা শুনে
বুঝে ফেলেছে শীতলরা তার জন্য সাজছে না। তবে
তারা এই কথাটা তাকে কেউ জানায় নি। তারা শুধু

ওর জন্য বিশেষ দিনেও সাজবে না এটা মানতে পারছে না সে। খুব খারাপ লাগছে নিজের কাছে। অপরাধী মনে হচ্ছে।

এই অনুষ্ঠানে যদি তারা যুক্ত না হতো তাহলে সবাই সাজত। মজা করত। তাছাড়া বিয়ের সাজ নিয়ে প্রতিটা মেয়েরই আলাদা স্বপ্ন থাকে। কিছু ইচ্ছে থাকে। শীতল খুব চঞ্চল। ভারি সাজ সাজে না। তবে সে সাজতে পছন্দ করে। সেই পিচ্চি মেয়েটা তার জন্য নাকি সাজবে না। এটা কোনো কথা? অবশ্য সাজগোছ নিয়ে তার মধ্যে

হেলদোল দেখা যার নি। সবাই যখন সাজানো নিয়ে কথা বলছিল শীতল তখন খেতে ব্যস্ত। হয়তো সে কষ্ট পাবে বিধায় তাকে বুঝতে দিচ্ছে না কেউই। এসব নানান কথা ভাবতে ভাবতে কান্নার জোর বাড়ল। তার জীবনেও আজ বিশেষ দিন। বিশেষ ক্ষণ, অথচ পাশে কেউ নেই। সায়ন, শুদ্ধকে জামাই আদর করার জন্য তো শাহাদত চৌধুরী আছেন। অর্কের জন্য আছেন শারাফাত চৌধুরী। কিন্তু তার সঙ্গে জুড়ে রুবাব এসবের কিছুই পাবে না। তার ভাগ্যটাই খারাপ। নিজেরও বাবা নেই সহধর্মিণীও

এতিম। শুধু যে এতিম তাও না মুখ পোড়া ঝলসানো
চেহারার এক মেয়ে। ঐশ্বর্য কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ
মনে হলো রুমে অন্য কেউ উপস্থিত। কৌশলে চোখ
মুখ সে পেছনে ঘুরতেই দেখে শখ, স্বর্ণ আর শীতল
দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে

তার দিকেম পরনের হলুদ সুতি শাড়ি। সকাল
থেকেই তাদের শাড়ি পরিয়ে রেখেছে সিরাত। নতুন
বউ বলে কথা, বউরা নতুন শাড়ি না পরলে নাকি
বিয়ে বাড়ি জমে না। মা-চাচী আর পণ্ডিত আত্মীয়ের
মুখের উপর কিছু বলতে না পেরে চারজন হলুদ শাড়ি
পরে ঘুরছে। তারা কেউ ই শাড়িতে অভ্যস্ত না দেখে
সামলে হাঁটছে ধীরে-সুস্থে। এ নিয়ে সায়ন আর রুবাব
একচোট খেঁপিয়েছে তারা নাকি কচ্ছপ। বিয়ের
ড্রেসকোড কচ্ছপের মতো হলে নাকি ভালো হবে।
আজ কে সকাল থেকেই তিনবোন ঐশ্বর্যের সঙ্গে সঙ্গে
থাকছে। একমুহূর্তের জন্যও একা ছাড়ছে না। কেননা
তারা বুঝতে পারছে ঐশ্বর্য ভেতর ভেতর কষ্ট পাচ্ছে।
সে এডুকেটেড স্টাইলিশ একটা মেয়ে। অথচ তার
বিয়ের আয়োজনে তাকে মুখ লুকিয়ে চলতে হচ্ছে।
কেউ যদি তার দিকে কিছুক্ষণ তাকায় সে পালাতে

চায়। কথার ধারালো তীর ঘায়েল করার আগে ওড়না দিয়ে টানে মুখে। রুমের মধ্যে তাদেরকে দেখে ঐশ্বর্য উঠে বসল। জোরপূর্বক হেসে বলল,-‘এসো, বসো।’ শখ তার পাশে বসল। স্বভাবসুলভ মিষ্টি হেসে বলল,-‘কাঁদছো কেন ভাবি? খারাপ লাগছে? ভাইয়াকে ডাকব?’

-‘না। ওই..আসলে মাথা ব্যথা করছে।’

-‘মাথা টিপে দেই শুয়ে পড়ো তো দেখি।’

-‘না ঠিক আছে সেরে যাবে।’

মলিন হেসে কথাটা বলল ঐশ্বর্য। স্বর্ণ বরাবরই স্পষ্টভাষী। মনে যা আসে মুখের উপরে সেটা চটাস করে বলে দেয়। কেন জানি কথা চাপিয়ে রাখতে পারে না। এই এখন যেমন ঐশ্বর্যের কান্নাও পছন্দ হলো না। কেন কাঁদবে? যার রুবারের মতো ভালোবাসার একজন

মানুষ আছে। যে মানুষটা তার জন্য প্রতি নিয়ত লড়ে যাচ্ছে।কেঁদে তাকে হার্ট করা বোকামি নয় কি? মেয়ে হয়েছে বলে যখন তখন কাঁদতে হবে? চোখের পানি এত সস্তা? সে যদি শক্ত নাহয় তাহলে সমাজের

মানুষ তাকে আরো ভেঙে দেবে। মোদাকথা, লড়াই করে

শেষ অবধি গিয়ে ঠুকরো কারনে ভেঙে পড়া মেয়েদেরকে একদমই পছন্দ না। সে যদি এমন করতে থাকে রুবাব তো কষ্ট পাচ্ছেই সেই সঙ্গে শুদ্ধরও খারাপ লাগবে। এক্সিডেন্ট তো বলে কয়ে আসে না।

হয়েই যখন গেছে তখন মানিয়ে নিতে হবে। আর জীবনের চড়াই উৎরাই পার করার নামই তো জীবন। মনে মনে এসব কথা গুছিয়ে নিলেও রুড কিছু বলল না। তবে একেবারে চুপ থাকতেও পারল না। সে কিছুক্ষণ ঐশ্বর্যের দিকে তাকিয়ে রইল। মুখটা আগের মত নেই,,তবে মুখে দাগ নেই চোয়াল থেকে শুরু করে গলার নিচ থেকে খসখসে চমড়া। পোড়া ঝলসানোর ছাপ। তাকে এভাবে তাকাতে দেখে ঐশ্বর্য কথার মাঝখানে থেমে গেল। বুঝল স্বর্নের তাকানোর মানে। মাথা নিচু করতেই ঝরঝর করে অশ্রু ঝরিয়ে গেল ঝরঝর করে। শখ, শীতল তাকে কাঁদতে দেখে অসহায় দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলো

স্বর্ণের দিকে। স্বর্ণ গলল না। তবে শান্ত শীতল স্বরে বলল,-‘তুমি একদম ঠিক ধরেছো আমরা তোমার জন্য সাজছি না। এই যে সাজছি না, এতে আমাদের মনে খারাপ লাগা কাজ করছে না। কেন করছে না, জানো? কারণ রুবাব ভাইকে ফুপাতো ভাই ভেবে আমরা কখনো আলাদা করতে পারি নি আর তুমি হলে আমাদের ভাইয়ের জান। ভাই আর ভাইয়ের জানের জন্য এইটুকু করা যায়।’

ঐশ্বর্য মাথা নিচু করে নিলো। স্বর্ণ পুনরায় বলল,
-‘বিয়ের সাজ শখের অংশ। সাজতেই হবে এমন কোনো কথা নেই।

এমন না যে, না সাজলে চরম ক্ষতি হবে। সাজ ছাড়াও বিয়ে হয়। আর ‘সাজব না’ একথাটা কেন নেগেটিভ ভাবে ধরছো? বিয়েটা পবিত্র বন্ধন। পবিত্র কাজ অযু করে আরম্ভ করতে হয়। আমার মা-চাচীদের আমি এটাই করতে দেখি। ভারি মেকাব আর চাকচিক্যের ভিড়ে শো অফ করানোর মধ্যে কি পবিত্রতা থাকে? যাও মুখ ধুঁয়ে এসো আমরা-আমরাই রেডি হবো। শীতল এদিকে আয়, শখ আপু তোমাকে আগে শাড়ি পরাব। আমিও দেখি মেকাব ছাড়া সাজ

হয় কী না। আমাদের বউ বউ লাগে কী না!’ একথা বলে স্বর্ণ উঠে দাঁড়াল। আধভেজা চুল খোঁপা করে নিজেই দায়িত্ব নিলো বাকিদের তৈরি করার। শীতল তখন শখকে পঁচাতে লাগল। ছোট বোনের পঁচানি শুনে শখ বকা তো দূর লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। অতঃপর চারজন মিলেমিশে নিজেরা তৈরি হলো। মুখে বাড়তি প্রসাধনী বলতে ফেস পাউডার, চোখে গাঢ় করে কাজল আর ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক। হলুদ জামদানী শাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে হিজাব। সঙ্গে ফুলের গয়না। গয়নাটা যদিও অর্ডার করে বানানো। পরনের পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে সাদামাটাও না, তবে মানানসই। আর এটুকুতেই নজর বিঁধে যাচ্ছে তাদের উপর। আর সত্যি বলতে, একজন মানুষের পছন্দ দেখে বোঝা যায় সে কতটা স্মার্ট। কতটা রুচি সম্পূর্ণ মানুষ। বাইরে তখন ধুমধড়ক্কা গান বাজছে। সিঁতার সিমিন, সিরাত এসে তাদের তাড়া দিয়ে গেলেন। অন্যরাও এ রুমে আসতে চাইলে কোনো মতে বুঝিয়ে নিয়ে গেলেন। এদিকে সন্ধ্যা পেরিয়ে মাগরিবের আজানও হয়ে গেছে। ধুমধাড়ক্কা গান বাজছে। চার

পদ্মফুলের স্টেজটা জ্বলজ্বল করছে। বসার আসনের সামনে

সাজিয়ে রাখা নানান রকমের মিষ্টি, পানীয়, ফলসহ আরো কত কী

। ফল টল দিয়ে বানানো কত কী বানানো। এসব মিলিয়ে আটটায়

শুরু হলো হলুদের অনুষ্ঠান। শুদ্ধের বাকি ফ্রেন্ড হইহই করে নাচতে নাচতে মাথার উপর বড় লাল ওড়না ধরে চারবধূকে স্টেজে নেওয়া হলো। শখ, স্বর্ণ, শীতল ও ঐশ্বর্য একে একে যার যার আসনে গিয়ে বসার পর সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা সায়ন, রুবাব, শুদ্ধ, অর্ক 'ও সেখানে উপস্থিত হলো। সুঠাম দেহের চার পুরুষকে যে কী চমৎকার লাগছে। তারা ধীর পায়ে যে যার স্টেজের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মুগ্ধ হয়ে দেখল ব্যক্তিগত ফুলকে। গান থেমে গেছে। থেমে গেছে হইচই।

তারা বউয়ের পাশে গিয়ে না বসে দাঁড়িয়ে আছে দেখে সাফওয়ান

চৌধুরী তখন তাদের উদ্দেশ্যে বললেন,-‘ঐ কি রে, কিরে?’

চারজনই তখন যার যার বউয়ের দিকে তাকিয়ে
ঠোঁটে হাসি এঁটে একযোগে বলল,
-‘মধু! মধু!’

তাদের কাণ্ডে হাসতে লাগল উপস্থিত সকলে।
অতঃপর নতুন বররা বসার আগে সবার প্রথমে
নিজেরাই বউয়ের হলুদ ছোঁয়াল। বউয়ের
উপর সবার আগে অধিকার থাকে তার বরেরই। সেই
হিসেবে দেখা যায় দুনিয়ার এত মানুষ এসে হলুদ
ছুঁয়ে দিলেও আসল মানুষটারই দেওয়া হয় না।
তাদের হলুদ ছুঁয়ে বসল যে যার বউয়ের পাশে। শখ
মাথা নিচু করে আছে দেখে অর্ক আশ্তে করে
ডাকল,-‘শখ?’

শখ তাকাল। অর্ক পাঞ্জাবির পকেট থেকে একজোড়া
নুপুর বের করে বাড়িয়ে দিয়ে বলল,
-‘হলুদ ছুঁইয়ে দোয়া হিসেবে কিছু একটা দিতে হয়।
আমার পক্ষ থেকে এটা।’

শখ নিলো। মিনমিন করে বলল,
-‘আমি কিছু আনি নি।’

-‘ব্যাপার না। তবে চাইলে একটু মিষ্টি খাইয়ে দিতেই
পারো আমি কিছু মনে করব না।’

শখ লজ্জায় জমে গেল। আশেপাশে কত মানুষ।
সবাই তাকিয়ে আছে। মানুষটাও চাচ্ছে, না করাটা কি
ঠিক হবে? শখের অবস্থা অর্ক বুঝল, বলল,
-‘ আচ্ছা সমস্যা নেই।’

শখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। সিরিয়াল অনুযায়ী সবার
প্রথমে স্বর্ণ আর সায়নের স্টেজ। তারপর শুদ্ধ আর
শীতলেন। তারপর রুবাব আর ঐশ্বর্যের এরপর শখ
আর অর্কের। সবার স্টেজের মাঝে তিন কি চার হাত
দূরত্ব। সায়ন একটু পর তাকাচ্ছে স্বর্ণের দিকে।
চোখে মুগ্ধতা। কিছু বলার আগে স্বর্ণ
বলল,-‘আশেপাশে গেস্ট আছে বেফাঁস কথা বললে
খুব খারাপ হবে কিন্তু। ‘

সায়ন থেমে গেল। শারফাত চৌধুরী ও সিঁতারা
একসাথে এদিকে

আসছে দেখে কিছু বলা হলো না আর। তবে পেটের
কথা উগলাবে

সময় বুঝে। এদিকে শুদ্ধ শীতলের দিকে বিরক্তির
নজরে তাকিয়ে আছে। বিশেষ কায়দা ভ্রুঁ কুঁচকে ধীর
স্বরে বলল,

-‘গোসল করিস নি? গায়ে থেকে তেলাপোকা
তোলাপোকা গন্ধ আসছে কেন?’

এ মুহূর্তে কোনো বর তার বউকে একথা বলতে
পারে? পারে? পাশে বসা বিশুদ্ধ পুরুষ পারে। শুনে
শুনে শীতলের অভ্যাস আছে দেখে সে কিছু বলল না।
তবে চুপ থাকলে কথারা পেটের মধ্যে খোঁচাচ্ছে দেখে
জবাব দিলো,

-‘তেলাপোকাক সঙ্গে ঘুমালে এমনই হয়।’

শুদ্ধর ভ্রুঁজোড়া এবার আরো কুঁচকে গেল। আচ্ছা
ব্যাঙাটি তাকে তেলাপোকা বলল? কতবড় সাহস! সে
কিছু বলার আগে শীতল বলল,-‘কেমন লাগছে
আমায়?’

-‘কাজের মেয়ে রহিমার মতো।’

-‘এজন্য ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছেন বুঝি?’

শেষকথাটা চাইলেও মুখে বলা হলো না বললে আর
তাকাবেই না।

তবে মনে মনে হেসে নিলো শীতল। এর আগেও
খেয়াল করেছে

চোখে কাজল পরলে শুদ্ধ বার বার তাকায়। দেখে।
চোখের কাজল পছন্দ করে বিশুদ্ধ পুরুষ মুখ ফুটে

বলবে না। সায়ন আর স্বর্ণকে হলুদ দিয়ে শারাকাত
চৌধুরীরা এগোলেন শুদ্ধদের দিকে। সায়নের গায়ে
হলুদ দিচ্ছেন সাওয়ান ও সিরাত চৌধুরী। বাবা-
মাকে দেখে শুদ্ধ থেমে গেল। শারাকাত চৌধুরী
স্নেহের হাসি ছুঁড়লেন বিনিময়ে তারাও হাসল। সায়ন-
স্বর্ণকেও চোখ ভরে দেখে মন ভরে দোয়া করেছেন।
এদেরও তাই করলেন। রুবাব-ঐশ্বর্যকেও তাই,,
এরপর শখ আর অর্ককেও। এভাবে একে একে
হলুদের অনুষ্ঠান চলতেই থাকল। চারপাশে কত হাসি,
কত মজা, কত আনন্দ। এক স্টেজে বসে আরেক
স্টেজে বসা ভাই-বন্ধুকেও পঁচালো। কামরানরা এলে
তাদের কাণ্ডে সকলে হাসতে হাসতে কাহিল।
অথচ কেউ জানলোই না সবার ভিড়ে বিনা নিমন্ত্রণে
কেউ এখানে এসেছে। যে একবুক কষ্ট নিয়ে ছলছল
চোখ আর ঠোঁটে হাসি ঐটে তাকিয়ে আছে শীতলের
দিকে। দূর থেকে দেখছে এক সমুদ্র সমান তৃষ্ণা
নিয়ে। বিরবির করে আপনমনে বলছে,-‘আমার
ভাগের নিমন্ত্রণ পত্রটা বুঝি কম পড়েছিল তাই পাঠাও
নি,

তাই না? তাতে কি! এই জীবনে আমাকে কেউই ঘটা করে নিমন্ত্রণ করে নি। তাই বলে কি আমি আসব না? তবুও এসেছি, বেহারার মতো তোমাকে দেখতে আবারও ছুঁতে এসেছি বাবুই পাখি। জানো, আজকের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমাকে পাওয়ার আশা রেখেছিলাম।

প্রতি সেকেন্ডে চাচ্ছিলাম শুদ্ধ ম'রে যাক। যেকোনো ভাবে সে ম'রে যাক। সেটা আর চাচ্ছি না। এখন চাচ্ছি, তুমি বেঁচে থাকো। সুখে থাকো। জানো বুরাক চেয়েছিল কিয়ারাকে আঁটকে রাখতে,, পারে নি। এতদিনে খুব করে চেষ্টাও করেছিল। মিষ্টি কথায় না শুনলে সে

ভেবেছিল ভয় দেখিয়ে হলেও নিজের কাছে রেখে দিবে। হলো না।

কিয়ারা আজ সকালে সুইসাইড করেছে। সে এখন কবরের স্থায়ী বাসিন্দা। বুরাকটাও বোধহয় বাঁচবে না তার অবস্থাও ভালো না। ডাক্তাররা আশা দিতে পারছে না। ওদের দেখে আমি এখন খুব করে চাই, তোমাকে আমার হতে হবে না পাখি। আমি এটাও জানি কিয়ারা এত দিন বেঁচে ছিল তুমি তাও থাকবে না।

আর তোমাকে সাদা কাফনে মোড়া অবস্থায় দেখার সাহস আমার নেই। তারচেয়ে তোমার ভালো নিয়ে তুমি খুব ভালো থাকো। বৃষ্টির মতো সুখ বর্ষণ হোক তোমাদের উপর। ওসব সুখ টুখ আমাদের জন্য মরিচিকা, বিভীষিকার মতো অভিশপ্ত।’-‘তোমাকে সাদা কাফনে মোড়া অবস্থায় দেখার সাহস আমার নেই। তারচেয়ে তোমার ভালো নিয়ে তুমি খুব ভালো থাকো। বৃষ্টির মতো সুখ বর্ষণ হোক তোমাদের উপর। ওসব সুখ টুখ আমাদের জন্য মরিচিকা, বিভীষিকার মতো অভিশপ্ত।’একথা বলে দুই পা পেছাতেই কারো বুকের সাথে ধাক্কা খেল ইয়াসির। ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন ফিরে দেখে শাহাদত চৌধুরী দাঁড়িয়ে আছেন। কখন এসে দাঁড়িয়েছেন খেয়াল করে নি সে। হলুদের সাজে শীতলের মুখ দেখে ভুল বসেছিল দিন-দুনিয়া। তারই বা কি দোষ? শীতলের পুতুলের মতো মেকাবহীন স্নিগ্ধ লাজুক মুখটা দেখে নজর সরানো দায়। কি যে সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। শাহাদত চৌধুরীকে দেখেও ইয়াসিরের মধ্যে হেলদোল দেখা গেল না। আরেকবার তাকাল হলুদের স্টেজের

দিকে। শুদ্ধ হয়তো কিছু বলেছে দেখে শীতল লাজুক
মুখে তাকিয়ে আছে শুদ্ধর দিকে। ইস!

তার চোখের চাহনিতে স্পষ্ট শুদ্ধর প্রতি একরাম
মুগ্ধতা ও ভালোবাসা।

শাহাদত চৌধুরী এবার গলা খাঁকারি দিয়ে আশেপাশ
খেয়াল করে নিচু স্বরে বললেন,-‘ তোমার সঙ্গে কথা
বলার রুচি বা ইচ্ছে কোনোটাই আমার নেই। মানুষ
যে এতটা বেহায়া হতে পারে তোমাকে না দেখতে
জানতাম না। বারবার বেঁচে যাচ্ছেো বড় ভাইয়ের
জন্য। মানুষ আর কুকুরের মধ্যে তফাৎ জানো?’

ইয়াসির দৃষ্টি সরিয়ে তাকাল শাহাদত চৌধুরীর দিকে।
ক’দিন আগেও এ কথার বলার সাহস করত না।
করলে বুলেট ফুঁড়ে দিতো বুকের বাঁ পাশে।
কোনোকালে কারো বড় বড় কথা শোনার ধৈর্য্য তার
ছিল না। আজকাল

ভালো মানুষের সংস্পর্শে এসে ধৈর্য্য টা বোধহয়
কয়েকগুন বেড়েছে। এতে ভালো মানুষগুলো তাকে
দূর্বল ভাবতে শুরু করেছে। কিন্তু সে তো এতটা দূর্বল
নয়। বারবার মুখ খুবড়ে পড়ে গিয়ে আবার উঠে
দাঁড়ানোর মতো শক্তি রাখে নিজের মধ্যে। শাহাদত

চৌধুরী তাকে কুকুর বলল তার যে রাগ হচ্ছে তা না।
সে দুই পকেটে হাত গুঁজে হাসল। বলল,
-‘কুকুর খাবার পায় না বিধায় তাড়িয়ে দেওয়ার পরও
মানুষের দ্বারে ঘুরে। লাখি ঝাটা খায়। আপনার কথা
মতো মেনে নিলাম আমি কুকুর। তবে পেটের ক্ষুদায়
আমি কাতর নই আমি কাতর ভালোবাসার ক্ষুদায়।
আপনার ছোটো কন্যা আমার বুকে বিষের ছুরি দিয়ে
জঘন্যভাবে জখম করেছে। আমার আমিটাকে নড়বড়ে
করে দিয়েছে। আর আরেকটা কথা বললেন আপনার
বড় ভাইয়ের জন্য আমি বারবার বেঁচে যাচ্ছি। হিসাব
কষে দেখলাম ঘটনা উল্টো। বরং আপনার বাড়ির
ছেলেরা আপনার ভাইয়ের কারণেই বেঁচে গেল।
নয়তো আমার আল্লাহর কসম শুদ্ধ থাকত কবরে
আজ আমি থাকতাম ওই স্টেজে আপনার মেয়ের
পাশে। জামাতা

হয়ে আপনি হলুদ ছোঁয়াতে আমাদের। আমি ভীষণ
খারাপ! জঘন্যতম খারাপ! আমার জানে মনে দয়া
মায়া খুব কম। শুধু আমার মৃত মায়ের জীবিত
স্বামীকে পুরোপুরি ঘৃণা করতে পারি না বলেই এখনো
ধ্বংসস্তুপ করি নি। নয়তো আমি ইয়াসির খান কি

করতাম, কী পারতাম, ক্ষমতার দাপটসহ দেখিয়ে
দিতাম।’-‘তুমি ছাড়ো নি ইয়াসির! ছাড়তে বাধ্য
হয়েছো। শুদ্ধ-শীতল হসপিটালে

তোমার সামনে দুজন দুজনকে কবুল করেছে। তুমি
দাঁড়িয়ে দেখেছোও।

ওদের ভালোবাসার কাছে তুমিও হেরে গেছো। শুদ্ধ
তোমার মতো পেছন থেকে ছুড়ি বসায় নি বরং শিনা
উঁচু করে ভালোবাসার কথা জানিয়েছে।

তুমি শুধু শুধু ঝামেলা না পাকালে এসব কিছুই হতো
না। অবশ্য ঝামেলা করেছে বলেই, আমার মেয়েও
আরো একধাপ এগিয়ে একরাতের মধ্যে সম্পর্কের
পূর্ণতা এনেছে। এখন বড় বড় কথা বললেও তুমি
ভালো করে জানো শুদ্ধ কোন ধাঁতুর তৈরি।
নাকাচুবানি খাইয়েছে সেটা ভুলে যাও নি নিশ্চয়ই?
আর সেসব অপ্রকাশিত আছে তাই থাকুক। যাই
হোক, আমার

ভাই মানে তোমার বাবা শারায়ত চৌধুরীর আদেশ
তুমি যেন আজকে চৌধুরী বাড়িতে প্রবেশ করো।
খাওয়া দাওয়া করো। যদিও তোমাকে বাড়িতে
টোকানোর কোনো ইচ্ছে নেই শুধু ভাই চাচ্ছে বলে

বলতে বাধ্য হচ্ছি, ভাইয়া তোমার সাথে কথা বলবে।
বাড়ির গেস্ট রুমে গিয়ে ওয়েট করো।'একথা শুনে
ইয়াসির তাকাল দূরে দাঁড়ানো শারায়াত চৌধুরীর
দিকে। যদিও ভেবেছিল চুপচাপ এসে দেখে চলে
যাবে কিন্তু হলো না শারায়াত চৌধুরীর নজরে পড়ে
গেছে। আর কিছুক্ষণ থাকলে শুদ্ধ কিংবা সায়নের
নজরে পড়তে পারে। তারা হয়তো তার উপস্থিতি
পছন্দ না করতে পারে।

আর এজন্যই হয়তো শারায়াত চৌধুরী আড়ালে
ডেকে নিচ্ছেন। বাহ কী সুন্দর ছলচাতুরী! দিনশেষে
রক্তের সম্পর্কের জয়! ইয়াসিরকে তাকাতে
দেখে শারায়াত চৌধুরীর বুকটা ধক করে উঠল।
সেদিনের পর ছেলেটার সঙ্গে উনার দেখা তো দূর
কথাও হয় নি। ছেলেটা আগেও যেমন এড়িয়ে যেতো
এখনো তাই। এই জীবনে ছেলেটা হয়তো উনাকে
বাবার আসনে বসাবে না। সায়ন, শুদ্ধর মতো
মনভরে বাবা বলে ডাকবে না। তবে বেঁচে থাকাকালীন
তিনি তার খোঁজ অবশ্যই রাখবেন। যদি ইয়াসির
একবার বাবা বলে উনাকে ডাকে প্রাণপণে ছুঁটেও
যাবেন। উনার আফসোস ভরা বুকটাতে একটাই

আফসোস ছেলেটা উনাকে শুরু থেকে ভুল বুঝে গেল।

তবুও পাগল হোক, খারাপ হোক, রাগী হোক, বেপরোয়া হোক ছেলেটা এখন উনারই এবং প্রিয় মানুষটার দেওয়া শেষ আমানত। এতদিন প্রচুর চেষ্টা করেছে ছেলেটাকে শুধরানোর কিন্তু যে নিজে ভালো হতে চায় না, তাকে কিভাবে ভালো বানাবেন? তার সঙ্গে দুটো কথা বলবেন সুযোগও দেয় না। বরাবরের মতো আজও মুখ ফুটে ডাকলেন কিন্তু ইয়াসির পাশ কাটিয়ে মেইন গেটের দিকে চলে গেল। ধীরে সুস্থে ধাপ গুনতে গুনতে গেট পেরিয়ে চোখের আড়াল হয়ে গেল। সে যেতেই সায়ন তাকাল শুদ্ধর দিকে। শুদ্ধর দৃষ্টি তখন অদূরে দাঁড়ানো তার বাবার দিকে। সায়নও ঘুরে তাকাল পুনরায় বাবার দিকে। শারায়াত চৌধুরী রুমাল চোখে চেপে ধরে ছিলেন। ভাবখানা এমন যে চোখে কিছু একটা পড়েছে। চোখ মুছে মুখে হাসি এঁটে স্টেজের দিকে তাকাতেই দেখলেন শুদ্ধ তাকিয়ে আছে উনার দিকে। এবারও ছেলের কাছে ধরা পড়ে পাথরের ন্যায় নিশ্চুপ হয়ে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাবার অসহায় মুখখানা দেখে শুদ্ধ নজর সরিয়ে

তাকিয়ে রইল মাটির দিকে। বিয়ে উপলক্ষে চৌধুরী বাড়িতে অনেক মানুষের সমাগম বিধায় সেফটির ব্যবস্থাও রয়েছে, তবে নিঁখুতভাবে। ডিভিল ড্রেসআপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিছু সংখ্যক মানুষ। যারা সন্দেহভাজন কাউকে দেখলেই

ব্যবস্থা নেবে। ইয়াসির হয়তোবা ভেবেছিল তার আগমনের কথা চৌধুরী পুত্ররা জানবে না। কিন্তু ভুল, সে এটাও জানে না তার থেকেও ধুরন্ধর শারাফাত চৌধুরীর ছোটো পুত্র। তারা বোকার মতো কাজ করে নি যে

শত্রুপক্ষ আসবে, লুকিয়ে থাকবে, অথচ তারা ক্ষুণাক্ষনে জানতে পারবে না। মূলত শুদ্ধ অনুমতি দিয়েছে বিধায় এই সময়টুকু থাকতে পেরেছিল ইয়াসির। এবং যে ক মিনিট ছিল কয়েক জোড়া চোখ তারই দিকে স্থির ছিল। চারদিকে আনন্দ- উল্লাসের মাঝে ইয়াসিরের আগমনে কেন জানি শুদ্ধর মনটা বিধিয়ে গেল। এতদিন শারাফাত চৌধুরী কারণে ইয়াসিরের পাপের রাজ্যের ক্ষতি করলেও প্রাণে ছেড়ে দিয়েছিল। তার মানে এই না পূর্বের কর্মকান্ড মাফ করেছে নতুবা কখনো করবে। সে অবশ্য ভেবেছে,

অনুষ্ঠানের পর এ ব্যাপারে সরাসরি কথা বলবে
শারায়্যাত চৌধুরী সাথে।

উনি যদি ইয়াসিরকে স্বীকৃতি দেন বা নিজের কাছে
রাখতে চান; রাখতে পারেন। বাবা ছেলেকে কাছে
রাখবে ভালো কথা। সেক্ষেত্রে সে শীতলকে নিয়ে
অন্যত্র চলে যাবে। প্রবাদ অনুযায়ী তেলে-জলে মিশে
না। তাদের ক্ষেত্রেও তাই। তাছাড়া ইয়াসির শীতলের
প্রতি দুর্বল জানার পরও এক বাড়িতে একসাথে
থাকার প্রশ্নই আসে না। এতটা ভালো মানুষও সে
না। তার তো আবার মনে বিষ রেখে মুখে মধু ঢালার
মতো অভিজ্ঞতাও নেই। এখন শুধু অনুষ্ঠান শেষ
হওয়ার অপেক্ষা।

অতঃপর গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান শেষ হতে রাত
একটা বেজে গেল। তবুও বিয়ের বাড়ির আমেজ যেন
শেষ হওয়ার নয়। রাত যত বাড়তে থাকল

আনন্দ তত দ্বিগুন হলো। স্টেজ থেকে নেমে বাগানের
মাঝখানে চেয়ার পেতে বসল সকলে। মেহমানরাও
আছে। কামরান সিঁতারার একটা লাল ওড়না মাথায়
দিয়ে সাজল শীতল আর হাসান সাজল শুদ্ধ। এরপর
শুদ্ধ শীতল ঠিক যেভাবে ঝগড়া করে ঠিক সেভাবেই

অভিনয় করে দেখাল। হাসানের হাতে চালাকাঠ আর শীতলরূপী কামরান রংঢং করে কোমর বাঁকিয়ে দৌড়াচ্ছে। আর মুখে বলছে, ‘ আর করব না শুদ্ধ ভাই! ভুল হয়ে গেছে আমার। এবারের মতো মাফ করে দেন। জীবনেও অবাধ্য হবো না আপনার।’

এটুকু দিয়ে কামরান আর হাসানের অভিনয় শেষ হলো। এদিকে তাদের অভিনয় দেখে সকলে হাসতে হাসতে কাহিল। এরপর মাঠের মাঝখানে উঠে এলো রুবাব আর সায়ন। রুবাবের মাথায় লাল ওড়না। অর্থাৎ সে এখন শীতলের চরিত্রে আর গম্ভীর হয়ে দাঁড়ানো সায়ন এখন শুদ্ধ। হঠাৎ রুবাব ভিড়ের মাঝে গিয়ে দাঁড়াল তারপর ওড়না উড়িয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে দাঁড়াল সায়ন অর্থাৎ শুদ্ধর সামনে। হাঁপানি রোগীর মতো বুক উঠা করার অভিনয় করল। তারপর একলাফ সায়নের কোলে উঠে সায়নের কানের দুই ইঞ্চি নিচে স্বজোরে কামড় বসিয়ে বলল, ‘শুদ্ধ ভাই আমি যদি আপনার নামে দু’একটা কলঙ্ক মাখি আপনি কি রাগ করবেন?’

একথা বলে রুবাব আরেকটা কামড় বসাল সায়নের কানের নিচে। সায়ন জবাব কি দেবে হেঁড়ে গলায়

চিৎকার করে গালি দিতে লাগল,-‘হারামজাদা ছাড়! ও
মা গো আমি শেষ। আহহহ! আল্লাহ গো আমার গলা।’
সায়ন চিৎকার করতে করতে শুয়ে পড়েছে ঘাসের
মধ্যে। রুবাব বসে আছে সায়নের বুকের উপর।
এদিকে উপস্থিত সকলে হাসতে হাসতে একে
অপরের গায়ে ঠলে পড়েছে। লাথি খাওয়ার ভয়ে
রুবাবও উঠে পালিয়েছে। সায়ন রুবাবকে গালি দিতে
দিতে উঠে বসল। এইটুকু দিয়ে শেষ হলো শুদ্ধ-
শীতলের প্রেম নিবেদন। তখনো উপস্থিত সকলে
হাসছে উচ্চশব্দে। শুদ্ধ মিটিমিটি হাসলেও শীতল
লজ্জায় রাঙা। এরপর মাঠে নামল আজম আর স্যান্ডি।
আজমের কপালে, গালে, নাকে, হাতে, পায়ে ব্যাণ্ডেজ
আর মাথায় সেই লাল ওড়না। আজম এখন শীতলের
চরিত্রে আর স্যান্ডি আছে শুদ্ধর। সায়ন মাইক্রোফোনে
সবাইকে থামতে বললে বাকিরা হাসি থামাল।
নীরাবতায় ছেড়ে গেল চারপাশ। তখন আজম চট
করে ঘাসের উপর হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসল। কান্নার
অভিনয় করল। তখন
স্যান্ডি রূপী শুদ্ধ ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো। বসল
আজমের মুখোমুখি। তার কপালেও ব্যাণ্ডেজ। আজম

তখনো কাঁদছে দেখে স্যান্ডি তার ওড়না তুলল।
শীতলের চোখ মুখে দিয়ে আজলা ভরে মুখটা ধরে
ভীষণ আদুরে সুরে বলল,-‘ কি হয়েছে ব্যাঙাচি
কাঁদছিস কেন তুই?’

আজম তখন চট করে স্যান্ডির কোমর জড়িয়ে ধরে
বুকে মাথা রাখল। তারপর স্যান্ডির পিঠ খামছে ধরে
হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল,

-‘আমার কাউকে দরকার নেই। কারো ভালোবাসার
দরকার নেই। আমার আমার শুধু আপনাকেই চাই
মানে শুধুই আপনাকে।’

স্যান্ডি এবার অসহায় সুরে জবাব দিলো,

-‘আমি তো শুধু তোর, তোরই। থাম না,, প্লিজ
দোহায় লাগে একটু শান্ত হো।’

এইটুকুতে পুরো মাঠ থমকে গেছে। ঘুরে ঘুরে
তাকাচ্ছে পাশাপাশি বসা শুদ্ধ-শীতলের দিকে। মজার
ব্যাপার হলো শুদ্ধর দৃষ্টি শীতলের মুখপানে স্থির
থাকলেও শীতল মাথা নিচু করে বসে আছে। টপটপ
করে তার অশ্রু ঝরে পড়ছে তার হাতের কব্জিতে।
তখন সাম্য সেদিনের ডাক্তারের মতো সেজে সেখানে
উপস্থিত হলো। স্যান্ডির কাঁধে হাত রেখে বড়দের

মতো করে বলল,-‘ইয়াং ম্যান যা চাচ্ছে সম্ভব হলে রাজি হয়ে যাও। ওর শারীরিক মানসিক দুটোই বাজে ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। গুলির আঘাত কারেন্টের শকের পর ও যে বেঁচে আছে এটাই তো শুকরিয়া। যতটুকু বুঝছি ওর হাটেও সমস্যা করছে। যার কারণে বারবার নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে! ওকে স্বাভাবিক করো নয়তো যা লক্ষণ দেখছি হার্ট অ্যাটাক করতে পারে যখন তখন।’

সাম্য কথা শেষ করতেই আজম স্যান্ডির বুকে কপাল ঠেঁকিয়ে জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগল। তখন স্যান্ডি তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে অসহায় সুরে বলল,-‘আমি তোর। প্রমাণ চাস, হ্যাঁ? সকালটা হোক সকালেই বিয়ে করব।’

তখন আজম অস্পষ্ট সুরে হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগল,

-‘আমি আপনার বউ হবো শুদ্ধ ভাই। এখনই হবো,,এই মুহূর্তেই হবো। হয় আপনি আমায় এখনই বিয়ে করবেন নয়তো আমাকে মেরে ফেলবেন। আপনি ছাড়া অন্য কারো অযাচিত স্পর্শ আমার শরীরে এসে লেগেছে।

আমি সহ্য করতে পারছি না। আমি মানতে পারছি না। আপনার পবিত্র ছোঁয়ায় হয় আমাকে পবিত্র করুন নয়তো আজই আমার কবর খোঁড়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন।'এইটুকুতে যেন থমকে গেল পুরো মাঠ। তাদের অভিনয় দেখে উপস্থিত সকলে ভেবেছিল খুব মজার কিছু হবে। কিন্তু শেষে অভিনয় দেখে ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। বেশ কিছুক্ষণ থম মেরে পরিবেশটা পুনরায় মাতিয়ে তুললে শুদ্ধর বন্ধুরা মিলে ফানি ফানি গানে নাচল। নাচ নাকি বাদর নাচ বোঝা গেল না যদিও। তাদের কর্মকাণ্ডে সকলে হাসতে হাসতে কাহিল। হালুদের ডালাতে থাকা ফল মিষ্টিগুলোর সকলে কাড়াকাড়ি করে খেলো।

আগামীকাল বিয়ে। সারাদিন অনেক ধকল যাবে বিধায় নতুন বউদের ফ্রেশ হতে পাঠিয়ে দিলেন সিরাত। ঘড়ির কাঁটা তখন দুই এর ঘরে স্থির।

বউদের তাড়া পেয়ে ছেলেরা হইহই করে করে গেল সায়নের রুমে। রুমে গিয়ে সকলের মধ্যে আজকেও দুটু পানি খাওয়া নিয়ে হইহই বেঁধে গেল। রেড ওয়াইন দেখে আজম আনন্দের চোটে ধরতে গেলে

সায়ন বলল,-‘শুধু ধরেই দেখ, এরপরের কাহিনি পরে বলছি।’

আজম অসহায় চোখে সবার দিকে একবার করে তাকিয়ে সরে বসল।

টোক গিলল পরপর। কামরান লুকিয়ে এক ছিপি আজমের দিকে দিলে সায়ন রুবাবের কোলের উপর পা তুলে দিয়ে বলল,

-‘কামরান তোর পেছনে লাথি দিলে তুই কি রাগ করবি ভাই?’

-‘হে, হে, এত জায়গা থাকতে পেছনে ক্যান ভাই?’

-‘যাতে বসতে না পারিস।’

-‘দিলে আশ্তে দিয়েন প্রথমবার তো।’

তখন আজম সায়নের দিকে হাত পেতে করুণ সুরে বলল,

-‘ভাই একটু দেন না চেটে চেটে খাব।’পরেরদিন সকালবেলা,

আজ ১৪ই নভেম্বর। রোজ বৃহস্পতিবার। দেখতে দেখতে সেই কাজ্জিত দিনটি অবশেষে চলেই এলো। সকাল থেকে সকলে ব্যস্ত। সকালের নাস্তা সেরে নিয়েছে সকলে। ঘড়ির কাঁটা তখন দশের ঘরে।

চারজোড়ার গায়ে হলুদ লাগিয়ে গোসল করানো হবে।
সিঁতারা তড়িঘড়ি চারটে সাদা লুঙ্গি রুবাবের হাতে
ধরিয়ে দিলেন। চার বরকে পরে বাগানে আসতে
বললেন। নতুন বউরা গায়ে হলুদের হলুদ শাড়ি পরে
বাগানে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। গোসল পর
বিয়ের বেশে বউরা তৈরি হতে হবে। তারা যেন দ্রুত
আসে। রুবাব ফোনে কথা বলতে বলতে ইশারায়
বোঝাল আসছে তারা। তারপর কিছুক্ষণ কথা বলে
লুঙ্গি নিয়ে উপরে যাওয়ার পথে দেখা হলো সায়নের
সাথে। আরেকটা জরুরি কল আসায় সে সায়নের
হাতে লুঙ্গি ধরিয়ে দিয়ে কথা সারতে গেল
এককোণে। সায়ন চারটে লুঙ্গি উল্টো পাল্টে দেখে
শুদ্ধর কাছে গেল। বলল,-‘লুঙ্গি! আরাম দায়ক
পোশাক, পরবি ভাই? ফুরফুরাইয়া বাতাস ঢুকবে
ঘামাচি হওয়ার ভয় নাই।’

শুদ্ধ কোলের উপর থেকে লেপটপ সরিয়ে রাখতে
রাখতে বলল,

-‘আমার অভ্যাস নাই যেহেতু রিক্স নিতে চাচ্ছি না,
তুমি পরো।’

-‘আমারও অভ্যাস নাই যদি খুলে যায়?’

-‘গেলে গেল তাতে কি? চট করে খুলে পড়ে গেলে ফট করে তুলে আবার গিটু লাগিয়ে নিবা।

-‘মন্দ বলিস নি তবে লুঙ্গি পরানোর বুদ্ধি কার জানিস?’

-‘সম্ভবত বাবার।’

-‘ওরে বাবার ঘরে বাবা! এখন যাই, বাবার সঙ্গেই মুলাকাত সেরে আসি।’

-‘হুম।’

সায়ন এবার লুঙ্গি হাতে গেল শারাদাত চৌধুরীর কাছে। তখন তিন কতী ড্রয়িংরুমে বসেছিলেন। উনাদের সঙ্গে কথা বলে ফেরার পথে দেখা হলো সিঁতারার সাথে। সিঁতারী ছেলের বাহুতে একটা মেরে বললেন,

-‘কিরে লুঙ্গি পরতে দিলাম পরিস নি কেন?’

-‘ওই দেখো বাবা পরে বসে আছে। কত রিকুয়েষ্ট করলাম বাবা এটা আমার বিয়ের লুঙ্গি আমাকে দাও, দিলোই না। এমন ছোঁচা মার্কী বাবা জীবনেও দেখি নি।’

-‘তোর বিয়ের লুঙ্গি তোর বাবা পরবে কেন? এ লোকের মাথা কি পুরোটা গেল নাকি?’

-‘সম্ভবত ।’ একথা শুনে সিঁতারা গেলে কর্তাদের কাছে ।
সায়ন, শুদ্ধ, রুবারের জন্য কেনা লুঙ্গি শারাদাত,
সায়ন, শাহাদত চৌধুরী পরে বসে আছেন । একে
তো দেরি হয়ে গেছে তার উপরে এরা কাহিনি শুরু
করেছে । উনি এবার বেশ বিরক্তি নিয়ে খ্যাকঁ করে
বললেন,

-‘ছেলেদের লুঙ্গি তোমরা পরে বসে আছো কেন?
খোলো বলছি ।’

-‘মানে কি? কেবলই তো সায়ন লুঙ্গি এনে দিয়ে বলল
বাড়ির সব ছেলেরা নাকি লুঙ্গি পরে ফটোসেশন
করবে । এখনই যেন লুঙ্গি টা পরি ।’

-‘কখন বলল?’

-‘কেবলই । ‘

সিঁতারা বিরক্তি নিয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখলেন
আশেপাশে সায়ন নেই । বাবাদের ফাঁসিয়ে দিয়ে
পালিয়েছে সে । কেমন হাড়ে বজ্জাত ছেলে ভাবা যায়!
সিঁতারা এবার বকতে বকতে চলে গেলে বাকিদের
ডাকতে । সায়ন তখন সিঁড়ি নিচ থেকে দাঁত বের
করে হেসে বলল,

-‘রাগ করে না লক্ষীটি আমরা আমরাই তো।’ একথা বলে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে চলে গেল। সিঁতারা শুদ্ধর রুমে গিয়ে দেখে রুবাব আর অর্ক বসে আছে। চারজনের কেউই লুঙ্গি পরবে না। এত বুঝিয়েও লাভ হলো না। অগত্যা গতকাল রাতের সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে তারা যেতে রাজি হলো। তবে শর্ত একটা মা-চাচী বাদে বাইরে কেউ আজ গায়ে হলুদ ছোঁয়াতে পারবে না। বিশেষ করে দূর সম্পর্কের ভাবিরা। ওদিকে মেয়েগুলো টানা রোদে দাঁড়িয়ে আছে দেখে ঘাড়ত্যাড়া ছেলের কথায় অগত্যা রাজি হতে হলো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে আসার কথা বলে উনি বেরিয়ে গেলেন। তারপর বররা সহ বাকি ছেলেরা সাদা পাজামা পাঞ্জাবি পরে একে একে বাগানে গিয়ে উপস্থিত হলো। বড় এক একটা পিঁড়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে সাদা ফুলের গয়না পরে দাঁড়িয়ে আছে শখ, স্বর্ণ, ঐশ্বর্য, শীতল। সিরাত তখন এগিয়ে এসে রুবাবের কান টেনে বলল,-‘দেখ তো রোদে মেয়েগুলোর মুখ লাল হয়ে গেছে। ড্রেস চেঞ্জ করতে এত সময় লাগে? যা গিয়ে যার যার বউয়ের পেছনে গিয়ে দাঁড়া।’

-‘পিঁড়ার উপর?’

-‘হুম।’

তারপর বউদের পেছনে দাঁড়াল। তখন মা-চাটীরা আগে বউয়ের গায়ে হলুদ লাগিয়ে সেই হলুদ ছেলেদের গায়ে ছোঁয়ালেন। ভাবিরা খিলখিল করে আসতে গেলে সিঁতারা বারণ করলেন। এতে অনেকেই মুখ গোমরা করে দূরে সরে গেল। ঘাসের উপর সামনে সাজিয়ে রাখা ছোট বড় বেশ কয়েকটা কলসে পানি ভর্তি করা। সম্ভবত সাত পুরুরের পানি। কলসের মুখে আমপাতা ডুবানো। এসব কোথাকার কীসব নিয়ম কানুন কে জানে! ছেলেরা বিরক্ত মুখে যেতে গেলে তাড়াহুড়ো করে কাজ সারতে বললেন সিমিন। আরো কিছু কাজ করার থাকলেও ছেলেগুলোর কারণে সেসব বাদই থাকল। তারপর সেই কলসের পানি একে একে ছেলেদের মাথায় ঢালা হলো। সেই পানিতে ভিজলো ঠিক বুকের কাছে দাঁড়ানো যার যার সহধর্মিণী। অতঃপর কোনোমতে নিয়ম পালন করে ওয়াশরুমে গিয়ে ভালো করে গোসল সেরে নিতে বললেন সিঁতারা। ভাবিরা একপ্রকার খোঁচা মেয়ে বললেন, গতরে দম থাকলে

যাৰ যাৰ বউকে কোলে কৰে ওয়াশৰুম অবধি পোঁছে
যেতে। উনাদেৰ বলতে দেৰি সায়েন স্বৰ্ণকে চট কৰে
কোলে তুলে নিলো। যেতে যেতে ফিসফিস কৰে
স্বৰ্ণেৰ কানে কানে বলল,-‘আৰ কয়েক ঘণ্টা
তাৰপৰ,,তাৰপৰ আজ পাশা খেলব রে শ্যাম।’

তাকে দেখে ৰুবাব ঐশ্বৰ্যকে কোলে নিলো। সেও
ফিসফিস কৰে বলল,

-‘ ভালোবাসি হলুদিয়া পাখি।’

তাদেৰ যেতে দেখে অৰ্ক ঘূৰে একবাৰ শুদ্ধৰ দিকে
তাকিয়ে পুনৰায় তাকাল শখের দিকে। নিচু স্বৰে
আমতা আমকা কৰে বলল,

-‘ উঠবে? আমাৰ কোলে?’

শখ লজ্জায় মুখ কাঁচুমাচু কৰলে অৰ্ক বলল,

-‘ তাহলে আমাকে নাও। ‘

শখের ঠোঁটে হাসি খেলে গেল। তখন এক ভাবি
বলল,

-‘কি রে শখ তোৰ জামাই ভয় পাচ্ছে নাকি?’

শখ জবাব দেওয়ার আগে অনুভব কৰল সে অৰ্কের
কোলে। চোখ তুলে বিশ্বয় নিয়ে তাকাতেই দেখা

মিলল হলুদ ভর্তি গালের অর্ককে। তাকে তাকাতে
দেখে অর্ক নিচু স্বরে বলল,

-‘খাও না? ওয়েট নেই বললেই চল। ব্যাপার না,
আমার কাছে গেলে এক মাসেই,,। ‘

বাকি তিনজন গেলেও শুদ্ধ শীতলের মাঝে হেলদোল
নেই। তখন শীতল বলল,-‘ কি হলো? কোলে নিচ্ছেন
না কেন?’

-‘খেয়ে খেয়ে তো কুমড়ো পটাশ হয়েছিস। এখন
কোলে নেওয়া বললে নেওয়া নাকি?’

শীতল চট করে ঘাড় ঘুরিয়ে বিষ্ময় ভরা কণ্ঠে বলল,
-‘ আপনি আমাকে মোটা বললেন? এজন্যই খেতে
চাইতাম না আমি। নিজে বেশি বেশি খাইয়ে মোটা
বানিয়ে এখন খোঁটা দিচ্ছেন। চড়বোই না আপনার
কোলে।’

তারা যাচ্ছে না দেখে বাকিরা যে যার মতো পঁচাতে
লাগল। তবে তারা দুজনই চুপ। সিঁতারা, সিমিন,
সিরাত ভাবলেন লজ্জা পাচ্ছে তাই উনারা যাওয়ার
জন্য জিনিস গোছাতে লাগলেন। তখন শুদ্ধ নিচু স্বরে
শীতলকে বলল,

- ‘ এইটুকু পথ সামলে নে সিঁড়ির অবধি গিয়ে আমার সামলে নেবো।’ শীতল মনে মনে হাসল। সে জানত এমন কিছু বলবে শুদ্ধ। কারণ সে যতটুকু চেনে তার বিশুদ্ধ পুরুষের রোমান্টিকতা সব চার দেওয়ালের মাঝে। মা-চাচীদের সামনে জীবনেও কোলে নেবে না তাকে। আফসোস নেই তার। তার উপরে আবার বাড়ি ভর্তি মানুষ। তবে এমন কিছু করতে হবে যেন কেউ আঙুল তুলতে না পারে। তাই ঘুরে দাঁড়ালো শুদ্ধর দিকে।

তারপর তার হলুদ শাড়ির লাল আঁচল দিয়ে শুদ্ধর এক হাত বেঁধে হাঁটা ধরল বাড়ির দিকে। এমন দৃশ্যে সকলে হইহই করে উঠল। কামরান সিটি বাজাল। তাদের সিটি বাজানোর সুরে সায়ন, রুবাব, অর্ক পেছনে ঘুরে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সাদা পাজামা পাঞ্জাবি পরা আধভেজা গায়ের শুদ্ধর হাত বাঁধা শীতলের শাড়ির আঁচলে। এমন রোমান্টিক এক মুহূর্তে তারাও হইহই করে উঠল। সেই মুহূর্তে কে যেন সাউন্ড গান ছেড়ে দিলো, আঁচলে বান্ধিয়া রাখিবো গো তোমারে

আঁচলে বান্ধিয়া রাখিবো।

চোখের কাজল করিবো গো তোমারে

চোখের কাজল করিবো। শীতল তার হলুদ শাড়ির লাল
আঁচল দিয়ে শুদ্ধর এক হাত বেঁধে হাঁটা ধরল বাড়ির
দিকে। এমন দৃশ্যে হইহই করে উঠল সকলে।

কামরান সিটি বাজাল। বাগানের এককোণে বসা অন্য
আত্মীয়রা চৈঁচিয়ে উঠল। হঠাৎ

সিটি বাজানোর সুরে সায়ন, রুবাব, অর্ক পেছনে
তাকিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা আধভেজা গায়ের শুদ্ধর
একটা হাত বাঁধা শীতলের শাড়ির আঁচলে। শীতলের
চোখ মুখে নিদারুণ লজ্জার রক্তিম আভা। দৃষ্টি মাটির
দিকে। শুদ্ধও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে। তবে
ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বিশুদ্ধ পুরুষের
ঠোঁটের কোণেও

মিটিমিটি হাসি। ব্যাঙাটিকে সামলে নিতে বলেছিল
কিন্তু এভাবে সামলে নেবে সেও ভাবতে পারে নি।
তাদের এমন রোমান্টিক মুহূর্তে বউ কোলে নিয়ে
সায়নরাও হইহই করে উঠল। চৈঁচিয়ে পঁচাতে লাগল
শুদ্ধ শীতলের নাম ধরে। ক্যামেরাম্যান ছবি তুলতে

লাগলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে কে যেন লাউডস্পিকারে
গান ছেড়ে দিলো, আঁচলে বান্ধিয়া রাখিবো গো তোমারে
আঁচলে বান্ধিয়া রাখিবো।

চোখের কাজল করিবো গো তোমারে
চোখের কাজল করিবো।

এমন দৃশ্য আর গান শুনে সকলে ওদের নিয়ে পড়ল।
শীতল শুদ্ধর হাত ধরে টেনে বাড়ির ভেতর প্রবেশ
করল। পেছন পেছন প্রবেশ করল বাকি ভাইরা।
ড্রয়িংরুমে বসা চৌধুরী তিন কর্তা এক নজর দেখে
দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন। বউদের ওয়াশরুম অবধি
পৌঁছানোর কথা থাকলেও কাউকেই বউ নিয়ে উপরে
যেতে দেওয়া হলো না। সায়েন জোরাজোরি করে রাগ
দেখালেও কাজ হলো না। অগত্যা বউদের ড্রয়িংরুমে
রেখে তারা ওপরে চলে গেল। অর্কও আর দাঁড়াল না
শখের দিকে একবার তাকিয়ে বউদের থেকে বিদায়
নিয়ে বাড়ির পথে রওনা হলো। একটুপরে রেডি হয়ে
বরের বেশে আসতে হবে। এখন আসত না তবে
সিঁতারার ডাক অগ্রাহ্য করতে করতে পারে নি।
অর্কের সঙ্গে গেল হাসান, স্যান্ডি আর কামরান। তখন
শখের রুমে নতুন বউদের শাওয়ার নিতে পাঠালেন

সিরাত। একথা শুনে চারজনই একসঙ্গে ওয়াশরুমে
দুকল। বেশ বড়সড় ওয়াশরুমের স্পেস। ওয়াশরুমে
দুকতেই নজরে পড়ে ইতালিয়ান মার্বেলের তৈরি
দেওয়াল। ম পাথরের মতো ঠান্ডা টাইলস। ডানদিকে
বিস্তৃত ফ্রেস্টেড গ্লাস পার্টিশন; যেটা অপালের মতো
ঝাপসা। তার ভেতরে রেইন শাওয়ার। শাওয়ারের
দেয়ালে অ্যাম্বার-লাইট নিস, যেখানে সুগন্ধি অয়েল
আর নরম তোয়ালে সাজানো। বামদিকে চকচকে ওক
কাঠের ভ্যানিটি ইউনিট, তার উপরে স্থাপিত ওভাল
আকৃতির স্টোন বেসিন। বেসিনের কল থেকে বের
হয় উষ্ণ পানির ধারা। যদিও এটা স্রেফ সাধারণ কল
নয়, টাচ-অ্যাক্টিভেটেড ডিজিটাল মিক্সার। আর চৌধুরী
বাড়িতে প্রত্যেকটা ওয়াশরুম প্রায় এক ডিজাইনের।
সঙ্গে রয়েছে আধুনিক সু-ব্যবস্থা। শখ, স্বর্ণ, শীতল ও
ঐশ্বর্য

গল্প করতে করতে হলুদ উঠানোর কাজে লেগে গেল।
সিরাত এসে যার যার ফেসওয়াশ, তোয়ালে, পোশাক
দিয়ে গেল। ফেসওয়াশ মুখে ঘষতে ঘষতে গত
রাতের অভিনয় নিয়ে কথা উঠল। সায়েন, রুবারের
অভিনয় নিয়ে হাসতে শুরু করল। একটুপরে সিমিন

এসে ধমকে গেলেন, নতুন বউদের নাকি জোরে হাসতে নেই। মানুষ মন্দ বলবে। কিন্তু কেউ শুনল না। উনি চলে গেলে শীতল ওয়াশরুমের বালতি উপুড় করে তার উপরে বসল। শখের দিকে তাকিয়ে কিছু ভেবে মিটিমিটি হেসে বলল,-‘আপু? তুমি কিন্তু ভুলেও ঠোঁটে লাল লিপস্টিক দিবে না।’

-‘কেন?’

-‘অর্ক ভাইয়ার পেট খারাপ হতে পারে।’

-‘লিপস্টিকের সাথে উনার পেট খারাপের কি সম্পর্ক?’

-‘ওমা সম্পর্ক থাকবে না? খাবে তো তোমার উনিই, তাই না?’

একথা শুনে শখ লাজুক হেসে একটা মারল শীতলকে। পানি ছুঁড়ে দিলো একমগ। বোনকে লজ্জা পেতে দেখে শীতল খিলখিল করে হেসে এবার স্বর্ণকে বলল,-‘আপু, কাল সকালে কয়টায় ডেকে দিবো ? ফজরের আগে নাকি পরে?’

স্বর্ণ বোনের শয়তানি বুঝে জবাব দিলো না। ফেসওয়াশ দিয়ে পুরো মুখ

ধুয়ে তাকাল বোনের দিকে। স্বর্ণকে জবাব দিতে না
দেখে শীতল পুনরায় বলল,

-‘আপু, বলো? তোমাদের ডাকার জন্য আমাকে তো
জেগে থাকতে হবে।

তাছাড়া আমার একটা দায়িত্ব আছে না? আরে লজ্জার
কিছু নেই তো, বলো, বলো।’

স্বর্ণ এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে শ্যাম্পুর বোতল থেকে
একগাদা শ্যাম্পু শীতলের মাথায় ঢেলে দিলো। ঘষা
দিয়ে ফ্যানা তৈরি করে পিরামিডের মতো করে রেখে
দিলো। দেখতে এবার কার্টুন কার্টুন লাগছে। তাকে
দেখে শখ আর ঐশ্বর্য হেসে ফেলল। হাসল স্বর্ণও।
তবে স্বর্ণের হাসির কারণ একটু ভিন্ন। আর সেটা হলো
শীতলের কাঁধ, গলায় থাকা কিছু দাগ। পাজিটা
অন্যকে পঁচাচ্ছে ঠিকই কিন্তু নিজের দিকে খেয়াল
করেছে কী? ছোট হয়েও খুব তো অন্যের বাসরঘর
নিয়ে মজা নিচ্ছে অথচ বাসরের আগেই তার গায়ে
বাসরের চিহ্ন ফুটে আছে। সে যদি এখন বলে লজ্জায়
সামনেই আসবে না। মুখ কাঁচুমাচু করবে। দূরে দূরে
থাকবে। একথা ভেবে স্বর্ণ আপাতত

কিছু না বললেও কেন জানি ভীষণ হাসি পেল। ঠোঁটে
মিটিমিটি হাসি এঁটে শীতলের মুখের গলার হলুদ
তুলতে সাহায্য করল। সে জবাব দিচ্ছে না দেখে
শীতল বোনের দিকে চোখ তুলে তাকাল। চোখাচোখি
হওয়াতে শীতলের হয়তো টনক নড়ল। সে তড়াক
করে উঠে শাড়ির আঁচল ঘুরিয়ে নিয়ে গলা ঢেকে
নিলো। ইস! বেমানুম ভুলেই বসেছে এটার কথা।
তখন ঐশ্বর্য মিটিমিটি হেসে বলল,-‘ ফজরের আগে
বা পরে স্বর্ণকে কেন ডাকবে শীতল? আমাদেরও
বলো আমরাও শুনি?’

বোনকে একদফা লজ্জায় ফেলার সুযোগ মিস করল
না শীতল। সে দাঁত বের করে হেসে জবাব দিলো,
-‘ বিয়ের পরদিন সকালে ডাকাডাকির কাজ করে
ননদ-ভাবিরা। আরো

কত কিছু শিখিয়ে দিতে হয়। আমিও দেবো। আমি
তো সম্পর্কে আপুর জা, তাই না আপু?’

শখ এবার বিষ্ময়ভরা সুরে বলল,

-‘কি কাজ করতে হয়? আর কি শিখিয়ে দিবি তুই?’

শীতল শয়তানি হেসে বলল,-‘মেজো মায়ের ছোটো
ভাইয়ের বিয়ের কথা মনে আছে? আমরা সবাই বিয়ে

খেতে গেলাম না? আমি দেখেছি বিয়ের পরদিন
সকালে ঘটা করে নতুন বর বউকে গোসল করানো
হয়।’

শখ, ঐশ্বর্য একে অপরের দিকে তাকিয়ে আরেকদফা
হেসে উঠল। তখন স্বর্ণ বলল,

-‘ডাকতে হবে না। তোর জাঁদরেল ভাই যদি বাঁচিয়ে
রাখে আমি একাই উঠতে পারব।’

-‘এই আপু, তুমি কি ভয় পাচ্ছো সায়ন ভাইকে?’

-‘পাচ্ছি।’

-‘কাকে? ভাইয়াকে নাকি তার আদরকে?’

-‘দুটোই।’ স্বর্নের কথা শুনে বাকি তিন অটুহাসিতে
ফেটে পড়ল। সিরাত এসে ধমক দিয়ে গোসল সারতে
তাড়া দিলো তাদের। রেডি হতে হবে। সময় কি আর
বসে আছে? বকা শুনে একে একে ফ্রস্টেড গ্লাস
পাটিশানে গিয়ে গোসল সারল। ভেজা কাপড় ধুয়ে
বালতিতে রাখল। এগুলো পরে মেলে দেওয়া হবে।
রেডি হতে হবে বিধায় কেউই শাড়ি পরল না। চুল
শুকানোর কাজে লেগে গেল। শীতল গোসল সেরে
আধশোয়া হয়ে সিলিং এর নিচে বসল।

ঝটফট ফোন হাতে তুলে রংঢং করে কয়েকটা ছবি
তুলে শুদ্ধকে পাঠিয়ে দিলো। মিটিমিটি হাসতে হাসতে
মেসেজ করল, 'বিয়ের গোসল ডান। নতুন বরের
অপেক্ষায়।' সঙ্গে সঙ্গে মেসেজ সিন হলো। যা
সচারাচর হয় না। তবে কী ফোন হাতে নিয়ে বসেছিল
? কিছু টাইপ হচ্ছে দেখে শীতল অধির আগ্রহে
তাকিয়ে রইল। তখন টুং করে মেসেজ এলো, 'ওয়েট
করছি।' - 'কেন?'

- 'শাওয়ার নিবো।'

- 'কেবল নিলাম।'

- 'তাতে কি, আবার নিবি।'

- 'পারব না।'

- 'কেন?'

- 'ভাইয়ারা সবাই সবার বউকে কোলে নিলো আপনি
নিলেন না। আমার কী ইচ্ছে হতে পারে না আমার
বরের কোলে চড়ার। যেহেতু নেন নি আমিও আর
আপনার ধারে কাছে যাব না।' - 'কে বলল নিবো না?'

- 'নিবেন নাকি? কখন শুনি?'

- 'সুযোগ বুঝে।'

- 'কত সেকেন্ডের জন্য শুনি?'

-‘বউ যতক্ষণ চাইবে।’

-‘সিওর?’

-‘সিওর। শাওয়ার নিতে হবে জলদি আসা হোক।’

-‘আজ একা নেওয়া হোক।’

-‘আসতে বলেছি।’

-‘না বলেছি।’

-‘খুব সাহস বেড়েছে, না? ঘড়ির কাঁটা কিন্তু ঘুরছে।

দিন পেরিয়ে রাত আসবে। ভাবিরা তোকে একা রেখে

যাবে আমার রুমে। রাত গভীর হবে। আমিও থাকব

রুমে। তা মনে আছে তো আজ আমাদের কী

রাত?’-‘যে পুরুষ নিজের বউকে কোলে নিতে পারে

না তার মতো দুর্বল পুরুষের কাছে আমি যাব না।’

-‘আমি দুর্বল!’

লাস্ট মেসেজ সিন করে শুদ্ধ অফলাইনে চলে গেল।

শীতল দাঁত দিয়ে নখ কাটতে কাটতে ভাবুক হয়ে

বসে রইল। কি বলতে কী বলে ফেলল। সে কী সেই

দুর্বলের কথা বলেছে নাকি? এখন কি করে বোঝাবে

এটা ওই দুর্বল না। মুখ গোমরা করে ফোন রেখে

আগে চুল শুকিয়ে নিলো। মেকাব দিয়ে সাজবে না

তবে ড্রেস, চুল,পরিপাটি করে দেওয়ার জন্য দুজন

মেয়ে আসবে। উনাদের রুমে পাঠানোর আগে সিঁতারা তড়িঘড়ি রুমে এলেন। মেহমানরা ভিড় বাড়ার আগে চারজনকে সামনে বসিয়ে নিজের হাতে খাইয়ে দিলেন। শখ মায়ের হাতে খেতে গিয়ে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলো। সিঁতারাও বুকচাপা কষ্ট চেপে মেয়েগুলোকে খাইয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। উনি যেতেই সাম্য, সৃজন হাজির হলো। তাদের হাতে বই জাতীয় কিছু। তারা নাচতে নাচতে এসে বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। শীতল পুনরায় শিখিয়ে দিলো চার দুলাভাইদের থেকে কীভাবে টাকা হাতাতে হবে। যদিও গোপনে কদিন থেকেই ট্রেনিং দিচ্ছে সে। শর্ত একটাই তাকেও ভাগ দিতে হবে। তিনমাথা যুক্তি পরামর্শ

করছে দেখে কেউ বিরক্ত করল না। শুধু শুনে গেল তিন পাজির কথা। তখন সায়েন স্বর্ণকে ফোন করে বেশ আদুরে সুরে ডাকল,-‘জান?’

-‘হুম।’

-‘বিজি?’

-‘না।’

-‘একটু আসি? বুকের ভেতরটা কেমন চিনচিন করছে।’

-‘গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা বোধহয় ওষুধ খাও।’

-‘বাল খাও। রুমে মানুষ আছে?’

-‘হুম।’

-‘ওহ। আচ্ছা শোন, সাম্য, সৃজনের হাতে ক্যাটালগ পাঠালাম চারজন দেখে চুজ কর কেমন ডেকোরেশন চাস।’

-‘কিসের ডেকোরেশন?’

-‘বাসরঘরের?’

-‘আমাদের দেখতে হবে কেন? তোমরা ঠিক করো।’

-‘পারব না। আমরা বাসরঘর নষ্ট করার প্রস্তুতি নিচ্ছি। তোরা কর।’

শীতল স্বর্ণের ফোনের সাথে কান লাগিয়ে শুনছিল কথা। এক পর্যায়ে খিলখিল করে উঠল। তার হাসির শব্দ শুনে সায়েন বলল,-‘আরেক পাগলি হাসছে কেন? দাঁত খুলে পা কেটে যাবে তো। তাছাড়া শুদ্ধ কি ফোঁকলা বউ নিবে? আচ্ছা জান, যারা ফোঁকলা তারা ঠিকঠাক কবুল বলতে পারে তো? নাকি দাঁতের ফাঁক দিয়ে কবুল বেরিয়ে যায়।’

শীতল ততক্ষণে সরে গেছে। বিছানায় বসে গড়িয়ে
গড়িয়ে হাসছে দেখে সায়ন ফিসফিস করে বলল,
-‘জান? বনু কি শুনে ফেলল নাকি?’

-‘হুম।’

সায়ন এবার খুকখুক করে হাসল। তারপর গলা
খাঁকারি দিয়ে রুবাবের উদ্দেশ্যে বলল,

-‘সামান্য একটা শর্ট নিয়েছিলাম বলে তোর মামা
কত কথা শুনাল। এই দেখ বাড়িল বাড়িল কিনে
এনেছি। এই শাহরিয়ার সায়ন গরীব না রে, গরীব
না। যা অফার দিলাম কার কয়টা লাগবে নিয়ে যা।
যাওয়ার আগে বলে যা, সাদা পাজামার নিচে কোন
রঙের টা পরব?’-‘পিংক নাই? না মানে মেয়েরা
গোলাপি পুঁকি জিনিস পছন্দ করে। স্বর্ণও বোধহয়
পুঁকি জামাই পছন্দ করবে। পিংক কালার পরো।’

-‘আজ রাতে এমনিতেই মেলা এনার্জি লস হবে
তাকে মেরে আপাতত এনার্জি লস করতে চাচ্ছি না।
তুইও না নতুন বর? চল, আয়, মিলেমিশে
ভদ্রতার ভাণ করি?’

একথা শুনে রুবাব সায় দিলো। তারপর সবগুলো শর্ট
হাতড়ে নিজের ঠোঁটে চিমটি চিমটি কাটতে কাটতে

কিছু একটা ভাবল। তারপর বিজ্ঞের মতো জবাব দিলো,

-‘সাদার নিচে কালোটা ফুটবে ভালো। ব্রান্ডের জিনিস পরবা মানুষকে না দেখালে চলে? কালোটাই পরো।’
সায়ন কটমট করে তাকিয়ে রুবাবকে কিছু না বলে স্বর্ণকে বলল,

-‘কার কোন ডেকোরেশন পছন্দ মেসেঞ্জারে জানা।
একটুপরে লোক আসবে রুম সাজাতে, দেরি করিস না। আমি তোর ভাইকে একটু সাইজ করি ততক্ষণে।’

একথা বলে কল কেটে দিলো। রুবাব দৌড়ে খাটের এককোণে দাঁড়িয়ে সমানে চেষ্টাচ্ছে। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না ছোটোবেলার মতো দুই ভাই মারামারি করতে লাগল।_‘আপনার সংসার করব না আমি। ঘৃণা করি আপনাকে। আপনি আমার জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছেন। আপনি নিকৃষ্ট। খারাপ। জীব জানোয়ারের থেকেও অধম আপনি।’

উক্ত কথা টি বলে কিয়ারা হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। ছুঁতে গেলেই সে এসব শুরু করে। কিল, ঘুষি খামচি কোনোটা বাদ রাখে না। তবে বিশেষ মুহূর্তে

এমন কিল, ঘুষি, খামচি খুব একটা খারাপ লাগে না
বুরাকের। সে বরং বউয়ের ছেলেমানুষী ভেবে
হাসিমুখে গ্রহণ করে। এমনিতে আগের মতো কাছে
টানে না। তবে সপ্তাহে দু'একদিন যাও টানে এভাবে
রিয়েক্ট করে। এমন তো না যে প্রথম স্পর্শ করছে
তবুও রোজকার এসব কাহিনি ভালো লাগে না। বিয়ে
করা বউয়ের সাথে জোরাজুরি কিসের? নিজের
চাহিদা মিটিয়ে যখন ফ্রেশ হয়ে এলো কিয়ারা তখনও
নিশ্চুপ হয়ে শুয়ে ছিল। আজ সকালে এনে দেওয়া
শপিং ছুঁয়েও দেখে নি। সেগুলো বের করে সে নিজে
বলল,- 'থ্রি-পিচ যা ছিল ফেলে দিয়েছি। এবার থেকে
সবসময় শাড়ি পরবে। শাড়ি পরা নারী আমার একটু
বেশিই পছন্দ। '

প্রায় দিন এমন করে দেখে বুরাকও কিছু বলল না।
পাস্তা আনিয়ে খেতে খেতে বলল,

- 'শুনলাম, চৌধুরীরা তিনপুত্রের বিয়ের অনুষ্ঠান
একসাথে করবে। যাবে নাকি বান্ধবীর বিয়েতে?'

একথা শুনে কিয়ারার কান্না বন্ধ হয়ে গেল। সে
অশ্রুসিক্ত চোখে তাকিয়ে ভেজা গলায় জিজ্ঞাসা করল,

- 'কার বিয়ে?'

-‘তোমার ফ্রেন্ড শীতলের। সঙ্গে সাইন- স্বর্ণ আর
রুবাব-ঐশ্বর্যের বিয়েও একসাথে সারবে।’

-‘রু..বাব? কোন রুবাব?’-‘ নাগরকে এত তাড়াতাড়ি
ভুলে গেলে? নাকি আমার মুখ থেকে শুনতে চাচ্ছে,
হুম?’

কিয়ারা শোয়া থেকে উঠে বসল। গায়ে চাদর জড়িয়ে
পুনরায় শুধালো,

-‘বলুন? কোন রুবাবের কথা বলছেন? শীতলের
ফুপাতো ভাই রুবাবের
কথা বলছেন?’

-‘বোধহয়।’

-‘কবে বিয়ে? কার সাথে বিয়ে?’

-‘বলব না।’

কিয়ারা বুকের চাদর আঁকড়ে ধরে নিচে নামল।
উতলা হয়ে বুরাকের পা ধরে বসে পড়ল। অসহায়
সুরে কাঁদতে কাঁদতে বলল,

-‘ বলুন না প্লিজ! রুবাব কি ওই মেয়েটাকে
ভালোবাসতো? নাকি অরেঞ্জ ম্যারেজ? কবে বিয়ে
ওদের? আমি যাব,,নিয়ে চলুন না আমায়।’কিয়ারার
মনে হলো তার দম আঁটকে আসছে। গোপন

কুঠুরিতে লুকিয়ে রাখা মানুষটার বিয়ে? তাকে তো
জানানো হলো না মনের কথা। লুকানো ভালোবাসা
হলোও মানুষটাকে ভালোবাসে সে; খুব ভালোবাসে।
বুরাক একটা কথার জবাবও দিলো না। বারবার
অনুরোধ করলেও না। কিয়ারা

অসহায় হয়ে থম মেরে বসে রইল। হাঁটুতে মুখ গুঁজে
কাঁদতে লাগল। তার

কান্না দেখে রুবাকের কেন জানি পৈশাচিক আনন্দ
হলো। বেশ গর্ব হলো নিজের ভালোবাসাকে নিজের
কাছে আঁটকে রাখতে পেরে। সত্যি বলতে

ভালোবাসার মানুষকে ধরে রাখতেও ভাগ্য লাগে।
এদিক থেকে ইয়াসির হেরে গেছে, আর সে জোর
করে হলেও তার ভালোবাসাকে জিতে নিয়ে জয়ী
হয়েছে। মনে মনে এসব ভেবে ওষ্ঠে হাসি এঁটে
টিভিতে হিন্দি গান ছেড়ে দিলো। গানের সাউন্ড
বাড়িয়ে দিলো নিজেও সুর মেলাতে লাগল। অতঃপর
জরুরি কল আসায় রেডি হয়ে গুনগুন করতে করতে
বেরিয়ে গেল। সারাদিন পেরিয়ে ফিরল, রাত
এগোঁটায়। বউটাকে কাঁদতে দেখে বেরিয়েছিল তাই
মন ভালো করতে অনেক গুলো চকলেট আর গোলাপ

ফুল এনেছে। সেগুলো হাতে নিয়ে রুমের ঢুকে দেখে
কিয়ারা দেহ সিলিং

ফ্যানের সাথে ঝুলছে। তার এনে দেওয়া শাড়ি দিয়ে
ফাঁস দিয়েছে। এত ঘৃণা মনে? এত জেদ? সকালেই
না ভালোবাসা পাওয়া নিয়ে গর্ব করল সে? অথচ দিন
পেরিয়ে রাত নামতে না নামতেই কিয়ারা তাকে
এভাবে হারিয়ে দিলো? তার গর্ব ধূলোয় মিশিয়ে
দিলো? তাহলে ইয়াসির নিজের অধিকার ছেড়ে দিয়ে
বুদ্ধিমানের কাজ করল? এ পরিস্থিতি তাই বলছে।
নতুবা দিনশেষে পেয়েও হারিয়ে ফেলল কেন। হতভম্ব
বুরাক যখন দ্রুত

শাড়ি কেটে কিয়ারাকে নামাল তখন কিয়ারা প্রাণহীন
দেহমাত্র। গলায়

ফাঁসের মোটা দাগ। জিহ্বায দাঁত গেঁথে আছে। হাত-
পা বরফের ন্যায় ঠান্ডা। সে কত করে ডাকল কিন্তু
শুনলোই না পাষাণ মেয়েটা। তবুও সে
দৌড়াদৌড়ি করে হসপিটালের নিয়ে গেল। তখন
জানা গেল মেয়েটি আর নেই। এবং সে দেড় মাসের
প্রেগনেন্ট ছিল। একথা শুনে বুরাক যেন পাথর বনে

গেল। প্রাণহীন কিয়ারার পাজোড়া ধরে হাউমাউ করে
কেঁদে

মাফ চাইল। ফিরে আসার কত অনুরোধ করল।
তাকে তার বাবা-মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার
ওয়াদা করল। কিন্তু কিছুতে কিছু হলো না। তবে
শেষ মুহূর্তে কিয়ারার মৃত দেহ বাবা-মায়ের কাছে
পৌঁছে সত্যটা জানিয়ে ফেরার পথে বুরাক এক্সিডেন্ট
করে। এটা যে কাক্সিত সুইসাইড করার চেষ্টা বুঝতে
বাকি নেই কারো। তারপর থেকে বুরাক হাসপিটালেই
ছিল।

ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিল। অতঃপর
ডাক্তারদের সব চেষ্টা

বৃথা করে আজ সকলে সেও না ফেরার দেশে চলে
গেল। কিয়ারা ফাঁকি দিলো সেও বেহায়ার মতো
পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে তারই পিছু নিলো। কি
অদ্ভুত ভালোবাসা! পৃথিবীর মানুষ চলে নিজ নিয়মে
যার যার জীবনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

কেউ কারো জন্য থেমে থাকে না। সময়, পরিস্থিতি,
থামতে দেয় না। শূন্য নিজেও শূন্যস্থান পছন্দ করে
না। প্রকৃতি হিসাব ভুলে না। সব মিলিয়ে যা যার

প্রাপ্য, কৃতিত্ব সব মিলে মিশে একাকার হবে। শূন্যের হিসাবে একটি সংখ্যা বসে পূর্ণ হবেই। সেই হিসেবে আজ ১৪ নভেম্বর। একই দিন। একই বার। একই দেশ। ঘড়ির কাঁটাটাও চলছে এক নিয়মে। অথচ পরিস্থিতির নির্মম কড়াঘাতে বুরাকের লাশ নিতে ইয়াসির নিজে গেছে হসপিটালে। অপেক্ষা করছে বিশ্বস্ত সহকারীর লাশ নেওয়ার জন্য। এই লাশের নামটা ছিল বুবাক। মানুষটা যখন আর নেই নামের কদরই বা আর কে করবে? এদিকে বুবাক আর কিয়ারার জার্নি যেখানে শেষ অন্যদিকে আজকের দিনে চৌধুরী নিবাসে চলছে সুখের মাতম। চার জোড়া দম্পতির মধুর মিলনের মৌসুম। পূর্ণতার শুভক্ষণ। কারণ, ওই একটাই; পৃথিবীর মানুষ চলে যার যার জীবনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে! সময়ের হিসেবে। বহমান জীবনের গতিপথকে অনুসরণ করে। ঘড়িতে সময় একটা বেজে তেরো মিনিট। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমন্ত্রিত মেহমানরা উপস্থিত। বেড়েছে হৈ-হুল্লোড়। বাগানের মাঝখানে উঁচু করে তৈরি করা হয়েছে রাজকীয় স্টেজ। চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্য মন্ডিত স্টেজ বিষয় নিয়ে তাকিয়ে থাকার

মতোই। গোল্ডেন ফ্রেমে অর্কিড ও টকটকে লাল
গোলাপের ফুলঝুরি দিয়ে সাজানো চারপাশ। আধুনিক,
রুচিসম্মত ডেকোরেশন দেখে সকলে চৌধুরীদের
রুচির প্রশংসা করতে বাধ্য। তারা যে ছেলে-মেয়ের
বিয়েতে দিলখোলা মনে অর্থ ব্যয় করেছে সেটা বলার
অপেক্ষা রাখে না। স্টেজের মাঝখানে ক্রিস্টাল
সিংহাসন। নতুন বর-বউ জোড়ায় জোড়ায় বসবে
এখানে। সিংহাসনের পেছনের দিকে ছোট বড় কাঁচের
লণ্ঠন। যাওয়া আসার জন্য রয়েছে লম্বা ওয়াকওয়ে।
কার্পেট এর উপর পাপড়ি ছড়ানো রাজপথ। এ পথ
দিয়ে প্রবেশ করবে চার দম্পত্তি। স্টেজের নিচু আসনে
বসে আছেন অতিথিরা। সারি সারি চেয়ার পেতে
বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনেকে বসে গল্প
আড্ডায় মেতেছে কেউবা ছুটেছে ফুড কর্নারের
দিকে। বর-বউ যেহেতু আসে নি সুযোগ বুঝে পেট
ঠান্ডা করে নিচ্ছে। বাগানের ডান পাশে তৈরি করা
হয়েছে বিশাল লাইভ ফুড কর্নার। একদিকে ধোঁয়া
উঠছে লাইভ কাবাব স্টেশন থেকে। সেখান তৈরি
হচ্ছে চিকেন মালাই, রেশমি ও বিফ সিক কাবাব।
কাবারের ঘ্রাণে ম ম করছে চারিপাশ। আরেকদিকে

ব্যবস্থা করা হয়েছে লাইভ পাস্তার। মাঝবয়সী এক
শেফ অতিথিদের পছন্দমতো পাস্তা রেডি করে দিচ্ছে।
এর পাশে ফুচকার স্টল। টক, ঝাল, মিষ্টি, মিশ্র চার
রকমের পানি দিয়ে ফুচকা খাচ্ছে নানান বয়সী গেস্ট।
বিশেষ করে একটু বেশি ভিড় করেছে মেয়েরা। বেশ
মজা করে খাচ্ছে ফুচকা। খাবারের মান যথেষ্ট ভালো
এই নিয়েও আলোচনা হচ্ছে। এসবের পর মেইন
বাহেটে টেবিলে সাজানো। সেখানে রয়েছে কাচ্চি,
রোস্ট, রেজালা, চাইনিজ ডিশ, স্যালাড, ডিপস আর
এসব সোনালি ঢাকনাওয়ালা হিটারে সাজানো।
গেস্টটা নিজেদের

মতো তুলে নিতে পারবে। এর অপরপাশে বেশ বড়ো
সড় ডেজার্ট জোন। সেখানে চকোলেট ফাউন্টেন টপ
টপ করে পড়ছে আর বাচ্চারা পছন্দ সই ফল ডুবিয়ে
মজা করে খাচ্ছে। চকলেট মুখ মেখে একাকার।
পরনের ড্রেস নষ্ট হচ্ছে তবুও থেমে নেই। খেতেই
হবে চকলেট বলে কথা! ডেজার্ট জোনের সঙ্গে
লাগোয়া আরেকটি স্টলে মিঠাই আইল্যান্ড, রসমালাই,
লালমোহন, বাসুন্ধরা, কস্টমাইজড কাপকেক সাজিয়ে
রাখা। এর থেকে একটু দূরে পানীয়ের ব্যবস্থাও

রয়েছে। সেখানে মিন্ট লেমোনেড, স্ট্রবেরি ফিজ, ব্ল্যাক কারেন্ট মিক্স সব কাঁচের আলোঠাসা কাউন্টারে রাখা আর অন্যপাশে কফি বার। সময় যত বাড়ছে মানুষের সংখ্যাও তত বাড়ছে। নামি-দামি অনেকজন গেস্ট হিসেবে এসেছে। মেহমানরা বসে আছেন দেখে শারাবাত চৌধুরী ছেলের পুনরায় তাড়া দিলেন। বকলেনও ইচ্ছেমতো। যেখানে বউরা সেজেগুজে রেডি সেখানে ছেলেরা এখনো নামে নি। বউয়ের মেকাব কি তারা করছে? ছেলে মানুষের রেডি হতে এতক্ষণ লাগে? পৃথিবীতে আর মানুষ বিয়ে করে নি নাকি ওরাই একা বিয়ের পিঁড়িতে বসছে? এত বকে যখন কাজ হলোই না তখন সাফওয়ান চৌধুরী দোতলায় ছুটলেন। গিয়ে দেখলেন তিনজন জমিয়ে গল্প করছে। হরমুড়িয়ে উনাকে আসতে দেখে সাইন বলল,-‘ চাচ্চু আমাদের কি লজ্জা পাওয়ার ভাগ ধরতে হবে? মুখে রুমাল ধরে রাখব? কতক্ষণ রাখব টাইম বলে দাও।’

একথা শুনে সাফওয়ান চৌধুরী হতবাক হয়ে বললেন,
-‘তোরা কি লজ্জা পাচ্ছিস?’

-‘একেবারেই যে পাচ্ছি না, তা না। নতুন বর হিসেবে একটু একটু পাচ্ছি আর কি।’

-‘আরে ব্যাটা, ছেলে মানুষের আবার কিসের লজ্জা?’

-‘আমিও তো রুবাব আর শুদ্ধকে এটাই বোঝাচ্ছি।

কিন্তু ওরা বলল একটু লজ্জা না পেলে নাকি শাহাদত চৌধুরী বউ দিবে না। তাই ভাণ

ধরার রিহাসাল করছিলাম।’একথা শুনে সাফওয়ান

চৌধুরী হেসে ফেললেন। নজর ঘুরিয়ে তাকালেন

তিনছেলের দিকে। মুখভরে হাসলেন তবে কিছু

বললেন না। ছেলেরা বড় হলে বাবারা মুখের উপর

প্রশংসা করতে পারে না, করলে ছেলেরা লজ্জা পায়।

তবে বিপরীতে কিছু বলার আগেই নিচ থেকে পুনরায়

ডাক ভেসে এলো। উনি ওদেরকে নিয়ে নিচে

নামলেন। সায়ন, শুদ্ধ, রুবাব তিনজনে বরের বেশে

দ্রয়িংরুমে শারাকাত চৌধুরীর সামনে দাঁড়াল। লম্বা-

চওড়া, তিন সুদর্শন যুবককে দেখে চোখ জুড়িয়ে

এলো শারাকাত চৌধুরীর। মনে

মনে যা বলেন আজও সেটাই বললেন, ‘বিসমিল্লাহ,

আল্লাহুম্মা বারিক।’

ছেলেরা ছোটো থাকতেও যখনই একসাথে নিয়ে বের হতেন তখন প্রায় অনেকেই ছেলেদের দিকে তাকিয়ে থাকত। সুন্দর, সুন্দর বলত। আদর করে কাছে রাখতে চাইত। ঘুরে বাড়ি আসতে না আসতেই দেখা যেতো ছেলেরা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। পরে একদিন শুক্রবারের নামাজের পর মসজিদের এক ইমাম উনাকে এই ছোট দোয়াটি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এখনো যখনই উনার মনে হয় কোনো পোশাকে ছেলে বা মেয়েদের একটু বেশি ভালো লাগছে, তখনই উনি এই দোয়া পড়ে দেন। মুখ স্থির। চোখ স্থির। অথচ মনে মনে দোয়া জপে ফেলেন। আজও তাই করলেন। এরপর উনি সবার প্রথমে সায়নের মাথায় পাগড়ি পরিয়ে মুখে মিষ্টি তুলে দিলেন। একটু পানি খাইয়ে তারপর বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

হাসিমুখে শুভ বিবাহের শুভেচ্ছা জানালেন। ছাড়তে গেলে কেন জানি সায়ন ছাড়ল না ওভাবে দাঁড়িয়ে রইল। মুখে কিছু বলল না। কিছুটি না।

আচ্ছা, আজকের এই বিশেষ দিনে ছেলেটা কী খুব কষ্ট পাচ্ছে? আপন বাবা-মা'র জন্য? পাওয়া টাই তো

স্বাভাবিক। সায়ন বুকের সাথে লেগে গেছে দেখে শারায়াত চৌধুরীও ছাড়ানোর চেষ্টা করলেন না। বরং বাঁধন শক্ত করলেন। বিরবির করে আওড়ালেন, ‘আব্বা,,আমার আব্বাজান!’সায়ন চোখ বন্ধ করে চুপ করে রইল। ভয়ও পেল, ঝরঝর করে কেঁদে ফেলার ভয়। শারায়াত চৌধুরী ছেলের পিঠে হাত বুলিয়ে বোঝালেন এতদিন ছায়া হয়ে পাশে ছিলেন; থাকবেন। সায়ন মৃদু মাথা নেড়ে সরে দাঁড়াল।

একইভাবে উনি শুদ্ধকেও পাগড়ি পরিয়ে দিলেন। মিষ্টি মুখ করিয়ে বুকে জড়িয়ে নিলেন। ছেলেরা বড় হয়ে গেলে বুকে জড়ানোর এই মুহূর্তটুকু সহজে আসে না। ছেলেরাও বাবার বুকে ঝাপিয়ে পড়তে পারে না। আজ সুযোগ বুঝে শারায়াত চৌধুরী শুদ্ধকেও বুকে জড়িয়ে নিলেন। বললেন, ‘বাবার প্রতি অভিমান জমিয়ে রেখো না, মাই সান। তোমাদের দাম্পত্য জীবনের জন্য অনেক দোয়া রইল।’ শুদ্ধ মৃদু মাথা নাড়িয়ে সরে দাঁড়াল।

উনি এবার রুবাবের সামনে দাঁড়ালেন। ছেলেটা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। দৃষ্টিজোড়া মেঝেতে স্থির। তারও তো বাবা নেই। এই বিশেষ দিনে নিজের

হাতে পাগড়ি পরিয়ে, দোয়া করে,বুকে জড়িয়ে
নেওয়ার মানুষটা ওই অন্ধকার কবরের বাসিন্দা।
বাবাকে ছাড়া, বাবার দোয়া ছাড়া তাকে আরেকটা
শুভকাজ সারতে হবে। শারায়ত চৌধুরী হাসিমুখে
আরেকটা পাগড়ি রুবাবের মাথায় পরিয়ে দিতেই
ছেলেটা বুকের সঙ্গে লেগে গেল।সবাইকে চমকে
দিয়ে রুবাব ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। উপস্থিত
সবাই

কিছু বলার ভাষা হারিয়ে ফেললেন। রক্তে, মাংসে
গড়া প্রতিটা মানুষের জীবনে গোপন কিছু অপূর্ণতা
থাকে। না পাওয়ার আফসোস থাকে। এটা যেমন
সবাই দেখে না। দেখলেও বুঝে না। ছেলেটা ভালো
চাকরি করে।

ভালো পরিবারের ছেলে। অনেক কষ্টের ভালোবাসার
মানুষটাকে পেতে যাচ্ছে। অবশ্যই এটা খুশিরই
সংবাদ কিন্তু এই খুশির দিনেই বাবা নামক ছায়াটা
তার মাথার উপর নেই। বাবা থাকলে এ দিনটি
হয়তো অন্যরকম হতো। পরিপূর্ণ হতো। এদিকে
শতরূপা চৌধুরীও রান্নাঘরের এক কোণে কেঁদে লাল
হওয়া চোখে দেখলেন রুবাব তার মামার বুকে। কত

স্নেহের সাথে ধরে আছে মামাকে। বাবার জন্য রাখা
শূন্য সেই আসনটা মামাকে দিয়ে পূর্ণ করা কী
নিদারুণ চেষ্টা তার। সৌভাগ্য করে ভাইদেরও
পেয়েছে যারা, উনার স্বামী বিয়োগের পরও সবদিক
থেকে মনোবল শক্তি, সাহস জুগিয়ে আসছেন। তখনই
নতুন বর এসেছে, বর এসেছে, রব উঠল। চৌধুরীর
গিন্ধিরা নতুন বরকে মিষ্টি মুখ করিয়ে গাড়ি থেকে
নামানোর জন্য ছুটলেন। মূল ফটকে
গিয়ে দাঁড়ালে দরজা খুলে আগে কামরান, স্যাভি,
হাসান নামল। এরপর নামল অর্ক। তখন একে একে
সায়ন, শুদ্ধ, রুবাব এসে অর্কের আরেক পাশে
দাঁড়াল। অর্ক এ বাড়ির জামাই তাই তাকে দিয়েই
কাজ শুরু হলো।

শাহাদত চৌধুরী এগিয়ে এসে স্বর্ণের রিং, গলার
চেইন আর হাতে ওয়াচ পরাতে গেলে অর্ক শুদ্ধর
দিকে তাকাল। এসব তার পছন্দ না। অর্কের দৃষ্টি
বুঝে তখন শাহাদত চৌধুরী হাসতে হাসতে
বললেন,-‘তাকিয়ে লাভ নেই, তোমার বন্ধুকেও পরতে
হবে। এজন্যই সব কটাকে
এখানে দাঁড়িয়ে করিয়েছি।’

এরপর অর্কের সঙ্গে বাড়ির ছেলেরও নতুন বরের মতো সাদরে গ্রহণ করা হলো। যদিও এটা বড়দের গোপন প্ল্যান ছিল। এত মানুষের ভেতরে

কিছু বলা ঠিক হবে না ভেবে তারা আপাতত চেপে গেল। চারজন একে একে হেঁটে আসার সময় আচমকা সকলে চোঁচিয়ে উঠল। সিটি বাজাল। পেছনে ঘুরে তাকাতে তাকাতেই যার যার সহধর্মিণী বামপাশের জায়গা দখল করে দাঁড়াল। তাদের পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে সঙ্গে হাঁটতে লাগল।

চারজন ঘাড় ঘুরিয়ে পাশে তাকালে ক্যামেরা মান ক্লিক ক্লিক শব্দে ছবি উঠাতে লাগল। বউদের আগমন যে এভাবে হবে তারা জানত না। ভাবে নি এমনভাবেও হতে পারে। সচারাচর বর স্টেজে থাকে বউ একটু পরে

আসে। তারা ভেবেছিল এমনকিছুই হবে কিন্তু এখানে ঘটল উল্টো কিছু। আর এই উল্টো কিছু ঘটানোর কারিগর সিরাত। উনার মতে, যার সঙ্গে আজীবন পথ চলতে হবে, চলতে ইচ্ছুক, তাহলে শুরু থেকেই পথচলার সঙ্গী হতে সমস্যা কি? এদিকে চার বরই থমকে দাঁড়িয়ে গেছে বউ বেশে যার যার প্রিয়শীকে

দেখে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। তবে একেক
জনের চোখে মুখে মুগ্ধতা ঝরে পড়ছে। শখ, স্বর্ণ,
শীতল, ঐশ্বর্য কারো মুখে ভারী মেকাব নেই।
অতিরিক্ত সাজ নেই। তবুও তাদের ড্রেসআপ,
পরিপাটি লুক, চোখের কাজল আর হালকা লিপস্টিকে
অনিন্দ্য সুন্দর লাগছে। সায়নের কালো শেরওয়ানির
সঙ্গে মিলিয়ে স্বর্ণের পরনে সাদা মাটা কাজের
গোল্ডেন লেহেঙ্গা। শুদ্ধর অফ ওয়াইট শেরওয়ানির
সঙ্গে মিলিয়ে শীতলের পরনে এ্যাশ কালার লেহেঙ্গা।
রুবাবের ব্লু শেরওয়ানির সঙ্গে মিলিয়ে ঐশ্ব্যের পরনে
ডার্ক রেড লেহেঙ্গা। অর্কের অলিভ কালার
শেরওয়ানির সঙ্গে মিলিয়ে শখের পরনের ব্লাশ পিংক
লেহেঙ্গা। ড্রেসআপ চমৎকারভাবে মিলিয়ে তারা।
আশেপাশে অনেক মানুষের ভিড়, তাদের দৃষ্টি স্থির
ওদের চারজোড়ার দিকে। তাই কেউ কিছু বলল না
পুনরায় পথ চলতে লাগল। সবার বড় সায়ন তাই
সায়ন-স্বর্ণ এরপর শুদ্ধ-শীতল, এরপর রুবাব- ঐশ্বর্য
তারপর অর্ক-শখ। তারা ধীরে সুস্থে হেঁটে স্টেজে
উঠে বসল। কয়েকজন ক্যামেরাম্যান এসে ছবি
তুলতে থাকল। উপস্থিত মেহমানরা বর-বউ দেখতে

ব্যস্ত। সবার মুখে একই কথা, চারজোড়াকে ভালো
মানিয়েছে। রাজযোটক যেন। ঘরে ঘরে বিয়ে করল
এখন টঁকে থাকলেই হয়। এত কথা, এত মানুষ,
এত আয়োজনকে অগ্রাহ্য করে স্বর্ণ হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে
সায়নের দিকে তাকাল। চোখাচোখিও হলো দুজনের।
তখন সায়ন নিচু স্বরে বলল,

-‘এত মানুষের ভিড়ে বউয়ের দিকে তাকিয়ে শান্তি
পাচ্ছি না।’

এইটুকু বলে থামল তারপর পুনরায় বলল,,

-‘তোকে মনভরে দেখার সময় টুকু দিস জান, প্লিজ।’
স্বর্ণ দৃষ্টি সরিয়ে নিলো। ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি।
ঘটা করে জিজ্ঞাসা করতেও হলো না তাকে দেখতে
কেমন লাগছে। তার আগেই সায়ন তার জবাব দিয়ে
দিলো। এতক্ষণ শীতল দৃষ্টি নত রাখলেও এবার
আড়চোখে তাকাল শুদ্ধর দিকে। সে বলতে বলতে
বাধ্য, মানতে বাধ্য, তার বিশুদ্ধ পুরুষ আসলেই সু-
পুরুষ, সুদর্শন পুরুষ। তবে এত সুদর্শন হওয়া ভালো
না। নজর লাগে! কিন্তু এখন কি করা যায়? একথা
ভাবতে ভাবতে হঠাৎ

অনুভব করল, তার আঙুলের ভাঁজে কেউ আঙুল গুঁজে দিয়েছে। তড়িৎ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। বুঝল, পাশে বসা মানুষটার কাজ। যদিও তাদের হাতটা ঘোপটার বাড়তি কাপড়ে ঢাকা। কেউ দেখতে পাচ্ছে না, পাবেও না। তখন শুদ্ধ হাতের বাঁধনটা শক্ত করে ধীর লয়ে বলল,

-‘কাছে ডাকলে যে আসে না, আমার কথা শোনে না, সে যেন আমার দিকে না তাকায়। তার তাকানোর উপর নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো।’

একথা শুনে শীতল কোনোমতে হাসি আঁটকাল। মুগ্ধ নয়নে দেখল অফ হোয়াইট পাগড়ি পরা প্রেমিকপুরুষটার দিকে। সাহেব তার হাতটা দখলে নিয়েছে। আঙুলের ভাঁজে আঙুল ডুবিয়ে এখন বড় বড় কথা বলা হচ্ছে। ভালোবাসবে তবে মুখে স্বীকার করবে না। করতেও হবে না। সে এমনই থাকুক; গোপনে এভাবেই ভালোবেসে যাক। সে এতেই খুশি; এতেই সুখী। শুদ্ধ- শীতলের পরের আসনে ঐশ্বর্য-রুবাব বসেছে। রুবাব পাশে বসা নার্তাস ঐশ্বর্যের দিকে তাকাল। ফিসফিস করে বলল,-‘ বর পছন্দ হয়েছে, ম্যাম?’

রুবাবের কথা শুনে ঐশ্বর্য তাকাল। ঠোঁটে হাসি এঁটে
অকপটে জবাব দিলো,
-‘ভীষণ।’

একথা শুনে রুবাব ফিক করে হেসে ফেলল।
চমৎকার সেই হাসি। ঐশ্বর্য চোখ ভরে দেখল। এই
মানুষটাকে হাসতে দেখতে ভালো লাগে তার। খুব
আনন্দ হয় যখন মানুষটা হাসে। ইচ্ছে করে এক
পৃথিবী সুখ কুঁড়িয়ে এনে মানুষটার পায়ে সপে দিতে।
মনে মনে এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎই তার
নজর গেল শখ-অর্কের দিকে। শখ মুখ কাচুমাচু করে
বসে আছে। দেখে মনে হচ্ছে এক্ষুণি কেঁদে ফেলবে।
খুব নার্ভাস। তার মনের অবস্থা বুঝে অর্ক মুখের
কাছে হাত নিয়ে গলা খাঁকারি দিলো। নিচু স্বরে
শুধাল,-‘ভয় পাচ্ছে?’

-‘ন ন মানে।’

-‘আমিও পাচ্ছি। আসলে জীবনে প্রথমবার তো। ভয়
পেও না, আমরা আমরাই তো।’

শখ মাথা নিচু করে নিলো। দৃষ্টি রাখল হাতের চুড়ির
দিকে। মনের ভেতর চলছে আকাশ-কুসুম ভাবনা।
যাকে এতদিন ভাইয়ের বন্ধু ভেবে সম্মান করে

এসেছিল আজ তার নামের পাশে নিজের নাম বসাতে হবে। তার সঙ্গে পথ চলতে হবে। বিপদের সঙ্গী হতে হবে। সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নিতে হবে। আপন ঘর ছাড়তে হবে। প্রাণপ্রিয় বাবা-মা, চাচা-চাচীরাসহ কলিজার ভাই-বোনদের ছেড়ে যেতে হবে অন্যের বাড়িতে। নিজের হাতে সাজাতে হবে আরেকটা সংসার। তখন চাইলেও আর যখন-তখন ছোটো ভাই-বোনরা জ্বালাতে তার রুমে হামলা করবে না। এটা কিনে দাও, ওটা এনে দাও,,পেয়ারা মাখিয়ে দাও এসব বায়না ধরবে না। কোথাও কোনো আকাম করে এসে মার খাওয়া থেকে বাঁচানোর রিকুয়েষ্ট করবে না।রুমে এসে দেখবে না কেউ খাবার ভর্তি ঝুড়ি দিয়ে গেছে। এ কাজটা সচারাচর শুদ্ধ ভাই করে। দেশে বাইরে গেলে যত দামেরই জিনিস হোক বলবে না, ‘এটা তোর।’ বরং বিছানার উপর রেখে চলে যাবে।এমন জিনিস আনবে যা পছন্দ হবেই। সায়ন ভাই হুটহাট রুমে এসে চুরি হাত ধরিয়ে দেবে না। তাকে কিছু খেতে দেখলে হাত থেকে কেড়ে এক কামড় খেয়ে ফিরিয়ে দেবে না। রুবাব ভাই দুষ্টমি করবে না। মাস শেষে বাবার থেকে হাত খরচ পায়

আবার ভাইরা দেয়। মা-চাচীরা জানে সে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না তাই নিজেরা বুঝে নেন। এখনো তার জামা-কাপড় মা চাচীরাই পছন্দ করে আনে। আজকের পর থেকে এসব কিছুর পরিবর্তন আসবে।

বরং তাকে নজর রাখতে হবে তার সংসারের প্রতি; সংসারের মানুষদের প্রতি। এসব কথা ভাবতে ভাবতে শখের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে অশ্রু ঝরে গেল। দম বন্ধ করা অনুভূতি বুকে নিয়ে হাঁসফাঁস করতে লাগল।

চারটে বিয়ে পাড়াতে হবে বিধায় কাজি সাহেব অনেকক্ষণ আগেই চলে এসেছেন। লেখালেখির পর্বও শেষ করেছেন ইতিমধ্যে। বিয়ের আসল কাজই হচ্ছে বিয়ে পড়ানো তাই বিয়ে পড়ানোর কাজটাই আগে সম্পূর্ণ করা হবে। সায়নকে দিয়ে শুভ কাজের সূচনা হলো। এতদিনের অপেক্ষা, এত ঝট-ঝামেলার পর সকলের উপস্থিতিতে সায়ন-স্বর্ণের শুভ কাজটা সম্পূর্ণ হলো। তবে সায়ন মনে মনে শুধু জপে গেল, আলহামদুলিল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ! প্রিয় পুরুষটাকে পাওয়ার জন্য এত ব্যাকুলতা। চঞ্চলতা। সব মিলিয়ে

প্রিয় পুরুষকে হারানোর ভয়ে হসপিটালে একপ্রকার
জেদ করে বিয়ে করা শীতল নতুন করে শুদ্ধর নামে
কবুল পড়ল। একবার বিয়ে করেছে কবুলও পড়েছে।
তবুও অনুভূতি যেন একই রকম। কান্নারত ভেজা স্বর
আর কম্পিত হাতে রেজিস্ট্রি পেপারে সাইন করল।
ইচ্ছে ছিল শুদ্ধর বউ সাজবে। আজকে সে শখটাও
পূরণ হলো।

এরপর এলো রুবাব- ঐশ্বর্যের পালা। ঝলসানো
দেহের মেয়েটাকেও যে এত ভালোবাসা যায়। আগলে
রাখা যায়। তাকে হারানোর ভয়ে ডুঁকরে কাঁদা যায়,
এটা রুবাবকে না দেখলে জানত না সে। যে পুরুষ
পাগলের মতো ভালোবাসতে জানে তার জন্য জীবন
কুরবান। তার জীবনে ভালো কিছু নেই বললে চলে।
এত অপূর্ণতার মাঝে রুবাব তার জীবনে এসেছে
সন্ধ্যাপ্রদীপ হয়ে। একথা ভেবে সময় নিলো না
ঐশ্বর্য। অধির আগ্রহে দম আঁটকে বসে থাকা
রুবাবের কলিজা ঠান্ডা করে বলে ফেলল, ‘কবুল!
কবুল! কবুল!’এবার কাজি সাহেব এলেন অর্ক আর
শখের কাছে। উনাদের দেখে শখ অসহায় চোখে
আশপাশে তাকাল। চোখ বুলিয়ে মাকে খুঁজল। আগে

ভয় পেলে মায়ের আঁচলটাই আঁকড়ে ধরতো। মেয়ে
ভয় পাচ্ছে দেখে সিঁতারা বুকের ভেতর আগলে
নিতেন। এখনো তো ভয় পাচ্ছে। তাহলে কোথায়
সেই মমতামাখা আঁচল? সামনে নেই কেন মা? বোন
টা ভয় পাচ্ছে বুঝে তিনভাই তড়াক করে উঠে
দাঁড়াল। স্বর্ণ, শীতল, ঐশ্বর্য গিয়ে একসাথে দৌড়ে
গিয়ে জড়িয়ে ধরল কাঁপতে থাকা শখকে। তিন ভাইও
দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল বোনের দিকে। আগলে নিলো
যত্ন করে। ভাইদের পেয়ে শখ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।
মেয়ে কাঁদছে দেখে তিন জা স্টেজে উঠে এলেন।
বোঝাল না কাঁদতে। শুভকাজে কাঁদতে নেই। বেচারী
অর্ক দেখে গেল। কেন জানি নিজেকে অপরাধী মনে
হচ্ছে। এরপর কাঁদতে কাঁদতেই শখ অর্কের নামের
সঙ্গে নিজের জুড়ে দিলো। দুরদুর বুকে স্বামীরূপে
কবুল করল অর্ককে। ফটোসেশান চলল। বেলা
গড়িয়ে যাচ্ছে ক্ষুধাও পেয়েছে বিধায় তাদেরকে খেতে
বসানো হলো। হইহই করে খাওয়া-দাওয়া হলো।
হাসি-ঠাট্টা হলো। সাম্য-সৃজন বরদের জুতো চুরি
করতে না পেরে গলা ফাটিয়ে কাঁদতে লাগল। তাদের
কান্নার চোটে টিকতে না পেরে নতুনরা বরেরা যার

যার জুতো খুলে তাদের হাতে ধরিয়ে দিলো। তারপর
টাকা দিয়ে জুতো ছাড়িয়ে নিলো। নতুবা এই হা
আজকে আর বন্ধ হতো না। এই নিয়েও খুব হাসাহাসি
হলো। এভাবে সময় গড়িয়ে শখের বিদায়ের ঘন্টা
বেজে উঠল। যাওয়ার কথা উঠতেই শখের
চোখজোড়া পুনরায় ছলছল করে উঠল। ঠিক তখনই
কামরান হাসানের গলা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে
কেঁদে উঠল। স্যান্ডিও গালে থুথু লাগিয়ে কান্নার
অভিযোগ করল। তাদের কান্নার অভিনয় যা ছিল
কোথা থেকে আজম এসে মরা কান্না জুড়ে দিলো।
শখ নিজের কান্না ভুলে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল।
সায়ন তখন শখকে বুকের একপাশে আগলে নিয়ে
হাঁটতে হাঁটতে বলল,

-‘ রাতটুকুর ব্যাপার। সকালে ঘুম থেকে উঠেই
দেখবি আমরা হাজির।’ শখ মৃদু মাথা নাড়াল। যতই
কাঁদবে বলে মনঃস্থির করুক বাবা-মায়ের অসহায়
দৃষ্টি দেখে পুনরায় কেঁদে ফেলল। সাফওয়ান,
শাহাদত চৌধুরী

বুকের আগলে নিলেন। চাচীরা নিজেরা কাঁদতে
কাঁদতে তাকে কাঁদতে বারণ করল। বোনরা কাঁদছে।

এত কান্নাকাটির মাঝে শুদ্ধ আর অর্কের চোখাচোখি হলো। শুদ্ধ কিছু বলতে গেলে অর্ক বন্ধুকে জড়িয়ে ধরল। বলল,

-‘জানি তো তোর বোন নয় কলিজা নিয়ে যাচ্ছি।
ভরসা রাখ বন্ধু। আমি

আমার সবটুকু দিয়ে তাকে ভালো রাখার চেষ্টা করব।’ শুদ্ধ মৃদু হাসল। তার চোখজোড়া লাল হয়ে উঠেছে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল বোনের দিকে। শখটা সায়নের বুকে হামলে পড়ে খুব কাঁদছে। তার দেখে সায়নের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে গেল। রুবাব কাঁদছে। দুই ভাইকে পেলেও শুদ্ধকে না পেয়ে খুঁজল। সায়ন দেখিয়ে দিলে ধীরে ধীরে এলো শুদ্ধর কাছে। মুখ ফুটে কিছু বলতে পারল না দেখে শুদ্ধ বোনকে বুকে জড়িয়ে নিলো। আলতো হাতে চোখ মুছে দিলো। মাথায় একটা চুমু খেয়ে আদুরে সুরে বলল,

-‘কাঁদে না। সাবধানে যাও, নিজেও ভালো থেকো;
অন্যদেরও ভালো রেখো, হুম? আমরা ভাইরা সব সময় তোমার পাশে আছি।’ একথা বলতে বলতে শুদ্ধ শখকে অর্কের গাড়িতে তুলে দিলো। অর্কও সবার থেকে বিদায় নিয়ে পাশে বসল। শখ জানালা দিয়ে

হাত বাড়িয়ে অঝরে কাঁদতে লাগল। অশ্রুসিদ্ধ বাপসা
চোখে দেখে গেল তার প্রিয় পরিবারকে। দম্ভের সঙ্গে
দাঁড়িয়ে থাকা চৌধুরী বাড়িটাকে। মেহমানরা চলে
যাচ্ছে একে একে। মেয়ে বিদায়ের পর বাড়িটা কেন
জানি মিইয়ে যায়। শখ চলে যাওয়ার পর বাড়িটা যেন
থমকে গেছে। বাড়ির প্রতিটা সদস্য এখনো অশ্রুসিদ্ধ
চোখে তাকিয়ে রাস্তার দিকে। মেয়ে তো নয় যেন
একেকজনের কলিজা ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। আর শখ
এমন একটা মেয়ে টেবিলভর্তি খাবার থাকার পরও
তাকে যদি শুধু শাক-ভাত দেওয়া হয়, সে সেটা দিয়ে
খেয়ে উঠবে। তবুও মুখ ফুটে বলবে না তাকে কেন
মাছ, মাংস দেওয়া হলো না। কিছু এনে দিলে বলবে
না পছন্দ হয় নি। পছন্দ যদি নাও হয় বুঝতেই দেবে
না। অন্য বাড়ির মেয়েরা চাচীদের সঙ্গে কত ঝগড়া
করে। খোঁচা মারামারি করে। আর এই বাড়িতে যা
মাকে বলতে পারে না বাড়ির মেয়েরা সেটা সিরাতকে
বলে। কারণ সিরাত বন্ধুর মতো মিশে তাদের সঙ্গে।
সবাই মন খারাপ করে যখন ভেতরে যাবে তখনই
অর্কের গাড়িটা ফিরে

এলো। কি হলো জানার জন্য সকলে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। অর্ক নেমে এলো। সকলের চিন্তিত মুখ দেখে জানাল তারা সবাই ঠিক আছে।

কোনো সমস্যা হয় নি। তখন অর্কের মা গাড়ি নেমে শারাগাত চৌধুরীর উদ্দেশ্যে বললেন,

-‘ভাই, আপনার ছেলে-মেয়েদের আমি আমার সঙ্গে নিতে যেতে চাই। এত ভাই-বোনদের মাঝে বড় হয়ে হঠাৎ একা হয়ে যাচ্ছে এজন্য বউমা কষ্ট পাচ্ছে। আপনাদের বাসার মতো আমাদের বাসায় এত মানুষ নেই। আরো নার্ভাস হয়ে যাবে মেয়েটা।’

একথা শুনে শারাগাত চৌধুরী ছোটো ভাইদের দিকে তাকালেন। এরপর তাকালেন তিন ছেলেদের দিকে। ছেলে গুলো হচ্ছে ঘাড়ত্যাড়া। উনি যা বলবেন তারা উল্টো কাজ করবে তাই ছেলেদের হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন না। বরং তাদেরকে বললেন,-‘যাবে?’

তাদের জবাবের আগে অর্কের মা হাসিমুখে পুনরায় বললেন,

-‘কিছুক্ষণ থেকে নাইয় চলে আসবে। পথ তো আর বেশি দূরে না।’

শুদ্ধ, সায়নের চোখাচোখি হলো। দু'জনে ঠোঁট চেপে
ভদ্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সিঁতারাও বললেন যেতে
তাহলে স্বর্ণ, শীতলেরও ভালো লাগবে।

তবুও ছেলেরা খাম্বার মতো দাঁড়িয়ে আছে দেখে
সিরাত বিরক্ত হলেন। বিরক্ত নিয়ে বললেন,

-‘হ্যারে শুদ্ধ, এ সায়নকেও বলি হারি যায়; তোদের
কি শখ আহ্লাদ বলে কিছু নাই? ইয়াং ছেলেপুলে এত
অলস হলে চলে? বাড়িতে বাইক আছে, নতুন বউ
আছে, সুযোগ পেয়েছিস যা ঘুরে আয়। ওদিকে রুম
সাজানো এখনো বাকি ফিরতে ফিরতে কমপ্লিট হয়ে
যাবে।’মেজো মার কথা শুনে শুদ্ধ একবার তাকাল
শীতলের দিকে। শীতলের চোখজোড়ায় আনন্দ
ঝলঝল করছে। সে আবার বাইকে ঘুরতে পছন্দ
করে কী না। তার সঙ্গে বের হওয়ার সুযোগ পেলেই
হয়। অগত্যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো নতুন বর-বউরা
বাইকে করে ঘুরতে যাবে। ঘুরে তারপরে যাবে
অর্কদের বাসায়। শুদ্ধ ও সায়নের বাইক আছে, রুবাব
আর অর্কের বাইকের ব্যবস্থাও হয়ে গেল। সায়নের
বাইকে স্বর্ণ, শুদ্ধর বাইকে শীতল, রুবাবের বাইকে
ঐশ্বর্য আর অর্কের বাইকে শখ। শখের ঠোঁটের কোণে

এখন মিষ্টি হাসি। তাকে হাসতে দেখে অর্ক যেন হাফ ছেড়ে বাঁচল। প্ল্যান তাহলে সাকসেক হলো। বউটাকে কাঁদতে দেখে মনে হচ্ছিল আজই দম আঁটকে মারা যাবে। অতঃপর শুদ্ধর বাকি বন্ধুরা, আজম, সাম্য-সৃজনরা গাড়িতে উঠে বসল। গাড়ি বেরিয়ে গেলে শুদ্ধরাও একে একে বের হলো।

তাদেরকে যেতে দেখে অর্কের মা হেসে চৌধুরীর বাড়ির সদস্যদের দিকে তাকালেন। বললেন,
-‘ছেলে-মেয়ে গুলো ভালো থাকলে আমরাও ভালো থাকব। আমরা যদি সুযোগ না দেই তাহলে কিভাবে হবে? ঘুরে এলে ওদের মনও ভালো হবে। আজ যদি ফিরে না আসতাম আপনাদের মন খারাপ থাকত ;বাকিরাও মন মরা থাকত। এতে কি ভালো হতো? আমরা যা করি/করছি সবই তো ওদেরকে ভালো রাখার জন্য, তাই না? বেয়ান-বেয়াইন এবার আমাকেও যে যেতে হবে। আমার চারছেলে নতুন বউদের নিয়ে বাড়ি যাবে, তাদের বরণ করতে হবে তো নাকি।’

নিজের কথা শেষ করে অর্কের মা চমৎকার করে হাসলেন। সহধর্মিণীর কথায় সহমত জানালেন অর্কের

বাবা। উনাদের মন-মানসিকতা দেখে উপস্থিত সকলে মুগ্ধ হলেন। বুঝলেন শুদ্ধ কেন বার বার এটা বলেছিল অর্কের বাবা-মায়ের চিন্তা ধারা দেখে আপনাআপনি সন্মান চলে আসে। আর গাছ ভালো হলে ফল ভালো হবে এটা স্বাভাবিক। অতঃপর শখকে নিয়ে সবার মনে যা চিন্তা ছিল অনেকটাই কমে এলো। সিঁতার, সিমিন, সিরাত একে একে অর্কের মাকে জড়িয়ে ধরে নতুন করে বিদায় দিলেন। চৌধুরী বাড়ির মূল ফটক পেরিয়ে ধীর গতিতে একে একে এগিয়ে যাচ্ছে চারটে বাইক। প্রথমে সাইনের বাইক, এরপর অর্কের, তারপর রুবাবের এবং সবার শেষে শুদ্ধর। সাইন প্রথমে থাকায় রাস্তা দেখে শুনে যাচ্ছে। সামনে থেকে দ্রুত গতির গাড়ি দেখলে সিগন্যাল দিচ্ছে। হাতের ইশারায় গতি কমাতে বলতে কিংবা থামতে বলছে। কিছুক্ষণ আগে অফিস ছুটি হওয়াতে রাস্তায় জ্যাম বেঁধেছে। জ্যামের কারণে বাইক টানতে পারছে না। তাই সাইন সামনে থেকে প্রটেকশন দিচ্ছে আর শুদ্ধ পেছন থেকে। মোদাকথা, বাড়ির মেয়েরা সঙ্গে আছে সাবধানে না নিলে চলে? এভাবে চলতে চলতে রাস্তা ফাঁকা পেয়ে গতি বাড়াল।

চারটে বাইকে বর-বউকে দেখে অনেকে তাকাচ্ছে।
কনুইয়ের গুঁতো মেরে পাশের জনকে দেখার ইঙ্গিত
দিচ্ছে। দূরন্ত গতিতে পাশ কাটিয়ে যাওয়া গাড়ির
মানুষগুলোও মুখ বাড়িয়ে দেখছে। দেখছে পথচারীরা।
টং দোকানের সামনে আড্ডায় মশগুল বন্ধুর দলটা
তাদের দেখিয়ে সিটি বাজাল। চিৎকার করে
বলল, 'ভাইরা আমার দোয়া দিয়ে যান। আমগোর
কপালেও যেন বউ জোটে।' তাদের কথা শুনে সকলে
হেসে ফেলল। চলতে চলতে হাইওয়ে পেরুল। চার
কাপলের মধ্যে চলছে টুকটাক কথাবার্তা। খুনশুঁটি।
মুখ চাপা হাসি।

এদিকে তখন বিকেলের শেষ মুহূর্ত। দিনের আলোর
তেজ ফুরিয়ে শুরু হবে রাতের রাজত্ব। ঘুটঘুটে
অন্ধকার গিলে খাবে পুরো পৃথিবীকে। সূর্য নিজ
নিয়মে অস্ত যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাগরিবের
আজান দিবে। সায়ন কিছু একটা ভেবে বাইক
থামাতে বাকি তিনটে বাইক থেমে গেল। রুবাব
জিজ্ঞাসা করলো- 'কি হলো ভাই থামলে যে?'

- 'সামনে একটা নদী আছে একটু থেমে তারপর
যাই?'

-‘নতুন বউ নিয়ে নদীর পাড়? বড় মামী জানলে তোমার খবর আছে।’

-‘আরে কিছু হবে না।’

-‘চলো তাহলে।’

অতঃপর তারা নদীর পাড়ে বাইক স্ট্যান্ড করল। শরীর জুড়ানো বাতাসে মনটাও জুড়িয়ে গেল। সিঁড়ির উপর চার বউ বসলে অর্ক তাদের সুন্দর করে ছবি তুলল। কামরান চার বরের ছবি তুলল। কাপল ছবিও তুলল। তখন এক মাঝবয়সী মহিলা এলেন ভাজা বাদাম নিয়ে। তারাও বাদাম নিলো। মহিলা তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তারাও জানাল। মহিলা তখন ফট করে বলে বসল,-‘সম্পর্কে বাঁচাইতে চাইলে আপনার ভিত্তি সম্পর্ক গড়তি নাই। পরকে দুইডা কথা কওন যায় আপনারে কওন যায় না। আইজ ভালো সম্পর্ক আছে কাইল থাকবে ইর তো গ্যারান্টি নাই। আম,,।’

উনি আরো কিছু বলতে চাচ্ছিলেন তার আগেই শুদ্ধ টাকা বাড়িয়ে দিয়ে বলল,

-‘এ যে টাকাটা। আর আপনি ওসব ভাববেন না আন্টি পারলে দোয়া করবেন আমাদের জন্য।’

মহিলা নিজের কথা শেষ না করতে পেরে বোধহয়
বেজার হলেন। বিরক্ত মুখে চলে গেলেন। হঠাৎ সবার
মধ্যে এক নীরাবতা দেখা গেল। মহিলা কিন্তু একটা
শব্দও ভুল বলে নি। উনি যা বলেছেন চরম সত্য
বলেছেন। তখন শীতল হঠাৎ এক হাত বাড়িয়ে বলে
বসল,-‘আমরা ভাই-বোনরা একে অন্যের প্রাণ ছিলাম,
আছি, ভবিষ্যতেও তাই থাকব। দেহে প্রাণ
থাকাকালীন একে অন্যের রক্ষাকবজ হবো।’

শীতলের কথা শেষ হতেই শীতলের হাতের উপর
সায়ন ডান হাত রাখল। স্বর্ণ, রুবাব, সাম্য, সৃজন,
সবাই রাখল। শুদ্ধ বুকে দুহাত গুঁজে তাকিয়ে
দেখছিল ওদের কাণ্ড। সে হাত রাখছে না দেখে
সবাই ঘুরে তাকাল তার দিকে। শুদ্ধ অর্ক, ঐশ্বর্যকে
হাত রাখার ইশারা করল। তারা তো বাইরের কেউ
না বরং আপন হয়ে গেছে। শুদ্ধর কথা শুনে তারাও
হাসি মুখে যুক্ত হলো। এরপর শুদ্ধ শীতলের হাতের
নিচে একহাত আর অর্কের হাতের উপর আরেক হাত
রাখল। অর্থাৎ প্রাণথাকা কালীন দু’হাতে সামাল দেবে
সকলের প্রতি তার সমস্ত দায়িত্ব, স্নেহ, ভালোবাসা। এ
মুহূর্তে নতুন করে ওয়াদাবদ্ধ হলো তারা। কেন জানি

মনে জোর পেলো। মন খারাপ মুহূর্তে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে সকলে হইহই করে উঠল। অতঃপর আজান হয়ে গেলে তারা বাইক নিয়ে রওনা হলো অর্কের বাড়ির পথে। দশ মিনিটের মধ্যেই চারটে বাইক ঢুকল বাড়ির গেট দিয়ে। হর্ণ শুনে অর্কের মা ছুটে এসে চার দম্পত্তিকে সাদরে গ্রহন করলেন। হাসি মুখে তাদেরকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। নানান ধরনের খাবার এনে খেতে সাধলেন। অর্কের বিয়ে উপলক্ষে আসা গেস্টরা ঘুরে ঘুরে তাদেরকে দেখল। বোনকে শগুরবাড়ি রাখতে আসা নিয়ে কেউ কেউ খুশি হলো, কেউ বিরক্তিমুখে দেখে গেল। ফিসফাস করে কটুবাক্য চলল। চৌধুরীর পুত্ররা সব বুঝলেও হাসি মুখে সবার সঙ্গে কথা বলল। তারা পৌঁছানোর পরপরই একটা গাড়িও এলো, গাড়ির ড্রাইভার কেজি কেজি মিষ্টির প্যাকেট, ফলমূলসহ আরো নানান জিনিস পৌঁছে দিয়ে গেল। এসবের বাহার দেখে উপস্থিত অনেকের চম্ফু চড়কগাছ। অর্ক, অর্কের মা এসব আনায় খুব করে বকলেন সায়ন, শুদ্ধ, রুবাব হাসিমুখে বকা শুনল। খুশির সময় বোধহয় তাড়াতাড়ি চলে যায়। দেখতে দেখতে ঘড়ির কাঁটা দশের ঘরে

স্থির হয়েছে। শখ একটু দূরে বসে আছে। কত মানুষ এসে দেখে যাচ্ছে। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে নিচু স্বরে জবাব দিচ্ছে। অর্কের মা উনার চেনা পরিচিত মানুষের সঙ্গে শখের পরিচয় করিয়ে সায়নদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। মহিলা যে ভীষণ খুশি তা উনার কথার ভঙ্গিতে স্পষ্ট। এত কথা, এত আনন্দের মাঝে শুদ্ধ জানাল তাদের যেতে হবে। ভাইয়া চলে যাবে শুনে শখের মুখ মলিন হয়ে গেল। চোখজোড়া পুনরায় ছলছল করে উঠল। অসহায় চোখে তাকাতেই অর্ক বুঝল তার মনের কথা। কি এক কথাতে হাসতে হাসতে এসে বসল শখের পাশে। এদিক ওদিক তাকিয়ে সুযোগ বুঝে ফিসফিস করে বলল,-‘শখ, কেঁদো না প্লিজ। ওদেরও আজ বিশেষ দিন। ওদেরও এবার একা ছাড়া উচিত। কতকিছু পর ওরাও আজকে এক হয়েছে। যার যার প্রিয় মানুষকে নিজের করে পেয়েছে। ভাই-বোনদের হাসি মুখে বিদায় দাও। তোমাকে কাঁদতে দেখলে ওরা কষ্ট পাবে। এমনিতেই দেখো মুখটা মলিন হয়ে গেছে। শুধু তোমার জন্য ক্লান্ত হয়েও কতক্ষণ বসেছিল। জানি তো তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে। নিজেকে একটু সামলে নাও, প্লিজ।

আমি..আমি আগামীকালই তোমাকে চৌধুরী বাড়িতে
নিয়ে যাব, প্রমিস।'অর্ক ভুল বলে নি বুঝে শখও
নেত্রজোড়া মুছে নিলো। শুদ্ধরাও যাওয়ার জন্য উঠে
দাঁড়িয়েছে। বিনয়ীভাবে কথাবার্তা বলে বিদায় নিচ্ছে
অর্কের বাবা-মায়ের থেকে। শখ এসে দাঁড়ালে ওর
মুখ দেখে তিন ভাই আগলে নিলো। থেমে থেমে কত
কথা বোঝাল। বোঝাতে গিয়ে তাদেরও কণ্ঠস্বর ভারি
হয়ে চোখজোড়া ছলছল করে উঠল। স্বর্ণ, ঐশ্বর্য,
শীতলও বিদায় নিলো। অতঃপর বুকচাপা কষ্ট নিয়ে
বোনকে রেখে বেরিয়ে এলো তারা। তবে বাইকে উঠে
যেতে যেতে কতবার যে ঘুরে ঘুরে তাকাল। বার বার
বলল, কাল দেখা হবে। মন খারাপ যেন না করে।
তাদের বলা কথা আর অসহায় দৃষ্টি দেখে শখের
চোখের পানি ভর ধরল না ঝরঝরিয়া কেঁদে ফেলল।
বোনকে দূর থেকে কাঁদতে দেখে বাইক স্টার্ট করেও
থেমে গেল তিনভাই। অর্ক হাতের ইশারায় আশ্বস্ত
করে এবার সামলে নিলো শখকে। কামরান, হাসান,
স্যাভি তিনজন তাদের যেতে ইশারা করে তারা
হইহই করে শখ আর অর্ককে নিয়ে ভেতরে চলে
গেল। অর্ক আর শখকে নিয়ে শুরু করল হাসি-ঠাট্টা।

এমন সব কাহিনির মাঝে এর পর্যায়ে শখও না হেসে
পারল না। তার হাসিমাখা মিষ্টি মুখের ছবি অর্ক সেভ
করল বন্ধুর কাছে। বোনকে হাসতে দেখে তবেই
শুধুরা রওনা হলো চৌধুরী বাড়ির দিকে। নতুবা
অর্কের বাড়ির থেকে একটুদূরে তিন বাইকে তখনো
স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। অপেক্ষায় ছিল ‘বোন হাসছে’
এমন একটা মেসেজ পাওয়ার। অনেক রাত হয়েছে
দেখে শারফাত চৌধুরী একের পর এক কল করতে
লাগলেন ছেলেদের। কিন্তু একজনও যদি ফোন ধরে!
এ নিয়েও বকলেন কিছুক্ষণ। বকা না থামতেই হর্ন
বাজাতে বাজাতে শুধুরা বাইক নিয়ে মূল ফটক
পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল। গিন্নিরা পুনরায় তিন
ছেলে-বউদের বরণ করে নিলেন। বাড়িতে তখনো
অনেক মেহমান। বরণ করতে গিয়ে হাসাহাসি হলো
খুব। এরপর সিরাত তিন বউকে আগে শখের রুমে
নিয়ে গেলেন। তিনজনে বিছানায় শুয়ে পড়েছেন।
আজ সারাদিন অনেক কষ্ট হয়েছে। সিঁতারে এসে
তাদের অবস্থা দেখে হেসে ফেললেন। সিমিন এসে
খাওয়া-দাওয়া করালেন। শখের খোঁজ খবর নিলেন।
সিরাত ওদের এই হাল দেখে তো বলেই

ফেললেন,-‘এখনই ক্লান্তিতে হাল ছাড়লে হবে, মা গো? আসল পরীক্ষা তো হবে চার দেওয়ালের মাঝে। না ক্লান্তি মানবে আর না অজুহাত শুনবে।’

একথা শুনে শীতল ভীষম খেলো। মনে পড়ল দুপুরে বলা শুদ্ধর কথা। এদিকে রুবাবও আসতে আসতে যা তা বলেছে ঐশ্বর্যকে। আর স্বর্ণ? তার ফোনে যে কিসব মেসেজ এসেছে সেসব কাউকে বলার মতো না। তবে মেজো মা থামাতে হবে বুঝে স্বর্ণ বলল,
-‘ছিঃ! কিসব বলো মেজো মা? লজ্জা পর্দা কি লকারে রেখে এসেছো?’

শীতল বলল,-‘বয়কট, লজ্জাছাড়া চাচী শাশুড়ি।’

ঐশ্বর্য মিনমিন করে বলল,

-‘ভয় দেখাচ্ছেন কেন আন্টি?’

সিরাত ওদের অবস্থা দেখে হো হো করে হাসলেন।

বললেন,

-‘ওমা না বললে জানবি কিভাবে? এ্যাই তার আগে বল তো তিনজনই ঠিক আছিস তো? মানে আমার ছেলেদেরকে উপোস রাখবি না তো? ‘

মা আর বড় মা সামনে থাকায় তিনজনই মুখ কাচুমাচু করতে লাগল। সিরাতের সাথে যথেষ্ট ফ্রি হলেও তারা

সিমিন আর সিঁতারের সঙ্গে এসব ব্যাপারে এতটাও
ফ্রি না। সিরাত লাগাছাড়া কথা বলায় সিমিন, সিঁতারা
ডাক শুনে চলে গেলেন। তখন সিরাত দুষ্টু হেসে
ফিসফিস করে বললেন,-‘ আর বুদ্ধি দেবো?’

-‘থামবে তুমি!’

এভাবে নানান কথা বলে উনি পঁচাতে লাগলেন।
তিনজন কখনো শুনল কখনো বা হাসল, লজ্জা পেল,
কখনো রাগ দেখাল। ছেলেরা বাড়ি ফিরে আবার
কোথায় গিয়েছে কে জানে। যার যার রুমে সাজানো
হয়ে গেছে। রাত বাড়ছে। সারাদিন অনেক ধকল
গেছে বিধায় তিনজনকে যার যার রুমে রেখে
আসলেন সিরাত। মেয়েগুলোর বিশ্রাম দরকার। ক্লান্তি
ভেসে উঠেছে তাদের চেহারায়। রেখে আসার সময়ও
কত গল্প, কত হাসাহাসি হলো। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে
সঙ্গে বাড়ি স্তব্ধ হতে লাগল। তখন শেরওয়ানি বদলে
ছেলেগুলো কোথাও গিয়েছিল রাত বারোটার পর
হাসতে হাসতে কেবল ফিরল। তাদের গায়ে মাটি
দেখে সিঁতারা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,-‘এই
তোরা কোথায় গিয়েছিলি? তোদের গায়ে কাঁদা মাটি
কেন?’

সায়ন দাঁত বের করে হাসতে হাসতে জবাব দিলো,
-‘সারাদিন বসে থাকতে থাকতে শরীর ম্যাজম্যাজ
করছিল। তাই তিন ভাই মিলে ফুটবল খেলে এলাম।’
ছেলেদের কাণ্ডে শারায়ত চৌধুরী বিরক্ত মুখে কিছু
বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। এদের কিছু বলা মানে
যেচে বাঁশ খাওয়া। তাই বিরবির করতে করতে
রুমের দিকে হাঁটা ধরলেন। সিতারা ছেলেদের ফ্রেশ
হতে পাঠিয়ে দিলেন। তিনভাই রুমে যাওয়ার বদলে
এগোলো সাফওয়ান চৌধুরীর কাছে। সাফওয়ান
চৌধুরী ফোনে কথা বলে ঘুরতেই তাদের দেখে
অবাক হলেন। কিছু বলার আগে রুবাব লাজুক মুখে
বলল,-‘মেজো মামা, এমতাবস্থায় বউয়ের কাছে
যাওয়া ঠিক হবে না, ফটাফট পাজামা-পাঞ্জাবি ম্যানেজ
করে দাও, প্লিজ!’

-‘তোদের এ হাল কেন?’

এবার অধৈর্য্য সায়ন বলল,

-‘চাচ্চু আমার খুব বাসর বাসর ফিল আসছে একটু
তাড়াতাড়ি করো না প্লিজ।’

সাফওয়ান চৌধুরী কাশলেন। গলা খাঁকারি দিয়ে
তিনজনকে গেস্ট রুমে পাঠিয়ে খোঁজ করলেন

সিরাতেৱ। সিৱাত তিনটে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি এনে সাফওয়ান চৌধুৰীৰ কাছে দিলেন। উনিও পৌঁছে দিলেন ছেলেদের কাছে। গেস্টৰুমে ফেশ হয়ে খাবারের ট্ৰে নিয়ে তিনজনে দোতলায় উঠে এলো। স্বর্নের আগের রুম রুবাব আর ঐশ্বৰ্যের জন্য সাজানো হয়েছে। অতঃপর সিঁড়ি দিয়ে ভদ্রভাবে উঠে সায়েন সবার আগে রুবাবকে বিদায় দিলো। রুবাবের বুকো, মাথায় ফুঁ দিয়ে বলল,- ‘ভয় পাস না ভাই,, বেঁচে থাকলে কাল দেখা হবে। আর শোন, সমস্যা থাকলে আমাকে আগে জানাইস আমি চাঁদা তুলে তোকে হারবাল কিনে দেবো।’

রুবাব হাসতে হাসতে রুমে প্রবেশ করল। সায়েন শুদ্ধ আরেকটু হেঁটে তাদের রুমের দিকে আসতেই সায়েন শুদ্ধকে থামিয়ে বলল,

- ‘ভাইরা ভাই কি অবস্থা আপনার? সব ঠিকঠাক তো? অভিজ্ঞ মানুষ..!’

শুদ্ধ ভ্রুঁজোড়া বাঁকাতেই সায়েন থেমে গেল। বোকা বোকা হেসে নিজের রুমে প্রবেশ করল। ভুল মানুষকে খোঁচানো যাবে না। নয়তো তার বাসর নামক সোনা ডিম আজও হাতছাড়া হতে পারে। আজ

কোনোভাবে মিস করা যাবে না। আজ সে বাসর করবেই; করেই ছাড়বে। এসব ভেবে মনে মনে খুশিতে আটখানা হয়ে রুমে ঢুকে দেখে স্বর্ণ বসে আছে। স্বর্ণ এখন শাড়ি পরে আছে। তার দিকে চোখ পড়তেই সায়নের দম আঁটকে আসার জোগাড়। কোনোমতে ট্রে রাখল। ধীরে সুস্থে দরজা আঁটকাল। ধীর পায়ে

স্বর্ণের কাছে গিয়ে দুই হাতে কোমর জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ল। ভাবখানা এমন যেন কিছুটি জানে না। স্বর্ণ খেয়াল করল তার চুলে পানি জবজব করছে। ঘাড়, কাঁধ ভেজা। সে শাড়ির আঁচল দিয়ে সায়নের মাথার চুল মুছতে লাগল। নরম স্বরে জিজ্ঞাসা করল,-‘কোথায় যাওয়া গিয়েছিলে?’

জবাবে সায়ন বলল,

-‘একটা প্রশ্নের জবাব একটা চুমুর বিনিময়ে কিনে নিতে হবে। যতটা প্রশ্ন ততটা চুমু। রাজি থাকলে এক চাপুন নয়তো চুপ থেকে আদর করতে সহায়তা করুন।’

-‘মাস্তুলি প্রবলেম। সেকেন্ড ডে। দুঃখিত, পাঁচদিন ওয়েট করতে হবে।’

একথা কৰ্ণকুহরে প্রবেশ করামাত্রই সায়ন আঁতকে
উঠে বসল। আবারও বাঁধা! তারমানে আজও হবে না?
কেন জানি এবার তার ভীষণ অভিমান হলো। সে
অভিমानी মুখে কিছুক্ষণ স্বর্গের দিকে তাকিয়ে রইল।
তারপর

অভিমানি সুরে বলল,-‘বালের বউ আমার। বালের
বাসর। যখনই কিছু ভাবি তখনই ঠাড়া উড়ে আসে।
এত বাঁধা তো যা বাসরই করব না। এম্মুণি বনবাসে
চলে যাব। ছোটো ভাইরা বিয়ে করে বাসর করে
ফুটফুটে চেহারা নিয়ে চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।
আর আমি,,,আমি বাসরে ঠাড়া পরাই শেষ হচ্ছে না।’
রাগে অভিমানে কথাগুলো বলতে বলতে সে দরজার
দিকে পা বাড়াতেই

স্বর্ণ পেছন থেকে তার পাঞ্জাবির আঁকড়ে ধরল।
স্বজোরে টানে নিজের দিকে ঘুরাতেই সায়ন মুখ
ফিরিয়ে নিলো। স্বর্ণ বলল,-‘কোথায় যাচ্ছে?’

-‘যে যৌবন কাজে লাগে না সেই যৌবন রাখব না।’

-‘এত পাগল হলে হবে?’

-‘কেন হবো না? আর কত ওয়েট করা যায়? আগে
কেন বললি না যে ডেট আছে?’

-‘বললে কি হতো? বিয়ের তারিখ বদলে ফেলতে?’

-‘ফেলতাম।’

একথা বলে সে পাঞ্জাবি ছাড়িয়ে যেতে গেলে স্বর্ণ পুনরায় ধরে ফেলল। তখন সায়ন বলল,

-‘গরম পানি আর কী কী যেন লাগে নিয়ে আসি। বউটা তো আমারই। কষ্ট তো দিতে পারি না। এতদিন ধৈর্য্য ধরেছি আর এক সপ্তাহ নাহয়....!’ সায়ন আর কথা শেষ করতে পারল না তার আগেই স্বর্ণ তার ওষ্ঠজোড়া আঁকড়ে ধরল। হতভম্ব সায়ন বিস্ময়ে কথা ভুলে গেল। ভুল গেল নিজের অবস্থান। কাল, ক্ষণ, সময়। লম্বা, চওড়া সায়নের হাইটের সঙ্গে দাঁড়াতে একটু কষ্টই হচ্ছিল। সায়ন মাথা নিচু করতেই স্বর্ণের জন্য সুবিধা হলো। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সরতে গেলে সায়ন আঁকড়ে ধরল স্বর্ণকে। চুপ করে তাকিয়ে রইল স্বর্ণের দিকে। মুখে শব্দ নেই। তবে তার চোখজোড়া যেন খুব অভিমান করে বলছে, ‘যেহেতু ছুঁতে পারব না আর জ্বালাস না, জান। দোহায় লাগে, থাম, প্লিজ।’ তার অবস্থা দেখে স্বর্ণ দুট্টু হাসল। তারপর সায়নের পায়ের পাতার উপর দাঁড়িয়ে কানে কানে ফিসফিস করে বলল,-‘অনুমতি দিলাম।’

-‘কিসের?’

-‘ মিথ্যা বলেছি।’

সায়ন এবার ফট করে ঘুরে তাকাল। অবাকের সুরে বলল,

-‘ মাস্তুলি প্রবলেম নেই?’

-‘না।’

-‘আবার মজা নিচ্ছিস?’

-‘না।’সায়নের বুঝতে বাকি রইল না স্বর্ণ এতক্ষণ মিথ্যা বলে মজা নিচ্ছিলো। সে এক ধাক্কায় স্বর্ণকে সরিয়ে দিলো। বিনাবাক্যে দ্বিতীয় ধাক্কায় দুজনে বেড়ে। স্বর্ণ কিছু বলার আগে অগ্রাসী সায়ন অধৈর্যের মতো ওষ্ঠজোড়া দখলে নিলো। চুমুর তালে তালে দাঁত বসাতে লাগল স্বর্ণের কাঁধে, গলায়। হাতজোড়াও লাগামছাড়া অবাধ্য হলো। স্বর্ণ বাঁধা দিতে গেলে বেহায়ার মতো হাসল। পরনের পাঞ্জাবি ছুঁড়ে ফেলে স্বর্ণের আঁচলটাও সরে গেল। দুষ্ট, বেহায়া, অসভ্য পুরুষটা সেদিকে তাকিয়ে ঠোঁট কামড়ে কেমন করে যেন হাসল। ভ্রুঁ নাচাল। তারপর স্বর্ণের কানে কানে মেঘদূতের কবিতার কয়েকটা লাইন আওড়াল,সত্যিই ক্ষেপে গেছি এবার,

চুমুতে চুমুতে ছিঁড়ে নেবো ঠোঁট।

পাঁজকোলা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দেব বিছানায়,
বারো হাত কাপড়ের কানায় কানায়।

সাধ্য থাকে তো শুধু এক বার ওঠ,
গোত্রাসে ভালোবেসে যাব এক চোট।

__ মেঘদূত (কবিতা সংগৃহীত)রুবাব রুমে ঢুকে দেখে
ঐশ্বর্য বিছানার হেডবোর্ডে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে
পড়েছে। চোখ, মুখে ক্লান্তির ছাপ। হলুদের রাত
থেকে গায়ে গায়ে হালকা জ্বর মেয়েটার। তবুও
কাউকে বলে নি, আচমকা এসে জড়িয়ে না ধরলে
সেও জানত না। মেডিসিন নেওয়ার পর জ্বরটা এখন
নেই অবশ্য। রুবাব হাতের ট্রে রেখে এগিয়ে গেল।
এগিয়ে মনে হলো দরজা আঁটকানো হয় নি। পুনরায়
পিছু ফিরে দরজা আঁটকে বিছানার কাছে গেল।
নিঃশব্দে বসল। ঐশ্বর্যকে কোলে তুলে বালিশে
ঠিকঠাকভাবে শুইয়ে দিলো। চুমু খেলো কপালের মাঝ
বরাবর। ঐশ্বর্যের পরনে হালকা গোলাপী রঙের
জামদানি শাড়ি। হাত, কান, গলা, কোমরে কাঁচা
ফুলের গয়না। মালাটা সরে গেছে বিধায় চোখ পড়ল
গলার দিকে। ওর গলা থেকে বুক অবধি এসিডে

ঝলসানো খসখসে কুঁচকানো চামড়া। ফর্সা শরীরে
ঝলসানো চামড়া দেখতে অদ্ভুত লাগে। যদিও তার
কাছে একটুও অদ্ভুত লাগে না, বরং গর্ব হয়। আরো
ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। পৃথিবীতে যত সুখ, শান্তি,
ভালোবাসা আছে সব কুড়িয়ে ঐশ্বর্যের আঁচলে বেঁধে
দিতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে তার বুকে জমা
কষ্টগুলো শুষে নিতে। তার মুখ লুকানো কান্না করার
কারণগুলো এত তুড়িতে সমাধান করে দিতে। কিন্তু
সেটা তো তার পক্ষে সম্ভব না। সম্ভব না ঐশ্বর্যকে
আগের অবস্থানে নিয়ে এতে। মেয়েটা যতই স্বাভাবিক
থাকুক সে ঠিক বুঝে ঐশ্বর্য ভেতর ভেতর গুমরে
মরছে, কষ্ট পাচ্ছে। অথচ তার পড়াশোনা, চলাফেরা,
স্মার্টনেস, কথাবার্তার মাঝেও একটা আর্ট আছে। তার
পারসোনালিটি নজরে লাগার মতোই। অথচ সেই
মেয়ে এখন কেন জানি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায়।
যখন একা থাকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অঝরে
কাঁদে। সে যখন তার বুকে আঁকড়ে ধরে আদুরে
বিড়ালছানার মতো মুখ লুকিয়ে রাখে। যেন সেও চায়
রুঝাবের বুকের ভেতর ঢুকে যেতো। লোকচক্ষুর
আড়ালে লুকিয়ে থাকতে। কেননা লুকিয়ে থাকলে

কেউ অবাক দৃষ্টিতে তাকাবে না, গলায় কি হয়েছে
জানতে চাইবে না, ঘৃণায় মুখ কুঁচাবে না, ঘটনা শুনে
স্বাত্ত্বগার বাণী আওড়াবে না। তবে রুবাব বুকে হাত
রেখে বলতে পারবে বলসানো চেহারা ঘৃণার
পরিবর্তে চুমু খেতে পারবে। মেয়েটা ভীষণ
ভালোবাসতে পারবে। তাকে সুখে রাখার, ভালো
রাখার চেষ্টায় থাকবে। বলা বাহুল্য, ঐশ্বর্যকে আগে
যতটুকু ভালোবাসে এখন তার থেকেও হাজারগুন
বেশি ভালোবাসে। ভালো না বেসে উপায় আছে? এ যে
তার ভাইয়ের বিপদে কেমন ঢাল হওয়ার চেষ্টা
করেছিল। নিজের ক্ষতি করেও ঠিকই দেখিয়ে
দিয়েছে সে আমানত রাখতে জানে। তার এই ত্যাগের
কারণে চৌধুরী পরিবারের প্রতিটা সদস্যের কাছে সে
প্রিয়। ভীষণ ভালোবাসার। তবে তাকে কেউ
মাত্রারিক্ত কিছুই করে না যাতে ঐশ্বর্য ভাবে অন্যকিছু
ভাবে। অন্যকিছু বলতে তাদের স্নেহ লোক দেখানো।
এজন্য বাড়ির অন্য মেয়ে যেমন থাকে, যেমন আদর
পায়, তার জন্যও সে আদরটুকু বরাদ্দ থাকে।
শারায়াত চৌধুরী বিয়ে উপলক্ষে তার কাছে এক
টাকার নেন নি। দিতে গেলে থমথমে মুখে বকেছে।

এত বকাটা আদরের। বাড়ির মেয়ে হিসেবে শীতল, স্বর্ণ, শখ যা পেয়ে একই জিনিস ঐশ্বর্যকেও দেওয়া হয়েছে। মা মরা, স্বজনহারা মেয়েটাকে সবাই এত ভালোবাসে যে দেখেও খুব শান্তি লাগে। যতই এটা মামার বাড়ি হোক, শুদ্ধ-সায়ন মামাতো ভাই হোক, সে দিনশেষে গর্ব করে বলতে পারে তারও পরিবার আছে। কলিজার ভাই বোনরা শক্তি হিসেবে পাশে আছে। এসব নানান কথা ভাবতে ভাবতে কেন জানি রুবাবের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে অশ্রু গড়িয়ে গেল। পরের অশ্রুটুকু পরার আগেই ঐশ্বর্য হাতের মুঠোয় নিলো। ঘুমঘুম স্বরে বলল,-‘কাঁদছো কেন? বউকে দেখে আফসোস হচ্ছে?’

রুবাব পুনরায় ঐশ্বর্যের কপালে, গালে ঠোঁট ছুঁইয়ে বলল,

-‘উঠো, খাবে চলো।’

-‘খেয়েছি আমি। তুমি খেয়ে এসো।’

-‘তা হচ্ছে না, উঠুন।’

একথা বলে রুবাব ঐশ্বর্যের হাত ধরে টেনে এনে উঠে বসাল। তারপর ঐশ্বর্যের মুখে খাবার পুরে

নিজেও খেতে লাগল। ঐশ্বর্যের রুবাবের মুখ দেখে
রুবাবের কাঁধে মাথা রেখে বাহু জড়িয়ে ধরে বলল,
-‘আমার মহারাজের মন খারাপ কেন? ঘুমিয়ে
পড়েছিলাম তাই?’

-‘না।’

-‘কি হয়েছে?’

-‘বলতে পারি যদি কান্নাকাটি না করো।’ ঐশ্বর্য মাথা
তুলে তাকাল। কিছু একটা বুঝে কিয়ৎকাল রুবাবের
মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। রুবাব ঐশ্বর্যের
মুখে খাবার দিলেও ঐশ্বর্য নিলো না তার অশ্রুসিদ্ধ
চোখজোড়া থেকে ঝরঝরিয়া অশ্রু ঝরে গেল।

রুবাব ছলছল চোখে বাম হাতে তার চোখ মুছে দিয়ে
হাসল। বলল,

-‘তুমি কাঁদলে যাব কিভাবে?’

এর আগে ঐশ্বর্য কখনো রুবাবের দেশ ছাড়ার মুহূর্তে
ভুলেও কাঁদে নি। বরং হাসি মুখে তাকিয়ে বিদায়
জানিয়ে বাসায় ফিরে পাগলের মতো কেঁদেছে। যতই
কষ্ট পাক, মন খারাপ হোক, রুবাবের সামনে মন
খারাপ করে কথা বলে নি। কিন্তু এবার বোধহয়
নিজেকে সামলাতে পারবে না। পারবে না হাসি মুখে

বিদায় দিতে। ঐশ্বর্য আজ স্থির থাকতে পারল না
রুবাবের কাঁধে মুখ লুকিয়ে শব্দ করে কেঁদে ফেলল।
রুবাব একহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে ভেজাস্বরে বলল,
-‘কাঁদে না জান। তুমি কাঁদলে আমি যেতে পারব না।
আমার ধাপ উঠবে না। মাত্র..মাত্র ছয়টা মাস। দেখবে
দেখতে দেখতে চোখের পলকে কেটে যাবে।’

ঐশ্বর্য কথা বলতে পারল না। ব্যাকুলস্বরে কেঁদে
গেল। রুবাবের খাওয়া হলো না। গলা দিয়ে খাবার
নামল না। কোনোমতে হাত ধুয়ে ঐশ্বর্যকে বুকে নিয়ে
শুয়ে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে ঐশ্বর্যের ফুলের গয়নার
বেহাল দশা। পরনের শাড়ি এলোমেলো। চুল
অগোছালো। ফর্সা নাকটা লালবর্ণ ধারণ করেছে।
ফুলে লাল হয়ে উঠেছে ডাগর ডাগর নেত্রজোড়া।
চিকন ঠোঁটজোড়া কান্নার চোটে তিরতির করে
কাঁপছে। ঐশ্বর্য হঠাৎ রুবাবের বুক থেকে মুখ তুলে
ফোঁপাতে লাগল। রুবাবের মুখটা আজলা ভরে দুই
হাতে নিলো। কপালে চুমু করে কপালে কপাল
ঠেকাল। তারপর ঢোক গিলে বলল,-‘যেতে দিবো যদি
আমি যা চাই দেওয়া হয়।’

রুবাব ঐশ্বর্যের চোখজোড়া মুছে চোখের পাতায় চুমু
খেলো। বলল,

-‘কি লাগবে বলেই দেখো।’

-‘ছোট্ট রুবাব আসার ব্যবস্থা করে যাও।’

ঐশ্বর্যের কথার মানে বুঝতে সময় লাগল না
রুবাবের। হতভম্ব হয়ে এক

পর্যায়ে শব্দ করে হেসে ফেলল। ঐশ্বর্যের মাথাটা
বুকের সাথে চেপে ধরে বলল,

-‘আমার বউটা তো কখনো আবেগী ছিল না। বোকা
বোকা কথা বলতো না। এ কদিনে শীতলের ছোঁয়া
লেগেছে বুঝি?’

-‘কথা ঘুরাবে না রুবাব। আমি যা বলছি তাই হবে
নয়তো যাওয়া হচ্ছে না এই বলে দিলাম।’

-‘আরে বাবা, হাতে সময় নেই আর দশদিন পরেই
আমার জয়েন্ট। বেবি নেওয়ার প্ল্যান কি এভাবে হয়?
এবার এসে নাহয়..!’

-‘আল্লাহ চান তো এবারই হবে। প্লিজ,,,প্লিজ রুবাব!’

অগত্যা ঐশ্বর্যের জেদের কাছে রুবাবকে হার মানতে
হলো। ঠিক করল, কিছুদিনের জন্য দূরে কোথাও
ঘুরতে যাবে। কারণ বউয়ের আবদার রাখতে একান্ত

সময়ের প্রয়োজন। চেষ্টা করুক,,বাকিটা আল্লাহ
ভরসা।__'শখ? ভালো আছ তো তুমি?'

হরমুড়িয়ে রুমে ঢুকে উক্ত কথাটি আমতা আমতা
করে বলল অর্ক। খুব নার্ভাস সে। আসলে বন্ধুদের
ঠেলা খেয়ে এভাবে ঢুকতে হয়েছে। একদল হাড়ে
বজ্জাত বন্ধু কপালে জুটেছে। ঢুকতে গিয়ে স্বজোরে
বারি খেয়েছে হাতের কনুইতে। শখ অবাক দৃষ্টিতে
তাকিয়ে আছে তার সামনে দাঁড়ানো সুদর্শন পুরুষের
দিকে। অর্ক কি বলবে বুঝতে না পেরে শুধু মুখ
কাচুমাচু করছে। তার অবস্থা দেখে শখের কেন জানি
ভীষণ হাসি পেল। ভালোও লাগল, শুধু সে না অর্কও
নার্ভাস। বিয়েটা এত তাড়াতাড়ি হলো তাদের মাঝে
বোঝাপড়া হয় নি। সেভাবে কথা হয় নি। কারো
পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারে জানা যায় নি। এসব
নাহয়ে অবশ্য ভালো হয়েছে এখন যা হবে হালাল
ভাবে হবে। কামরানরা বাইরে থেকে দরজা আঁটকে
দিয়েছে। সে একবার বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে
ভেতর থেকেও লক করল। তারপর ধীর পায়ে এসে
বসল বিছানার এককোণে। আমতা আমতা করে ধীরে

ধীরে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল শখের দিকে। নরম সুরে বলল, ‘পছন্দের খাবার এনে দিয়েছি খাও নি কেন?’

‘পেট ভরা।’

‘এখনো মন খারাপ?’

শখ জবাব দিলো না ধীরে ধীরে মাথা নিচু করে নিলো। অর্ক বলল,

‘কালই ওইবাড়িতে নিয়ে যাব। আগে ছিল একটা বাড়ি এখন হলো দুইটা বাড়ি। আজ থেকে দুই দুইটা বাড়ি তোমার; যখন ইচ্ছে যাবে-আসবে।’

‘হুম।’

এরপর কেউ আর কোনো কথা খুঁজে পেল না। কিছুক্ষণ পর শখ নিজে থেকে নিচু স্বরে বলল,

‘নামাজ পরব অযু করে আসুন।’ কথাটা কণ্ঠকুহরে পৌঁছানো মাত্রই অর্ক ভীষণ খুশি হলো। এতক্ষণ ধরে ভাবছিল কথাটা কিভাবে বলবে। মেয়েদের নানান সমস্যা থাকে। সে যদি আগ বাড়িয়ে বলেও আর যদি সমস্যা থাকে মেয়েটা লজ্জা পাবে। তাই

বলতে পারছিল না তবে প্রস্তাব যখন শখের থেকে এসেছে সে বসল না। চট করে অযু করে এলো। সে এলে শখ অযু করে এসে অর্কের আগাপিছু নামাজে

দাঁড়িয়ে গেল। দুজনের হাত তুলল রবের দরবারে।
দোয়া করল নিজের দাম্পত্য জীবনের জন্য, বাকি
তিন কাপলের জন্য। নামাজ পরে
শখ উঠে বসতেই অর্ক একটা প্যাকেট তার দিকে
এগিয়ে দিলো। বলল, ‘এখানে দেনমোহরের নগদ
টাকা আছে। আর, আর ছোট্ট একটা গিফ্ট। খুলে দেখ
পছন্দ হয় কী না! নেদারল্যান্ডস গিয়েছিলাম সেবার
খুব শখ করে এনেছিলাম। মমের জোড়া মমকে
দিয়েছি আজকে বউ.. না মানে তোমারটা তোমাকে
দিলাম।’

শখ গিফ্টের প্যাকেট খুলে দেখে অসম্ভব সুন্দর
একজোড়া স্বর্ণের চুড়ি।

সে চুড়িজোড়া দেখে তাকাল অর্কের দিকে। তারপর
এগিয়ে দিতেই ধপ করে অর্কের হাসি মুছে গেল।
বলল, -‘পছন্দ হয় নি? আচ্ছা, সমস্যা নেই আবার
এনে দেবো।’

একথা বলে সে শখের বাড়িয়ে দেওয়া চুড়িজোড়া ধরে
রাখতে গেলে শখ অন্যদিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে
দিলো। লজ্জায় নতজানু সে। তবুও তার দিকে থেকে
একধাপ এগিয়ে এলো। যাতে অর্কও সহজ হতে

পারে। আর দুজনের কেউ একটু একটু করে না
এগোলে কেউ সহজ হতে পারবে না। অথচ সম্পর্ক
টিকতে রাখতে চাইলে বোঝাপড়াটাই সবার আগে।
শখের বাড়ানো হাত দেখে অর্ক দ্বিতীয় দফা খুশি
হলো। ঠোঁটের কোণে হাসির রেশ। খুব যত্ন করে
চুড়িজোড়া পরিয়ে দিলো। শখের লজ্জারাঙা মুখের
দিকে তাকাল। বুঝল শখের আরেকটা অস্বস্তির
কারণ। তাই বলল, ‘ ভয় নেই, যতক্ষণ না তুমি
পারমিশন দিবে ততক্ষণ,,,!’

একথা বলে অর্ক থামল তারপর একগ্লাস পানি পান
করে গিয়ে বেডের একপাশে শুয়ে পড়ল। শখ
দাঁড়িয়ে আছে দেখে তাকেও শুয়ে পড়তে বলল।
রাতও অনেক হয়েছে। আজ সারাদিন অনেক ধকল
গেছে বিশ্রাম দরকার। শখ ধীর পায়ে অন্যপাশে গিয়ে
শুয়ে পড়ল। তখন অর্ক তাদের বন্ধুদের গল্প বলতে
লাগল। সেসব শুনে হাসল শখ। অর্ক খুব সুন্দর করে
গুছিয়ে স্পষ্টস্বরে কথা বলে। শখ মনযোগীশ্রোতা হয়ে
গল্প শুনতে শুনতে ঘুমে তলিয়ে গেল। তার নিঃশ্বাস
ভারি হতেই অর্ক কাছাকাছি এলো। খুব মন দিয়ে

শখের মুখটাকে দেখল। খুব সাবধানে কপালে আদর
আঁকল।

তারপর বিরবির করে বলল, ‘বন্ধুর বোন ভেবে
নজর না দিয়ে ভুল করেছি। এখন আফসোস হচ্ছে।
তবে দিনশেষে তোমাকে পেয়ে নিজেকে বড্ড
সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছে। এই যে ঘুমকুমারী আমার
জীবনে আসার জন্য চিরকৃতজ্ঞ আমি। কথা দিচ্ছি,
আমি বেঁচে থাকাকালীন ভালোবাসার অভাব হবে না
আপনার। হতেই দেবো না আমি।’ ওদিকে একচোট
ভালোবাসাবাসি শেষে সায়ন-স্বর্ণ দুজনই একসাথে
শাওয়ার নিয়ে এলো। নামাজ পরল। একসাথে
খেলো। তারপর সায়ন স্বর্ণকে বুকে জড়িয়ে শুয়ে
পড়ল। কে বলবে এই ছেলেটাই এত উন্মাদ ছিল!
ক্ষ্যাপাটে ষাঁড়ের মতো তেড়ে এসেছিল তাকে ছুঁয়ে
দিতে। অথচ তার ছোঁয়াতে কোনো ক্ষীপ্রতা ছিল না।
তাড়া ছিল না। যা ছিল তা হলো ভালোবাসা। এই
ছেলেকে বুঝতে হলে তার মতো করে চলতে হবে।
এই যে তখন ওভাবে ক্ষেপে গেল বাঁধা দিলো রেগে
যেতো। সে যখন মেনে নিলো সব ঠান্ডা। এ বুনো
ক্ষ্যাপাটে ছেলেটা মুখে যতই গালাগাল করুক,

বকা দিক, তার বিশেষদিক সে ভীষ যত্ন করে
ভালোবাসতে পারে। বুকে আগলে রাখতে জানে।
তাকে সব রকমভাবে চেনো হয়ে গেছে স্বর্ণের।
তাকে কখন কিভাবে থামাতে হবে তাও বুঝে। কখন
কীভাবে তার পেট থেকে কথা বের করতে হয় তাও
জানে। এখন যেমন স্বর্ণ হাত বাড়িয়ে সায়নের মাথার
চুল টেনে দিতে থাকল। সায়ন শান্ত ভদ্র ছেলের
মতো স্বর্ণের গলার ভাঁজে মুখ গুঁজে আছে। ঘুমঘুম
ভাব। তখন স্বর্ণ জিজ্ঞাসা করল, ‘ঘুম পাচ্ছে?’

‘হুম।’

‘বললে নাতো তখন কোথায় গিয়েছিলে?’

‘কবরস্থানে।’

‘কেন?’

‘ইয়াসিরের সহকারী বুরাকের জানাযায় শরীক
হতে। জানিস, বুরাক

কিয়ারাকে কিডন্যাপ করেছিল। আঁটকে রেখেছিল।
বিয়েও করেছিল।

কিয়ারা তাকে মানতে না পেরে সুইসাইড করেছে
পরে ছেলেটা নিজের জীবনটাও শেষ করে দিলো।

কিয়ারাকে চিনতে পেরেছিস? আমাদের শীতলের

বেস্ট ফ্রেন্ড। এর পেছনেও ইয়াসির আছে। এখন
কথা হচ্ছে,

শীতলের কানে গেলে কি যে হবে আল্লাহ জানে।’

— ‘তোমরা গিয়েছিলে কেন? জানলেই বা কিভাবে?’

— ‘ইয়াসির খবর পাঠিয়েছিল জানাযায় শরীক হওয়ার
যাওয়ার জন্য। না যেয়ে উপায় আছে? পৃথিবীর সব
ক্ষমতা, অহংকার জানাযার কাতারেই শেষ। আজ যে
খাঁটিয়ায় বুরাক কাল আমি ..!’ — ‘থামো। ঘুমাও।’

সায়ন নিঃশব্দে হেসে ফেলল। স্বর্ণকে বুকের সাথে
চেপে ধরে ঘুম ঘুম স্বরে বলল,

— ‘ভুলেও আমাকে ছেড়ে যাস না রে জান। তোকে
ছাড়া আমার পুরো পৃথিবী অন্ধকার। ম’রে যাব আমি।
দরকার হলে নিজের হাতে খুন করে যাস তবুও একা
ফেলে যাস না।’

একথা বলতে বলতে সায়ন ঘুমে তলিয়ে গেল। স্বর্ণ
শুনে গেল প্রেমিক পুরুষটার কথা। চাঁদের আলোয়
মন ভরে দেখল সায়নের মায়াভরা মুখ।

সে জানে, এই চঞ্চল এই পুরুষটার বুকে একটা বাক্স
আছে। সেই বাক্সে একান্ত ব্যক্তিগত কিছু কষ্ট
লুকানো আছে। হাসপিটালে শুদ্ধ-শীতলের

বিয়ের দিন ইয়াসির যেদিন সবার সামনে সায়নকে
পরগাছা বলেছিল। অপ্রকাশিত সত্য প্রকাশ হয়েছিল।
সেদিন সায়ন বাড়িতে এসে চুপচাপ শুয়ে পড়েছিল।
সেও এসেছিল। বুকের মাঝে আগলে নিতেই
এভাবেই

আগলে রেখেছিল। তার এই উন্মাদ পুরুষটাই নীরবে,
নিঃশব্দে অঝরে কেঁদেছিল। তার চোখের পানি তার
গলা ভিজিয়েছিল। সেদিনের বাকি রাতটুকুও জেগে
ছিল। ঠিক এভাবে বুকে আগলে রেখে বুঝিয়েছিল,
সে আছে, ছিল, মৃত্যুর আগ মূহূর্ত পর্যন্ত সঙ্গে
থাকবে। পাক্কা বিশ মিনিট ধরে শীতলকে কান ধরিয়ে
দাঁড় করিয়ে রেখেছে শুদ্ধ। তার হাতে শক্তপোক্ত
মেহগনি গাছের চ্যালাকাঠ। শীতল লাল জামদানি
বাঙালিয়ানা ভাবে পরেছে। গায়ে সুগন্ধিওয়ালা কাঁচা
ফুলের গয়না। সরু কোমরে শুদ্ধর দেওয়া সেই
কোমরবন্ধনী। লম্বা খোলা চুল। সব মিলিয়ে ভীষণ
মিষ্টি লাগছে দেখতে। শুদ্ধ থমথমে মুখে ভ্রুঁ জোড়া
কুঁচকে তাকে আপাদমস্তক দেখল। রাতের বেলা
সেজেছে কেন বলে চ্যালাকাঠ দিয়ে মারতে গেলে
শীতল ভয়ার্ত চোখে তাকাল। তার এমন ব্যবহারের

কারণ খুঁজে পাচ্ছে না সে। তাকে তাকাতে দেখে শুদ্ধ
এক বারি বসিয়েই দিলো।

ধমকে বলল, তার দিকে তাকালেই মেরে প্রতিবন্ধী
করে দেবে। অগত্যা শীতল মাথা নিচু করে কান ধরে
ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কান্নাভেজা স্বরে বলল,-‘কি
করেছি আমি? মারছেন কেন আমায়? কিছুদিন আগে
না আমরা প্রেম করে বিয়ে করেছি? কষ্ট করে পাওয়া
বউকে কেউ মারে?’

-‘আমি প্রেম করি নি। বিয়েও করি নি। আমি
সিঙ্গেল। সিঙ্গেলই থাকব। বের হোন আমার রুম
থেকে, কারো সঙ্গে রুম শেয়ার করতে পারি না
আমি।’

শুদ্ধর কথা শুনে শীতল বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে
রইল। কি বলে এই লোক? মন নিলো, দেহের
দখলদারি খাটাল, এখন বলে কি না সিঙ্গেল! এই
লোক কি গাছের সাথে বারি টারি খেলো নাকি? নাকি
মাল মুল খেয়ে এসেছে? যদি তা না হয় তাহলে হঠাৎ
মতিভ্রম হওয়ার মানে কি? তাকে যেতে না দেখে শুদ্ধ
আরেক বারি মারার আগেই শীতল হাউমাউ করে
কেঁদে উঠল। মুখে বলতে লাগল,-‘আর মারবেন না

শুদ্ধ ভাই, চালাকাঠের মার খুব লাগে। আর করব না। আপনি যা বলবেন তাই। আপনি সিঙ্গেল। আমি সিঙ্গেল। পৃথিবীতে যে যেখানে আছে আমরা সবাই সিঙ্গেল।’

কাঁদো কাঁদো সুরে একথা বলতে শুনে শুদ্ধ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। পানি পান করতে করতে বেড়ে শোয়া শীতলের কথাগুলো শুনল। দেড় ঘন্টা আগে রুমে এসে দেখে শীতল বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। ক্লান্ত মুখটা দেখে মায়া লাগছিল দেখে ডাকে নি। শীতলের গায়ের ফুলের গয়না খুলেছে। চুলে বিনুনি করেছে। নামাজ পরেছে। তবুও শীতল জাগা পায় নি সে নামাজ

পরে উঠে পানির মুখে নিতেই ব্যাঙাটির ঘরের ব্যাঙাটি ঘুমের ঘরে স্বপ্ন দেখে কেঁদে উঠল। ভুলভাল বকছে এখনো। কাঁদছেও। মাঝরাতে কেউ শুনলে কি ভাববে? তবে এটা নতুন কিছু নয় দেখে শুদ্ধ অবাকও হলো না রাগলও না। গ্লাসে পানি নিয়ে শীতলের কাছে গেল। নরম সুরে বলল,-‘কাঁদতে কাঁদতে গলা শুকিয়ে গেছে নিশ্চয়ই? পানি খা।’

একথা বলে পরপর দুবার শীতলকে ডাকতেই শীতল
চোখ পিটপিট করে তাকাল। নিজের অবস্থান ধাতস্থ
করে উঠে বসল। বুঝল, স্বপ্ন দেখছিল।

গ্লাসটা নিয়ে পানি পান করল। ঘুম ছুটে গেছে তার।
স্বপ্ন দেখে কাঁদছিল বুঝে মনে মনে নিজেই একচোট
হাসল। শুদ্ধ গ্লাসটা রাখতেই সে বলল,

-‘কখন এসেছেন? ডাকেন নি কেন আমায়? আসলে
মাথা ব্যথা করছিল

চোখ বন্ধ করে থাকতে থাকতে কখন যেন ঘুমিয়ে
পড়েছি। খেয়েছেন আপনি?’

-‘হুম। মাথা ব্যথা কমেছে?’

-‘না।’ শুদ্ধ দুজনের বালিশ ঠিকঠাক করে শুতে
ইশারা করল। শীতলও কথা না বাড়িয়ে শুয়ে পড়ল।
শুদ্ধ হাতের উপর ভর দিয়ে শুয়ে শীতলের কপাল
টিপে দিতে লাগল। শীতল চেয়ে চেয়ে দেখল বিশুদ্ধ
পুরুষটাকে। খেয়াল করল শুদ্ধ সাদা পাজামা পাঞ্জাবি
পরে আছে। এই বেশে বেশ লাগে তার

ব্যক্তিগত পুরুষটাকে। তারপর কী ভাবল কে জানে
লজ্জায় গালজোড়া লাল হয়ে উঠল। ওষ্ঠজোড়া লাজুক
হাসল। শুদ্ধ শীতলের তখনো দিকে তাকিয়ে থাকায়

কোনোটাই নজর এড়ালো না তার। তার ঠোঁটেও
ফুটল মিটিমিটি হাসি। চোখে দুষ্ট চাহনি। ওর এমন
দৃষ্টিতে শীতল নতজানু হয়ে গেল। শরীর কাঁপতে
লাগল মৃদুভাবে। ইচ্ছে করে যে বিশুদ্ধ পুরুষ তাকে
লজ্জা দিচ্ছে বুঝতে বাকি রইল না। তবে এ মানুষটা,
এ মানুষটার ছোঁয়া সর্বাঙ্গে মেখেছে তবুও এ দৃষ্টি যেন
নতুন করে ঘায়েল করে দিচ্ছে তাকে। তার লাজুকভাব
দেখে শুদ্ধ ভ্রুঁ নাচাতেই শীতল দুই হাত দিয়ে তার
চোখ ঢেকে দিলো। এ চোখজোড়া ভারি দুষ্ট। বড্ড
জ্বালাচ্ছে। কিসব আবদার

করছে। তার এহেন কাণ্ডে শুদ্ধ হাত সরিয়ে তার
নিজের আঙুলের ভাঁজে

শীতলের আঙুল রাখল। নিচু স্বরে বলল,

-‘কেউ কি আমাকে দেখে লজ্জা পাচ্ছে?’-‘(....)।’

-‘পাচ্ছে না?’

-‘(.....)’

-‘যাই, ফুটেজটা তাহলে নিয়ে আসি।’

একথা বলে উঠতে গেলে শীতল আঁটকে দিলো।

শুদ্ধর বুকে মুখ লুকিয়ে

মিনমিন করে বলতে লাগল,

-‘এই,,, না প্লিজ। এই যে দেখুন আমি লজ্জা পাচ্ছি,..
খুব লজ্জা পাচ্ছি। ‘ওর কান্ডে শুদ্ধ এবার শব্দ করে
হেসে ফেলল। বুকের উপর টেনে নিলো ছোট
শরীরটাকে। তাকে এভাবে হাসতে দেখে শীতলের
মন ভরে গেল। চোখজোড়া যেন জুড়িয়ে এলো। সে
নিজেও মিটিমিটি হাসতে হাসতে মনে মনে আওড়াল,
- ‘মাশাআল্লাহ! মাশাআল্লাহ! এই মুখের হাসিটুকু
হাজার বছর অমলিন থাকুক। আমার ভাগের সবটুকু
সুখ, সব ভালোবাসা আপনার জীবনে পুষ্পকলির ন্যায়
ফুটে উঠুক।’রাতের ঘোর কাটিয়ে পরেরদিন নতুন
এক সকালের সূচনা হলো। সকাল
সাড়ে আটটার মধ্যে বাড়িতে হইহটগোল শুরু হয়ে
গেছে। নাস্তার পর্বও শেষ। তবে নবদম্পতিদের
খাওয়ার টেবিলে ডাকা হয়নি ; রুমেই পাঠিয়ে দেওয়া
হয়েছে সকালের খাবার। নতুন বিয়ে, একটু লজ্জা,
একটু অস্বস্তি লাগবে এটা স্বাভাবিক। তাছাড়া ছেলে-
মেয়েদের অকারণে লজ্জা দিতে চান নি কেউই।
যদিও ভাবিরা গোসলের ব্যাপারে গাঁইগুঁই করছিল।
মজা নেওয়ার জন্য ডাকতে যেতে চাচ্ছিল। কিন্তু
সিরাত বারণ করলেন কারণ সায়ন এসব মজা

বুঝলেও শুদ্ধ বুঝবে না। ওই ছেলের মুখ তো না যেন ধারালো ব্লেড। কি বলতে কী বলে বসবে তখন হবে আরেক বিপদ। আর

শুদ্ধ গতদিনও গোসলের জন্য বাগানে যেতে চাচ্ছিল না। সিতারা বলে কয়ে রাজি করালেও পাজামা-পাঞ্জাবি পরে গিয়েছিল। হলুদে পরনের পোশাক নষ্ট করেছে, তবুও পাঞ্জাবি খুলে নি, লুঙ্গিও পরে নি। ভাবিদের হাতে গোসলের পানিও ঢালতে দেয়নি। তার মতে, সারাজীবন নিজেরা গোসল করতে পারলে বিয়ের দিন অন্যের সাহায্য লাগবে কেন? সাবান ঘষামাজা করার জন্য? নিয়মের দোহাই দিলে মা-চাচীরাই হলুদ ছুঁইয়ে একমগ পানি ঢালুক তবুও ভাবিরা না। না মানে না! বিয়ের আগের দিন যে ছেলেটা এত কাহিনি করল সেই ছেলেই সকালের গোসলের কাহিনি মানবে? মানবে না। বরং খুব রেগে যাবে। কারণ এটা কিসের গোসল তা সবাই জানে। কিছু কিছু ব্যাপার গোপনে সুন্দর। তাকে ডাকলে গেলে সে মুখের উপর চটাস করে বলে বসতে পারে, ‘বিয়ের পরদিন সকালবেলা লোক দেখিয়ে গোসল করলে পূণ্য হয়? নেকি পাওয়া যায়? আসলে কি যায়? যদি যায়, আগে প্রমাণ দেখানো

হোক তারপর সে যাবে। শুধু বাড়ি না দরকার হলে সামনের চৌরাস্তায় গিয়ে গোসল সারবে। ছেলেটা যখন রেগে যায় তখন এভাবে কথা বলে। সকালবেলা শুধু শুধু তাকে রাগানো উচিত হবে না। এভাবে নানান কথার ছলে অনেকক্ষণ যাবৎ বোঝানোর চেষ্টা করলেন সিরাত। কিন্তু তারা শুনছে না। সিমিনও টু শব্দটি করছেন না, কারণ মেয়ে-জামাইকে নিয়ে কী বা বলবেন? বলা কি সাজে? তাই নিজের কাজ করে যাচ্ছেন। উনাকে চুপ দেখে এবার বাধ্য হয়ে সিতারা মুখ খুললেন। বললেন, _ ‘ওরা পড়াশোনা জানা বুঝদার ছেলে-মেয়ে ওদের আর কি শিখাবি?

যুগ কি আর এককালে পড়ে আছে? তাছাড়া রুমেই ওয়াশরুম আছে বাকিটা ওদের উপর ছেড়ে দে। তোরা নাস্তা-পানি কর ওরা একটুপরেই নেমে আসবে।’

_ ‘মামনি তুমি..!’

_ ‘শাপলা কথা বাড়াস না, মা। আমার শান্ত ছেলেটা রেগে গেলে আরেক বিপদ। তাছাড়া গতকাল কম ধকল গেল না একটু রেস্ট করুন। ধীরে সুস্থে আসুক। তোরা পেয়ারা খাবি? পেড়ে এনে

দিবো?’উনার কথা শুনে কেউ আর কিছু বলার সাহস
করলেন না। তবে বিয়েতে এসে মনক্ষুণ্ণ হয়েছেন।
সবকিছুতে বাধা দেয়। বিয়ে বাড়িতে হাসি-ঠাট্টা
করবে এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু না, গতদিনও শুদ্ধ
গোসল করানোতে আপত্তি করল। ভাবিদের হাতে
নাকি গোসল করবে না। সেই সঙ্গে জারি করল দূর
সম্পর্কের ভাই বা দুলাভাই নতুন বউদের কোলে
নিতে পারবে না। নিয়ম অনুযায়ী বিয়ের আগের দিন
বা পরেরদিন দেবরকে তো ভাবি গোসল করিয়ে
দেয়। দুলাভাইরা মজা করে ভেজা গায়ে থাকা
শালিদের কোলে নেয়। কত মজার মজার ইয়ারকি
করে। প্রথম রাত নিয়ে পরামর্শ দেয়। বাঙালি
বিয়েতে সচরাচর এমনই হয়ে থাকে। তাহলে এদের
বেলা এত বাধা কেন? এতই যখন বাধা তাহলে
ডেকেছে কেন? একা অনুষ্ঠান সারত?এসব নিয়ে
ফিসফাস করতে করতে তারা বাগানের দিকে চলে
গেল। গিন্নিরা কেউ সেসব নিয়ে মাথা ঘামাল না।
বাড়ির সন্তানদের নিজ হাতে পেলেপুষে বড় করেছেন
উনারা। উনারা জানেন কে কেমন! কোন বিষয়টা
ছেলেরা কীভাবে নিবে। বুঝা হওয়ার পর থেকে

ছেলেরা টি-শার্ট ছাড়া ড্রয়িংরুম অবধি আসে না, খুব
লজ্জা করে। উনারাও নক না করে ছেলেদের রুমে
প্রবেশ করে না। এগুলো হচ্ছে ভদ্রতাবোধ। যতই
তারা নিজেরা সম্পর্ক করে বিয়ে করুক গোসল নিয়ে
বড়দের সামনে কাহিনি করলে লজ্জা পাবে। কি
দরকার শুধু শুধু ওদের লজ্জায় ফেলার? সত্যি বলতে,
এগুলো উনাদেরও পছন্দ না। আর মজার ছলে
এগুলো প্রশ্ন দেওয়ার মানে হয় না। বাড়ির ছেলেরা
কোনোকালে ভাবিদের সাথে কেন কারোর সঙ্গে
আবোলতাবোল ফাজলামি করে না। যা করে ভাই-
বোনের সাথে। তাহলে আজ কেন করবে? সিতারার
কথা অনুযায়ী সত্যি সত্যি ঘড়ির কাঁটা যখন নয়ের
ঘর ছুঁই ছুঁই তখন তিন জুটি ড্রয়িংরুমে উপস্থিত
হলো। বউয়ের পরনে সুতির শাড়ি,
ছেলেদের পরনে টি-শার্ট আর ট্রাউজার। ওরা নিজেরা
কথাবার্তা বলছে। একে অপরকে পচাচ্ছে। ইশারায়
কীসব বলে মিটিমিটি হাসছে। একটু পর
ছেলেরা গেল বাগানের আর মেয়েরা এলো রান্নাঘরে।
রান্নাঘরের সামনে যারা কাজ করছিল স্বাভাবিকভাবে
কথা বলল। গতদিনের কিছু ব্যাপার নিয়ে গল্প করল,

হাসল। তবে ওদের তিনজনের চোখে, মুখে লজ্জাভাব
তিন জা বুঝল। উনারা সহজভাবে এটা ওটা বলায়
তাদের মধ্যে যতটুকু জড়তা ছিল নিমেষেই কেটে
গেল। সত্যি বলতে স্বর্ণ, শীতল, ঐশ্বর্য নিচে নামতে
বেশ লজ্জা পাচ্ছিল। এখন ঠিকঠাক। এরপর ভিডিও
কলে তারা শখের সঙ্গে কথা বলল। তাড়া দিলো
তাড়াতাড়ি আসার। বারোটোর পর ড্রয়িংরুমে পা
রাখল শখ ও অর্ক। তাদেরকেও পচানো হলো। গল্প
হলো। গোল হয়ে বসে অনুষ্ঠানে পাওয়া উপহারগুলো
দেখতে বসল। সিতারা তখন হাতে করে একটা ব্যাগ
এনে বললেন, ‘আজ সকালে এক লোক এসে এটা
দিয়ে গেছে। দেখ তো বাবা কি আছে এতে?’

সায়ন আপেলের কামড় বসিয়ে চিবাতে চিবাতে সেটা
খুলল। দেখল একই রকমের চারটা বক্স। বক্সে
ডায়মন্ডের লেটেষ্ট মডেলের নেকলেস। খুবই সুন্দর
দেখতে! সে চারটা নেকলেস নেড়েচেড়ে দেখতে
দেখতে বলল,

-‘এটা আবার কোন ভূত দিয়ে গেল? একটা না, দুইটা
না, চার..চারটা? ওমা গো টুরুর বড়লোক দেখি!’

তার কথায় ছোটরা হেসে ফেললেও বড়রা ভ্রু কুঁচকে
ফেললেন। ডায়মন্ড হাতের মোয়া নাকি? তাও চারটা!
যে দিয়েছে তার অন্যকোনো উদ্দেশ্যে আছে বোধহয়।
কোনো চিরকুট আছে কী না দেখতে রুবাব ব্যাগ
হাতড়ে দেখল। আছে দেখে খুলে দেখল। চিরকুটে
ছোট করে লেখা, ‘আমি কে, জানাটা কি খুব জরুরি?
না জানলে উপহার গ্রহন করবেন না বুঝি? তবে বলি
শুনুন, আমি হলাম পৃথিবীর পাপ।’রুবাব লেখাটা
পড়তেই তার দৃষ্টি ঘুরে গেল শুদ্ধর দিকে। শুদ্ধ
কমলার খোসা ছাড়িয়ে সাম্যের হাতের প্লেটে রাখছে।
সেখান থেকে তুলে তুলে খাচ্ছে শীতল, সৃজন, সাম্য,
শখ। সায়ন একবার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে ফিক
করে হেসে ফেলল। উপস্থিত মেহমান আছে দেখে
কথা বাড়াল না। তবে কিছু বলে কথা কাটাতে হবে
তাই বলল তাদের এক ফ্রেন্ডের কাজ।

তারপর সেগুলো সাইডে রেখে অন্যকিছু দেখায়
মনোযোগী হলো। এসব করতে করতে আরো কয়েক
ঘন্টা পেরিয়ে গেল। সময় যেন দৌড়াচ্ছে। বেলা
গড়িয়ে যাচ্ছে দেখে সিতারা সবাইকে খেতে
ডাকলেন। ছেলেরা সবাই বসল। অর্ক শুদ্ধর পাশে

বসেছে। বেচারী হাসিমুখে খেতে বসলেও তার হাসি বেশিক্ষণ টিকলো না। নতুন জামাই বিধায় যে যা পাচ্ছে প্লেটে তুলে দিচ্ছে। প্লেট দেখে মনে হচ্ছে ছোটো খোটো খাবারের পাহাড়। তবুও থেমে নেয় কেউ। তার অবস্থা দেখে শীতল হাসি আঁটকে এগিয়ে এলো। শারারফাত চৌধুরীর উদ্দেশ্যে বলল,

-‘বড় আব্বু খাবার টেবিলে রাজনীতি করা ঠিক হচ্ছে না। আমি মানব না এই অবিচার।’

-‘রাজনীতি? কে রাজনীতি করল আম্মাজান?’

-‘দেখাচ্ছি।’

একথা বলে সে সাইন আর রুবারের প্লেটে আরো খাবার তুলে দিয়ে মিষ্টি করে হাসল। বলল,-‘বাড়ির সব জামাইদের সমান সমান অধিকার।’

অর্ক এবার নিজেও শীতলের মতো করে হেসে বলল,
-‘শালিকা দেখি বহুত চালাক। আমাদেরকে ফাঁসিয়ে দিয়ে নিজেরটাকে বাঁচিয়ে নেওয়া হচ্ছে বুঝি? সমস্যা নেই, আমাদের ভাইরা ভাইয়ের প্রতি এ অবিচার আমরাও মানব না।’

একথা বলতে বলতেই সাইন আর রুবার শুদ্ধর প্লেট ভর্তি করে দিয়েছে। শুদ্ধ তাকাল শীতলের দিকে।

এজন্য সে ব্যাঙাটিকে বলে আগ বাড়িয়ে পণ্ডিত না করতে। তার তো কিছু হয় না বরং ওর পণ্ডিতর মাসুল তাকে গুনতে হয়। কি দরকার ছিল অন্যকে বাঁশ দিতে যাওয়ার? বড়রা আছে দেখে কেউ কিছু বলল না খেতে লাগল। একপর্যায়ে বড়রা খাওয়া শেষ করে ড্রয়িংরুম বসলেন। এদিকে সায়ন, শুদ্ধ, রুবাব, অর্ক যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের একা দেখে চার মেয়েকে সিমিন ঠেলে দিয়েছে কার কী লাগবে তুলে দেওয়ার জন্য। অথচ তারা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করছে। ছেলেরা যে যতটুকু পারল খেলো। কিন্তু তাদের প্লেটে এখনো অনেক খাবার দেখে শুদ্ধ শীতলকে ডাকল। বলল,-‘ খাবার যেন নষ্ট নাহয়।’ একথা বলে বেসিনে হাত ধুতে গেল। শীতল একবার তাকিয়ে বসে পড়ল শুদ্ধর চেয়ারে। শুদ্ধর এঁটো প্লেটে খেতে শুরু করল নিজের মতো করে।

না নাক ছিঁটকাচ্ছে আর না কোনো কথা বলছে। ভাবখানা এমন যে এটা খুব সাধারণ ব্যাপার। শুদ্ধর দেখাদেখি সায়ন, রুবাবও যার যার বউয়ের দিকে তাকিয়ে উঠে পড়ল। তবে অর্ক মুখ কাঁচুমাচু করে বসে আছে। সে কি করবে? শীতল যেটা অনায়াসে

করল শখ সেটা করবে না। না করাটা স্বাভাবিক।
তাকে এঁটো হাতে বসে থাকতে দেখে শীতল বলল,
-‘নতুন দুলাভাই খাচ্ছেন না কেন? আর কিছু
লাগবে?’

-‘এই না প্লিজ। আসলে,,।’

-‘আপু সামলে নেবে আপনি উঠতে পারেন।’ অর্ক
একবার তাকালে শখ এসে পাশে বসল। নিজে টেনে
নিলো অর্কের প্লেট। তখন অর্কও উঠে দাঁড়াল তবে
তার চোখে, মুখে বিষ্ময়। সে ভাবতে পারে নি শখ
তার এঁটো খাবার খাবে। তখন সায়ন হাসতে হাসতে
পুরনো একটা কথা তুলল। সুযোগ বুঝে স্বর্ণের
আঁচলে হাত, মুখ মুছে বলল,

-‘শীতল যখন ছোটো ছিল আমরা খেতে বসলেই
সবার প্লেট থেকে কিছু না কিছু সে খাবেই। খাবে
মানে খাবেই। এটা তার রুটিন। আমাদের হাতে
একবার করে খেলে ওর আলাদা প্লেটে না খেলেও
হতো। ওর যা পছন্দ আমরা দিলেও শুদ্ধ কেন জানি
দিতো না। সবাই দিচ্ছে, সে কেন দিচ্ছে না, এটাও
মানতে পারত না শীতল। ভাবত শুদ্ধ দিচ্ছে না

তারমানে ওর খাবারই বেশি স্বাদ। এই নিয়ে রোজ
ওদের ঝগড়া হতো।’

এইটুকু বলতেই শীতল লজ্জায় মুখ কাচুমাচু করল।
কোনোমতে মুখের ভাতটুকু গিলে বলল,-‘থামো না
ভাইয়া। এখন তো বড় হয়েছি।’

একথা শুনে সিমিন তরকারির বাটি দিতে এসে
নিজেও হেসে ফেললেন।

তখন সায়ন পুনরায় বলল,

-‘ এক টেবিলে বসলে সে ঘুরে ঘুরে সবার কাছে
যেতো। যা খেতে চাইত সবাই দিতো। শুদ্ধ দিতো না
তবুও শীতল শুদ্ধর পাশেই দাঁড়িয়ে থাকত।

শুদ্ধর খাবার যখন শেষের দিকে তখন রাগে কটমট
করে বলত,’ আমি দাঁলিয়ে আছি তো নাকি? চোকে
দেকে না।’ তখন শুদ্ধ জবাব না দিলে কিংবা মুরগির
রান তাকে না দিলে আগে বারবার পেছনে দাঁড়াত।

নিজের সেভ জোন বুঝে তারপর বলত, ‘শুধু বাইয়ের
মুগলি গু কায়।’সায়ন কথাগুলো বলতে বলতে
নিজেও হো হো করে হাসছে। বাকিরাও তাই। শুদ্ধর
ঠোঁটের কোণেও মুচকি হাসি। ব্যাঙাচিটা এভাবেই তো
জোর খাটিয়ে মনের জায়গা দখল করেছে। শুধু দখল

করে নি ঘরের বউ হয়ে তারপর থেমেছে। এসব
কথার মাঝেই চোখাচোখি হলো শুদ্ধ-শীতলের।

দুজনের ঠোঁটের কোণে মিটিমিটি হাসি। চোখে মুখে
পূর্ণতার ছাপ। আর মনকুঠুরিতে একে অপরের প্রতি
অসীম ভালোবাসা। অতঃপর এত এত হাসি-ঠাট্টার
মধ্যে খাওয়া-দাওয়ার পর্ব শেষ হলো। তারপরের
সময়টুকু যেন তাড়াতাড়ি কেটে গেল। বিকেলের
দিকে বাকিসব মেহমানরা বিদায় হলো। সন্ধ্যার পর
রুবাব ঐশ্বর্য আর শতরূপাকে নিয়ে নিজেদের ফ্ল্যাটে
চলে গেল। দেশ ছাড়ার আগে আরেকবার এসে দেখা
করে যাবে। তারা যেতেই বাড়ি শান্ত হয়ে গেল। মন
খারাপ হলো সবার তবুও যেতে দিলো। তারা যাওয়ার
পরপর শখ বইপত্র নিয়ে রেডি হলো। তাকেও যেতে
হবে।

এখন তো পরের ঘরের প্রদীপ সে। পরের ঘর আলো
করায় তার কাজ।

একরাশ মন খারাপ নিয়ে তারাও বিদায় হলো। অর্ক
আজও কথা দিলো সময় পেলে তাকে নিয়ে আসবে।
মেয়ে বিদায় করে একরাশ মন খারাপ নিয়ে বড়রা যে
যার রুমে চলে গেলেন। ড্রয়িংরুমে ফাঁকা হতেই বাকি

দুই জুটির একজোড়া ছাদে গেল আরেক জোড়া
বেলকনিতে সময় কাটাল।এরপরের দিনগুলো যেন
চোখের পলকে পেরিয়ে গেল, রুবাবও দেশের বাইরে
চলে গেল। নিজ নিয়মে দিন কাটতে লাগল। যখন ফ্রি
থাকে তখন ভিডিও কলে একদৃষ্টিতে ঐশ্বর্যের মুখের
দিকেই তাকিয়ে থাকে। নীরবে, নিঃশব্দে দুজনের
চোখের কোণ বেয়ে অশ্রু ঝরে যায়। শূন্য বুকটা খাঁ
খাঁ করে। ইচ্ছে করে মন-মালিনীকে শক্ত করে বুকের
সঙ্গে মিশিয়ে রাখতে। কিন্তু সেটা তো সম্ভব না।
তাকে কাছে পেতে হলে ছয়টা মাস পার করতে হবে।
যদিও সে পৌঁছে ক্যালেন্ডারের পাতায় ক্রস আঁকতে
শুরু করেছে।সবার সঙ্গে যোগাযোগ হয় তার।
শতরুপা চৌধুরী ব্যস্ততা অনেক কমিয়ে দিয়েছে। উনি
এখন সময় দেন ঐশ্বর্যকে। দুজন ঘুরতে বের হয়।
চট করে চৌধুরী বাড়ি থেকে ঘুরে আসে। শীতলরাও
আসে সারাদিন কাটিয়ে চলে যায়। শপিং করার হলে
প্ল্যান করে চারজন একসাথে বের হয়। সারাদিন
বাইরে খেয়ে, ঘুরে, শপিং করে তারপর বাড়ি ফিরে।
তাকে মন খারাপের

সুযোগটুকু কেউ দেয় না। এভাবে দিন কাটতে
কাটতে রুঝাবের যাওয়ার আরো একটা মাস পেরিয়ে
গেল। এখনো পাঁচটা মাস। সময়কে কেন যে ঠেলে
পার করা যায় না? কেন যে মানুষ পাখি হতে পারে
না? পাখি নাহয় না হোক অলৌকিক শক্তি থাকলেও
তো হতো। চুপসারে গিয়ে প্রিয়সীকে বুকে জড়িয়ে
নিতো। এভাবে আরো কিছুদিন পর ঐশ্বর্য সবাইকে
অবাক করে দিয়ে পুনরায় তার কাজে মুগ্ধ অন
করল। বর্তমানে শুদ্ধর সঙ্গে তার ল্যাবে কাজ করছে
ঐশ্বর্য। মাস তিনেক পরের ঘটনা,
সামনে নির্বাচন বিধায় একটু বেশিই ব্যস্ত সময়
কাটছে সাইনের। কখন ফিরে, কখন যায়, বলা
মুশকিল। কদিন যাবত বাড়িতেও খাওয়া-দাওয়া করে
না। সারাদিন পড়ে থাকে পার্টি অফিসে নতুবা শুদ্ধর
ভাড়া নেওয়া সেই ফ্ল্যাটে। বর্তমানে ওখানে তার
দলের ছেলেপুলেরা থাকে। নির্বাচনকে সামনে রেখে
ছেলেপুলে নিয়ে প্ল্যান অনুযায়ী এগোচ্ছে সে। ভোট
আদায় করতে যা করা লাগে করছে। কারণ এ শহরে
মেয়র হবে। জনসাধারণের পাশে দাঁড়াবে। নিজের
শহরকে নিজের মতো করে সাজাবে। এ শহরের

নানান পেশার মানুষের ভোগান্তি কমাবে। তবে যেভাবে ভাবছে সেগুলো বাস্তবায়ন করতে আরো পথ হাঁটতে হবে। তার আগে তাকে বিপুল ভোটে জিতবে হবে। জেতার জন্য মানুষের কাছে যেতে হবে। তাদের মন জয় করতে হয়। মন জয় করলে না ভোট পাবে সে। কিন্তু এগুলো এত সোজা না। সে যেভাবে দাপটের সাথে এ অবধি এসেছে তাতে প্রতি ধাপে ধাপে অনেক শত্রু বাড়িয়েছে। আর বাংলা প্রবাদে আছে দৃশ্যমান শত্রুর থেকে গোপনের শত্রু বেশি ভয়ংকর। কিন্তু চৌধুরীর পুত্ররা বুঝলে তো? তারা তো ভয় পায় না। বরং সবাইকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এতদিন যেভাবে দাপিয়ে দেখিয়ে বেরিয়েছে এখনো তাই। কিন্তু মনে রাখা উচিত শত্রুকে কখনো দুর্বল ভাবতে নেই। শত্রু ক্ষমতাবান না হলেও শত্রু। আর শত্রুর কাজ বিধ্বংসী থাকা মারা। তারা মূলত থাকে সুযোগের অপেক্ষায়। আর সুযোগ পেলেই বিষদাঁত বসিয়ে বিষটুকু ঢেলে দেয়। আর এর জলজ্যাত্ত উদাহরণ হিসেবে আবু সিদ্দিকের কথায় ধরা যাক, রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে তার অবস্থা এখন ঢোঁড়া সাপের মতো। না আছে বিষদাঁত আর না বিষ তবুও

ফণা তুলতে ছাড়ছে না সে। পূর্বের মতো এখনো সায়নকে অপদস্ত করার ধান্দায় আছে। সায়নও জেনে বুঝে হাসিমুখে সহ্য করছে কারণ ওই মানুষটার হাত ধরেই রাজনীতির মাঠে পা রেখেছিল। অনেক কিছু শিখেওছিল। কেন জানি কৃতজ্ঞাবোধ থেকে বার বার ছাড় দিচ্ছে। কিন্তু...কিন্তু তার ধৈর্য নির্ভর করে মুডের উপর। এখন ছাড় দিচ্ছে লিমিট ক্রস করলে তাকেও ক্রস সময় লাগবে না তার। রাজনীতির অবস্থা দেখে এ বছর সাধারণ মানুষজনও নির্বাচন নিয়ে চিন্তিত। আর সময় এগোচ্ছে একের পর ঝামেলা হতেই আছে। একদল পাতিনেতা ইচ্ছে করে অশান্তি সৃষ্টি করছে। নিজেরা ঝামেলা করে এর ওর গায়ে দোষ চাপানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। আর লোকমুখে শোনা যাচ্ছে মেয়রের পদে দাঁড়াচ্ছে তিনজন, তারা হলো শাহরিয়ার সায়ন, রবিউল কাউসার, কনক আলী। এই কনক সিদ্দিকের সাবেক সহকারী। বেশ কিছুদিন দেশের বাইরে থেকে ফিরেছে

নির্বাচন করার আশায়। সায়নের এ নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই সে নিজ কাজে ব্যস্ত। তবে তার মাথাব্যথার কারণ হতে যাচ্ছিল অর্কের বাবা। যদি উনি

উপর মহল থেকে আসা লোভনীয় অফারে নির্বাচনে
দাঁড়াতে। শুধু সায়নকে থামানোর জন্য একদল
উনাকে অফার করে যাচ্ছিল। বিনিময়ে উনাকে শুধু
সায়নের বিপক্ষে নির্বাচনে দাঁড়াতে হবে। কারণ
তাদের মতে বর্তমানে সায়নের দল ভারী। অর্কের
বাবা নির্বাচনে দাঁড়ালে পারিবারিক চাপ কিংবা বোনের
সংসার বাচাতে সায়নকে থামতেই হবে। সবাই জানে
চৌধুরীর পুত্ররা বোনদের জন্য কলিজা কেটে দিতে
প্রস্তুত। কিন্তু আশার কথা, অর্কের বাবা কোনোভাবেই
রাজি নয় রাজনীতিতে জড়াতে। উনি বরাবরই
শান্তিপ্রিয় মানুষ। এসব ঝামেলা এড়াতে সুযোগ বুঝে
উনারাও দেশ ছেড়েছেন গতকাল মধ্যরাতে। নতুন
আত্মীয়দের সঙ্গে ঠোকাঠুকির
ইচ্ছে নেই উনাদের। উনাদের দেশ ছাড়ার ঘটনা
জানার পর শারফাত চৌধুর সায়নকে ফোন করে
ডাকলেন। একটেবিলে বসে খেলেন। উনার অভ্যাস
খাওয়ার আগে ছেলেদেরকে বকাবকি করেন না। যত
বকাবকি করার খাওয়ার পর। আজও তিনি তাই
করলেন, খাওয়ার পর সায়নকে নিজের পাশে বসিয়ে
সুন্দর করে বুঝালেন রাজনীতির মধ্যে না জড়াতে।

আলাদা অফিস করে দিবেন, নিজের হাতে কাজও শিখিয়ে দিবেন তবুও যেন এসবে না জড়ায়। আগে একা ছিল এখন স্বর্ণের কথা ভাবতে হবে। এখন দুজন আগামীতে তিনজন হবে। একটা পরিবারকে সুস্থ পরিবেশ দিতে হলে এসবে জড়ানো যাবে না। পূর্বের কথা বাদ এখন সরে আসুক। রাজনীতি করলে কারো ভবিষ্যত সুন্দর হয় না। বরং দিনশেষে যা হয় তা হলো অপমৃত্যু। এক গালে হাত রেখে সায়েন বাবার কথা মন দিয়ে শুনল, ভাবল, তারপর হাঁক ছেড়ে স্বর্ণকে কাছে ডাকল। তারপর সবার সামনে জিজ্ঞাসা করল,

-‘আমাকে নিয়ে বা আমার কাজ নিয়ে তোরা সমস্যা আছে? ভেবে বল।’

-‘হঠাৎ একথা?’

-‘যা জানতে চাচ্ছি উত্তর দে।’

-‘রাজনীতি করো জেনে বুঝেই তো সম্পর্কে জড়িয়েছিলাম। নতুন করে কোনো সমস্যা দেখছি না। তাছাড়া সবাই যদি সাধারণ পেশা বেছে নেয় তাহলে রিস্কিগুলো কে নিবে? ভবিষ্যতের কথা যদি বলো তাতেও সমস্যা নেই। কারণ খুব বেশি হলে বিধবা

হবো,, এছাড়া আর কিছু না। কাঁটার পথ হাঁটতে
গেলে কাঁটার ভয় পাওয়া কি সাজে? সাজে না, ক্যারি
অন।'স্বর্ণের অকপটে বলা কথায় সকলে কথা ভুলে
গেলেও সায়ন ঠোঁটে হাসি নিয়ে নিশ্চুপ হয়ে তাকিয়ে
রইল তার স্বর্ণকোমলের দিকে। অগাধ বিশ্বাস ছিল
তার স্বর্ণ এমনই জবাব দেবে। তাছাড়া তাকে যদি
জিজ্ঞাসাও করা হয় চৌধুরী বাড়িতে কেউ তোমার মন
পড়তে পারে? গর্ব করে, দস্ত নিয়ে

সিনা টান করে বলবে তার ভাই শুদ্ধ আর সহধর্মিণী
স্বর্ণ তার মন পড়তে পারে। এরা দুজন সঙ্গে থাকলে
সে দূর্গম পথও অতিক্রম করতে পারবে।

শারায়াত চৌধুরী আর কিছু বলতে পারলেন না দেখে
উঠে চলে গেলেন।

সায়নও কনকের ফোনকল পেয়ে স্বর্ণকে ফ্লাইং কিস
ছুঁড়ে বেরিয়ে গেল।

পার্টি অফিসের কাছে যেতেই দেখল আজমসহ বেশ
কজন ছেলেপুলো স্ট্যাম্প হাতে দাঁড়িয়ে আছে।
রবিউলকে নাকি মেরে ধরে খোঁড়া করবে।সায়নও
বুঝল রবি কিছু একটা করেছে যার কারণ আজম
রেগে গেছে। সে পুরো ঘটনা শুনে বুঝল রবি নাকি

সায়নের নামে মিথ্যা কথা রটাচ্ছে। সায়ন-স্বর্ণ নাকি
আকাম কুকাম করতে গিয়ে ধরা পড়েছে তাই বাড়ির
লোকরা তাড়াহুড়ো করে তাদের বিয়ে পড়িয়েছে।
এমন আরো নোংরা কথা। সব শুনেও সায়ন
আপাতত মাথা গরম করল না। তবে ছেলের শান্ত
হয়ে বসতে বলল। তারা বসলে সে বলল,-‘আলোচনা
থেকে সমালোচনার সৃষ্টি। আমাদের সংস্পর্শে তিন
ধরনের মানুষের বসবাস। একদল, যতক্ষণ না স্বার্থ
ফুরাবে ততক্ষণ জানের বন্ধু, এরপর স্বার্থ ফুরালে
পাখি ফুড়ৎ। দ্বিতীয়দল, যতক্ষণ তোর হাতে ক্ষমতা
থাকবে ততক্ষণ তেল মেরে ফুলিয়ে রাখবে। এরপর
ক্ষমতার দাপট শেষ তারাও উধাও। সর্বশেষ যে
দলটার কথা বলব, এরা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি
নিমকহারাম। এরা প্রথমে ছায়াসঙ্গী হয়ে কাছ ঘেঁষবে,
মিশবে, বিশ্বাস অর্জন করবে একসাথে থাকবে, খাবে,
ঘুরবে আবার সুযোগ বুঝে অন্য কোথাও গিয়ে ঠিকই
সমালোচনার ঝড় তুলবে। বোঝার উপায়ই রাখবে না,
এ সেই ব্যক্তি যে শুভাকাঙ্ক্ষী সেজে এতদিন তোরই
ঘাড়ে বসে তোর গাছের কাঁঠাল ভেঙে খেয়ে আবার
তোরই গায়ে বমি করছে।’এইটুকু বলে সায়ন থামল।

প্যান্টের পকেট থেকে চুইংগাম বের করে চিবাতে
চিবাতে এদিক ওদিক তাকাল। আজম মন দিয়ে কথা
শুনল। তারপর বলল,

-‘কিন্তু যা করি নাই তাই নিয়া ক্যান কথা হইব ভাই?
আমরা রবির..!’

আজমকে থামিয়ে দিলো সায়ন। ঠোঁটে বাঁকা হাসি
ফুটিয়ে বলল,

-‘সমালোচকের কাজ সমালোচনা করা। তুই যতই
ভালো কাজ করিস তারা তোর সমালোচনা করবেই।
তারা মূলত আসেই খুঁত ধরতে। যখন খুঁত পাবে না
তখন অতীতে থাকা বসাবে। দুর্বলতা খুঁজবে।
দুর্বলতার ধার ধরে তোকে টেনে নিচে নামানোর চেষ্টা
করবে। কিন্তু,,কিন্তু এদের পাত্তা দেওয়া যাবে না।
পাত্তা দিলেই এতদিনের টার্গেট লক্ষ্যচ্যুত!’-‘তাহলে
কি করব ভাই?’

-‘কি করবি?’

-‘ভ্রম।’

একথা বলতে বলতে সায়ন এবার আজমের সামনে
দাঁড়াল। বলল,

-‘ঠিক এভাবে আমার মতো প্রতিপক্ষের মুখোমুখি
দাঁড়াবি। চোখে চোখ

রেখে ঈগল-দৃষ্টিতে তাকাবি। তারপর বাম হাত তার
চোখের সামনে তুলে মধ্যমা আঙুল দেখিয়ে বলবি,
‘মাঠ প্রস্তুত, এসো খেলব! মাঠ অর খাট সিদ্ধান্ত
তোমার বাট খেলা হবে।’

সায়নের কথা শুনে এতক্ষণ যারা রাগে ফুঁসছিল
তারাও হেসে ফেলল।

সিরিয়াস মুহূর্তে হাসিয়ে ছাড়ে এই লোক। সত্যি
বলতে, ঠিক এই কারণে তারা শাহরিয়ার ভাইকে এত
পছন্দ করে। ভালোবাসে। এদিকে অর্কের বাবা-মা চলে
যাওয়ায় বাড়িটা ফাঁকা। এত বড় বাড়িতে প্রাণ বলতে
শখ আর অর্ক।

পরীক্ষার পর বেশ কিছুদিনের ছুটি পেয়েছে শখ তাই
আজ যাবে চৌধুরী নিবাসে। গতরাতে অর্ক বাড়ি
যাওয়ার কথা বলার পর থেকে ভীষণ খুশি সে। যতই
বাপের বাড়ি কাছে হোক, এক শহরে হোক, কেন
জানি বাড়ি যাওয়ার কথা উঠলেই মন ভালো হয়ে
যায়। ইচ্ছে করে বলামাত্রই ছুটে গিয়ে মায়ের বুকে
ঝাঁপিয়ে পড়তে। মাকে জড়িয়ে ধরে মায়ের শরীরের

স্নেহময়ী, মমতাময়ী প্রিয় গন্ধটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে টেনে
নিতে। কিন্তু সেটা তো আর সম্ভব না।

তবুও আফসোস নেই কারণ ভাগ্য করে শ্বশুরবাড়ি
পেয়েছে। কিছু বলার আগে সবকিছু পেয়ে যায়। সেটা
হোক খাবার-দাবার, পোশাক-আশাক কিংবা প্রসাধনী।
তাকে মন খারাপ করে থাকতে দেখলে শ্বশুর-
শাশুড়িও লেগে পড়ে মন ভালো করতে। কাছে টেনে,
পাশে বসিয়ে, হাসির গল্প শোনান। কি খাবে, কি
পছন্দ, যেসবেও খেয়াল রাখেন। এর কারণ হচ্ছে
বাড়িতে

বয়সের দিক থেকে সবার ছোট শখ। তাও বাড়ির
একমাত্র পুত্রবধু। খুব পছন্দ করে তাকে বউ করে
এনেছে তার শ্বশুর-শাশুড়ি। এজন্য বোধহয়
ভালোবাসতে কমতি রাখেন না। তবে উনারা
ভালোবাসলেও এ বাড়িতে

আসা যার হাত ধরে এসেছে, সে এখনো মানুষটা
অনেক পিছিয়ে আছে।

তার উপর আজকাল ব্যস্ত সময় পার করছে। সকালে
নাস্তা করে বের হয় সারাদিন পর রাতে এসে
কোনোমতে খেয়ে একটু রেস্ট করে চলে যায়। সময়

দিতে না পারায় সরিও বলে। তার খারাপ লাগলেও হাসিমুখে মেনে নেয়। কারণ শুদ্ধকে দেখে জানে একজন সায়েন্টিস্ট কেমন হয়। তাদের সময় কীভাবে কাটে। সে অবশ্য কথা দিয়েছে একটু ফ্রি হলে তাকে নিয়ে

দেশের বাইরে ঘুরতে যাবে। ছুটির কদিন দিন বাড়ি থেকে ঘুরে এলে তার ভালো লাগবে। তাই পতিমহাশয়ের কথায আজকে যাচ্ছে বাবার বাড়ি। অবশ্য অর্ক নিজেই ড্রপ করে দিবে জানিয়েছে। বেশ ক’দিন পর বাড়িতে

যাচ্ছে তাই ভাবল নাডু বানিয়ে নিয়ে যাবে। সাম্য, সৃজন শীতল খুব নাডু পছন্দ করে। বাড়িতে পা রাখতে না রাখতে আগে জিজ্ঞাসা করবে,-‘আপু, নাডু আনোনি?’

তারপর শুরু হবে হাতাহাতি, কাড়াকাড়ি, একচোট মারামারি হলেও হতে পারে। ভাই-বোনদের কথা মনে করে হাসল। তারপর কাজ গুছিয়ে গেল রেডি হতে। চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে দৃষ্টি পড়ল আয়নার প্রতিবিশ্বের দিকে। তার ঠোঁটের কাছটা একটু সামান্য ফুলে আছে। ঠোঁট থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তাকাল

ওয়াশরুমের বন্ধ দরজার দিকে। পানির শব্দ আসছে।
অর্ক শাওয়ার নিচ্ছে। শাওয়ারের কথা মনে হতেই সে
লজ্জায় লাল হয়ে গেল। মিটিমিটি হাসল। কেন জানি
মন থেকে সরাতে পারে না সেদিনের সেই ঘটনা।
আসলে ঘটনাটা ওদের বিয়ের দু'সপ্তাহ পরের ঘটনা।
সেদিন সকালে ওরা শাশুড়ি ও বউমা মিলে নাস্তা
তৈরি করছিল। সে শাশুড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ডিমের
খোসা ছাড়াচ্ছিল। তখন তার শাশুড়ি ফল কাটতে
কাটতে বললেন,- 'বিয়ের আজ দুই সপ্তাহ। এতগুলো
দিনে একদিনও চুল ভেজা দেখলাম না। কোনো
সমস্যা? সমস্যা হলে বল, আমি বলেছি না, আমাকে
আগে ফ্রেন্ড ভাববে তারপর শাশুড়ি। '

উনি আসলে কী বোঝাতে চেয়েছেন বুঝতে কষ্ট হয়
নি তার। কি বলবে, কি বলা উচিত বুঝতে না পেরে
লজ্জায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। এরপর কাজের
বাহানায় কোনোমতে পালিয়ে বেঁচেছিল। সেদিনের
পর আকার ইঙ্গিতে আরো কিছু বলতেন। ছেলের
সঙ্গে প্রেম করতে পরামর্শ দিতেন। সেসব বলতে
গিয়ে নিজে হো হো করে হেসেছেন। কোনোমতে
হাসি থামিয়ে পুনরায় বুঝিয়েছেন সহজ হতে। এদিকে

উনার ছেলে ভদ্র মহাশয়। বউয়ের প্রতি সব রকম
খেয়াল থাকলেও আগ বাড়িয়ে কাছে আসে না।
তাহলে মেয়ে হয়ে সে কীভাবে এগোবে? কিন্তু
শাশুড়ির এমন কথা শুনলে লজ্জায় কুঁকড়ে গেলেও
কিছু বলতে পারে না। তাই একদিন বুদ্ধি করে
সকালে গোসল সেরে বের হতেই অর্কের মুখোমুখি
পড়ে। সে ভেবেছিল অর্ক এখন উঠবে না। কিন্তু
তাকে অবাক করে দিয়ে ততক্ষণে অর্ক উঠে ব্রু
কুঁচকে তাকিয়ে ছিল। ধরা পড়ে খতমত খেয়ে কিছু
বলার শব্দ খুঁজে পাচ্ছিল না। তাকে লজ্জায় লাল হতে
দেখে অর্ক কিছু একটা আন্দাজ করেছিল। নিজেও
মিটিমিটি হাসতে হাসতে বলেছিল,-‘মম কিছু বলেছে,
তাই না?’

-‘ন..না তেমন কিছু না।’

-‘বুঝেছি। তবে তুমি পারমিশন দিলে তোমাকে
সাহায্য করতে পারি।’

-‘কি সাহায্য?’

-‘তুমি চাইলে রোজ সকালে তোমার ফরজ গোসলের
কারণ হতে পারি।’

অর্কের মুখে একথা শুনে তার ইচ্ছে করছিল মাটির
নিচে ডুকে যেতে।

তারপর থেকে অর্ক সুযোগ পেলেই একটু আধটু
দুষ্টুমি করতো। কখনো কখনো লজ্জা দিয়ে খুব
হাসত। তারপর কিভাবে কিভাবে যেন সম্পর্কটা
সহজ হয়ে এলো। একটু একটু করে মানুষটাকে বেশ
ভালো লাগতে শুরু করল। তার যত্ন, আগলে রাখা,
ছোটো খোটো ব্যাপারে খেয়াল রাখা সব

মিলিয়ে দুর্বল হতেই হলো। এভাবে আরো কিছুদিন
পর এক রাতে হঠাৎ গভীরভাবে ছুঁয়ে দেওয়ার
আবদার করল। লজ্জায় মরি মরি হলেও সেও বাঁধা
দেয় নি। অতঃপর ভালোলাগায় ভালোবাসায় দিনগুলো
কাটছে।-‘আরে শীতল রাণী যে, এত রোদের মধ্যে
এখানে কেন, বাড়ি যাবে না?’

হঠাৎ কারো মুখে নিজের নাম শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে
তাকাল শীতল। পরনে কলেজ ড্রেস। কাঁধে কলেজ
ব্যাগ। হাতে আধখাওয়া কোণ আইসক্রিম।

সে আপাতত দাঁড়িয়ে আছে ফটোস্ট্যাটের দোকানের
সামনে। কিছু নোট ফটোকপি করতে হবে। পাশে
দাঁড়ানো এই মানুষটাকে চিনে সে। অনেক আগে এ

লোকটাকে সায়ন ভাইয়ার সঙ্গে দেখেছে। তবে নাম?
হ্যাঁ নামটা বোধহয় কনক নতুবা রনক। এই দুই
নকের ভেতর যে কোনো একটা নক হবে তা সিঁওর।
সে যে নাম গুলিয়ে ফেলেছে বুঝতে দিলো না
কনককে। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে জবাব দেওয়াটা
ভদ্রতা। তাই সুন্দর করে জবাব দিলো,
-‘এইতো এই নোটগুলো ফটোকপি করে চলে যাব
ভাইয়া।’

-‘ওহ। আচ্ছা শীতল তোমার ফ্রেন্ড কিয়ারা না কি
যেন নাম ও কই? ওকে দেখি না কেন? ওর খোঁজ
জানো?’

কিয়ারার কথা উঠায় ধপ করে শীতলের হাসিটুকু
মুছে গেল। ছোট করে উত্তর দিলো,-‘না।’

-‘আমি জানি। তবে জানতে চাইলে সাইডে এসো।
সব কথা সব জায়গায় বলা যায় না।’

একথা শুনে শীতল বিষ্ময় নিয়ে তাকাল। তারপর
কনকের পিছু পিছু একসাইডে দাঁড়ালে কনক শুরু
থেকে পুরো ঘটনাটুকু শীতলকে জানাল। সব শুনে
শীতলের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। পরমুহূর্তে

ওর মনে হলো এ লোকটা মিথ্যা বলতে পারে। হতেও পারে অন্য কোনো চাল। তাই

সব শুনেও সে নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তাকে চুপ দেখে কনক পুনরায় জানাল কিয়ারার কথা নাকি শুদ্ধ, সায়ন আগে থেকে জানত, ইচ্ছে করে তাকে জানায় নি। সে মিথ্যা বলছে না, বিশ্বাস না হলে বাড়িতে গিয়ে যেন

সায়নকে জিজ্ঞাসা করে। একথা শুনে শীতল যেন বাকহারা হয়ে গেল। যদি এটা সত্যিও হয়, তবে ইয়াসির নামক লোকটাকে যতটুকু ঘৃণা করতো তার থেকে দশগুন বেশি ঘৃণা করবে। কারো মৃত্যুকামনা নাকি করতে নেই কিন্তু এ লোকটার জন্য আল্লাহর ত্রিশটা দিনই সে মৃত্যু কামনা করবে। এর আগে তাকে সায়নের মুখোমুখি হতে হবে। মনে মনে এসব ভেবে শীতল আর দাঁড়াল না হাতের আইসক্রিম ছুঁড়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির পথে রওনা হলো। কোনোমতে রিকশায় উঠে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। তার অশ্রুভর্তি চোখের তারায় ভেসে উঠল প্রিয় বান্ধবীর হাসিমাখা মুখ। ভেসে উঠল কতশত জমানো স্মৃতি। তার জন্য কিয়ারার এ হাল মানবে

কিভাবে সে? কিভাবে সইবে এই কঠিন সত্য?
ব্যক্তিগত জীবনে একের পর এক ঝড়ঝাপটা
সামলাতে গিয়ে শীতলের পড়াশোনার নাজেহাল
অবস্থা। আগে পড়াশোনায় মোটামুটি যেমন ছিল
বর্তমানে আরও শোচনীয় অবস্থা। তার ওপরে এখন
কলেজে আসতেও ইচ্ছে করে না। এলে একাকীত্ব
যেন তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। প্রিয় বান্ধবীকে
পায় না। মনে জমে থাকা কথাগুলো বলতে পারে না।
দুষ্টুমির ছলে কিয়ারাকে হুমকি দিয়ে ক্লাস ফাঁকি দিতে
পারে না। তাদের ক্লাসের

অন্য বন্ধুরা যখন দল বেঁধে হাসাহাসিতে মেতে ওঠে,
সে শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখে। এক সময়
তো ওরাও এভাবেই মেতে থাকত! ক্লাসে কথা বলার
অপরাধে কতবার শাস্তি পেয়েছে তার হিসেব নেই।
বাড়িতে ভালো কিছু রান্না হলে কিয়ারা তার জন্য
নিয়ে আসত। সেই খাবার সে স্যারের চোখ এড়িয়ে
ক্লাসে শেষ করত। তার কাণ্ডে কিয়ারা হেসে খুন
হতো। দু'জন মিলে চুরি করে এখানে ওখানে চলে
যেত। বাজি ধরে তার পছন্দের ভেলপুরি খেতো। যেই
হারতো কাঁচের চুড়ি কিনে দিতে হতো। কিয়ারা কাঁচের

চুড়ি খুব পছন্দ করত। তার নাকি কাঁচের চুড়ির
রিনরিন শব্দে মন ভালো হয়ে যেতো। যেদিন থেকে
একথা জেনেছে মাঝেমাঝেই ইচ্ছে করে হারত সে।
হারার অজুহাতে অনেক চুড়ি কিনে দিয়েছে তাকে।
শুধুর আনা কত জিনিস দিয়েছে। একই রকমের
ড্রেসও আছে তাদের। ভেবেছিল ইদের মধ্যে পার্থক্য
গিয়ে একইরকমভাবে চুল কাটবে। কিন্তু হঠাৎ সব
এলোমেলো হয়ে গেল। প্রতিটা মুহূর্তের কথা তার
মনে আছে।

মনে আছে তাদের ফ্রেন্ডশীপের প্রথমদিনের কথা।
শুধু স্মৃতি রেখে আস্ত মানুষটা হারিয়ে গেছে। তার
কথা ভাবতে গেলেই দুচোখ ছাপিয়ে অঝরে জল
গড়াতে থাকে। বুকের ভেতরটা যন্ত্রণায় হাহাকার
করে ওঠে। ইচ্ছে করে গালাগাল করে পরস্পরকে
ওকে জড়িয়ে ধরে প্রাণভরে কাঁদতে। কিন্তু কোথায়
পাবে ওকে? কোথায় হারিয়ে গেল মেয়েটা? সে
যতটুকু জানত, কিয়ারা মনে মনে রুবাবকে পছন্দ
করত। আকার ইঙ্গিতে বার বার জিজ্ঞেস করত
রুবাব কবে আসবে। এলে কতদিন থাকবে। বুঝত
প্রিয় বান্ধবীর মনের কথা। তারও খুব ইচ্ছে ছিল

রুবাবের সঙ্গে কিয়ারার কিছু একটা হোক। কিন্তু ঐশ্বর্যের কথা জানার পরে সে আর এগোয়নি। রুবাব অন্য কারও সাথে জড়িয়ে আছে জানলে কিয়ারা কষ্ট পাবে ভেবে আগ বাড়িয়ে কিছু বলেনি। এমনকি এ কারণে কিয়ারাকে বাড়িতে ডাকা কমিয়ে দিয়েছিল। ভেবেছিল সুযোগ বুঝে সব বুঝিয়ে বলবে, কিন্তু সেই সুযোগ আসার আগে মেয়েটা নিঁখোজ হয়ে গেল। সে এমনভাবে হারাল জানিয়েও গেল না, কোথায় গেল, কেন গেল। তবে সে মন থেকে দোয়া করে একবারের জন্য হলেও যেন কিয়ারার দেখা পায়; কারণ তার কাছে অনেক কিছু জানার বাকি আছে। ব্যথিত মনে এসব ভাবতে ভাবতে শীতল ক্লাস শেষ করল। নিজের হাতে নোট লিখতে গিয়ে আবারও তার কিয়ারার কথা মনে পড়ল; ও থাকলে অনায়াসেই সব লেখা ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যেত। একটাবার দেখা হোক এই সব খাটুনির শোধ অবশ্যই নেবে। কিয়ারাকে বকতে বকতে সে

কিছু নোট লিখল আর কিছু নোট ফটোকপি করা দরকার। বেশিরভাগই চিত্র যেটা হাতে আঁকা আপাতত সম্ভব নয়। তাই সাথী নামের মেয়েটিকে

নিয়ে রাস্তার ওপাশে গেল শীতল। ফটোকপির দোকানের সামনে অনেক ভিড় দেখে সাথী জানাল, আজকে থাকুক কালকে দিলেই হবে। সে বাসে যাতায়াত করে। বাসে গিয়ে ফেরিতে করে নদীর পার হয়ে তারপর বাড়ি। বাস মিস হলে মুশকিল হয়ে যাবে। একথা বলে সে চলে গেলেও শীতল ভিড় কমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। পাশের দোকান থেকে আইসক্রিম কিনল। আইসক্রিম খেতে খেতে ছাউনির নিচে এসে দাঁড়াতেই ব্যাগের ভেতর ফোনটা ভাইব্রেট হয়ে উঠল। ফোন বের করে ফ্রিনে ‘শুদ্ধ’ নামটা দেখে ঠোঁটের কোণে এক চিলতে দুষ্ট হাসি ফুটে উঠল। কল রিসিভ করে গলার স্বর বদলে বলল,-‘মিসেস শোয়াইব স্পিকিং, হু আর ইউ?’ শীতলের কথা শুনে ওপাশে শুদ্ধ মুচকি হাসল। সেও কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য মিশিয়ে পালটা জবাব দিল,
-‘মুডি সাইটেশ স্পিকিং।’
-‘ওহ, তা কাকে চাই আপনার?’
-‘আপাতত আমার বউটাকে চাচ্ছিলাম। ক্লাস শেষ হয়েছে?’

-‘হুম। কলেজের সামনে ফটোকপির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছি।’

শুদ্ধর কণ্ঠ এবার কিছুটা সতর্ক শোনাল,

-‘ওখানে কেন? পাশের চায়ের দোকানে তো বখাটে ছেলেপেলের আড্ডা থাকে। ওখান থেকে সরে দাঁড়া, আমি নিতে আসছি।’ শুদ্ধ আসছে শুনে শীতল ভীষণ খুশি হলো। মিটিমিটি হেসে বলল,

-‘থাকলে থাক। আমাকে কিছু বলার সাহস কারোর আছে নাকি? আমি হলাম শাহরিয়ার সায়ন মানে হবু মেয়রের বোন! আমাকে কিছু বললে আমার ভাই জান খেয়ে নেবে, হুম।’

একথা শুনে শুদ্ধ হেসে ফেলল। গায়ে থেকে এ্যাপ্রোণ খুলতে খুলতে বলল,

-‘তা তো খাবেই! ডাকাত ভাইয়ের ডাকাত বোন বলে কথা। সাইডে দাঁড়া, এক্ষুণি আসছি।’

-‘হুম, আসুন।’ ফোনটা কেটে দিয়ে শীতল গলে যাওয়া আইসক্রিমে একটা বড় কামড় বসাল। দোকানের দিকে তাকিয়ে দেখল ভিড় এখনো কমেনি। আজই কেন সবার ফটোকপি করার ধুম পড়ল, কে জানে! তবে এখন আর তার তাড়া নেই, শুদ্ধ তো আসছেই।

একথা ভেবে ডানে ঘুরতেই নিজের নাম শুনে বামে
ঘুরে তাকাল শীতল। পাশে দাঁড়ানো পুরুষটার স্থির
দৃষ্টি ঠিক তার দিকেই। তবে উনি আর কি বলেছে
শুনতে পায় নি সে। শুনতে পায় নি বুঝে লোকটি
পুনরায় বলল,

-‘ বললাম আরে, শীতল রাণী যে! এত রোদের মধ্যে
এখানে কেন? বাড়ি যাবে না?’লোকটি কথাটা বলে
তার আপাদমস্তক দেখে ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি
ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সূক্ষ্ম নজরে পরখ করল
ফুটফুটে ফুলের মতো সুন্দর মেয়েটাকে। রোদের
তাপে ফর্সা গাল দুটো লালচে হয়ে উঠেছে। ঠোঁট
জোড়া যেন রক্তিম আভা ছড়াচ্ছে। পরনে কলেজ
ড্রেস। মাথায় হিজাব। কাঁধে কলেজ ব্যাগ আর হাতে
ধরা আধখাওয়া আইসক্রিম। এ মেয়েটার জন্য
ইয়াসিরের মতো পাষাণ পুরুষটার মন ফেঁসেছে।
বেচারা দেবদাস হয়ে বর্তমানে কোন গর্তে মুখ
লুকিয়েছে কে জানে। যে আগে দাপট দেখিয়ে বেড়াত
সেই মাফিয়া কিং বর্তমানে নাকি ভেজা বিড়াল।
ভালোবাসা মানুষকে কতটা বদলে ফেলে, ভাবা যায়!
এদিকে শীতলও

তার পাশে দাঁড়ানো লোকটাকে চিনতে পারল। অনেক আগে সে সাইন ভাইয়ার সঙ্গে একে দেখেছিল। সম্ভবত ভাইয়ার রাজনৈতিক দলের কেউ হবে। কিন্তু নামটা যেন কী? কনক নাকি রনক? এই দুই ‘নক’-এর কোনো একটা হবে তা নিশ্চিত। নামটা পুরোপুরি মনে না পড়লেও সেটা বুঝতে দিল না। এত বড় মানুষকে নাম জিজ্ঞাসা করা অভদ্র হয়ে যাবে কী না। তাছাড়া এ লোক কেন এসেছে তাও তো জানে না, তাই চুপ করে রইল।

পরে আবার ভাবল কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেওয়া একপ্রকার সৌজন্যবোধ। তাই সে সুন্দর করে জবাব দিল,

-‘এই তো ভাইয়া, নোটগুলো ফটোকপি করেই চলে যাব।’

শীতলকে একা পেয়ে কনক এবার কিছু ভাবল। কথার ছলে বলে বসল,

-‘ওহ। আচ্ছা শীতল, তোমার ফ্রেন্ড কিয়ারা না কী যেন নাম ও কই? ওকে তো আর দেখি না। কোনো খোঁজ জানো ওর?’

কিয়ারার নাম শুনতেই শীতলের মুখের হাসিটুকু
নিমিষেই মিলিয়ে গেল। ছোট করে উত্তর দিল,
-‘না।’

-‘বিয়ে হয়ে গেছে নাকি?’

-‘তাও জানি না।’

-‘যোগাযোগ হয় না?’

-‘না।’ শীতলের বিবর্ণ মুখ দেখে যা বোঝার বুঝে নিল
কনক। মনে মনে একটা কুটিল হাসি হেসে সায়নকে
এক চোট গালি দিয়ে এবার নিজের মোক্ষম টোপটা
ফেলল। সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশটা দেখে নিয়ে গলার
স্বর নামিয়ে বলল,

-‘আমি জানি ও কোথায়। তবে বিস্তারিত জানতে
চাইলে একটু আড়ালে এসো। সব কথা তো আর
রাস্তার মাঝখানে বলা যায় না। তাছাড়া আমি যা বলব
এগুলো বেশ গোপনীয় ব্যাপার। আশা করি, কথাগুলো
তোমার আর আমার মধ্যে থাকবে।’ একথা শুনে
শীতল বিস্ময় নিয়ে তাকাল। কৌতূহলী হয়ে কনকের
পিছু পিছু কিছুটা আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। কনক শুরু
থেকে কিয়ারা কিভাবে কিডন্যাপ হয়েছিল তারপর
সুইসাইড করে মৃত্যুর ঘটনা সব খুলে বলল।

বাদ গেল না বুঝার করা শারীরিক-মানসিক
নির্যাতনের কথা। তবে যা সত্য তার সঙ্গে আর একটু
ঝাল মশলা যোগ করতেও ভুলল না সে। সব শুনে
শীতলের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল! বাকহারা
হয়ে তাকিয়ে রইল। থরথর করে কাঁপতে লাগল।
পরমুহূর্তেই ওর মনে হলো এই লোক মিথ্যা বলতেও
পারে? তাকে বোকা বানাতে অন্য চাল হতে পারে।
একথা ভেবে সে রাস্তার দিকে তাকাল, মনে পড়ে
গেল এর আগে সে কিডন্যাপ হয়েছিল। কিন্তু এখন
রাস্তায় অনেক মানুষ। আর যাই হোক এ লোকটা
কিডন্যাপ করতে পারবে না। তবে যা যা শুনল
জবাবে কিছু বলার ভাষা খুঁজে পেল না। তার পাশে
একটা হিজল ফুলের গাছ। গাছটা ধরে নিখর হয়ে
দাঁড়িয়ে রইল। তাকে চুপ থাকতে দেখে কনক বুঝল
তীরটা জায়গা মতো লেগেছে। তাই আর একটু
খোঁচাতে পুনরায় জানাল, কিয়ারার এই পরিণতির
কথা শুদ্ধ আর সায়েন আগে থেকেই জানত। কিন্তু
তারা ইচ্ছে করে তাকে জানায়নি। এটা তারা অন্যায়
করেছে। অন্তত মৃত মুখ দেখার সুযোগ করে দিতো,
তাও করে নি। এখন দেওয়ালে কপাল ঠুকলেও লাভ

হবে না। শীতল মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে
আছে। তখন কনক

গলা খাঁকারি দিয়ে জোর দিয়ে বলল, সে একটুও
মিথ্যা বলছে না, তার কথা বিশ্বাস না হলে যেন বাড়ি
গিয়ে সরাসরি সায়নকে জিজ্ঞাসা করে। সায়ন নিশ্চয়ই
তাকে মিথ্যা বলবে না। একথা শুনে শীতল যেন
বাকহারা হয়ে গেল। যদি এটা সত্যি হয়, তবে
ইয়াসির নামক লোকটাকে সে আগে যতটুকু ঘৃণা
করত, এখন তার চেয়েও দশগুণ বেশি ঘৃণা করবে।
বড় মা

বলেন, কারো মৃত্যু কামনা করতে নেই; খারাপ
কামনা করতে নেই। কিন্তু এ লোকটার জন্য সে
আল্লাহর কাছে দিন-রাত মৃত্যু প্রার্থনা করবে। তবে
তার আগে সায়নের থেকে সব সত্য জানা প্রয়োজন।
সে জানে পৃথিবী উল্টে যাবে তবুও তার সায়ন ভাই
তাকে মিথ্যা বলবে না। বাইরের লোক যা বলার বলুন
সে সব শুনবে তার ভাইয়ের থেকে। কনক হয়তো
আরো কিছু বলত কিন্তু শীতল আর এক মুহূর্তও
দাঁড়াল না। হাতের আধখাওয়া আইসক্রিমটা ছুঁড়ে
ফেলে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলো। কনকের কথার

তালে ভুলে গেল শুদ্ধ তাকে নিতে আসছে। সে
ঝাপসা চোখে রাস্তা পার হয়ে কোনোমতে রিকশা
ডেকে উঠে বসল। এতক্ষণ ধরে চোখের পানি
আটকে রাখলেও নিজেকে আর সামলাতে পারল না।
দুহাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কেঁদে ফেলল। প্রিয়
বান্ধবীর মুখ আর জমানো স্মৃতিগুলো চোখের সামনে
ভেসে উঠল। কিয়ারার করুণ দশা সে মানবে
কীভাবে? এই কঠিন সত্য আজীবন তার বুকের ভেতর
কাঁটার মতো বিঁধে থাকবে। কাঁদতে কাঁদতে সে দোয়া
করতে লাগল এসব যেন মিথ্যা হয়, ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন
হয়। কিয়ারার সঙ্গে দেখা না হোক, তবুও যেন
পৃথিবীর কোথাও না কোথাও বেঁচে থাকে, ভালো
থাকে।

এদিকে তাকে এভাবে কাঁদতে দেখে মধ্যবয়সী
রিকশাওয়ালা আড়চোখে তাকাচ্ছেন। প্রেমিকের সঙ্গে
ঝগড়া হয়েছে ভেবে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। তবে
মুখ কুঁচকে ফেললেন। এই কাজে থেকে প্রতিদিন
কত কিছুরই না সাক্ষী হন! হুড তুলে কেউ কেউ
এমন কাজ করে যে ইচ্ছে করে লাথি মেরে রিকশা
থেকে ফেলে দিতে। কিন্তু চাইলে কি তা সম্ভব হয়?

তাছাড়া বড়লোকদের সন্তানরা যা করে সব ঠিক!
এসব ভেবে উনি ধীর গতিতে রিকশা টানছিলেন।
হঠাৎ একটা কালো বাইক হাতের ইশারায় উনাকে
থামাতে বলল। রিকশা থেমে যাওয়ায় শীতল দেখল
শুদ্ধ বাইকে বসা।

তাকে দেখে দ্রুত চোখ মুছে নিল শীতল। কিন্তু
তাতেও লাভ হলো না।

ততক্ষণে ফর্সা মুখটা লালবর্ণ ধারণ করেছে। শুদ্ধ
রিকশাওয়ালার ভাড়া মিটিয়ে শীতলের দিকে তাকাল।
বলল,-‘নেমে আয়।’

বিনা বাক্যে শীতল নামল। কিছু বলার আগেই
বাইকের পেছনে বসল।

কাঁধে হাত রেখে পিঠে কপাল ঠেকিয়ে চুপ করে বসে
রইল। মাথাব্যথা করছে নাকি জিজ্ঞাসা করলে না
বোধক মাথা নাড়াল। শুদ্ধ বাইক স্টার্ট করে বাড়ির
পথে না গিয়ে উল্টো পথ ধরল। এখন বাড়ি গেলে
অনেক প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে। আর শুদ্ধ নিজেও
ওর কান্নার কারণ না জানা পর্যন্ত শান্তি পাবে না।
কিছুক্ষণ আগেও কথা হলো এরমধ্যেই কি এমন
হলো যে কাঁদতে হবে? এমনিতে বাড়িতে চঞ্চল, যত

রকম দুষ্টে বুদ্ধি সব তার ওপরই প্রয়োগ করে।
অহেতুক হলেও তাকেই বেশি জ্বালায় তাকেই বকায।
যদিও আগের তুলনায় তার দুষ্টমি অনেক কমেছে।
এখন আগের

মতো ধাপে ধাপে দুষ্টমি না করলেও সুযোগ পেলে
ছাড়ে না। কিন্তু বাড়ির বাইরে সাধারণত এমন
আচরণ করে না। অযথা কান্নাকাটি করার মেয়ে সে
না। তাহলে এইটুকু সময়ের মধ্যে কি এমন হলো?
এখন তো সরাসরি কিছু জিজ্ঞাসা করলেও বলবে না।
ওর পেট থেকে কথা বের করতে হলে অহেতুক
ঝগড়া করতে হবে, এক পর্যায়ে অতিষ্ঠ হয়েই নিজে
সব উগরে দেবে। কিন্তু ঝগড়া শুরু করার আগেই
শুদ্ধ অনুভব করল তার পিঠের শাট ভিজে যাচ্ছে।
এবার তার সত্যিই খটকা লাগল। কণ্ঠস্বর নরম করে
বলল,-‘কষ্টের পরিমাণ কি অনেক বেশি? আমাকে
একটু ভাগ দেওয়া যাবে?’

শীতল কোনো জবাব দিল না। শুদ্ধ আবার বলল,
-‘কেউ চাইলে তার সবটুকু কষ্ট আমার কাছে
আমানত রাখতে পারে। কবুল বলার সময় তো কষ্টের
ভাগ নেওয়ার ওয়াদাও করেছিলাম।’

এবারও নিস্তন্ধতা। তবে পিঠের শার্ট আঁকড়ে ধরেছে
দেখে শুদ্ধ বলল,

-‘চোখের জলের সাথে নাকের জল মিশিয়ে খিচুড়ি
বানিয়ে আমার শার্টটা নষ্ট না করলেই কি নয়?
বেচারা শার্ট তো কারো ক্ষতি করেনি!’এবারও কোনো
সাড়াশব্দ না পেয়ে শুদ্ধ বাইকের আয়নায় তাকাল।
দেখল শীতল পিঠে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।
কাঁদছে সে, অথচ

অদ্ভুত কারণে বুক পুড়ছে তার। এত যত্নে আগলে
রেখে অন্যের কথায় কাঁদলে সহ্য হয়? কান্নার
কারণও তো অজানা। তাই আবারও বলল,

-‘বাইক থামাব? থামাই? পিঠের বদলে আমার বুকে
মুখ লুকিয়ে কাঁদলে হয়তো শান্তি পাবি। লোকে বলে,
স্বামীর বুকে শান্তি থাকে। সেই শান্তি স্ত্রী-র সব কষ্ট
ভোলার মহৌষধ হয়ে কাজ করে। বিশ্বাস না হলে
নিজেই পরীক্ষা করে দেখ।’শীতল ঢোক গিলে
নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল। কিন্তু বুকের মধ্যে
একদলা কষ্ট চাপ ধরে আছে। সে এটাও বুঝল তার
কান্না শুদ্ধর পছন্দ হচ্ছে না। তাই কান্নাজড়িত কণ্ঠে
অস্পষ্ট সুরে মুখ খুলল,

-‘জেনেবুঝে কখনো কারো খারাপ চাইনি। নিজের অবাধ্যতা, চঞ্চলতা শুধু আপনজনদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছি যাতে অন্যরা বিরক্ত না হয়। আমি আমার কাছের মানুষগুলোকে বড্ড ভালোবাসি শুদ্ধ ভাই! তাদের সামান্য কষ্টও আমাকে ভেঙে চুরমার করে দেয়। অথচ আজ জানলাম, আমারই অজান্তে, আমারই কারণে, আমারই প্রিয় কেউ পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে। এই অপরাধবোধ আমি কীভাবে সহিব? নিজেকে কীভাবে ক্ষমা করব আমি?’

একথা শুনে শুদ্ধ হঠাৎ ব্রেক কষল। বাইক থামিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে অবাক দৃষ্টিতে তাকাল শীতলের দিকে। ওর কান্নার ধরণ আর কথা শুনে বুঝতে বাকি রইল না যে শীতল সব জেনে গেছে। তবে এ মুহূর্তে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বাড়ানো যুক্তিযুক্ত মনে হলো না তার কাছে। যা বলার সুন্দর করে বুঝিয়ে বলতে হবে। একথা ভেবে সে পুনরায় বাইক স্টার্ট দিয়ে সোজা চলে গেল একটা শপিংমলে। সেখান থেকে প্রয়োজনীয় কিছু কেনাকাটা সেরে শীতলকে নিয়ে গেল এক অভিজাত রেস্টুরেন্টে। তবে রেস্টুরেন্টে খাওয়ার মতো মানসিকতা শীতলের নেই। তাই

দুকতে না চাইলে শুদ্ধই এক প্রকার জোর করে নিয়ে
গেল। ওয়াশরুম দেখিয়ে বলল চোখ-মুখে ভালো করে
পানি দিতে, সেই সাথে হাতে ধরিয়ে দিল মাত্রই
কেনা নতুন ড্রেসটা। শীতল শুদ্ধর মুখপানে তাকিয়ে
কী ভাবল কে জানে, তবে বাধ্য মেয়ের মতো ড্রেস
বদলে মুখ ধুয়ে এসে টেবিলে বসল। তখনই খাবার
চলে এলো। শুদ্ধ ওর প্লেটে খাবার বেড়ে দিয়ে খেতে
ইশারা করে নিজেও খাবার তুলে নিল। শীতল মুখে
এক লোকমা খাবার দিলেও নির্লিপ্তভাবে বসে রইল।
ওর নিশ্চুপ ভাব দেখে শুদ্ধ ধীরস্থির কণ্ঠে বলল,
-‘আমরা মানুষরা রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ হলেও
সবার জীবনের গল্প আলাদা। আমরা কেউই নিজের
জীবন বা নিয়তিকে মনের মতো করে সাজাতে পারি
না। যদি নিয়তি আমাদের হাতের মুঠোয় থাকত, তবে
বিশ্বাস কর পৃথিবীর কেউই ‘দুঃখ’ নামক শব্দটা
নিজের ঝুলিতে রাখত না। কিয়ারার সঙ্গে যা হয়েছে,
সেটা ওর নিয়তি। আমরা কেউই কারও ভাগ্য বদলে
দেওয়ার ক্ষমতা রাখি না; সেই ইখতিয়ারও আমাদের
নেই।

আমি তোকে একবারও বলব না যে, তুই ওর জন্য
কষ্ট পাস না। তোর কষ্ট হচ্ছে, তুই প্রাণভরে কাঁদ।
কিন্তু কাঁদতে কাঁদতেই ওর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া
কর। এটা হয়তো ওর কাজে লাগবে। বিচার যে
চাইবি, সেই

অপরাধীও বর্তমানে কবরের বাসিন্দা। বুরাক মানতে
পারে নি কিয়ারার

চলে যাওয়া। তাই বলছি, খবরদার! নিজেকে
দোষারোপ করিস না। যা হয়েছে তাতে আমাদের
কারও কোনো হাত ছিল না। এমনটা না আমরা সব
জেনে-বুঝে ইচ্ছে করে চুপ ছিলাম। যদি জানতামও
অবশ্যই কিছু না কিছু করতাম।’-‘আসলে..!’

-‘আসলে নকলে বুঝি না। তবে ভাইয়াকে এসব
বলার দরকার নেই। এত সহজে ভেঙ্গে পড়লেও
চলবে না। এই জীবনে কত ঝড় আসবে-যাবে।

শত্রু থেকে সব সামাল দেওয়া শিখতে হবে। যত
আবেগ, যত কষ্ট, সব নিজের মধ্যে চেপে রাখতে
হবে। মানুষ কষ্ট দেবেই, এটা মানুষের স্বভাব, তবে
নিজের দুর্বলতা কাউকে দেখানো যাবে না। মানুষকে
যত দুর্বলতা বোঝাবি মানুষ ততই মজা লুটবে। আমি

চাই, আমার সহধর্মিণী আমার মতো শক্ত হোক।
যাতে কেউ আঙুল তোলার আগেও হাজারবার
ভাবে।’-‘ তাহলে এখন কি করব?’

-‘ মন খারাপ করে কান্নাকাটি করা যাবে না। যারা
দুর্বল, নিজেদের প্রতি কোনো বিশ্বাস নেই, তারা
সহজে কান্নাকাটি করে। অল্পতে ভেঙ্গে পড়ে।’

শীতল খুব মন দিয়ে কথাগুলো শুনল। ভাবল।
তারপর নিজেকে সামলে সময় নিয়ে খাবারটুকু শেষ
করল। কথাগুলো কাজে দিয়েছে দেখে শুদ্ধ হাঁফ
ছেড়ে বাঁচল। বাপরে, এতক্ষণ কাঁদতে দেখে বুকের
ভেতরটা কেমন করছিল। তারপর সেখান থেকে
বেরিয়ে দু’জন ইচ্ছেমতো ঘুরল। শশ্মান ঘাটের পাশ
দিয়ে যাওয়ার সময় না চাইতেও হেসে ফেলল। মনে
পড়ল

বিপদের চৌরাস্তার ঘটনা। বাড়ি ফিরতে ফিরতে
মাগরিবের আজান হয়ে গেল। দুজনে ফ্রেশ হয়ে
নিলো। শীতল মায়ের কাছে গিয়ে বসলে সিমিন
এলোমেলো চুল দেখে বকতে শুরু করলেন। তাকে
বকতে দেখে সিতারা উনাকে সন্ধ্যার নাস্তা রেডি
করতে বলে তেল এনে শীতলকে চুলে দিতে

লাগলেন। একটুপরে শুদ্ধও এসে বসল। শীতলের
লম্বা চুলে দুটো বিনুনি দেখে বলল,-‘আর কত পুতুল
বানিয়ে রাখবে? এখন বাড়ির বউ হয়েছে। মেরে ধরে
কাজ শিখাতে হবে।’

ছেলের কথা শুনে সিতারা ফিক করে হেসে
ফেললেন। বললেন,

-‘কেন ভয় হচ্ছে নাকি?’

-‘কিসের ভয়?’

-‘নতুন করে যদি আবার বিয়ের প্রস্তাব আসে সেই
ভয়।’

একথা বলে সিতারা পুনরায় বললেন,

-‘আমি চাই না ও বড় হোক। সে ছোট শীতল হয়ে
চোখের সামনে থাকুক। দুপাশে দুটো বিনুনি করে
সারা বাড়ি দৌড়ে বেড়াক। খিলখিল করা হাসিতে
চৌধুরী বাড়ি মাতিয়ে রাখুক। সবাই বড় হয়ে গেলে,
কেউ দুষ্টুমি করবে না। বাচ্চারা দুষ্টুমি না করলে, ভুল
না করলে,আমরা বকব কাকে? কি নিয়ে সময়ে
অসময়ে হাসাহাসি করব বল দেখি?’

নিজের কথা শেষ করে সিতারা স্বর্ণকে ডেকে তার
চুলও বেঁধে দিলেন।

সায়ন তখন ফুচকা নিয়ে বাড়ি ফিরল। শার্টের
বোতাম খুলে আরাম করে বসল। হাঁক ছেড়ে পানি
চাইল। তারপর শীতলের দিকে তাকিয়ে বলল,-
‘কিরে বোনু চোখ মুখ শুকনো লাগছে কেন? শরীর
খারাপ? নাকি কে কী বলেছে?’

-‘চুলে তেল দিলাম তাই।’

-‘ওহ।’

-‘ফুচকা এনেছি, খেয়ে দেখ কেমন, ভালো নাহলে
ওই শালাকে উদোম কেলাব। আগেই বলেছি ভালো
হলে যেন দেয়।’

শীতল হাসল না। জবাবে কিছু বললও না। ড্রয়িংরুমে
তখন চারজনই আছে। শীতল রান্নাঘরে মা-চাচীদের
দিকে একবার তাকিয়ে দৃষ্টি ফেরাল সায়নের দিকে।
স্বর্ণ পানি এনে সায়নের হাতে ধরিয়ে পাশে বসল।
তখন শীতল বলল,

-‘ভাইয়া তুমি আমার ভাই কম দুলাভাই বেশি? নাকি
দুলাভাই কম ভাই বেশি?’

-‘দুলাভাই কম ভাই বেশি।’

-‘ওহ। তাহলে বড় ভাই হয়ে একটা দায়িত্ব পালন
করো। আমাকে একটা জায়গায় নিয়ে চলো। তবে
যাওয়ার কথাটা একজনকে বলা যাবে না।’

শীতলের কথা শুনে সায়ন পাশে বসা শুদ্ধর দিকে
তাকাল। তারপর সেও

ফিসফিস করে বলল,-‘ আচ্ছা শুদ্ধকে বলব না। কিন্তু
কোথায় যাবি রে?’

শীতল থমথমে মুখে জবাব দিলো,

-‘ স্বর্ণ আপুর জন্য পাত্র দেখতে। তুমি বিয়ে করে
ট্রিট দাও নি তাই তুমি বয়কট।’

শীতলের বলতে দেরি তবে স্বর্ণের হাত বগলদাবা
করতে দেরি হলো না সায়নের। ছটফটে সুরে বলল,

-‘কিডনি হারালে কিডনি পাওয়া যাবে কিন্তু বউ
হারালে বউ পাওয়া যাবে না। অনেক কষ্টের বউ
আমার রিক্স নেওয়া যাবে না।’

একথা শুনে মা-চাচীরাও হেসে ফেলল। উনাদের
হাসির শব্দে সায়ন হাত ছেড়ে দিলো। মাথা চুলকাল।

তখন শীতল শুদ্ধকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল,

-‘আজ একটা কেয়ারিং বর নেই বলে।’মাস দেড়েক
পরের ঘটনা,

চৌধুরী নিবাসে সকাল যেভাবে শুরু হয় আজও
সেভাবেই শুরু হয়েছে। শারফাত চৌধুরী নাস্তা সেরে
যাওয়ার সময় শীতলকে কলেজে নামিয়ে দিয়ে গেছে।
ক্লাস শেষে সায়ান কিংবা শুদ্ধ গিয়ে আনবে। নির্বাচন
যত

এগিয়ে আসছে প্রতিটি অলিগলিতে নতুন প্রাণচঞ্চলতা
দেখা দিয়েছে।

রাস্তার ওপর দড়ি টাঙিয়ে সাদা-কালো পোস্টারের
সারি। দেয়ালগুলো ছেয়ে গেছে প্রার্থীদের রঙিন
লিফলেটে। মাইকের আওয়াজে কান পাতা দায়।
প্রার্থীর গুণগান আর প্রতিশ্রুতির রেকর্ড করা গান বা
ভাষণ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বাজতেই থাকে।
বয়স্ক থেকে শুরু করে তরুণ প্রজন্ম আলোচনার
কেন্দ্রবিন্দু থাকে একটাই: শাহরিয়ার সায়ন ভাই।
সায়নের নামের প্রচারও চলছে পুরো দমে। তার
নামের মিছিলে ছেলেপুলের মুখে একটাই
স্লোগান, ‘আমার ভাই, তোমার ভাই,
শাহরিয়ার ভাই! শাহরিয়ার ভাই!
শাহরিয়ার ভাইয়ের মার্কি কি?
‘পায়রা’ ছাড়া আবার কি!

শাহরিয়ার ভাইয়ের ‘পায়রা’ আনবে সুখের বন্যা।’

অলিগলি রাজপথ

‘পায়রা’ মার্কার জয়লাভ।

আসিতেছে শুভ দিন

পায়রা মার্কায় ভোট দিন।’

চারদিকে এত হইহট্টগোলের মাঝে এক ধরনের
টেনশনও কাজ করছে।

বিরোধী দলগুলো বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে মানুষের আতঙ্ক সৃষ্টি
করছে। প্রশাসন তখন শক্ত হাতে সব সামাল দিচ্ছে।

কখনো কখনো দুই পক্ষের সংঘর্ষে

পুলিশ আহত হওয়ার ঘটনা ঘটছে। এজন্যই বাড়ির
কাউকে অকারণে বের হতে দিচ্ছে না শুদ্ধ, সায়ন।

গতকাল রাতে পার্টি অফিসে ছিল শুদ্ধ।মিছিল,

সমাবেশে না গেলেও তাকে পার্টি অফিসে দেখা

যাচ্ছে। সায়নও ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে নানান ব্যাপারে

আলোচনা করে গুঁটি গুঁটি পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে লক্ষ্যের

দিকে। সব ঠিকঠাক থাকলে মেয়র পদে সায়নই

জিতবে। শুদ্ধ সারারাত জেগে পরেরদিন সকাল থেকে

ল্যাবে ছিল, বেশ

কয়েকঘন্টা কাজ করে বাড়ি ফিরে দেখে শীতল
এখনো ফিরে নি। সায়ন জানিয়েছে সময়মতো সেই
আনবে শীতলকে। বার বার কল করে বাড়ি ফেরার
তাড়াও দিলো। তারপর ফ্রেশ হয়ে খেয়ে শুতেই
চোখজোড়া ঘুমে বুজে এলো। কতটুকু ঘুমিয়েছে জানা
নেই তবে আচমকা শরীরে ঝাঁকুনি খেয়ে চোখ খুলে
তাকাল শুদ্ধ। সিতারা বেগম হাউমাউ করে কাঁদছে।
থরথর করে কাঁপছে উনার শরীর। হঠাৎ ঝাঁকুনি
খেয়ে ঘুম ভাঙায় কিছুই বুঝল না শুদ্ধ। তবে সিরিয়াস
কিছু আন্দাজ করে উঠে বসতেই সিতারা বললেন
দ্রুত তার ফোন দেখতে। শুদ্ধ ফোন সাইলেন্ট করে
চার্জ দিয়ে ঘুমিয়েছিল। মায়ের কথায় ফোন চেক
করে দেখল অসংখ্য ফোনকল। আজমের কল বেশি
দেখে কল ব্যাক করে যা শুনল তাতে তার মাথায়
যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। অতঃপর কোনোদিকে না
তাকিয়ে একদৌড়ে নিচে নামল। তারপর বাইক নিয়ে
পৌঁছাল এক নির্জন জায়গায়। তখন মাগরিবের
আজানের আগ মুহূর্ত। স্তিমিত আঁধার নেমেছে ধরণীর
বুকে। সেই মুহূর্তে ভিড় করেছে অসংখ্য মানুষ।
হইচই চারদিকে। সে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতেই দৃষ্টি

আটকাল কলেজে ড্রেস পরা অল্প বয়সী এক মেয়ের
দিকে। তাতেই শুদ্ধর হুৎপিণ্ড যেন থমকে গেল।
দেখল, কলেজের ড্রেস পরা শীতল বসে আছে
মাটিতে, তার কোলে রক্তে ভেজা সায়নের মাথা।
দুজনের পোশাক রক্তে রাঙা। পাশে বসে আজম
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ডাকছে অবচেতন সায়নকে।
হতভম্ব শুদ্ধ এগিয়ে যেতেই শীতলও চোখ তুলে
তাকাল। তাকে দেখে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়েই
রইল। কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেললেও ভেতরের
সবটুকু আক্রোশ আর হাহাকার মিশিয়ে কিছু শব্দ
গোছাল। তারপর ভাঙা গলায়, থেমে থেমে
বলল, '__কোনো বোন কি চোখের সামনে ভাইয়ের
নিখর দেহ দেখতে পারে? পারে না, আমিও পারি নি।
ওরা আমার ভাইকে মারতে এসেছিল আমি ওদের
মেরে দিয়েছি।'

শীতলের কথাগুলো যখন শুদ্ধর কানে পৌঁছাল তখন
শুদ্ধও বাকহারা।

যে মেয়েটি পিঁপড়ে মারতেও ভয় পেত তার এমন
দুঃসাহসিক কথায় ও কাজে শুদ্ধর চেনা জগৎটা
মুহূর্তেই যেন উল্টেপাল্টে গেল। বেশ কদিন ধরে পেট

ব্যথায় ভুগছে শীতল। খুব একটা জটিল না বিধায়
আপাতত চেপে আছে। তাছাড়া সারাদিনে কত
হাবিজাবি জিনিস খায়।

বেশিরভাগ বাইরের জিনিস, প্যাকেটজাত চিপস-
চকলেট বা ফাস্টফুড। বারণ করলেও শোনা হয় না।
এখন যদি পেটব্যথার কথা কাউকে বলতে যায়
কপালে শনি আছে। তার মা জানলে দু'একটা কিল
পড়তেও পারে।

বিয়ের পর অবশ্য মারেননি তবে ইশারা করে হলেও
শাসন করতে ছাড়ে না। কত কী যে শিখিয়ে দেয়।
অন্যদিকে এসব খাওয়া নিয়ে শুদ্ধ সবার সামনে
বকলেও নিজেই হরেক রকমের জিনিস এনে রুমে
রাখে। এনে আরেক দফা ভাষণ শুরু করে। সেও
মনোযোগী শ্রোতার ন্যায় বকা-ঝকা শুনতে শুনতেই
খায়। খেতে খেতে বকা শুনতে অবশ্য ভালোই লাগে।
সায়েন্টিস্ট বর বলে কথা। কম আয়-রোজগার তো
করে না। খেয়ে যদি টাকা না ফুরায় তবে চলবে কী
করে? সত্যি বলতে, টাকা পয়সা রাখারও জায়গা-
টায়গা লাগে নাকি? আজকাল শুদ্ধ তেমন বাড়ি থাকে
না বিধায় খুব একটা খেয়াল করে না। এই সুযোগে

এসব খাওয়ার পরিমাণও বাড়িয়েছিল আর এজন্য বোধহয় গ্যাস্ট্রিকের সমস্যাটা বেড়েছে। গ্যাস্ট্রিক ভেবে ওষুধও খায়। ওষুধ খেলে ব্যথাটা ঠিক হয়ে যায়। ভেবেছিল শুদ্ধকে একবার জানাবে কিন্তু মানুষটা ভীষণ ব্যস্ত। ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরলে এসব বলে ওর চিন্তা বাড়াতে ইচ্ছে করে না। কারণ শুদ্ধ নিজের কাজ সামলে আবার সুযোগ বুঝে ভাইয়ের কাজে লড়ে যাচ্ছে। এখন বাড়ির সবার একটাই প্রার্থনা দুই ভাইয়ের কষ্ট সফল হোক। জয়ী হয়ে ফিরে আসুক তারা। নিজের শহরের মানুষের কল্যাণে সততার সাথে কাজ করুক। সেও খুব করে চায় পায়রামার্কা জিতে যাক। কারণ পায়রা জিনিসটা হচ্ছে তাদের কাছে স্পেশাল কিছু। শুদ্ধর ল্যাবের ওই পায়রার কথা এখনো মনে গেঁথে আছে তার। মাঝেমধ্যে গিয়ে নেড়েচেড়ে আসে। নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসার আগে একদিন খাবার টেবিলে সায়নকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘ভাইয়া কোন প্রতীকে দাঁড়াবে তুমি?’ সায়ন সেদিন দাঁত বের করে হেসে বলেছিল, ‘ইচ্ছে তো ছিল গাঁজার মার্কা নেব কিন্তু আমজনতা

মানবে না। এক কাজ কর প্রতীক তোরা সবাই মিলে
ঠিক কর।’

উল্টে ভাই-বোনদের ঘাড়ে চাপিয়েছিল প্রতীক ঠিক
করার গুরু দায়িত্ব।

পরে সবাই মিলে আলোচনা করে সাদা পায়রা ঠিক
করেছে। এর কারণ

সাদা পায়রা শান্তি, পবিত্রতা, মুক্তি, ভালোবাসা, ও
বিশ্বস্ততার প্রতীক।

তাদেরও দৃঢ় বিশ্বাস তার ভাইয়ের পায়রা জয়ী হয়ে
মুক্ত মনে আকাশে উঠবে। সকলকে দেখিয়ে দিবে
সাদা পায়রার জোর। এ নিয়ে নিজেরা নিজেরা
স্লোগান বানিয়ে আজমের কাছে পাঠায়। আজম
সেগুলো নিয়ে দলের ছেলেপুলেদের মুখস্থ করিয়ে
মিছিলে নামায়। গতকালও সে নতুন একটা লিখে
পাঠিয়েছে। সেটা হলো, পায়রা ডাকে বাকুম বাকুম
শান্তি আসবে হাজার রকম!

উড়ছে পায়রা দিচ্ছে ডাক,
আপদগুলো সব চুলোয় যাক।

সাদা পায়রায় দিলে ভোট
শান্তি পাবে দেশের লোক।

ভোট দিবেন ভাই কোনখানে?

পায়রা মার্কার মাঝখানে। সে এটা লিখলেও ছেলেপুলেরা সায়নকে একটু রাগাতে শেষের লাইনটা বদলে দেয়। চেষ্টা করে বলে, ‘এই ভোট দিবেন ভাই কোনখানে? শাহরিয়ার ভাইয়ের মাঝখানে।’ এটা শুনে সায়ন ওদের স্ট্যাম্প নিয়ে দৌড়ানি দিলে বেহায়াগুলো হেসে গড়াগড়ি খায়। তাদেরকে হাসতে দেখে সায়নও হেসে ফেলে। ওদের সাথে বসে সিগারেট টানতে টানতে বলে, নির্বাচনের আগে গালি দিলাম না তোলা রইল। এখন ভদ্র সাজতে হবে নয়তো ভোট মিস যাবে। তবে সময় করে সব শালাকে দোচন দেব। রেডি থাকিস। তাতেও কেউ ভয় পায় না কারণ তারা এসব শুনে অভ্যস্ত। বরং সায়নের গালি না শুনলে তাদের কাছে ফাঁকা ফাঁকা লাগে। তবুও তারা তাদের শাহরিয়ার ভাইকে খুব ভালোবাসে। কারণ গালি দিয়ে আবার কাছে টেনে নেয় সে। তবে আজকাল শুদ্ধর জন্য গালি টালি দেয় না। সায়েন্টিস্ট সাহেব পার্টি অফিসে সময় কাটান। উনি জেন্টেলম্যান কি না! গালা-গাল পছন্দ করে না। তার কথা কেউ যদি অকারণে গালি দেয় তাহলে আর কোনোদিকে

তাকানোর দরকার নাই, আগে ধামধুম করে দিয়ে চোখ-মুখ ফাটিয়ে দেবে। এমনভাবে দিবে যেন দুই ঘুসিতে মারের ওজন বুঝে। এত সহজে যদি রাগ উঠানো যায় তাহলে কি দরকার গালি টালি দিয়ে এনার্জি লস করার?

আজ বৃহস্পতিবার_রোজকার মতো ব্যস্ততা দিয়ে দিনটির সূচনা হয়েছে। নিত্যদিনের মতোই রুটিন মারফিক যে যার কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। শুদ্ধ, সায়েন গতরাতে পার্টি অফিসে ছিল। সারারাত কি করেছে একমাত্র তারাই জানে। সকালবেলা শুদ্ধ বাড়িতে ফিরে শীতলকে ঘুমাতে দেখে জ্বালিয়ে খুব করে, তারপর শাওয়ার নিয়ে কোনোমতে নাস্তা সেরে গেছে ওর ল্যাবে। তার তাড়াহুড়ো দেখে শারাফাত চৌধুরী নিজে শীতলকে কলেজে নামিয়ে দেওয়ার কথা জানানেন। বাবা যাবে শুনেও শুদ্ধ বারবার সাবধান করে গেছে। এরপর নাস্তার পর্ব সেরে শীতলকে কলেজে নামিয়ে শারাফাত চৌধুরী অফিসে চলে গেলেন। উনিও বারবার বলে গেলেন কলেজ ছুটি হলে যেন বাইরে না আসে। চৌধুরী বাড়ি থেকে কেউ এসে তার ফোনে কল না করা অবধি যেন গেটের

কাছেও না আসে। শীতলও তাই করেছে। সব ক্লাস করেছে।

টানা ক্লাস করে ভীষণ ক্ষুধা লেগেছে তার তাই ক্যান্টিন থেকে কিছু কিনে এনে জারুল গাছের নিচে বসল। কলেজ ছুটির পর অনেকে চলে যাচ্ছে আবার অনেক মাঠে বসেছে। কেউবা নোট করছে জোড়া জোড়া বসে। কেউবা তারই মতো গাড়ির জন্য অপেক্ষা করেছে। কিনে আনা পছন্দের

স্যান্ডউইচ নিয়ে মুখে দিলো। খেতে খুব একটা ভালো না আবার মন্দও না, ক্ষুধা পেটে চালিয়ে নেওয়ার মতো। সে আরেক কামড় দিতেই ফুডুৎ

করে সেখানে চড়ুই এলো। তাদের দেখে সে স্যান্ডউইচ ভেঙে ছুঁড়ে দিলে

তারা ভয়ে ভয়ে ঝুঁকরে ঝুঁকরে খেলো। খাওয়া শেষে আবার তাকালে সে আবার দিলো। তাদের কিছু খেতে দেখে একটা কাঠবিড়ালি তুরতুর করে এসে আবারও গাছে উঠে গেল। মুখে কেমন একটা শব্দ করল।

শীতল

গাছের দিকে তাকিয়ে আয় আয় করে কাছে ডাকলেও এলেও না। তখন ফোনে বল এলো, সায়নের নাম্বর

দেখে রিসিভ করতেই শুনতে পেল,-‘কি রে বোনু কই তুই? গেটের কাছে আছি বেরিয়ে আয় দেখি।’

-‘ একটু দাঁড়াও ভাইয়া, আসছি।’

-‘ দৌড়াবি না আশ্তে ধীরে আয়।

শীতল শুনলে তো? সে কোনোমতে ফোনটা ব্যাগে ঢুকিয়ে ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে দৌড়ে বের হলো। সায়ন ওর বাইকে বসে চুলে ব্যাক ব্লাশ করছে।

শীতল গিয়ে বাইকের পেছনে বসতেই সায়নও বাইক স্টার্ট করল। শীতল আধখাওয়া স্যান্ডউইচ ভেঙে সায়নের মুখের সামনে ধরলে সায়ন মুখে নিলো। প্যাকেটে আরো দুটো স্যান্ডউইচ থাকায় ভাই-বোন যেতে-যেতে গল্প করতে করতে খাচ্ছিল। হাসছিলও কিছু একটা নিয়ে। ঘড়িতে তখন সাড়ে তিনটা বাজে। দুজনের ভীষণ ক্ষুধা লেগেছে।তখন শুদ্ধ কল করে দেখে শুনে ফিরতে বলল। সেও নাকি বাড়ি ফিরেছে। ফেরার পথে নাকি মিছিল বের হতে দেখেছে। তারাও আসছে বলে কল কাটল। এদিকে দূর থেকে দেখা গেল রবির দলের ছেলেরা মিছিলে বেরিয়েছে। অনেক বড় মিছিল। তাদের প্রতীস নিয়ে সেই স্লোগান দিচ্ছে। বড় মিছিল যেতে সময় লাগবে। রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে

না থেকে সায়ন বাইক নিয়ে অন্য রাস্তায় ঢুকল। সেই
রাস্তায় আবার কনকের দলের মিছিল পেল। সেটা
পার করে

কিছুদূর যেতেই দেখা গেল তারই দলের মিছিল।
আজম সবার সামনে।

গলা ফাটিয়ে শ্লোগান দিচ্ছে। তার দাপুটে
ছেলেপুলেদেরকে দেখে সায়ন ফ্লাইং কিস ছুঁড়ে বাহবা
দিলো। নিজেও স্বর মিলিয়ে শ্লোগান দিলো। তার
কাণ্ডে শীতল খিলখিল করে হেসে ফেলল। বড় মিছিল
পেরোতেই সায়ন বাইক সজোরে টান দিলো। রাস্তাটা
একটু নির্জন দেখে সায়নও জোরেই গাড়ি টানছিল।
হঠাৎ কোথা থেকে দুটো বাইক এসে তাদের পথ
আটকে দাঁড়াল। সায়ন দ্রুত ব্রেক কষে খেঁকিয়ে গালি
দিতে গিয়েও থেমে গেল।

সামনের বাইকে বসা কনককে দেখে বলল,-‘ বোনকে
বাড়ি পৌঁছে দিয়ে তোর কথা শুনব, এখন পথ ছাড়!’
শীতল সঙ্গে আছে দেখে সায়ন কথা বাড়াতে চাইল না
বরং সতর্ক হলো। শান্ত ভঙ্গিমায় কনকের সঙ্গে
কথাও বলল। কিন্তু কনক শোনার অবস্থায় নাই। সে
বাইক থেকে নেমে শীতলের কাছাকাছি দাঁড়াল।

কেমন করে দেখল। তার দৃষ্টি দেখে শীতল দৃষ্টি
সরিয়ে নিলো। ভাইয়ের সঙ্গে সিঁটিয়ে বসল। সায়ন
তখন চোয়াল শক্ত করে পুনরায় সাবধান করে
বলল,-‘কনক, লিমিট ক্রস করিস না। নামতে হলে
কলিজা টেনে ছিঁড়ে ফেলব বলে দিলাম।’

কনক যেন শুনেও শুনল না তার কথা। সে শীতলের
দিকে তাকিয়ে মন মরা স্বরে বলল,

-‘আজ আমার ছোটো বোনের জন্মদিন। সারা দুনিয়া
খুঁজেও পাচ্ছি না তাকে। কান পেতি আছি কখন এসে
গিফট নেওয়ার আবদার করবে। গালভর্তি হেসে
আদুরে সুরে আমাকে আবার ‘ভাইয়া’ বলে ডেকে
উঠবে।’

এইটুকু বলে সে থামল। তারপর সায়নকে
বলল,-‘আমার বোনটা দলের কেউ ছিল না।
রাজনীতির কিছু বুঝত না। সরল মনের মেয়ে ছিল।
পাতিলে ভাত থাকলে খেতো নতুবা উপোস থাকলেও
কাউকে বুঝতে দিতো না। বাড়তি আবদার করত না।
আমার প্রাণপাখি। আমার বাড়ির প্রাণ ছিল আমার
বোন। তবুও তাকে বাঁচতে দিলি না তুই? রেপ
করলেও বাঁচিয়ে রাখতি। ভাইয়ের কাছে বোনরা

কখনো পুরনো হয় না, কলুষিত হয় না, ধর্ষিতা হয় না। সে থাকলে এতকিছুর পরেও বাড়ি ফিরলে ধর্ষিতা বোনের মুখে নাহয় ভাইয়া ডাক শুনে কলিজা জুড়াতো আমার।’

কনকের কথা শুনে শীতল হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কিসব বলছে এই লোক? মাথা কি পুরোটাই গেছে নাকি? তার সায়ন ভাই, বেস্ট ভাই! বেস্ট মানুষ। এমন ঘৃণ্য কাজ করতে পারে না সে! তাছাড়া স্বর্ণ আপুকে পাগলের মতো ভালোবাসে সায়ন ভাই। অন্য মেয়ের দিকে তাকাবে এটা দুস্বপ্নের মতো। এতদিন পর পুরনো কাসুন্দি ঘাটতে দেখে সায়নের রাগ তরতর করে বাড়ল। প্রমাণ দেওয়ার পরও ঘুরেফিরে তাকে দোষারোপ করছে কনক? শীতলের উপস্থিতিতে এ নিয়ে কথা বাড়ানোর প্রয়োজনই মনে করল না। রেগে গেলে তার মুখে কোনো লাগাম থাকে না। কি বলে হুঁশ থাকে না। ছোটো ভাই-বোনের সামনে সে কখনো গালাগাল করে নি। তারা জানে তাদের সায়ন ভাইয়া মাটির মানুষ। রাজনীতি করলেও খুন করে না। মানুষ মারে না। সেও চায়, মরার আগ মুহূর্ত অবধি তাদের এই

ধারণা বহাল থাকুক। তবে কনক ভুলভাল বকতেই থাকলে কিছু একটা ঘটে যাবে। একথা ভেবে চলে যাওয়ার জন্য বাইক স্টার্ট দিতে গেলেই কনক এসে চাবিটা ছিনিয়ে নিলো। কনকের সঙ্গে আসা এক ছেলে রড দিয়ে বাইকের সামনে সজোরে বাড়ি দিলো। শীতল ভয়ে চিৎকার করে ভাইয়ের হাত আঁকড়ে ধরল। সায়ন ঘাড় ঘুরিয়ে বোনকে দেখে রাগান্বিত সুরে বলল,-‘ থামতে বলছি তোকে!’

-‘কেন? বোন ভয় পাচ্ছে? তোর বোনটা বোন হয় আর আমাদের গুলো ফেলনা, না? এই দুই হাতে আমার বোনটাকে কবরে শুইয়ে এসেছি রে।

আমার তোতাপাখিটা কবরে শুয়ে আছে। সেই যন্ত্রণা আজও দগদগে ঘা করে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। তোকে আমি একদিন অভিশাপ দিয়েছিলাম, বলেছিলাম আমার অবস্থানে তোকে দাঁড়াতে হবে। ভেবেছিলাম ইয়াসির যা করার করবে, কিন্তু না সে করবে না। বরং আজকে যা হবে জানলে আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে না। তাই তোকে নিঃশেষ করতে আমাকে হাল ধরতে হলো। আজ তুই চোখের সামনে দেখবি, বোন ধর্ষণ হলে ভাইয়ের কেমন লাগে। বোনের নগ্ন দেহ..!’

কনক আর বলতে পারল না সায়ন শীতলকে ধরে
বাইকে থেকে নেমেই কনককে এলোপাতাড়ি মারতে
লাগল। চিৎকার করে বলতে লাগল,-‘ মা*দারচো*দ!
দিনে দুপুরে নেশা করে আমার সঙ্গে চুদুরবুদুর
চু*দাও?’

তোমার চুদুরবুদুর তোমার কাছে রাখো। এর আগে
পেনড্রাইভে প্রমাণ দেওয়ার পরও নতুন করে ভং
মারাইতে আসছো তুমি?’

নাক দিয়ে গলগল করে আসা রক্ত শার্টের বাহুতে
মুছল কনক। হতভম্ব শীতলের দিকে তাকিয়ে হাসল।
তারপর বলল,-‘শীতলরাণী তোমার সায়ন ভাই কিন্তু
মারাত্মক লেভেলের পর্ন লাভার, জানো? সব ধরনের
পর্ন ওর কালেকশন থাকে। এইতো কিছুদিন আগে
আমাকেও পেনড্রাইভে করে অসংখ্য কালেকশন
দিয়েছে।’

লজ্জায় শীতল চোখ নামিয়ে নিলো। মুখটা গলার সঙ্গে
মিশিয়ে নিলো।

কথাটা মিথ্যা জেনেও সায়ন ঘুরে বোনের মুখের দিকে
তাকাতে পারল না। থমথমে সুরে বলল,

-‘আমি তোকে একটা পেনড্রাইভ দিয়েছিলাম।’

-‘ দিয়েছিলি তো ।’

-‘সেখানে কিছু থাকার কথা ছিল ।’

-‘ছিল তো! অনেক ছিল..তোর পছন্দের পর্ন!’কনক

কথা শেষ করার আগেই দাঁড়ানো চারটে ছেলে

আচমকা সায়নকে এলোপাথারি মারতে লাগল।কনক

ছেলেদের হাতে মোটা রড তুলে দিয়ে নিজে এগোলো

শীতলের দিকে। তাকে এগোতে দেখে শীতল কেঁদে

উঠে পালানোর আগেই হিজাবে টান পড়ল। টেনে

হিঁচড়ে হিজাব খুলে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলল। শীতল

বুকের কাছে আড়াআড়িভাবে হাত রেখে হাউমাউ

করে কাঁদতে কাঁদতে, ‘ভাইয়া বাঁচাও! ভাইয়া!’ বলে

করণসুরে কাঁদছে।ছেলেগুলো ধারালো রাম-দা, রড

দিয়ে মারতে লাগল সায়নকে রাস্তায় শুইয়ে ফেলেছে।

মার খেতে খেতেও সায়ন কনককে থামতে বলছে।

ওর চিৎকারে কনক ভীষণ মজা পাচ্ছে। সে সায়নের

দিকে একবার তাকিয়ে টান মেরে শীতলের বুকে

ভি-বেল্ট খুলতে গেলে শীতল মুচড়ামুচড়ি শুরু করল।

কনক তাকে পেছনে থেকে জাপটে ধরে নোংরা

স্পর্শে ছুঁয়ে দিতে থাকল। ভাইয়ের অবস্থা আর আসন্ন

বিপদ বুঝে শীতল হাত জোর করতে লাগল। কিন্তু

শুনলে তো? শীতল অশ্রুসিক্ত চোখে রাস্তার এদিক ওদিক তাকাল সাহায্যের আশায়। কিন্তু সে হয়তো এটা জানে না কনক পূর্ব পরিকল্পনা করে এখানে এসেছে। এই রাস্তায় প্রবেশ ও বের হওয়ার পথে তার ছেলেদেরকে পাহারায় রেখেছে। সাধারণ পথিকও এক ঘন্টার মধ্যে এদিকে আসতে পারবে না। কনক তাকে পিচঢালা রাস্তায় আছড়ে ফেললে শীতল চিৎকার করে উঠতে গেলে তাকে কিক মারলো কনক। কিক লেগেছে পেটে। শীতল পেট ধরে কঁকিয়ে উঠল। বোনকে মেরেছে দেখে সায়ন সামনের ছেলেটাকে লাথি মেরে সরিয়ে আসার জন্য উঠে দাঁড়াতেই, দুটো ছেলে গালি দিয়ে বাহুতে রাম-দার কোপ বসিয়ে দিলো।

সায়নের পরনের শার্ট কেটে মাংস কেটে রক্তের ধারা বইতে শুরু করল। তবুও সায়ন থামল না কনককে লাথি মেরে সরাতে গেলে ছেলেগুলো আবার কোপাতে লাগল। গালি দিতে দিতে সায়নের বুকে লাথি বসিয়ে রাস্তায় ফেলে দিলো। কনক তার নিজের কার্যসিদ্ধি করতে উঠে পড়ে লেগেছে। কি ভেবে যেন শীতলকে টেনে হিঁচড়ে পাশের জঙ্গলের দিকে নিয়ে গেল।

শীতল চিৎকার করে কাঁদছে। বোনের আকুতি ও
অসহায় কান্না সায়ন সহ্য করতে পারছে না। তাই
নিজেও কাঁদতে কাঁদতে বলল,-‘ক..নক! আল্লাহর
দোহায় লাগে থাম! আমার বোনটাকে ছেড়ে দে। তুই
যা বলবি তাই হবে। আমি..আমি নির্বাচন থেকে সরে
দাঁড়াব তবুও ছেড়ে দে আমার বোনকে। ওর কিছু
হলে আমার শুদ্ধটা মরে যাবে। তোর পায় পড়ি,
আল্লাহর দোহায় লাগে ছাড়, প্লিজ! আমাকে জানে
মেরে দে!তবুও আমার শীতলের ক্ষতি করিস না।’

শীতল ও সায়নের চিৎকার করা কান্নায় আশপাশটাও
ভারী হয়ে উঠল।

গুমোট ধরে থমকে গেল আকাশ- বাতাস। কিন্তু
তাদের আকুতি কারো মন গলল না। কেউ শুনল না
তাদের আর্তনাদ। কনক ততক্ষণে শীতলের ড্রেস
ছিঁড়ে ফেলেছে। পুরুষালি শক্ত হাতের থাপ্পড়ে ফর্সা
গালে দাগ বসে গেছে। সে বাঁধা দিলে কনক
শীতলের গলার ভাঁজে কামড়ে ধরে বলল,-‘এই
বে*শ্যা কি আছে তোর শরীরে? কিসের জন্য শুদ্ধ
পাগল? কিসের জন্য ইয়াসির পাগল? কিসের লোভ

দেখিয়ে পুরুষ নাচাস তুই? দেহের খুব জ্বলন না?
কত জ্বা'লন তাই দেখব!

কনকের জঘন্য কথা আর একটুদূরে বড় ভাইয়ের
অসহায় কান্না দেখে শীতলের কান্না থেমে গেল। সে
কনককে বাঁধা দিলো না। জোর খাঁটিয়ে আটকাতেও
গেল না। বাঁধা না পেয়ে কনকও বুঝে নিলো শীতল
মিইয়ে গেছে। সে হেসে তার সালোয়ারে হাত দিলে
শীতল কনকের বুক বরাবর লাথি বসাতে গেলে
কনক ধরে পা ধরে ফেলল। পাল্টা আক্রমণ করছে
দেখে কনক গালি দিলো। পরপর আরো দুটো থাপ্পড়
দিয়ে পেছনে ঘুরে তাকাল। চোঁচিয়ে উঠে বলল,

-‘র..নি! ওই খা*নকির পোলাকে এদিকে আন। ওর
সামনেই ওর বোনকে রেপ করব। শালাকে পৃথিবীর
সবচেয়ে ঘৃণিত শাস্তি দেব। পুরনো হিসাব চুকাব
আজ। বোঝাব যার যার জিনিস তার তার দরদ। যার
যার বোন তার তার কাছে কত আদরের, কত
স্নেহের।’ শীতল ততক্ষণে বুঝে গেছে তাদের কান্না,
ভয়, অসহায়ত্ব কাজে আসবে না। যা করতে হবে
বুদ্ধি খাঁটিয়েই করতে হবে। একথা ভেবে ঘাড় ঘুরিয়ে
সায়নের দিকে তাকাল। সায়ন তখনো আকুতি করেই

যাচ্ছে। ভাইয়ের আকুতিতে ব্যথা ভুলে গেল। কান্না
ভুলে গেল। দুরন্দুরু করা বুকে গচ্ছিত ভয়টুকু হঠাৎ
উধাও হয়ে গেল। মন ও মস্তিষ্ক চিৎকার করে বলতে
লাগল এবার লড়ো নয়তো মরো। একথা ভাবতে
ভাবতে হঠাৎ চোখের সামনে শুদ্ধর মুখটা ভেসে
উঠল। কানে বাজতে থাকলে একটি কথা, ‘আমি
ছাড়া কারো অযাচিত স্পর্শ শরীরে লাগতে দিবি না।
প্রয়োজনে

মেরে দিবি বাকিটা সামলে নেবো।’

শুদ্ধ সেদিন কথাটা বলে থেমে থাকে নি। বরং বিশেষ
কৌশলে কলেজ

ড্রেসে একটি ছোট পকেট তৈরি করিয়েছিল। চেন
সিস্টেম করে সেখানে একটা টিজার গোপনে রাখার
ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল। টিজার ব্যবহার করা
শিখিয়েছিল। টিজার হলো কম-প্রাণঘাতী এক ধরনের
ইলেকট্রিক অস্ত্র। এর মাধ্যমে কিছুক্ষণের জন্য হলোও
আক্রমণকারীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। এবং
টিজার বহনযোগ্য। যা আত্মরক্ষা সুবিধাজনক করে
তোলে। তবে এটা বাংলাদেশে ব্যবহার নিষিদ্ধ।
বিপদে পড়ে এটার কথা বেমানুম ভুলে বসেছিল সে।

সে আর ভাবল না কামিজের বিশেষ ভাঁজে থাকা
টিজারটি কৌশলে খুঁজল। তবে তার ভাগ্য বোধহয়
সহায় নাই তাই এত খুঁজেও পেল না। শীতল ততক্ষণে
বুঝে গেছে তাদের কান্না, ভয়, অসহায়ত্ব কাজে
আসবে না। যা করার বুদ্ধি খাঁটিয়ে করতে হবে। কিন্তু
কি করবে? কিভাবে বাঁচাবে ভাইকে? একথা ভেবে
ঘাড় ঘুরিয়ে সায়নের দিকে তাকাল। সায়ন তখনো
ভাঙা গলায় আত্ননাদ করে যাচ্ছে। সেই আত্ননাদ
শুনে ছেলেগুলো খুব মজা পাচ্ছে। খুব হাসছে।
হাসতে হাসতে যে যেভাবে পারছে হাতে থাকা রড
আর হকিস্টিক দিয়ে ইচ্ছে মতো মারছে। বিশ্রী গালি
দিচ্ছে। সায়ন একা পেরে উঠছে না। পারা সম্ভবও
না। একা কতক্ষণ টিকবে? কতক্ষণ সহ্য করবে?
ভাইয়ের নিস্তেজ হয়ে আসা গোঙানিতে শীতল কান্না
ভুল গেল। কৌশলে কামিজের ভাঁজে ‘টিজার’টি
খুঁজতে লাগল। কিন্তু ভাগ্যও যেন আজ নিষ্ঠুর খেলায়
মেতেছে। এত খুঁজেও টিজারটি পেল ন। ঘাড়
বাঁকিয়ে চারদিকে তাকাল কিন্তু কোথাও নেই। শেষ
আশাটুকুও শেষ হয়ে গেল। তখন সায়নকে মারতে
থাকা ছেলেগুলোর একজন হঠাৎ চোঁচিয়ে উঠল।

বলল, _'ভাই, এডারে কি শেষ কইরা দিমু? হাতে সময় নাই। বাইরের পোলাপান সিগন্যাল দিতাছে, বেশিক্ষণ থাকলে ঝামেলা হইবো।'

একথা শুনে কনক ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। সায়নের অবস্থা দেখে নির্লিপ্ত গলায় বলল,

_ 'এত তাড়াতাড়ি শেষ করলে আমাদের কষ্টটুকু বিফলে যাবে। ও হচ্ছে 'পারফেক্ট ম্যান'। আর পারফেক্ট ম্যানের বিদায় যদি পারফেক্ট ভাবে না হয় তাহলে পাপ লাগবে। তবে যা নিয়ে এত ঝামেলা সেই ঘটনা স্মরণীয় করব। ওকে ওর দরদী বোনের সামনে কুরবানি করব।'

তখন ছেলোটো আবার বলল, _ 'তাইলে এহানে আসেন ফরজ কাজ আগে করি। খাওয়া মালরে আর কি খাইবেন? রাইতে নাহয় ইন্টেক আইনা দিমু নে।'

কথাটা শুনে কনক শীতলের দিকে তাকাল। ঠোঁটের কোণে নোংরা হাসি এঁটে কিছু একটা ভেবে বলল, _ 'যা ছেড়ে দিলাম। তোর ভাইয়ের মতো জানোয়ার হতে পারলাম না। তবে তোকেও শাস্তি পেতে হবে কারণ তোর অপরাধ তুই সায়নের বোন।'

ভাইয়ের অপরাধে দায় তোকেও নিতে হবে। এমন দায় যা জীবনেও না ভুলিস। সেই দায় হলো নিজের চোখে ভাইকে কুরবানি হওয়া দেখবি। আমি ছুরি চালাব আর তুই কালিমা পড়বি। চোখ ভরে দেখবি ভাইয়ের ছটফটানি। আর তোদের অসহায় মুহূর্ত দেখে আমি পরাণ জুরাব। আর এটা হবে আমার বোনের প্রতি হওয়া অন্যায়ের ফয়সালা। ‘

একথা বলে কনক সত্যি সত্যিই শীতলের উপর থেকে সরে উঠে দাঁড়াল।

শীতলের চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে সায়নের কাছে নিয়ে গেল। এক ধাক্কা মেরে ফেলল পিচঢালা রাস্তার উপর। তবে শীতলের মাঝে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। সায়নের রক্তাক্ত দেহের দিকে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। গাল বেয়ে অঝরে জল গড়িয়ে গেল। দুই ধাপ এগোতেই রাস্তার উপর ধপ করে বসে পড়ল। দেহে যেন প্রাণ নেই। কানে যা শুনল তাতে শরীর অবশ হয়ে আসছে। তার কি ক্ষমতা আছে ভাইয়ের...! তার

অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে যখন-তখন জ্ঞান হারাবে। শরীরে আর কুলাচ্ছে না। কনক শীতলকে আরেকটা

লাথি মেরে হাতে ছুরি তুলে নিলো। ছুরির ধার পরখ করে আদেশের সুরে বলল,-‘দেখ কিভাবে কুরবানি করতে হয়, খবরদার চোখ সরাবি না। নয়তো তোকেও আল্লাহর নামে কুরবানি করে ফেলব!’

শীতল অসাড় শরীর নিয়ে রাস্তায় পড়ে রইল। কনক শীতলকে একবার দেখে ছেলেদেরকে ইশারা করতেই ছেলেগুলো শত্রু করে সায়নকে চেপে ধরল। কনকও সবচেয়ে ধারালো ছুরি এনে সায়নের মাথার কাছে বসল।

সায়ন তখন অস্পষ্ট সুরে কিছু বলতে চাইলে কনক হাসল। সায়নের এই দশা তার কলিজা ঠান্ডা করে দিচ্ছে। শান্তি পাচ্ছে সে। ভীষণ শান্তি। তবে মরার আগে শত্রুকে কিছু বলার সুযোগ দিলে মন্দ হয় না। তার আকুতি, অসহায় দৃষ্টি মন ভালো করার খোরাক হবে। একথা ভেবে সুযোগ দিলে সায়ন অস্পষ্ট শুধু এইটুকু বলল,- ‘আমার লাশ যাই করি আমার বোনটাকে অন্তত বাড়িতে পৌঁছে দিস। তোর মরা বোনের কসম দিলাম।’

এখনো বোনের সাফাই গাওয়া সহ্য হলো না কনকের। মুখের কথা শেষ না হতেই ধারালো ছুরি

চালাতেই আচমকা তার দেহেও উচ্চ ভোল্টেজের বৈদ্যুতিক শক লাগল। শরীরকেঁপে ঝিমঝিম করে উঠল। হাত থেকে ছুরি পড়ে গেল। গোঙানির মতো শব্দ করে রাস্তায় শুয়ে পড়ল কনক। নড়তে অবধি পারল না। কনককে পড়তে দেখে ছেলেগুলো অবাক হলো। তারা চোখ তুলে দেখে শীতল হাঁটু মুড়ে বসে আছে। শীতল কখন উঠে এসেছে খেয়াল করে নি। কখন রাস্তার পড়ে থাকা টিজারটি হাতে তুলে নিয়েছে তাও দেখে নি। তারা বিস্ময় নিয়ে তাকাতেই শীতল আরেকটা ভয়ংকর

কান্ড ঘটিয়ে ফেলল। কনকের হাত থেকে ছিটকে পরা ছুরিটাই কনকের গলায় ঢুকিয়ে দিলো। এমন ভাবে ছুরি ঢুকাল ওপাশ দিয়ে ছুরি বেরিয়ে গেল। তাজা রক্তের বান এসে লাগল শীতলের গায়ে। তবুও শীতল থামল না চোখের পলকে ছুরি একটানে বের করে পরপর কনকের বুকে ঢুকিয়ে দিলো। ঢুকিয়ে মোঁচড় দিলো। শক খেয়ে স্থির হওয়া কনক ছুরিকাঘাতে কুরবানির গরুর মতো শব্দ করে একবারে স্থির হয়ে গেল। শীতল নিজে থরথর করে কাঁপছে। কাঁপছে সর্বাঙ্গ। একা একা বিরবির করে

বলছে,-‘আ..আর মারবি আমার ভাইকে? মার..বি?
মেরেই দেখ..।’

শান্ত অবলা মেয়েটার অশান্ত রূপ থেকে ছেলেগুলো
কিছু বলার ভাষার হারিয়ে ফেলল। মেয়েটা এমন
কিছু করবে কল্পনাও করে নি। তারা ছুঁটে গিয়ে
কনকের শ্বাস চেক করে দু’পা পিছিয়ে গেল।
কনকের শ্বাস চলছে না। জলজ্যাত ছেলেটা চোখের
পলকে মারা গেল? এটা কিভাবে সম্ভব?

এদিকে রাস্তা পাহারা দেওয়া ছেলেগুলো কল দিয়ে
যাচ্ছে। কেউ রিসিভ

করছে না দেখে মেসেজ করল তারা সরে যাচ্ছে।
আজমরা মিছিল শেষ করে ফিরে আসছে। এপথে
দুকবে কী না বলা যাচ্ছে না তবে শীঘ্রই সরে যাওয়া
উচিত। আজমদের হাতে পড়লে তাদের চিহ্ন রাখবে
না। আবার যা ঘটে গেছে এখানে থাকলে তাদের
ঘাড়ে দোষ আসতে পারে। মেয়েটা যখন মেরেছে
সেই ফাসুক। একথা ভেবে আবার ভাবল মেয়েটাকে
কিছু না বলে যাওয়া ঠিক হবে না। তারা রড তুলে
মারতে গেলে সায়ন গড়িয়ে গেল শীতলকে রক্ষা
করতে। সায়নের তখনো জ্ঞান ছিল। কিন্তু শেষরক্ষা

হলো না রডের বারি পড়ল শীতলের গায়ে।
ছেলেগুলো দুই ভাই-বোনকে আরেকদফা মারতে
লাগল। হকিস্টিকের লাস্ট বারিটা সায়নের মাথায়
পরাতে এবার পুরোপুরি জ্ঞান হারাল সায়ন। শীতল
ভাইয়ের মাথা তার

কোলে তুলে নিলো। কামিজের এককোণা দিয়ে যত্ন
করে ভাইয়ের গলা আর মুখ মুছে দিলো। গলগল
করে রক্ত বের হচ্ছে। কিন্তু কোথা থেকে আসছে এত
রক্ত? কোপানো বাহু, ফাঁটা মাথা নাকি খেঁতলে যাওয়া
মুখ থেকে? নাকি গলা থেকে? কোথায় ধরবে?
কোথায় ধরলে রক্ত পরা বন্ধ হবে? সে পড়ে থাকা
হিজাব নিজের বুকে জড়িয়ে ভি-বেল্টটা সায়নের
মাথায় বেঁধে দিলো। সায়নের পকেট থেকে রুমাল
বের করে বাহু বাঁধল। তারপর ভাইয়ের কপালে চুমু
খেল। ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে নিভু
নিভু স্বরে ডাকল,-‘ভাইয়া.. এ ভাইয়া! তাকাও না
একটু!’

সায়ন তাকাল না। অনেক আগেই চোখজোড়া বন্ধ
করে নিয়েছে। মেনে নিয়েছে তার অসহায়ত্ব! সায়নের
সাড়াশব্দ পেল না দেখে শীতল নীরবে কাঁদতে

লাগল। কাঁদতে কাঁদতে তার গলার স্বর বসে গেল।
চিৎকার করা কান্নায় অদ্ভুত শোনাচ্ছে। কাঁদতে
কাঁদতে হঠাৎ মনে হলো কাউকে খবর দিতে হবে।
ভাইকে হাসপিটালে নিতে হবে। এদিক ওদিকে
তাকিয়ে ব্যাগ খুঁজতেই নজর পড়ল রাস্তায় পড়ে থাকা
সায়নের ফোনের দিকে। কেউ ফোন দিচ্ছে সাইলেন্ট
থাকায় শব্দ হচ্ছে না। সে সায়নের মাথাটা কোল
থেকে নামিয়ে ফোনের কাছে গেল। ফোনটা হাতে
তুলে দেখল ডিসপ্লেতে ভাসছে আজমের নাম। কল
রিসিভ করলেও গলা দিয়ে কথা বের হলো তার।
ওদিকে আজম হ্যালো ভাই! ভাই কথা কন! হ্যালো?’
করেই যাচ্ছে। নেটওয়ার্কের সমস্যা ভেবে আজম কল
কেটে আবার কল ব্যাক করল। শীতল সায়নের দিকে
একবার তাকিয়ে কম্পিত হাতে কল রিসিভ করে
বহুকষ্টে উচ্চারণ করল, ‘আ..জম ভাই! ভাইয়াকে..।
ভাই..ভাইয়া উঠছে না। কথা বলছে না।’

সায়নের ফোনে মেয়েলি কণ্ঠস্বর শুনে আজম অবাক
হলো। কান থেকে ফোন সরিয়ে নাম্বার চেক করে
দেখল সায়নেরই নাম্বার। ভাঙা গলা শুনে প্রথমে
বুঝতে পারে নি এটা শীতল। পরে যখন বুঝল

আজমও যেন স্থির হয়ে গেল। আসন্ন বিপদের কথা মাথায় আসতেই শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। দরদর করে ঘামতে লাগল। ঢোক গিলে বলল,-‘শীতল? বোন আমার, ভয় নেই। আমি এন্ফুগি আসছি। আশপাশ দেখে বলো তো বোন কোথায় আছো তোমরা?’

-‘আপনার সঙ্গে দেখা হলো ওই.. ওই রাস্তায়।’

-‘আসছি বোন। এন্ফুগি আসছি।’

একথা বলে আজম ছুটতে শুরু করল। আচমকা পাগলের মতো ছুটতে দেখে বাকি ছেলেরাও ঘটনা জেনে দৌড়াতে শুরু করল। তারা মিছিল শেষ করে ফিরছিল। ছেলেপুলেরা মিছিল করলে তাদেরকে খুশি করতে হয়। সায়নের কথা অনুযায়ী আজম সেটাই করছিল। হাসাহাসি করছিল।

সায়ন জিতলে বড় সড় ট্রিট নিবে সেটা নিয়ে আলোচনা করছিল। তারা আবার খুব সহজে সায়নের কাছে আবদার করতে পারে। সায়নও প্রথমে আবদার শুনে গালি দেয় তারপর নিজেই আবদার অনুযায়ী সেসব এনে দেয়। মানুষটাকে এজন্যই তারা ভালোবাসে। এমন একটা মানুষকে যদি মেয়র

হিসেবে পায় তবে মন্দ হয় না। আজকের মতো মিছিল করা শেষ। রাত নয়টায় দিকে আরেকবার বের হবে পোষ্টার লাগাতে। আমজাদের মোড়ের দিকে কারা যেন পায়রার পোষ্টার ছিঁড়ে ফেলেছে। নতুন করে আবার লাগাতে হবে। তাছাড়া কোন রাস্তায় যাবে জানার জন্য সায়নকে কল করেছিল আজম। কে জানে মানুষটার উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে।

শুদ্ধ তাকে বার বার বলেছিল সায়নের দিকে খেয়াল রাখতে। এই নিয়ে আলোচনা করেছিল এবং বড়সড় একটা হামলা হবে আন্দাজ করেছিল।

এটা যে আজই স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি তারা। এদিকে বাড়িতেও জানাতে ভেবে শীতল তার ফোন বের করল। শুদ্ধকে কল দিলো। মানুষটা গতকাল রাতে জেগে ছিল তাই কিছুক্ষণ আগে সে নিজেই বলেছিল একটু ঘুমিয়ে নিতে। সে ফিরলে আর ঘুমাতে দেবে না।

আজ যেভাবেই হোক ঠেলেঠুলে হলেও রাতে ঘুরতে বের হবে। সারারাত ঘুরবে, বাইরে খাবে। সে ফিরতে ফিরতে যেন ঘুমিয়ে নেয়। একথা শুনে বোধহয় শুয়েছে ভেবে সিতারাকে কল করল। কল ঢুকতেই

বুক কেঁপে উঠল। একজন মাকে কিভাবে ছেলের এমন অবস্থার কথা জানাবে সে?

ভেঙ্গে পড়লে হবে না। বড় মাকে বললে শুদ্ধর কানেও খবর চলে যাবে। সেই মানুষটাকে যে তার বড্ড প্রয়োজন। অতঃপর সিতারাকে জানিয়ে শীতল পুনরায় সায়নের কাছে বসল। যত্ন করে মাথাটা আবারও কোলে তুলে সায়নের কানে কানে বলল,-‘খবরদার পালানোর চিন্তা করবে না। পৃথিবীর আলো দেখার আগে ওই ছোট প্রাণটিকে এতিম করে দিও না, ভাইয়া। এতটা নিষ্ঠুর হইয়ো না।’

একথা বলে শীতল একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেল। এরপর আজম এলো।

আজমও কত করে ডাকল শুনলোই না। ছেলেপুলেরা দলে দলে আসায় ঘটনা দ্রুত ছড়িয়ে গেল। ইমিডিয়েট অ্যাম্বুলেন্স কল করাও হলো। কিন্তু সমস্যা হলো, পানির পাইপ ফেটে এ রাস্তায় বড় গাড়ি ঢুকতে পারছে না। কিছুক্ষণ আগেও ঠিকই ছিল হঠাৎ পাইপ ফাটল কি করে? এটাও প্রশ্নই থেকে গেল। অ্যাম্বুলেন্স যেন কোনোভাবেই আসতে না পারে রবির দল দুই দিক থেকে মিছিলে নেমে রাস্তাটাও ব্লক করে ফেলল।

এই সুযোগে সায়নটা যদি ভালোই ভালোই দুনিয়া
ছাড়লে তাকে মেয়র হওয়া থেকে কেউ আটকাতে
পারবে না। রাজনীতি এমনই! বিপদে শত্রু মারুক
ভোট আমার। আসন আমার। ক্ষমতা আমার। এর
বিনিময়ে দুই মিনিট শোক পালন করব নাহয়।
দেশবাসীকে দেখাতে দুটো ফোঁটার জায়গায় আরো
চার ফোঁটা চোখের পানি ঝরাবে। তবুও মরুক।
এটাই রাজনীতির চক্র। বর্তমানে—

এরপরের ঘটনাটুকু আরেকটা দুঃস্বপ্নের মতো কাটল।
হস্তদত্ত হয়ে শুদ্ধ এলো (৭৭নং পর্বের শেষে উল্লেখ
করা হয়েছে)। শীতল সায়নের অবস্থা দেখে পুরো
ঘটনা বোঝা শেষ। পাইপ ফাটার কথাটাও জানে,
তবে বসে থাকার সময় নেই। সে দ্রুত গিয়ে ভাইকে
বুকে জড়িয়ে নিলো। কোথায় ধরবে , সবখানে
কোপানো নয়তো খেঁতলানো। সে আর অপেক্ষা করল
না সায়নকে কোলে তুলে নিলো। গাড়ির অপেক্ষায়
বসে থাকা সম্ভব না।

তাকে যেতে দেখে শীতলও উঠতে গেলে পুলিশ
পথরোধ করল। তাকে যেতে দেওয়া হবে না। একথা

শুনে শুদ্ধ কিছু বলার আগে শীতল নিজে থেকেই বলল,-‘নিয়ে যান ভাইয়াকে।’

-‘ ভাইয়াকে অ্যান্থলেসে তুলে দিয়ে আসছি।’

একথা বলে হাঁটা ধরল সামনের পথ দিয়ে। আজম মানুষ সরিয়ে তাকে যাওয়ার রাস্তা করে দিচ্ছে। তখন শারফাত, সাফওয়ান চৌধুরী হত্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। গাড়ি রেখে হেঁটেই এসেছেন। রীতিমতো হাঁপাচ্ছেনও। শারফাত চৌধুরী শুদ্ধর সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সায়নের দিকে তাকাচ্ছেন। চোখের পানিতে দুবার হোঁচট খেলেন। কেন জানি মুখ ফুটে একটা কথাও বের হচ্ছে না। তবে ভেতর থেকে কেউ যেন চিৎকার করে ডেকে যাচ্ছে ‘আব্বা! আব্বা রে, তাকা। কোথায় কষ্ট হচ্ছে? এইতো বাবা এসে গেছি, বাবাকে বল! ওহ বাপ.. সায়ন? কলিজা আমার।’

সায়ন বরাবরই উনার অবাধ্য ছেলে। বাবাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসলেও ঘাড়ত্যাড়ামি করা ওর স্বভাব। সাধারণ কথাকে পেঁচিয়ে উনাকে রাগানো তার অতি পছন্দের কাজ। ভালো কথা বললেও কখনো শোনে না। যেমন এখনও শুনছে না।যেখানে একজন

মানুষের জীবন মরণের কথা সেখানেও কিছু মানুষের
বিবেক কাজ করেনা। এই যেমন মিছিলের নাম করে
যাওয়ার পথে দল বেঁধে রবির ছেলেরা দাঁড়িয়ে আছে।
সরতে বলতেও সরছে না। সিগারেট টানছে নতুবা
নিজেরা নিজেরা হাসাহাসি করছে। পরিস্থিতি বুঝে
পুলিশ এসে মিছিল ভঙ্গ করল। কেউ ঝামেলা করতে
এসে তাকে ধোলাই করা হলো। সাইনের ছেলেপুলেরা
ভিজেপুরে কোনোমতে পানির পাইপ ঠিক করল।
শুদ্ধও ততক্ষণে অনেকটুকু পথ এগিয়ে এসেছে
আরেকটু এসে

দেখল অ্যাম্বুলেন্স আসছে। তাকে দেখমাত্রই চালক
দ্রুত নেমে সাইনকে শোয়ানোর ব্যবস্থা করল। শুদ্ধ
ভাইকে শুইয়ে শারায়ত আর সাফওয়ান চৌধুরীকে
দ্রুত অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিলো। সে আসছে না দেখে
শারায়ত চৌধুরী অবাক হয়ে বললেন,- ‘তুমি যাবে
না?’

- ‘এদিকটা সামলে আসছি।’

একথা বলে চালককে তাড়া দিলে অ্যাম্বুলেন্স ছেড়ে
দিলো। শুদ্ধর হাতের ইশারায় আজমসহ পাঁচজন
বাইকে করেই অ্যাম্বুলেন্সের পেছনে ছুটল।

পুরো ঘটনা পরিকল্পিত বুঝতে বাকি নেই তাই তাদেরকে পাঠাল। যাতে মাঝরাস্তায় অ্যাম্বুলেন্স থামাতে না পারে। ওরা যেতেই শুদ্ধ শতরূপাকে কল করে কথা বলতে বলতে ছুটল শীতলের কাছে। অর্ক, হাসান আর স্যাভিকে হসপিটালে পাঠাল। সিরাতকে কল করে বলল বাড়ির কেউ যেন একধাপ বাইরে বের নাহয়। একটুপরে আজম নিজে গিয়ে তাদের হসপিটালে নিয়ে যাবে। চারদিকে বিপদ এখন বুঝে শুনে চলতে হবে।

শীতল তখনো ওখানেই চুপ করে বসেছিল। মিছিলের ছেলেপুলেরা চলে

যাওয়ায় রাস্তাটা ফাঁকা। এই সুযোগ কনকের লাশও নিয়ে যাওয়া হলো।

পুলিশ অনড় হয়ে বসে থাকা শীতলের দিকে নজর রাখছিল। কেন জানি

মায়া হচ্ছে মেয়েটাকে দেখে। মায়া লাগার মূল কারণ ভাইয়ের জন্য সে মানুষ মেরে ফেলেছে। রং-এর দুনিয়ায় কত কাহিনির সাক্ষী হতে হয়। কত ঘটনা চোখে দেখতে হয়। এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। অপরাধীকে

নিয়ে যেতে হবে। পুলিশ শীতলকে হ্যান্ডকাপ পরাতে
গেলে তখন ছুটতে ছুটতে শুদ্ধ এসে শীতলকে বুকে
আগলে নিলো। ওর মাথাটা বুকের সঙ্গে চেপে
ধরতেই শীতলও আঁকড়ে ধরল শুদ্ধকে। এই বুকটাই
খুঁজছিল সে।

শীতল স্থির। কাঁদছে না। কথাও বলছে না। তখন
পুলিশটি এগিয়ে এলে শুদ্ধ বলল,

-‘আমি বলছি ও পালানোর চেষ্টা করবে না।
হ্যান্ডকাপ লাগাবেন না প্লিজ।’

-‘স্যার এটা..!’

-‘প্লিজ।’ আরেক পুলিশের ইশারায় পুলিশটি কথা
বাড়াল না। তাছাড়া অল্প বয়সী অপরাধীকে (১৮
বছরের নিচে) কোনোভাবে হ্যান্ডক্যাপ পরানোর নিয়ম
নেই। বরং এটি আইনবিরোধী কাজ। শীতলকেও
এবার নিয়ে যেতে হবে। পুলিশটি তাড়া দিলে শুদ্ধ
কান্নারত শীতল মুখ দুই হাতের আজলা ভরে নিলো।
তারপর শীতলের কপালে চুমু এঁকে বলল,

-‘কিছু হবে না। আমি আছি না, হুম?’

একথা বলে নিজের হাতে শীতলের মুখ মুছে দিলো।
মুছে লাভ হলো না পরক্ষণেই গাল ভিজে গেল। শুদ্ধ

পুনরায় বুকে জড়িয়ে নিলো। শীতলের কানে কানে
নিচুস্বরে বলল,

-‘আমি স্বশরীরে না থাকলেও আমার হয়ে কেউ না
কেউ থাকবে। ভয় নেই।’

এইটুকু বলে শীতলকে বুক থেকে সরিয়ে
বলল,-‘উনাদের সঙ্গে যাও, একটুপরেই আমি আর
ফুপি আসছি।’

-‘ভা..ভাইয়া?’

-‘ ভাইয়ার কিছু হবে না, ইনশাআল্লাহ।’

একথা বলে শীতলকে বোঝালেও আসলেই কি তাই?
এরপর শীতলকে দাঁড় করিয়ে যেতে ইশারা করল।
শীতলও সম্মতি সূচক মাথা নাড়িয়ে

এক ধাপ বাড়িয়েও দাঁড়িয়ে গেল। ঘুরে তাকাল শুদ্ধর
দিকে। মানুষটাকে ছাড়া থাকতে ভীষণ কষ্ট হবে।
তার প্রশস্ত বুকটা ছাড়া ঘুমানো কষ্ট হবে। চোখের
সামনে ভাসছে বোনের মুখ। সায়নের কথা শুনে তার
অবস্থা কি হবে ভাবলে কলিজা কেঁপে উঠছে। তবে
শান্তির কথা হলো যে অমানুষ তার ভাইয়ের গলায়
ছুরি ধরেছে সেই মানুষটাকে সরিয়ে ফেলেছে। যদি
না সরাতো জীবনের সবচেয়ে বড় আফসোস হয়ে

উঠত। যা হয়েছে তা নিয়ে ভেবেও কাজ নেই। তবে সামনে যা হবে ভয় পেলে বা কান্নাকাটি করলে তার সামনে দাঁড়ানো মানুষটা ভেঙে পড়বে। অথচ এই মানুষটার এখন অনেক দায়িত্ব। অনেক কাজ। তাকে এখন থাকতে হবে অবিচল। মনে মনে একথা ভেবে মিষ্টি হেসে সামনের পথে পা বাড়াল। সে জানে না সামনে কি আছে? কি হবে? কি হতে পারে? তবে প্রতি ধাপে ধাপে দোয়া করে গেল যেন বোনের মুখের হাসিটুকু অক্ষত থাকে। সিতারার বুকের মালিক যেন হাসিমুখে ফিরতে পারে। তাদের ভাই-বোনদের খুনশুঁটিতে চৌধুরী নিবাসে যেন আবার চাঁদের হাঁট বসে। একথা ভাবতে ভাবতে সে পুলিশের গাড়িতে উঠে বসল। গাড়ি ছেড়ে দিলে শীতল ঝাপসা হতে হতে অনেকদূর চলে গেল। তৈরি হলো দূরত্ব। একটা সময় চোখের আড়ালই হয়ে গেল। শুদ্ধ অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে শূন্য দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল। যাকে এতদিন বুক পাঁজরে আগলে রেখেছিল, যার গায়ে আঁচ লাগার আগে নিজে ঢাল হয়ে দাঁড়াত, আজ তাকেই চোখের সামনে পুলিশের গাড়িতে উঠতে দেখছে। যাকে চোখের আড়াল করে না। একা ছাড়ে

না। বাড়ির কেউ কিছু বললে কথা শোনাতে ভুলে না।
আজ তাকেই পুলিশের হাতে একা ছাড়তে হলো।
আচ্ছা, তার কেমন লাগছে? বুকটা খুব বেশি পুড়ছে?
কি জানি কিছু হবে একটা। আজ শুক্রবার। কর্মব্যস্ত
মানুষের সাপ্তাহিক ছুটির দিন। রোদ ঝলমলে সুন্দর
একটি সকাল। তবে ‘সুন্দর’ শব্দটা বড়ই আপেক্ষিক।
কারণ, সব সুন্দর সবার জন্য সুন্দর হয়ে আসে না।
এই যেমন শীতলের কথাই ধরা যাক, আজ তার
সকালটা শুরু হয়েছে জেলখানার বন্দি দশায়। এখানে
বাবা নেই, মা নেই, নেই প্রাণপ্রিয় পুরুষটিও। অথচ
গতকাল সকালটাও তার জন্য অন্যরকম ছিল।
পরিবারের আদুরে মেয়ে হয়ে সবার আদরে সময়ও
কাটিয়েছিল সে। অথচ আজকে তার অবস্থান ভিন্ন,
পরিস্থিতি ভিন্ন। কে জানত, ধৈর্যে আসা ঘূর্ণিঝড়ে
বদলে যাবে জীবনের গতিপথ। ভেঙে যাবে স্বপ্ন!
এখানে আসার পর থেকে কেন জানি তার মনে হচ্ছে
জেলের দেয়ালগুলো তাকে দেখে উপহাস করে
হাসছে। ফিসফিসিয়ে বিদ্রূপ করছে। শীতল নামটা
বদলে দিয়ে ‘খুনি’ নামে ডাকছে। সে অবশ্য তাতে
লজ্জা কিংবা ভয় পাচ্ছে না বরং ভালো লাগছে।

কারণ সে জানে এ সমাজের মানুষের চোখে খুনি,
আসামি, অপরাধী হলেও যা করেছে ভাইকে বাঁচাতে
করেছে। বোনের মুখের হাসি টেকাতে করেছে।
করেছে অনাগত অতিথির জন্য। করেছে একজন
মায়ের জন্য যিনি কোলে বুকে করে তার সন্তানকে
মানুষ করেছেন। করেছে চৌধুরী বাড়ির সব জীবন্ত
ফুলগুলোকে একই ডালে ফুটিয়ে রাখতে। সেখান
থেকে একটা ফুলকে হারিয়ে ফেললে বাগানের সব
সৌন্দর্য হারিয়ে যাবে। শূন্যতা গিলে খাবে বাকি
ফুলগুলোকে। তাছাড়া নতুন অতিথিকেও জানানো
দরকার বাবা মানে বিশাল বটবৃক্ষ। সন্তানকে আপদ-
বিপদ থেকে রক্ষা করার জীবন্ত দেয়াল। শুধু এইটুকু
বোঝানোর জন্য হলেও ভাইয়াকে যে বাঁচতেই হবে।
সে অবশ্য জানেই না নতুন অতিথি আগমনের কথা।
শুধু সেই না বাড়ির কেউই জানে না। শীতল নিজেও
জানত না, যদি না পরশু রাতে বোনের কাছে শুতে
যেত। শুদ্ধ না থাকলে কেন জানি ঘুম আসে না তার।
একা শুলে আবোলতাবোল কিসব চিন্তা মাথায়
ঘুরপাক খায়। চোখের সামনে নীল রঙা দুটো চোখ
ভাসতে থাকে। মনে হয় কেউ তাকে ফলো করছে।

কেউ তাকিয়ে থেকে হাসছে। কিয়ারাকে মিস করে।
তাদের স্মৃতিগুলো মনে পড়ে। নিজেকে খুব অপরাধী
মনে হয়। শুদ্ধর বাইরে থাকলে বুকের ভেতরটা ভয়ে
কুঁকড়ে থাকে। তার বয়স অল্প, তবে জীবনে যেসব
সমস্যা পার করেছে ভয়টা আজকাল জেঁকে বসেছে।
এসব চিন্তা যখনই মাথায় ভর করে তখনই মায়ের
কাছে ছুটে চলে যায় নাহলে দেখে সায়ন আছে কি
না। যদি দেখে সায়ন নেই তাহলে স্বর্ণের সঙ্গে ঘুমায়।
স্বর্ণ তাকে কাছে টেনে গল্প করতে করতে ঘুম
পাড়িয়ে দেয়। সেদিনও সে গিয়েছিল, কিন্তু রুমে ঢুকে
দেখে স্বর্ণ ওয়াশরুম থেকে বের হচ্ছে। চোখে-মুখে
পানি দিয়ে এলেও কাহিল অবস্থা তাকে দেখে স্বর্ণ
হেসে শুতে বলল। মুখ মুছে পানি খেয়ে শীতলের গা
ঘেঁষে শুলো। তিনবোন আগে এভাবেই শুয়ে কত গল্প
করত শখ চলে যাওয়ায় একটু খারাপই হয়েছে।
শীতল একবার ভাবল, শখকে ভিডিও কল করে গল্পের
সঙ্গী করতে। কিন্তু অর্ক থাকলে খারাপ দেখাবে তাই
সেই চিন্তা বাদ দিলো। নড়েচড়ে স্বর্ণের পেটের উপর
এক পা তুলে দিয়ে আরাম করে শুলো। পাশের
জনের পেটের উপর পা না দিলে তার ঘুম আসে না।

বিয়ের প্রথম কদিন ঘুমের ঘোরে শুদ্ধর পেটের
ওপরেও পা তুলে দিতো। শুদ্ধ নামিয়ে দিলে আবার
দিতো তাতে ভীষণ বিরক্ত হতো। একপর্যায়ে বিরক্তির
সুরে বলত,

-‘ নাহ্ এর জ্বালায় তো পারা গেল না, কোনো ভদ্র
মেয়ে এভাবে ঘুমায়?’

সেও ঘুমের ঘোরে জবাব দিতো,-‘খ্যাচ খ্যাচ না করে
ঘুমান সকালে উঠে সালাম করে নেব।’

বেচারা তখন কিছু বলার ভাষা খুঁজে না পেয়ে চুপ
করে থাকে। কয়মাসে

অবশ্য তারও অভ্যাস হয়ে গেছে। বরং এখন সে পা
না দিলে নিজে টেনে নেয়। শীতল অভ্যাসবশত স্বর্ণের
পেটে পা দিলে স্বর্ণ নামিয়ে দিলো। গল্প করতে
করতে আবার পা দিলে আবারও নামিয়ে দিলো।
একপর্যায়ে সে ব্যাপারটা খেয়াল করে মুখ বেজার
করে বলল,-‘আপু, তুই বড় জা-য়ের মতো ব্যবহার
করছিস কেন? একটু পা দিলে কি আর এমন হবে?’
একথা বলে পা দিতে গেলে স্বর্ণ পা ধরে থামিয়ে
দিয়ে বলল,

-‘কার যেন বেবিদের গায়ের স্মেল পছন্দ? ‘

-‘আমার! ওয়েট, ওয়েট, এই আপু বেবি এলো কোথা থেকে?’

-‘ তার উপস্থিতি এখানে আছে বলেই তো আনা হলো ।’

-‘মানে কি?’

-‘ সামথিং সামথিং ।’একথা শুনে শীতল তড়াক করে উঠে বসল । কিছু একটা আন্দাজ করে চোখ বড় বড় করে একবার স্বর্গের মুখের দিকে তাকাল তো একবার ওর পেটের দিকে । মূল ঘটনা ধরতে পেরে খুশির চোটে চিৎকার করতে গেলে স্বর্ণ মুখ চেপে ধরে ইশারায় না করল । মৃদু হেসে বলল,

-‘চুপ বোন চিৎকার করিস না । বাড়ির কেউ জানে না ।’

স্বর্ণ শীতলের মুখ ছেড়ে দিলো । ছাড়া পেয়ে শীতল বোনকে জড়িয়ে ধরে

অভিনন্দন জানিয়ে বলল,-‘ আমাকে অভিনন্দন জানাবে না?’

-‘ তুইও কনসিভ....!’

-‘আরে না, আমি তো খালামণি হব ।’

-‘আসলেই? নাকি..!’

-‘ তোমার হিটলার দেবর আগেই বলে দিয়েছে
বাচ্চাকাচ্চা এখন না।

তাকে যতটুকু চিনি ভুল করেও ভুল করবে না সে।’

-‘ভাগ্যে থাকলে আমাদের পরিকল্পনার বাইরেও
অনেক কিছু ঘটে। তবে

ভাইয়া যখন বারণ করছে তাহলে জেনেবুঝে করেছে।
আগে পিরিয়ডের সমস্যা ছিল এখনো আছে?’

-‘হুম। ভাবছি আরেকবার ডাক্তারের কাছে যাব।
আচ্ছা আপু, সুখবরের কথা ভাইয়া জানে?’স্বর্ণ না
বোধক মাথা নাড়াল অর্থাৎ জানে না। কদিন যাবৎ
শরীর বেশি খারাপ হওয়ায় ইউরিন টেস্ট করেছিল।
পজিটিভ দেখে বিশ্বাসই করতে পারে নি পরে ব্লাড
টেষ্ট করে রিপোর্ট পেয়েছে আজ সন্ধ্যার পর। সায়েন
আগেই জানিয়েছে আজ রাতে ফিরবে না। ফিরলে
আগামীকাল দুপুরে। আর ফোনে জানাতে ইচ্ছে করে
নি। কিছু মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করাটা উত্তম। সত্যি
বলতে, তার মনে হয়েছে ফোনের থেকে মুখোমুখি
দাঁড়িয়ে বলার আনন্দটুকু অন্যরকম। সে ফিরুক,
ফেরামাত্রই সায়েনের মুখোমুখি দাঁড়াবে তারপর
প্রগেনেসি কিট আর ব্লাড রিপোর্টটা হাতে ধরিয়ে

দেবে। তারপর দেখার পালা শাহরিয়ার চৌধুরী কি করে। কিভাবে নেয় খবরটা। হয়তো কথা বলায় ভুলে যাবে নয়তো খুশিতে তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলবে। তার মানুষটা আবার একটু অন্যরকম। অন্যরকম বলতে দুঃখ পেলে হাসতে পারে খুশির সময় কাঁদতে পারে। এসব নিয়ে কথা বলতে বলতে স্বর্ণ ঘুমিয়ে গেল। কিন্তু খুশির চোটে শীতলের চোখে ঘুমই এলো না। সে নিঃশব্দে উঠে স্বর্ণের গায়ে কাঁথা টেনে চারপাশটাও বালিশ দিয়ে ঘিরে দিলো। যাতে বোন গড়িয়ে না পড়ে যায়। এখন থেকে খুব সাবধানে থাকতে হবে। তারপর সে পা টিপে টিপে বেরিয়ে রান্নাঘরে গেল। নিজের খুশিটুকু উদযাপন করতে একটা মিষ্টি মুখে পুরে আরেকটা হাতে নিয়ে ওপরে উঠে এলো। শুদ্ধর রুমে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখল। বাবু কি তার মতো হওয়ার সম্ভবণা আছে? নাহলেও সবাইকে বলবে তার মতোই হয়েছে। কথা হচ্ছে খবরটা শুদ্ধকে দিতে মন চাচ্ছে। কিন্তু সায়ন যখন জানে না তখন আর কাউকে জানানো উচিত হবে না। আগে সায়ন ভাই জানুক এরপর ঘটা করে সবাইকে জানাবে। তবে এই মুহূর্তে

শুদ্ধকে একটু রাগানো যাক। একথা ভেবে সে
বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। মিটিমিটি
হাসতে হাসতে শুদ্ধকে মেসেজ করল,-‘ বাড়ি আসা
হোক। এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ঘুম পাড়িয়ে
দেওয়া হোক।’

পাক্সা বিশ মিনিট পর শুদ্ধর রিপ্লাই এলো,
-‘দেরি হবে।’

মেসেজ দেখে শীতলের রাগ হলো পরক্ষণেই খুশিতে
গদগদ হয়ে টাইপ করল,

-‘আমার না বেবিদের গায়ের স্মেল খুব ভালো লাগে।
আপনার ভালো লাগে না?’

মেসেজ দেখে শুদ্ধ ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে রইল। কিসের
মধ্যে কি? ব্যাঙাচি নিশ্চয়ই মুভি দেখেছে নতুবা হঠাৎ
বেবির কথা এলো কোথা থেকে? তবে

এখন বেবি টেবি না। এক বেবিকে পেলেপুষে বড়
করে বউ বানাতে প্রচুর ধকল গেছে তার। এখন সেই
বেবির বেবি হলে জীবন শেষ। ঘরের বেবি আরো
বুঝদার হোক। তার ঘুমানোর স্টাইল ঠিক হোক
নয়তো এই রিস্ক নেওয়া যাবে না। দেখা যাবে, বেবির
পেটের উপর পা তুলে দিয়ে অবস্থা খারাপ করে

ফেলবে। একথা ভেবে সে কিছু টাইপ করার আগে
শীতল টাইপ করল,-‘ মিস করছি।’

-‘ রাত অনেক হয়েছে ভুলভাল বকে ব্রেককে
কনফিউজ না করে ঘুমিয়ে পড়।’

-‘ঘুমাব এক শর্তে।’

-‘কি শর্ত?’

-‘আদুরে সুরে একবার বলুন, ‘ আই লাভ ইউ
শীতলপাখি।’

-‘ভালোবাসলে নাহয়, ‘ভালোবাসি’ বলতাম।’

শুদ্ধর চালাকি শীতল ধরতে পারল না বরং শুদ্ধকে
পঁচাতে বলল,

-‘কেউ ভালোবাসে না আবার আমার কিছু হলে ভ্যাঁ
ভ্যাঁ করে কাঁদে।

-‘ বয়েই গেছে কারো জন্য কাঁদতে। আমার চোখের
পানি এত সস্তা না।’

-‘ বুঝলাম। এবার যা বলতে বললাম ফটাফট বলুন
দেখি।’

-‘মানুষ আছে।’

-‘ মানুষ থাকলে আমি কি করব? আমি কি মানুষকে
বলছি আমাকে, ‘লাভ ইউ’ বলতে? আপনাকে বলেছি

আপনি বলুন নয়তো ঘুমানো দূর মেসেজ করে খুব
জ্বালাব।’-‘আমিও।’

-‘আমিও মানে?’

-‘আমিও বাড়ি ফিরে জ্বালাব..!’

এরপর শীতল বেশ কয়েকটা মেসেজ করলেও সিন
হলো না রিপ্লাইও এলো না। তবে একটু হলেও
জ্বালাতে পেরে শান্তি নিয়েই ঘুমিয়েছিল। ওই
মানুষটাকে জ্বালানোয় যা শান্তি তা অন্যকিছুতে নেই।
সেসব কথা স্মরণ করে দেওয়ালে মাথা ঠেকাল
শীতল। উঁচুতে থাকা জানালার শিক দিয়ে যতটুকু
আলো আসছে তাতে বুঝল সকাল হয়েছে। রাতের
অন্ধকারকে সূর্যের আলো গোথাসে গিলে খেয়েছে।
এখন দিনের রাজত্ব। অথচ তার জীবনে ঘুটেঘুটে
অন্ধকার পাকাপোক্ত ভাবে গেঁড়ে বসেছে। সে জানে
না, এ অন্ধকার আর কখনো কাটবে না কি না। আর
কখনো স্বাভাবিকভাবে চলতে পারবে কি না।
সমাজের মানুষ তাকে সহজভাবে মেনে নিবে কি না।
গতকাল রাতে শতরূপা চৌধুরী অনেক কাঠ পুড়িয়েও
তার জামিন করাতে পারেন নি। ফলে রাতটুকু
এখানেই কাটাতে হয়েছে। আজকে দুপুরে নাকি

তাকে আদালতে তোলা হবে। সে অবশ্য জানত ছুটির দিন আদালত পুরোপুরি বন্ধ থাকে। কিন্তু গতরাতে জানল শুক্র-শনিবার বা সরকারি ছুটির দিন হলেও বিচারিক কার্যক্রম বন্ধ থাকে না। বরং এই কাজের জন্য প্রতি জেলায় একজন ডিউটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত থাকেন। পুলিশ আসামীকে সেই বিচারকের বাসভবনে অথবা আদালতের বিশেষ চেম্বারে হাজির করেন। সেই বিচারক তখন আসামীর অপরাধ অনুযায়ী প্রাপ্ত বয়স্ক হলে হাজতে আর ১৮ বছরের কম হলে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠানোর নির্দেশ দেন। তার ক্ষেত্রেও সেটাই করা হবে। এসব ভেবে চোখ বন্ধ করতেই শুদ্ধর মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। কালকে সাইনকে হসপিটালে পৌঁছানোর পর শারাবাত আর সাফওয়ান চৌধুরী আজমের থেকে পুরো ঘটনা জেনেছেন। উনারা প্রথমে ভেবেছিল এটা বিরোধীদল এর কাজ। রাজনীতিতে যে দু’দিন পর পর এমন কোপাকুপি হয় সেটাও জানেন। এমন কতদিন সাইন আহত হয়ে ফিরে এর জন্যই তো ছেলেকে বারণ করেন কিন্তু সে তো শোনার ছেলে না। কিন্তু মূল ঘটনা জানার পর যখন জানলেন এখানে শীতলের

নাম জড়িয়ে গেছে। শুধু জড়ায় নি সে পুলিশের হাতে
গ্রেফতার হয়ে বর্তমানে থানায়। একথা শুনে উনি
হতভম্ব হয়ে কয়েকপল তাকিয়ে ছিলেন। উনি কল্পনা
করতেও পারেন নি শীতল এমনকিছু ঘটতে পারে।
গতদিন শুদ্ধ আহত সায়নকে কোলে তুলে উঠে
দাঁড়াতেই উনারা পৌঁছেছিলেন। পিছনে বসা শীতলকে
নজরে আসে নি। আসত, যদি ছেলের রক্তাক্ত অবস্থা
দেখে নিজেরাও ঠিক থাকত। পাগল পাগল হয়ে
ছেলেকে নিয়ে না ছুটতেন। আরেকটা কলিজার
টুকরোও যে সেখানে ক্ষুণাক্ষরেও টের পান নি। কিন্তু
যখন শুনলেন সায়নকে ওটিতে ঢুকিয়ে সাফওয়ান
চৌধুরী, আজমসহ শুদ্ধর ফ্রেন্ডদেরকে ওখানে রেখে
শারায়াত চৌধুরী ছুটেছিলেন শীতলের কাছে। ওদিকে
টিভিতে ব্রেকিং নিউজ চলছে এই ঘটনা। শাহাদত
চৌধুরী মিটিং এ ছিলেন যখনই ঘটনা শুনলেন কলের
পর কল দিতে থাকলেন। মেয়ের অবস্থা জেনে
পাগলের মতো করতে লাগলেন। শারায়াত চৌধুরী
ভাইকে কোনোমতে বুঝিয়ে বুঝা দিলেও নিজে
সারারাস্তা কাঁদতে কাঁদতে থানায় পৌঁছেছেন। গিয়ে
দেখেন, শীতল বেঞ্চের উপর বসে আছে যেন কাঠের

পুতুল। মেয়েটার অবস্থা দেখে বুক কেঁপে উঠল। উনি মায়াভরা কণ্ঠে একবার ডাকলেন,-‘মা! আমার আন্মা।’
পরিচিত কণ্ঠ শুনে শীতল চোখ তুলে তাকাল। বড় আব্বুকে দেখে ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল। একটা শব্দ মুখ দিয়ে বের হওয়ার আগে চোখ দিয়ে অঝরে অশ্রু গড়াতে লাগল। একলা একা এখানে খুব অসহায় লাগছিল।

জীবনে কখনো এতটা অসহায় লাগে নি। লাগবে কিভাবে তাকে কখনো একা ছেড়েছে নাকি কেউ? আর না কখনো থানায় আসা হয়েছে। উনি দ্রুত গিয়ে শীতলকে বুক জড়িয়ে নিলেন। মমতামাথা হাত মাথায় রেখে বললেন,

-‘ভয় নেই মা। এই যে আমি এসে গেছি। তোমার ফুপিও এম্মুণিই চলে আসবে, মা। একটুপরই আমরা বাড়ি ফিরে যাব।’ শীতল ছোট। বয়স কম। তবে একেবারে অবুঝ নয়। সে জানে বড় আব্বু বুঝাতে এসব বলছে। কোনো খুনি গ্রেফতার হলে সাথে সাথে ছাড়া পায় না। তবে এ নিয়ে কিছু বলল না বড় আব্বুর কাঁধে মাথা রেখে বসে রইল।

মাথার ভেতর কিসব চিন্তা ঘুরঘুর করছে। বাবা কি জেনেছে তার কথা?

মা কি করছে? খবর শোনার পর ঠিক আছেন তো? আর আপু? আপুর কি খবর? সে যখন একা একা এসব ভাবছিল তখন শুদ্ধ আর শতরূপা এলো। পুলিশের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কিসব কথা বলল। ধারণা মতে, তাকে আদালতে তোলা হবে একথায় বলেছে পুলিশ। কনক যদি মারা না যেতো কিংবা নির্বাচনে না দাঁড়াত তাহলে রিস্ক নিয়ে হলেও শীতলকে ছাড়ত। কিন্তু যা ঘটেছে তাকে ছাড়া মানেই হাজারটা প্রশ্নের মুখে পড়া। তার উপরে মরার উপর ফাঁড়ার ঘায়ের মতো পেছনে পড়েছে মিডিয়া। সাংবাদিকরা ছোঁ পেতে আছে কখন শীতলকে বের করা হবে আর প্রশ্ন করা হবে। ঠিক একারণে স্বয়ং শাহাদত চৌধুরী কথা বললেও উনাকে সরি বলতে হয়েছে। কেননা বিরোধিদল নজর রাখছে জলঘোলা করার জন্য। এসব ছাপিয়ে ছাড়লে উনাদের চাকরি নিয়ে টানাটানি হয়ে যাবে। এভাবে আরো কিছুক্ষণ আলোচনা চালালেও কাজ হলো না। এদিকে রাত বাড়ছে দেখে একটা সময় তাদেরকে যেতে বলা

হলো। শীতল চুপ করে বসেছিল। তার কিছু বলার নেই, চাওয়ার নেই, আবদারও নেই।

এখন কান্নাকাটি করা বোকামি ছাড়া কিছু হবে না। শতরূপা শীতলের মনের অবস্থা বুঝে বুকে টেনে কপালে চুমু খেলেন। কত কি বলে অভয় দিলেন। ডাক্তার নাকি বলেছে সায়েন তাড়াতাড়িই ঠিক হয়ে যাবে, সেসব বললেন। শীতলও বুঝল ফুপি তার মানসিক চাপ কমানোর জন্য এসব বলছেন। শীতলের পোশাক বদলানো দরকার দেখে শুদ্ধর আনা ড্রেসটা পরল শীতল। তবে তাকে জোর করেও কেউ কিছু খাওয়াতে পারল না।

মুখেই নিলো না। তাকে খাওয়াতে গিয়ে শারায়ত চৌধুরী বারবার করে কেঁদে ফেললেন। আর সে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে শুদ্ধর মুখপানে তাকিয়ে ছিল। জামিন না হওয়াতে কেন জানি মানুষটার মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। চোখজোড়া লাল লাগছিল। যাওয়ার সময় মায়া নিয়ে বারবার ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছিল। একধাপ এগিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ছিল। কথা বলতে পারছিল না। কণ্ঠস্বর কাঁপছিল। অবস্থা

বুঝে শারাবাত চৌধুরী সামনে এগিয়ে গেলেন।

সুযোগ পেয়ে শীতল শুধু এইটুকু বলল,

-‘ফাঁসিতে ঝুলে গেলে গেলাম আফসোস রাখিয়েন না। যে একবার মৃত্যুর চোখে চোখ রেখেছে তাকে ফাঁসির দাঁড়ি আর কি ভয় দেখাবে?’

এইটুকু বলতে না বলতে একজন মহিলা পুলিশ এসে তাকে নিয়ে চলে।

শুদ্ধ দেখল নিয়ে যাওয়া। সঙ্গে নিয়ে যাওয়ারও ক্ষমতা নেই। যা ঘটেছে যত কষ্টই হোক মানতেই হবে।

এখন শুধু দেখার পালা তার ভাগ্য তাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায়। ওদিকে সময়ের সাথে সাথে সায়নের অবস্থা অবনতি হচ্ছে। তার পুরো শরীর কোপানো। রড দিয়ে মারার কারণ হাঁড়ে ফাটল ধরেছে। দুই হাঁটুর যা অবস্থা সহজে উঠে দাঁড়াতে পারবে কী না সন্দেহ। মাথাতেও গুরুতর আঘাত পেয়েছে। ধারালো ছুরি বসানোর ফলে গলার চামড়া কেটে তার শ্বাসনালীর একদম কাছে থেমেছে। আর এক চুল পরিমাণ নড়চড় হলেই এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যেতো প্রধান ধমনী। শুদ্ধরা থানা থেকে বেরিয়ে আবার ছুটেছে হসপিটালে। ব্যাগ ব্যাগ রক্ত লাগছে।

অর্ক, স্যাভি, হাসান কামরান যখন যা লাগছে ছুটে গিয়ে নিয়ে আসছে। আজম চৌধুরী বাড়ি গিয়ে বাড়ির মেয়েদের এনেছে। সিতারা স্বর্ণের কাঁধে মাথা রেখে নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে। স্বর্ণের মাঝে কোনো হেলদোল নেই। সে শুধু একমনে ওটির লাল লাইটের দিকে তাকিয়ে আছে। সে জানে, রাজনীতিতে এসব হয়। হবেই। তার বেহায়া পুরুষটা তাকে বারবার বুঝিয়েছে রাজনীতিতে এসব স্বাভাবিক। কখনো যদি আহত হয় ভুলেও যেন মরাকান্না না করে। সেও মেনে নিয়েছিল তার কথা তবে বলেও দিয়েছিল মার খাক, অসুস্থ হোক, তবে একেবারে পালানোর চেষ্টা যেন না করে। সে মানতে পারবে না, একদমই পারবে না। কারণ মাত্র এ কয়েক মাসের সংসারে মন ভরে নি। তার আরো সময় লাগবে। আরো ভালোবাসা লাগবে। আরো আদর লাগবে। সর্বপরি সর্বদা তাকে পাশে লাগবে। সে কি ভেবেছি, যে আসছে তার সব দায়িত্ব তাকে চাপিয়ে দিয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যাবে? এত সোজা? মানবে না, কোনোভাবেই মানবে না। তাকে জানতে হবে তাদের মাঝেও আরেকজন আসতে চলেছে। ওই উন্মাদ পুরুষটাকে কেউ বাবা ডাকার

জন্য চলে এসেছে। অনাগত প্রাণটার কোনো দোষ নেই তবে সে কেন বাবাকে পাবে না? কেন তার আগমনের কথা জানার আগেই কেউ পালিয়ে যাওয়ার পায়তারা এঁটেছে? বেহায়ার মতো করে ঠিকই বলতো, ‘জান রে, শুদ্ধ আমার আগে বাসর সেরেছে আমি ওর আগে বাবা হবো। এবার গো হারান হারাব ওকে, মিলিয়ে নিস।’ সেটাই হচ্ছে তবে পালানোর তাড়া কিসের? এসব নাহয় বাদই থাকল। কিন্তু তাদের কলিজার টুকরো বোনটা? চৌধুরী বাড়ির তোতাপাখিটা? সে তো খুনের দায় ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়েছে। পবিত্র দুই হাতে রক্তের দাগ লাগিয়েছে, তার কি হবে? বোনের কষ্টকে স্বার্থক করতে হবে না? এসব ভেবে স্বর্ণ উঠে দাঁড়াল। সারাদিনে বেশ কয়েকবার বমি করেছে। এখনও পেটের মধ্যে গুলিয়ে যাচ্ছে। সে ওয়াশরুমে গিয়ে বমি করতে লাগল। পেটে কিছু নেই খালি পেটে বমি করতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। মাথাটাও ঘুরছে। স্বর্ণ বেসিন ধরে নিজেকে সামলে নিলো। বেশ কিছুক্ষণ থম মেরে দাঁড়িয়ে থেকে চোখে, মুখে পানি দিয়ে বের হলো। বের হতেই দেখে শুদ্ধ একটুদূরে দাঁড়িয়ে আছে। তখনও থরথর

করে কাঁপছে সে। প্রেসার কি একেবারে নেমে গেল নাকি? এমন হচ্ছে কেন? সে বরাবরই শক্ত ধাঁচের। সহজে কষ্ট পায় না। তবে আজকে কেন উল্টো কিছু হচ্ছে? কেন দমটা আঁটকে আসছে? যখন দেয়াল ধরে এসব ভাবছিল হঠাৎ অনুভব করল কেউ তাকে স্নেহমাখা স্পর্শে আগলে নিয়েছে। নিভু নিভু চোখে শুদ্ধকে দেখে হাল ছেড়ে দিলো। শুদ্ধও স্বয়ত্তে বুকে আগলে নিলো বোনকে। শখের থেকে কম ভালোবাসে না স্বর্ণকে। তারপর শক্ত মেয়েটার কী হলো কে জানে এতদিন যা করে নি আচমকা সেটাই করে বসল। সে শুদ্ধর হাতটা কপালে ঠেকিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। তবে এ কান্নার শব্দ নাহলেও সেকেন্ডের মধ্যে শুদ্ধর হাত ভিজে গেল। তাকে এভাবে ভেঙে পড়তে দেখে বুকের ভেতর টা দুমড়ে-মুচড়ে গেল। তখন শুদ্ধ নরম সুরে বলল,
- ‘এই ঘটনা কি নতুন? এর আগেও কতবার আহত হয়েছে আবার সুস্থ হয়েও উঠেছে। এবারও হবে, ইনশাআল্লাহ।’
জবাবে স্বর্ণ অস্পষ্ট শুধু এইটুকু বলল,

-‘ তাকে থেকে যেতে বলো ভাইয়া। দ্রুত ফিরতে বলো। তাকে কিছু বলার আছে আমার। তার অনেক কিছু জানার আছে।’

এইটুকু বলতে বলতেই স্বর্ণ জ্ঞান হারাল। স্বর্ণের অবস্থা দেখে আরেকটা কেবিন নিয়ে স্বর্ণকে শুইয়ে ডাক্তার ডাকা হলো। প্রেসার মেপে একবারে লো দেখে স্যালাইন দেওয়া হলো। শুদ্ধ সিরাতকে স্বর্ণের কাছে বসিয়ে

রেখে ওটির সামনে গিয়ে দেখে কান্নাকাটি বেঁধে গেছে। ডাক্তার-নার্সরা ছুটাছুটি করছে। সায়নের অবস্থা আরো খারাপ। ডাক্তার অভিভাবককে ডাকলে শুদ্ধ নিজেই গেল ডাক্তারের চেম্বারে। কারণ শারায়াত চৌধুরীর প্রেসার বেড়ে গেছে অলরেডি। দরদর করে ঘামছেন। উনাকে টানাটানি করা আর ঠিক হবে না। শুদ্ধ ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে গেলে ডাক্তার বলল,-‘ইয়াং ম্যান মনকে শক্ত করো।’

-‘ স্যার, ভণিতা না করে যা বলার সরাসরি বলুন প্লিজ।’

-‘ পেশেন্ট ধীরে ধীরে রেসপন্স করা ছেড়ে দিচ্ছে। সরি টু সে.. পেশেন্টের

অবস্থা দেখে এইটুকুই বলতে পারি সে রিকোভারী
করবে না। নিজেদের মনকে শক্ত করো।’

-‘বাইরের দেশে...!’

-‘আয়ু না থাকলে পৃথিবীর যে প্রান্তেই ভাইকে নিয়ে
যাও কাজ হবে না।

তবে আমি বলব তাকে নিয়ে আর টানা হেঁচড়া না
করাই ভালো।’

শুদ্ধ আরো কিছু নিয়ে আলোচনা করে বেরিয়ে এলো।
তবে কাউকেই এ ব্যাপারে কিছু বলল না। নিজের
মধ্যে সংগোপনে এটাও চাপিয়ে রাখল। রাতটুকু
সেভাবেই কাটল। সকালবেলা শুদ্ধ মেয়েদেরকে বাড়ি
পাঠিয়ে দিলো। হাসপিটালে শুধু অর্ক, আজম আর শুদ্ধ
থাকল। ঘন্টা খানিক পর কামরান, হাসান আর স্যান্ডি
আসলে অর্ককে জোর করে পাঠানো হলো।

তবে আজম আর শুদ্ধ একচুলও নড়ল না। দু’জনই
ঠাঁই সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। আজ দুপুরে শীতলকে
আদালতে তোলা হবে। শুদ্ধকে যেতে হবে।

তাই বারবার সবাইকে সাবধানে থাকতে বলে দূর
থেকে একবার ভাইকে দেখে বাড়ির পথে রওনা
হলো। তার গায়ে এখনো ভাইয়ের রক্তমাখা টি শার্ট।

বাড়ি ফিরে ফ্রেশ হয়ে ছুটবে শীতলের কাছে। আজ সঙ্গে গাড়ি বা বাইক না থাকায় সিএনজি করে এলো। সায়নের পার্টি অফিসের সামনে ছেলেপুলেকে জটলা করে বসে থাকতে দেখে নামল। এ ছেলেগুলোকে কিছু বলা দরকার। তাকে দেখে ছেলেগুলোই দাঁড়িয়ে গেল। মলিন মুখে সালাম দিলো। শুদ্ধ ঠোঁটে মলিন হাসি এঁটে সালামের জবাব দিয়ে সবার উদ্দেশ্যে বলল,-‘ সব ঠিক হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ। সকালে নাস্তা করেছিলে তোমরা?’

-‘ না ভাই।’

-‘বলো কি? এখন বাজে সাড়ে এগারোটা।’

একথা বলে ওয়ালেট থেকে টাকা বের করে একজনের হাতে দিয়ে বলল সবাই মিলে নাস্তা করে নিতে। তারপর বলল,

-‘ নাস্তা করে গায়ে জোর বাড়াও জরুরি কাজ সারতে হবে তো নাকি।’

-‘ কি কাজ ভাই?’

-‘ পরে বলব। তবে যে কাজ দিবো করতে পারলে জন প্রতি একটা করে টাকিলা। আদারস্ অপশনও আছে।’

-‘আমরা প্রস্তুত ভাই।’ শুদ্ধ মৃদু হাসল। তারপর সময় দেখে তাদেরকেও সাবধানে থাকলে বলে রাস্তা পার হলো। রাস্তার ওপাশে রবি একটা ঘর তুলেছে। সেটা বর্তমানে তার অফিস। রবির আপাতত কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই দেখে তার মুখের হাসি সরছেই না। কনক তিন হাত মাটির নিচে আর সায়নের যা অবস্থা আশা করা যাচ্ছে, খুব তাড়াতাড়িই তার জানাজায় শরিক হতে হবে। এ কনকটা এমন দুষ্ট সায়নকে জবাই করতে নাকি গলায় ছুরি চালিয়েছে। সায়ন আগে যেমন অন্যের গলায় ছুরি চালাত ঠিক সেভাবে। ভালোই হয়েছে, সব আপদগুলো একসাথে বিদায় হয়েছে। এই খুশিতে সায়নের পার্টি অফিস ভাঙার প্ল্যান করে ফেলেছে। কিন্তু সায়নের দলের ছেলেরা ওখান থেকে একধাপ সরছে না। আজম নেই এই সুযোগ ভেঙে ফেলার। এসব নিয়ে আলোচনা করতে করতে খেয়াল করল শুদ্ধ হেঁটে কোথাও থেকে ফিরছে। থানার পুলিশের থেকে জেনেছে শীতলেন জামিন হয় নি। আজ আদালতে তুলবে একথা শুনে তো তাদের খুশি দ্বিগুন হয়ে গেছে।

মেয়েটাকে আলাভোলা ভাবত কিন্তু যেই খেল দেখাল
তাতে তার লাভও হয়েছে। তবে এখন একটু মজা
নেওয়া যায়। বিপদে পড়া শত্রুকে এমন হাবুডুবু
খেতে দেখে কার না ভালো লাগে? নিজেরা নিজেরা
এসব নিয়ে আলোচনা করে শুদ্ধকে শুনিয়ে শীতলকে
ইঙ্গিত করে সাউন্ড বক্সে গান ছেড়ে দিলো। রবির
দলের ছেলেপুলেরা নিজেরাও গলা মিলিয়ে গাইতে
শুরু করল,বাংলা সিনেমায় নাকি ধুম পড়েছে
আহামরি সুন্দরি এক নায়িকা এসেছে।

কোমরের দোলায় নাকি সাগরেরই ঢেউ
দেখেছিস নাকি ওরে তোদের মাঝে কেও?

চল যাই, চল যাই ,বাংলা সিনেমা দেখি
সিনেমারই নাম নাকি পরাণ পাখি।

শুদ্ধ দাঁড়িয়ে গেল। বুঝতে বাকি রইল না রবির
খোঁচাটা। তবে পিছনে তাকিয়ে দেখার প্রয়োজন মনে
করল না। সব হিসাব পাই টু পাই বুঝিয়ে দেওয়া
হবে। শুধু খারাপ পরিস্থিতি সামলে উঠুক, তারপর
নাহয় বাংলা সিনেমা দেখার মজা রাজকীয় ভাবে
সেলিব্রেট করা যাবে।দুপুর ২:৩০ মিনিট।

জুম্মার নামাজ শেষ। শীতলের বয়স যেহেতু কম তাই তাকে সরাসরি আনা হয়েছে শিশু আদালতে। যেটা সাধারণ আদালতের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানকার পরিবেশ এমনভাবে তৈরি করা যাতে শিশু কিংবা কিশোর ঘাবড়ে না যায়। ভয়ে নিজেকে অপরাধী অনুভব না করে। তাতে তারা মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়ে। মূলত তাদের কথা চিন্তা করেই এভাবে সাজানো। শীতল এসে দোতলার করিডোর রাখা একটা বেঞ্চের উপর বসে আছে। উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রাঁধাচূড়া গাছের একটি ডালে। সেই গাছে একটি কাকের বাসা দেখা যাচ্ছে। বাসায় দুটো ছানা। একটুপরে একটি কাক এসে বাচ্চাদের মুখে মুখ দিয়ে আহার করাতে লাগল। কিছু একটা মুখে নিয়ে দুটো ছানার মুখে দিচ্ছে। বাচ্চা দুটো খাচ্ছে। নিচুস্বরে ডাকছে নিজ স্বরে। তখন আরেকটা কাক এসে মুখে করে আরেকটা ফল বাসায় রেখে চলে গেল। এই কাকটি কি ছানাদের বাবা? মা খাওয়াচ্ছে, বাচ্চারা খাচ্ছে আর বাবা খাবার যোগান দিচ্ছে। দৃশ্যটুকু দেখে শীতলের বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠল। চোখের কোণা আপনাআপনিই ভিজে উঠল।

সে ঝটপট মুখ ফিরিয়ে নিল। বাবা-মায়েরা বোধহয় এমনই হয়। সন্তান যেমন হোক বুকে আগলে রাখার ক্ষমতা শুধুমাত্র বাবা-মায়েরই আছে। বলতে লজ্জা নেই, সেও ভীষণ মিস করছে বাবা-মাকে, তার পরিবারকে।

ইচ্ছে করছে মায়ের বুকের ভেতর গুঁটিয়ে যেতে। কিন্তু মা আসে নি কেন জানে না। সে আশেপাশে আরেকবার খুঁজেও পেল না। তার মা এতটাও পাষণ না। যতই মারুক, বকুক, গালি দিক পরে ঠিক আগলে নেয়। তবে কি তার মা মুখ ফিরিয়ে নিলো? নাকি অন্যকিছু? বোন ঠিক আছে তো?

এসব ভেবে শীতল ভেতর ভেতর অস্থির হলেও কোনো জবাব পেল না।

তবে জানতে হলে শতরূপা কিংবা শুদ্ধর সঙ্গে আগে কথা বলতে হবে। সে আসার আগে শুদ্ধ আর শতরূপা এসেছে এখানে। চোখাচোখি হলেও কথা হয় নি তাদের সাথে। আদালত চত্বরের এক কোণে তারা নিচু স্বরে কী নিয়ে যেন আলোচনা করছে। দুজন উকিল কাগজ খুলে কিসব যেন দেখাচ্ছে। সে অবশ্য এই মুহূর্তে একজনের অপেক্ষায় পথ চেয়ে আছে,

সেটা হলো তার বাবা। বাবার সাথে তার কথা হয়
নি। বাবা এই ঘটনা কি

শুনেছে? শুনলে আসছে না কেন? শীতল যখন মনে
মনে এসব ভাবছিল

তখন দূর থেকে শুদ্ধ একবার শীতলের দিকে
তাকাল। একবার না বার বার তাকিয়ে নজর
রাখছিল। শীতলের অস্থিরভাব খুব ভালোভাবে তার
নজরে পড়ল। উকিলের সাথে কথা সেরে গেল
দায়িত্বরত এসআই-এর দিকে। উনাকে কিছু বলায়
শীতলের দিকে একবার তাকিয়ে কেবল মৃদু মাথা
নাড়ালেন। মাথা নাড়ানো মানে শীতলের সঙ্গে
আলাদাভাবে কথা সেরে নিতে পারে। অনুমতি পেয়ে
শুদ্ধ ধীরপায়ে শীতলের কাছে এলো। বেঞ্চে বসা
প্রিয়শীর পাশে নিজেও বসল। শুকনো মুখটার দিকে
কেবল তাকিয়ে নরম সুরে সালাম দিলো,-‘আসসালামু
আলাইকুম মিসেস শোয়াইব। কেমন আছেন?’

শীতলও কয়েকপল প্রিয় মুখটার দিকে তাকিয়ে
সালামের জবাব দিলো।

তবে বলা হলো না কেমন আছে। শুদ্ধর নির্ঘুম চোখ
দেখে নরম সুরে প্রশ্ন করল,

-‘দুপুরে খেয়েছেন?’

-‘হুম।’

-‘ভাইয়া কেমন আছে?’

-‘ ভালো আছে। দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।’ কথা বলতে বলতে শুদ্ধ পকেট থেকে ফোন বের করে একবার চারপাশ দেখে নিল। যদিও পুলিশের অনুমতি নেওয়া আছে তবে সময় খুব অল্প। সে ফোন কান থেকে নামিয়ে খুব নিচু স্বরে বলল, ‘কথা বলো।’ শীতল কাঁপা কাঁপা হাতে ফোনটা কানে ধরল। ওপাশ থেকে একটা খুব পরিচিত মমতামাখা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো,

-‘শীতল? আম্মু আমার?’

বাবার কণ্ঠ শোনা মাত্রই পাথর হয়ে থাকা বুকের ভেতরটা আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে পড়ল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে কোনোমতে কান্না আটকানোর আগ্রাণ চেষ্টা করল। ধরা গলায় অনেক কষ্টে উচ্চারণ করল, ‘বা..বাবা।’

শাহাদত চৌধুরী কান থেকে ফোন সরিয়ে পরপর ঢোক গিললেন। ভেজা চোখ দুটো দুই আঙ্গুলের সাহায্যে চেপে ধরে বললেন,-‘কাঁদে না মা। তুমি না

আমার সাহসী মেয়ে? আমি তো জানি, আমার
আম্মাজান সহজে ভেঙে পড়ে না। আমি সব সময়
তোমার পাশে আছি মা। কখনো ভাববে না তুমি
একা। পুরো পৃথিবী মুখ ফিরিয়ে নিলেও বাবা সব
সময় তোমার সঙ্গে আছি।’

-‘(....)’

-‘ তুমি যা করেছো, সেটা করার কলিজা সবার থাকে
না। জীবনে বাঁচতে গেলে কতরকম পরীক্ষা দিতে
হয়। ধরে নাও এটাও একটা পরীক্ষা। সব পরীক্ষায়
ভালো ফল পেতে আগে ধৈর্য্য ধরতে হয়। তুমি ধৈর্য্য
ধরো মা।

খবরদার ভেঙে পড়বে না। ভীতুরা যুদ্ধের মাঠে গিয়ে
যুদ্ধ করার আগেই হার মেনে নেয়। জীবন হচ্ছে
তেমনই যুদ্ধক্ষেত্র। তুমি হচ্ছেো একজন বীর সৈনিক।
সত্য হচ্ছে তোমার অস্ত্র। বীর, অটল, অনল থাকো
সত্য তোমার কাছে মাথা নোয়াবেই। সব বিপদ কেটে
যাবে। এইটুকু মনে রাখবে, আই এম প্রাউড অফ
ইউ, মা! রিয়েলে প্রাউড অফ ইউ।’বাবার কথাগুলো
শীতলের মনে ম্যাজিকের মতো কাজ করল। সাহস
জোগাল। টিভিতে দেখা আদালত আর আদালতে

এসে বসে থাকা দুটো ভিন্ন জিনিস। ভিন্ন অভিজ্ঞতা।
সে ফোনটা একটু শক্ত করে ধরে কম্পিত সুরে
ফিসফিসিয়ে বলল,

-‘বাবা এসো, একটু তাড়াতাড়ি এসো প্লিজ।’

-‘আসব মা। আগামীকালই দেশে ফিরব আমি। তুমি
কিন্তু ভয় পাবে না। আমার মেয়ে ভয় পেয়ে গুঁটিয়ে
গেলে এটা আমার জন্য মেনে নেওয়া কষ্টকর হবে।
বাবা আছি, সবসময় তোমার পাশে আছি মা।’

সময় যেহেতু কম তাই শাহাদত চৌধুরী দ্রুত কথা
শেষ করলেন। শীতল শুদ্ধকে ফোনটা ফিরিয়ে দিলো।
শুদ্ধ শীতলকে উঠিয়ে পিলারের পেছনে দাঁড়াল।
দায়িত্বরত পুলিশ দেখেও কিছু বলল না। বরং বুঝল
কিছু তাই

দৃষ্টি সরিয়ে নিলো। শুদ্ধ শীতলকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে
কপালে চুমু ঐঁকে বলল,-‘ চোখে পানি কেন? বলেছি
না, যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ ভয় নেই।’

শীতলের চোখের কোণা বেয়ে অঝরে জল গড়িয়ে
গেল। কেঁপে উঠল ওষ্ঠজোড়া। ভেজাসুরে বলল,

-‘খান নি কেন আপনি? কি ভেবেছেন আপনার মিথ্যে
আমি ধরতে পারব না?’

শুদ্ধ মৃদু হাসল। যত্ন করে চোখজোড়া মুছে দিলো।
কি করে বোঝাবে যে গলা দিয়ে কিছুতেই খাবার
নামবে না। সম্ভবই না! সে প্রসঙ্গ চেঞ্জ করতে বলল,
-‘গিয়ে খাব। এবার আমি কিছু কথা বলি ম্যাম, একটু
মন দিয়ে শুনুন?’

-‘হুম।’-‘এখন আমাদেরকে ভেতরে যেতে হবে।
ভেতরে একজন ম্যাজিস্ট্রেট থাকবে। উনাকে দেখে
ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই। মনে করবে স্কুল/কলেজে
যেমন বড় স্যাররা মৌখিক পরীক্ষা নেন, এটাও
তেমনই একটা পরীক্ষা। তাড়াহুড়োর দরকার নেই।
ধীরে ধীরে কথা বলবে। ভয় লাগলে বুক ভরে একটা
লম্বা শ্বাস নেবে।’

এইটুকু বলে শুদ্ধ থামল। শীতলের চুলগুলো একটু
গুছিয়ে দিয়ে আবার বলল,

-‘সত্যি বলতে ভয় নেই। সত্য বললে মানুষের বুক
কাঁপে না। শুধু মনে রেখো, তুমি যা করেছ তোমার
ভাইকে বাঁচানোর জন্যই করেছ। উনি যা জিজ্ঞেস
করবে এক কথায় উত্তর দেবে। বেশি কথা বললে
মানুষ খেই হারিয়ে ফেলে। ওখানে নানান প্রশ্ন উঠবে
এমনও হতে পারে আমাকে নিয়ে কথা উঠতে পারে।

আমাদের বিয়ে নিয়ে কথা হতে পারে। চুপ করে শুনবে। যেটাই বলুক রেগে তর্ক করা যাবে না। সব জায়গায় রাগ/জেদ দেখাতে নেই। আর হ্যাঁ, ওখানে গিয়ে ভুলেও কাঁদবে না। আবেগ নিজের একান্ত ব্যক্তিগত এটা সবাইকে দেখাতে নেই। দেখালে দুর্বল ভাববে। যা বলবে বিনয়ের সাথে মাথা উঁচু করে দৃঢ় স্বরে বলবে। তাহলে উনি ভাববে যা বলছ, সত্যি বলছ। সত্যের স্বর সবসময় উঁচু হয়।’-‘আপনি থাকবেন না?’

-‘থাকব। শুধু আমি না আমাদের পুরো পরিবার তোমার সাথে আছে। স্বর্ণ একটু অসুস্থ, আম্মুর প্রেসার বেড়েছে তাই মেজো মা, ছোটো মাকে বাড়িতে রেখে এসেছি। বাবা আর মেজো চাচ্চু হসপিটালে তাই আসতে পারে নি। অর্করা বারবার ফোন করে খোঁজ নিচ্ছে। আজম তোমার জন্য দোয়া পাঠিয়েছে। ওরা স্বশরীরে আসতে পারছে না কারণ এখানে বেশি মানুষ এলাও করবে না। তারা কেন আসে নি এটা ভেবে ভুলেও কষ্ট পেও না।’

শুদ্ধ নিজের কথা শেষ করে শীতলের ঘামার্ত মুখটা মুছে দিলো। মাথার ওড়না টেনে দিতেই পুলিশের

গলা খাঁকারি দিয়ে বুঝল সময় শেষ। শুদ্ধ পুলিশ সদস্যের ইশারায় শীতলকে নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কামরায় প্রবেশ করল। শীতল চোখ বুলিয়ে নিলো। দোতলার একদম কোণের কক্ষটি ম্যাজিস্ট্রেটের খাস কামরা। ছুটির দিন বিধায় করিডোরগুলোতে ভিড় নেই। তবে ম্যাজিস্ট্রেটের কক্ষের সামনে পুলিশের কড়া পাহারা। ঘরের ভেতরটা বেশ ছিমছাম তবে গাম্ভীর্যে ভরা। রুমের মাঝখানে বিশাল এক মেহগনি কাঠের টেবিল। টেবিলে ওপর সারিবদ্ধভাবে সাজানো ফাইল,অন্যপাশে পেন হোল্ডার এবং একটি কাঁচের পেপারওয়েট। টেবিলের ঠিক ওপরে বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক সংবলিত ছোট ডেস্কটপ ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ড। দেয়ালের এক পাশে সারিবদ্ধ বুকশেলফ, যেখানে মোটা মোটা আইনের বই। এককোণে থাকা বড় জানালার এক পাল্লা খোলা। সেখান থেকে বাইরের রাঁধাচূড়া গাছের একটি ডাল দেখা যাচ্ছে। দেয়াল জুড়ে টাঙানো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বর্তমান রাষ্ট্রপতির ছবি। সে আরেকটা জিনিস খেয়াল করল, সাধারণ আদালতের মতো এখানে উঁচু কাঠগড়া, বড় ডক বা বিচারকের জন্য উঁচু আসন

নেই। ম্যাজিস্ট্রেটের বড় রিভলভিং চেয়ারটির ঠিক উল্টো পাশে তিনটি কাঠের চেয়ার। এক পাশে ছোট একটি সোফা রাখা সম্ভবত আগত বিশেষ অতিথিদের জন্য।

সে একনজরে এসব দেখে টেবিলের ওপাশে থাকা ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে তাকাল। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় কিছু একটা লিখছিলেন। কারো উপস্থিতি অনুভব করে কলমটি রেখে চশমা খুলে টেবিলের ওপর রাখলেন। ঠোঁটে হাসি এঁটে বললেন,- ‘আজকের অতিথি তো দেখতে ভীষণ মিষ্টি। নাম কী তোমার?’

একদম সাবলীলভাবে কথা শুরু করলেন উনি। যাতে মেয়েটা ঘাবড়ে না যায়। যদিও এটা একটা কৌশল। কৌশল জানলে সামনের মানুষকে খুব সহজে বশে আনা যায়। খুব সহজে পেটের কথা বের করা যায়। বাচ্চারা তো এটাতেই কারু। মেয়েটার বয়স কম আইনের চোখে এখনো বাচ্চাই।

উনার কথার প্রেক্ষিতে শীতল সালাম দিয়ে বিনয়ীসুরে জবাব দিলো,

- ‘আমার নাম সুবহানা চৌধুরী শীতল।’

-‘ভীষণ সুন্দর না। পড়াশোনা করো?’

-‘জি স্যার।’উনি এভাবে আরো দু’একটা কথা বললেন যাতে শীতল সহজ হয়। বুঝে যে এখানে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এরপর ধীরে ধীরে কথা তুললেন,

-‘শীতল, মা কাকটা যখন তার বাচ্চাদের মুখে খাবার তুলে দিচ্ছিল, তখন তোমার কেমন লাগছিল? তুমি অনেকক্ষণ ধরে ওটা দেখছিলে, তাই না?’

শীতল অবাক হয়ে তাকাল। উনি জানল কিভাবে? তখন তো করিডর ফাঁকা ছিল। তবে বুঝতে বাকি রইল এখানে সবকিছু তীক্ষ্ণ নজরে নোট করা হয়। তাই সে নিচু স্বরে বলল,

-‘ভালো লেগেছে। মা তো এমনই হয়।’-‘ঠিক বলেছো। আচ্ছা মা, তুমি কি জানো তোমার মা আজকে কেন আসতে পারেনি? উনি খুব অসুস্থ। কেন জানো? কারণ মা তোমাকে খুব ভালোবাসে। আর এই ভালোবাসার মানুষগুলোর যখন বিপদ হয়, তখন আমরা শান্ত থাকতে পারি না। তখন আমরা ঝোঁকের বশে অনেক কঠিন কাজ করে ফেলি না?’

শীতল ক্যাচ করল উনার কথা। স্পষ্টও হলো উনি ইমোশনকে তীরবিদ্ধ করতে চাচ্ছে। যাতে আবেগী হয়ে ওঠে সে। অথচ শুদ্ধ বলেছে তার মা অসুস্থ নয় বরং বোন অসুস্থ বিধায় আসতে পারে নি। বোনটা প্রেগনেন্ট অসুস্থ হওয়া স্বাভাবিক। শুদ্ধর কথামতো সে ছোট করে উত্তর দিলো,

-‘জি।’

-‘শীতল, আমি মানলাম তুমি তোমার ভাইকে খুব ভালোবাসো। আচ্ছা, যখন ওই ভয়ঙ্কর মুহূর্তটা এসেছিল, তখন তোমার কি একবারও নিজের কথা মনে হয় নি? এখন যা পরিস্থিতি তোমার ভাইটা বেঁচে গেলেও তুমি

তো ফেঁসে যাবে। আফসোস হচ্ছে না?’- “না স্যার। তখন শুধু মনে হচ্ছিল, আমার ভাইয়াকে বাঁচাতে হবে। ওই মুহূর্তে আমার কাছে আমার ভাইয়ার চেয়ে বড় আর কিছু ছিল না। আর আমার ভাই যদি বেঁচে যায় আর আমার যদি জেল হয়, তাহলেও আমি খুশি।’

-‘কেন? তোমার কি ভালো থাকার ইচ্ছে নেই। পড়াশোনা করে নামডাক করতে চাও না? তোমার

বাবা একজন সম্মানিত ব্যক্তি উনার মেয়ে খুনি, এটা কি একজন বাবার কাছে ভালো কিছু হতে পারে?’

-‘আমার বাবার শিক্ষা পরিস্থিতি বুঝে পদক্ষেপ নেওয়া। আমি শুধু তাই করেছি স্যার।’ বিচারক খুব সাধারণ প্রশ্ন করছে কিন্তু প্রশ্নের ওজন অনেক বেশি। তবে শীতলও চেষ্টা করছে গুছিয়ে উত্তর দেওয়ার। শুদ্ধ শুধু দেখে যাচ্ছে তার ব্যাঙাটির চেষ্টা। সে জানত, সে যেটা বলবে শীতল অক্ষরে অক্ষরে সেটা পালন করবে। যখন সরাসরি বিচারক কথা বলেন তখন উকিলদের কিছু বলার থাকে না। তাই উনারা আপাতত নিশ্চুপ। বিচারক এবার নড়েচড়ে বসলেন। বুঝলেন মেয়েটা শক্ত আছে তাই পরের তীরটা ছুঁড়লেন,

-‘শীতল, তোমার ভাইকে বাঁচানোর আবেগটা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু ওই মুহূর্তে তোমার হাতে একটা ‘টিজার’ ছিল। ওই যন্ত্রটা সাধারণ কোনো কিশোরীর কাছে থাকার কথা নয়। ওটা কোথায় পেলো? ওটা কি আগে থেকেই তোমার কাছে ছিল? কে দিয়েছিল?’ শীতল জানত এই প্রশ্নটা আসবেই। তবে তাড়াহুড়ায়

উত্তর দিলো না চুপ রইল দেখে বিচারক আবার বললেন,

-‘ওটা কি সায়নের ছিল নাকি তুমি নিজের নিরাপত্তার জন্য ওটা সংগ্রহ করেছিলে? আর সেটার ব্যবহার করার সাহস বা কৌশল কোথায় থেকে শিখলে?’

শীতল বুঝতে পারল যার নাম নিবে তার ওপরে আইনি ঝামেলা বাড়তে পারে। তাই সে পরিস্কার গলায় বলল,

-‘না স্যার, ওটা সায়ন ভাইয়ার ছিল না। ওটা আমি ওদিন রাস্তায় পড়ে পেয়েছিলাম।’

বিচারক ঞ্চ কুঁচকে তাকিয়ে এবার একটু কড়া গলায় বললেন,

-‘রাস্তায় পড়ে পেয়েছিলে? এটা কি কোনো খেলনা যে রাস্তায় পড়ে থাকবে? আর তুমি জানলে কীভাবে ওটা কী জিনিস? কীভাবে ব্যবহার করতে হয়?’-‘একদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে একটা প্যাকেট পড়ে পেয়েছিলাম।

কৌতূহল থেকে ওটা বাসায় নিয়ে আসি। প্রথমে বুঝতে পারিনি ওটা কী,

পরে ইউটিউবে সার্চ দিয়ে জানতে পারি এটা একটা ইলেকট্রিক টিজার।

ওটা কীভাবে অন করতে হয়, কীভাবে প্রয়োগ করে, ইন্টারনেটে ভিডিও দেখে শিখে নিয়েছিলাম।

আজকাল আমরা মেয়েরা কোথাও সেভ না তাই ভেবেছিলাম এটাকে কাজে লাগাব কারণ দিনশেষে আমিও মেয়ে। আমারও একা চলতে ফিরতে হয়।

তবে লুকিয়ে রাখতাম কারণ বাড়ির কেউ জানলে কেড়ে ফেলে দিত।'এভাবে আরো দুএকটা কথা

হলো।একপর্যায়ে পুলিশ কেস তদন্তের জন্য জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি চাইল। শীতল যেহেতু

অপ্রাপ্তবয়স্ক লক-আপে একা জিজ্ঞাসাবাদের পারমিশন নেই। তবে তদন্তের স্বার্থে একজনপুলিশ

অফিসার ও প্রবেশন অফিসার উন্নয়ন কেন্দ্রে গিয়ে শীতলের সাথে কথা বলতে পারবে। এবং ঘোষণা

দিলেন পরের শুনানিতে তদন্তের অগ্রগতি দেখে কেস এগোবে। ততদিন শীতলকে রাখা হবে গাজীপুরের

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে। কেন্দ্রটি মূলত কোনো জেলেখানা নয় বরং এটি সরকারি আবাসিক

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মিশ্রণ। আইনের ভাষায় এটাকে

এখন ‘শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র’ বলা হয়। অতঃপর
বিচারকের নির্দেশ অনুযায়ী শীতলকে গাজীপুরের
কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।_ ‘সিদ্দিক
ভাই সায়নের বইনের জামিন হই নাই?’

ঠোঁটে ধরা সিগারেটে পরপর কয়েক টান দিয়ে হাসল
সিদ্দিক। বারবার সায়নকে বলেছিল বাড়াবাড়ি না
করতে। কিন্তু ছেলেটা কথা শুনলই না।

ভাইয়ের কথায় দল আলাদা করল। নির্বাচনে দাঁড়াল।
তার ভাই শুদ্ধও কৌশলে তাকে দল থেকে বহিঃস্কার
করে ছাড়ল। কি ভেবেছে শুদ্ধ সে জানতে পারবে না?
ভাইকেই শুধু রাজনীতির মাঠে একা রাজ করাবে?

এত সোজা? আর সায়নের এত জোর কেন? কারণ
তার পাশে তার ভাই আছে। বাজপাখির মতো নজর
রাখে সায়নের প্রতিটা পদক্ষেপে। নয়তো সায়নের
আজ যা অবস্থা এটা আরো আগে হওয়ার কথা ছিল।

শুধুমাত্র

শুদ্ধ , শাহাদত চৌধুরী তার সায়নের চালাক বউটা
তার চারপাশে শক্ত একটা বলয় তৈরি করে
রেখেছিল। সায়ন কখনোই লোক নিয়ে ঘুরাঘুরি পছন্দ
করে না তাই কৌশলে সায়নের দলের মধ্যে শুদ্ধর

ঠিক করা কিছু লোক ঢুকিয়েছিল। সে কখন কোথায় যায়, কি করে, সব খবরই তাদের কাছে থাকে। নতুবা তারা টের পেত না সায়নের মাথার উপরে মরণ ফাঁদ প্রস্তুত। তারা আন্দাজ করেছিল বলেই নির্বাচনের বাহানায় শুদ্ধকে পার্টি অফিসে দেখা যেত। প্রায়ই সময় ভাইয়ের সঙ্গে লেপ্টে থাকত। নতুবা সে দূর থেকে ধূর্ত চাল চালালেও খুব একটা পার্টি অফিসে আসত না। যাতে কেউ টের না পায় এসবের মধ্যে সে জড়িত। তবে এটা বলতে বাধ্য শুদ্ধ

ভাইকে সত্যিই ভালোবাসে। ভাইয়ের ভালো চায় বলে এসব করে নাহলে তার যা মেধা এসবে কেন জড়াবে? ইগরের থেকেও শুনেছে শুদ্ধ নাকি খুব মেধাবী। বর্তমানে সে যেসব রিসার্চ করছে যদি নিজের লক্ষ্যে স্থির থাকতে পারে তাহলে দেশ না বিশ্বব্যাপী তার গুনে সবাই তাকে চিনবে।

ছেলেটা কেন যে নিজের ভালো না বুঝে শুধু শুধু এসবে জড়াচ্ছে কে জানে? তবে চিন্তা নেই, তাকেও টপকানোর বিশেষ এক প্রস্তুতি চলছে। তিনদিন পরের ঘটনা,

আদালতের রায় অনুযায়ী শীতল আছে কিশোর
উন্নয়ন কেন্দ্রে। এখানে এখানকার রুটিন মাসিক
চলতে হচ্ছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এখানে আসার
পর কেউ তাকে দেখতে আসে নি। সম্ভবত সপ্তাহে
একদিন দেখা করার সুযোগ দেয়। এখানে আসার
তিনদিন পার হয়েছে কেবল আরো চারদিন অপেক্ষা
করতে হবে। তবে প্রয়োজনীয় সবকিছুই পেয়ে
গেছে। শুধু সায়নের কোনো খবর পায় নি। অথচ এই
খবরটুকু পাওয়ার জন্যই চাতক পাখির মতো অপেক্ষা
করছে। আজ সকাল থেকে কেন জানি মন কু-
ডাকছে। বারবার মনে হচ্ছে খারাপ কিছু একটা হবে।
সে বারবার মন শক্ত করে নিজেকে শাসাচ্ছে কিছু
হবে না। সারাদিন কাটলেও বিকেলে
তাকে ডেকে একটা গাড়িতে তোলা হলো। কেস
শুনানির ডেট নেই, তবে কোথায় যাচ্ছে? সে কিছুক্ষণ
চুপ থেকে গাড়ি বাড়ির পথে যাচ্ছে দেখে বিষ্ময় নিয়ে
বলল,-‘আমরা কোথায় যাচ্ছি?’
তার পাশে বসা সিভিল ড্রেসের পুলিশ মহিলাটি ভীষণ
বদমেজাজি।

সামান্য একটা কথা বলাতেও খুব বিরক্ত হলো। তবুও
খ্যাক খ্যাক করে বলল,

-‘তোমার বাড়িতে।’

বাড়ির কথা শুনে শীতল আরেকদফা অবাক হয়ে
জিজ্ঞাসা করল,

-‘আমার কি জামিন হয়ে গেছে?’

এবার মহিলা পুলিশটির বিরক্তির মাত্রা দ্বিগুন হলো।
দাঁতে দাঁত পিষে জবাব দিলো,

-‘তোমার কে যেন মরেছে। লাশের মুখ দেখে চলে
আসবে। সময় মাত্র আধাঘন্টা। খবরদার বলছি,
আসার সময় কোনোরকম নাটক করবে না।’

এইটুকু বলে পুনরায় বিরবির করলেন,-‘জনে জনে
মরবে আর আমাদের হয়েছে যত জ্বালা। তাকে নিয়ে
চলো রে। মরাকান্না দেখ রে। এসব দেখতে দেখতে
জীবনের অর্ধেকটা গেল।’

উনার একটি বাক্যতে শীতলের পুরো পৃথিবী যেন
দুলে উঠল। ‘কে যেন মরেছে’ এই কথাটা তার মাথায়
গেঁথে গেল। চোখের সামনে ভেসে উঠল ভাইয়ের
রক্তাক্ত মুখ। ভাইয়া কি তবে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়েই
দিল? শুধু

তাকে বাঁচাতে গিয়ে খুনি হলো আর সেই ভাই তাকে
ছেড়েই চলে গেল? এ কষ্ট মানবে কিভাবে সে?
কিভাবে সহ্য করবে? সে আর ভাবতে পারল না স্থির
হয়ে বসে রইল। নীরবে গাল বেয়ে অঝরে অশ্রু
গড়াতে লাগল।

এগুলো কোন পাপের শাস্তি পাচ্ছে সে? কেন তার
বেলাতেই সময় নিষ্ঠুর রূপ দেখাচ্ছে? গাড়িটা যখন
চৌধুরী বাড়ির গেটে থামল তখন বাড়িভর্তি মানুষ।
চারদিকে চাপা গুঞ্জন। পুলিশের সঙ্গে নামল শীতল।
তার হাতে হ্যান্ডকাপ পরানোর নিয়ম না থাকলেও
পরানো হলো। গতসপ্তাহে এক মেয়ের বোন মারা
যাওয়াতে দেখতে নিয়ে গিয়েছিল। পরে সুযোগ বুঝে
মেয়েটা পালিয়েছিল আর বাড়ির লোক তাকে লুকিয়ে
রেখেছিল। পরে অনেক কষ্টে তাকে খুঁজে বের
করেছিল। এই রিস্ক নেওয়া যাবে না দেখে মূলত
হ্যান্ডকাপ পরানো হয়েছে। বাগানের মাঝখানে সাদা
কাপড়ে ঢাকা একটি খাটিয়া রাখা। সিতারা বেগমের
চাপা কান্না ভেসে আসছে। শীতল ভিড় ঠেলে এগিয়ে
গেল। তার পা যেন আর চলছে না। প্রতিটি পদক্ষেপে

যেন কেউ বুকের ভেতর ছুরি চালাচ্ছে। সাদা কাপড়ের কাছে পৌঁছে সে হাঁটু গেড়ে বসল। পুরো শরীর কাঁপছে থরথর করে। বাড়ির ভেতর খবর চলে গেছে শীতল এসেছে। খবর পেতেই শখ দৌড়ে এসে তাকে জড়িয়ে নিলো বুক। সাম্য, সৃজন, ঐশ্বর্যও জড়িয়ে ধরল। কি করুণ সুরে কাঁদছে তারা। ওদের কান্নার শব্দে চারপাশ যেন থমকে গেছে। শারায়াত চৌধুরী, সাফওয়ান চৌধুরী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। নীরবে কেঁদে যাচ্ছে। স্বর্ণকে দেখা গেল দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে পাথর হয়ে বসে আছে। তার দেহে যেন প্রাণ নেই। তার সমস্ত শক্তি টুকু কেউ যেন শুয়ে নিয়েছে। সে বোনের দিক থেকে সরিয়ে তাকাল খাটিয়ার দিকে। ভাইয়াকে জিজ্ঞাসা করবে, কেন ফাঁকি দিল? পরিস্থিতি যা ছিল সে পারে নি ভাইকে আঘাত পাওয়া থেকে বাঁচাতে, তাই বলে সবাইকে ছেড়ে চলে যেতে হবে? এত নিষ্ঠুর করে হলো তার সায়ন ভাই? এর জবাব তাকে দিতেই হবে। একথা ভেবে সে ধীরে ধীরে সাদা কাফনের একটা কোণা ধরল। বুকের ভেতর তখন প্রলয়

চলছে। চোখে ঝরছে নোনাজল। কাফনের কোণা
টানতেই

নিষ্পাপ মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। শীতলের
মুখ দিয়ে কোনো শব্দই বের হলো না। গলার স্বরও
যেন নিজের অজান্তেই শুক্ক হয়ে গেল। সে অবিশ্বাস্য
চোখে তাকিয়ে মানুষটার বুকের ওপর হাত রাখল।
নিজের

সঙ্গে একপ্রকার যুদ্ধ চালিয়ে কোনোমতে একটি শব্দই
উচ্চারণ করল,

-‘বা..বাবা!কাফনের কোণা টানতেই নিষ্পাপ মুখটা
ভেসে উঠল চোখের সামনে। শীতলের মুখ দিয়ে
কোনো শব্দই বের হলো না। গলার স্বরও যেন
নিজের অজান্তেই শুক্ক হয়ে গেল। সে অবিশ্বাস্য চোখে
তাকিয়ে মানুষটার বুকের ওপর হাত রাখল। নিজের
সঙ্গে একপ্রকার যুদ্ধ চালিয়ে কোনোমতে একটি শব্দই
উচ্চারণ করল,

-‘বা..বাবা!’

প্রাণপ্রিয় বাবাকে দেখে শীতল হতভম্ব চোখে তাকিয়ে
রইল। বাবার কি হলো? এভাবে শুয়ে আছে কেন?
তিনদিন আগে না ফোনে কথা হলো? কত কী বলে

তাকে বুঝা দিলো। দ্রুত আসার প্রতিশ্রুতি দিলো
তাহলে এসব কি? সে বিরবির করে বলল,-‘চিটিং
হচ্ছে বাবা..এটা কিন্তু কথা ছিল না।’

একথা বলে একটু কাছে বুঁকে বাবার গাল ধরতেই
ভেজা অনুভব করল। চোখের সামনে এনে দেখে
রক্ত। মাথা থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে কান বেয়ে রক্ত
আসছে। রক্ত কেন? কোথায় ব্যথা পেয়েছে বাবা?
ভাইয়ের রক্তের দাগই তো মুছে নি এরমধ্যে
বাবারও..? আর প্রাণপ্রিয় বাবা না কিছুক্ষণ আগে
মিশনে গিয়েছিল? যাওয়ার আগে তাকে কথা
দিয়েছিল যেভাবে যাচ্ছে সেভাবেই ফিরে আসবে।
তিনদিন আগেও কথা দিলো দেশে ফেরামাত্রই তার
কাছে যাবে। সব সমস্যার সমাধা করে দিবেন। বাবা
সবসময় তার পাশে আছে। তবে কি বাবা মিথ্যা
বলেছিল? কিন্তু বাবা তো কখনোই মিথ্যা বলে না।
সে আর ভাবতে পারল না আশ্তে করে বাবার বুকে
মাথা রাখতে গিয়ে টের পেল শক্ত কিছু সাদা ব্যান্ডেজ
দিয়ে বাঁধা বাবার বুক। ব্যান্ডেজ উতলে রক্ত ভেসে
উঠেছে। না জানি বাবা কত ব্যথা পেয়েছে।

সে আর সহ্য করতে পারল না বাবার হাত আঁকড়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। কি করুণ সেই কান্না সুর। তার কান্নার শব্দে চারপাশটা আরো ভারি হয়ে উঠল। শারায়াত চৌধুরী দৌড়ে এসে শীতলকে বুকে জড়িয়ে নিলেন ঠিকই কিন্তু এক শব্দ ব্যয় করে কিছু বলতে পারলেন না। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর তিন ভাই অনেক কষ্টে নিজেদের পরিবারকে সামলে রেখেছিলেন। দূরে থাকলেও উনার সম্পর্ক আগের মতোই ছিল। শাহাদত চৌধুরী দুই সন্তানের বাবা তবুও এখনো আগের মতোই উনাকে মান্য করে। একবার যদি মুখ ফুটে বলেন, ‘শাহাদত এটা করলে কেমন হয়?’ উনার বলতে দেরি সেকাজ করতে দেরি হয় না।’ শীতলকে বুকে আগলে উনি চোখের পানি ছেড়ে দিলেন। চাকরির কারণে শীতল, স্বর্ণ কখনোই বাবাকে কাছে পায় নি। স্বর্ণ বুঝদার কিন্তু শীতল বরাবরই বাবা পাগল। মাঝেমাঝেই আবদার করে বসে বাড়ি আসার জন্য। কিন্তু চাইলে তো যাওয়া যায় না আবার মেয়ের কান্নাও সহ্য করতে পারেন না। তখন উনাকে ফোনে করে বলে, ‘ভাই, আমার পাগলি মেয়েটা কাঁদছে।’ এইটুকু বলে চুপ করে যেতেই

তখন উনি বুঝে নিতেন উনাকে কিছু একটা করতে হবে। সেই অনুযায়ী বাড়ির সবাইকে নিয়ে হয় ঘুরতে বের হতেন। নয়তো বাড়িতে কোনো প্রোগ্রাম এরেঞ্জ করতেন। আবার তিনমাস পার হয়ে গেলে যখন বলতেন, ‘কতদিন হলো বাড়ি আসবে না?’ উনার কথা শুনে শাহাদত চৌধুরী মলিন হাসতেন। উনিও বুঝে নিতেন ভাই দায়িত্বের কাছে বন্দি। আর এ দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে গিয়েছিলেন মিশনে। আর উনার মিশনে যাওয়া নিয়ে আপত্তি করার মতো যুক্তি ছিল না। কারণ শাহাদত চৌধুরী শুনতেনও না। মিশনে যাওয়া নিয়ে যদি কিছু বলতে হয় তাহলে বলা বাহুল্য, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। আর এই স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে যারা ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বীর সদস্যরা। শুধু যে দেশের সীমানা তা নয় জাতিসংঘ যখন কোনো দেশের শান্তি ফেরাতে রক্ষাকর্মী চায় তখন বাংলাদেশের সেনাবাহিনী বুকভরা সাহস নিয়ে সবার আগে এগিয়ে যায়। সর্বদা প্রস্তুত থাকে ‘আমরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে রক্ষা করি’ ঠিক এই সংকল্পে। আর শাহাদত চৌধুরী ছিলেন বরাবরই দক্ষ ও সাহসী

এক অফিসার। যার কারণে মালির মতো দুর্গম এবং
ঝুঁকিপূর্ণ মিশনের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে
নিয়েছিলেন। প্রায় একুশ দিন আগে ১২০ থেকে ১৫০
জন সৈনিক নিয়ে তিনি রওনা দিয়েছিলেন মালির
উদ্দেশ্যে। মালি হলো আফ্রিকার একটি দেশ। এটি
সাহারা মরুভূমির বিশাল অংশ জুড়ে অবস্থিত। তবে
অনেক বছর ধরে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ এবং বিদ্রোহী
গোষ্ঠীদের অত্যাচারে জর্জরিতসেখানকার মানুষ।
সেখানে শান্তি বলতে কিছু নেই বরং বাতাসের চেয়ে
বারুদের গন্ধ বেশি পাওয়া যায়। সাহারার উত্তপ্ত বালু
যেমন শরীরের চামড়া পুড়িয়ে দেয়, তেমনি বছরের
পর বছর চলা রক্তক্ষয়ী সংঘাত কতশত মানুষের
স্বপ্নগুলোকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। শারাবাত
চৌধুরীরসহ উনার পুরো টিম যেখানে অবস্থান
করছিলেন, সেটি ছিল সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা।
সেখানে চারিদিকে শুধু ধুধু বালুচর আর রুম্ম
পাহাড়ের সারি। দিনে সূর্যের তেজ এত প্রখর যেন
গায়ে পড়লে মনে হয় কেউ আগুনের হলকা ঢেলে
দিচ্ছে। গ্রামগুলো একটি থেকে অন্যটি মাইলের পর
মাইল দূরত্ব। মাঝখানে জনমানবহীন মরুভূমি। আর

এখানে সবচেয়ে আতঙ্ক ছিল চোরাগোষ্ঠা হামলা। চোরাগোষ্ঠা হামলা মানে অতর্কিত হামলা। আরো সহজ ভাষায় বলতে গেলে, এখানে মাইলের পর মাইল বালুচর মানুষজনের চিহ্নমাত্র নেই। অথচ বালুর স্তূপে মাইন (IED) পুঁতে রাখা। কিংবা পাহাড়ের খাঁজে স্নাইপার তাক করে রাখা যেটা দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই। অথচ পা রাখলেই মৃত্যু। এমন প্রতিকূল পরিবেশে শারফাত চৌধুরীর টিম শুধু সাহসের ওপর ভর করে টিকে ছিলেন।

কিন্তু রোজ কাউকে না কাউকে হারাতে হতো। এমনও হয়েছে উনার সৈনিক উনার হাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। আবার এমনও হয়েছে চোখের পলকে কারো না কারো দেহ ছিন্নভিন্ন হতে দেখেছে। এমতাবস্থায় অনেকে হাল ছেড়ে দেশে ফিরতে চেয়েছিল। বুঝিয়ে সাহস জুগিয়েছেন।

আর এসব মিলিয়ে উনার দিনগুলো ভয়াবহ কাটছিল। যদিও নিজেকে নিয়ে ভাবার কিছু ছিল না। কারণ পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ছুঁয়ে একদিন কণ্ঠছেড়ে বলেছিলেন, ‘আমি শপথ করিতেছি যে, আমি বাংলাদেশের প্রতি অনুগত থাকিব। জল, স্থল ও

অন্তরীক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিব। ইহার জন্য যদি নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে হয়, আমি পিছপা হইব না।’

সেই শপথের কথা স্মরণ করে উনার এখন দুটো লক্ষ্য হয়েনাদের কাছে হার মানবে না। দ্বিতীয়ত সঙ্গের সৈনিকগুলোকে সহি সালামতে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। এখানে এসে উনি টিমের সবার সঙ্গে খুব সাধারণ ভাবে মিশতেন। যখন দেখতেন সৈনিক হাল ছেড়ে দিচ্ছে বা ভয় পাচ্ছে, তখন কত রকমের গল্প শোনাতে। সৈনিকরাও খুব পছন্দ করত উনার সঙ্গ। কিন্তু হঠাৎ দেশ থেকে আসা কলিজার টুকরো মেয়ের খবর শুনে চতুর মানুষটা ভেতর ভেতর কেন জানি মনোবল হারাচ্ছিলেন। নিজেকে বুঝিয়ে সম্মানিত পোশাকটির দিকে তাকিয়ে ব্যক্তিগত জীবনকে সাইডে সরিয়ে দিতেন। কিন্তু পোশাকের নিচে রক্তে, মাংসে গড়া একটা শক্ত বুক ছিল। সেখানে যত্ন করে গাঁথা ছিল পরিবার নামক একটি দুর্বল কুঠির। বাড়ি থেকে দূরে থাকলেও অসীম ভালোবাসা, যত্ন জমা রাখেন সেখানে। কিন্তু যখন দেখেন কলিজার টুকরো মেয়ে বিপদে পড়ে

উনাকেডাকছে। আকুতি ভরা সুরে বলছে, ‘বাবা এসো, তাড়াতাড়ি এসো প্লিজ।’এতদিন যাদের বুক দিয়ে আগলে রাখতেন তারা বিপদে পড়ে সরাসরি উনারই সঙ্গ চাচ্ছে। পাশে চাচ্ছে। বাইরের অপবাদ থেকে মুখ লুকাতে বাবার ছায়ায় মুখ লুকাতে আকুতি জানাচ্ছে। আরেক সন্তান হসপিটালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। পরিবারের উপর দিয়ে একের পর এক বিপদের ঝড়

ধেঁয়ে আসছে। এসব জেনে-শুনে কতক্ষণ ঠিক থাকা যায়? যায় না। আর ঠিক না থাকাটা উনার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াল। নিজের মনোবলের ভীত নড়ে গেল।

সেদিনের লোমহর্ষক ঘটনা,
রোজকার মতো ওই মুহূর্তেও ছিলেন সংঘর্ষের এক পর্যায়ে। রাস্তার বাম পাশের ছোট টিলার আড়াল থেকে ধোঁয়া উড়ছে। ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে
প্রথম গাড়িটা ছিঁটকে পড়েছে রাস্তার ধারে। মুহূর্তের মধ্যে চারিদিক স্তব্ধ।

মেশিনগানের তপ্ত গুলিতে পরিবেশ আরো ভয়াবহরূপ ধারণ করেছে। তখনও বিদ্রোহীরা পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে লুকিয়ে ছিল। নজর রাখছিল উনাদের প্রতি।

তবুও শাহাদত চৌধুরী এক মুহূর্তের জন্য বিচলিত
হলেন না। বরং সাহসী বজ্রধ্বনিতে হুকুম দিলেন,
‘ডিসমাউন্ট! সেকশন ওয়ান বাম দিকে কভার নাও।
আমরা ওদের পিন ডাউন করব। কোনো বেসামরিক
মানুষ যেন ক্রসফায়ারে না পড়ে!’

উনার কথামতো অন্যরা পজিশন নেয়। চারপাশ তখন
ধুলোর মেঘ আর বারুদের কটু গন্ধের ছড়াছড়ি।
পরিস্থিতি তখন আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে।
এরপর চোখের সামনে উনাদের আরো দুটো গাড়ি
ল্যান্ডমাইনে উড়ে গেল। ওই গাড়িতে ছিল
বাংলাদেশের বীর সন্তান রিফাত, জামিল, কাদের,
মনির, কার্তিক, সবুজ, মিনার, রাতুল নামের বীর
সৈনিক। এক মুহূর্তে তাদের শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে
গেল। তাদের অবস্থা দেখে আরিয়ান ছলছল চোখে
তাকাল শাহাদত চৌধুরীর দিকে। একের পর
বিষ্ফোরণে

কানে তালা লাগানোর অবস্থা সঙ্গে আছে এলএমজির
গর্জন। শাহাদত চৌধুরী আরিয়ানকে চোখের ইশারায়
সাহস জুগিয়ে বজ্রকণ্ঠে পুনরায়

আদেশ দিলেন,-‘কভার! ওয়ান ও ব্লক পজিশন থেকে
ফায়ার আসছে! সবাই পজিশন...!’

বাকি কথা শেষ করার আগে হঠাৎ একটি বুলেট
গেঁথে গেল উনার ডান বাহুতে। ভিজে গেল বাহুর
কাছের পোশাকটি। উনার থেকে কয়েক হাত দূরে
আরিয়ান গোঙাচ্ছে, ওর দুই পায়ে গুলি লেগেছে।
চারদিকে করুন আত্ননাদ। পাহাড়ের খাঁজে বিদ্রোহীরা
মাথা তুললেই খুলি উড়িয়ে দেবে। একটা গুলি খেয়ে
শাহাদত চৌধুরী দমলেন না বরং হাত থেকে ছিঁটকে
পরা উনার এম-ফোর রাইফেলটা শক্ত করে ধরলেন।
মনে মনে ওয়াদা করে নিলেন প্রাণ গেলে যাক তবুও
এই হয়েনাদের দমন করতেই হবে। সঙ্গে আসা
নিজের একটা সৈনিককেও এখানে ফেলে যাওয়া যাবে
না। নিজের ওয়াদা রাখতে রাখতে। দেশে ফিরতে
হবে। পরিবারকে বিপদ থেকে বাঁচাতে হবে। মনে
মনে এসব ভেবে উনি সেকশন কমান্ডারকে ইশারায়
জানালেন ফ্লাঙ্কিং করার জন্য। এক হাতে গ্রেনেড বের
করে পিন খুললেন তিনি, অন্য হাত শক্ত করে চেপে
ধরলেন মাটি। অতঃপর সেটা নিশানা বুঝে ছুঁড়তেই
জায়গা মতোই লাগল। মিনিট দশেক পর কোথাও

থেকে আচমকা একটা বুলেট এসে গেঁথে গেল উনার
বুকের। আরেকটা এসে লাগল মাথার পেছনের
দিকে। মাথায় বুলেট গেঁথে সেখানেই থেকে গেল আর
আর বুকেরটা পিঠের মাংস খেতলে বেরিয়ে গেল।
মুহূর্তেই মুখ খুবকে পড়লেন শাহাদত চৌধুরী।
আকাশপানে একবার তাকালেন। দু ফোঁটা অশ্রু
গড়াতেই কানে প্রতিধ্বনির মতো বাজতে লাগল,
'বা..বাবা এসো, একটু তাড়াতাড়ি এসো প্লিজ।' কিন্তু
উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা উনার নেই। চোখের সামনে
মৃত্যুর দূত। আর কি যাওয়া হবে? কলিজার টুকরো
মেয়েরা, একসঙ্গে পথচলার সঙ্গী, সুন্দর পরিবার;
পরিবারের সদস্যদের সবার মুখগুলো স্মরণ করার
সময়টুকু হলো না উনার। তার আগেই শেষ নিঃশ্বাস
ত্যাগ করলেন শাহাদত চৌধুরী। ফেরা হলো না
আপন দেশে। যদিও বা ফিরলেন দেহে প্রাণটি রইল
না। এদিকে শীতলকে সামলানোর দায় হয়ে পড়েছে।
বাবার বুকে মাথা রেখে চিৎকার করে কাঁদছে।
শারাবাত চৌধুরী বসে থাকতে পারলেন না উঠে চলে
গেলেন। শুদ্ধ তখন জরুরি কল সেরে এসে দাঁড়াল
শীতলের কাছে।

শীতলের আধাঘন্টা থাকার আদেশ থাকলেও এক ঘন্টা করা হলো। এই সময়টুকু বাড়াতে শুদ্ধকে খসাতে হলো দেড় লক্ষ টাকা। কথায় বলে না, হাতি যখন কাঁদায় পড়ে তখন চামচিকাতেও লাথি মারে। তাদের অবস্থা হয়েছে সেইরকম। টাকার হিসাব বাদ যাক কাজ হয়েছে এটাই অনেক।

শুদ্ধ শাহাদত চৌধুরীর বুক থেকে সরাতেই শীতল উঠল না। বরং বাবার বুক আঁকড়ো ধরে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলল,-‘ বোনকে বিধবা হওয়া থেকে বাঁচাতে আসামি হলাম। বাড়ি ফিরে দেখি আমার মা..আমার মা বিধবা হয়ে বসে আছে। এই....এই দৃশ্য কিভাবে সহ্য করব আমি? কিভাবে নিজেকে বুঝ দেবো আমার বাবা আর নেই রে। আমার বাবা, আমার কলিজার টুকরো বাবা আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে। আমি বাবা ডাকব কাকে? কে আমার ডাকে সাড়া দেবে? কার কাছে মায়ের নামে অভিযোগ করব আমি? কে আমার শক্তি হবে? কে আমাকে সাহস জোগাবে? তাড়াতাড়ি আসার কথা দিয়ে একেবারেই চলে গেল আমার বাবা। বাবা, বাবা উঠো, বাবা! বাবা না থাকার অভাবে অভাবী কোরো

না রে, বাবা। এ অভাব লাগব করার ক্ষমতা আমার নেই।

বাবা..তোমাকে সাদা কাফনে দেখতে পারছি না আমি। আমার কলিজা ছিঁড়ে যাচ্ছে বাবা। আমার দম আঁটকে আসছে।'শুদ্ধ জোর করে শীতলকে সরিয়ে আনল সেখান থেকে। শুদ্ধকে আঁকড়ে ধরে কাঁদল মেয়েটা। উপস্থিত প্রতিটা মানুষ তার কান্নায় চোখের পানি ধরে রাখতে পারল না। তখন ধীর পায়ে স্বর্ণ এলো। শীতল বোনকে দেখে কান্না ভুলে গেল। বোনের এ রূপ সহ্য করার মতো না। চেহারার কি হাল!

স্বর্ণএবার নিজেও বসে পড়ল শীতলের পাশে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বাবার মুখের দিকে। শুদ্ধ তখন দু'বোনের মাথাতে ভরসার হাত রাখল। তার নিজেরও কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে। বাড়িতে দুজন মানুষের কাছে সব কথা শেয়ার করে পারত। যে কোনো ব্যাপারে সহজে আলোচনা করতে পারত। তারা হলো শাহাদত চৌধুরী আর সাইন। অথচ তাদের একজন বর্তমানে কোমায় আর আরেকজন একেবারে ফাঁকি দিয়ে চলেই গেল। তারা ফাঁকি দিলেও সে তো পারবে না। যত ঝড় আসুক সবটা

তাকেই সামলাতে হবে। সবাই খুব কাঁদছে, অভিযোগ দিচ্ছে কিন্তু সে পারছে না।

এই না পারাটা যে কতটা যন্ত্রণার হারে হারে টের পাচ্ছে। তবে যেদিন সব সমস্যার সমাধান হবে। বিপদের মেঘ কেটে নতুন সূর্য উদয় হবে সেদিন সেও কাঁদবে, খুব কাঁদবে। ততদিন যত যা কিছু ঘটে যাক দু'হাতে সামলে নেবে, নিতেই হবে। এসব ভেবে শীতল আর স্বর্ণের মাথায় হাত রাখলে দুজনই ঘুরে তাকাল তার দিকে। তখন শুদ্ধ বলল,-‘শহীদ শাহাদত চৌধুরীর মেয়ে তোমরা। ভেঙে পড়লে চলবে? কেউ না জানুক তোমরা তো জানো তোমাদের বাবা হাল ছাড়ার মানুষ না। তবে তোমরা কেন ভেঙে পড়ছো? বাবার মেয়েরা বাবার মতো হতে হবে না?

মায়ের কথা ভাবতে হবে না? উনাকে তো তোমাদেরই সামলাতে হবে।’

মায়ের কথা বলতেই শীতলের টনক নড়ল সে উঠে বাড়ির ভেতর গেল। সিমিন দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। চোখের পানি অঝরে ঝরে যাচ্ছে। শীতলকে আসতে দেখে ছোটো বাচ্চার মতো ঠোঁট ভেঙে কেঁদে দিলেন। শীতল মাকে শক্ত করে জড়িয়ে

ধরেই বসে রইল। সিমিন জমে থাকা কান্না উগড়ে
দিলো মেয়ের কাছে। মাকে কাঁদতে দেখে শীতল আর
কাঁদল না। এদিকে ঘড়ির কাঁটা টিকটিক করে ছুটে
চলেছে ঘন্টার কাঁটার দিকে। এভাবে কিছুক্ষণ পাথর
হয়ে মায়ের কাছে থাকল শীতল। দু'জন মহিলা
পুলিশ দাঁড়াতেই বুঝল সময় শেষ। সে মায়ের
কপালে চুমু দিয়ে কান্নাভেজা স্বরে থেমে থেমে
বলল,-‘সাবধানে থেকো। আপুর খেয়াল রেখো।’

সিমিন মেয়ের কাঁধ থেকে মুখ তুলে ফ্যালফ্যাল করে
তাকিয়ে রইল। এই কোন পাপের শাস্তি পাচ্ছে উনি?
মাথার উপর থেকে ছায়াটা সরে গেল, বড় মেয়ের
অনিশ্চিত ভবিষ্যত, ছোটো মেয়ের এই দশা! এতদিন
কি এই দিনের জন্য বেঁচে ছিলেন? শীতল সিতারা
আর সিরাতের দিকে তাকালে

উনারা শব্দ করে কেঁদে ফেললেন। কথা দিলেন তার
মা বোনের খেয়াল রাখবে। এইটুকু প্রতিশ্রুতি পেয়ে
শীতল পুনরায় ওর বাবার কাছে এলো।

বাবার হাত আঁকড়ে ধরে বুঁকে চুমু খেলো বাবার
কপালে। কানে কানে ফিসফিস করে বলল,-‘শেষ
যাত্রায় একটা সিক্রেট কথা শুনে যাও বাবা। কথাটা

হয়তো বলতে চেয়েও কোনোদিন মুখ ফুটে বলা
হয়নি কিন্তু আজ চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে,
'তোমায় অনেক ভালোবাসি বাবা! সারাটা জীবন তুমি
শুধু আমাদের ফাঁকিই দিয়ে গেলে। কখনও দেশ,
কখনও দেশের মানুষ, আর কখনও ওই জলপাই
রঙের পোশাকটার দোহাই দিয়ে আমাদের থেকে
দূরেই থাকলে। বাবার আদর ঠিকমতো পাওয়ার
আগেই তুমি কর্তব্যের চাদরে মুখ লুকালে। আমার
ওপর যদি তোমার সামান্যতম দাবি থাকে বাবা, তবে
ফিরে এসো। এবার বাবা হয়ে নয়, আমার সন্তান
হয়ে আমার কোলে ফিরে এসো। আমি তোমায় আর
একটি মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল হতে দেব না।
সেই সবটুকু সময় আমি তোমায় দেব, যা তুমি
আমাকে দিতে পারোনি। ফিরে এসো বাবা, ফিরে
এসো।' একথা বলে এবার শুদ্ধর দিকে তাকাল।
তারপর থেমে থেমে বলল,

- 'আমার বাবার শরীরে আজ না জানি কত আঘাত।
কত ব্যথা। আপনারা যখন ধরবেন একটু আস্তে করে
ধরবেন আমার বাবাকে। যত্ন করে গুঁইয়ে দিয়ে
আসবেন শক্ত মাটির বিছানায়। আমি মেয়ে হয়ে তো

সেসব পারব না তাই সবার মতো আপনার ঘাড়ে
দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে গেলাম, আসছি আমি।’

(সমাপ্ত)